REGTD. No. C. 708.
১০ম বর্ষ | বৈশাখ ১৩২৭ | ১ম সংখ্যা

ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক পরিচালিত

প্রতিভা

মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক—অধ্যাপক শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সরকার
এম্-এ, পি-এইচ্-ডি; এফ্-সি-এস

সূচী

প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।

বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ২৸০ | শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বি, এল কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিভা কার্য্যালয়, ঢাকা। | এই সংখ্যার মূল্য ডাকমাশুল সহ [illegible]

প্রতিভা—১০ম বর্ষ ১৩২৭ সন

বর্ষ সূচী

(বর্ণানুক্রমিক)

প্রতিভা

১০ম বর্ষ | বৈশাখ ১৩২৭ | ১ম সংখ্যা

নববর্ষ।

'প্রতিভার জীবনের আর এক অধ্যায় চলিয়া গেল। অতীত বৎসর একবারেই বিস্মৃতির কোলে বিলীন হইবে কি না কে জানে? কতকগুলি ঐতিহাসিক গবেষণা কতকগুলি সাহিত্যের আলোচনা, কতকগুলি রসাল প্রবন্ধ লইয়া 'প্রতিভার' জীবনগতি,—গত কাল গতির সহিত মিশিয়া ভগবানের চরণতলে উপনীত হইয়াছে। হয়তো তাহার কতক সমাদৃত হইয়াছে, কতক আবার হতাদরেও মুহ্যমান হইয়া আছে।

চুটকী গল্পে বা নীরস কবিতায় 'প্রতিভার' অঙ্গ পুষ্ট করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। বিশুদ্ধ আমোদ আমাদের অন্যতম লক্ষ্য হইলেও 'জীবন সংগ্রাম বড় কঠোর' এই ধারণাই 'প্রতিভার' মূল সূত্র। তাই, আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারে আমরা জ্ঞানের ক্ষীণ বর্ত্তি ধারণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছি এবং সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের গন্ধ সুরভি বিকীর্ণ করিতেও যত্ন করিয়াছি। সফল হইয়াছি কি না, বিচার করিবেন সুধী গ্রাহক ও অনুগ্রাহকগণ।

"ধিয়াত্মন স্তাবদ চারু না চরম্,
জনস্তু যদ্বেদ সতদ্‌বদিষ্যতি।"

যদি আমাদের শ্রম কিঞ্চিমাত্রও সফল হইয়া থাকে, যদি ক্ষীণ দীপালোকে একজন পথিকও উপকৃত হইয়া থাকেন তবে ভগবান্ প্রতিভার ক্ষুদ্রজীবনেও কৃপাদৃষ্টি করিয়াছেন ইহা মনে করিব। আর, "ক্লেশঃ ফলেন হি পুন র্নবতাং বিধত্তে" এই তত্ত্ব সার করিয়া ভবিষ্যতের জন্য উৎসাহ সম্পন্ন হইয়া আমরা নবোদ্যমে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইব। যিনি শাশ্বত, যিনি সর্ব্ব লোকাশ্রয়, যিনি কর্ম্মফল দাতা তিনি আমাদের সহায় হইবেন।

গত বর্ষে আমরা শীতাতপ, আলো ও ছায়া, সুখ দুঃখের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছি। সুখ অপেক্ষা

দুঃখের ভাগই আমাদের ভাগ্য বিপর্য্যয়ে অদৃষ্টে লাভ হইয়াছিল। অতীত বৎসরে কয়েকটী নক্ষত্র বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশ হইতে চিরতরে অস্তমিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের যশোরশ্মি আমি মধ্যগত চন্দনের মৃদু গন্ধের মত বঙ্গ-বাসীর শোভন মন্দির চির পুলকিত করিয়া রাখিবে।

এবৎসর আমরা নূতন আশায় আশান্বিত হইয়াছি। পৃথিবী প্রতি নিয়ত নানা বিষয়ে নূতন আকার ধারণ করিতেছি। জগতের নৈতিক সামাজিক রাজনীতিক অবস্থার নবোন্মেষ হইতে চলিয়াছে। কালের স্রোতোর সহিত চলিয়া চলিয়া অথচ নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া নীরবে নূতন শক্তির অনুশীলন পূর্ব্বক আমরা অগ্রসর হইব। আর, সমবেত সাহিত্যিকবৃন্দের একনিষ্ঠ প্রচেষ্টায় বঙ্গবাণীকে জগতের নমস্যা করিতে যত্নপর হইতে হইবে। বৈদিক ঋষির ভাষায় বলিব—

"তাং ধীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি।"

শ্রীকামিনিকুমার সেন।

নববর্ষে।

সুরে সুরে আজি বাজো সুমধুর
 ওগো মানবের মনোবীণা!
বাজো ধরণীর বেদনা-বিধুর
 মরম-রাগিনী গীতহীনা!
নবভুবনের নবীন বরষে
নবজীবনের বোধন-হরষে
জাগো নিখিলের মনোময়ী বাণী
 মহামানবের হৃদিলীনা!

গাহ গাহ গান নীরব চারণ,
 নরদেবতার সভাকবি!
অমাযামিনীরে করিয়া হরণ
 প্রভাত আনিল নবরবি!—
জাগে শিহরণ কমলের বনে,
বিহগ-কাকলী মুখরে পবনে;
গাহ ঋষি সাম ভুবন-শিয়রে,
 আঁকো নীলিমায় হেম-ছবি!

কাঁপে কাঁপে মরু-ধরণী-শিরায়
 বীর-শোণিতের প্রাণ-ধারা,
প্রলয়ের ঘন অশনি-শিলায়
 অচেতনে আজি জাগে সাড়া!
ভাষাহীন গণ-মরমের মাঝে
নরদেবতার জাগরণ বাজে!—
শতদিকে বহি' তটিনীর বারি
 সাগরের বুকে হল হারা!

কোথা—কোথা কাঁদে মূক বারিধার
 গিরি-পাষাণের হিয়াতলে!
বাহিরিবে কবে ধারা ঝরণার
 শিলা বিদলিয়া কলকলে!
ফুটি-ফুটি করে কোথা ফুলকলি
দলের বাঁধনে আপনারে ছলি',
মধুপেরে চাহি' বহে যায় বেলা
 বুক-ভরা সুধা-পরিমলে!

জাগো জাগো কবি-তাপস অমর,
 জাগো তমসার অবসানে!
ঊষার আলোকে ভরি' চরাচর
 আলো শিহরণ প্রাণে প্রাণে!
প্রপাত পুলকে বহে যাক্ ছুটি,'
উঠুক্ হরষে ফুলশিশু ফুটি,'

বনবীথিকার ভাষাহীন বাণী
মুখরিয়া তোল গানে গানে !

চাহে চাহে তোমা ব্যথিত ভুবন,
অসহায় প্রাণ দিশাহারা,
ফেণায়ে উঠিছে অধীর চেতন—
নবজীবনের কলধারা !
কে আজি জুড়াবে নিখিলের হিয়া
চিরজনমের সুধা বিতরিয়া ?
সাগর-দোলায় কে দেখাবে আজি
গগনে উজল ধ্রুবতারা ?

দিকে দিকে জাগে আকুল তিয়াস,
কে পিয়াবে হৃদি-স্নেহ-বারি ?
ফেলে সুরাসুর অনল-নিশাস,
কে বাটিয়া দিবে সুধা-ঝারি ?
জাগো কবি জাগো নিখিলের বুকে,
বিজিতের লাজে, ব্যথিতের দুখে,
জয়ীর পুলক-আকুলিত প্রাণে
মোহ-তমসায় অপসারি' !

বাজো বাজো কবি-বীণায় মধুর
বাজো মানবের মহাবাণী !
জাগো নবারুণ-বিকাশ-বিধুর
হৃদি-কমলের বীণাপাণি !
জাগো যুগ-কবি, হে প্রাণ, বিধাতা !
গাহ মানবের মিলন-বারতা,
নব বরষের উষায় ভুবনে
নব জাগরণ দেহ আনি' !

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

উষা।

(ঋগ্বেদের একটী চিত্র)

ঘোর নৈশ তমিস্রা ভেদ করিয়া যেমন পূর্ব্বগগণে প্রভাতের অরুণিমা একটু ২ করিয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে অমনি বিশ্বময় এক নূতন চেতনা জাগিয়া উঠিল। পাখীরা আলোক দেখিয়া গাছের ডালে পুলকে গান ধরিল, বিশ্বের যাবতীয় প্রাণী নূতন প্রাণ পাইল, গৃহস্থ নিজ কর্ত্তব্যে গমন করিল, ঋষিরা দান যজ্ঞাদি ধর্ম্ম কর্ম্মে মন দিতে লাগিলেন, ভিখারী ভিক্ষার জন্য নিজ গৃহ হইতে বাহির হইল—সর্ব্বত্রই কি এক গতি, কি এক চেষ্টা, কি যেন এক প্রাণের বিকাশ। কে ঐ সুন্দরী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী পূর্ব্বাকাশে অন্ধকারের দ্বার খুলিয়া বিবিধ বর্ণ রঞ্জিত ভূষায় সজ্জিত হইয়া, কে ঐ অনন্ত যৌবনা "অজরা অমৃতা" যুগ যুগান্তর হইতে প্রত্যহ বিশ্বজগতে এমন সুন্দর জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া এই নূতন প্রাণ প্রেরণ করিতেছে? রাত্রির অন্ধকার নিমগ্ন বিশ্ব কাহার চক্ষে প্রকাশ পাওয়ার জন্য প্রত্যূষে মস্তক নামাইয়া নমস্কার করিতেছে? ঋষিরা তাঁহাকে চিনিয়া গদগদ স্বরে গাহিতেছেন—"উঠ, জাগ। ঐ দেখ অন্ধকার দূর করিয়া নূতন আলোকে জগৎ উদ্ভাসিত করিয়া আমাদের প্রাণ আমাদের প্রাণবায়ু "বিশ্বস্য হি প্রাণনং জীবনং" রূপে সঞ্জীবনী শক্তিময়ী দেব দুহিতা উষা আসিয়া আমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন। এ সুন্দরীর শোভা, তাঁহার স্বরূপ বর্ণনা করিতে যাইয়া ঋষির ভাষাও যেন হার মানিয়াছে। ঋষি তাঁহার উপমার জন্য দ্যুলোক ভূলোক খুজিয়া সুগৃহিনী ভিন্ন তাঁহার অন্য উপমার সামগ্রী পাইলেন না। তাঁহার সৌন্দর্য্যের তুলনাও সুন্দরী গৃহিনী, স্বরূপের তুলনাও ঐ সুন্দরী গৃহিনী। সুগৃহিনী যেমন প্রত্যূষে গৃহের সকল লোককে জাগাইয়া রাত্রের জীর্ণ শ্লথ ভাব দূর

করিয়া তাহাদের ভিতর এক নূতন চেতনা জাগাইয়া তাহাদিগকে নিজ নিজ কর্ম্মে প্রেরণ করিয়া নিজেও আপন কর্ম্মে গমন করেন। উষাও তেমণি সমস্ত বিশ্বকে জাগাইয়া তাহার সুপ্ত ভাবকে প্রাণবান, চেষ্টাবান গতিবান করিয়া সকলকে নিজ নিজ কর্ম্মে প্রেরণ করিয়া অমনি অন্তর্ধান হন—কার্য্য সম্পন্ন হইলে এক মুহূর্ত্তও থাকিবার কামনা করেন না "পদং ন বেতি"।

আঘা যোষেব সুনরী উষাঃ যাতি প্রভু ঞ্জতী।
জরয়ন্তী বৃজনং পদ্বৎ ইয়তে উৎপাতয়তি পক্ষিণঃ॥
বি যা সৃজতি সমনং বি অর্থিনঃ পদং ন বেত্তিওদতী।
বয়ো নকিষ্টে পপ্তিবাংস আসতে বি উষ্টোবাজিনী-
বতী॥
বিশ্বমস্যা ন নাম চক্ষসে জগজ্জ্যোতি স্কৃণোতি
সুনরী।
বিশ্বস্য হি প্রাণনং জীবনং তে বি যদুচ্ছসি সুনরি॥

হে আমাদের দেশের গৃহিনীগণ, পুরাতন বৎসরের সহিত পুরাতন জীর্ণ ভাব যাহা তোমাদের নিজস্ব নয়, সে ভাব পরিত্যাগ করিয়া আপন স্ব-রূপ গ্রহণ কর, নূতনকে সাদরে আহ্বান করিয়া লও। দেখ আজ আমাদের দেশ অজ্ঞানতা ও জড়তার ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এস আজ তোমাদের চির পুরাতন নিত্য নূতন সৌন্দর্য্য ও স্ব-রূপ লইয়া তন্দ্রামগ্ন আত্মবিস্মৃত জাতির প্রাণে আপন সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চার করিয়া আবার তাহাকে প্রাণবান প্রজ্ঞাবান শক্তিমান চেষ্টাবান করিয়া তোল, তাহাদের হৃদয়ে তাহার স্ব-রূপকে বিকশিত করিয়া তোল!

শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী।

"দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি"।

মায়া ও স্বাধীন ইচ্ছা *

সংসারের লোক তুমি; দুঃখে কষ্টে ঝালা পালা হইয়া কি যে তোমার 'প্রাণ' চায়, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। 'মুখে' ফাঁকা সুখ, শান্তি কি আনন্দের আকাঙ্ক্ষা করিতেছ, 'অন্তরে' কিন্তু কেবলই অবিশ্বাস, কেবলই নৈরাশ্য, কেবলই দুঃখের চিন্তা, অশান্তির ভাব। শুনিলে, "ওঃ, অমুক স্থানের অমুক 'মহাপুরুষ' সাক্ষাৎ শিব!"—জাতিগত একটা সংস্কার রহিয়াছে। আশা সেই সংস্কারটা উস্‌কাইয়া দিল, আর অমনি দৌড়াইলে তাঁর কাছে। মনে কত আশা—তাঁর একটা কৃপাকটাক্ষে, একটা অমৃতময় কথায় তোমার মনে সুখ শান্তি আনন্দের উদ্দাম ফোঁয়ারা ছুটিয়া যাইবে, কোথায় রহিবে দুঃখ, দারিদ্র্য, শোক তাপ!

তুমি ত ছুটিয়া ছুটিয়া কণ্ঠাগত প্রাণ হইয়া 'মহাপুরুষের' চরণ-তলে আসিয়া লুটাইয়া পড়িলে? তিনি অমনি 'বালকের মত সরল' হইয়া অথবা রুদ্র সংহার-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিলেন, "বাপু হে, রয়েছ মায়ার রাজ্যে, চলেছ ভোগের পথে—ও সব পা'বে কোথায়? সুখ যদি চাও, শান্তি যদি চাও, আনন্দ যদি চাও—এসো 'ত্যাগের' পথে; 'সব' ছেড়ে এসে 'তাঁকে' ধর। দেখ্‌বে সুখ শান্তি আনন্দের অবধি নাই। কর 'ত্যাগ' অভ্যাস কর, তবেই সব হ'বে!"

—এমন ভয়ানক মিথ্যা কথা বলিয়া কি বাপু লোক ঠকাইতে হয়, না, আত্মপ্রতারণা করিতে হয়? নিজে যদি সন্ধান না পাইয়া থাক, সে কথাটা বুঝিয়া বলিতে আপত্তি কেন?

---

* লেখকের যন্ত্রস্থ গ্রন্থ "উত্তর বেদ ও পরম পদ" হইতে গৃহীত।

'মায়ার' হাত এড়াইতে যাইয়া, "নেতি নেতি", "ত্যাগ ত্যাগ" করিয়াই সমগ্র ভারতটা অধঃপতনের রসাতলে আসিয়া পৌঁছিয়াছে! তুমি নিজেও যে কতটা উপরে উঠিয়াছ, কতটা সুখ শান্তি আনন্দের সন্ধান পাইয়াছ, তাহা ত' তোমার দৈহিক ভোগে, বাক্যের অসার্থকতায়, রোগের যাতনায়, অকাল মৃত্যুতে এবং মৃত্যুর সময়কার ব্যবহারেই প্রমাণিত! তবু আবার তুমি ত্যাগের কথা মুখে আনিতেছ! মঙ্গলময় ভগবানের যে যত নিকটবর্ত্তী হইবে, তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া মঙ্গলময় বিভূতিগুলি আপনা হইতে ততই প্রকাশ পাইতে থাকিবে। 'সিদ্ধাই' বলিয়া তাহা উড়াইতে গেলে চলিবে কেন?

ত্যাগ করিবে, কি হে বাপু? তোমার আছে কি যে ত্যাগ করিবে? রাস্তার ভিকারী হইয়া বলিতেছ বেঙ্গল ব্যাঙ্কের টাকায় আমার প্রয়োজন নাই—আমি উহা ছাড়িয়া দিলাম! মাথা রাখিবার কুটীরখানা নাই—অথচ ভড়ং করিতেছ যেন গৌতম বুদ্ধের মতই রাজ-সিংহাসন ত্যাগ করিতেছ! ধিক্ তোমাকে, আর দুরদৃষ্ট তাদের, যারা তোমার কথাটা বেদ বাক্য মনে ক'রে মিথ্যার পাছে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে!

যে 'দ্বন্দ্বাতীত' 'তুরীয়' অবস্থার কল্পনা করিয়া তুমি নিজে সেই দিকে ছুটিয়া চলিয়াছ ও 'সংসারী' লোককে যাইবার জন্য আহ্বান করিতেছ—সেই 'তুরীয়' ভাবে কতকাল অবস্থান করা চলে? কাল অনন্ত—দশ হাজার, বিশ হাজার কি বিশ কোটি বৎসরই না হয় তুমি 'সমাধিস্থ' হইয়া 'সুখদুঃখের অতীত' হইয়া রহিলে তার পর? যখন ব্যবহারিক জগতে আসিবে, তখনই যে 'বিষয়' গুলি জোর করিয়া কাণে ধরিয়া তোমাকে যখন তখন আসিয়া বলিবে—ওরে কাণা, একবার চোখের মাথা খেয়ে আমার রূপের ডালিটা দেখ্ না! ওরে কালা, একবার আমার মলের রুণু রুণু ঝুনু ঝুনু শোন্ দেখি! ওরে জড়, একবার আমার অঞ্চল বীজনে কত সুখ, তা অনুভব কর্ দেখি! তখন তুমি থাকিবে কোথায়? মহেশ্বরের ধ্যান ভঙ্গ, রাজত্ব-দ্বেষী মহর্ষি বিশ্বামিত্রের ঔরসে শকুন্তলার জন্ম, পুত্রশোকে পরমজ্ঞানী বশিষ্ঠের জলে ঝম্প প্রদান—এ সকলই 'ত্যাগের' নিষ্ফলতার জলন্ত চিত্র।

ভগবানের যে দুই বিভিন্ন বিপরীত শক্তির খেলায় এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব, তাহার প্রভাব, তুমি 'চক্ষু বুজিয়া' থাকিলেও, তোমার উপর সমান ভাবে চলিতেছে, চলিতে থাকিবে। 'চক্ষু বুজিয়া' থাকিতে যাইয়া এই উভয় শক্তির প্রভাবের অতীত একটা অবস্থা তুমি কল্পনা করিয়া লইয়াছ; ইহাদের একটিকেও তুমি ধরিয়া থাক নাই। অনন্যচিত্ত হইয়া 'আকর্ষণ' কর নাই। কাজেই যখন আবার তুমি চক্ষু মেলিতে যাও, তখন উভয়টিই তোমার উপর সমান ভাবে ক্রিয়া করিতে আরম্ভ করে। কখনও তোমার বাক্য সত্য হয়, কখনও হয় না; কখনও চিত্ত স্থির হয়, কখনও হয় না; কখনও দুঃখে চিৎকার কর, কখনও কর না। এই ভাবে, ভগবান্ অনন্ত হইলেও, তোমার অন্ত হইয়া থাকে!

তাই বলি, অর্থহীন কথা বলিয়া দেশটাকে ও মানুষ-গুলাকে আর গোল্লায় দিও না। 'মানুষের মত' মানুষ যদি তৈয়ার করিতে না পার, 'দেবতার' মত মানুষ আর গড়িতে যাইও না।

'ত্যাগ' তুমি করিতে পার কিনা, পারিলে কতটুকু পার, তাহার বিচার পরে করা যাইবে। জগৎটা যে মায়ার রাজ্য অলীক ও অসার, তোমার এ কথাটার অর্থই আগে তলাইয়া দেখা যা'ক্।

ভগবান্ সগুণ কি নির্গুণ, তাঁহার এক মাথা কি সহস্র মাথা অথবা মাথা আছে কি নাই—ঘরে বসিয়া চক্ষু বুজিয়া তাহা কল্পনা করিবার আমার কোনই প্রয়োজন নাই। এই বিরাট বিশ্ব তাঁহার স্ব-রচিত গ্রন্থ—তাঁহার আত্মকাহিনী। ইহার ভিতরে, চক্ষু মেলিয়া

চাহিলে, তাঁহার যে পরিচয় পাওয়া যায়, বর্ত্তমানে তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

বিশ্ব-ভাণ্ডারে ভগবানের বিপরীত গুণের সমাবেশ দেখিতে পাই—উভয়ই অসীম অপরিমেয়। হাসিরও অন্ত নাই, কান্নারও শেষ নাই; সুখেরও পার নাই, দুঃখেরও অবধি নাই। তিনি অনন্ত অমৃতের ভাণ্ডার, আবার অনন্ত গরলের ভাণ্ডার।

বিশ্ব-নিয়ন্তা নিতান্ত অপক্ষপাত। জ্ঞান অজ্ঞান, সুখ দুঃখ, ঐশ্বর্য্য দারিদ্র্য, প্রেমদ্বেষ—এ সকল কিছুই তিনি হাতে ধরিয়া বিতরণ করেন না। আমরা যে যাহার রুচি প্রবৃত্তি এবং তদনুরূপ কার্য্য দ্বারা তাঁর অনন্ত ভাণ্ডার হ'তে অমৃত বা বিষ 'টানিয়া' লই।

তাঁর ভাণ্ডারটাই, অর্থাৎ অভিব্যক্তরূপে তিনি নিজেই বিপরীত গুণের সমাবেশ, কিন্তু তথাপি আলো যেখানে, সেখানে অন্ধকার নাই; সুখ যেখানে, সেখানে দুঃখ নাই; জীবন যেখানে, সেখানে মৃত্যু নাই। উভয়ই যে অনন্ত, অতল ও অসীম। সাধারণ দৃষ্টিতে পরস্পরের অর্থ বোধক এবং সীমা-নির্দ্দেশক হইলেও প্রকৃতপক্ষে 'বিপরীত' গুণগুলি পরস্পরে সীমাবদ্ধ অতএব সান্ত ও মিথ্যা করিয়া দিতেছে না। বিশ্ব-ভাণ্ডারে তার মালিকের যে পরিচয় মিলে, সে দিকে তাকাইয়া দেখ। তাই 'অজ্ঞানে' ডুবিয়া রহিয়াছ—'মায়ার' হাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছ। এবং এই মায়ার প্রভাবে, তুমি জগতের স্বরূপ দেখিতে পাইতেছ না, দেখিতে পাইতেছ সুধু মায়ারই খেলা—অসীমানন্ত গুণের সান্ত সসীম বিকাশ!

মায়ার সম্বন্ধে তোমার মস্ত ভুল রহিয়াছে। মায়াতে তুমি কর্ত্তৃত্ব আরোপ করিতেছ। তুমি মনে করিতেছ মায়ার প্রভাবেই আমি অসত্যকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইতেছি! তুমি বলিয়া থাক—সুখ দুঃখ, ঐশ্বর্য্য দারিদ্র্য, জীবন মরণ প্রভৃতি বিপরীত গুণের সমাবেশে গঠিত এই জগৎ সম্পূর্ণ অসার ও অস্থায়ী কিন্তু মায়ার মোহে পড়িয়া আমি এই জগৎ খাটি সত্য বলিয়া ধরিয়া লইতেছি এবং ইহা ছাড়িয়া যাইতে প্রাণে ব্যথা বোধ করিয়া থাকি!

কিন্তু ইহা মায়ার খেলা নয়—জগতের প্রতি তোমার যে আসক্তি, তাহা তোমারই ভিতরকার ঐশী প্রকৃতি ও শক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা মাত্র। অন্তশ্চোক্ষে চাহিয়া দেখিলেই দেখিতে পাইবে, পরস্পর বিরোধী গুণগুলি কেহই কাহাকে সীমাবদ্ধ কিংবা মিথ্যা করিতেছে না। উভয়ই তুল্যরূপে সত্য। কিন্তু বহিশ্চোক্ষে তুমি দেখিতেছ, এবং দেখিয়া বলিতেছ—তাহারা পরস্পরের বিরোধী; উভয়ই অসীম অতএব অসার ও অস্থায়ী। ইহাই তোমার মায়ার হাতে আত্মসমর্পন। প্রবল ইচ্ছা ও প্রবল আত্ম-জ্ঞান না থাকিলে মায়ার প্রভাব এড়াইয়া জগতের স্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ অন্ধকারের পাশে আলোর, মৃত্যুর পাশে জীবনের চিত্র ফুটিয়া থাকে। তাহাতেই মনে হয় যেন ইহারা পরস্পরকে ব্যর্থ করিয়া দিতেছে। এই বাহ্য-রূপের অন্তস্তলে চাহিয়া দেখ না, তাই দিনের পরে রাত্রি, এক জীবনের শেষে মৃত্যু দেখিতে দেখিতে জগৎটাকেই তুমি মিথ্যা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছ! এমনই তোমার অবস্থা হইয়াছে যে, রৌদ্র উপভোগ করিবার সময়ও অনাগত রাত্রির অন্ধকার ও জড়তার ভয়ে তুমি সঙ্কুচিত হইয়া থাক! ইহাই মায়ার খেলা। মায়ার প্রভাবে তুমি জগতের ও আপনার স্বরূপও এই উভয়ের মধ্যে যে নিত্য সম্বন্ধ তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছ না, এবং তাই অসীম অনন্তকে সসীম ও সান্ত বলিয়া, এমন কি তোমার অন্তর্নিহিত স্বাধীন ও অমোঘ ঐশী ইচ্ছা-শক্তিকেও মায়ার অধীন মনে করিয়া, মায়ার শাসন-দণ্ড মাথা পাতিয়া লইতেছ। ইহারই প্রভাবে অনন্ত অমৃতময় কারণ হইতে জগৎ-রূপ কার্য্যটাকে বিচ্যুত ও বিভিন্ন মনে করিয়া তুমি সুখের সঙ্গে দুঃখ এবং জীবনের সঙ্গে মৃত্যু উপভোগ করিতেছ।

মানুষের সঙ্গে— তাঁহারই সত্তায় সত্তাবান্ ও চৈতন্যে

চৈতন্যময় মানুষের সঙ্গে, লুকোচুরি খেলিবার জন্য বিশ্বনিয়ন্তা তাঁহার মুখের উপর মায়ার ঘোমটা টানিয়া বসেন নাই। অথবা তাহাকে প্রতারিত করিয়া দুঃখ যন্ত্রণাময় সংসারে বিমুগ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য কোনও অনীশ্বরী শক্তি যে এইরূপ করিতেছে তাহাও নহে। প্রাকৃতিক নিয়মাবলীরই সাধারণ নাম-মায়া। জড়জগতকে ভগবান্ আপনার চৈতন্য ও ইচ্ছাশক্তি হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছেন, তাই ইহার 'উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়'-সাধনের জন্য তিনি কতকগুলি বিধান করিয়া রাখিয়াছেন। এই বিধানের বশবর্ত্তী হইয়াই, পৃথিবী অবিরত ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমাদিগকে আলোর পরে অন্ধকার এবং অন্ধকারের পরে আলো এবং পার্থিব বস্তুর অসারতা উপভোগ করাইতেছে। চৈতন্য ও স্বাধীন ইচ্ছা-শক্তির অধিকারী হইয়াও মানুষ আপনার স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করে নাই, বরং আপনাকেও এই জড়জগতের বিধানেরই অধীন মনে করিয়া, আপনার অতি প্রাকৃতিক সত্বা ও শক্তি আপনিই খর্ব্ব করিয়া লইয়াছে। প্রাকৃতিক বিধান মানিয়া লইয়া সেই সীমার মধ্যেই সে আপনার অমোঘ ইচ্ছা-শক্তি প্রয়োগ করিতেছে—তাই পার্থিব অসারতা তাহাকে মর্ম্মে মর্ম্মে জ্বালাইয়া আসিতেছে। যে নিষিদ্ধ "জ্ঞান-তরুর ফল" ভক্ষণ করিয়া আদম ও ইভ্ মানবজাতিকে মরণশীল করিয়াছিলেন, এই মায়াই সেই জ্ঞান-তরু। যতদিন তাঁহারা 'উলঙ্গ' অবস্থায় ছিলেন, অর্থাৎ তাঁহাদের স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি আপনাকে খর্ব্ব করিয়া মায়ার প্রাকৃতিক বিধানের নিকট মস্তক অবনত করে নাই, তত দিনই তাহারা পূর্ণ আনন্দে ছিলেন। যখন তাঁহারা আপনাদিগকেও জড়জগতের বিধানের অধীন মনে করিলেন, তখনই তাঁহাদের তথা মানবজাতির মরণ ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল।

চৈতন্যও স্বাধীন ইচ্ছা বিবর্জ্জিত জড়জগতের জন্য তিনি যে বিধান প্রণয়ন করিয়াছেন, সর্ব্বশক্তিমান ভগবান নিশ্চয় সে বিধানের বশবর্ত্তী নহেন, তাঁহারই চৈতন্যে চৈতন্যময় তাঁহারই ইচ্ছাশক্তিতে শক্তিমান মানুষও এই বিধানের অতীত। ইচ্ছা করিলেই সে আপনার ইচ্ছাশক্তি ভগবানের ইচ্ছা-শক্তির সঙ্গে সংযুক্ত করিতে পারে এবং এই ভাবে আপনার সকল ইচ্ছাই সার্থক করিতে পারে, আপনার বাঞ্ছিত বস্তু আকর্ষণ করিয়া অনন্তকাল ভোগ করিতে পারে। ইহাই তাহার জীবনের লক্ষ্য ও পরম পরিণতি। ইচ্ছার এই যে আকর্ষণী শক্তি, ইহাই হইল প্রাকৃতিক বিধানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও অলঙ্ঘ্য বিধান। এই বিধান অনুসারেই যত অতিপ্রাকৃতিক ব্যাপার সম্ভবপর হইয়াছে। জড়জগতের নিয়ম-বদ্ধ জীবন যাপন করিবার জন্য মানুষের বিকাশ হয় নাই। আপনার ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিয়া, বাসনা—অনুরূপ বস্তু সৃষ্টি ও তদ্বিপরীত বস্তু বিনাশ করিয়া, ভগবানের পূর্ণ মঙ্গলময় জীবন যাপন করিবার জন্যই তাহার উদ্ভব। যতদিন সে ইহা না করিবে, ততদিন তাহাকে জন্ম মৃত্যুর চক্রে ঘুরিতেই হইবে। জড়জগতের বিধান মানিতে যাইয়া সে যদি মায়ার হাতে আত্মসমর্পণ করে, তবে কে তাহাকে রক্ষা করিবে? যতদিন না আত্মচৈতন্যের বিকাশ হইয়া তাহাকে তাহার ইচ্ছা-শক্তির কথা স্মরণ করাইয়া দিবে, ততদিন পর্য্যন্ত "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ" তাহাকে হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করিতেই হইবে, যখন সে দেখিবে, তাহার ইচ্ছার উপর ইচ্ছা নাই, তখনই সে ঠিক বুঝিবে—"সোহম" আমি সর্ব্বশক্তিমান, আমি ইচ্ছাময়। তখনই তাহার প্রকৃত মোক্ষ—প্রাকৃতিক বিধানের অতীত অবস্থা লাভ হইবে।

স্বাধীন ইচ্ছাময় পুরুষের বাসনা ও আকর্ষণ অনুসারে ভগবানের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে মঙ্গল ও অমঙ্গল উভয়ই অনন্ত ধারায় বর্ষিত হইয়া থাকে, মায়ায়—অজ্ঞানে অর্থাৎ জড়জগৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞানে—আচ্ছন্ন হইয়া আপনাকে এমনই খর্ব্ব করিয়া ফেলিয়াছে যে, মিথ্যাকে—যাহা তোমার সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে তাহাকেই—সত্য বলিয়া

ধরিয়া লইতেছ! তাই দিনের পর রাত্রি উপভোগ করিতেছ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দিন অফুরন্ত রাত্রিও অফুরন্ত, চঞ্চল বলিয়া, ধরিয়া থাকিতে পার না বলিয়া, পর্য্যায়ক্রমে এই দুইটিই উপভোগ করিতেছ। একই সূর্য্য একই স্থানে থাকিয়া সমান ভাবে আলোক ও উত্তাপ বিতরণ করিতেছে; পৃথিবীটা সরিতেছে বলিয়াই ত এশিয়ার সূর্য্য আমেরিকার দিন করিতেছে। কিন্তু সূর্য্যের দিন করার বিশ্রাম নাই। চঞ্চল পৃথিবীকে আশ্রয় না করিয়া যদি অচঞ্চল সূর্য্যকে ধরিয়া থাকিতে পারিতে, তবে দিন ছাড়া রাত্রি যে কখনও আছে, তাহা কি তুমি কখনও জানিতে পাইতে? না, রাত্রির ঘনান্ধকার নিবারণের জন্য অন্ধকারের গণ্ডী "ত্যাগ" করিবার জন্য, ক্ষীণশক্তি দীপের সাহায্য লইতে যাইতে? এই চঞ্চল পৃথিবীর উপরেই চাহিয়া দেখ। নরওয়ে দেশের লোকের ত, রাত্রি বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহার সঙ্গে একরূপ পরিচয় নাই বলিলেও চলে। সে দেশের লোক যে "নিশীথ ভাস্কর"ও উপভোগ করিয়া থাকে! মায়া তোমাকে এই সত্য উপলব্ধি করিতে দেয় না। তাই তুমি আলো ও আঁধার এই উভয়কেই সমানভাবে মিথ্যা বলিয়া এই উভয়ের অতীত একটা কল্পিত অবস্থার অনুসন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ!

তাই বলিতেছি, মায়ার হাত এড়াইবার নাম করিয়া "ত্যাগের" পথে চলিতে যাইয়া মায়ায় আরও জড়াইয়া পড়িও না। ত্যাগের কথা মুখেও আনিও না—মায়াকে আমলই দিও না। তোমার জন্য ত মায়ার প্রয়োজন হয় নাই। ভিতরের দিকে তাকাও—চৈতন্যের কথায় মনোযোগ দেও—অচঞ্চল সূর্য্যটিকে, তোমারই অমোঘ ইচ্ছা-শক্তিটিকে, আকড়িয়া ধর, তবেই অন্ধকারের গণ্ডী পার হইয়া, আলো, অনন্ত আলোর রাজ্যে উপস্থিত হইবে। কেবল, কি তুমি বাস্তবিক বস্তু, তাহাই জানিয়া লওয়া এবং তাহাই ধরিয়া থাকা, আর সেই পদার্থের যে অনন্ত ভাণ্ডার তাঁহার সঙ্গে তোমার সংযোগ অবিচ্ছিন্ন রাখা—ইহাই হইল তোমার কার্য্য। ইহা করিতে পারিলেই অচিরেই দেখিতে পাইবে, মায়া অতিক্রম করিয়াও, তোমার বাসনা চরিতার্থ হয়। তোমার ইচ্ছা-শক্তি আপনাকে সার্থক করিয়া থাকে। উপলব্ধি করিবে—সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বত্র বিদ্যমান মহেশ্বর হইতে তুমি অভেদ। বুঝিবে মায়ার চশমা পরিয়া একদিন তুমি যাহা মিথ্যা বলিয়াছ, তাহা নিতান্তই খাঁটি সত্য।

ত্যাগের সম্বন্ধে আর একটা কথা ভাবিয়া দেখ। যাহা তুমি ত্যাগ করিতে চাও, সেটাই তোমার মস্তিষ্ক এবং চিত্ত উভয় জুরিয়াই বসিয়া থাকে, তাহারই চিন্তায় তুমি আকুল, তাহারই ভাবে তুমি তন্ময়, কাজেই "ত্যাগ" করিতে যাইয়া, "ত্যজ্য" বস্তুটাকেই তুমি অজ্ঞাতসারে বরণ করিয়া লইতেছ—আকর্ষণ করিতেছ! "দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি" করিতে যাইয়া, "কামিনী-কাঞ্চন" ত্যাগ করিতে বলিয়া, দুঃখটাকেই, কামিনী-কাঞ্চনটাকেই তুমি ধ্যায় বস্তু করিয়া তুলিয়াছ! এই কারণেই সাধারণতঃ দেখা যায়, যে সকল অনুষ্ঠানের মূলে "কামিনী কাঞ্চন" বিদ্বেষ বা ভয়। সেই কামিনী-কাঞ্চনের অতিমাত্র সমাগম হইতেই তাহাদের পতনের সূত্রপাত হইয়া থাকে। এইভাবে, আকর্ষণশক্তি অজ্ঞাতসারেও, আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে।

ইহার কারণ খুঁজিতে বেশী দূর যাইতে হইবে না। আশা ও আকাঙ্ক্ষার অপেক্ষা ভয়, উদ্বেগ ও সন্দেহের শক্তি সাধারণ জীবনে অনেক বেশী। ভয়ে যতটা একাগ্রতা জন্মে, "ভয়ানক' জিনিষটার দিকে মনটা যত সহজে আকৃষ্ট হয়, আশায় কখনও ততটা একাগ্রতা জন্মে না কিংবা 'আশাপ্রদ' বস্তুটাও কখনও তত সহজে মনটা আকর্ষণ করিতে পারে না। আশার সঙ্গে সঙ্গে যে আশঙ্কার উদয় হয়, তাহার প্রভাবই বেশী, না, আশঙ্কার ঘন মেঘের উপর যে আশার বিদ্যুৎঝলক

দিয়া ওঠে, তাহারই প্রভাব বেশী, তাহা তুমি নিজেই ভাবিয়া দেখিও।

ত্যাগ করিবার ইচ্ছার মূলে দুঃখের স্মৃতি। সেই স্মৃতি হইতেই বিরক্তি ও ভয়ের উদ্ভব। সকলেই জান, সুখের স্মৃতি অপেক্ষা দুঃখের স্মৃতির প্রভাব কত বেশী। দুঃখের সাগরে ডুবিবার সময় অতীত সুখের কথা মনে হইলে হো হো করিয়া হাস, না, আরও দুঃখে ডুবিয়া যাও? আর, সুখের সাগরে ভাসিয়াও অতীত দুঃখের কথা মনে হইলে, সুখটাই বেশী গভীর হইয়া ওঠে, না, ভবিষ্যতের জন্য আশঙ্কাই বেশী জাগিয়া ওঠে ও বর্ত্তমানের উপর অতীতটা ভাসিয়া উঠিয়া চোখের জলে বুক ভিজাইয়া দেয়?

তাই বলিতেছি, যার অস্তিত্বের মূলে দুঃখের স্মৃতি; ভয়, উদ্বেগ, আশঙ্কা ও বিরক্তিতে যার দেহ গঠিত সেই 'ত্যাগের' কথাটা শুনাইও না। অর্জ্জন করিতে থাক, বর্জ্জন আপনা হইতেই হইতে থাকিবে।

শুনা'বে যদি, শুনাও—গ্রহণের কথা আকর্ষণের কথা! শুনাও ইচ্ছার অসীম আকর্ষণী শক্তির কথা। প্রাণে ঐকান্তিক ইচ্ছা উদিত হইলে তাহার আকর্ষণে ভগবানের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে সুখের অজস্র অনন্ত প্রবাহ ছুটিয়া আসে। সংসার ছাড়িয়া যাইতে না বলিয়া "সংসারী" জীবকে বল অনন্ত অমৃত ভাণ্ডার হইতে অমৃত—জ্ঞান (অর্থাৎ প্রজ্ঞান ও বিজ্ঞান) মঙ্গল, ঐশ্বর্য্য সচ্ছলতা, সুখ শান্তি, আনন্দ প্রেম ও বিশ্বাস, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য, শক্তি ও সাহস, সিদ্ধি ও জীবন—অর্থাৎ মঙ্গলের পূর্ণতা—গ্রহণ করিতে,আকর্ষণ করিতে। শুনাও সেই অমৃতময় সত্য—অনন্যচিন্তয়ন্তো।"যে জনাঃ মাং পর্য্যুপাসতে, তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্" জলদ-গম্ভীর স্বরে জানাইয়া দাও, মঙ্গলময় নিজ মুখে বলিয়াছেন, যে আমাকে বই জানে না, সর্ব্বদা আমারই চিন্তা করে,তাহার সেই চিন্তার—আকর্ষণের—জোরে অনন্ত মঙ্গল তা'র বাড়ীতে আমি মাথায় করিয়া পৌঁছাইয়া থাকি।

'মাটির মানুষ' হইতে আর কখনও বলিও না। স্বাধীন ইচ্ছা বিসর্জ্জন ও অহঙ্কার ত্যাগ করিতে শিখাইয়া ভগবানের চৈতন্যে চৈতন্যময় এবং তাঁহারই দ্বারা অনুপ্রাণিত, সঞ্জীবিত, পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত মানুষকে আর দুঃখের পথে পাঠাইও না—জীবন্মৃত করিয়া রাখিও না। যে গীতার এত বড়াই কর, সেই গীতায় অহঙ্কারের যে বিকাশ, তাহা অন্য কোথাও দেখিয়াছ কি? ভগবান্ তোমাকে কি বলিয়াছেন, কি শিখাইয়াছেন?—বলিয়াছেন, বিশ্বাস করিতে আহ্বান করিয়াছেন, যাহা শ্রেষ্ঠ, যাহা আদর্শ, তাহাই আমি। আর তুমি কি শুনাইতেছ?—তুমি শুনাইতেছ, মান অভিমান সব ত্যাগ ক'রে মাটির মানুষ হও!

যিনি পূর্ণ জ্ঞান, অনন্ত বিজ্ঞান, অপরিমেয় শক্তি, তাঁহারই অংশ, তাঁহা হইতে অভিন্ন, তাঁহারই জীবনে জীবিত, তাঁহারই তেজে উদ্ভাসিত জীবের চক্ষুর সম্মুখে আর তুমি জীবন্মৃতের চিত্র ফুটাইয়া তুলিও না। তার প্রাণে অহঙ্কার জাগাইয়া দাও—বলিয়া দাও তাকে—সে কে, কত বড়; আপনার মূলটা আঁকড়িয়া ধরিলেই, হা হুতাশ, বিলাপ পরিতাপ, আশঙ্কা উদ্বেগ, সন্দেহ ভয় পদ-দলিত করিয়া, পরের দিকে না চাহিয়া আপনার ভিতরের দিকে চাহিলেই সে যে বিরাট, সে যে মহান্, সে যে মঙ্গলঘন হইয়া বসিতে পারে।

আকর্ষণই প্রাকৃতিক বিধানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিধান। সমস্তটা বিশ্ব জুড়িয়াই আকর্ষণ শক্তির খেলা চলিতেছে। এই আকর্ষণ-প্রভাবেই গ্রহ-নক্ষত্র অনন্ত শূন্যে ঝুলিয়া রহিয়াছে। অকার্ষণেই পূর্ণতা সাধন, আবার আকর্ষণেই অপচয় ঘটিয়া থাকে। আকর্ষণেই ভগবানের সঙ্গে তাঁহার বিরচিত বিশ্বের সংযোগ-সূত্র। বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া তুমিও আকর্ষণের অধীন, এবং এই আকর্ষণের প্রভাবেই তোমার ইচ্ছা-শক্তি ভগবানের অনন্ত ভাণ্ডার

ধরিয়া টান দেয়। যখন তোমার মন কোনও বস্তু দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তখন তাহাতে একটা বিশেষ ভাবের বিকাশ হয়। সেই ভাব হইতে চিন্তাবিশেষের উদয় হয় এবং এই উভয়ের সংযোগে ভাবটা গাঢ়তর হইয়া কল্পনা কার্য্যকরী হইয়া ওঠে। বস্তুটার আকর্ষণে প্রথমে তোমার মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, সেই ভাবের ভাণ্ডার হইতে বর্ণ তুলিয়া লইয়া কল্পনার তুলিকা এখন বস্তুটাকে বেশ করিয়া রঞ্জিত করিয়া থাকে। ইহার ফলে তোমার মনে এখন একটা অতি প্রবল ভাবের উদয় হয়। এই ভাবকেই তুমি অবিচারে 'রিপু' বলিয়া থাক। রিপু যখন জাগ্রত হয়, তখন তুমি আর তোমাতে থাক না—থাক সেই রিপুতে, এবং অলক্ষিতে ভগবানের ভাণ্ডার হইতে, রিপুর প্রকৃতি অনুসারে শুভ কি অশুভ আকাঙ্ক্ষাও আকর্ষণ করিয়া থাক, প্রথমকার সুখের কি দুঃখের ভাবটা এখন বেশ প্রবল হইয়া ওঠে।

ইহা হইতে বুঝিতে পারিতেছ, ইতিমধ্যেই তুমি মনে মনে অনেক পরিমাণ মঙ্গল কি অমঙ্গল আকর্ষণ করিয়া আনিয়া বেশ সুখ কি দুঃখ উপভোগ করিতেছ। আরও যদি রিপুকে প্রশ্রয় দেয়, তাহা হইলে ভাব শীঘ্রই কার্য্যে পরিণত হইয়া, রিপুর শক্তি অনুসারে, বাস্তব সুখ কি দুঃখ তোমার দ্বারে আনিয়া উপস্থিত করিবে।

এ পর্য্যন্ত তোমার কার্য্যেও অল্পবিস্তর পরিমাণে বিকশিত মানসিক শক্তিসম্পন্ন ইতর প্রাণীর কার্য্যে বড় বিশেষ পার্থক্য নাই। কিন্তু তোমার চৈতন্য ও স্বাধীন ইচ্ছা আছে, তাহা তাহাদের নাই। ভাবের প্রথম বিকাশের পরে অথবা রিপু জাগ্রত হইবার পরেও যদি তুমি ফলাফল সম্বন্ধে বিচার করিতে বস, এবং সুফল ও কুফল অনুসারে যদি ইচ্ছা-শক্তি প্রয়োগ করিয়া প্রথম ক্ষেত্রে রিপুর শক্তি বৰ্দ্ধিত ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে রিপুর শক্তি প্রতিহত কর,তবে তুমি,প্রথম পক্ষে প্রত্যক্ষ ভাবে ও দ্বিতীয় পক্ষে পরোক্ষভাবে, মঙ্গল আকর্ষণ করিয়া আনিবে।

ইহা হইতে দেখিতে পাইতেছ, যাহাকে তুমি 'রিপু' বল, সেই রিপুর মারফতই আমরা শুভাশুভ আকর্ষণ করিয়া থাকি। কেহই কাহাকে কিছু আনিয়া দেয় না—আকর্ষণের শক্তি ও আকৃষ্ট বস্তুর প্রকৃতি-অনুসারে আমরা অল্প কি অধিক পরিমাণে সুখ দুঃখ ইত্যাদি পাইয়া থাকি। যদি অবিমিশ্র ও অনন্ত সুখ পাইবার জন্য ইচ্ছা-শক্তি প্রয়োগ করা হয়, তবে সেইরূপ সুখই পাওয়া যায়। মায়া—প্রাকৃতিক বিধান স্বাধীন ইচ্ছা-বিবর্জ্জিত সৃষ্টির জন্য। মানুষের ভাগ্যবিধাতা—তাহার স্বাধীন ইচ্ছা ও আকর্ষণী শক্তি। আকর্ষণী শক্তির হাতে অবিচারে আত্ম সমর্পণ করিয়া রিপুর প্রকৃতি অনুসারে সে সীমাবদ্ধ ও দুঃখ মিশ্রিত সুখ পাইয়া আসিতেছে এবং 'মোহ-মুদ্গর' আওড়াইতেছে। একবার যদি সে স্বাধীন ইচ্ছা পূর্ণভাবে প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করে, তবে শীঘ্রই তাহার 'দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি' হইয়া মোক্ষ—ইচ্ছার অবাধ স্বাধীনতা ও তাহার ফলে ইষ্টসিদ্ধি—লাভ হইবে।

তাই, অহঙ্কার দমন করিতে না বলিয়া, জানাইয়া দাও মানুষকে—তা'র আকর্ষণের কি অসীম প্রভাব। আকর্ষণ করিতে পারিলে, অসীমানন্ত ভগবান্‌কেও সে তার আকৃষ্ট গুণের সমবায়ে গঠিত করিয়া আপনার সম্মুখে দাঁড় করাইতে পারে—আপনার অভিলষিত বিষয় তাঁহাকে দিয়া বাস্তব সত্যে পরিণত করাইয়া তুলিতে পারে।

শ্রীকুমুদিনীকান্ত গাঙ্গুলী।

সভাপতি মহাশয় ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আপনারা কষ্ট স্বীকার করিয়া যে আজ এখানে উপস্থিত হইয়াছেন, সেই জন্য আপনাদিগকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

আমি আজ যে কথা বলিতে উপস্থিত হইয়েছি সে কথা নূতন' নহে—সত্য চিরকালই পুরাতন। তবে হয়ত, উপলব্ধির তারতম্য অনুসারে এবং গুছাইয়া ভাবিবার ও বলিবার ধরণের বিভিন্নতাবশতঃ চির পুরাতন সত্যটাও অভিনব বোধ হইতে পারে। আশা করি, চিরপ্রচলিত বিশ্বাস ও ব্যবহারের বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইলেও, নিজের ও মানব সমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধনার্থ, বিষয়টা সম্বন্ধে একটু চিন্তা করিতে উপেক্ষা করিবেন না।

বাহুল্য ভয়ে বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি স্বাধীন ইচ্ছার বিকাশ সম্বন্ধে' বিশেষ কিছুই বলিতে চেষ্টা করি নাই। যদি আপনাদিগের, জানিবার কৌতুহল হয় বারান্তরে সেই সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে।

মনশ্চক্ষুঃ।

কোথাও সে ত লুকায়ে নাই জ্বালিছ মিছে প্রদীপচয়
সেত গো নহে ঘনতমসালিপ্ত
অতীন্দ্রিয় করেছে তারে আলোর ভূষা, অভাবে নয়
ভানুর ভানু সে যে গো মহাদীপ্ত।
অযুত রবি জ্বেলেছে যেবা সে কি গো কভু আঁধারে রয়?
আলোক জালে হারালে পথভ্রান্ত!
ভানুরে কেবা হেরিতে বলো প্রদীপ জ্বালে গগনময়?
আলোর ভূষা হয়েছে তব ধ্বান্ত।
তাহার পানে চাহিতে ওগো ঝলসি যাবে তোমার চোখ
আগুন হয়ে উঠিবে সারাগাএ
যে আঁখি তব ঝলসি যায় সে আঁখি তব দগ্ধ হোক
চাহিতে হবে তবুও অহোরাত্র।
যে আঁখি তব তাহার তেজ সহিতে কভু পারেনা হায়
দগ্ধ হলে সে আঁখি সন্দিগ্ধ
মর্ম্মকোষে খুলিবে তব নূতন আঁখি উজল তায়
রৌদ্র, হবে চন্দ্রালোক স্নিগ্ধ।
ফুটিলে মন' আঁখি কুমুদ, ইন্দু হয়ে দীপ্ত মান
কৌমুদীতে সে যে গো সুধা বণ্টে
কঠোর তপে দেহের আঁখি কোটরগত হইলে ম্লান
মনের আঁখি হেরে গো নীলকণ্ঠে।

শ্রীকালিদাস রায়।

ছোট' লেখা।

[দৃষ্টি ও চিন্তা]

(১)

ছোটো জিনিষটে 'বড়'রই একটা অংশ,—যদি তার 'প্রাণ' থাকে তবে প্রসারিণী শক্তিও থাক্‌বে। 'অনন্ত' জিনিষটে সে হয়তো বোঝেই না,—কিন্তু সে 'অনন্তের' নিতান্ত আপনার জন; জ্ঞাতি,—কুটুম্ব।

(২)

ছোটো একটা পক্ষী—শিশু। তার মাতা অপর ঠাঁই থেকে মুখের ভেতর ক'রে খাবার এনে তা'কে 'হাঁ' করিয়ে খাইয়ে দিচ্ছে। বিষয়টী ছোটো,—কিন্তু এটী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত, অতুলনীয় মাতৃ-স্নেহের একটা দিক,—যে দিকটে না বুঝ্‌লে সৃষ্ট জগতের অনেকটা দিক বোঝা বাকী রইল।

(৩)

সন্ধ্যায় প্রাক্‌কালে পাখীগুলো ঝাঁক ধ'রে উড়ে যায়,—আকাশের সব চেয়ে উঁচু প্রদেশ দিয়ে। কোথায় যায়?—তা'দের নীড়ে। দিনের সমস্ত কার্য্য সমাধা ক'রে, সেই নিতান্ত পরিচিত সহচরগুলি একত্র দল বেঁধে,—মানবের বিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রগুলিকে বহু নীচে রেখে—অনন্ত শূন্য পথ দিয়ে তারা চলে যায়।

ছোটো পাখীগুলি!—তা'দের যাবার প্রণালীটা দেখে কিন্তু ভাবতে বল্‌তে হয়। তারা বড় অনায়াসেই চ'লেছে,—কোনো ব্যস্ততা নাই, অধীরতা নাই,—তাদের গতি সংযত, নিশ্চিন্ত। তারা জানে, তারা কোথা' যাচ্ছে; তা'দের কার্য্য প্রণালীটা অনন্তের জ্ঞাতি সম্পর্কিত।

তবু তারা ছোটো পাখী,—তা'দের নীড়ও হয়তো ছোটোই; অন্ততঃ বোধ হয় ইঁট-পাথরের ত্রিতল গৃহ না—ও হ'তে পারে।

(৪)

একটী পরমাণু ছোটো,—খুব ছোটো; তাকে হয়তো দেখ্‌তে পাইনে,—কিন্তু তাকে যদি কখনো স্পর্শ করতে পারি তবে অনন্তের 'সংস্পর্শ' কেমন তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

ছোট্টো একটুকু ছেঁড়া নেক্‌ড়া বা একটুকুন্ ছাই, তারো দরকার হয়। চক্‌চকে সুন্দর কাচের শিশিগুলিতে ভাল খাঁটী দাওয়াই থাক্‌লেও সেগুলি যদি একত্র রাখা যায়,অনেক সময় তারা ঠক্কর লেগে ভেঙ্গে যেতে পারে,—শিশিগুলোর ফাঁকে ছেঁড়া নেক্‌ড়া দিয়ে রাখ্‌লে হয়তো তা' হবে না। আর শুনিছি জমীর ভাল সারেও কখনো কখনো 'ছাই'—চাপা দিতে হয়, নইলে সেগুলো 'মাটী' হয়।

(৫)

আঁধার না থাক্‌লে আলোর মূল্য থাক্‌তো না। এক জায়গার 'ভগ্ন' অবস্থা অপর জায়গার পূর্ণত্বকে প্রকাশ করে।

ভাঙা ইঁট শুরকিতে আস্তো ইঁট পাথরে 'জোড়' লাগিয়ে তবে-তো 'ইমারত' তৈরী হয়।

(৬)

সাহিত্য-ক্ষেত্রে, 'সহজ' আর 'সাধারণকে' নিয়ে কখনো কখনো 'গোলে' পড়তে হয়।

একদিন একজন পাঠক বল্লেন,—"ভারি-তো লেখা? আমিও এ-টা লিখ্‌তে পারতুম্; কথাটা সহজ ও সাধারণ,—আমার মনেও এটা কত-কাল থেকেই র'য়েছে।"

লেখক সেখানেই ছিলেন,—পাঠক তাঁকে জান্‌তেন না। লেখক তাঁর একজন সাথীকে ব'ললেন,—"আমার এত বড় সুখ্যাতি আর কেউ করে নি!"

যে-টা মানুষের মধ্যে চিরকাল আছে সেইটে ভাল ভাবে সোজাসুজি ব'লতে পারলে তা' সাহিত্য; যে-টা কেউ কখনো জান্‌তো না;—ভাবে-নি,—সে-টা ব'ললে তা' একটা 'বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার' হ'তে পারে; সাহিত্য সে-টী না-ও হ'তে পারে।

(৭)

সাহিত্যের যে-টা 'খবর' তা পুরোণো হয় না; 'নূতন' পত্রিকা ক-দিন পরই 'পুরোণো' হ'য়ে পড়ে।

একটা অতি 'মামুলী' ধরণের ডিটেক্‌টিভ বইয়ের মধ্যে জান্‌বার বিষয় দশ পাতা উল্‌টিয়ে দেখবেই সারা হ'লো। হাবড়া 'ষ্টেসনে রেল গাড়ীতে যে মৃতদেহ একটা বাক্সের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে সে-টা যদি উমাসুন্দরীর দেহ ব'লেই একবার বুঝে ফেলা গেল, তবে সেই বইটে আর না পড়লেও চলে।

কিন্তু,—কালীদাসের শকুন্তলা শেষটায় দুষ্মন্তের কাছে যেতে পেয়েছিলেন কি না; সেকসপীয়রের ওথেলো তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর কি ক'রলেন, পোর্শিয়ার বক্তৃতার পর সাইলকের মোকদ্দমার কি হ'লো;—বর্ত্তমান যুগে বঙ্কিমের কুন্দনন্দিনীর কি অবস্থা হ'য়েছিল; রবীন্দ্রনাথের কুমার সেনের কি ক'রে মৃত্যু হ'লো, কাবলিওয়ালার 'খোঁকি'কে দেখবার সাধ হ'তো কেন,—এগুলো শত-সহস্র বার প'ড়ে দেখে, জেনে ফেল্‌লেও তারা চির-নবীন। কত মানুষ এ সব প'ড়েছে,—কত ভবিষ্যৎযুগে আরো পড়বে,—কিন্তু এর প্রত্যেকটী কথা, প্রত্যেকটী অক্ষর প্রত্যেকবার 'নূতন' লেগেছে আর লাগবে!—এ-গুলি সাহিত্য।

(৮)

'অসাধারণ' জিনিষটে ভাল,—কিন্তু 'সাধারণকে' জানাটাও ভাল।

আমরা যে নিতান্তই 'সাধারণ'! তাই পৃথিবীর সাধারণ ধূলি, গানের সাধারণ সুর, ছেলে-পেলের সাধারণ হাসি,—গাভীর বৎস অনুসন্ধানে সাধারণ চেষ্টা, দোহন-কালে সদ্য-বিচ্ছিন্ন বৎসের দিকে তাকিয়ে সেই গাভীর সাধারণ কাতরতা,—এক-একজনকে এত 'অসাধারণের' মধ্যে ডুবিয়ে দেয় যে 'এক জন্ম' এগুলিকে না-দেখে যদি 'সহস্র জন্ম' দেখা-যেতো তবেও বুঝি তার খালি 'সাধারণ' অক্ষর পরিচয়ই হতো।

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক।

মৈমনসিংহ জেলার আটিয়া পরগণার প্রসিদ্ধ সাহিত্য সেবকগণ।

অন্ধকবি ৺ভবানী প্রসাদ।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর অবসান কালে স্বর্গীয় ভবানী প্রসাদ কর কাটালীয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। তাঁহার কৌলিক উপাধি কর রায়। ইনি জন্মান্ধ ছিলেন। তাঁহার বর্ণবোধ ছিল না। তিনি মার্কণ্ডের চণ্ডীর পদ্যানুবাদ করিয়া বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। লোকে তাঁহাকে অন্ধকবি ভবানী প্রসাদ বলিত। তখন লোকের নামের পূর্ব্বে এইরূপ উপাধিই ব্যবহৃত হইত। এমন কি, কবিগণের নামের পূর্ব্বে খঞ্জ, কাঠকাটা, খোলবেচা, নির্লোভ প্রভৃতি উপাধি দেখা যায়। যথা কাঠকাটা জগন্নাথ, খঞ্জ ভগবান, খোলবেচা শ্রীধর, নির্লোভ গঙ্গারাম ইত্যাদি। যাহা হউক, শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু মহাশয় এই অন্ধ কবিকে প্রকটিত না করিলে আমরা তাঁহার পরিচয় দিতে পারিতাম না।

৺কেবলকৃষ্ণ বসু।

৺কেবলকৃষ্ণ বসু ১২২২ সালে "কাশীখণ্ড" নামক গ্রন্থ প্রণয়নকরেন। তাঁহার নিবাস কেদারপুর। ইনি উল্লিখিত জন্মান্ধ কবির মৃত্যুর শতাধিক বৎসর পরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মৃত দাগুমিঞা।

মৃত আব্দুল আলী খাঁ ওরফে দাগুমিঞা চাড়ান গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি কয়েকখানা পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম মৃত বসরত আলী খাঁ।

৺নবকান্ত ভট্ট।

৺নবকান্ত ভট্ট উপস্থিত কবি ছিলেন। তিনি ছাওয়ালীতে বাস করিতেন। আজকাল যেখানে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র সাহার বাড়ী অবস্থিত, ইহার কিছু পূর্ব্বদিকে এই কবির বাড়ী ছিল। তদানীন্তন জনৈক ভূম্যধিকারী তাঁহার কবিতা শ্রবণ পূর্ব্বক সন্তুষ্ট হইয়া কয়েক পাখী জমি নিষ্কর দিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারী এই সব জমি বিক্রয় করেন।

৺রঙ্গনাগর আচার্য্য।

৺রঙ্গনাগর গায়ক ময়মনসিংহ জেলার একজন প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন। বঙ্গীয় দ্বাদশ শতাব্দীর অন্তিমকালে বাঙ্গল্যা গ্রামে শাকদ্বীপিয় ব্রাহ্মণকুলে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শৈশবে ধূলা খেলা ছাড়িয়া চিত্তোন্মাদক ও শ্রান্তিহর সঙ্গীত বিদ্যার অনুশীলনে মনোনিবেশ করেন। তখন গ্রামবাসী বহু লোক তাঁহার সঙ্গীত শুনিয়া পরম আনন্দিত হইতেন। এমন কি ক্ষেত্রস্থ কৃষককুল ও পথিকগণ তাঁহার গান শুনিয়া তাঁহার সন্নিকটে গমন করতঃ ক্লান্ত ও অবসন্ন প্রাণে শান্তি অনুভব

করিত। শ্রোতাগণ গমন কালে বালককে ধন্যবাদ দিয়া যাইত। তখন পল্লীতে স্কুল, পাঠশালা ছিল না। তিনি ৺গুরু, খ, বার কলা প্রভৃতি শিক্ষা করিয়া পিতৃসন্নিধানে সংস্কৃত শিক্ষায় মনোযোগ প্রদান করেন। তিনি অল্প দিনের মধ্যে অভিনিবেশ, অধ্যবসায় প্রভৃতি ছাত্রোচিত গুণে সন্ধি, কারক, সমাস, কৃৎ, তদ্ধিত, ধাতুপ্রত্যয়, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতিতে প্রভূত জ্ঞানার্জন করেন। সঙ্গীত ও বিদ্যালোচনা তাঁহার চিরসঙ্গী ছিল।

কথিত আছে, একদা তিনি স্বপ্নে দেখেন, ভগবান স্বয়ং তাহকে বলেন, "রঙ্গনাগর, তুমি রামমঙ্গল গাহিলে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিতে পারিবে।" তদনুসারে তিনি সংস্কৃত টোল ত্যাগ করিয়া সঙ্গীত বিদ্যায় অধিকতর মনোনিবেশ করেন। ময়মনসিংহ, ঢাকা, পাবনা, বগুড়া, রঙ্গপুর প্রভৃতি জেলায় বহুলোক তাঁহার সুমধুর সঙ্গীত শুনিয়া তন্ময় হইতেন। শিক্ষিত কি অশিক্ষিত, ধনী কি নির্ধন, পুরুষ কি স্ত্রী, শিশু কি বৃদ্ধ তাঁহার গান শ্রবণ পূর্ব্বক তন্ময় হইয়া সহস্র কণ্ঠে প্রশংসা করিত। তিনি সঙ্গীত প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইয়া সহজ সংস্কৃত ও সরল বাঙ্গালায় নিত্য নূতন গান গাহিতে চিরভ্যস্ত ছিলেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ও 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে' (ব্রাহ্মণ কাণ্ডে) তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। প্রবাদ— একদা তিনি প্রায় মাসাধিক কাল সংস্কৃত ভাষায় রামমঙ্গলের নূতনে পালা গাহিয়া প্রভূত সুখ্যাতি লাভ করেন। এরূপ সুখ্যাতি লাভ তাঁহার প্রায়শঃ হইত। অদ্যাপি অনেক গায়ক তাঁহার রচিত গান গাহিয়া সুখ্যাতি লাভ করিতেছেন।

৺রঙ্গনাগর গায়কের দলে মৃত স্বরূপ চন্দ্র শীল, ৺গৌর চন্দ্র আচার্য্য, মৃত জয়মঙ্গল কৈবর্ত্ত দাস, মৃত কানাইলাল মালী, মৃত রঘুনাথ শীল, ৺নিত্যানন্দ আচার্য্য প্রভৃতি গায়ক ছিলেন।

৺রঙ্গনাগর আচার্য্য অশীতি বৎসর বয়ঃক্রম কালে ইহলীলা ত্যাগ করেন। তাঁহার রচিত কয়েকটী গান নিম্নে দেওয়া গেল।

গান।

(১)

রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যাওয়ার পর বিভীষণের উক্তি।—

ওহে দশানন, অবিলম্বে লঙ্কাতে রাম আসিবে।
বল প্রকাশিবার তরে, রাম তোমা সবংশে মারিবে।
(তখন) শোণিতে লঙ্কা ভাসিবে, আসিবে শকুনী শিবে,
তোর দশ মুণ্ডে বসিবে, তখন সীতা হাসিবে।

(২)

হনুমান সীতার অন্বেষণে যাইয়া সীতার নিকট উক্তি।—

আমি দেখেছি মা সীতে, সীতা নাথকে আসিতে
(তাঁহার) চক্ষে বারি মুখে বলে হা সীতে, হা সীতে,
সদায় উঠিতে বসিতে সীতে, কেন্দে বলেন কোথায় সীতে?
নীল কমল যায় দুঃখার্ণবে ভাসিতে ভাসিতে।
(তাঁহার) নিদ্রা নাই দিবা নিশিতে, বসন অঙ্গে নাই সীতে,
আমি দেখিতে পারি নাই প্রভুর শ্রীমুখ হাসিতে।

(৩)

রাবণ বধের পূর্ব্বে গৌরী যুদ্ধক্ষেত্রে আসিলে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলেন,—

ও চেয়ে দেখরে লক্ষ্মণ ভাই, আজ রণে গণেশ জননী এসেছে।
ভেবেছিলাম রাবণ মারি, দুঃখ সব পরিহরি,
বিভীষণকে রাজা করি হবে মনে কি তয় আছে।
মম প্রতি ক্রোধ দৃষ্টে, ভগবতী একদৃষ্টে,
অতি রুষ্টে সিংহ পৃষ্ঠে দেখ রয়েছে।
আর নাহি গেল বুঝা, রণ জয় গেল বুঝা,
দশাননে দশভুজা আপনি সদয় হয়েছে।
দেশেতে মরিল পিতা, অরণ্যে হারালেম সীতা,
শোকেতে কৌশল্যা মাতা মৈল কি আছে।
জানকীর কারণে রণ, করিলাম অকারণ
সীতার সঙ্গে দরশন বুঝি আমার যে হয়েছে।

(৪)

যুদ্ধক্ষেত্রে রাবণ রামচন্দ্রের ব্রহ্ম অস্ত্রে আহত হইয়া মৃত্যুর পূর্ব্বে বলেন,—

প্রাণত অন্ধ হল আজ আমার—ও রাম কমল আঁখি
(এবার) নিদান কালে বন্ধু হলে কাল বেটাকে দিতেম ফাঁকি
ঐহিকের ঐশ্বর্য্য সুখ, আর কিছু রাম নাই হে বাকী।
ইন্দ্রবেটা আহার যোগাইত, অশ্বপালে কালকে রাখি।
(আজ) কাম পেয়ে কাল বেটায় ধরে, সেই ভয়ে রাম তোমায় ডাকি।
আমি হারি নাই, আমি হারি নাই, আমি হারি নাই,
আমি হারিতাম, যদি তোমায় মারিতাম, আমি রণে হারিলাম।
ভবে তরিলাম, এমন হারিব বলি হারি যাই।

(৫)

ভজন বিষয়ক গান।

হরি, মোরে রেখেছ শীতল চরণে
দুস্কৃতি তপস্যাহীন
কৃতং পাপী অহং দীন,
হেলায়ে খোয়াইলাম দিন
গেল দিন অকারণে।
শোন জগৎ গোসাই—
আমি আর জনম নাহি চাই,
যমকে জিনিয়া যাই,
মরি যেন রাম নাম নিয়ে বদনে।

৺হরিবন্ধু চক্রবর্ত্তী।

ছাওয়ালী নিবাসী ৺গোলকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺হরিবন্ধু চক্রবর্ত্তী। ইনি রাঢ়ী শ্রেণীর শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ। তিনি কখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সঠিক বলিতে পারিব না। কিন্তু তিনি যে খৃষ্টীয় ঊনবিংশতি শতাব্দীর প্রারম্ভ কালে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ নাই।

৺হরিবন্ধু চক্রবর্ত্তী মহাশয় কলাপ ব্যাকরণে জ্ঞান লাভ করিয়া 'দশকর্ম্ম' শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি গান রচনায় পটু ছিলেন। এমন কি, এক সময়ে তিনজন লোককে তিন রকমের ৩টী গান রচনা করিয়া দিতে পারিতেন যে, লেখকগণ স্বীয় গান লিখিয়া লইতে অবকাশ পাইতেন না। প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে তিনি তাঁহার একমাত্র সন্তান শ্রীযুক্ত প্রাণবন্ধু চক্রবর্ত্তী ও পরিবারবর্গকে রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। প্রবাদ, নিম্নলিখিত গানটি তাঁহার রচিত।

গান।

প্রেম কি প্রেমিক নইলে, অপ্রেমিকে প্রেম জানেরে ?
যে প্রেমেতে প্রেমিক হয়ে, শ্রীকৃষ্ণ ধাম প্রভু ছেড়ে,
প্রেম করিয়াছিল সজনী,
চণ্ডীদাস আর রজকিনী,
বিল্বমঙ্গল রাধাগোবিন্দী তারাও ধনী।
তারা প্রেমে প্রেমে ফাঁদ পাতিয়া, ধরিয়াছে অধর চাঁদে
প্রেম করিয়াছে অনেক জনা,
কেবল মন্ত্র বীজ উপাসনা।
ব্রজ গোপীর মত প্রেম আর কেও করে না—
তারা এমনি প্রেমের কল শিখেছে, গোবিন্দ যাতে পায়ে ধরে।
প্রেম শুনি সই যথা তথা,
সেই প্রেমের বা বাড়ী কোথা ?
সে প্রেম কিবা বরণ, কি গঠন, কয় কি কথা'
সে প্রেম নাই কোন খানে, কেবা জানে দিবে হরি বন্ধুরে।

মৃত রাজচন্দ্র দত্ত।

মৃত রাজচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নিবাস মাহাড়ী। ১২৫৭ বঙ্গাব্দের ১০ই ফাল্গুন তিনি 'নাড়ীচক্র' নামক এক খানি পুস্তক লিখিয়াছেন। এই হস্তলিখিত পুস্তকখানি আমাদের নিকট আছে। ইহা তুলট করা কাগজে লেখা। ইহাতে প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত আছে। কিন্তু ইহার অবস্থা জীর্ণ। ভাদগ্রাম নিবাসী স্বর্গগত চন্দ্রমোহন দত্ত মহাশয়ের আদেশে গ্রন্থকার এই গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছেন।

পুস্তকের নমুনা।

৺৭শ্রীশ্রীদুর্গাঃ॥ প্রণমং জগদুৎপত্তি স্থিতি সংহার কারণং।
সর্গাপবর্গা জাত্রারং ত্রৈলোকত্ত শিবং।
অথ ভাশা নারি-চক্র লিক্ষতেঃ।
নারির প্রকাশ করিলা সিব কাবিলা আপনেঃ॥
পার্ব্বতি কহিল তাহা হরষীত মনে।

মনুষ্যের রোগপিরা কহিতে প্রকাশ ॥
কৃপা করি কৈলা শীব ঔশদ প্রকাশ।
প্রথমেতে জ্বরোগ পরীক্ষা কথনঃ ॥
নারির প্রকাশ সিব করিলা রচন।
সারে তিন কুটী ন্যারি সরিরে বন্দন ॥
নারি কন্দ দেশে লইয়া সর্ব্বত্র ঔশনঃ।
আপদ মস্তকে সিব সপ্ত আহারঃ ॥
মৃদঙ্গ বাজিলে জেমন তেমতি প্রচারঃ।
চতুর্থ বিংসতি নারি করিয়া বিধানঃ ॥
পুরুষের দক্ষীণ অঙ্গুনি মুনে।
শ্রীরামে কার সমমুনে ॥

৺হরিনাথ চক্রবর্ত্তী।

৺হরিনাথ চক্রবর্ত্তীর পিতার নাম ৺বংশীবদন চক্রবর্ত্তী ও নিবাস আমুর্কী। ৺বংশীবদন চক্রবর্ত্তীর চারি পুত্র ছিল। যথা, ৺রামলোচন, ৺পদ্মলোচন, ৺হরিনাথ ও গৌরচন্দ্র।

খৃষ্টীয় ঊনবিংশতি শতাব্দীর প্রারম্ভকালে হরিনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যাজনিক ব্রাহ্মণ ও প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন। তিনি কলাপ ব্যাকরণে জ্ঞান লাভ করিয়া দশকর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্মভীরু ও নিষ্ঠাবান্ ছিলেন। তাঁহার রচিত কয়েকখানি হস্তলিখিত পুথি আমরা দেখিয়াছি। উহাতে কতকগুলি চিত্তোন্মাদক গান লিখিত আছে। কিন্তু উহাতে বহু বর্ণাশুদ্ধ থাকিলেও তাঁহার রচনা কৌশল প্রশংসার্হ। প্রায় ৪০।৪৫ বৎসর হইল তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তদীয় বংশের দৌহিত্র ৺পূর্ণানন্দ, শ্রীযুক্ত যাদবানন্দ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত জ্ঞানানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ত্রয় তাঁহাদের (গায়কদের) বাস ভবনে বাস করিতেছেন। নিম্নে তাঁহার রচিত গানের নমুনা দেওয়া গেল।

নমুনা।

পদাবলি।

বলে বৃন্দাধনিঃ শুন গো সজনীঃ
হায় ২ একি হৈল গোঃ।
বৈলা হরি ২ ধরাতলে পরি
প্রাণের কিশোরি মৈল গো ॥
হৈল সিব নেত্রঃ নাহি খাব মাত্রঃ
হায় ২ কি করিলামঃ।
ছৈল জ্ঞান হতঃ জনমের মত
প্রাণের কিশোরি হারাইলাম ॥
ওঠ গো শ্রীরাধেঃ বন্ধুর বিচ্ছেদেঃ
একা কেন ভাবি রাই।
জগনাবজনেঃ মাধব সকলেঃ
জিবনেতে কাজ নাই ॥
প্রবোধ বচনেঃ নিকুঞ্জ কাননেঃ
চৈতন্ত পাইল প্যারি।
হা হা প্রাণনাথঃ বলে অকস্যাৎ
কোথা রৈল প্রাণহরি ॥
প্যারি ওক্ত—
ওগো বৃন্দে প্রাণনাথ বুঝি এইল না গো ॥
বৃন্দা ওক্ত—
ওগো প্যারী ধর্য্য হওগো ॥
প্যারি ওক্ত—
ওগো বৃন্দে জিবন রাখা প্রওজন নাইগো ॥
ওগো বৃন্দে প্রাণ যাওয়াকালে এই কৈরগো ॥
বৃন্দা ওক্ত—
ওগো প্যারী সে কেমন গো ॥
প্যারী ওক্ত—
ওগো বৃন্দে তবে বলি শুন গো ॥

মৃত আনন্দমোহন সরকার।

মৃত আনন্দমোহন সরকার কড়াইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার উষা, মানভঞ্জন ও পুষ্পযাত্রা নাকি পূর্ববঙ্গের প্রাচীনতম নাটক। সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও জ্যোতিষে তাঁহার প্রচুর জ্ঞান ছিল।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৌলিক।

যৌতুক ও পণ প্রথা।

সৃষ্টি রক্ষার অনুকূলে বিহিত বিধাতার অপূর্ব্ব বিধানের নাম বিবাহ। বিবাহিত দম্পতির সুখ স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের আনুকূল্য করণার্থ বিবাহকালে কন্যাকে যে বস্ত্র আভরণ প্রভৃতি প্রদত্ত হয় উহাকে যৌতক বা যৌতুক বলে। সুপ্রসিদ্ধ দায়ভাগ গ্রন্থে যৌতুক শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা দেখা যায়। "যৌতুকং পরিণয় লব্ধং, যু মিশ্রণে ইতি ধাতোর্যুত ইতি পদং মিশ্রতা বচনং, মিশ্রতাচ স্ত্রী পুংসয়ো রেকশরীরতা বিবাহাচ্চ তদ্ ভবতি; "অস্থিভিরস্থীনি মাংসৈর্মাংসানি ত্বচা ত্বচমিতি শ্রুতেঃ" অতো বিবাহ কালে লব্ধং যৌতুকং।" যৌতক শব্দের অবয়বার্থ বিবাহ সময় লব্ধ ধন। মিশ্রণার্থ যু ধাতুর পর ভাববাচ্যে বিহিত ক্ত প্রত্যয়ের যোগে যুত পদ নিষ্পন্ন। ভাববাচ্যের প্রত্যয়ের দ্বারা ধাতুর অর্থ মাত্রই প্রতীত হয়। সুতরাং যুত শব্দের অর্থ মিশ্রীকরণ। এস্থলে মিশ্রীকরণ অর্থে স্ত্রী পুরুষের এক শরীরতা, সম সুখ দুঃখ ও ধর্ম্মাধর্ম্মভাগিতা বুঝায়। এতাদৃশ একাত্মবোধ বা অভেদ বুদ্ধির মূলে বিবাহ সংস্কার। এ বিষয়ে সর্ব্বপ্রমাণ শিরোমণি শ্রুতি প্রমাণ দিতেছেন, 'কন্যার অস্থি, মাংস ও চর্ম্মের সহিত জামাতার অস্থি, মাংস ও চর্ম্ম একত্ব প্রাপ্ত হয়। বিবাহের মন্ত্রেও দেখিতে পাই, "যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম। যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।" কথাগুলি উর্ব্বর মস্তিষ্কের উদ্ভট কল্পনা বলিয়া একেবারে উড়াইয়া দিবার নহে। আর্ত্তপতির জন্য পবিত্রতা পত্নীর হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ, প্রোষিত প্রিয়তমের নিমিত্ত সাধ্বী স্ত্রীর ভোগ সুখ বর্জ্জন, শরীর কার্শ্য ও কান্তি মালিন্য, হৃষ্টবল্লভের সুখের সময়ে পতি দেবতা বনিতার হর্ষোল্লাস, আর মৃতপতির পারলৌকিক সেবা শুশ্রূষা ও সাহচর্য্যের জন্য সাধ্বী পত্নীর জীবনদান উদ্ধৃত শ্রৌত প্রমাণের অকাট্য প্রমাণ। মধুর হরগৌরী মিলনের ন্যায় পরস্পর প্রীতির জন্য দম্পতির যে নিঃস্বার্থ পবিত্র আত্মত্যাগ, উহাই আর্য্য বিবাহের অমৃতময় ফল। বিধাতার শ্রেষ্ঠ দান এই পরিণয়ের সময়ে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই যৌতুক পদবাচ্য। সময় ও অবস্থার ভেদে এই যৌতুক স্ত্রীধনরূপে পরিগণিত হয়। প্রাচীন অর্থশাস্ত্রে, বিবাহ কালে লব্ধ, পতির দারান্তর গ্রহণ সময়ে গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত প্রাপ্তি, বিবাহেতর সময়ে ভর্ত্তৃকুল, পিতৃকুল, মাতৃকুল ও ভ্রাতৃকুল হইতে প্রাপ্ত, শিল্পকর্ম্ম করিয়া স্বয়ং উপার্জ্জিত মোটামুটি এই কয় প্রকার স্ত্রীধন উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে শিল্প ও বিবাহ লব্ধ ধনে স্ত্রীর নির্ব্যূঢ় স্বত্ব (Absolute right) শাস্ত্রও ব্যবহার সিদ্ধ। অন্যপ্রকার স্ত্রীধন ব্যয় করিতে হইলে স্ত্রীকে স্বামীর মতের অপেক্ষা করিতে হয়। এইরূপ দুর্ভিক্ষাদির সময়ে স্বামীও স্ত্রীর মতানুবর্ত্তী হইয়া ঐ ধনের যথেষ্ট বিনিয়োগ করিতে পারেন। কিন্তু শেষোক্ত দুই প্রকার (বিবাহ ও শিল্পলব্ধ) স্ত্রীধনে স্ত্রীর অনন্যাপেক্ষ অধিকার থাকায় উহা তিনি ইচ্ছামত দান ও ব্যয়াদি করিতে পারেন। ইহাতে ভর্ত্তার সম্মতি কিংবা আপত্তির অবসর নাই। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, জনহিতৈষী মহর্ষি শাস্ত্রকারগণ অবলা স্ত্রীজাতির সুমহৎ উপকারার্থে প্রাচীন সমাজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বিবাহে এই যৌতুক প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। ভারতভূমি রত্নপ্রসূ নামে চিরপ্রশংসিত হইলেও বীর জননীর অন্ধ খঞ্জাদি বিকল অকর্ম্মণ্য সুতোৎপাদনের ন্যায় সময়ে সময়ে ইহাতে অনেক দরিদ্র ও রুগ্ন সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। শাস্ত্রকর্ত্তাগণ যেমন ঐ সকল কর্ম্মাক্ষম অসহায় হতভাগ্যদের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেইরূপ অর্জ্জনহীন কোমল প্রকৃতি গৃহকর্ত্রী নারী জাতি, বিশেষতঃ অনাথা বিধবা ও অধীরাদের অক্লেশে জীবন যাত্রা, ব্রত নিয়ম ও ধর্ম্ম কর্ম্ম অনুষ্ঠানার্থ এই পরম কল্যাণকর যৌতুক ও

স্ত্রী ধনের বিধান উদ্ভাবিত করিয়াছেন। সুখময় শৈশবে মাতা পিতার স্নেহ-কোমল-ক্রোড়ে লালিত পালিত, আনন্দময় যৌবনে পতির সোহাগ দোলায় পরিবর্দ্ধিত, অন্তে নীরস বার্দ্ধক্যে পুত্র কন্যার ভক্তিময় পরিচর্য্যায় রক্ষিত নারী যদি দুর্দ্দৈবের কোপদৃষ্টিতে পড়িয়া ঐ সকল সৌভাগ্য সুলভ স্থান হইতে বিচ্যুত হন, তাহা হইলে তিনি কিরূপ বিড়ম্বনা ভোগ করেন, উহা আজকালকার চাকুরীজীবী বাবুদের অপরিজ্ঞাত নহে। ধনীর অন্তঃপুরস্থ প্রমোদ বনে সযত্ন বর্দ্ধিত লতিকার ন্যায় সুখৈশ্বর্য্যের ক্রোড়ে লালিত পালিত রমনী যদি ভাগ্য বিপর্য্যয়ে সহসা নিরাশ্রয় হইয়া পড়েন, তাহা হইলে উহাকে নির্ব্বিঘ্নে রক্ষা করিবে বলিয়া দূরদর্শী—মহর্ষি নিবন্ধকারগণ শাস্ত্রে মহতী যৌতুক পদ্ধতির বিধান দিয়াছেন। কালের গতি বিচিত্র ও দৈবের আদেশ শিরোধার্য্য। এক সময়ে যাহা জগতের অশেষ কল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, আজ তাহাই অবোধ শিশুর হস্ত ন্যস্ত শাণিত কৃপাণের মত আত্মহত্যার অমোঘ উপায়ে পরিণত। সমাজের অশেষ হিতার্থে উদ্ভাবিত ঐ যৌতুক পদ্ধতি আধুনিক সভ্য সমাজে কিরূপ বিকৃতাকার ধারণ করিয়াছে, শাস্ত্রের ও কৌলীন্য প্রথার সহিত উহার সম্পর্ক কতটুকু তাহা প্রণিধান যোগ্য। শাস্ত্রে এখন কোথাও দেখা যায় না যে, কন্যাদান কালে পর্য্যাপ্ত যৌতুক ও স্ত্রীধন না দিলে দান অসিদ্ধ হয় বা উহাতে দাতার কোনও প্রত্যবায় ঘটে। অবশ্য সাচ্ছাদনালঙ্কৃত কন্যা দানের বিধি শাস্ত্র দৃষ্ট। গো হিরণ্যাদি দানের সময়ে বস্ত্র ভোজ্যাদি দানাঙ্গের ন্যায় ঐ সকল স্থলে কন্যাদানই মুখ্য, বস্ত্র ভূষণাদি দান আনুষঙ্গিক মাত্র। দাতা সহর্ষ মানসে তাঁহার পরম স্নেহপাত্রী দুহিতা ও জামাতার সন্তোষের জন্য সাধ্যমত যাহা দান করেন, গ্রহীতা জামাতাও তাঁহার সদাশয় অভিভাবকবর্গের প্রফুল্ল চিত্তে উহা গ্রহণ করাই শিষ্টাচার ও শাস্ত্রসম্মত। শাস্ত্রে গুণবান্ পাত্রে অর্পিতা কন্যা দশ পুত্রের সমানরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ আজন্ম প্রাণপণে যথাশক্তি লালন পালন করিয়া কর্ত্তব্যের অলংঘ্য অনুরোধে বাধ্য হইয়া যাহাকে সুখী করিবার বাসনায় অপরিচিত ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত করা হয়, সেই স্নেহাধার তনয়াকে উপযুক্ত উপঢৌকন দিতে কুণ্ঠিত হয়, এরূপ হৃদয়হীন নৃশংস জনক ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতে সুদুর্লভ। কন্যা দান মহাদানের অন্তর্গত। আমার মনে হয় ইহাকে মহা মহাদান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ আত্ম প্রতিকৃতি আত্মজার দানের সহিত এক আত্মজ দান ভিন্ন অপর কোনও অনাত্ম পার্থিব দান তুলিনা হইতে পারে না। ভারতবাসীর ভাগ্যদোষে এতাদৃশ মহা-পবিত্র ও পুণ্যবহুল কন্যাদান আজ কাল "কন্যাদায়" রূপ মহাদায়ে পরিগণিত হইয়াছে। এই ঘৃণ্য জঘন্য কদাচারের সঙ্গে পবিত্র ধর্ম্মশাস্ত্রও বল্লাল প্রতিষ্ঠিত কৌলীন্যের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নাই। শাস্ত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিমাত্রেই স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন যে, উহাতে কন্যা বিক্রয়ের কিরূপ ভীষণ নিন্দাবাদ আছে। আচার্য্যপাদ কাশ্যপ বলেন,—

"শুল্কেন যে প্রযচ্ছন্তি স্ব সুতাং লোভ মোহিতাং
আত্মবিক্রয়িণঃ পাপাঃ মহাকিল্বিষ কারিণঃ।
পতন্তি নরকে ঘোরে ঘ্নন্তি চ সপ্তমং কুলং॥"

যাহারা লোভের মোহে পড়িয়া পণ লইয়া কন্যা বিক্রয় করে, তাহারা আত্ম বিক্রয়ী মহাপাপী হয়। ঐ মহাপাপিগণ অনন্তকাল ঘোর নরকে পচিতে থাকে। তদ্বংশজাত সপ্তম পুরুষকে পর্য্যন্ত ঐ দুরাত্মার দুষ্কর্ম্মের ফল ভাগী হইতে হয়। উক্ত প্রমাণে "লোভ মোহিতাঃ" পদের তাৎপর্য্য,

পিত্রাদি অভিভাবক যদি স্বীয় স্বার্থের জন্য ঐ পণ গ্রহণ না করেন, কেবল কন্যার প্রতি অনুকম্পাবশতঃ পণ গ্রহণ করিয়া উহার সুখ সন্তোষের বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কন্যাধনরূপে রক্ষা করেন, তাহা হইলে প্রত্যবায় ভাগী হন না। ইহার সমর্থক প্রমাণ;—

"যাসাং নাদদতে শুল্কং জাতয়ো ন স বিক্রয়ঃ।
অর্হণং যৎ কুমারীণাং মানৃশংস্যংহিতৎ স্মৃতং॥"

অধিক শাস্ত্র প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকের বিরক্তি উৎপাদন নিষ্প্রয়োজন। দেশের দুর্ভাগ্য কন্যাবিক্রয়ীর দল আবহমান কাল সমাজের তীব্র বিষ দৃষ্টিতে পড়িয়া লাঞ্ছিত হইতেছেন। সুদীর্ঘকাল সামাজিক শাসন ও গঞ্জনার ফলে এই পাপ প্রবৃত্তি অনেক পরিমাণে কমিয়া আসিয়াছে। ক্রিয়ার পর প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী; এই সনাতন নীতিনেমির আবর্ত্তনে সুদূর ভবিষ্যতে এই পাপ স্রোত নিঃশেষে রুদ্ধ হওয়াও অসম্ভব নহে। বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে, সামাজিকগণ যে জাতীয় পাপের জন্য এক শ্রেণীর লোকদিগকে (কন্যা বিক্রয় কর্ত্তৃগণকে) কোণঠেসা করিয়া নানাবিধ নিগ্রহের সাহায্যে বহুকাল হইতে দমন করিতে চেষ্টা করিতেছেন, এবং তাঁহাদের এই সাধু চেষ্টা কতকটা ফলবতীও হইয়াছে; তাঁহারা বা তাঁহাদের বংশপ্রদীপ ও জ্ঞাতি বান্ধবগণ পুত্র বিক্রয়রূপ উৎকট পণ প্রথার প্রশ্রয় দিয়া স্থবির হিন্দু সমাজের অল্পাবশিষ্ট জীবশোণিত (Life llood) শোষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। জন প্রবাদ ঘোষণা করে, বায়সেরা এক চক্ষে দেখিয়া থাকে। আমাদের মনে হয়, কেবল বায়স কেন, সমাজের সকল স্তরেই এরূপ একাক্ষবায়সবান্ধব অনেক বিদ্যমান আছেন। স্বার্থদৃষ্টি ভিন্ন তাঁহাদের পরার্থদৃষ্টিটা "কাণা" নদীর ন্যায় একেবারেই রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এই একাক্ষ বায়সের দলের বুঝা উচিত কন্যা বিক্রয় ও পুত্র বিক্রয় তুল্য পাপজনক। উহা একই মুদ্রার সদর মফঃস্বল দুই পীঠ মাত্র। উহাতে মূল্য কিংবা ফলগত একটুকুও তারতম্য নাই। আমাদের মনু মহারাজ কন্যা পুত্র বিক্রয়কে উপপাতকের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার বিধান,

"তড়াগারাম দারাণামপত্যস্য চ বিক্রয়।"

মনু ১১, ১১৮।

এই প্রমাণের পূর্ব্ব ও পরভাগে তিনি নানাবিধ উপপাতকের নাম করিয়াছেন। তন্মধ্যে সরোবর, উদ্যান, সাধ্বী পত্নী ও অপত্য (পুত্র কন্যা) বিক্রয়কে ঐ সকল উপপাতকের তালিকা ভুক্ত করিয়াছেন। এই প্রমাণোক্ত অপত্য শব্দের অর্থ পুত্র ও কন্যা, ইহাকে ইংরেজীতে child বলা হয়। ব্যাখ্যাটা লেখকের স্বকপোল কল্পিত নহে। মহামহোপাধ্যায় শূলপাণি পণ্ডিত তাঁহার সুবিখ্যাত প্রায়শ্চিত্ত বিবেক নামক গ্রন্থে মনুর ঐ প্রমাণ তুলিয়া "অপত্যস্য অনেক বিধস্য" এইরূপ একটু ইঙ্গিত করিয়াছেন। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব খ্যাতনামা মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্ত পণ্ডিত ৺ মধুসূদন স্মৃতিরত্ন তৎকৃত প্রায়শ্চিত্ত বিবেকের টীকায় ঐ স্থলে অপত্য শব্দের বিশদ ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, "অনেক বিধস্যেতি কন্যায়াঃ পুত্রস্যচ দ্বাদশ বিধস্যেত্যর্থঃ। ন পততি বংশো যেন তদপত্য মিতিব্যুৎপত্তেঃ"। 'অনেক বিধ শব্দে ঔরস, দত্তক, কৃত্রিম প্রভৃতি দ্বাদশ প্রকার পুত্র কন্যাই বুঝিতে হইবে। যাহার জন্ম হইলে বংশ পতিত (লুপ্ত) হয় না, তাহাকেই অপত্য কহে, এই ব্যুৎপত্তি (প্রকৃতি প্রত্যয় বিশ্লেষণ) লভ্য অর্থ দ্বারা অপত্য শব্দে পুত্র কন্যা দুইই বুঝায়।' এটা যুক্তি বা বিজ্ঞানের যুগ। সুতরাং অনুস্বার বিসর্গের এলাকা ছাড়িয়া যুক্তির চক্ষে দেখিলেও স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, আত্মা অলিঙ্গ; স্ত্রী পুং ভেদ বর্জ্জিত। বালক বালিকার কল্পিত পঞ্চালিকার (পুত্তলীর) বিবাহ দেওয়ার ন্যায় এই স্ত্রী পুরুষ ভেদ কল্পনা কেবল ব্যবহারিক জগতের ব্যবহার নির্ব্বাহার্থ প্রচলিত। আচার্য্য পদে শঙ্করের সঙ্কেত, "কাতব কান্তা কস্তে পুত্রঃ" ইহারই সমারক মাত্র। উপনিষদ প্রমাণেও দেখিতে পাওয়া যায়, "এই আত্মা স্ত্রী, পুরুষ কিংবা নপুংসক নহেন, নামরূপ শূন্য মহাকাশের ঘটাদি সম্বন্ধের ন্যায় এই অলিঙ্গ অনামরূপ আত্মার যখন যে কোন ও উপাধিভূত দেহাদির সহিত সংশ্লেষ জন্মে, তখন ইনি সেইরূপেই প্রকাশিত হন।" আর একটু অগ্রসর হইয়া কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত গর্ভোপনিষদে

গর্ভে শরীরোৎপত্তির রচনা প্রণালীর প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলে দেখা যায়; পিতা মাতার আর্ত্তব শোণিত এক রাত্রিতে ঈষৎ গাঢ় হইয়া ক্রমশঃ নবম মাসে সর্ব্বাবয়ব সম্পূর্ণ হইয়া থাকে। তৃতীয় মাসে ঐ গর্ভস্থ সন্তানের মুখ নাসিকাদি ইন্দ্রিয় গোলকের চিহ্ন সমুদ্ভূত হইয়া ৪র্থ ও ৫ম মাসে ঐগুলি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। অতএব ঐ সময়ের পূর্ব্বে ভ্রূণটী (Foctus) আধারের ব্যাখ্যাত আলিসি অবস্থাতেই থাকে। সরকারী শবব্যবচ্ছেদাগারে অবৈধ ভাবে হত ভ্রূণের বয়সও স্ত্রীত্ব পুংত্ব নির্ণয় এই প্রণালীর অনুগত। সদাশয় ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের আইনেও স্ত্রীবধ ও পুরুষ বধের দণ্ডের কোন ইতর বিশেষ নাই। ইহাতেও স্ত্রী আত্মা ও পুরুষ আত্মার সমত্ব সূচিত হইতেছে। শ্রুতি, স্মৃতি, যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ যে আত্মার স্ত্রী পুরুষ ভেদ রাহিত্যের সুদৃঢ় প্রমাণ, সেই আত্ম প্রতিমূর্ত্তি পুত্র কন্যা বিক্রয়জনিত পাপের যে কেশাগ্র মাত্র পার্থক্য নাই, ইহা বোধহয় বিবেকিমাত্রেই অসঙ্কোচে স্বীকার করিবেন। এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, পূর্ব্বোক্ত উপপাতকে পাতকী কোন ব্যক্তি আজি কালকার দিনেও সমাজে কোন প্রকারে দণ্ডিত হন কিনা? গোবধ, অভক্ষ্য ভক্ষণ, নিন্দিত দেশ গমন প্রভৃতি কতিপয় পাপ ঐ শ্রেণীর অন্তর্গত। তথা কথিত বর্ত্তমান সমাজেও যদি কেহ গোহত্যা, নিন্দিতান্ন গ্রহণাদি করেন, তাহা হইলে অদ্যাপি সমাজ তাহার মাথা মুড়াইয়া কড়ি উৎসর্গ করাইয়া অদ্ভুত প্রায়শ্চিত্তে দণ্ডিত করেন। এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত না করিলে সমাজে তাহার নাপিত পুরুত ও হুঁকা বন্ধ হয়, এক কথায় সে একঘ'রে হইয়া থাকে। আমরা জিজ্ঞাসা করি, ঐরূপ উপপাতকীর পক্ষে সমাজ এইরূপ দণ্ড মণ্ডের কর্ত্তা হইলেন কিসের বলে? যদি প্রাচীন শাস্ত্রই তাহার শাসনের যন্ত্র হয়, তাহা হইলে মুমূর্ষু হিন্দুসমাজের পঞ্জর দুর্ব্বল বক্ষের উপর সজোরে পদাঘাত করিয়া যাহারা বরপণ প্রথা গ্রহণরূপ উপপাতকে নিত্যপাপী হইতেছেন, তাহাদের মস্তক মুণ্ডন ও প্রায়শ্চিত্ত বিধানের দিকে দৃষ্টি নাই কেন? মান্ধাতায় আমলের পাঁজি পুঁথিগুলি যদি অকে'জোই হইয়া থাকে, তাহাহইলে সে গুলিকে কীর্ত্তিনাশার জলে ভাসাইয়া দেওয়াই অতি বুদ্ধিমান্‌দিগের কর্ত্তব্য। হিন্দু নামের দোহাই দিয়া সুবিধামত হিন্দু শাস্ত্রের কতকগুলি অনুশাসন মানিব, আর যাহাতে আমার যথেচ্ছাচারের বাধা জন্মাইবে, সেগুলি আমি জানিয়াও জানিব না, দেখিয়াও দেখিব না, বা শুনিয়াও শুনিব না, এরূপ ঘোর কপটাচার সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের রাজ্যে চিরকাল চলিতে পারে না। পরমেশ্বরের বিরাট্ দরবারে প্রকাশ্য কপটীর ক্ষমা আছে, কিন্তু গুপ্ত কপটাচারীর জন্য নরকের কোটি দ্বার যুগপৎ উদ্‌ঘাটিত। ধনী হইতে চাও, সরল ও অকপট হও; সুখী হইতে চাও সৎপথে চলিয়া পরিশ্রমশীলতার দ্বারা অর্থার্জ্জন কর, উহা আত্মসাৎ করিলে কখনই সুখী হইতে পারিবে না। পরের ধনে অযথা লোভ করিয়া অন্যায় উপায়ে অতি প্রাচীন শাস্ত্রের হিতোপদেশ, "মাগৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনং", অর্থের জন্য লালসা করিও না, ধন কাহারও নহে। সোনা, রূপা টাকা ও নোটের ন্যায় উহার কেবল হাতফের্ হইতেছে মাত্র। কৌলীন্য প্রথা প্রচলনপ্রসঙ্গে মহাত্মা বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ গ্রন্থে দৃষ্টিগোচর হয়, "রাজা বল্লাল সেন কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠার দিন স্থির করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে নিত্য ক্রিয়া সমাধানে রাজ সভায় আসিতে অনুরোধ করেন। ইহাতে কতিপয় ব্রাহ্মণ এক প্রহরের সময়, কতিপয় দেড় প্রহরের সময় আর কতকগুলি আড়াই প্রহরের সময় উপস্থিত হন। যাঁহারা শেষে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা কৌলীন্য মর্য্যাদা পাইলেন। যাঁহারা দেড় প্রহরের সময় আসিলেন, তাঁহারা শ্রোত্রিয়, আর যাঁহারা এক প্রহরের সময় আসিলেন তাঁহারা গৌণ কুলীন হইলেন। ইহার তাৎপর্য্য, নিত্যক্রিয়া করিতে অধিক সময় লাগে,

সুতরাং যাঁহারা আড়াই প্রহরের সময় আসিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে নিত্যক্রিয়া করিয়াছিলেন। এজন্য রাজা তাঁহাদিগকে সদাচারপূত বিবেচনা করিয়া প্রধান কুল মর্য্যাদা প্রদান করিলেন। দেড় প্রহরের সময় আগতেরা আচারাংশে ন্যূনবিধায় অল্প মর্য্যাদা পাইলেন। আর প্রথম প্রহরে আগতেরা আচার ভ্রষ্ট বলিয়া অবধারিত হওয়ায় রাজা তাঁহাদিগকে হেয় বোধে অপকৃষ্ট স্থান দান করিলেন। কালক্রমে গৌণ কুলীনেরা শ্রোত্রিয় পর্য্যায়ে নিয়োজিত হইলেন, কিন্তু সর্ব্বাংশে শ্রোত্রিয়দিগের সমান হইতে পারিলেন না। প্রকৃত শ্রোত্রিয়েরা শুদ্ধ শ্রোত্রিয় ও গৌণ কুলীনেরা কষ্ট শ্রোত্রিয় বলিয়া উল্লিখিত হইতে লাগিলেন। গৌণ কুলীন সংজ্ঞা কালে তাঁহারা যেরূপ হেয় ও অশ্রদ্ধেয় ছিলেন, কষ্ট শ্রোত্রিয় সংজ্ঞা কালেও সেইরূপ রহিলেন।" সাগর প্রকাশ, ৩২ পৃষ্ঠা। কুলদীপিকা নামক প্রসিদ্ধ কুল শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে, "কুলীন শব্দেন উৎকর্ষবিশেষ বংশজাতক ব্যক্তিরিতি। তথাচ লক্ষণং। উৎকর্ষ বিশেষ ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন বংশ জাতকত্বে সতি তদ্ধর্ম্মবত্বং কুলীনত্বমিতি। উৎকর্ষ বিশেষস্তু নবধা গুণাঃ। তদ্ যথাঃ

"আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং।
নিষ্ঠাবৃত্তি স্তপোদানং নবধা কুল লক্ষণং॥"

অতএব উৎকর্ষ বিশেষাত্মক নবধা গুণ বিশিষ্টত্বং কুলীনত্বং কুলীন শব্দে বিশেষ উৎকর্ষ প্রাপ্ত বংশজাত ব্যক্তিকে বুঝায়। ইহার পরিচয়ক বিশেষণ, উৎকর্ষ বিশেষরূপ গুণবিশিষ্ট বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া উৎকর্ষ জনক তত্তৎ গুণবিশিষ্ট হওয়ার নাম কৌলীন্য। সংক্ষেপে, সদ্বংশ জাত ও পূর্ব্বোক্ত সদ্ গুণশালীব্যক্তিদিগকে কুলীন বলা হয়। এই উৎকর্ষজনক গুণগুলির নাম; সদাচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা (মর্য্যাদা রক্ষণ), তীর্থসেবা, একনিষ্ঠা, সাধুজীবিকা, তপস্যা (ব্রত নিয়মাদি) ও যথাশক্তি দান। বল্লাল রাজপ্রতিষ্ঠিত কৌলীন্যের ভিত্তি সদাচার ও স্বধর্ম্ম নিষ্ঠা। প্রাচীন কুলশাস্ত্রেও প্রধানতঃ ঐগুলিই কৌলীন্যের নিদান বলিয়া পরিগৃহীত। বর্ত্তমান সময়ে কুলীন বলিয়া সচরাচর যাঁহারা কুল মর্য্যাদার ডঙ্কা বাজাইয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তি ঐ সকল সদ্ গুণের সহিত পরিচিত। প্রাচীন কুলশাস্ত্র বা বল্লালী কৌলীন্যের সহিত আধুনিক উদ্ভট বরপণ প্রথার বিশেষ কোনও সম্পর্ক নাই। কারণ কালের পরিবর্ত্তনে ও প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মে ঐ সাময়িক ব্যবস্থাগুলি অধুনা বহুল পরিমাণে শিথিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু যতদিন এই সকল কুপ্রথা সমাজ হইতে চির বিদায় গ্রহণ না করিবে, ততদিন শিথিল মূল বৃক্ষও দণ্ডের ন্যায় সমাজের পক্ষে চরম উদ্বেজক থাকিবে। এখনও এমন অনেক লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা তথা কথিত কৌলীন্যরূপ আকাশ কুসুমের সৌরভে (essence) স্ব-কলেবর আমোদিত মনে করিয়া স্ব-কুলমর্য্যাদা খ্যাপনে সহস্র মুখ হন। ময়ূর পুচ্ছাবৃত জীববিশেষের ন্যায় উঁহারা সমাজের সমূহ অনিষ্টের মূল। আমরা উঁহাদের ধার করা ময়ূরপুচ্ছরূপ কৌলীন্যের স্বরূপ উদ্ ঘাটনের জন্য কথঞ্চিৎ প্রয়াস পাইলাম। আশা করি গরীয়সী জন্ম ভূমির অকৃত্রিম সেবক মাত্রেই ইহাদিগকে ভালরূপ চিনিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইবেন।

সুখের বিষয়, আজকাল একদল স্বদেশ-সেবক নূতন শিক্ষা দীক্ষার, আচার ব্যবহারের, অশন বসনের ও চাল চলনের প্রবর্ত্তক হইয়া সংবাদ পত্রাদির সাহায্যে তাঁহাদের অভিনব মতের বীজ স্বদেশ বিদেশে বিক্ষিপ্ত করিতেছেন। স্বদেশ মাতৃকার এই সকল স্বেচ্ছা সেবক বীর পুত্র আমাদের সবিশেষ শ্রদ্ধাস্পদ। তাঁহাদের নিকট আমাদের ক্ষীণ কণ্ঠের করুণ জিজ্ঞাসা যে, স্বদেশ উদ্ধারের অন্যতম প্রধান অঙ্গ স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতা বলিয়া তাঁহারা এতদিন যে প্রবল আন্দোলন আলোচনা করিয়া আসিতেছেন; উহাতে কতটুকু সুফল ফলিয়াছে? তাঁহাদের অবলম্বিত পদ্ধতি নিতান্তই ব্যর্থ

হইয়াছে, আমরা এরূপ কথা বলিবার সাহস বা প্রবৃত্তি রাখি না। যে নারী জাতির সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির কামনায় তাঁহাদের প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে, সংক্রামক ব্যাধি এবং মহামারীতে সেই মহীয়সী মাতৃজাতি দিন দিন দারুণ নৈরাশ্যের তাড়নায় অনলে, সলিলে, উদ্বন্ধনে, বিষপ্রয়োগে আত্মজীবন বিসর্জ্জন দিতেছেন; তাঁহারা ইহার কি কোনও স্থায়ী প্রতিকার করিতে পারেন না? শিক্ষা ও স্বাধীনতা দানের সহিত যাহাতে তাঁহাদের জীবন কোরকগুলি অকালে সামাজিক কুপ্রথা কীটদংশনে শুকাইয়া না যায়, তৎপ্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখাই তাঁহাদের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য হওয়া উচিত। অন্ন বস্ত্রের নিদারুণ অভাবের দিনে স্নেহময় মাতা পিতার কন্যাদায় চিন্তাভারক্লিষ্ট বদন ও জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালসার দেহ দেখিয়া সাক্ষাৎ করুণার মূর্ত্তি কন্যাকুল যদি পূজ্যতম পিতা মাতাকে এই জীবন্ত নরক হইতে উদ্ধার করিবার আশায় প্রত্যহ জীবন দান করিতে থাকেন, তাহা হইলে শিক্ষা ও স্বাধীনতা প্রচার কাহাদের জন্য? শিক্ষিতা কুমারীও এই পাপাচারের প্রভাব হইতে মুক্ত নহেন। যাঁহাদের আদর্শে আজ প্রাচ্য সমাজ অনুপ্রাণিত, সেই বীর সমাজেও এরূপ জাতি ধ্বংসকর মহান্ অনর্থের সন্ধান পাওয়া যায় না। আর একদল আছেন, যাঁহারা আমাদের পূর্ব্বে প্রাচীন আর্য্য শাস্ত্রকারদের উপর খড়্গহস্ত। ইঁহারা "যত দোষ নন্দঘোষ" ন্যায়ে এই শাস্ত্রকারদের স্বর্গীয় আত্মার তৃপ্তির উদ্দেশ্যে অহরহ অজস্র কুবাক্য বারি বর্ষণ-দ্বারা তর্পণ করিয়া থাকেন। ইঁহাদের যুক্তি, ঐ স্বার্থ কপট শাস্ত্রকারগণই আমাদের স্ত্রী সমাজের অধঃপাতের কারণ কূপমণ্ডূকতার সমর্থন করিয়া ভারতের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। আমরা কিন্তু শাস্ত্রে ইঁহাদের এই অদ্ভুত উক্তির ও অপূর্ব্ব যুক্তির সমর্থক প্রমাণ পাই না। স্ত্রী জাতির ভরণপোষণ, রক্ষণাবেক্ষন ও মান মর্য্যাদা প্রদর্শনের অনুকূলে শাস্ত্রে এত অধিক প্রমাণ পাওয়া যায়, যেগুলি একত্র করিলে দ্বিতীয় একখানি মহাভারত হইয়া উঠে। সুখবোধের আশায় আমরা সর্ব্ব প্রধান শ্রেষ্ঠ মনুসংহিতা ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ হইতে এস্থলে দুইটী প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দেবরৈস্তথা। পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ॥" মনু৩, ৫৫।

"পদে পদে শুভং তস্য যঃ স্ত্রীমানঞ্চ রক্ষতি।
অবমত্য স্ত্রিয়ং মূঢ়ো যো যাতি পুরুষাধমঃ।।
পদে পদে তদশুভং করোতি পার্ব্বতী সতী॥"

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, ৩২ অধ্যায়।

স্ত্রীলোককে বহুমান পূর্ব্বক ভোজনাদি প্রদান ও ভূষণাদি দ্বারা সজ্জা ভূষিত করা, বহু মঙ্গলকামী পিতা, ভ্রাতা, পতি ও দেবরগণের কর্ত্তব্য। যিনি স্ত্রীর সম্মান রক্ষা করেন, তিনি সর্ব্বদা কল্যাণভাগী হন। পক্ষান্তরে যে নির্ব্বোধ স্ত্রীর অবমাননা করে, সাধ্বী পার্ব্বতী দেবী প্রতিপদে তাহার বিঘ্ন ঘটাইয়া থাকেন। যে পুণ্যভূমি ভারতের অমর গ্রন্থ মহাভারতে ধর্ম্মাবতার নৃপেন্দ্র চূড়ামণি যুধিষ্ঠির, "ইয়ং নঃ প্রিয়াভার্য্যা প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী।

মাতেব পরিপাল্যাচ পূজ্যা জ্যেষ্ঠেব স্বসা॥"

বিরাটপর্ব্ব, ৩য় অধ্যায়।

বলিয়া বাক্য ও কার্য্যতঃ পূরাপূরি স্ত্রীর সম্মান রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। যে ভারতের আদর্শ ভূপতি সত্যাবতার শ্রীরামচন্দ্র স্বকৃত অশ্বমেধ যজ্ঞে নির্ব্বাসিত পতিব্রতা পত্নী সীতাদেবীর হিরণ্ময়ী প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া ভারতরমনী কেবল সাম্যসঙ্গিনী নহেন, যথার্থ সহধর্ম্মিনী, এই মহাবাক্যের সত্যতা বর্ণে বর্ণে রক্ষা করিয়া জগতে স্ত্রীজাতির অর্চনার হীরকখচিত স্বর্ণ সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; যে ভারতে যুগ যুগান্তরের কথা নয়, সে দিনও দক্ষিণেশ্বরের মত্তপাগল পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ স্বপরিণীতা যুবতী স্ত্রীকে জগন্মাতার অংশরূপে দর্শন ও বর্ণন করিয়া স্ত্রীর প্রকৃত স্বরূপ মহামাতৃভাবের প্রচার করিয়া গিয়াছেন; অদ্যাপি

যে ভারতের পূর্ব্ব সীমান্তে কামাখ্যাদেবীর অর্চ্চনান্তে এবং পশ্চিমে মুক্তিধাম বারাণসী ক্ষেত্রে দৈবকৃত্যে, বার্ষিক দুর্গা, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি শক্তিপূজার অনুষ্ঠানে দেশের সাক্ষাৎ শক্তি, সোমীবিদ্যা ও বুদ্ধিরূপিণী, সর্ব্ববিধ উন্নতিবিধায়িনী, আদর্শ—,কন্যা,ভগিনী,বধূ,জননী গৃহিনী কামিনীকুলের অব্যক্ত শক্তির গূঢ় মহিমা অবগতির ও পরিস্ফুরণের নিমিত্ত কুমারী পূজা পদ্ধতি সুপ্রচলিত এবং যে কুমারী পূজায় জাতিভেদ পর্য্যন্ত শাস্ত্র বর্জ্জিত হইয়াছে, সেই ভারতে স্ত্রীজাতির প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনের ব্যবস্থা কেবল পুঁথিগত বলিয়া যাহারা স্থানে অস্থানে গলগর্জ্জন করেন, সেই সকল মহাপণ্ডিতের দলকে দূরে হইতে নমস্কার করাই নীতিসঙ্গত। পরিশেষে ভুক্তভোগী ধর্ম্মভীরু স্বদেশ ও স্বজাতির প্রকৃত হিতকামী শক্তিশালী মহানুভবগণের নিকট সানুনয় নিবেদন যে, তাঁহারা যেন উপেক্ষাবুদ্ধির আশ্রয়ে সমাজের এই গলিত দুষ্ট ক্ষতটীকে (Fistula) অগ্রাহ্য না করেন। ঔষধ পথ্য বিহীন দরিদ্র প্রতিবাসী সংক্রামক ব্যাধিতে প্রাণ ত্যাগ করিলে উহাতে ধনীরও প্রাণহানির যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। আমি বড় লোক, দু চা'র হাজার দিতে বা নিতে, আমার তিলার্দ্ধ মাত্র কষ্ট হইবে না, এই ঘৃণিত স্বার্থনীতি মনুষ্যত্বের পরিচায়ক ও রক্ষক নহে। সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, তুমি তোমার ধনাগারের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মালিক নহ। বিশেষতঃ সমাজে তুমি কখনও একাকী জীবন ধারণ করিতে পারিবে না। ভ্রাতৃকুল, বন্ধুকুল, কন্যাকুল ও জামাতৃকুল প্রভৃতি বেষ্টিত হইয়া তুমি সুখে কালাতিপাত করিয়া থাক। ইহাদের সুখ দুঃখের প্রভাব অনেক সময়ে তোমার হৃদয়ে প্রভুত্ব করে। ইহারা সকলেই কিছু তোমার ন্যায় গর্ভেশ্বর (To be born with a silver spoon in one's mouth) হইয়া ভূমিষ্ঠ হইবার সৌভাগ্য লাভ করেন নাই। সুতরাং ইহারা যদি কখনও তোমার অমানুষিক হৃদয়হীনতায় হৃদয়ে ব্যথা পান, তাহা হইলে এই সকল হতভাগ্যের আপশোষের তপ্ত শ্বাস তোমার সুখ শীতল অন্তঃকরণকে এক দিন না এক দিন সন্তাপিত করিবে। আর ভগবান না করুন, ইহাদের মধ্যে যদি কাহারও বয়স্থা কন্যা ব্যর্থ যৌবনের উত্তপ্ত বিষাদে দীনহীন পিতা মাতার নিদারুণ মনঃক্ষোভ নিবৃত্তির বাসনায় আত্মঘাতিনী হয়, তাহা হইলে উহার প্রতিহিংসা-লোলুপ প্রেতাত্মা তোমার সুখ নিদ্রার বিষম ব্যাঘাত ঘটাইবে। আমরা বুঝিতে পারি আর নাই পারি, প্রেমময় বিশ্ব পিতার এক অদ্বিতীয় বিরাট প্রেম তন্ত্রীতে নিখিল জগৎ জীবের হৃদয় নিয়ত ঝঙ্কৃত হইতেছে। একজনের দোষে উহার একটী যদি একটুও বিকল কিংবা বেসুরা হয়, তাহাতে সকলগুলিই বিগড়াইয়া যাইবে।

শ্রীনিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ।

অবরোধ।

(Erckmann Chatrian লিখিত 'Le Blocus' নামক আখ্যায়িকার বঙ্গানুবাদ)

প্রথম অধ্যায়।

ইহুদি পাড়ার মোয়াস বুড়াকে একদিন বলেছিলাম যে খুড়া কালসুবুর্গ অবরোধের গল্পটা তোমার একদিন কর্ত্তে হবে। খুড়ার বোধ হয় সে দিন হাতে বড় কাজ ছিল না, বল্লে "আচ্ছা সে আর বেশী কথা কি আমি তোমাকে বিস্তারিতই শোনাব। ঘটনাটা ১৮১৪ সালের। বুড়া আমাকে যা বলেছিল, আমি তা ঠিক তাহারই জবানীতেই বলে যাচ্ছি।

আমি তখন চাঁদনী বাজারের দক্ষিণ কোণে যে ছোট বাড়ীটা ছিল, সেইখানেই থাকতাম; ব্যবসা ছিল পুরানো লোহা সের দরে বিক্রী করা। গুদামটা ছিল রাস্তার খিলানের নীচে, আর আমার পরিবারের মধ্যে আমার স্ত্রী সলে আর আমার বুড়া বয়সের ছেলে

সাবেক। ইট্‌জিস আর ক্রসেন বলে যে বড় দুইটি সাবালক ছেলে ছিল তাদের পূর্ব্বেই মার্কিন মুলুকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম আর জেক্‌মা বলে একটি মাত্র মেয়ে তারও বিয়ে সাদি চুকিয়ে দিইছিলাম। জমাইটর নাম বারুখ, সে ফাডার্থ গ্রামে চামড়ার ব্যবসা কর্ত্ত। আমার লোহার ব্যবসা ছাড়া আরও একটা ব্যবসা ছিল। রংরুটের দল সিপাইগিরিতে ভর্ত্তি হওয়ার পর যখন সরকারী পোষাক জুতো পেয়ে তাদের পুরান জামা কাপড় বিক্রী করে ফেল্‌তো, আমি সেই সব কিনে নিয়ে রাখ্‌তাম। আমার কাছ থেকে আবার ফিরিওয়ালারা সেই সব কিনে নিয়ে কতক কাগজের কারখানায় দিত আর কতক বাছ গোছ করে চাষাভুষাদের কাছে বিক্রী কর্ত্ত। ব্যবসাটা নেহাৎ মন্দ চল্‌ছিল না। মাসে মাসে হপ্তায় হপ্তায় কত রংরুট যে ফাল্‌সবুর্গ হয়ে যেত, তার আর গোনাগুন্তি নেই। আস্‌তে আস্‌তেই তাদের মাপ জোপ নেওয়ার ব্যবস্থা হ'ত, তার পর যেই সরকারী পোষাক পাওয়া আর সাজ সজ্জা করে রওনা করিয়ে দেওয়া। কেউ চল্লেন মেয়েন্স কেউবা ট্রাসবুর্গ কেউবা আর কোথাও। মোদ্দা ব্যবসাটা এই রকমই ছিল এবং অনেক দিন ধরে চলেছিলও বেশ, কিন্তু শেষের দিকটা লোকে আর বরদাস্ত করতে পার্‌লে না। সেই রুশিয়া থেকে ফেরৎ আসার পর ১৮১৩ সালে যে খুব রকম ফৌজ সংগ্রহ চল্‌ছিল, ঠিক সেই সময়েই লোকে প্রায় ক্ষেপে উঠবার উপক্রম কর্‌লে।

আমাকে এমন আহাম্মক পায়নি যে ছেলে দুটোকে আট্‌কে রেখে দেবো আর রাজ সরকারের জমাদার এসে ঘাড় পাকড়ে লড়াই কর্ত্তে নিয়ে যাবেন। ছেলে দুটোর বুদ্ধির কিছু কমি ছিল না। বার বছরে পা দিতেই তারা রীতিমত কাজকর্ম বুঝে নিয়েছিল। বিনা পয়সায় খাটুনির চেয়ে যে পালিয়ে সূর্য্যি মামার দেশে যাওয়া ভাল একথা হুঁসিয়ার ছেলেদের আর বুঝিয়ে দেওয়া দরকার ছিল না। এর আগে একদিন সন্ধ্যা বেলায় সাত-ডালওয়ালা বাতি দানে বাতি জেলে আমরা খেতে বসেছি, এমন সময় তাদের গর্ভধারিনী তাদের পানে চেয়ে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠ্‌ল। বল্‌লে "এইত যুদ্ধ যাবার বয়স হয়ে এল, এইবার দুষমনেরা আমার সোনার চাঁদদের ধরে নিয়ে গিয়ে বন্দুকের গুলি, সঙ্গীনের খোঁচা আর কামানের গোলার সাম্‌নে ধরে দেবে ত। ভগবান এ পোড়া অদৃষ্টে যে কি লিখেছেন"—আমি দেখলাম এই কথা শুনে দুজনেরই মুখ ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছে; আমি মনে মনে হাস্‌লাম, ভাবলাম—এ ব্যাটারা সেয়ানা ছেলে পৈতৃক প্রাণটা ছিছি মিছি নষ্ট কর্ত্তে বড় রাজী নয়। যাক্ একটা দুর্ভাবনা গেল। দেখ বাবা ফিট্‌জ, আমার যদি গোটাকতক বণ্ডামার্ক এই লড়ায়ে গোয়াগুলোর মত ছেলে হ'ত তা হ'লে শুধু তাদের জ্বালাতেই আমাকে জলে পুড়ে মর্ত্তে হ'ত। সে রকম ছেলে থাক্‌লে আমি নিশ্চয়ই বল্‌তাম এরা কখনই আমার বংশে জন্মায়নি।

ছেলে দুইটি ত শশীকলার মত বাড়্‌তে লাগ্‌ল—যেমন রূপ তেমনি গায়ের শক্তি। পনের বছরে পড়্‌তেই ইটজিগ একজন পাকা ব্যবসাদার হ'য়ে উঠেছিল। পাড়াগাঁয়ে গস্তে বেরিয়ে সে বেশ সস্তায় ছাগল ভেড়া কিন্‌তো আর সেইগুলো জুটিয়ে নিয়ে এসে মিটেল ব্রণের কসাই বরিস্‌এর কাছে বেশ দুপয়সা লাভ রেখেই বিক্রী কর্ত্ত। ফ্রোমেন-দাদার ভাই—সেও পিছিয়ে পড়বার ছেলে নয়। চাঁদনীর নীচে তিন্‌টে গুদামে আমাদের যে পুরানো মাল বোঝাই ছিল সে গুল কি করে সুবিধায় কাট্‌তি কর্ত্তে হয় তা সে ভাল করেই শিখেছিল। আমার বড়ই ইচ্ছা ছিল যে ছেলে দুটোকে কাছের গোড়াতেই রাখি কিন্তু আমার ইচ্ছা থাক্‌লে কি হয়, জীহোভা ঠাকুরের ত একটু দয়া থাকা চাই। আমার বুড়া বয়সের নড়ি সবার ছোট

সাফেনটিকে যে কাছে দেখ্‌তে পাই, এতেই আমার যা কিছু আনন্দ। তার সেই কোঁকড়ান চুল, ডগ্‌ডগে চঞ্চল চাউনি দেখ্‌ছ তো কেমন চট্‌পটে, ঠিক যেন কাঠ বেড়ালীর বাচ্চা। শেষ কালে কেবল এই সুখটুকুই ভগবান আমার জন্য রেখেছেন। ১৮১২ সালের পর থেকে কত ঝড় ঝাপটা যে মাথার উপর দিয়ে গেছে তাহা আর বল্‌বার নয়। কত রকম আশঙ্কা যে মনে হত, তা আর কি বল্‌ব। মন যখন বড় খারাপ হত, এক এক বার বড় দুটিকে বুকে চেপে ধর্ত্তাম্‌ মুখ দিয়ে তখন আর কথা বেরুত না। তারা ভয়ে ভয়ে অবাক হ'য়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাক্‌ত।

আমি দেখে আস্‌ছি যে সম্রাট নেপোলিয়ন বাহাদুর এক্‌ একবার যুদ্ধ যাত্রার পর পারিতে ফেরেন আর অমনি চার পাঁচ লক্ষ মুদ্রা আর দু তিন লক্ষ লোকের ফরমায়েস করেন। এবার আমার মনে হতে লাগ্‌ল কাকেও বাদ দেবেন না, সব শুদ্ধ যমের মুখে টেনে নিয়ে যাবেন। শতর আঠার বছরের ছেলেরাও বাদ পড়্‌বে না। খবর যা পাওয়া যাচ্ছিল তা দিন-কের দিন খারাপ বই ভাল নয়। একদিন আমি ইট্‌জিগ্‌ আর ফ্রমেনকে ডেকে বল্‌লাম, দেখ বাবারা ব্যবসার যা কিছু মারপেচ তা দুজনেই বেশ শিখে ফেলেছ, আর যা একটু আধটু বাকী আছে তা আর শিখ্‌তে ক দিন। আর দু একমাস যদি তোমরা এখানে থাক তাহলে আর দেখ্‌তে হবেনা। তোমাদের নাম লড়ায়ে যাওয়ার ফর্দ্দয় উঠে যাবে, তখন আর পাঁচজনের যে দশা হয়েছে তোমাদেরও তাই ঘট্‌বে। কর্ত্তারা হয়ত একদিন দুদিন তোমাদের মাঠে নিয়ে যাবেন, বন্দুক ছোড়া শিখাবেন তার পর যে রওনা সেই রওনা। বুড়া বাপ মা হাপিত্যেস করে পথের দিকে তাকিয়ে থাক্‌বে, তোমাদের আর দেখতেও পাবেনা আর খবর খবরাও পাবেনা। আমার স্ত্রী সর্‌লে এই কথা শুনে কাঁদিতে আরম্ভ কর্‌লে আর তার দেখা দেখি বাড়ী শুদ্ধ আর সকলে ফোঁপাতে আরম্ভ কর্‌ল। তারা একটু শান্ত হলে পর আমি বল্‌লাম "দেখ এখন এখনই যদি তোমরা হেভার বন্দরের রাস্তা ধরে মার্কিন মুলুকে রওনা হও, তাহা হলে নির্ব্বিবাদে বাহাল তবিয়তে সেখানে পৌঁছে যেতে পার্‌বে। সেখানে গিয়ে তোমরা খাসা ব্যবসা বাণিজ্য কর্‌বে, বেশ দু পয়সা রোজগার কর্‌বে, তার পর যে সাদি কর্ব্বে, ভগবানের আশীর্ব্বাদে তোমাদের আবার ছেলে পুলে হবে, তাদের যেমন লালন পালন কর্ব্বে তেমনি এ বুড়ো বুড়ির জন্যও টাকা পাঠাবে। জানতো ভগবানের আদেশ বাপ মাকে কখনও ভক্তি শ্রদ্ধা করতে ভুলোনা। আমাদের ধর্ম্ম গ্রন্থে আইজ্যাক্‌ যেমন জাকবকে আশীর্ব্বাদ করেছিল বলে লেখা আছে, আমিও তোমাদের তেম্‌নি প্রাণ খুলে অশীর্ব্বাদ কর্‌বো। তোমরা দীর্ঘজীবি হয়ে স্ত্রী পুত্র নিয়ে সুখে ঘরকন্না কর্‌বে।—এখন কি মত কর্চ্ছ, ঠিক করে বলে ফেল।

তারা তখনই মার্কিন যাওয়া স্থির করে ফেল্‌লে। আমি তাদের সারবুর্গ পর্য্যন্ত আগিয়ে দিয়ে এলাম। বুড়ো বাপের আশীর্ব্বাদ নিষ্ফল হয় না। ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন, আমি যা যা বলেছিলাম এখন ঠিক তাই হয়েছে; তারা দুই ভাই ঘর সংসার নিয়ে সুখে রাজত্ব কর্‌ছে। তাদের পাঁচটি কুচো কাচা হয়েছে। আর আমার কোনও কিছু আবশ্যক হলে তখনই তারা টাকা পাঠিয়ে দেয়।

এদের দুই ভাইকে ত রওনা করে দিয়ে এলাম, থাক্‌লেন কেবল আমার শেষ বয়সের অবলম্বন্‌ সেই সর্ব্বের ছোট সাফেন্‌টি। বাপ মায়ে যদি এক ছেলেকে অপরের চেয়ে বেশী স্নেহ কর্ত্তে পারে তা হলে তাদের দুজনাকে যা ভালবাস্‌-তাম তার চেয়ে যেন একেই বেশী ভালবাসি বলে মনে হয়। তারপর আমার মেয়ে রয়েছে জেক্যা, যার সার্ভানে বে দিইছি। জামাইটির নাম বারুম্‌, খাসা ছেলে, যেমন সাহসী তেমনি ভাল মানুষ। এই মেয়েটিই আমার প্রথম সন্তান, তার কল্যাণে আমি এর মধ্যেই নাতির মুখ দেখেছি। খোকার বাপের ঠাকুর্দ্দার নাম ধরে তার নাম রাখা হয়েছে দাভিদ। ভগবানের খেলা দেখ, বুড়াদের কাজ ফুরিয়ে গেলে তাদের সরিয়ে নেন আর তাদের স্থান পূরণ কর্ত্তে পাঠিয়ে দেন এই সব শিশুদের। এবার জেক্যার যে খোকাটি হবে, আমার বাপের নাম ধরে তার নাম রাখ্‌ব এসক্রাম।

১৮১৪ সালে কাল্‌স্‌বুর্গ অবরোধের আগে যা কিছু ঘটেছিল যতদূর স্মরণ আছে সবই তোমাকে বল্‌লাম। এ পর্য্যন্ত সবই এক রকম ভালয় ভালয় যাচ্ছিল কিন্তু প্রায় ছ হপ্তা আগে থেকে সহরেই বল আর পল্লীগ্রামেই বল সর্ব্বত্রই যেন কেমন একটা গোলযোগ উপস্থিত হ'তে লাগ্‌ল। দুঃসময় কি আর অমনি আসে? চারিদিকে জর জারি আরম্ভ হল। যুদ্ধে গিয়ে যারা ক্ষত বিক্ষত হয়েছে তারা সব এই সময়েই দেশে ফিরতে লাগ্‌ল, কারুর বা হাত নেই, কারুর বা পা নেই। প্রায় সব বাড়ীতেই দেখ্‌তাম, এরকম দু পাঁচটির সেবা শুশ্রূষা চল্‌ছে। গত দু বৎসর থেকে জন মজুরের অভাব। আবাদ যে হবে তার আর উপায় নাই। **সব ধরে যুদ্ধে নিয়ে গেছে।** জিনিস পত্রের দাম এমন বেড়ে গেল যে বলবার নয়। আটা, ময়দা, মাছ, মাংস কোন জিনিষটা সস্তায় পাবার যো নেই, মদ পর্য্যন্ত আক্রা হয়ে গেল। আল্‌সেস্‌ লোরেনের কোন জিনিসই আর হাটে আসে না। মহাজনদের মাল সব গুদামেই বোঝাই থাক্‌ল। মাল যদি কাটতি না হয়ে গুদামে পড়ে থাকে তা হ'লে সে মালও যা ধুলা বালিও তাই। দেখে মনে হ'ত অভাব কিছুই নাই কেবল যা দুঃখ অন্ন বস্ত্রের আর ব্যারাম পীড়ার। এর উপর আবার আকাল এসে চারিধার থেকে উঁকি ঝুঁকি মারতে আরম্ভ কর্ল্লে। সে যা হ'ক ভগবান কিন্তু এ দুর্দ্দিনেও আমার দিকে চাইতে ভোলেন নি। নবেম্বরের গোড়ায় খবর পেলাম জেফ্যার আর একটি খোকা হয়েছে আর মা, ছেলে দুজনাই ভাল আছে। শুনে যে আমার কি আনন্দ হল তা আর কি বল্‌ব। আমি তখনই সার্ভান যাব বলে বেড়িয়ে পড়লাম। ফিট্‌জ তুমি অবশ্য বুঝতে পেরেছ যে শুধু মেয়ের আর একটি পুত্র সন্তান হয়েছে বলেই যে আমি এত খুসি হয়েছিলাম তা নয়। এই নাতিটির কৃপায় আমার জামাইকে যে যুদ্ধে গিয়ে অপঘাতে মর্ত্তে হবে না এতেই আমার এত আহ্লাদ। আমার বাক্স বাবাজীর বরাৎটা মোটের উপর ভালই বল্‌তে হয়। মন্ত্রি সভার যোগে সম্রাট বাহাদুর যখন হুকুম জারী করেলন যে যারা বে করেনি তাদের সকলকেই যুদ্ধে যেতে হবে। ঠিক তার দুদিন আগেই বাকথের সঙ্গে আমার জেফ্যার বে হয়ে গেছে। তার পর যখন হুকুম হল, যাদের ছেলে পিলে নেই তারাও যুদ্ধে যাবে, তার পূর্ব্বেই তার প্রথম ছেলেটি ভূমিষ্ঠ হয়েছে। তারপর যুদ্ধটা খারাপ যাচ্ছে দেখে যখন কর্ত্তারা হুকুম জারী কর্ত্তে গেলেন যে এক ছেলের বাপও বাদ যাবেন না, ঠিক সেই সময় এই ছোট নাতিটির জন্ম হ'ল। বল দেখি বাবা এতে আনন্দ হয় কি না হয়! তখনকার কালে দু পাঁচটি ছেলে থাকা পরম সৌভাগ্য বল্‌তে হবে। তা না হ'লে আর কিছুতেই কাটাকাটির ভেতর অপঘাত থেকে বাঁচবার উপায় ছিল না। কাজেই সে সময় পুত্রের উপর যত দরদ আর কিছুর উপরই তত দরদ হওয়ার কথা নয়। সেই জন্যই আমি শুনবা মাত্র দেরী না করে লাঠি গাছটা হাতে নিয়ে বেড়িয়ে পড়্‌লাম। ভাবলাম, যাই গিয়ে দেখে আসি নাতিটা কেমন হ'য়েছে। যদি দেখি "মঙ্গলের বাচ্ছার" মত মোট্টা সোটা বলিষ্ঠ হয়ে থাকে তা হ'লে বুঝবো তার বাপও এ যাত্রা রক্ষা পেয়ে গেল। কিন্তু পথে যেতে যেতে যা সব দৃশ্য দেখ্‌তে পেলাম, ভগবান যদি আরও বিশ বছর বাঁচিয়ে রাখেন তা হ'লেও তা ভুল্‌তে পারব না। বোঝ বাবা, এক বার—কাত্রভাঁ থেকে সার্ভান পর্য্যন্ত লম্বা গাড়ীর সার চলেছে। সব গাড়ী ব্যারামী আর ঘা ওয়ালা সেপাইয়ে ভর্ত্তি। **আল্‌সাসের যে সব চাষা ভুষাদের গাড়ী ধরে, জোর জাপট করে এই সব অভাগা সেপাইদের সঙ্গে দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল তারা রাত্রেই জোট করে ঘোড়া খুলে নিয়ে গাড়ী টাড়ী ফেলে দৌড় দিয়েছে।** খোলা মাঠ সারা রাত্রের হিম আর বরফ তাদের উপর দিয়ে গিয়েছে। যে যেখানে ছিল তেমনি হ'য়ে পড়ে রয়েছে, একটু সরতে নরতে পারেনি। এ যেন প্রকাণ্ড একটা গোরস্তানের লম্বা মিছিল চলেছে। দেখলাম হাজার হাজার কাকে কাল মেঘের মত আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। তারা সন্ সন্ শব্দে পাখা নেড়ে বেগে উড়ে যাচ্ছে

আর এক সঙ্গে বিকট কা কা করে চারিদিক কাঁপিয়ে তুল্‌ছে। সংসারে যে এত অগুন্তি কাক আছে আমি না দেখলে তা কখনও বিশ্বাস কর্ত্তে পারতাম না। কাকগুলা এসে সেই মড়া বোঝাই গাড়ীর উপর বস্‌ছিল আর কাছদিয়ে কোনও লোকের যাতায়াতের সাড়া পেলেই তারা 'বন্‌ফস্তানে'র জঙ্গলের দিকে উড়ে যাচ্ছিল না হয় 'দানের ভাঙ্গা মঠ বাড়ীর ছাদের উপর গিয়ে বস্‌ছিল। আমি সেখানটায় খুব পা চালিয়ে চলে যেতে লাগ্‌লাম। মনে হতে লাগ্‌ল যেন কত সব ছোঁয়াচে রোগ পেছন থেকে তাড়া করে আস্‌ছে। ভাগ্যে সেবার ফাল্‌সবুর্গে শীতটা একটু সকাল সকালই পড়েছিল। সিয়িবার্গ হয়ে নির্ম্মল পাহাড়ে হাওয়া হু হু করে বইতে আরম্ভ কর্‌ল, সেই হাওয়ায় যত রোগের বীজ উড়িয়ে নিয়ে গেল। তা নইলে মহামারীর হাত থেকেও বাঁচা কঠিন হ'ত। শুন্তে পাই নাকি মাঝে মাঝে কাল পেলেগ্‌ও দেখা দিইছিল। নবেম্বর মাসের প্রথম দিকে যখন লিপ্‌জীক সহর থেকে এরা হটে আস্‌ছিলেন এসব সেই সময়কার ব্যাপার। যাক্‌ সার্ভান ত অনেক কষ্টে পৌছান গেল, গিয়ে দেখি মহা গোলমাল সহরটা সেপাই, সান্ত্রি, বন্দুক, কামান, গোলন্দাজে, ঘোড় সওয়ারে ভর্ত্তি। আমার মনে পড়ে যে, বড় রাস্তার ধারে একটা সরাইখানার জানালাগুলো সব খোলা ছিল। ভেতর দিকে দেখা যাচ্ছিল একখানা লম্বা টেবিল পাতা রয়েছে। তার উপর খাসা ধোপ দোস্ত চাদর বিছান। খাবার জিনিষ থরে থরে সাজান রয়েছে। বড় ঘরানাদের নিয়ে যে একটা ফৌজ করা হয়েছিল সেই দলের কতকগুলি ছেলে এই পথ দিয়েই ফিরে যাচ্ছিল। বাহিরে থেকে সেই লম্বা টেবল আর খাবার দাবার আয়োজন দেখেই তারা সবাই টক্‌ টক্‌ ঘোড়া থেকে নেবে পড়েছিল। হোটেল ওয়াল্লাটি তেমনি একটি তক্ষক লোক, সে প্রত্যেকের কাছে আগাম আগাম খোরাকীর খর্চ্চা আদায় করে নিয়েছিল। তার পর বাছারা যেই খেতে বসেছে, অমনি হোটেলের একজন ঝী পেছন থেকে দৌড়ে এসে"ওই প্রাসিয়ানরা এল"বলে চীৎকার করে উঠ্‌ল। যেই চেঁচান আর অমনি সকলে লাফিয়ে উঠে সওয়ার হয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দেওয়া। কোথায় প্রাশিয়ান তার ঠিক নাই, পেছন ফিরে দেখবারও কারুর অবসর হ'ল না। শুন্তে পাই, হোটেলওয়ালা আগে এমনি করে একবারকার খাবার বিশবার বিক্রী করেছিল। এ ত ব্যবসা নয়, রীতিমত ডাকাতি। আমার কতবার মনে হচ্ছিল যে, এই সব জোচ্চোর বেটাদের ধরে নিয়ে গিয়ে লট্‌কে দেওয়া ছাড়া এ রকম বদমায়েসীর আর কোনও ঔষধ নাই। সেই দিনকার সেই ব্যবহার দেখে আমার সর্ব্বশরীর ঘৃণায় ভরে গিয়েছিল। আমার যদি ক্ষমতা থাক্‌ত তা হ'লে সেদিন বাকি যা কিছু নজরে পড়েছিল তার একটা ছবি একে তোমার সামনে ধরে দিতাম। সেই ব্যারামী সেপাইদের মুখের চেহারা, তাদের শুয়ে থাক্‌বার ভঙ্গী, তাহাদের সেই রোগ যন্ত্রণার চীৎকার আর যারা হাপসে পড়ে আর হেঁটে যেতে পার্চ্ছিল না কিন্তু যাদের জোর করে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সেই অভাগাদের চোখের জল, এসব যতই বল্‌ব ততই কথা বেড়ে যাবে। শুনে তোমাদের আরও গা শিউরে উঠবে। থাক্‌, আর কাজ নাই! একটি কথা আমি কখনও ভুলতে পার্‌বনা। তানেরির সেই পুরান সাকোটার পাথরের উপর মাথা রেখে একজন অল্প বয়সী সেপাই শুয়েছিল। ভাল ঘরের ছেলে, বয়স সতর আঠারর বেশী হবে না। সে মাঝে মাঝে উঠবার চেষ্টা কর্‌ছিল আর তার কাল ঝুলের মত একখানি হাত তুলে দেখাচ্ছিল। বুঝ্‌লাম, পিঠে গুলি লেগে হাত দিয়ে বেড়িয়ে গেছে বেচারা বোধহয় গাড়ী থেকে কি করে পড়ে গিয়েছিল, তার কাছে কেউ এগুতে সাহস করছিল না। সকলেই বল্‌ছিল ওর ভীষণ ছোয়াছে রোগ। কি যন্ত্রনা কি কষ্ট! বলব কি মনে কর্ত্তেও ভয় হয়। যাক্‌ সে কথা। সে দিন আর এক ব্যাপার ঘটেছিল, তা তোমাকে এখনও বলা হয়নি। বুঝ্‌লে ফ্রিজ, একদম বড় জাদরেল মার্শাল ভিক্টরের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

আমার বাড়ী থেকে বার হতে একটু দেরী হয়েছিল। যখন কাল্‌সবুর্গ গিয়ে পৌছালাম তখন রাত্রি হয়েছে। বড় রাস্তা ধরে যাচ্ছি, এমন সময় দেখলাম, সলেই হোটেলে মহা

ছিল। প্রত্যেক জানালা দিয়ে আলো আস্‌ছে। দুজন সেপাই বাহিরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। বড় বড় সব কাপ্তেন সাহেবরা রঙ বেরঙের উর্দ্দি পরে অনবরত যাচ্ছে আস্‌ছে। বাহিরে দেওয়ালের আংটায় মস্ত মস্ত ঘোড়া বাঁধা। হোটেলের উঠানটা প্রকাণ্ড। তারই এক পাশে এক খানি ঘোড়ার গাড়ী দাঁড়িয়ে ছিল। সব প্রস্তুত। লণ্ঠন দুটো যেন প্রোজ্বাতি তারার মত জলছিল। পাহারা-ওয়ালারা রাস্তা থেকে সব লোক সরিয়ে দিচ্ছিল। আমার কিন্তু না গেলেই নয়। জামাই বাড়ী সেখান থেকে আরও অনেকখানি আগে। আমি সেই ভিড়ের ভিতর দিয়ে হোটেলের সামনে পর্য্যন্ত এগিয়েছি, অমনি একজন সেপাই "হট্ যাও" "হট্ যাও" করে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো। এমন সময় তাদেরি একজন উপরওয়ালা এসে হাজির। গোঁটে জোয়ানগুলি কাঁটার মত শক্ত। কটাশে গোছ গালপাট্টা দাড়ী। খিলেনওয়ালা ফটক দিয়ে বের হতেই আমাকে দেখে চীৎকার করে বল্‌লে "আরে মোয়াস, তুই এখানে এলি কোত্থেকে, কত দিনের পর যে তোর সঙ্গে দেখা! তবু-সাক্ষাৎটা হলো সেও ভাল। এই বলে সে আমার হাত চেপে ধরল। আমি ত একেবারে আকাশ থেকে পড়্‌লাম। মস্ত একজন জাঁদ্‌রেল গোছ লোক আমার মত সামান্য মানুষের হাত ধর্‌ছে এ রকম ত বড় দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। আমি অবাক হয়ে তার পানে চেয়ে থাক্‌লাম। একটু দম ধরতেই তাকে চিন্‌তে পারলাম। সে আমাদের জিমার্ন, এখন ফৌজে চাকরি করে। বড় কেও কেটা নয়, একটি দল সেপাইএর রীতিমত সর্দ্দার। পয়ত্রিশ বৎসর আগের কথা আমার মনে পড়তে লাগ্‌ল। আমরা তখন এক সঙ্গে "গেনোদে" পণ্ডিতের পাঠশালে পড়তাম। তখন ছেলে বুদ্ধিতে গড়ের ধারে, কেল্লার মাঠে মাঠে, সহরের রাস্তায় দুজনে কত যে দুরন্ত-পনা করে বেড়িয়েছি তা আর বল্‌বার নয়। কিন্তু এই দেখার পর জিমার্ন ভায়া আরও কয়বার ফাল্‌সবুর্গ হয়ে গেছেন কিন্তু পুরানো মিতেটিকে আর একটি বারও মনে পড়েনি।

জিমার্ন আমার হাত ধরে একগাল হেঁসে বল্লে "আর এদিকে আয়, আজ তোর সঙ্গে বড় জাদ্‌রেল সাহেবের দেখা করিয়ে দিই"। যেই বলা আর কথাবার্ত্তা কওয়া নেই, একদম্ আমাকে হিড় হিড় করে টান্‌তে টান্‌তে মস্ত একটা হল্ ঘরে নিয়ে উপস্থিত কর্‌লে। সেখানে ফৌজের যত কর্ত্তা ব্যক্তিদের আড্ডা। দুখানি টেবিল পাতা তার উপর গোটা দুই লণ্ঠন আর কতক গুলো বোতল সাজান। একরাশ জাদ্‌রেল কর্ণেল, কাপ্তান সাহেবরা খাসা খাসা পোষাক পড়ে হয় কছমের টুপি মাথায় দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কারুর বা টুপি লাল, কারুরই বা পালক লাগান আর কারুরই বা মাথায় ফলক লাগান ইস্পাতের "মাথাল" হেলমেট। কোমর থেকে সব তরোয়াল কিরীচ ঝুল্‌ছে, উর্দ্দির উঁচু কলারে প্রায় কান পর্য্যন্ত ঢাকা পড়েছে। কেউ কেউ বা দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বার্ত্তা কচ্ছেন, খাবার দেওয়া হলেই খেতে বসে যাবেন। সকলকেই যেন কিন্তু মন্‌মরা মন্‌মরা বোধ হতে লাগ্‌লে।

এসব লোকদের ভিতর দিয়ে যেতে তোমাদের আমাদের সাহস হয় না কিন্তু করি কি। জিমার্ন তো হাত ছাড়েনি, আপন মনে টেনে নিয়েই চলেছে। শেষে আমরা একটা ছোট দরজার কাছে গিয়ে পোঁছালাম। ঘরের ভিতরের উজ্জল আলো দুয়ারের ফাঁক দিয়ে বার থেকেই দেখা যাচ্ছিল। আমরা দুজনেই ঘরে ঢুক্‌লাম, বেশ উচু ঘর। পাশের বাগানের দিকে গোটা দুই জানালা খোলা রয়েছে। মার্শাল বাহাদুর সেই ঘরেই ছিলেন দেখ্‌লাম খালি মাথায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তিনি মুখে মুখে যে সব হুকুম দিয়ে যাচ্ছিলেন আর দুই জন লোক তা লিখে নিচ্ছিল। আমার মনের অবস্থা তত ভাল ছিল না, সেই জন্য আর বেশী কিছু লক্ষ্য কর্‌তে পারিনি। আমরা ঘরে ঢুকতেই মার্শাল আমাদের দিকে ফিরে দাঁড়ালেন। আমি দেখ্‌লাম তাঁহার চেহারা অনেকটা লবেন জেলার চাষা ভূষাদের মত। বেশ লম্বা চৌড়া লোক। বয়স প্রায় পঞ্চাশ আন্দাজ। মাথায় চুলে পাক ধরেছে। বয়সের হিসাবে শরীরটা খুব মজবু

বলেই বোধ হল। জিমার্ন কুর্নিশ করে বল্‌লে, মার্শাল! এই একজন লোক ধরে এনেছি। জাতি শত্রু এ। আমাদের সঙ্গে একত্রে পাঠশালে পড়তো, গত ত্রিশ বছর গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আল্‌সাস্ লোরেনের কোনও জয়গাই এর জান্‌তে বাকী নাই। মার্শাল কাছের গোড়া থেকেই আমাকে এক নজর দেখে নিলেন। আমি তখন মোটে হাত চারেক দূরে দাঁড়িয়ে টুপিটা হাতেই ছিল, কেমন যেন বাধ বাধ ঠেকৃতে লাগ্‌ল। তারপর কেরাণীদের কাছ থেকে কাগজগুলি নিয়ে নাম দস্তখৎ করে আমার দিকে চেয়ে বল্‌লেন "আচ্ছা মুরুব্বি, সেই গত বারকার লড়াইএর কথা লোকে কি বল্‌ছে বলত? পাড়াগাঁয়ে কি রকম শুন্‌তে টুন্‌তে পাও?"

'মুরুব্বি' কথাটা শুনে আমার একটু সাহস হল। আমি বল্‌লাম "ছোঁয়াচে জ্বরে লোকে ভারি কষ্ট পাচ্ছে। কেও এখনও নির্ভরসা হয়নি। সকলেই জানে সম্রাট বাহাদুর যখন এত ফৌজ নিয়ে কাছের গোড়াতেই রয়েছেন"—আমার কথা শেষ না হতেই তিনি যেন একটু বিরক্ত ভাবে বাধা দিয়ে বল্‌লেন সে থাকৃগে, তারা আত্মরক্ষা করতে চায় কিনা তাই বল'আমি বল্‌লাম আল্‌সেস লোরেনের লোকেরা সম্রাটকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, তাঁর জন্ত তারা যথা সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন কর্‌তে প্রস্তত। তারা নিশ্চয়ই প্রাণপণে দেশরক্ষা কর্‌বে।" আমি নিজেকে বাঁচিয়ে কথা কয়টা বল্‌লাম বটে কিন্তু আমার মুখের ভাব দেখেই মার্শাল বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন যে, আমি লড়াই ফৈজদ বড় ভালবাসি না। সেই জন্তই বোধহয় মুখ টিপে হেসে বল্লেন "আচ্ছা; কাপ্তেন, এতেই হ'বে এখন।" কেরাণীরা ফের আবার লিখ্‌তে আরম্ভ কর্‌লে, জিমার্ন আমাকে ইসারা কর্ত্তেই আমি তার সঙ্গে বার হয়ে এলাম। বাহিরে বেড়িয়ে জিমার্ন বল্‌লে "যা মোয়াস ভালয় ভালয় কুটুম বাড়ী যা"। সেবার আর পাহারায় আমাকে রুখ্‌লে না, আমি সোজা পথ ধরে চলে গেলাম। একটু পরেই বারুথের দরজায় পৌঁছিলাম। বারুথের বাড়ী বড় পাদরীদের যে আস্তাবল ছিল তারই পেছনে একটা ছোট গলির ভেতর। কি আঁধার রাত! আমি কয়েকবার দুয়ারে ঘা দিয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম। পথের সেই সব ভয়ানক দৃশ্য দেখার পর আপনার জনের কাছের গোড়ায় এসে প্রানটা বেশ ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছিল। বুক আর সে রকম ধর্‌ ফর্‌ কর্‌ছিল না।

দেখ ফ্রিজ, এই সব গায়ের জোরে লড়ালড়ি, এই সব যুদ্ধ জেতার অহঙ্কার, যা হ'তে সংসারে এত কষ্ট—এ সবই তখন আমার কাছে নিতান্ত তুচ্ছ জিনিস বলে মনে হচ্ছিল। দুই এক মিনিটের মধ্যেই জামাই গলির দরজা খুল্‌ছে শুন্‌তে পেলাম। বারুথ জেক্যাকে আমার জন্ত বেশীক্ষণ বসে থাক্‌তে হয়নি।

বারুথ বল্‌লে "বাবা এলেন নাকি?"

আমি বললাম "হাঁ আসতে বড় দেরী হ'ল পথে, আটকা পড়েছিলাম।" 'ভিতরে আসুন'।

আমরা খিড়কির রাস্তা দিয়ে ভিতর বাড়ীতে—যেখানে আমার জেক্যা শুয়েছিল সেই ঘরে গিয়ে উঠ্‌লাম। ধপ্‌ ধপে চাদর বালিশের জন্য মেয়েটার রং ফ্যাকাশে ফ্যাকাশে বোধ হচ্ছিল বটে কিন্তু মুখে আর হাসি ধরে না। আমার স্বর শুনে সে আমাকে আগেই চিন্‌তে পেরেছিল। আমি কাছে গিয়ে তাকে বুকের কাছে টেনে নিলাম। মনে যে তখন আমার কি আনন্দ, কথায় তা কি বল্‌ব। কোলের নাতিটি কেমন হ'ল দেখবার জন্ত এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলাম, শেষে দেখি যে জেক্যার কোলেই গায়ের চাঁদরে ঢাকা রয়েছে।

জেক্যা বল্লে বাবা এই যে খোকা। কেমন হয়েছে দেখুন।

খোকার গায়ে পা পর্য্যন্ত একটা জামা পরান ছিল। আমি দেখেই বুঝতে পারলাম, নাতিটি বেশ গোল গাল নিরোগী হয়েছে। হাত দুটি জোর করে মুঠি বেধে রয়েছে। বল্‌লাম, "বারুথ্‌ এযে দেখছি আমার বাপ এসড্রাস আবার ফিরে এসেছেন, মঙ্গল হোক্‌ মঙ্গল হোক্‌। আমার ইচ্ছা হল যে খোকাকে একবার কাপড় চোপড় খসিয়ে দেখি। আমি

তার জামাটা খুল্‌তে লাগলাম। সাত ডালওয়ালা বাতি দানে সাতটা বাতি জলছিল। ঘরের ভিতরটা বেশ গরমই ছিল। জামা খুলতে গিয়ে আমার হাত কাঁপতে লাগল। তাই দেখে আমার মেয়ে তার সেই রক্তশূন্য হাত দুখান দিয়েই আমাকে সাহায্য করতে লাগল বল্লে দাঁড়ান বাবা, দাঁড়ান, আমিই খুলে দিচ্ছি এখন, আমার জামাইও পেছনে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছিল। আমাদের সকলেরই চোখ ছল ছল করছিল। গায়ের জামা কাপড় সব খোলা হ'লে পর দেখলাম, খাসা গোলাপ ফুলের মত রং, চওড়া বুক, মাথাটিও বেশ বড়—একদিকে কাত হ'য়ে রয়েছে। গোলগাল পা দুখানিতে মল পরান। পিঠ মাজা সব মানান সই। খোকা তখনও জেগে উঠেনি। আর জন্মের ঘুমের ঘোর তখনও চোখে লেগেছিল। তাকে মাথার উপর তুলে নিলাম। ইচ্ছা হ'ল আমাদের প্রভুর মন্দিরে দাযুদের মত নাম কীর্ত্তন করতে করতে নাচি আর মুক্তকণ্ঠে গাইতে২ ভগবানের দাস দাসীদের ডেকে বলি—

ওরে আয় তোরা কর্ সবে বিভু গুণ গান
কর তাঁর মহিমা কীর্ত্তন
আসন্ধ্যা সকাল সে নামের বিরাম দিবি
কখন বল

মঙ্গলময়ের মঙ্গলের সে অন্ত নাইরে
সকল জাতির কর্ত্তা তিনি আকাশেরও
উর্দ্ধে তিনি

কার সঙ্গে দিবিরে তাঁর তুলনা
বল্ না ভাই কেমন করে করবি রে তাঁর তুলনা
কাদা ধুলা থেকে ছেলে তিনি টেনে লন কোলে
তাঁর কৃপা হলে বন্ধ্যা নারী দেখে পুত্র মুখ
আয় সবে গাই তাঁর নাম—

সত্য বল্‌ছি ক্রিজ মনে হ'ল বটে, এমনি করে ভগবানের নাম গান করি কিন্তু পোড়া মুখে তা বার হ'ল কই, শুধু বল্‌লাম "খাসা খোকা হয়েছে। খাসা গড়ন দীর্ঘজীবি হয়ে আমাদের জাতির মুখোজ্জ্বল করবে, বুড়া বয়সে এ হ'তে একটু সুখের মুখ দেখতে পাব।"

তারপর খোকাকে তার মায়ের কাছে দিয়ে ঢেকে ঢুকে রাখতে বলে ঘড়টিকে একবার দেখ্‌তে গেলাম। দেখ্‌লাম সে তার খাটটিতে শুয়ে অঘোরে ঘুম দিচ্ছে। আমরা আনন্দে পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ বসে রইলাম। বাইরে সব ঘোড়া যাচ্ছে। সৈন্য সামন্তরা চীৎকার কর্‌ছে, ঘড় ঘড় শব্দে কত সব গাড়ী চলেছে। ভিতরে সব শান্ত সব স্থির। মা শুয়ে নির্ভাবনায় ছেলেকে মাই দিচ্ছে।

দেখ ক্রিজ বড় বুড়া হয়ে পড়েছি। দূর অতীতের জিনিস যেন সে দিনকার ঘটনার মত চোখের সামনে ঘোরে। মনে হলেই বুকের কাছটা কেমন করে ওঠে। ভগবান আমাকে যথেষ্ট দয়া করেছেন, আমি সর্ব্বদাই সে জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিই। দেখ তাঁর কৃপায় এই দীর্ঘকাল বেঁচে রয়েছি, এই বয়সেই তিন পুরুষের মুখ দেখ্‌লাম কিন্তু এতেও আমার আশ মেটেনি যদি তাঁর দয়া হয়, ইচ্ছা হয় বেচে থেকে আরও দুপুরুষের মুখ দেখে যাই।

ইচ্ছা ছিল সেই সোলেই হোটেলের ঘটনার কথা এদের বল্‌বো কিন্তু আমার তখনকার আনন্দের কাছে এসব ব্যাপার নিতান্ত তুচ্ছ বলে মনে হয়েছিল। শেষে জেফ্যার ঘর থেকে বার হলে পাছে তার ঘুমের ব্যাঘাত হয় সেই জন্য পাশের একটা ঘরে গিয়ে দুই এক গ্রাস খেয়ে নিয়ে বারুখকে সকল কথা প্রকাশ করে বল্‌লাম। সে ত শুনে অবাক্। আমি বল্‌লাম, "শোন বাবা আমাকে সে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, লোকেরা আত্মরক্ষা করবে কিনা, এর মানে বুঝেছো তো। বেশ বোঝা যাচ্ছে, শত্রু পক্ষেরা এদের তাড়া করে আস্‌ছে হয়তো ক্রোশ পঞ্চাশের মধ্যেই এসে পড়েছে। এঁরা বোধ হয় তাদের আট্‌কাতে পারবেন না তাঁরা ফ্রান্সে ঢুকে পড়্‌বে।

দেখ আমাদের আনন্দের মধ্যেও সম্মুখে কত বিপদ কত কষ্ট ঘনিয়ে আসছে। কত ভয়ের কারণ রয়েছে। আমাদের দেশের লোকেরা এই দশ বৎসর ধরে অপর জাতির উপর যে অত্যাচার করেছে, এখন তারা আর প্রতিশোধ নিতে আসছে। আমার মনে হয়—থাক্ ভগবান করুন আমার এ ধারণা যেন ভুলই হয়। এই কথা বর্ত্তার পর আমরাও শুতে গেলাম। তখন রাত্রি আন্দাজ এগারটা, বাইরে তখনও খুব গোলমাল চল্‌ছে।

শ্রীগুরুদাস সরকার।

এস।

১

এস নূতন করিয়া পরাণে মম
ওগো নিতুই-নব বধূ,
এস হাসির জোছনা ছড়ায়ে আননে
অধরে ঢালিয়া মধু!
এস পুষ্পিত করি', হে চির-ঈপ্সিত,
হৃদয় নিকুঞ্জ মম,
এস স্নিগ্ধ পরশে জুড়ায়ে অঙ্গ
মলয় মারুত সম।

২

আজ আমায় রাতের গোপন গেহে
শিথিল সরম পাশ
কামিনী হেনা রজনী গন্ধা
খুলেছে বুকের বাস!
হের সুরভি-আকুল বকুল বিতানে
পবন মাতোয়ারা—
এস নন্দনে মোর ছুটায়ে ত্বরিৎ
রসের ফোয়ারা!

৩

শোন নিশীথ রাতে ভরিয়া আকাশ
পাপিয়া ধরেছে তান,
'বৌ কথা কও' সাধিয়া সারা,
করবে কে আর মান!
ওগো পাখীর গানের তরল ধারায়
গলিয়ে গিয়ে, সাধ—
বহিয়ে যাই তোমার পানে
ভাঙিয়া সকল বাধ!

৪

সখি, এমনি রাতে তোমায় আমায়
প্রথম পরিচয়;
সেদিন হ'তে জীবন আমায়
তব পরশ-সুধাময়!
তবু সত্যি কি সে মোদের, প্রিয়ে,
প্রথম মিলন রাতি?
তুমি নও কি আমার শত জনমের—
যুগ যুগান্তের সাথী?

৫

ছিলাম না মোরা যুগল বিন্দু
ক্ষীরোদ সিন্ধু নীরে?
যুগল কণিকা আদিম প্রাতের
সোনার অরুণ করে?
তৃণের গুচ্ছে, তরু লতিকায়
সোহাগ আবেষ্টনে?
চঞ্চু পুটের স্পর্শ লাভী
ক্রৌঞ্চ মিথুনে?

৬

মোরা দেখিনি কি দোঁহে প্রেমের আরতি
পঞ্চবটীর মূলে ?
আবার ফেলিনি অশ্রু নির্ব্বাসিতার
দুঃখে তমাসা কূলে ?
দেখিনি কি মোরা উতলা গোপিনী
গোকুল বৃন্দাবনে ?
যমুনা লহরী বহিতে উজান
শ্যামের বাঁশীর তানে ?

৭

আর দেখিনি দুজনে রুদ্রের শোক
মুগ্ধ বিস্ময়ে,
বিশ্ব টলায়ে প্রলয় নৃত্য
সতীর দেহ লয়ে ?
কাঁদি নাই মোরা বেহুলা যবে
স্বামীর শব কোলে
না হ'তে ভোর বাসর রাতি
ভাসিল অকূল জলে ?

৮

মোরা তখনো ছিনু এখনো আছি
এসেছি কতবার,
স্বর্ণ সূত্রে সুচির গাঁথা
ভাগ্য দুজনার !
ফুটেছি মোরা কতই রূপে
অনাদি কাল হ'তে,
আরো কতবার আসিব যাব
ভাসিয়া কালের স্রোতে !

৯

সখি, সেদিন মোদের নতুন দেখা
নাহিক লাগে মনে,
খুঁজিয়া শুধু পেয়েছিলেম
হারানো রতনে !
চির বসন্ত আসিয়াছিল
নব হরিতে সাজি',
শুধু নতুন তারে পুরানো সুর
উঠিয়াছিল বাজি' !

১০

তবে এস আজ মোর পুরানো বধূ
নূতন আবাহনে,
নিবিড় করি ধরিব তোমায়
নব আলিঙ্গনে !
আজ চির দেবতায় নূতন পূজা
করিব নব বর্ষে
সুপ্ত স্মৃতি জাগায়ে তুলি'
ফুটায়ে নব হর্ষে !

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী ।

"রক্তমোক্ষণ ও শিরা বিদ্ধকরণ প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনার প্রতিবাদ।"

গত পৌষ মাসের প্রতিভা পত্রিকায় শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন দাস মহাশয়ের পূর্ব্ব লিখিত প্রবন্ধের শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র সরস্বতী মহাশয় একটী বিস্তৃত আলোচনা বা দোষানুসন্ধান প্রকাশ করিয়াছেন দেখিতে পাইলাম। মোহিনীমোহন দাস মহাশয়ের মূল প্রবন্ধের "কপি" অতি অস্পষ্টভাবে লেখা থাকার জন্য এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের কতগুলি বিশেষ শব্দ প্রয়োগ থাকায় মাননীয় শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় প্রবন্ধটি প্রমাদশূন্য করিবার ইচ্ছায় প্রবন্ধ লেখকের নিকট প্রুফ দেখিবার জন্য প্রেরণ করেন কিন্তু দৈব দুর্ব্বিপাকে প্রবন্ধ লেখক নিতান্ত ব্যস্ত থাকায় জন্য উহা একবার দেখিবারও অবকাশ পান নাই এদিকে বিলম্ব হওয়ার জন্য উক্ত প্রবন্ধ প্রুফ সংশোধিত না হইয়াই মুদ্রিত হইয়াছে এবং এই জন্যই প্রতিভার মত কাগজেও এত ভুল রহিয়া গিয়াছে। ইহা যথার্থ ই দুঃখের কারণ সন্দেহ নাই কিন্তু আমাদের সরস্বতী মহাশয় এই লঘু পাপে নিতান্ত গুরু দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন দেখিয়া সত্যই আমরা অবাক হইয়া গিয়াছি। এই প্রুফ সংশোধনের জন্য একটী সরস্বতীর প্রতিভা খরচ না করিয়া একজন প্রুফ-রিডার দ্বারা সে কাজ চলিতে পারিত। সরস্বতী মহাশয় যে ভ্রমের তালিকা দিয়াছেন তাহা যে কোন্ জাতি দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, ইহা মুদ্রাকর প্রমাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। সরস্বতী মহাশয়ও মুদ্রাকর প্রমাদের কথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার প্রবন্ধ দেখিলেই বোঝা যায় কিন্তু তাহা স্বীকার করিলে যে কলহ করা হয় না।

আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য বশতঃ বহুকাল হইতে কায় চিকিৎসা ও অস্ত্র চিকিৎসা বিচ্ছিন্ন হইয়া পরিয়াছে। কায় চিকিৎসক যাহারা, তাহারা অস্ত্র চিকিৎসকদের ব্যবহারিক প্রণালীর কিছুই অবগত নহেন। এমন কি একটী ক্ষত স্থান বন্ধন প্রণালীও তাহারা অভ্যস্ত নহেন বা একখানা প্রাচীন অস্ত্রেরও আকার কিরূপ তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন না। যদি তাহা আংশিকও তাহারা জানিতেন তবে ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান আয়ুর্ব্বেদীয় শিক্ষার প্রতিষ্ঠান আষ্টাঙ্গ বিদ্যালয় ও চিকি কলেজে পাশ্চাত্য অস্ত্রচিকিৎসা বিজ্ঞানের সহায়তা গ্রহণ করিতে হইত না। বস্তুজ্ঞান না থাকিলে এবং মাত্র কেতাবী বিদ্যা নিয়া যাহারা বসিয়া থাকেন, তাহাদের নিকট যাহা আশা করিতে পারি, সরস্বতী মহাশয়ের নিকট আমরা তাহাই পাইয়াছি। যে বিদ্যার ব্যবহারিক ক্রিয়া সরস্বতী মহাশয়েরা বহু পুর্ব্বে ছারিয়া দিয়াছেন সে সম্বন্ধে কোন আলোচনা করা বোধহয় আরও একটু অধ্যবসায় সাপেক্ষ। আমরা যতদুর জানি বাংলা দেশে ঢাকার শাখারী বংশ চাঁদসীর চিকিৎসকগণ এবং খোলঘরের চক্ষু চিকিৎসকগণই মাত্র প্রণালীবদ্ধ ভাবে নিয়ম অনুযায়ি অস্ত্র চিকিৎসা করিয়া থাকেন। ইহারা শত শত বৎসর যাবত এই চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়া আসিতেছেন। ইহার মধ্যে চাঁদসীতে আজ প্রায় ৩॥০ শত বৎসর যাবত আতুরালয় প্রতিষ্ঠিত থাকায় বর্ত্তমানে হাসপাতালে যেরূপ ব্যবহারিক শিক্ষা হইয়া থাকে, ইহারাও সেই প্রণালীতে প্রাচীন চিকিৎসা প্রণালী শিক্ষা পাইয়া থাকে। আবার এখন যদি এই দেশে পুনঃ সেই আর্য্য মতে অস্ত্র চিকিৎসা প্রচলন করিতে হয় তবে ইহাদের নিকট হইতেই ধ্বংশাবশেষ গ্রহণ করিতে হইবে; অন্য উপায় নাই। কাজেই শত শত বৎসর যাহারা নানারূপ অসুবিধার মধ্যে এই বিজ্ঞান রক্ষা করিয়া রাখিয়াছে, তাহারা কি বলে তাহা একবার শান্ত হইয়া শুনিতে হইবে।

ব্যাকরণের তর্কের মধ্যে বস্তুজ্ঞান পাওয়া যাইবে না। যাহারা শত শত বৎসর হইল পৃথক হইয়া গিয়াছে তাহাদের সকল কথা তোমাদের সহিত না মিলিতে পারে। তাহা ছারা দাস মহাশয়ের প্রবন্ধতো অনুবাদ বহে। কেবল অনুবাদের কি প্রয়োজন—ব্যবহারিক জ্ঞান কোথায়? আর একটী কথা—আমাদের দেশের চিকিৎসা শাস্ত্রের বর্ণিত রোগের লক্ষণ তো অনেক সময়ই পশ্চিম দেশীয় চিকিৎসা গ্রন্থের সহিত মিলে না, আবার অনেক স্থলে আশ্চর্য্যরূপে মিলিয়া যায়, এজন্য কি বলিব যে পাশ্চাত্য গ্রন্থ আমাদের শাস্ত্রের নিকৃষ্ট অনুবাদ মাত্র? উহার কোন স্বাতন্ত্র্য নাই।

সরস্বতী মহাশয় সংস্কৃত জ্ঞানের খুব বড়াই করিয়া কয়েক স্থানে চক্ষে অঙ্গুল দিয়া দেখাইয়াছেন যথা—

শিরাব্যাধশ্চিকিৎসার্দ্ধং শল্যতন্ত্রে প্রকীর্ত্তিতঃ।
যথা প্রনিহিতঃ সম্যগ্ বস্তিঃ কায় চিকিৎসিতে॥

ইহার অর্থ মধ্যে লিখিয়াছেন—"পিচকারী ডুস প্রভৃতি দ্বারা মলদ্বারাদি দিয়া ঔষধ প্রয়োগ। ডুস, পিচকারী আর্য্য শাস্ত্রে কোথায় আছে, সরস্বতী মহাশয় জানেন। ইহার পর আবার সরস্বতী মহাশয়ের ইংরাজি শাস্ত্র যথা—'মাথার উপরে খুলির নীচে রোমাবর্ত্তের ন্যায় কতগুলি শিরার একত্র মেলন স্থানকে অধিপতি মর্ম্ম কহে,পাশ্চাত্য ভাষায় ইহাকে Medulla oblengato কহে।" Medulla oblengato মাথার উপরে থাকে? মাথার উপরে খুলির নিচে স্থানটী কোথায়? ইহা ডাক্তার মহাশয়গণই বুঝিবেন।

সর্ব্বশেষে আমরা সরস্বতী মহাশয়ের মত প্রতিভাবান লোককে মাত্র দোষ অনুসন্ধান কার্য্যে ব্যস্ত না থাকিয়া মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশে অনুরোধ করি।

শ্রীগোপালচন্দ্র দত্ত।

"পূর্ব্বোক্ত প্রতিবাদের উত্তর।"

আমার আলোচনার প্রতিবাদ করিতে যাইয়া শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ব্যক্তিগত সমালোচনা করাটা ঠিক হয় নাই। মূল প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে শুধু মুদ্রাকরের দোষ দিলেই" চলিবে কেন? মুদ্রাকর বর্ণ-বিন্যাস ভুল ছাপিতে পারে কিন্তু বিষয়ের পরিবর্ত্তন, বিধি স্থানে নিষেধ বা নিষেধ স্থানে বিধি ছাপিতে পারে না। প্রেস কপি সম্পাদকীয় কার্য্যালয়েই আছে, এ সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ তিনিই ভাল দিতে পারেন।

বাস্তবিকপক্ষে ব্যবহারিক প্রণালী জানা না থাকিলে সুশ্রুত সংহিতার ঐ সব অংশের অনুবাদ করিতে গেলে দাস মহাশয়ের মত বিড়ম্বনা প্রস্তুই হইতে হয়। এই 'রক্ত মোক্ষণ' সম্বন্ধে ১৩২৩ সালের চৈত্র মাসের 'প্রতিভায়' আমি একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, সে প্রবন্ধের প্রুফ আমি দেখি নাই; তাহার মধ্যে "চিকিৎসা শাস্ত্রের কতগুলি বিশেষ শব্দ" ব্যতীত বহু সংস্কৃত শ্লোকও ছিল তাহা কিন্তু সুন্দর মুদ্রিত হইয়াছিল। সেই প্রবন্ধে শিরোগত (মুখের মধ্যের শিরা ব্যতীত) শিরা বেধের যন্ত্রণ প্রণালী ও দাস মহাশয়ের প্রবন্ধের "যে সকল শিরার মুখ শরীরের ভিতরের দিকে, সেই সকল শিরা ব্যতীত মস্তকের অপরাপর শিরা বেধেয়" প্রণালীটা তুলনায় আলোচনা করিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন, ব্যবহারিক প্রণালীটা কোন প্রবন্ধে অনুসৃত হইয়াছে। যাঁহারা কোন দিন শিরোগত শিরাবেধ করেন নাই, তাঁহারা ঐ অংশের মর্ম্মগ্রহণে অক্ষম, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দাস মহাশয়ের প্রবন্ধের ঐ অংশের পুনরায় আলোচনা করিয়া দেখাইতে হইবে, যে তাঁহার ব্যবহারিক প্রণালী সম্বন্ধে কোন জ্ঞান থাকা প্রকাশ পায়

নাই বরং তাঁহার অনুবাদের নিষ্ফল প্রয়াস প্রবন্ধের সর্ব্বত্র বিজৃম্ভিত হইয়াছে। 'অস্তমুর্খ বর্জ্জানাং শিরো গতানাং'; এই মূলটুকু অনুবাদে অসমর্থ। দাস মহাশয় যে শরীরের ভিতরের দিকে শিরার 'মুখ' কল্পনা করিয়াছেন, তিনি ব্যবহারিক প্রণালী দ্বারা বুঝাইতে পারেন কি শরীরের বাহিরের দিকে কোন শিরার 'মুখ' আছে। তার পর "উরুদ্বয় কুঞ্চিত করিয়া জানু সন্ধির উপর হাত রাখিয়া হস্তাঙ্গুলি মুষ্টিবদ্ধ করিয়া গলার দুই পার্শ্বে স্থাপন করিবে।" এই অবস্থাটা দাস মহাশয় দেখাইয়া দিতে পারেন কি? হস্তদ্বয় জানু সন্ধির উপর থাকিলে তাহার অঙ্গুলিগুলি কি করিয়া মুষ্টিবদ্ধ হইয়া গলার দুই পার্শ্বে যাইবে, তাহা বুঝাইয়া দিতে পারেন কি? অনেক সময় আমাদের শিরোগত শিরাবেধ করিতে হয় তাহাতে দশ মিনিট হইতে পনর মিনিট সময়ের দরকার; এ পর্য্যন্ত রোগী 'দম বন্ধ' করিয়া কি প্রকারে থাকিবে তাহা কল্পনা করিয়াছেন কি?

প্রতিবাদকারী বলেন—চাঁদসীর মতে সর্ব্বত্র পুস্তককে অনুসরণ করা হয় নাই। তাঁহারা ব্যবহারিক প্রণালী-দ্বারা অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহাতে আমাদের কোন আপত্য নাই কিন্তু দাস মহাশয় যে ব্যবহারিক প্রণালী অনুসরণ করিয়া উক্ত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা কোন বিজ্ঞ ব্যক্তিই বলিবেন না। অনুবাদ দোষবহন। কিন্তু অনুবাদ করিয়া অস্বীকার করাটা নিতান্ত দোষাবহ। দাস মহাশয়ের প্রবন্ধের প্রথম ৩ পংক্তি ব্যতীত বাকী সবটা আক্ষরিক ও আনুপূর্ব্বিক অনুবাদের চেষ্টা, তাহা মূল পুস্তক যিনি পড়িয়াছেন তিনিই স্বীকার করিবেন। অনুবাদ না হইলে এমন পূর্ব্বাপর ক্রম ও রীতি স্থির থাকিত না। মূলের রীতি এই যে, কোন বিষয় গদ্যে অল্পাক্ষরে বলিয়া শিষ্য ব্যবসায়ার্থ ঐ বিষয় আবার প্রাচীন শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া অনুদিত হইয়াছে। রক্ত রোধের চিকিৎসায় এইরূপ বিরুক্তি আছে, তাহা দাস মহাশয় আনুপূর্ব্বিকভাবে অনুবাদের চেষ্টা করিয়াছেন।

যাঁহারা শস্ত্রচিকিৎসা করেন, তাঁহাদের রক্ত রোধক উপায়গুলি সর্ব্বদা ব্যবহার করিতে হয়। দাস মহাশয়ের প্রবন্ধ পড়িয়া বোঝা কঠিন যে তিনি ঐ প্রণালীতে অভ্যস্ত আছেন। তাহা হইলে 'স্কন্দন' অর্থে "বিপরীত গতি" লিখিতেন না ও 'ভস্মের' দ্বারা পাচন করিতে চেষ্টা করিতেন না। 'মূলে ভস্ম' শব্দের, প্রয়োগ থাকায়ই এই গণ্ডগোল হইয়াছে। তাহার অর্থ যাঁহারা কার্য্য করেন তাঁহারা প্রত্যেকেই জানেন যে ক্ষার বা তদ্বীর্য্যাক্রান্ত কোন পদার্থ লাগাইয়া রক্ত রোধ করিতে হয়। প্রতিবাদকারীকে ১৩২৩ সালের ভাদ্র, পৌষ ও চৈত্র সংখ্যা 'প্রতিভা' পড়িতে অনুরোধ করি, তাহা হইলেই দাস মহাশয়ের ব্যবহারিক জ্ঞানের পরিচয় পাইবেন। *

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র সরস্বতী।

---

* কোনও জটিল বিষয় যথা বিহিত আলোচিত হইয়া প্রকৃত সত্য নির্দ্ধারিত হওয়া সর্ব্বোতভাবে বাঞ্ছনীয়। এরূপ ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়াই আমরা শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র সরস্বতী মহাশয়ের প্রতিবাদ ও তাহার উত্তর প্রকাশিত করিয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আলোচনাটা ক্রমে ব্যক্তিগত সমালোচনায় দাঁড়াইয়াছে। এমতাবস্থায় এই স্থানেই ইহার শেষ হওয়া উচিত। এতৎসম্বন্ধে আর কোনও বাদানুবাদ প্রতিভায় প্রকাশিত হইবে না।

প্রতিভা সম্পাদক।

ঘুঘুর ডাকে।

শরতের শুভ সন্ধ্যা সুন্দর উজল
ঘুঘু কোথা ডাকে,—
সারা চিত্ত হ'ল মোর উদাস পাগল
অন্বেষি' কাহাকে!

গগনে রঙ্গীন মেঘ কুঙ্কুম ছড়ায়
সূর্য্য বসে পাটে,
মৃদুল সমীর ধীরে যেন বলে যায়
"আয় ফিরে বাটে!"

নদী-বক্ষে জেগে উঠে ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণে
করুণ লহরী,—
ফিরে গেছে পল্লী-বালা শান্ত-নিকেতনে
ঘট পূর্ণ করি'!

বিশ্ব যেন পলে পলে কুহেলী আবৃত
স্বপনে মিলায়,
অজ্ঞাত-রাজ্যের কোন্ অজ্ঞাত-সঙ্গীত
ঘুঘু বুঝি গায়!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

জীবের স্বরূপ ও স্বভাব।

আমরা দেহসর্ব্বস্ব জীব; দেহে আমাদের প্রগাঢ় আত্ম বুদ্ধি। আমরা যে দেহ হইতে পৃথক্ জীব কার্য্যতঃ আমরা তাহা বুঝি না। বুঝি না বলিয়াই দেহ সম্পর্কই আমাদের সর্ব্বপ্রধান সম্পর্ক; দেহ সম্পর্ক ব্যতীত যে জগতের সঙ্গে আমাদের আর কোন সম্পর্ক আছে, তাহা মনেও করি না। এজন্য জগতে দেহ সম্পর্ক স্থাপন করিবার নিমিত্তই আমরা অত্যধিক ব্যস্ত; দেহ সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারিলেই আমরা আমাদিগকে কৃতার্থ বোধ করি। দেহ সর্ব্বস্বের পক্ষে দেহ সম্পর্ক জনিত সুখই একমাত্র সুখ। তাই আমরা দৈহিক সুখ সম্ভোগের নিমিত্তই ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়া থাকি।

আমাদের দেহের ভিতরে কয়েকটী ইন্দ্রিয় আছে। দেহের উত্থান পতনের সঙ্গে এই ইন্দ্রিয়গুলিরও উত্থান পতন হয়। ঐ ইন্দ্রিয়গুলির সহিত দেহের নিত্য সম্বন্ধ। উহাদের দ্বারা দেহের রক্ষা হইতেছে কিন্তু দেহকে রক্ষা করিবার ক্ষমতা উহাদের নাই। আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা দৈহিক সুখ সংবিধানেরই নিয়ত চেষ্টা করিতেছি। দেহের সুখের জন্য ইন্দ্রিয় গ্রামকে অনিয়মিত খাটাইয়া হীন ও দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতেছি। সময় সময় দেহ সুখের জন্য ইন্দ্রিয়গুলিকে উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল করিয়া তুলিয়াও থাকি। ইন্দ্রিয় দেহেরই বটে, দেহের সহিত ইন্দ্রিয়গণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধও আছে সত্য, কিন্তু আমরা দেহ সর্ব্বস্ব বলিয়াই দেহ ভিন্ন আমরা কিছু না, দেহ মরিলে আমরা মরিলাম, দেহ বাঁচিলে আমরা বাঁচিলাম, দেহকে সাজাইলে আমরা সুন্দর সুশ্রী হইলাম ইত্যাদি ভ্রান্ত বুদ্ধির বশীভূত হইয়াই ইন্দ্রিয় দ্বারা কেবল দৈহিক মঙ্গলের জন্য, দৈহিক সুখের জন্য আজীবন খাটিয়া খাটিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত হইতেছি। কিন্তু দেহ আমরা নহি। দেহেরও

আমরা নহি, দেহও আমাদের নহে।

আমরা দেহাত্ম বুদ্ধি বলিয়াই দেহের জন্য এত খাটি এত করি। ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা দেহের সুখ সংগ্রহ করি। দেহের খাদ্য সামগ্রী যোগাই, দেহের বস্ত্র অলঙ্কার আহরণ করি। সেই খাদ্য সামগ্রী ও বসন ভূষণের জন্য কত সময় কত গুরুতর অন্যায় ও অকর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া বসি। দেহাত্ম বুদ্ধির ফলেই আমরা হীনভাবাপন্ন হইয়া যেমন ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেই তেমন সংসারেও ঘোর অনর্থ ঘটাইয়া থাকি।

দেহ আমরা নহি, এই বোধ আমাদের নাই বলিয়াই আমরা জগতের কণ্টক হইয়া কেবল দুঃখের সৃষ্টি করিতেছি, দুঃখময় অন্ধকারের সৃষ্টি করিতেছি। কিন্তু ইহা কিছুতেই বুঝিতে চাহি না যে,জগতের দুঃখ সৃষ্টি করা কি দুঃখময় অন্ধকারের সৃষ্টি করা আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য নহে; আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য জগতের সুখের সৃষ্টি করা, জগতে আশা দান করা। আমরা জগতে সুখ দিতে আসিয়াছি, আলো দিতে আসিয়াছি। যে যতটুকু পারি, যতটুকু সাধ্য শক্তি জগতে সুখ দিব, জগতে আলো দিব। যদি না ইহা করিলাম তাহা হইলেই আমরা কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হইয়া মনুষ্যত্বের পদ হারাইয়া ইতর জীবে পরিণত হইলাম। কিন্তু আমাদের দেহসর্ব্বস্বের পক্ষে জগতের হিতার্থে সুখ ও আলো দেওয়া নিতান্তই অসম্ভব। আমরা দেহ ভিন্ন যখন কিছু বুঝি না, তখন দেহকে অবলম্বন করিয়া যাহা করিতে পারি, তাহাই করিয়া থাকি, কাজেই আমাদের দ্বারা জগতের সেই মহান্ কার্য্য কিছুতেই হইতেছে না, আমরাও পশু পদবী ত্যাগ করিতে পারিতেছি। দেহ সর্ব্বস্বের পক্ষে দৈহিক সুখ দৈহিক সম্বন্ধ ত্যাগ করা বড়ই কঠিন। দেহের অভাব দূর করিতে করিতেই দেহ সর্ব্বস্বের সকল শক্তি চূর মার হইয়া যায়।

দেহ আমি নহি কি আমরা দেহ নহি, আমাদের এই বোধ না থাকিলেও দেহের সুখে আমরা কিন্তু যথার্থ ই সুখী হইতেছি না। আমরা নিতান্ত দেহাত্ম বুদ্ধি হইলেও ইহা বেশ বুঝিতে পারি। সুতরাং আমরা সকলেই যে কেবল দেহ সর্ব্বস্ব তাহা নহে; দেহ ব্যতীত আমরা একটী বস্তু আছি। আমরা দেহে বাস করিতেছি, সময় হইলে চলিয়া যাইব, দেহ পড়িয়া থাকিবে, দেহ কৃমি কীটের খাদ্য সামগ্রী হইবে, অথবা ভস্মে পরিণত হইবে, নিশ্চয়ই হইবে; একদিন না একদিন নিশ্চয় হইবে, ইহা বুঝি, সময় সময় চিন্তাও করি, সময় সময় ইহা বুঝিয়া, ইহা চিন্তা করিয়া মনের ময়লা কাটিয়াও ফেলি, দেহ যে আমি না এই জ্ঞান আমাদের সকলেরই ন্যূনাধিকরূপে আছে। কিন্তু থাই কোথা। বুদ্ধিও নিদ্রা আলস্য ত্যাগ করে না, হৃদয়ও জাগরিত হয় না। দেহ সর্ব্বস্ব হইয়াই জীবনটা কাটাইয়া দিতেছি।

দেহ আমাদের সর্ব্বস্ব নহে, আমরাও দেহ নহি, তবে আমাদের সর্ব্বস্ব কি, আর আমরাই বা কি, এখন তাহাই বলিব। আর একটী কথা আগেই বলিয়া রাখি, দেহ আমাদের সর্ব্বস্ব না হইলেও আমরা যখন এই রক্ত মাংসের দেহে বাস করিতেছি তখন, দেহের সহিত একটা সম্বন্ধ আছে; যে সম্বন্ধ মুখ্য না হইলেও, বরণীয় না হইলেও একেবারে বর্জ্জনীয় নহে। এই দেহকে আশ্রয় করিয়াই জগতে আসিয়াছি; জগতে প্রকাশ্য ভাবে বিরাজ করিতেছি। জগতের মুখাবলোকন করিয়া আমিও যে জগতের একজন তাহা বোধ করিতেছি।

জগতের স্বরূপ রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দাত্মক। এই জগৎরূপ রসের জগৎ, গন্ধ স্পর্শের জগৎ এবং শব্দের জগৎ; এই রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দাত্মক জগৎকে আমরা আপাততঃ এই দেহ দ্বারাই সম্ভোগ করিতেছি। এই জগৎকে সম্ভোগ করিবার নিমিত্তই দেহে ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি। এই জগৎ সম্ভোগ ব্যাপারটী দেহের নহে, আমি যে জীব আমার। আমি জীব জগৎ সম্ভোগ করিব। আমি সম্ভোগ করিব, সেই সম্ভোগটী শুধুই আমি জীবের জন্য, আমি যে দেহে বাস করিতেছি, কিংবা যে দেহ

আমার কিছু দিনের বাসগৃহ, তাহার জন্য নহে। আমি জীবরূপ রসাত্মক জগৎকে পরিপূর্ণরূপে সম্ভোগ করিব। সুতরাং আমার জন্য জগৎ, জগতের জন্য আমি। শুধু আমার জন্য আমি নহি। আমি সমগ্র জগতের জন্য; সমগ্র জগৎটী আমার জন্য। আর এই সমগ্র জগৎটী শ্রীভগবানেরই একমাত্র বিকাশ। জগতে আর জগন্নাথে কোন পার্থক্য নাই। জগন্নাথ হইতেই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। জগৎকে সম্ভোগ করিতে পারিলেই জগন্নাথকে পাইব। কারণ জগতের জলে স্থলে, অনলে অনিলে, অনু পরমাণুতে আসিয়া জগন্নাথ আমাদের সহিত মিলিত হইতেছেন। তাঁহারই রূপ রসে জগৎ; তাঁহারই গন্ধ স্পর্শে জগৎ, তাঁহারই শব্দে জগৎ। শ্রীভগবান এই পঞ্চবিষয়াত্মক জগতের ভিতর দিয়া আমাদের সহিত মিলিত হইতেছেন। তাঁহার সঙ্গে আমাদের যে মহামিলনের মহাবাস হইবে তাহার জন্য জগৎ রচনা হইয়াছে। জগৎ রচনা করিয়া জগন্নাথ দুর্লভ হইয়াছেন; রূপ রসাত্মক জগৎও দুর্ব্বোধ্য করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ বড় মিষ্ট মধুর বস্তু, তাঁহার ন্যায় মিষ্ট মধুর আর নাই। তিনি যদি সুলভ হইতেন তাহা হইলে, জীবে তাঁহার মিষ্টত্ব মধুরত্ব উপলব্ধি করিতে পারিত না। জগৎও দুর্ব্বোধ্য না হইলে জগতের আস্বাদন কমিয়া যাইত। জীব যে পরিত্রাণে পড়িয়া জগৎ আস্বাদন করিতেছে, জগতের মিষ্টত্ব মধুরত্ব আস্বাদন করিয়া জীব আর পরিতৃপ্ত হইতেছে না, তাহার কারণও জগৎ দুর্ব্বোধ্য বলিয়া। জগৎ দুর্ব্বোধ্য কিরূপ; না, জগতে এই জন্ম, এই মৃত্যু, এই হাসি এই কান্না, এই সুখ এই দুঃখ; এই সম্পদ্ এই বিপদ্—জীব ইহা ভাবিয়া অস্থির হইয়া যায়। জগতের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে পারে না। কিন্তু আস্বাদন করা জীবের স্বভাব, তাই জীব দুঃখ পাইয়াও সুখের আকাঙ্ক্ষা করে, বিপদে মুহ্যমান হইয়াও সম্পদের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে; মরণ হইবে নিশ্চয় জানিয়াও অমরের ন্যায় সংসারে বিচরণ করে। মধু আস্বাদন করাই জীবের স্বভাব। মধু আহরণের জন্যই দেখিবে জীবের যত আয়োজন, যত চেষ্টা। কণ্টকাঘাতে দেহ ক্ষত বিক্ষত হইতেছে তবু জীবের মধুর লোভ যাইতেছে না। পরাণ ছাড়িবে তবু মধু ছাড়িবে না। কোথায় মধু আছে, তাহারই সন্ধানে জীব ফিরিতেছে।

জীব ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র হইলেও স্বয়ং মধুর কণা। শ্রীভগবান্ যেমন মিষ্ট মধুর বস্তু, তাঁহার জীবও তদ্রূপ মিষ্ট মধুর বস্তু। জীব বিষের কণিকা নহে, জীব যদি মিষ্ট মধুর কণা না হইবে, তবে একে অন্যকে ভালবাসে কেন? যদি বল একে অন্যকে ভালবাসে স্বসুখের জন্য, প্রয়োজনের জন্য। যদি জীবের দ্বারা জীবের সুখ হয়, প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, তাহাহইলে বুঝা গেল জীব জীবের সুখের বস্তু, প্রয়োজনের সামগ্রী অবশ্য সকলে সকলকে ভাল না বাসিলেও, একজনকে ত ভালবাসে, একজনকে ত চাহে, একজনের শুখ সুশীতল স্নেহের ছায়ায় প্রীতির ছায়ায় দাঁড়াইয়া থাকে ত। জীব একজন না একজনের মুখের দিক তাকাইয়া থাকেই থাকে।

তবেই জীবের দ্বারাই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, জীব যত কেন ছোট না হউক, যত কেন মলিন না হউক, জীব স্বয়ং মিষ্ট মধুর বস্তু। জীব নিজে মিঠা, চায়ও সে মিঠা, আস্বাদন করেও মিঠা। মিঠা ছাড়া তাহার আস্বাদ্য কিছু নাই। জীব যেমন মিষ্ট, তেমন সুন্দর; পদ্মের ন্যায় জীবের রূপ মাধুর্য্য আছে, গন্ধ সম্পদ আছে, পরিমলও আছে। এই যে মিষ্ট মধুর বস্তু জীব উহার নয়নে বচনে বদনে আচারে আচরণে মিষ্টত্ব ফুটিয়া পড়িতেছে। মিষ্ট সামগ্রী জীবের সকলই মিষ্টত্ব।

আচ্ছা জীব যদি মিঠা সামগ্রীই হয়, তাহা হইলে তাহাতে তিক্ত ভাব দেখিতেছ কেন? জীবের মধ্যে ভীষণ ক্রোধ হিংসা দেখিতেছি, কাম লোভ দেখিতেছি, মদ মাৎসর্য্য প্রভৃতি বিষের ক্রিয়া দেখিতেছি, চিনি মিষ্ট বস্তু, উহাতে বালুকণা নাই। মিশ্রি মিষ্টতর বস্তু উহাতে

পাথরের কঙ্কর নাই, জীব যদি মিষ্ট বস্তু হয় তাহা হইলে উহাতে তপ্ত বালুকণার মত, কঠিন কঙ্করের মত গুরুতর দোষসমূহ দৃষ্ট হয় কেন? কোন জীব সর্প, কোন জীব ব্যাঘ্র, কোন জীব অসুর, কোন জীব মনুষ্য; আবার মনুষ্যের মধ্যেও কোন মনুষ্য ভাল, কোন মনুষ্য সরল, কোন মনুষ্য ক্রুর নিষ্ঠুর, কোন মনুষ্য দয়াবান, কোমল হৃদয়; কোন মনুষ্য পর সুখে সুখী, কোন মনুষ্য পরশ্রীকাতর, কোন মনুষ্য পরের জন্য অশ্রুপাত করিতেছে, স্বীয় স্বার্থ ত্যাগ করিতেছে, কোন মনুষ্য ছলে বলে পরার্থ হরণ করিতেছে; এইরূপ বিসদৃশ ভাব হইতেছে কেন?

চিনি যদি বালুতে ডুবিয়া থাকে তাহা হইলে কি তাহার গুণ নষ্ট হইয়া যায় না? চিনিতে বালুকণা মিশাইয়া দিলে কি চিনি আর সেই চিনি থাকে? সেইরূপ মানুষের মধ্যে যদি রাক্ষসের নিষ্ঠুরতা, পিশাচের অপবিত্রতা মিশাইয়া লওয়া যায় তাহা হইলে কি মানুষের সেই স্বভাব গুণ থাকিতে পারে? কখনই না। ফল কথা, মানুষ তখনই অমানুষ হইয়া যায়, যখন সে মানুষের স্বভাব নষ্ট করে। মানুষের মধ্যে যে পশুবৎ জীব দৃষ্ট হয় তাহা তাহার স্বভাব বিস্মৃতিই দোষ। মানুষ নিজের সকল ভুলিয়া যায় বলিয়াই তাহাকে যত দোষের ভাগী হইতে হয়। জীব জগতে মানুষ শ্রেষ্ঠ, সেই শ্রেষ্ঠ জীব নিকৃষ্ট জীবের ন্যায় কখনই হইতে পারে না, যদি তাহার স্বরূপ ও স্বভাব বিস্মৃতি না ঘটে। এই স্বরূপ ও স্বভাব বিস্মৃতির নামই মায়া।

জীবের স্বরূপ মধুময় সুতরাং তাহার স্বভাব কখনও বিষময় হইতে পারে না। তবে বিষময় দেখিতে পাওয়া যায়? শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিতেছেন,—

"জীব নিত্য কৃষ্ণ দাস তাহা ভুলি গেল।
মায়া পিশাচী তাহার গলায় বান্ধিল।"

জীব যে শ্রীভগবানের দাস তাহা ভুলিয়া যাওয়াতেই সে মায়ার দাস হইয়াছে। মায়া পিশাচী রজ্জু দ্বারা জীবের গলদেশ বান্ধিয়া তাহার স্বরূপ স্বভাব ভুলাইয়া দিতেছে।

"মায়া মুগ্ধ জীবের নাহি স্বতঃ কৃষ্ণ জ্ঞান।"
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন বুদ্ধি জীবের ভগবৎ জ্ঞান নাই। সে যে শ্রীভগবানের নিত্য দাস এই বোধ তাহার হয় না। সুতরাং মায়া তাহার গুরুতর দণ্ড করে। জীবকে দণ্ড দেওয়াই কুহকিনী মায়ার স্বভাব। সে দণ্ড কিরূপ না, জীবের স্বরূপ ও স্বভাব একবারে ভুলাইয়া রাখে। জীব স্বীয় স্বরূপ ও স্বভাব বিস্মৃত হইয়া চিরদিন দুঃখ পায়। এই দুঃখ ভোগ করা কিন্তু জীবের স্বভাব নহে। জীবের স্বভাব কি এখন তাই বলিতেছি।

শ্রীভগবানের দাসত্ব করা জীবের স্বভাব। জীব শ্রীভগবানের দাসত্ব ভুলিয়া মায়ার হাতে পড়িয়া যত লাঞ্ছনা দুর্ভোগ ভোগ করিতেছে। ভগবানের দাসত্ব স্মরণ থাকিলে জীবের কোনই ভয় থাকে না; মায়া তখন জীবের ত্রিসীমায়ও আসিতে পারে না।

জীব ভগবানের নিত্য দাস। ভগবানের দাসের স্বভাব কখনও সহস্র দোষে দুষ্ট হইতে পারে না; ক্রোধ করা, হিংসা করা, লোভ করা, অহঙ্কার করা, পরপীড়ন করা, পরাদ্রোহী হওয়া, নিষ্ঠুরতা, স্বার্থকতা, নীচাশয়তা এই সমুদয় জীবের স্বভাব নহে। কারণ জীব পবিত্র স্বভাব শ্রীভগবানের নিত্য দাস। মায়া জীবের গলায় দড়ি দিয়া জীবকে ক্রোধ করায়, হিংসা করায়, লোভ কয়ায়, অহঙ্কার করায়, পরপীড়ন করায়, পরাদ্রোহী করায়, এবং নিষ্ঠুরতা, স্বর্থপরতা, নীচাশয়তা প্রভৃতি দোষে দূষিত কলঙ্কিত করিয়া থাকে। যদি ইহা না হয়, তাহা হইলে মায়া ছাড়িয়া গেলে জীবের ঈশ্বর স্বভাব হয় কেন?

পশু পক্ষী ইতর জন্তুতে মায়ার অধিকার অত্যধিক। তাই তাহারা পশুপক্ষী হইয়াছে। মনুষ্যে মায়ার অধিকার অপেক্ষাকৃত কম তাই তাহারা জীবশ্রেষ্ঠ হইয়াছে।

আর জীবশ্রেষ্ঠ মানব মানবী যদি মায়ার দাস দাসী হইয়া পরে, মায়ার খেলাই খেলে, মায়ার ইঙ্গিতেই চলে তবে সেও ঐ ইতর জীবের দেহ প্রাপ্ত হইবে। মায়ায় অত্যন্ত বশবর্ত্তীতায় ইতর জীবের যেরূপ প্রকৃতি হিংসা দ্বেষ ক্রোধ পরপীড়া পরদ্রোহীতা ইতর জীবের প্রকৃতি; এইরূপ ক্রোধ হিংসা লোভ পরশ্রীকাতরতা পরপীড়া প্রভৃতি যদি মানুষেরও হয় তাহা হইলে মানুষ আবার নিকৃষ্ট হইয়া জগতে আসিবে। ইতর জীবের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া নানা দেহ ভ্রমণ করিবে।

মানব মানবী শ্রীভগবানের দাসত্ব বিস্মৃত না হইলে, কদাচ তাহার দেহ ভ্রমণ করিতে ও জন্মমৃত্যুর অধীন হইতে হইবে না। ব্রজের গোপ গোপী উত্তম মনুষ্য; মনুষ্যের পূর্ণ আদর্শ। গোপ হইতে গোপী আদর্শ আদর্শের চরম। গোপীর স্বভাব পূর্ণতম মনুষ্যের স্বভাব।

প্রত্যেক নরনারীর গোপীর পদাঙ্ক অনুসরণের প্রবল অধিকার আছে। মানব মানবী যদি শ্রীভগবানের নিত্যদাস এই তত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়া আপনার স্বরূপ ও স্বভাব চিনিতে জানিতে পারে তাহা হইলে তাহাকে ব্রজগোপীর স্বভাব ও অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইবে। সমগ্র জীব গোপ গোপীরূপে শ্রীভগবানের সহিত মিলিত হইবে। শ্রীভগবান যে জীবের প্রভু, জীবের সখা, জীবের সুহৃদ, জীবের জীবনবল্লভ এক দিন না একদিন তাহার এই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের উদয় হইবে। এবং এই জ্ঞান হইতে নিত্য সিদ্ধ ভগবৎ প্রেম যে তাহার হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় আছে, তাহারও উদয় হইবে। রস বোধের তারতম্য অনুসারে তাহার সেই রতির ভেদ হইয়া থাকে। রতি ভেদেও পঞ্চরসের ভেদ আছে। যাউক রসের বিচার আমাদের অদ্যকার আলোচ্য বিষয় নহে। রতিভেদে যে রসের তারতম্য আছে, রসলোলুপ পাঠক তাহা রসশাস্ত্রে দেখিয়া লইবেন।

ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা স্থূলজগৎকে উপলব্ধি করিতেছি। সেই উপলব্ধিও আত্ম সর্ব্বস্ব হইয়া করিতেছি। স্থূলজগৎ হইতে একটা যে সূক্ষ্ম জগৎ আছে, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না, কারণ আমরা আপনাকেই চিনি না। আর আপনাকে চিনিনা জানিনা বলিয়াই স্থূল চক্ষে যাহা দেখি তাহাই দেখি মাত্র, স্থূল কর্ণে যাহা শুনি তাহাই শুনিমাত্র, স্থূল নাসিকার যে ঘ্রাণ পাই, তাহাই আঘ্রাণ করিমাত্র, স্থূল বুদ্ধিতে যাহা বুঝি তাহাই বুঝিমাত্র। আমরা যে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম চিন্ময় পদার্থ, আমাদের যে সূক্ষ্ম চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা বুদ্ধি আছে, তাহার খবর রাখিনা। বিদ্যা উপার্জ্জন করি বটে, সে বিদ্যাও স্থূল বিদ্যা, ধন উপার্জ্জন করি বটে তাহাও স্থূল ধন। সূক্ষ্ম বিদ্যা ও সূক্ষ্ম ধনে আমাদের চক্ষু যায় না, বুদ্ধি খেলেনা। স্থূল লইয়াই বড় ব্যগ্র ব্যস্ত আছি; কাজেই সূক্ষ্ম বিদ্যা সূক্ষ্ম ধনে আমাদের তেমন আসক্তি নাই। আপনাকে চিনিনা জানিনা ইহাই তাহার একমাত্র কারণ। যদি আপনাকে চিনিতাম, আপনাকে জানিতাম, আপনাকে বুঝিতাম তাহা হইলে স্থূল জগৎ লইয়া, স্থূল দেহ লইয়া স্থূল ভাব ভাবনা লইয়া নিশিদিন ব্যাকুল রহিতে পারিতাম না। সূক্ষ্ম হইতে স্থূল হইয়াছে, আবার স্থূল সূক্ষ্মে যাইয়া পঁহুচিবে। স্থূল স্থায়ী নহে, স্থায়ী সূক্ষ্ম। আমরা যে বিদ্যাবুদ্ধির গৌরব করি, সে স্থূল। স্থূল বিদ্যা দ্বারা আমাদের অবিদ্যা বুদ্ধি, অবিদ্যার ভোগ অবিদ্যায় অশান্তি কখনও দূর হইবে না; হইতে পারে না। শ্রীমন্ মহাপ্রভু প্রেমের সূক্ষ্ম তত্ত্ব নির্ণয় প্রসঙ্গে শ্রীরামানন্দ রায় মহাশয়ের সহিত যে কথোপকথন করিয়াছিলেন এমন কথোপকথন জগতে আর হয় নাই। সে অপূর্ব্ব কথার আরম্ভ এইরূপ,—

"প্রভু কহেন বিদ্যা মধ্যে কোন্ বিদ্যা সার।
রায় কহেন কৃষ্ণভক্তি বিনু বিদ্যা নাহি আর॥
সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি।
রাধাকৃষ্ণ প্রেম যার সেই বড় ধনী॥"

কৃষ্ণ ভক্তি ব্যতীত আর বিদ্যা নাই, রাধা কৃষ্ণের প্রেম ব্যতীত আর ধন নাই। এই বিদ্যা যাহার আছে, সে-ই যথার্থ বিদ্বান, এই ধন যাহার আছে, সেই প্রকৃত ধনী। প্রভুর প্রশ্ন সূক্ষ্ম বিষয় লইয়া, রায় মহাশয়ের উত্তরও সূক্ষ্ম বিষয় লইয়া। স্থূল বিদ্যা স্থূল ধন জীবের দুঃখ দুর্গতি দূর করিতে নিতান্তই অসমর্থ; তাই সূক্ষ্ম বিদ্যা কৃষ্ণভক্তি অর্থাৎ মাধুর্য্যময় শ্রীভগবানে ভক্তিই উত্তম বিদ্যা। মাধুর্য্যময় শ্রীভগবানে উত্তমা ভক্তি হইলেই জীবের পরম ধন যে প্রেম তাহার প্রাপ্তি হইবে। শুদ্ধা ভক্তি কি না অকৈতব ভক্তি, অকৈতব ভক্তি কি না তাহাতে অজ্ঞানাদি ধর্ম্ম নাই। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের পরম পূজ্য সাধনসিদ্ধ গ্রন্থকারপাদ কৈতবের লক্ষণ বলিতেছেন, যথা—

"অজ্ঞানতামস্ নাম কহি যে কৈতব।
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ বাঞ্ছা আদি এই সব।"

এই সমস্ত কৈতব রহিতা যে ভক্তি তাহা হইতে প্রেম উৎপন্ন হইবে। যে প্রেম জীবের একমাত্র প্রয়োজন, যে প্রেম ব্যতীত জীবের সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হইতে পারে না; শুদ্ধা ভক্তি সেই প্রেমের প্রসূতি। ভক্তি জননী, প্রেম তাহার আনন্দ চিন্ময় রসপূর্ণ সুসন্তান। জীবের এই প্রেম ধনের উৎপত্তি শুদ্ধা ভক্তি হইতে হয়, তাই রায় মহাশয় সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ভক্তি রসের মাধুর্য্য ও মহিমা বুঝিতে পারিয়া উত্তর করিলেন, বিদ্যা মধ্যে কৃষ্ণভক্তি অর্থাৎ মাধুর্য্যময় শ্রীভগবানে ভক্তিই সর্ব্ব বিদ্যার মধ্যে উত্তম বিদ্যা। আর তিনি প্রেমের তত্ত্ব অবগত হইয়া কহিলেন, শ্রীরাধাকৃষ্ণে যাহার প্রেম আছে, সেই যথার্থ ধনী। আর কোন ধনের তাৎপর্য্য নাই। কেননা শ্রীরাধাকৃষ্ণে প্রেম ব্যতীত আর যে ধন পৃথিবীতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা স্থূল জগতের জন্য, স্থূল জীব দেহের জন্য, স্থূল জীব বুদ্ধির ভোগের জন্য। উহা সূক্ষ্ম জীবের ভোগ্য নহে, সূক্ষ্ম জীবের আস্বাদ্যও নহে। যাঁহারা স্থূল লইয়া ব্যাপৃত আছেন, তাঁহাদের সাময়িক দুঃখ ব্যাধির নিবারণ হয় বলিয়া তাঁহারা স্থূল ধনের এত গৌরব করেন, সেই স্থূল ধনের সংগ্রহ করিতে যাইয়া জীবন-পাত করেন। যে প্রেমধনে ধনী হইলে আর কোন দুঃখ থাকে না, দুঃখের আশঙ্কাও থাকে না আমরা সেই সূক্ষ্ম বিচারে বাধ্য হই না। এই কর্ম্ম ভোগ কেবল আমরা যে জীব, সেই জীবতত্ত্ব, অর্থাৎ জীবের স্বরূপ ও স্বভাব জ্ঞাত নহি এই জন্য। নিজের স্বভাব ও স্বরূপটী পরিজ্ঞাত হইলে আর এই লাঞ্ছনা, বিড়ম্বনা থাকে না। স্থূল বুদ্ধি আমাদিগকে আর স্থূল ব্যাপারে ঘুরাইয়া মারিতে পারে না। দেহাভিমানে দেহসম্পর্কশূন্য প্রেম হইতেও আমাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারে না।

জীব সূক্ষ্ম, তাহার শরীরটী মাত্র স্থূল। জীব সূক্ষ্ম বলিয়াই আমরা স্থূল দৃষ্টিতে জীবের সূক্ষ্ম শরীর দেখিতে পাই না। আমাদের সূক্ষ্ম চক্ষু ফুটিলে, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে জীবের সেই সূক্ষ্ম শরীর দেখিতে পাইব। আমি যাহাকে ভালবাসি, সেই আমার স্থূল চক্ষে স্থূল বুদ্ধিতে খুব মনোরম; যতই দেখি ততই দেখিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাকে দেখিতে পাই না, তাহার স্থূল শরীরটী মাত্র দেখি, কাজেই আমাদের ভালবাসা স্থূল দেহের উপায়, একথা বলিলে বোধহয় অন্যায় হইবে না। সূক্ষ্ম দর্শন শক্তি নাই, তাই প্রিয়জনের সূক্ষ্ম মূর্ত্তিও দেখিতে পাই না। ভালবাসাও ঐ স্থূল দেহেই পর্য্যবসিত হইয়া যায়। দেহ গেল ত ভালবাসাও গেল, দেহ রহিল ত দেহের উপর একটা টানও রহিল। সেই টানকেই আমরা ভালবাসা নাম দিয়া আসিতেছি। সুতরাং আমরা প্রেমের সন্ধান পাইতেছি না। সর্ব্বানন্দ-ধাম যে প্রেম তাহার সন্ধান পাইতে হইলে সূক্ষ্মদর্শী হইতে হইবে; স্থূল বুদ্ধি ত্যাগ করিতে হইবে, স্থূলের প্রতি যে একটা অমানুষিক টান আছে, তাহা ঘুরাইয়া সূক্ষ্মের দিকে দিতে হইবে। নতুবা সেই প্রেমধনের অধিকারী হইয়া প্রেমামৃত সিন্ধু শ্রীভগবানের সহিত প্রেমের খেলা খেলিতে সমর্থ হইব না। ঘুরিয়া ঘুরিয়া

পশু যোণী, পক্ষী যোণী, কীট পতঙ্গের যোণী, অধিক সৌভাগ্য হইলে আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষ যোণী প্রাপ্ত হইব। উত্তম মনুষ্য হইতে পারিব না। মনুষ্য জন্ম উত্তম জন্ম বটে, সে কেবল উত্তম মনুষ্যের জন্য। মনুষ্য মধ্যেও উত্তম হইতে না পারিলে, সেই পশুভাব, সেই পৈশাচিক ভাব, সেই ক্রুর নিষ্ঠুর নির্দ্দয়ের ভাব রহিয়া গেল। মনুষ্য কুলে জন্মধারণ করিয়াই বা কি হইল। তাই উত্তম মনুষ্য আদর্শ মনুষ্য হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলেই হৃদয়ে প্রেমের বন্যা আসিবে, হৃদয় সরস হইবে আর হৃদয় সরস হইলেই যত দুঃখ যত তাপ যত আধিব্যাধি সব দূর হইয়া যাইবে। সর্ব্বাত্মা অমৃতরসে অভিষিক্ত হইবে, আনন্দরূপ অম্বুদ্ধি বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। তাই জীব সর্ব্বদা সুভাবে পঁহুচিতে চাইতেছ। স্কুলের ব্যাপার বাণিজ্য জীবের স্বভাবের নহে, মাত্র স্বভাব পোষণের জন্য।

সর্ব্বত্যাগী শ্রীগৌরচন্দ্রকে শ্রীসনাতন গোস্বামী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, প্রভু,—

"কে আমি, আমারে কেন জারে তাপত্রয়।"

কে আমি, এই বলিয়া বলি শ্রীসনাতনের মত আমরাও জিজ্ঞাসু হইতে পারি. তাহা হইলে, এই তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া সনাতন ত্রিতাপের জ্বালা হইতে নিস্কৃতি পাইবার পথ পাইয়াছিলেন। আমরাও পাইব। কে আছ ত্রিতাপে দগ্ধ জীব, একবার এস, শ্রীসনাতনের মত বেদনা বিহ্বল প্রাণে তত্ত্বজিজ্ঞাসার কাতর কণ্ঠে শ্রীভগবান্‌কে আমরাও ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করি—

"হে প্রভু, হে স্বামিন্, হে প্রাণরমন, বুঝাইয়া দাও কে আমি আমারে কেন জারে তাপত্রয় ?"

শ্রীশরৎচন্দ্র ধর।

৺ স্বর্গীয় রায় চন্দ্রকুমার দত্ত বাহাদুর।

ঢাকা সাহিত্য পরিষদের প্রবীণ সদস্য এবং পরিষদের "গৃহনির্ম্মাণ ভাণ্ডারের" রক্ষক অশীতিপর বৃদ্ধ সুপুরুষ রায় চন্দ্রকুমার দত্ত বাহাদুর গত ২০শে চৈত্র শুক্রবার রাত্রি ৭টা ৩৫ মিনিটের সময় তাঁহার ঢাকা আশক লেনস্থ ভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। বিক্রমপুর তেওটিয়া গ্রামে ১২৪৫ সনের ২৫শে বৈশাখ রবিবার চন্দ্রকুমার বাবুর জন্ম হয়। তাঁহার পিতৃদেব ৺মৃত্যুঞ্জয় মুন্সী মহাশয় তদানীন্তন ঢাকার একজন অতি প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। তিনি স্থানীয় জজ আদালতের সেরেস্তাদারের কার্য্য করিতেন। সরস গল্প বলিতে মুন্সী মহাশয় এরূপ পটু ছিলেন যে তৎসাময়িক আরও একজন বিখ্যাত লোকের নামের সঙ্গে তাঁহার নাম সহযোগে এদেশে এখনও পর্য্যন্ত একটি ছড়া প্রচলিত আছে :—

"আলিমিঞার ঘড়ি, নীলাম্বরের বড়ি গোকুল মুন্সীর মোছে তাও ; গল্প শোনত মৃত্যুঞ্জয় মুন্সীর কাছে যাও।"

মৃত্যুঞ্জয় মুন্সীর চার পুত্র, তন্মধ্যে চন্দ্রকুমার দ্বিতীয়। প্রথমে চন্দ্রকুমার ঢাকার "পোগোজ" স্কুলে পড়িতে আরম্ভ করেন, পোগোজ স্কুল তখন আশক জমাদারের গলিতে তাঁহাদের বাসভবনের নিকটেই অবস্থিত ছিল। পরে তিনি কলেজিয়েট্ স্কুলে পড়িয়া তথা হইতে সেই সময়কার "জুনিয়ার" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নুতন বিধান প্রচলিত হইলে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া সফলকাম হন। কিন্তু পরবর্ত্তী পরীক্ষায় কৃতকার্য্য না হওয়ায় একটি কেরাণীর কার্য্য গ্রহণ করেন এবং কিছু দিন পরে ঐ কাজ পরিত্যাগ করিয়া কমিটি পাশ করেন, কিন্তু ওকালতি না করিয়া

পুনরায় কেরাণীর কার্য্যে নিযুক্ত হন। পরে তদানিন্তন "কেম্বেজ্রি পরীক্ষা" পাশ করিয়া ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে বরিশালে সবডেপুটির পদ প্রাপ্ত হইয়া সত্বরই তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে উন্নীত হন। তাঁহার বরিশাল অবস্থান কালে দেশ বিখ্যাত দৌলত খাঁর বান "ডাকে। সেই ভয়ঙ্কর ঝড়ে অসংখ্য লোক নানা প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সেই সময়ে বরিশালের ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব চন্দ্রকুমার বাবুর উপর জিলার ভার রাখিয়া নিজে ঘটনা স্থলে চলিয়া যান। সেই ঝড়ে বরিশাল জেলার অন্যান্য স্থানের লোকদিগেরও দুর্দ্দশার এক শেষ হইয়াছিল। চন্দ্রকুমার বাবু সেই সকল লোকের দুর্দ্দশার কথা সবিশেষ অবগত হইয়া উপরস্থ কর্ম্মচারী-বর্গের হুকুমের অপেক্ষা না করিয়াই নিজ দায়িত্বে বহু সহস্র টাকা গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে ঝটিকা প্রপীড়িত দরিদ্র ব্যক্তিদিগের সাহার্য্যের জন্য দান করিয়া সহৃদয়তার পরাকাষ্ঠাদেখাইয়াছিলেন। তাঁহার এই কার্য্যের জন্য গভর্ণমেণ্টও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া ছিলেন। প্রায় ২৬ বৎসর কাল কঠোর পরিশ্রম সহকারে কার্য্য করার পর ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। কার্য্যকালের অব্যবহিত পরেই তিনি "রায় বাহাদুর" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

অবসর গ্রহণের পর কিছু কাল তেওটিয়ার বাটীতে থাকিয়া পরে ঢাকার আশক লেন স্থিত নিজ বাটীতেই তিনি অবস্থান করেন। চন্দ্রকুমার বাবু প্রকৃত কর্ম্মী ছিলেন। মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি নানা দেশহিত কার্য্য করিয়াছেন, আলস্য কাহাকে বলে তিনি জানিতেন না। তিনি ঢাকা জনসাধারণ সমিতি (People's association) এবং জমিদার সমিতির (Land holder's) association) সহকারী সভাপতি (Vice President) ছিলেন। স্থানীয় জমিদার ৺মোহিনী মোহন দাসের জমিদারির রিসিভার (Receiver) ছিলেন, এবং ইহার পূর্ব্বে ৺ শ্রীশচন্দ্র দাসের জমিদারির কার্য্য নির্ব্বাহকের (Manager) কর্ম্ম করিয়াছেন।

শিক্ষা বিষয়ে তাঁহার অদম্য উৎসাহ ছিল। তিনি ঢাকা "কিশোরী লাল জুবিলি" স্কুলের এবং স্থানীয় জগন্নাথ কলেজের কর্ম্ম কুশল সম্পাদক ছিলেন। দেশ বৎসল চন্দ্রকুমার সোৎসাহে দেশের কাজ করিয়া সকলের শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন।

ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ বহুদিন তাঁহার আসক-লেনস্থ ভবনে অবস্থিত ছিল, এজন্য পরিষৎ তাঁহার নিকট চিরদিনই কৃতজ্ঞ থাকিবে।

এতদ্ব্যতীত সমাজ হিতকর কার্য্যেও তিনি সর্ব্বদাই অগ্রসর হইতেন। "পূর্ব্ব বঙ্গ কায়স্থ সভার" তিনি একজন অতি উৎসাহী সভ্য ছিলেন। এ বৃদ্ধ বয়সেও কর্ত্তব্যবোধে সন্তানগণ সহ তিনি উপবীৎ গ্রহণ করিয়া নিজ সমাজের লোকদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন। চন্দ্রকুকার বাবুর চারিটি পুত্র ও একটি কন্যা—। তন্মধ্যে প্রথম দুই পুত্র অতুলকুমার দত্ত বি,এ, এবং বিপুলকুমার দত্ত তাহার জীবিতাবস্থায়ই পরোলোক গমন করিয়াছেন। তৃতীয় আমাদের পরিষদের ভূত-পূর্ব্ব সম্পাদক ও বর্ত্তমান সদস্য শ্রীযুত ভূপালকুমার দত্ত এম্ এ, এবং চতুর্থ শ্রীযুত অমূল্যকুমার দত্ত।

এই ৮১ বৎসর বয়সেও চন্দ্রকুমার বাবু প্রাতে সন্ধ্যায় দুইবেলা প্রতিদিন যথা নিয়মে বুড়িগঙ্গার ধারে বেড়াইতেন। তিনি অক্রোধ, কর্ত্তব্য পরায়ণ, এবং সদা প্রফুল্ল ছিলেন।

দুঃখের বিষয় এই শ্রেণীর লোক ক্রমশঃই দেশ হইতে অন্তর্হিত হইতেছেন। ইঁহাদের অভাব আর পূরণ হওয়ার আশা নাই।

উপেক্ষিত।

মুক্তি আমি চাই নাই, চাহি না কখন—
ভালবেসে যদি আমি ভালবাসা পাই
নিঙাড়ি নিঙাড়ি বক্ষ নিঃশেষ করিয়া
শেষ সে রক্তের বিন্দু দিতে আমি চাই।

রক্তমাংসে গড়া আমি সকাম মানব
কোথা পাব দেবতার নিষ্কাম সে প্রাণ!
অনন্ত বাসনা মাখা হৃদয় আমার
চায় শুধু ভালবাসা—দান প্রতিদান!

উপেক্ষিত ভালবাসা—চরণে তাহার
কেমনে কেমনে অর্ঘ্য করিব প্রদান,
ধারেক কটাক্ষে, যদি ফিরে নাহি চায়
কে এসেছি, কি এনেছি, কিসের এ দান?

তবুও তবুও হায় দিতে যে গো হয়—
সে ত'রে ভুলেও কভু তুলে নাহি লয়!

শ্রী—কিশোর ধর *।

---

* লেখক নিজের নামটি এত অস্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন যে আমরা বহু কষ্টেও তাহার পাঠোদ্ধার করিতে পারি নাই। আশা করি লেখক তাহার নিজের লেখা চিনিয়া লইবেন এবং ভবিষ্যতে প্রবন্ধাদি প্রেরণ কালে নিজের নামটা একটু স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

প্রতিভা-সম্পাদক।

প্রতিভা

১০ম বর্ষ   জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭   ২য় সংখ্যা।

মদ্যপান। *

মানব মাত্রেই সুখের প্রয়াসী। কিসে সুখের মাত্রা একটু বাড়াইয়া লইবে তাহার চেষ্টায় সকলেই ব্যস্ত। মদ্যের আরাধনার মূলেও এই সুখবৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষাই বিদ্যমান রহিয়াছে। মদ্যে সুখ প্রসারিত ও গাঢ়তর এবং দুঃখ প্রশমিত হয়। মানবীয় সভ্যতার ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠায় মদ্য পানের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কি সভ্য কি অসভ্য, কি ভদ্র কি অভদ্র সকল সমাজেই ইহার পূজা হইয়া থাকে।

প্রথমতঃ বেদেই সুরা কুম্ভের উল্লেখ দেখিতে পাই। সৌত্রামণি ও বাজপেয় যজ্ঞের ইহা একটী বিশেষ উপকরণ। অমৃত বলিয়াই সোমরস দেবগণের প্রিয় পেয় হইয়াছিল এবং মানব সমাজেও এই দেবা-কাঙ্ক্ষিত পানীয় যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছিল। গুণ-মুগ্ধ মুনি ঋষিরা সমস্ত বিষয় বৈভব ছাড়িয়াও মদ্য ছাড়িতে পারেন নাই,—এমন কি পরম যোগী বশিষ্ঠও আসবদানে বিশ্বামিত্রের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। বৈদিক যুগের পরে ত্রেতায় কবিগুরু বাল্মীকীও ইহাকে ভুলিতে পারেন নাই। জগত পূজ্যা আদর্শ নারী সাধ্বী সীতা নরব্যাঘ্র রামের সুস্থ শরীরে প্রত্যাগমন প্রার্থনা করিতে বসিয়া গঙ্গাকে মদ্যের লোভ দেখাইয়াছিলেন।

> সা ত্বাং দেবী নমস্যামি প্রার্থয়ামি চ শোভনে।
> প্রাপ্তরাজ্যে নর ব্যাঘ্রে শিবেন পুনরাগতে ॥
> * * * * * *
> সুরা ঘট সহস্রেন মাংস ভূতৌ দনেন চ।
> যক্ষ্যে ত্বাং প্রীয়তাং দেবী পুরীং পুনরুপাগতা ॥

---

* মলিনার (Mollinari) প্রণীত "রসায়ন শাস্ত্র" নামক গ্রহির ইংরাজী সংস্করণ আকবরি নামক ত্রৈমাসিক পত্র, পত্রিকাদিতে প্রকাশিত প্রবন্ধাদি এবং কয়েক খানা সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে প্রাপ্ত সাহায্য প্রবন্ধ লেখক কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছে।

অযোধ্যার তার লঙ্কার রাবণের অন্তঃপুরেও ইহার যথেষ্ট সমাদর ছিল। যাপরে যদুবংশে মদ্যের প্রভাব কিরূপ বিস্তৃত হইয়াছিল তাহা উহার ধ্বংশের ইতিহাসেই জাজ্জল্যমান হইয়া রহিয়াছে। বলদেব রেবতী এবং 'হালা' উভয়কে তুল্য রূপে ভালবাসিতেন। পুরস্ত্রীগণও মদ্যের প্রতি যথেষ্ট সম্মান দেখাইতে কুণ্ঠিত ছিলেন না দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও তিনি মদ্যপায়ীদিগের প্রতি কটাক্ষপাত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই তথাপি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে মদ্যের মহিমা একেবারে অবগত ছিলেন না এমত নহে। সখা অর্জ্জুনের সহিত তাহাকে মদ্যপান করিতে দেখা গিয়াছে। কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস অজমহিষীর মদ্যাশক্তির যে পরিচয় দিয়াছেন তাহাও বিশেষ প্রণিধান যোগ্য।

মদিরাক্ষি মদাননার্পিতং মধু পীত্বা রসবৎ কথং নু মে।
অনুপাস্যসি বাষ্পদূষিতং পরলোকোপনতং জলাঞ্জলিম্॥

হে মদিরাক্ষি, যে তুমি আমার মুখার্পিত সুরা রসবৎ পান করিতে, সে তুমি কেমন করিয়া পরলোকোদ্দেশ্যে অঞ্জলি প্রদত্ত বাষ্পদূষিত জল পান করিবে?

তান্ত্রিক সাধনায় "কারণের" স্থান কেবল আরাধ্যেরই নীচে। তন্ত্রমতে কুলাচারিগণ সর্ব্বদা কুল সঙ্গী হইয়া সোম রস পান করিবেন, এবং শক্তির উদ্দেশ্যে বলি পূজা-পরায়ণ হইয়া নিত্য সুরাপানরত থাকিবেন। তবে, সংস্কৃত আর অসংস্কৃত সুরায় প্রভেদ আছে। একটী মোক্ষ প্রাপ্তির পথ অন্যটী তাহার অন্তরায়, এজন্য সুধা গায়ত্রী প্রভৃতি মন্ত্রদ্বারা শোধনের উপায়ও প্রদর্শিত হইয়াছে।

অসংস্কৃতাং সুরাং পীত্বা ব্রাহ্মণো ব্রহ্মহা ভবেৎ।
সংস্কৃতাস্তু সুরাং পীত্বা ব্রাহ্মণো ব্রহ্মদপ্নিবৎ॥

আবার "ব্রহ্মণস্তু মহা মোক্ষো মদ্যপানে প্রিয়ংবদে"। তান্ত্রিক প্রভাবেই এতদ্দেশে মদ্যের প্রচলন বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করে। শুনিতে পাই আজকালও কোন কোন শিক্ষিত ব্যক্তি 'কারণ' দ্বারা বিশুদ্ধীকৃত অন্ন গ্রহণ করিয়া থাকেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাবেও সুরাপান এককালে লুপ্ত হয় নাই। চৈতন্য অবতারের সময়ও উহার প্রচলন দৃষ্ট হয়।

পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পপাত ধরণীতলে।
উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥

এই সময়ের উক্তি।

তৎকালেও বৈষ্ণব অপেক্ষা শাক্ত উপাসক বেশী ছিল এবং শাক্তগণ মদ্যপায়ী ছিলেন।

ইউরোপ সভ্যতার আদি গুরুবংশ গ্রীকদিগের মধ্যে অবাধ সুরাপান প্রচলিত ছিল। মদ্য দেবতা ডিয়োন্যুসস্ (Dionysus) সর্ব্ব কনিষ্ঠ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা, তাঁহার পূজায় স্ত্রীপুরুষ একত্রে কত আমোদ আহ্লাদ করিয়া মদ্যপান করিত। এই পূজাই ছিল "the widest and the best known worship known to the best spirits of the best commnity of Hellas" গ্রীক কবিগণ, এমন কি দার্শনিকগণও উহার কত প্রশংসা করিয়াছেন। প্রাশ্চাত্য সভ্যতার অন্যতম গুরু—বংশ সুসভ্য রোমজাতির মধ্যে আপামর সাধারণ সকলেই বেকাস্ (Baechus) দেবতার পূজা করিতেন।

"Bacchus ever fair and young
Drinking joys did first ordain."

দেবতা বেকাস্ই মানব সমাজে মদ্য প্রচলন আনয়ন করেন বলিয়া তাহারা বিশ্বাস করিতেন। পারস্য কবি ওমর খৈয়ামের মদ্য প্রিয়তার কথা সকলেই জানেন এবং ইহা হইতেই পারস্যে মদ্যপান কিরূপ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল তাহা জানা যায়। মদ্য-জগতে পারস্যের "সিরাজি" আজও তাহার শ্রেষ্ঠ আসন হইতে বিচ্যুত হয় নাই। মোগল রাজ বংশে মদ্যের প্রভাব যথেষ্ট লক্ষিত হয় এবং বাদসাহ জাহাঙ্গীর নিজে ইহার বিশেষ ভক্ত ছিলেন।

এত গেল আর্য্যজাতির বিভিন্ন শাখার কথা। অন্যান্য সভ্যজাতির মধ্যেও মদ্যপানের প্রচলন দেখিতে পাওয়া

মধ্যে। প্রাচীন মূর্তির দেবতা বেলায়েলের সম্বন্ধে কবি মিল্টন বলিয়া গিয়াছেন।

To him no semple stood
Or after smoked * *
In count and palaces he also reigns
* * * *
and when night
Darkens the streep, than wander forth the lons of Belial slown with inoolence and wine." সমস্ত মানবের মধ্যেই যাহার মন্দির বিরাজমান তাহার আবার ভিন্ন মন্দিরের প্রয়োজন কি ?

এখানে ইংলণ্ডের তদনন্তীন সমাজেরও একটু আভাষ পাওয়া যায়। বাইবেলেও মদ্যপানের বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায়। নোয়ার পানাসক্তির কথা সকলেই জানেন। Holy Sacrament এ অদ্যাপি মদ্য ব্যবহৃত হয়। চীন জাতির মধ্যেও মদ্য প্রচলিত ছিল। অসভ্য জাতিরাও সুরাপান সুখে বঞ্চিত ছিল না।

যুদ্ধক্ষেত্রে মদ্যপান দেবী যুদ্ধের সময়ও প্রচলিত ছিল। স্বয়ং দেবী চণ্ডিকা অতিশয় সুরাশক্ত ছিলেন। "গর্জ্জ গর্জ্জ ক্ষণংমূঢ় মধু যাবৎ পিবাম্যহম্" তাঁহারই উক্তি। সূর্য্য বংশের শ্রেষ্ঠ বীর রঘু পারস্ত বিজয়ের পর মদ্যদ্বারা সৈনিকদিগকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। কিষ্কিন্ধ্যাবাসীরা উগ্র পানীয়ের পরম ভক্ত ছিল। এমনকি মুনি ভরদ্বাজ রামায়ণে তৎপর ভরতের সৈন্যদিগকে মদ্য ও মাংস দানে অতিথি সৎকার করেন। "Drinking is the soldier's pleasure" কথাটা অদ্যাপি প্রচলিত রহিয়াছে। যত দেশে যত স্থানে সৈন্যগণের আমোদ আহ্লাদের বিবরণ পাওয়া যায়, সর্ব্বত্রই মদের ঘড়া দেখিতে পাই। মদ্যপানে শরীর যন্ত্রের উপর কিরূপে কার্য্য করে তাহা নির্ণয় করিবার জন্য যত অনুসন্ধান (research) করা হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটীতেই সৈন্যদলের উল্লেখ দেখা যায়।

ব্যাসের ন্যায় হোমরও মদ্যের প্রশংসা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। জগতে বিভিন্ন জাতির কত সুপ্রসিদ্ধ কবির কাব্য ও কবিত্বের জন্য আমরা যে ইহার নিকট ঋণী তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বিদেশীয় কবিগণের ত কথাই নাই—আমাদের কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস তাঁহার কবিতায় মদ্যপানের উল্লেখ করিতে বসিয়া কোথায়ও ইহার নিন্দাবাদ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। বর্ত্তমান যুগের নটকুল শিরোমণি গিরীশচন্দ্র, মেঘনাদ বধের কবি মাইকেল, রৈবতক কুরুক্ষেত্রের নবীনচন্দ্র, নাট্যাচার্য্য রায় মহাশয় প্রভৃতি যে ইহার কিরূপ ভক্ত সেবক ছিলেন তাহা সকলেই অবগত আছেন। প্রতিভার অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিশেষতঃ যেখানে মস্তিষ্কের কঠোর পরিশ্রম আবশ্যক সেখানেই ইহার মাহাত্ম্য বিশেষ ভাবে দেখিতে পাই।

পাশ্চাত্য দেশে মদ্য অবশ্য পানীয়ের মধ্যে পরিগণিত এবং মদ্যশূন্য ভোজন-আসর গৃহ কর্ত্তার কার্পণ্যেরই পরিচায়ক। পিতা মাতার সম্মুখে সন্তানের মদ্যপান প্রাচ্য জগতে বিরল—ইঙ্গবঙ্গ সমাজের সম্বন্ধে এ কথা প্রযোজ্য কিনা ঠিক বলিতে পারি না।

মদ্যপান সংক্রামক ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের ন্যায় পৃথিবীর সমস্ত দেশে বিস্তৃতি লাভ করিয়া থাকিলেও ইহার কুফলগুলি যে উপেক্ষিত হয় নাই তাহার প্রমাণ সর্ব্বজাতির গ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায়। সোমরস শীত প্রধান দেশেই ব্যবহার যোগ্য ছিল এবং আর্য্যগণ গ্রীষ্ম প্রধান ভারতবর্ষে উগ্র পানীয়ের দোষগুলি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন। তখনই মদ্য অপেয়ম্, অদেয়ম্, অগ্রাহ্যং বলিয়া ঘোষিত হইল। দ্বিজাতীয়ের জন্য উহা নিষিদ্ধ হইল, মদ্যপান অপরাধের জন্য প্রায়শ্চিত্ত বিধিবদ্ধ হইল। কেহ কেহ হয়ত বলিতে চাহিবেন "The bigots of the iron time, Had called the harmless drink a crime" কিন্তু দোষ ও গুণ তুলনা করিলে একথা বলিবার যো নাই। মনু মৃত্যুই মদ্যপায়ীর উপযুক্ত

স্থির করিয়া বিধান করেন। যাজ্ঞবল্ক্য ক্লেশকর মৃত্যুতেই মদ্যপান জনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। অন্যান্য মুনি ঋষিরাও উত্তপ্ত সুরাপানে এবং কেবল গলিত ধাতু পানে দেহত্যাগের ব্যবস্থা দিলেন। অজ্ঞানিত পাপ যে মানবদেহ স্পর্শ করে না, এই মতেরও একটী ব্যতিক্রমের অবতারণা হইল। অজ্ঞানবশতঃ সুরাপানেও দ্বিজাতি বর্ণত্রয়ের পুনঃ সংস্কারের আবশ্যক হইল। ইহাতে পানদোষ অনেকটা কমিয়া আসিলেও একেবারে কিন্তু তিরোহিত হইল না। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণ এই বিধান মানিলেও সাধারণ লোকেরা মদ্যপান ত্যাগ করিল না। কাজেই যে আদেশ পূর্ব্বে অবশ্য পালনীয় (mandatory) ছিল তাহা ক্রমে উপদেশে পরিণত (recommendatory) হইল। তখন বর্ণভেদে সংস্কার ভেদে বিভিন্ন ব্যবস্থা নির্ণীত হইল—ব্রাহ্মণের পক্ষে সুরা একেবারেই নিষিদ্ধ রহিল, ক্ষত্রিয় বৈশ্যের পক্ষে বিশেষ বিশেষ মদ্য এবং শূদ্রের পক্ষে সকল প্রকার মদ্যই সমভাবে ব্যবহার্য্য বলিয়া বিধান করা হইল। বোধহয় ব্রাহ্মণ অন্তঃপুরে মদ্যের প্রভাব বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, কারণ দেখিতে পাই তাহাদের জন্য মদ্যপান পতিলোক প্রাপ্তির পথের কণ্টক বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল।

এখন হইতে মদ্য ব্যবসায়ী বিশেষ ঘৃণার পাত্র হইয়া পড়িল। মদ্যপ ব্যক্তি সমাজে পরিত্যক্ত এবং ঘৃণিত হইয়া দুঃসহ জীবনভার বহন করিতে লাগিল—সে সমাজপাত্রে কুষ্ঠরোগের ন্যায় পীড়ার কারণ মাত্র হইয়া দাঁড়াইল। ক্রমে পানদোষ এত কমিয়া গিয়াছিল যে চীন পর্য্যটক Huen Tsang এবং গ্রীক রাজদূত Magasthenes হিন্দুদিগের সংযমের বহু প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। মহম্মদীয় ধর্ম্মেও সুরাপান নিষিদ্ধ। মোগল রাজত্বের গৌরবের সময়ও আমরা দেখিতে পাই যে পয়গম্বরের ঐ নিষেধাজ্ঞা প্রতিপালিত হইত। আইনি আকবরিতে মদ্যপান নিষিদ্ধ রহিয়াছে এবং সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সময় মদ্যপান একটী কঠিনরূপে দণ্ডনীয় অপরাধের মধ্যে পরিগণিত ছিল। যদিও বাদসাহ জাহাঙ্গীর নিজে এই অভ্যাসের বশবর্ত্তী ছিলেন তথাপি যাহাতে প্রকৃতিপুঞ্জ তাহার এ দুর্ব্বলতার অনুকরণ না করে তৎপ্রতি তাহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তাঁহার সময় পদমর্য্যাদা নির্ব্বিশেষে মদ্যপায়ীকে প্রকাশ্যভাবে বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করা হইত। কি হিন্দু, কি ইস্‌লাম সকল ধর্ম্মগ্রন্থেই সুরাপান নিন্দিত হইয়াছে।

সুরাপানের অশেষ দোষ। যদুবংশের ইহাই ধ্বংশের কারণ। কোন কোন চিকিৎসকের মতে অল্প পরিমাণে নিয়মিত সেবনে মদ্য মানব শরীরের উপকারই সাধন করিয়া থাকে কিন্তু মদ্যপানের প্রধান দোষই যে পরিমিত পানের সঙ্কল্পটা বড় বেশী দিন থাকে না, যে কোন কারণেই হউক, শীঘ্রই মাত্রা অতিক্রম হইয়া গিয়াছে দেখা যায়। পিত্ত, বায়ু ও শ্লেষ্মা প্রধান প্রকৃতি অনুসারে অল্পাধিক সময়ের সুরা সেবীদিগের মধ্যে মস্তের উত্তেজনা ও অবসাদের ক্রিয়া আরম্ভ হইয়া থাকে। সুরা মানব দেহ যন্ত্র ক্রমশঃ ক্ষীণ ও অবসন্ন করিয়া শরীর ব্যাধিপ্রবণ করিয়া তোলে এবং উহার ফল তিন পুরুষ পর্য্যন্ত প্রসারিত হইতে দেখা যায়। এমন কি সুরাপানে বংশবৃদ্ধি শক্তির অপচয় ঘটিয়া জাতীয় ধ্বংশ সাধিত হয়। সুরার অপব্যবহার অর্থশালী ব্যক্তিদিগের নিঃসন্তান হইবার অন্যতম কারণ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। অবশ্য মদ্যপায়ী দরিদ্রের বহু সন্তানের দৃষ্টান্ত বিরল নহে কিন্তু দরিদ্র শ্রমজীবি বেতন প্রাপ্তির সময়ই মাত্র দুই এক দিনের জন্য সুরাপানের সুবিধা পায়—সুরার অপব্যবহার তাহার পক্ষে কদাচিৎই সম্ভবপর হইয়া থাকে। মদ্যপ ব্যক্তির সন্তান স্বভাবতঃই দুর্ব্বল এবং খর্ব্বকায় হয় এবং ইহারই প্রভাবে সৈন্যদলভুক্ত হইবার অপারগ ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে।

মদ্য মনোবৃত্তিগুলিকে প্রথমতঃ উত্তেজিত,

স্ফূর্ত্তিযুক্ত এবং উন্মাদ করিয়া পরে চিরদিনের জন্য তাহাদিগকে অবসন্ন করিয়া ফেলে।

সুরার অত্যধিক ব্যবহারে নানাপ্রকার স্নায়বিক রোগের উৎপত্তি হয়। কাহার কাহার যকৃত প্রসারিত হইয়া উহার ক্রিয়া বিপর্য্যস্ত হইয়া যায় এবং কেহ কেহ বা উন্মাদ-গ্রস্থই হইয়া পড়ে। বিভিন্ন দেশের উন্মাদদিগের সংখ্যা লইয়া দেখা গিয়াছে যে তাহাদিগের এক চতুর্থাংশের ব্যাধির মূলেই পান দোষ। কোন জীবন বীমা আফিসের ১০ বৎসরের মৃত্যু সংখ্যা হইতে দেখা দিয়াছে যে, মৃত্যুর হার মদ্যপায়ীদিগের মধ্যে শতকরা ৮১ এবং অমদ্যপায়ীদিগের মধ্যে শতকরা ৫৭ এবং সংক্রামক ব্যারামের আক্রমণে প্রথমোক্তদিগের মধ্যে শতকরা ৯০ জন এবং শেষোক্তদিগের মধ্যে শতকরা ২০ জন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। প্রতি বৎসর ইংলণ্ডে ৫০,০০০ হাজার, ফ্রান্সে ৪৫,০০০ হাজার, ভূতপূর্ব্ব জর্ম্মাণ সাম্রাজ্যে ৪০,০০০ হাজার, বেল্জিয়মে ২০,০০০ এবং রুষিয়ায় একলক্ষ লোকের পানদোষই মৃত্যুর মুখ্য বা গৌণরূপে কারণ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী Gladstone কমন্স্ সভাগৃহে বলিয়াছিলেন যে ইংলণ্ডের বড় তিনটী মহামারীতে যত লোক ক্ষয় হইয়াছে শুধু পানদোষে তদপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে।

মদ্যপান নৈতিক অধঃপতনের কারণ। ইহা শীঘ্রই বিবেক ও বিচার শক্তির জড়তা আনয়ন করিয়া পাপানুষ্ঠান সম্ভবপর করিয়া তোলে। ধর্ম্মাধিকরণে অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ফ্রান্স শতকরা ৭০-৭২ জন, ইংলণ্ডে ৩৩ জন এবং জর্ম্মাণীতে ৪২ জন মদ্যাশক্ত। মদ্য বিবেক ও বিচার শক্তি ম্লান করিয়া মানুষকে পশুর অপেক্ষাও অধম করিয়া থাকে। এই সেদিন প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ Lloyd George বলিয়াছেন, আমাদিগকে জর্ম্মাণী, অষ্ট্রিয়া ও পানাভ্যাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইতেছে এবং যতদূর বুঝিতে পারিতেছি শেষটীই জর্ম্মাণাপেক্ষা ভয়াবিহ ও বিপদ সঙ্কুল।

শ্রমজীবিদিগের মধ্যে একটা ভুল ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে মদ্যপানে শরীর উষ্ণ থাকে, শীত নিবারণ হয় এবং কার্য্যকরী শক্তি বৃদ্ধি পায়। দৃষ্টতঃ সত্য হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহা ভুল। পান করা মাত্রই কৈশিকা নাড়ী দ্বারা মদ্য শরীরের সকল স্থানে সঞ্চারিত হয় এবং তাহাতে স্নায়ুমণ্ডলী অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে। চর্ম্মের অব্যবহিত নীচে যে কৈশিকা নাড়ী আছে তাহা স্ফীত হওয়ায় অধিকতর পরিমাণে রক্ত চর্ম্মের উপর আসিয়া পড়ে এবং শরীরের উত্তাপও ঐ পরিমাণে বহির্গত হইয়া যায়। উষ্ণ ভাবটা ক্ষণস্থায়ী মাত্র। চতুঃপার্শ্বস্থ বায়ু যদি অতিমাত্র শীতল থাকে, তাহা হইলে এত অধিক পরিমাণে উত্তাপ বহির্গত হইয়া যায় যে শীতপ্রধান দেশে পথিপার্শ্বে সুপ্ত মাতালকে অনেক সময়ই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখা যায়। পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে শ্রমজীবির পক্ষে মদ্য শুধু যে নিষ্প্রয়োজন তাহা নহে, ইহাতে তাহার কঠোর এবং সুদীর্ঘ পরিশ্রম করিবার শক্তিরও অপচয় হইয়া থাকে। মদ্যের পরিবর্ত্তে চিনি, কাফি এবং চা ব্যবহার করিলে তাহাদের অধিকতর উপকার হইতে পারে।

জর্ম্মাণীতে প্রতি ব্যক্তি বৎসরে মোট ৯.৫ লিটার, * অষ্ট্রীয়ায় ৮.৯ লীটার, ফ্রান্সে ২২.৩, ইংলণ্ডে ১০.৮; বেলজিয়মে ১৩.০, রুষিয়ায় ২৭, আমেরিকার মার্কিণ রাজ্যে ৬.৪, ইতালিতে ১৪.১ লীটার মদ্য পান করে। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে সুইডেন জনপ্রতি ২৭ লীটার পর্য্যন্ত মদ্য ব্যয়ের পরিমাণ উঠিয়াছিল। ১৯০৫ সনে জর্ম্মাণীতে আবাল বৃদ্ধ বণিতা নির্ব্বিশেষে জনপ্রতি ৪৭ শিলিং বা ৩৫৷০ টাকা, পনর বৎসরের অধিক বয়স্কদিগের জনপ্রতি ৮ পাউণ্ড বা ১২০৲ টাকা এবং সমগ্র দেশে ১২ কোটী পাউণ্ড বা ১৮০ কোটি টাকা অথবা শ্রমজীবিদিগের আয়ের শতকরা ১২ টাকা মদ্যের সঙ্গে উধাও হইয়া গিয়াছিল। যত মদ্য প্রস্তুত হয় তাহার মধ্যে জর্ম্মাণীতে

* লীটার প্রায় একসের দুই ছটাকের সমান।

শতকরা ৫৪, অষ্ট্রিয়ায় ১৯, ফ্রান্সে ১৮ এবং ইংলণ্ডে ১৪ লীটার মাত্র কারখানা প্রভৃতির কার্য্যে প্রয়োজন হয়, অবশিষ্টাংশ নর শরীর শোষণ ও নরদেহ জীর্ণ করিয়া থাকে।

জার্ম্মাণীতে পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দীতেই মদ্যপান একটী জাতীয় বিপদের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। আফ্রিকা মহাদেশে পাশ্চাত্য জাতিদিগের অভিনিবেশ সংস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই পাশ্চাত্য সভ্যতার এই কলঙ্কটীও আদিম নিবাসীদিগের সমাজে প্রবেশ লাভ করে এবং তাহাদিগের ধ্বংশের পথ প্রশস্ত করিতে থাকে। ক্রমে এই পাপ তথায় এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে ১৮৯৯ এবং ১৯০৬ সনে সার্ব্বজনীন পানদোষনিবারিণী সমিতির (International congress against alcoholism) ব্রুশেল নগরীর অধিবেশনে মদ্যপান রহিত করিবার জন্য এক আইন বিধিবদ্ধ করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত এতদ্দেশেও তাহার দোষগুলি সংক্রামিত হইয়াছে, এমনকি ইংরাজী শিক্ষার অত্যাবশ্যক অঙ্গ বলিয়া মদ্যপান একদিন শিক্ষিত সমাজে স্পর্দ্ধার বিষয় হইয়াছিল। "সধবার একাদশীতে" যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা হইতেই তখনকার শিক্ষিত সমাজের যে কতদূর অধঃপতন হইয়াছিল তাহার মাত্রা নির্দ্দেশ করা যায়। কিন্তু এ আধ্যাত্মিকতার দেশে অচিরেই ইহার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইতে থাকে, আজ আর পথপার্শ্বে কর্দ্দমাক্ত কিংবা নর্দ্দমার পূতিজল সিক্ত উচ্চশিক্ষার গৌরবোজ্জল দেহ তেমন দেখিতে পাওয়া যায় না। "I shall drink till the bottom of the flash shall be parallal to the ceiling" আজ বাহাদুরীর বিষয় না হইয়া লজ্জারই কারণ হইয়াছে।

মদ্যপানের সঙ্গে মানব জাতির সর্ব্বাঙ্গীন দুর্দ্দশার এইরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ দেখিতে পাইয়াই বিশ্বপ্রেমিক মহাত্মাগণ এই ব্যাধি নিবারণের জন্য স্থানে স্থানে সমিতি স্থাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই সমিতাচার সমিতি (Temperance Assoiation) পানদোষ দূরীকরণে মানবের হিতসাধন করিতেছে। আমাদের গবর্ণমেণ্টের আবকারী নীতির অন্তস্তলে এই সংস্কারক দলের প্রতি যথেষ্ট মহানুভূতি দৃষ্ট হয়। আবকারী বিভাগ হইতে ভারত গবর্ণমেণ্ট ১৩ কোটী টাকা রাজস্ব প্রাপ্ত হয়, তথাপি এই দোষ নিরাকরণার্থ শুল্কের হার যথাসম্ভব বৃদ্ধি করিয়া মদ্যের প্রচলন যথাসম্ভব কমাইয়া দেওয়াই এই নীতির মূলমন্ত্র। রহিত (Prohibition) করা প্রথ আমেরিকায় গৃহীত এবং কার্য্যকরী হইয়াছে। শুষ্ক আমেরিকায় (Dry America) লোকের কার্য্যকরী এবং উৎপাদিকা শক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং অবৈধ উপায় অবলম্বনে মদ্য প্রস্তুত করা দূরে থাকুক প্রলোভনের বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পান লিপ্সাও তিরোহিত হইয়াছে। আমেরিকার ৪৮ টী প্রাদেশিক রাজ্যের (state) ৪৪ টী এই প্রতিষেধ নীতি সমর্থন করিয়া জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। কোন কোন দেশে রেলে, বিশ্রাম ঘরে বা ভোজনাগারে ইহার ব্যবহার রহিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

কিন্তু হায়! সমাজের প্রত্যেক স্তরেই আজিও মদিরার প্রভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। কত সম্মানী ব্যক্তির মান মর্য্যাদা যে ইহার মহিমায় লুপ্ত হইয়াছে ও হইতেছে, স্ত্রী পুত্রের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া কত দরিদ্র শ্রমজীবি যে ইহার সেবায় উৎসন্ন যাইতেছে, আশা ও ভরসার স্থল কত যুবকের যৌবন ও সাহস, আশা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা যে ইহার তরল তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতেছে, কত রণ-কেশরীর সংগ্রাম কৌশল ও শৌর্য্য বীর্য্য যে মদিরার মোহে চিরদিনের মত প্রচ্ছন্ন হইয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? এই ভাবে ইহা পারিবারিক অধোগতির পথ প্রশস্ত করিয়া সমস্ত জাতীয় জীবনটাকেই নির্ব্বীর্য্য, নিস্তেজ ও উৎসন্ন করিয়া আসিতেছে। ধনীর ও

জমিদারের অট্টালিকার যে ধ্বংশাবশেষ গ্রামে গ্রামে সহরে সহরে প্রাচীন গৌরবের স্মৃতিচিহ্নরূপে বিরাজমান রহিয়াছে, চক্ষুষ্মান প্রত্নতাত্ত্বিকের চক্ষু দেখিতে পাইবে, তাহার জীর্ণ ইষ্টক স্তূপের উপরে উজ্জ্বল অক্ষর খোদিত রহিয়াছে—'মদিরা মহিমা'।

শ্রীপরেশনাথ বসু।

অন্তরাত্মা।

পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধে 'মায়া ও স্বাধীন ইচ্ছার' স্বরূপ সংক্ষেপে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি, "মীয়তে অনয়া ইতি মায়া"—যাহার দ্বারা জড় জগতের বস্তু সমূহের পরিমাণ করা যায় অর্থাৎ তাহাদিগের বিকাশ ও বিলয়ের প্রকৃত তথ্য অবগত হওয়া যায় তাহারই নাম মায়া, যে সকল প্রাকৃতিক বিধানের বশবর্ত্তী হইয়া জড় জগৎ চলিতেছে, তাহাদিগেরই সাধারণ নাম মায়া। এক হিসাবে ইহা বিদ্যা, অপর হিসাবে ইহা অবিদ্যা, যখন এই প্রাকৃতিক বিধানের অনুসরণ করিয়া জড় জগতের কার্য্য কারণ বুঝিতে চেষ্টা করা হয়, তখন ইহা বিদ্যা বা বিজ্ঞান, আর যখন স্বাধীন ইচ্ছা সম্পন্ন মানুষ আপনাকেও এই বাঁধা বাঁধি নিয়মের অধীন মনে করিয়া ইহার নিকট মস্তক অবনত করে, তখন ইহা অবিদ্যা বা অজ্ঞান।

কাজেই মায়ার নিকট আত্ম সমর্পণই মানুষের সকল দুঃখের কারণ। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বিশ্বনিয়ন্তার ভাণ্ডার অর্থাৎ অভিব্যক্তরূপে তিনি নিজেই অনন্ত সুখ এবং অনন্ত দুঃখে পরিপূর্ণ। কিন্তু একটু সূক্ষ্ম ভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে, প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি কেবলই অনন্ত সুখ, অনন্ত আনন্দ। তিনি চৈতন্যময় ও ইচ্ছাময়—তাঁর জানেন, তাঁহার ইচ্ছাই সিদ্ধি। যাহা কিছু ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে সকলই তাঁহার ইচ্ছায়। এমত অবস্থায় তিনি আনন্দঘন বই আর কিছু হইতে পারেন কি?

মানুষকে তিনি স্বাধীন ইচ্ছা দিয়াছেন, সৃষ্টির অপরাংশ তিনি এই ইচ্ছা হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছেন। মানুষও প্রথমে আনন্দঘনই ছিল—যাহা ইচ্ছা করিয়াছে, তাহাই তখনই মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইয়াছে এবং তাহাকে আনন্দে বিভোর করিয়াছে। আপনার অসীমতা ও অনন্ততা অনুভব করিয়া সে আনন্দময় ছিল—"ত্রিতাপের" সঙ্গে তাহার পরিচয়ই ছিল না, "ত্রিতাপ" তখনও প্রকাশই পায় নাই।

যখন সে মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আপনার স্বাধীন ইচ্ছার কথা ভুলিয়া গেল, তখনই সে আপনাকে সান্ত ও সসীম করিয়া ফেলিল, মায়ার অধীন জড় জগতের বস্তু সকলের বিলয় এখন সে অবশ্যম্ভাবী বলিয়া স্বীকার করিয়া লইল—যাহা ভালবাসে তাহার বিনাশে কাঁদিতে এবং যাহা ঘৃণা করে তাহার বিনাশে হাসিতে লাগিল। সে ভুলিয়াই গেল যে, ইচ্ছা করিলেই সে সাধারণতঃ বিনাশশীল বস্তুকে অবিনাশী করিয়া রাখিতে পারে। শুধু তাহাই নহে, এই ভাবে আপনাকেও সে সর্ব্বতোভাবে মায়ার হাতে ছাড়িয়া দিয়া জন্ম জন্মান্তরের চক্রে ঘুরিতে লাগিল! আজ যে ত্রিতাপের জ্বালায় অস্থির হইয়া সে "ত্রাহি ত্রাহি" ডাক ছাড়িয়াছে—সংসার হইতে পলায়নের চেষ্টা করিতেছে, সেই ত্রিতাপ তাহারই নিজের সৃষ্টি ভগবান্ মঙ্গলময়—মঙ্গলই সৃষ্টি করিয়াছেন, আত্মবিস্মৃত হইয়া মানুষ অমঙ্গলের সৃষ্টি করিয়া আজ চোখের জলে পথ দেখিতে পাইতেছে না! যদি 'ত্রিতাপের' হাত এড়াইতে হয়, তবে তাহাকে আবার স্বাধীন ইচ্ছার বিকাশ সাধন করিতে হইবে—অতিমায়িক অর্থাৎ অতি প্রাকৃতিক জীবন যাপন করিতে হইবে। ইহাই তাহার চরম লক্ষ্য ও পরম পরিণতি।

লেখকের যন্ত্রস্থ গ্রন্থ "উত্তর শ্রেয় ও পরমপদ" হইতে গৃহীত।

স্বাধীন ইচ্ছার পরিচালনাই তাহার 'স্ব-ধর্ম্ম', 'পর-ধর্ম্ম' অর্থাৎ মায়ার ধর্ম্ম অনুসরণই তাহার মরণের কারণ হইয়াছে।

কেমন করিয়া স্বাধীন ইচ্ছার আবার বিকাশ সাধন করা যায়, এখন সেই সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাইতে পারে।

তোমার প্রাণের অন্তস্থলে, হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে, এমন একটা স্থান আছে যেখানে আঘাত লাগিবামাত্রই তোমার শিরায় শিরায় কার্য্যকরী শক্তি বিদ্যুতের মত ছুটিয়া আসে, তখন তোমার অজ্ঞাতসারেই, আঘাতের প্রকৃতি ও শক্তি অনুসারে, কখনও তোমার চক্ষু ফাটিয়া দর বিগলিত ধারে অশ্রু গড়াইয়া পড়ে, অথবা অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ ছুটিতে থাকে ; কখনওবা আনন্দে প্রাণ এমনই মাতোয়ারা হইয়া উঠে যে, এমন যে কঠিন গম্ভীর পুরুষ তুমি সেই তুমিও বালকের মত সরল-তরল হইয়া পড়— কখনওবা দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ কর, অথবা ভক্তিতে মাটিতে লুটালুটি খাইয়াও তৃপ্ত হও না! কখনওবা আবার, তুমি ভাবিয়া চিন্তিয়া লইবার পূর্ব্বেই, তোমার হাত যাইয়া অপরের মাথাটাই কাটিয়া ফেলে! মন হইতে যে ভাবের উদয় হয়, তাহার প্রকাশ তেমন স্পষ্ট হয় না। অন্তরাত্মার বিচার শক্তি তখনও অজ্ঞাতসারে ফলাফলের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে এবং আইন আদালতের কথাটা সঙ্গে সঙ্গে মনে জাগাইয়া তোলে বলিয়া মনের ক্রোধ তোমাকে গালি গালাজ, চড় চাপড়ের বেশী কোন কাজে প্রবৃত্ত করিতে পারে না। কিন্তু ক্রোধের কারণটা যখন এমন প্রবল ও আকস্মিক হয় যে, ক্রোধটা একেবারে অন্তরাত্মায় ভাবের আন্দোলন উত্থিত হয়, তখন আর আইন আদালতের কথা তোমার মনেই আসে না; তুমি অনায়াসে যাহার উপর ক্রোধ কর, তাহার মাথাটাও কাটিয়া ফেল! প্রত্যেক ভাব সম্বন্ধেই এই কথা। অন্তরাত্মার ভাবের আন্দোলন উত্থিত হইলে, দেশ কাল পাত্র ভুলিয়া, বৃদ্ধও বালকের মত উলঙ্গ হইয়া নাচিয়া থাকে অথবা ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলে—একবারও তাহার মনে হয় না, কে কি বলিবে।

এই যে স্থানটা যেখানে আঘাত লাগিলে দেশ কাল পাত্রের সীমা উড়িয়া যায়, এটাই হইল তোমার অন্তর্য্যামী অন্তরাত্মা। এখানে আঘাত লাগিয়া শক্তির উদ্ভব না হইলে মানুষের হৃদয়ে ঐকান্তিক ভাব ও নিষ্ঠার স্থান হয় না, এবং 'ভাবে বিভোর' হইয়া মানুষ, সহজ অবস্থায় যাহা অসাধ্য, তাহা সাধন করিতে পারে না। জন্ম-জন্মান্তরের অন্তস্থল দিয়া যে একটা অবিচ্ছিন্ন নীরব-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, তাহাই অন্তরাত্মা। যে কথা, যে ঘটনা, যে দৃশ্য তোমার 'মর্ম্ম' স্পর্শ করে, তাহার চিত্র এইখানেই অঙ্কিত রহিয়া যায়, এবং জাগ্রত ও নিদ্রাবস্থায় অনেক সময় তোমার মানস চক্ষুর সম্মুখে উদিত হইয়া আস্বাদিত পূর্ব্ব সুখ ও দুঃখ তোমাকে আবার আস্বাদ করাইয়া থাকে। এই অন্তরাত্মায়ই তোমার পূর্ব্ব জীবনের চিন্তা, ভাব ও কর্ম্মজনিত বিশ্বাস ও সংস্কার নিহিত রহিয়াছে, ইহাকে জাগাইলেই, সেই বিশ্বাস ও সংস্কার প্রবল হইয়া তোমাকে পূর্ব্বানুসৃত পথে টানিয়া লইয়া যাইবে—যেমন দস্যু রত্নাকরকে, মহারাজ বিশ্বামিত্রকে, বিল্বমঙ্গলকে এবং লালা বাবুকে লইয়া গিয়াছে।

যে মন দিয়া তুমি বহির্জ্জগতের সঙ্গে আদান প্রদান করিতেছ, তাহা বহির্ম্মুখী—সর্ব্বদাই বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। যে ভাব-তরঙ্গ এই মন আলোড়িত করিয়া, তাহার অন্তঃস্তলে অবস্থিত অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত পৌঁছায় না, সেই ভাব সতত চঞ্চল ; যে ক্রিয়ায় তাহার প্রকাশ, তাহাও সাধারণতঃ অসার ও অস্থায়ী। তোমার জীবনের সাধারণ কাজগুলির মূলে যে ভাব ও ইচ্ছা, তাহা এই মন হইতে উদ্ভূত হয়। কাজেই ভাবও গাঢ় হয় না, ইচ্ছাও প্রবল হয় না এবং ইচ্ছার পূরণও কদাচিৎই হইয়া থাকে।

কখনও সকল ইন্দ্রিয়-পথে এক সঙ্গে বিষয়-বাতাসের স্রোত আসিয়া মনটাকে দশদিকে চালিত করিয়া থাকে; তখন কোনই কার্য্য হয় না। কখনওবা কোনও বিশেষ ইন্দ্রিয়-পথে অধিকতর প্রবল বাতাস আসিয়া একদিকে মনটাকে অপেক্ষাকৃত প্রবলবেগে ঠেলিয়া লইয়া যায়। এই সময়ে যে রকমের হউক একটা ভাবের, এবং সবল হউক দুর্ব্বল হউক একটা ইচ্ছারও বিকাশ হয়। এটাই হইল তোমার সাধারণ অংশ; কিন্তু এ সময়েও একটা ইচ্ছা জাগরিত হইয়া পূর্ণ হইতে না হইতেই অপর শত ইচ্ছা জাগরিত হইয়া পরস্পরকে ব্যর্থ করিয়া দেয়।

কিন্তু কোনও সময়ে না কোনও সময়ে কোনও বিশেষ ইন্দ্রিয়-পথে এমন প্রবল একটা ঝাপ্‌টা আসিয়া উপস্থিত হয় যে, তখন মনে যে তরঙ্গ ওঠে, তাহাতে মনের অন্তস্তল পর্য্যন্ত আলোড়িত হইয়া পড়ে। এই সময়ে যে ভাবের ও যে ইচ্ছার উদ্ভব হয়, তাহার শক্তি আসে, মন হইতে নয়, অন্তরাত্মা হইতে। এই যে ইচ্ছা, ইহার শক্তি অমোঘ, ইহা পূর্ণ হইবেই হইবে।

যদি সিদ্ধিলাভ করিতে চাও, 'মনে' ইচ্ছা না করিয়া অন্তরাত্মায় ইচ্ছা করিও। অন্তরাত্মা জীব ও শিবের মধ্যবর্ত্তী এবং উভয়ের সংযোগ-সূত্র। জীব মনের দাস, সেই মন দিয়া ইচ্ছা করে, সেই মন দিয়া ভগবানকে ডাকে; কাজেই তাহার ডাক ভগবানের কাণে পৌঁছেনা, ইচ্ছাও পূর্ণ হয় না, কারণ শিবের সঙ্গে যে মনের সোজা সংযোগ নাই। মনের ডাক যদি অন্তরাত্মায় পৌঁছায়, অন্তরাত্মা তখন তোমার নিবেদন শিবের নিকট পৌঁছাইয়া দিবে। তুমি ঢাকা হইতে বোম্বে সংরে কি সোজা 'তার' প্রেরণ করিতে পার? ঢাকা-আপিস তোমার সংবাদ কলিকাতার কেন্দ্র আপিসে পাঠাইলে সেখান হইতে বোম্বে যাইয়া পৌঁছে, নতুবা কিছুতেই পৌঁছিবে না। তোমার মন যখন অন্তরাত্মার দ্বারে আঘাত করিবে, অন্তরাত্মায় তখন ইচ্ছার উদ্ভব হইবে এবং সেই ইচ্ছা ভগবানের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে তোমার ঈপ্সিত বস্তু আকর্ষণ করিয়া আনিবে।

সাধারণ জীবনে তুমি এমনই বহির্ম্মুখ হইয়া রহিয়াছ যে দুঃখের বেদনা কিংবা সুখের কোমলস্পর্শ কিছুই তোমার অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত যাইয়া পৌঁছেনা। তবে এ কথা ঠিক যে, সুখ অপেক্ষা দুঃখের আঘাতটা প্রবলতর, এবং অনেক সময় সেটা কিয়ৎ পরিমাণে অন্তরাত্মাকে ব্যাকুল করিয়াও থাকে; তাহার ফলে দুঃখের কথা, দুঃখের স্মৃতি তোমার মনটাকে জড়াইয়া ধরিয়া রাখে এবং অন্তরাত্মাও ক্রমশঃ অধিকতর দুঃখই আকর্ষণ করিয়া আনিতে থাকেন।

যে দুঃখ তোমার মনে তরঙ্গ তুলিয়া অন্তরাত্মার দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহাকে বাধা দাও। তাহার বিপরীত বস্তুটাকে—যাহা পাইলে এ দুঃখের আর সম্ভাবনা থাকিবে না—কল্পনা ও ভাবনা দ্বারা পুষ্ট করিয়া মন তাহাতে বাঁধিয়া ফেল। আরও ভাবিতে ভাবিতে, কল্পনায় সেই সুখের চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়া উপভোগ করিতে করিতে, মনটাকে অন্তর্ম্মুখী করিয়া অন্তরাত্মার দিকে ছুটাইয়া দাও। যতই তন্ময় হইয়া এই সুখের তুমি কল্পনা করিবে, অন্তরাত্মার আকর্ষণী শক্তি ততই বিকশিত ও পুষ্ট হইতে হইতে সেই সুখ তোমায় বহন করিয়া আনিয়া দিতে থাকিবে। অন্তরাত্মা হইতে যখন ইচ্ছা ধাবিত হয়, তখন আপনার শক্তিতে সে এমন শক্তিমান যে 'বিঘ্ন' তাহার লক্ষ্যই হয় না, 'ত্যাগের' কথা তাহার আমলেই আসে না; 'বিঘ্ন' ও 'ত্যাগ' সে বোঝেই না। 'সিদ্ধিলাভ করিব' এই প্রবল বিশ্বাসে সে ছুটিয়া চলে এবং সাধারণ অবস্থায় যাহা অজেয় বিঘ্নস্বরূপ, অনায়াসে তাহা পদদলিত করিয়া আপনাকে পূর্ণ করিয়া থাকে। বাড়ীতে যখন আগুণ লাগে, তখন গৃহস্বামীর জীর্ণ দুর্ব্বল দেহেও এমনই শক্তির সঞ্চার হয় যে, সহজ অবস্থায় সে যদি আধমন ওজনের জিনিষও তুলিতে না

পারে, তখন সে অনায়াসে একমণ ওজনের জিনিষও তুলিয়া লইয়া যায়। এ শক্তি তাহার কোথা হইতে আসে ;—আসে অন্তরাত্মার বিশ্বাস হইতে। 'পারিব কি "পারিব না' মনের এই যে ভাব, তখন তাহাতে স্থান পায় না—'বিঘ্ন' বলিয়া কোনও জিনিষ সে স্বীকার করে না।

প্রথমতঃ বহির্ম্মুখী উদ্দাম চঞ্চল মনটাকে অন্তরাত্মার দিকে টানিয়া নিতে বেগ পাইতে হইবে। অনেক সময় ভাবটা গাঢ় হইয়া কল্পনা সজীব করিয়া তুলিতে পারিবে না; তাই দুর্ব্বল কল্পনা পুষ্ট ভাবটা যাইয়া অন্তরাত্মায় আকর্ষণী ইচ্ছা-শক্তিও জাগাইতে পারিবে না। কিন্তু হতাশ হইও না—'অভ্যাস যোগের' স্মরণ লইও। ক্রমশঃ মন বহির্জগৎ হইতে বিচ্যুত হইয়া স্থির হইয়া আসিতে ও কল্পনার মধুর আস্বাদ পাইয়া তাহাতে নিবদ্ধ হইয়া বসিতে থাকিবে ; এবং কল্পনা যাইয়া অন্তরাত্মার নিকট তোমার নিবেদন জানাইবে। তখন অদম্য ইচ্ছা-শক্তি জাগরিত হইয়া সুধু যে তোমার তখনকার অভীপ্সিতই প্রদান করিবে তাহা নহে—অন্তরাত্মায় উদ্ভূত সকল ইচ্ছাই পূর্ণ করিবে। এমন কি, তোমার ঐকান্তিক ইচ্ছা হইলে, ভগবানের যে অনন্ত গুণরাজি তুমি আকর্ষণ করিতেছ, তাহারা সমবেত হইয়া তোমার ইষ্ট মূর্ত্তিই গ্রহণ করিবে এবং তোমার সঙ্গে আলাপ ব্যবহারও করিবে। হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি ব্যারামে ঔষধ পাওয়ার কথা অনেকেই জান। ব্যারাম হইতে মুক্তি লাভের জন্য রোগীর অন্তরাত্মায় যখন প্রবল ইচ্ছা জাগ্রত হয়, তখনই সেই ইচ্ছা ঔষধ সৃষ্টি করিয়া থাকে অথবা আকর্ষণ করিয়া আনে। "ভক্তিতে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর"—কথারও ইহাই সার তত্ত্ব।

মন্ত্র ও ধ্যান তোমার ঈপ্সিত গুণরাজির দিকে তোমার বহির্ম্মুখী মনটাকে আকৃষ্ট করিবার কৌশলমাত্র। যে নাম বা মন্ত্র লইলে তোমার অভীপ্সিত গুণরাজির চিত্র জাগিয়া ওঠে,সেই মন্ত্র, সেই নাম তুমি লইতে পার। গুণগুলি যদি পরিষ্কার ভাবে সর্ব্বদা তোমার মনে জাগরূক থাকে, নাম বা মন্ত্রের তোমার কোনই প্রয়োজন নাই। তোমার ধ্যেয় মূর্ত্তি তোমার আরাধ্য গুণাবলির জমাট্রূপ মাত্র বলিয়া ইহার উপর মনটা সহজেই নিবদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু মূর্ত্তিতে গুণগুলি যদি উজ্জ্বল ভাবে ফুটিয়া না ওঠে কিংবা মূর্ত্তি ছাড়াও যদি গুণগুলির উপরে মন নিবদ্ধ হইতে পারে, তবে মূর্ত্তির কোনই প্রয়োজন নাই। মোট কথা, গুণগুলিই তোমার ধ্যেয় ও ইষ্ট। যে ভাবে পার, সেই গুলিতে বহির্ম্মুখী মনটাকে লয় করাইয়া দিবে। ইহাই জপ, ইহাই ধ্যান।

ভগবানের অনন্ত মঙ্গলময় গুণগুলির এই ভাবে ধ্যান করিতে করিতে যখন তুমি তন্ময় হইয়া যাইবে, তখন অন্তরাত্মা তাঁহার ভাণ্ডার হইতে সেই গুণগুলির অজস্র অবিচ্ছিন্ন ধারা তোমার উপর আকর্ষণ করিয়া আনিতে থাকিবেন; এবং সেই গুণগুলির সমবায়ে গঠিত করিয়া তুমি যদি মনে মনে কোনও মূর্ত্তি গড়িয়া লইয়া থাক, অন্তরাত্মা তখন তাহাতে জীবন সঞ্চার করিয়া তোমার নিকট উপস্থিত করাইবেন। তুমি তখন তাঁহার সঙ্গে আলাপ ব্যবহার করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিতে পাইবে। যেমন তোমারই একদিনকার মনের কল্পনা আজ ঘড়ি, বাষ্পীয় পোত, ব্যোমযান প্রভৃতিতে পরিণত হইয়া তোমার মনে অতুল আনন্দ দান ও তোমার অশেষবিধ কল্যান সাধন করিতেছে, ঠিক তেমনই ভাবে তোমার কল্পিত মূর্ত্তিই তোমার সম্মুখে উপস্থিত থাকিয়া তোমার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি সাধন করিবে ও তোমাকে ভগবৎ সাক্ষাৎকরে সুখ উপভোগ করাইবে। ইচ্ছা করিলে অর্জ্জুনের মত, তাঁহার দ্বন্দ্বে গঠিত বিরাট রূপও দেখিয়া লইতে পারিবে।

আরও বুঝাইয়া বলিতেছি। আজ যে বিমান রথ দেখিতেছ, যে রথ তোমাকে বহন করিয়া শূন্যে উঠিতেছে ও দেশ দেশান্তরে লইয়া যাইতেছে,—সেটা তোমারই সৃষ্টি। তুমি তাহাকে যে রূপ ও যে শক্তি

দিয়াছ, সেই রূপ ও সেই শক্তি লইয়া সে তোমার কার্য্য করিতেছে। বাহ্যরূপ ধারণ করিবার পূর্ব্বে এই বিমান-রথের উদ্ভব হইয়াছিল তোমার মনে। আকাশে উড়িবার একটা বাসনা তোমার বহির্ম্মুখী মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল—আপনাকে সর্ব্বতোভাবে মায়ার অধীন মনে করিতেছ বলিয়া, ভিতর হইতে শক্তির বিকাশ সাধনের দিকে তোমার লক্ষ্য যায় নাই, তোমার লক্ষ্য গিয়াছে কৃত্রিম উপায় উদ্ভাবনের দিকে। যাহাই হউক, সীমাবদ্ধ ভাবে স্বাধীন ইচ্ছার পরিচালনা করিয়াই তুমি ক্রমশঃ কত উন্নত হইতেছ, তাহা ভাবিয়া দেখ।

যখন তোমার মনে আকাশে উড়িবার প্রবল বাসনা জাগিয়া উঠিল, তখন সেই বাসনার সঙ্গে সঙ্গে কল্পনাও জাগিয়া ওঠে। কল্পনা অর্থাৎ ধ্যান করিতে করিতে তুমি ক্রমেই তাহাতে তন্ময় হইতে থাক। অর্থাৎ তোমার অন্তরাত্মার উপর কল্পনা কার্য্য করিতে থাকে। ক্রমে সেখানে আশা ও ইচ্ছার উদ্ভব হয়, এবং সেই আশা ও ইচ্ছার আকর্ষণেই যে বিমান-যানটা একদিন তোমার মনের একটা ভাবমাত্র ছিল, আজ তাহাই মূর্ত্তিমান হইয়া তোমার শত প্রয়োজন সাধন করিতেছে!

সেইরূপ, তোমার আরাধ্য গুণগুলির সমাবেশে একটা মূর্ত্তি গড়িয়া লইয়া যদি তাহার সঙ্গে আলাপ ব্যবহার করিতে তোমার মনে প্রবল বাসনা হয়, তবে কল্পনা সেই মূর্ত্তি প্রথমে তোমার মানস চক্ষুর সম্মুখে ফুটাইয়া তুলিয়া তোমার মনটাকে বাহিরের দিক্ হইতে একে একে টানিয়া আনিয়া তাহাতে নিবদ্ধ করিয়া ফেলিবে। তখন অন্তরাত্মা জাগিয়া উঠিয়া তাহাতে জীবন সঞ্চার করিবেন। মূর্ত্তি তখন 'বর' দান করিবে—কথা বলিবে। কিন্তু সে 'বর', সে কথা, অন্তরাত্মারই বর, অন্তরাত্মারই কথা। অতএব, ইচ্ছা হইলে তুমি মূর্ত্তি গড়িয়া ভগবানের সঙ্গে আলাপ ব্যবহার করিতে পার, আর ইচ্ছা না হইলে, নাও করিতে পার। কিন্তু অন্তরাত্মা দিয়া যে ইচ্ছা করিবে, যে গুণ আকর্ষণ করিবে, উভয় পথেই তাহা সমানভাবে লাভ হইবে।

আসল কথা—বহির্ম্মুখী মনকে অন্তর্ম্মুখী করা ও অন্তরাত্মাকে জাগরূক করা। ইহাই হইল সিদ্ধি লাভের মূল মন্ত্র। অন্তরাত্মা যখন জাগ্রত থাকেন, তখন সামান্য একটা কথায়ও এমন একটা পূর্ব্বানুসৃত ভাবের তরঙ্গ উঠিয়া মানুষকে আকুল করিয়া তোলে যে, তখন আর তাহার সাধারণ জ্ঞানের দিক্ বিদিক্, হিতাহিত বোধ থাকে না। সাধারণ অবস্থায় যাহা সে কল্পনাও করে নাই, কিংবা মনে হইলেও শিহরিয়া উঠিয়াছে, তখন অনায়াসে সে সেই দুষ্কর কার্য্যও করিয়া বসে। "বেলা ত' গেল" কথাটা লালাবাবু জীবনে শত সহস্রবার শুনিয়াছিলেন কিন্তু শুনিয়াছিলেন চঞ্চল মন দিয়া। একদিন যে কোনও কারণে মনটা নিস্তেজ ছিল—বহির্জ্জগতের সঙ্গে তেমন সম্বন্ধ ছিল না। এই অবস্থাটাকে সাধারণ ভাষায় আমরা 'উদাস-উদাস' ভাব বলি, এবং অল্প বিস্তর পরিমাণে সকলের জীবনেই অনুভব করিয়া থাকি মনের যখন এই উদাস-উদাস ভাব, তখন তাহার কাণে প্রবেশ করিল, "বেলা ত' গেল"! মন নিস্তেজ, কথাটা যাইয়া একেবারে অন্তরাত্মার আঘাত করিল। অন্তরাত্মাই পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান জন্মের সংযোগ-সূত্র অথবা অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ। সেই আঘাতে পূর্ব্বজন্মের অনুসৃত বৈরাগ্যের ভাবটা প্রবল ভাবে জাগিয়া উঠিল—পরিবারের মমতা, সংসারের বন্ধন ঐ এক কথায় ছিন্ন হইয়া গেল!

অতএব অন্তরাত্মাকে জাগাইয়া তুলিয়া ঈপ্সিত গুণ-গুলি ভগবানের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে আকর্ষণ করিতে থাক। ইহাই তোমার একমাত্র কর্ত্তব্য এবং প্রকৃত সাধনা।

অন্তরাত্মাকে জাগাইতে হইলেই মনটাকে নিস্তেজ করিতে হইবে। কিন্তু চাপিয়া ধরা অথবা বাঁধিয়া রাখা ত' আর চলিবে না। পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের পথে বাহির হইতে শত প্রলোভন, শত আশঙ্কা আসিয়া

ইহাকে নাচাইয়া তুলিতেছে। তুমি যত একটু ঠাণ্ডা হইয়া বসিতে, সে আরও উদ্দাম ভাবে নাচিতে আরম্ভ করে।

নিস্তেজ করিতে হইলে কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের প্রতি ইহাকে ধাবিত করিতে চেষ্টা কর। খুব সোজা, যার মধ্যে বিশেষ কোনও ভাজ-গোঁজ নাই এমন একটা জিনিষ হাতে লইয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া খুব ভালরূপে দেখিয়া লও। যখন বুঝিবে ইহার সকলই দেখিয়াছ, কোথায় কোন্ বিশেষত্বটি আছে, তাহা ঠিকই তোমার নজরে পড়িয়াছে, তখন চক্ষু বুজিয়া সেই জিনিষটার চিত্রটি মানস চোখে দেখিবার চেষ্টা কর। একবারে হোক্, একদিনে হোক্, দশদিনে হোক্—যতক্ষণ না এই চিত্রটি তুমি ফুটাইয়া তুলিতে পারিবে, ততক্ষণ এই ভাবেই চলিতে থাকিবে। শেষে একদিন নিশ্চয় চিত্র উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। তখন অপেক্ষাকৃত জটিল বিষয় লইয়া কাজ আরম্ভ করিও। ক্রমে দেখিতে পাইবে, যে বিষয়েই তুমি চিন্তা করিতে বস না কেন, অন্যান্য বিষয় হইতে উঠিয়া আসিয়া মন তাহাতেই ডুবিয়া যায়। তখন আর ইন্দ্রিয়-পথে বহির্মুখী আকর্ষণ আসিয়া তাহাকে টানিয়া লইতে কিংবা নাচাইয়া তুলিতে পারে না। ভগবানের আরাধ্য গুণগুলির সমবায়ে গঠিত একটা মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া তাহার ধ্যান ও ধারণার যে কথা, তাহারও এই লক্ষ্য। ক্রমে ধ্যেয় বিষয়ে মনটা এতই ডুবিয়া যাইবে যে, ধ্যেয় মূর্ত্তির সঙ্গে তুমি একীভূতই হইয়া যাইবে—তোমার পক্ষে বহির্জ্জগৎটা তখনকার মত একেবারে লয় পাইয়া যাইবে। তখন অন্তরাত্মা সম্পূর্ণ জাগরূক হইয়া বসিবেন, এবং বিশ্বেশ্বরের অনন্ত ভাণ্ডারের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ সংযোগ রহিয়াছে বলিয়া তাঁহার আকর্ষণে তোমার ঈপ্সিত বস্তু আসিয়া তোমার বাসনা পূর্ণ করিবে।

উদ্দাম গতিতে চলন্ত এঞ্জিনের গতি হঠাৎ রোধ করিতে হইলে গার্ড 'ব্রেক্' কষিয়া থাকে। যাই ব্রেক্ কষা হইল, অমনি সাপের মাথায় ধূলা পড়িল, হুঁস্ হুঁস্ ফোঁস্ ফোঁস্ করিতে করিতে এঞ্জিন্ স্থির হইয়া দাঁড়াইল। মনরূপ এঞ্জিন্‌টাকে দমাইয়া আনিতেও ভগবান্ এইরূপ একটা 'ব্রেকের' ব্যবস্থা করিয়াছেন। গার্ড তুমি ঘুমাইয়া রহিয়াছ বলিয়া 'ব্রেকের' দিকে তোমার লক্ষ্যও হয় না, 'ব্রেকের' উপর তোমার হাতও পড়ে না; কাজেই মন, যেভাবে ইচ্ছা যেদিকে ইচ্ছা, তোমাকে লইয়া ছুটিয়া যাইতেছে।

শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়াটা এই 'ব্রেক্'। একটু ভিতরের দিকে চাহিলেই বুঝিতে পারিবে, কথাটা কত সত্য। যখন ছুটাছুটি করিয়া হাঁপাইতে থাক, তখন লক্ষ্যটা যায় শ্বাসের দিকে, এবং অন্য ভাবনা চিন্তা সকলই মন হইতে দূরে সরিয়া পড়ে। আকস্মিক বিপৎ-পাতের কিংবা অপ্রত্যাশিত সুখের সংবাদটা যখন তোমার কানে প্রবেশ করে, লক্ষ্য করিও, দেখিবে, তখন শ্বাস প্রশ্বাস স্থির হইয়া আসিতেছে, এবং মনটাতেও, যে কথা তুমি শুনিলে, সেই কথাছাড়া অন্য কথার স্থান নাই।

তাই, মন নিস্তেজ করিতে হইলে শ্বাস প্রশ্বাসটার দিকেও লক্ষ্য করিতে শিখিও। শ্বাস টানিয়া ভিতরে কতদূর পর্য্যন্ত বায়ু চালনা কর, এবং প্রশ্বাস ফেলিবার সময় কোন্ স্থান হইতে বায়ু বাহির হইতে থাকে, প্রথমে তাহা কয়েকবার লক্ষ্য করিয়া অভীষ্ট বিষয়ের প্রতি মনঃসংযোগ করিতে চেষ্টা করিও। এই ভাবে, যুগপৎ শত বিষয়ে চিন্তাপরায়ণ মন প্রথমে স্থির হইয়া পরে একটি মাত্র বিষয়ে চিন্তা করিতে শিখিবে এবং ক্রমে তাহাতে ডুবিয়া যাইবে।

মনঃ সংযমের আর একটি উপায় হইতেছে চিন্তা করা যে, আমার কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুগুলি সাম্যভাব ধারণ করিয়াছে—আমার মন শান্ত হইয়াছে, আমি সাম্যভাব ধারণ করিয়াছি—আমিই মূর্ত্তিমান

সাম্য। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে মনে সাম্যের একটা চিত্র ফুটিয়া উঠিবে, এবং মন বাস্তবিকই বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ছুটাছুটি ত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ ধীর ও শান্ত হইয়া আসিবে।

আর একটা কথা কখনই ভুলিও না। দেশলায়ের কাঠির মাথায় যে সামান্য একটু কালো বস্তু থাকে, তাহাতেই বিশ্বগ্রাসী অনলের লেলিহান্ জিহ্বা লুক্কায়িত আছে। জলে ভিজাও, সে জিহ্বা কখনই বাহির হইবে না; হয়ত একটু একটু করিয়া সে কালো বস্তুটা খসিয়াই পড়িবে। বাক্সের গায়ে তাহার সমধর্ম্মী কালো বস্তুটার যে একটা বিস্তৃত প্রলেপ থাকে, সেই প্রলেপটার উপর ঘষিলে, সেই কালো কণিকাটা তখন আপনার উজ্জ্বল তেজোময় রূপ ধারণ করিয়া যাহা দাও, তাহাই নিজস্ব—নিজের সঙ্গে একীভূত করিয়া লইতে চাহিবে।

তোমার অন্তরাত্মাটা সেই দেশলায়ের মাথার কালো কণিকাটুকু—কিন্তু বিশ্বগ্রাসী শক্তি ইহাতে নিহিত। মন-রূপ জলে তুমি ইহা ভিজাইয়া রাখিয়াছ ও কালো প্রলেপটার উপর না ঘষিয়া যেখানে সেখানে ঘষিতেছ বলিয়া, আগুণ আর জ্বলিতেছে না। বহুকাল জলে ভিজিয়া কণিকা স্যাঁৎসেঁতে হইয়া পড়িয়াছে—অস্থানে ঘষায় ঘষায় অনেকটা ক্ষয়ও পাইতে বসিয়াছে। আবার জ্ঞানের উত্তাপে বিশুষ্ক করিয়া লও, বিশ্বাস ও আশার ভাণ্ডার হইতে কালো বস্তুটা নূতন করিয়া মাখিয়া লও এবং ভগবানের অনন্তভাণ্ডার-রূপ কালো প্রলেপটার সঙ্গে তাহার সংযোগ সাধন কর—তখন দেখিবে, সেই দেশলায়ের মাথার ক্ষুদ্র কণিকাটুকুর কি তেজ, কি আভা!

অসীমানন্ত ভগবানের অংশ তুমি, তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত, তাঁহাদ্বারাই অনুপ্রাণিত, তাঁহা হইতে অভেদ। বিশ্ব-সংসারের যে দিকে চাহিয়া দেখ, দেখিবে একই ভাবে সকলেরই উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়। অতএব মণিমালার অন্তর্নিহিত অলক্ষ্য সূত্রটির মত 'একটা বস্তু' যে এই অসংখ্য মণিগুলিকে ধরিয়া রাখিয়াছে, এবং সেই 'একটা বস্তু' হইতে তুমি যে অভিন্ন তাহা তোমার বিচার-বুদ্ধিই—তোমার চৈতন্যই—তোমাকে বলিয়া দিবে।

সেই 'একের' অনন্তমুখী শক্তি, অপরিমেয় প্রভাব, তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত আমি, তাঁহার চৈতন্যে চৈতন্যময় ও স্বাধীন ইচ্ছায় ইচ্ছাময় আমি, তাঁহা হইতে অভেদ আমি—আমারও অনন্ত শক্তি, অপরিমেয় প্রভাব—তোমার অন্তরাত্মাই তখন তোমাকে একথা বলিয়া দিবেন। আশা,আকাঙ্ক্ষা এবং চিন্তায় তোমার অপরিসীম শক্তি, সে শক্তি তুমি খর্ব্ব করিও না। অনন্ত ভাণ্ডারের মালিক হইয়া কণিকার আশা করিয়া ও তদনুরূপ চিন্তা করিয়া, আপনার অনন্ত শক্তি তুমি সীমাবদ্ধ করিও না। যাহা চাও, তাহার অনন্ত ভাণ্ডার ধরিয়া টান দাও; যত যোরে টান পড়িবে, তত বেগে ও তত পরিমাণে ভাণ্ডার হইতে রত্ন আসিতে থাকিবে। রৌদ্র, বায়ু ও জলের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে সকলেই যথেচ্ছ গ্রহণ করিতেছে, তথাপি কাহারও সঙ্গে কাহারও দ্বন্দ্ব নাই। প্রত্যেকেই অনন্ত ভাণ্ডারের মালিক—অনন্ত পরিমাণে ভোগ করিতেছ। ভগবানের অনন্ত ভাণ্ডারের অন্যান্য রত্নও এই ভাবেই অনন্ত পরিমাণ ভোগ করা যায় অথচ কাহাকেও বঞ্চিত করা হয় না এবং নিজেরও কখনও বঞ্চিত হইবার আশঙ্কা নাই।

'কোনও প্রকারে দশটা টাকা আনিতে পারিলেই হইল', এইরূপ আশা আকাঙ্ক্ষা ও চিন্তা যাহার, তাহার প্রাপ্তি দশ টাকার মধ্যেই হইবে। ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশে, ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। আর যাহার আশা, আকাঙ্ক্ষা ও চিন্তা পরিমাণের গণ্ডীবদ্ধ নহে, যে 'পারিব কি না পারিব' চিন্তা না করিয়া, 'নিশ্চয় পারিব' এই বিশ্বাসের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া পৃথিবীর মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে চায়, সে যে শীঘ্রই অনেক

উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া বসে, আমেরিকা ও ইউরোপে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে। ধনে বিজ্ঞানে শিল্পে সাহিত্যে সে দেশের লোক তাই এত উচ্চে। প্রত্যেক বিষয়েই এই ভাবে অপরিমেয় সিদ্ধি লাভ করা যায়, এবং সূর্য্যকে ধরিয়া থাকিলে যেমন রাত্রির পরিচয় পাওয়া যায় না, তেমন অনন্ত ভাণ্ডারের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য যোগ সাধন করিতে পারিলে অমঙ্গল, দুঃখ দারিদ্র্য, রোগ শোক তাপ জরাব্যাধি মৃত্যুর সহিতও পরিচয় হয় না।

অন্তরাত্মাকে জাগাইতে হইলে কল্পনার সাহায্য লইতে হয়, একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এখন কল্পনা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

চিন্তার সঙ্গে কল্পনা বিজড়িত। যে বিষয়েই তুমি চিন্তা করিতে বসনা কেন, একটু পরেই কল্পনা তোমাকে সেই বিষয় হইতে ছাড়াইয়া অনেক দূরে লইয়া যায়, এবং নানা রঙ্গে সেই বিষয়টাকেও রঞ্জিত করিয়া থাকে। যাহার কল্পনা যত প্রবল, তাহার উন্নতি ও অধোগতি উভয়েরই পথ তত প্রশস্ত। মানুষের সাধারণ স্তর হইতে যে বিষয়েই যাহারা উন্নতি লাভ করে, সে বিষয়েই প্রথমে কল্পনা তাহাদিগকে নূতন রাস্তায় নূতন যানে বহন করিয়া লইয়া যায়—তার পরে কার্য্যে তাহারা তাহা পরিণত করে। যাহারা অধোগতি অবলম্বন করে, তাহাদেরও বেগ এবং পতনের ভীষণতাও কল্পনা অনুযায়ী হইয়া থাকে। বড় পণ্ডিত, বড় সেনাপতি হইতে হইলেও যেমন কল্পনাই প্রধান অবলম্বন, বড় চোর বড় ডাকাত হইতে হইলেও ইহা তেমনই অবলম্বন। যাহাদের কল্পনাশক্তি দুর্ব্বল অথবা নাই, তাহারা কোন দিকেই বড় হইতে পারে না। শিশুরা যখন খেলিতে থাকে, তখনও লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবে, যে কল্পনাপ্রিয়, সে নিত্য নূতন খেলার অবতারণা করিয়া দলপতি হইয়া বসে; আর যাহার কল্পনা নাই, সে অন্ধভাবে তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে অথবা গৃহস্থালীতে যাহা দেখিয়াছে পুতুল লইয়া তাহারই অনুকরণ করে, ভাত রাঁধে, ভাত খাওয়ায়, বিবাহ দেয়। যদ্দৃষ্টং তৎকৃতং। এ রকমের মানুষ ডোবার জল।

দারুণ ভয়, উদ্বেগ, আশঙ্কা, কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতির মূলেও কল্পনা; আবার প্রবল আশা, আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, প্রেম, প্রীতির মূলেও তাহাই। কল্পনাই তিলকে তালে পরিণত করিয়া একদিকে ভয়ে ম্রিয়মান, অপরদিকে আশায় উৎফুল্ল করিয়া থাকে; একদিকে কলাগাছে ভূত দেখায়, অপরদিকে কালো রূপের উপর বিদ্যুৎ চমকায়।

শিশুর যখন অসুখ হয়, মায়ের কল্পনা তখনই প্রবল বেগে কার্য্য করিতে থাকে। এক মুহূর্ত্তে মৃত্যুর দৃশ্যটি পর্য্যন্তও তিনি দেখিয়া লন আর হৃদয়ের তেজ ও সাহস এবং দেহের বল ও শক্তি হারাইয়া বসেন! আবার এক টাকার হাঁসের ডিম বিক্রয় করিতে যাইয়া মুহূর্ত্তেই, কল্পনার প্রভাবে, রাজা হইয়া বসার দৃষ্টান্তও অল্প নহে!

আমাদের প্রতি কার্য্যের মূলেই কল্পনা ও চিন্তা। কল্পনায় আমাদের উন্নতি এবং অবনতি উভয়ই সাধিত হয়। যে কল্পনায় প্রাণ সঙ্কুচিত হয়, সন্দেহ অবিশ্বাস ভয় উদ্বেগ পুষ্ট ও বলবান্ হয়, তাহা আমাদিগকে মরণের পথে লইয়া যায়। বিঘ্নটাকে বড় ও আপনাকে ছোট কল্পনা করিতে করিতেই, যাহারা একদিন আকাশে বেড়াইয়াছে, আজ তাহারা মাটির উপরও স্বচ্ছন্দে বেড়াইতে পায় না; আর যাহারা একদিন বনে জঙ্গলে পশুর সঙ্গে পশু সাজিয়া বেড়াইয়াছে, উচ্চ হইতে ক্রমশঃ উচ্চতর অবস্থার কল্পনা করিতে করিতে আজ তাহারাই আকাশে উড়িতে সমর্থ হইয়াছে! তাহাদের কল্পনায় আশা, বিশ্বাস, সাহস ও শক্তি বিকশিত ও পুষ্ট হইয়াছে, তাই তাহারা বড় হইয়াছে।

সর্ব্বনাশী কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে তোমাকে

বড় বেশ পাইতে হয় না—সে-ই তোমাকে বেশ টানিয়া নীচের দিকে লইয়া যাইতে পারে ; এবং আত্মীয় বন্ধু, সমাজ ও সংস্কার অনাহূত ভাবে আসিয়া তাহার শক্তি বেশ বাড়াইয়া দিয়া থাকে। তুমি যখন মনে ভাব, দশ টাকার বেশী আমার মূল্য নয়, তখন কয়জন বন্ধু আসিয়া তোমাকে দেখাইয়া দেয় যে, তোমার অপেক্ষা হীনলোকও হাজার হাজার টাকা উপার্জ্জন করিয়াছে ও করিতেছে ? যাহার নিকট যাও, যাহার সাহায্য-প্রার্থী হও, সে-ই বলে, "যে দিনকাল পড়েছে, তোমার চাইতে উপযুক্ত লোকও দশটাকা পায় না। পাও যদি ত' ঢের !"—তোমাকে আরও নামাইয়া দিল না কি ?

কিন্তু যে কল্পনার প্রভাবে দুর্য্যোগ সুযোগে পরিণত হয়, অমঙ্গল হইতে মঙ্গলের উদ্ভব হয়, আকাশের মৃত্যুগর্ভ বিদ্যুৎ ঘরে বসিয়া হাওয়া করে ও আলো দেয়, মাটির মানুষ আকাশে বেড়ায়, সে কল্পনা বড় সহজে মূর্ত্তিমান হইয়া বসেনা।

প্রথমতঃ, যাহা বা যাহারা তোমার এই উন্নতি-অভিমুখী কল্পনায় বাধা দেয় তাহাদিগকে যদি উপেক্ষা করিতে না পার,—ভগবান্ অনন্ত শক্তি, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন ; তাঁহা হইতে অভেদ আমি, তাঁহার শক্তিতে শক্তিমান আমি, অতএব যাহা ইচ্ছা, আমিও তাহাই করিতে পারি, ইহা যদি বিচারে তুমি না জানিয়া থাক, কিংবা বুঝিলেও দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিতে না পার—তবে তাহাদিগের সঙ্গে মিশিয়া তাহাদিগের অবিশ্বাস ও দুর্ব্বলতা গ্রহণ করিও না। যতদিন পর্য্যন্ত নিজের উপর বিশ্বাস স্থাপিত না হয়, যতদিন পর্য্যন্ত, নিজে যাহা বুঝিয়াছ, তাহাই ঠিক এই বিশ্বাস অকাট্য না হয়, ততদিন আপনার কল্পনার কথাও তাহাদিগকে বলিও না।

দ্বিতীয়তঃ, নির্জ্জনে শান্ত মনে বসিয়া তোমার আরাধ্য ভগবানের মঙ্গলময় গুণ বা গুণগুলির বিষয় চিন্তা করিতে থাকিও। যে যে ব্যাপারে সেই সকল গুণের অসাধারণ বিকাশ দেখিতে পাইয়াছ, সেই গুলি ভাবিয়া ভাবিয়া গুণগুলিকে জীবন্ত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিও। কল্পনার চোখে দেখিতে থাকিও যেন ভগবানের সেই গুণ-ভাণ্ডার হইতে অজস্র ধারায় তোমার উপর সেই গুণগুলি বর্ষিত হইতেছে, এবং মনে মনে ভাবিতে থাকিও—আমি অমুক অমুক গুণ। ক্রমে কল্পনা তোমাকে সেই গুণে 'গুণবান্ করিয়া তোমার চোখের সামনে ধরিতে থাকিবে। ইহাই ধ্যান। ধ্যান যতই গাঢ় হইবে, শক্তিরও তোমাতে ততই সঞ্চার হইতে থাকিবে।

তৃতীয়তঃ, যখন বাস্তব জগতে তোমার কল্পনার বিপরীত কোনও ঘটনা ঘটিয়া তোমাকে কাতর ও সঙ্কুচিত করিতে চাহিবে—যতদিন না প্রবল ইচ্ছা শক্তি বিকশিত হইয়া তোমার প্রাক্তন অর্থাৎ আকৃষ্টপূর্ব্ব ফল খণ্ডন করিতে পারিবে, ততদিন অল্পবিস্তর পরিমাণে এইরূপ ঘটনা ঘটিবেই,—তখন জোরে জোরে শ্বাস টানিতে টানিতে নিজের বিশ্বাস আঁকড়িয়া ধরিয়া ভবিষ্যতের সুখের চিত্র বর্ত্তমানে মানস চোখের সম্মুখে আঁকিতে চেষ্টা করিও। দুঃখের হাতে আত্মসমর্পন করিয়া, 'নাঃ কিছুই হ'লোনা ! কোনই উপায় দেখ্‌চি না !' এইরূপ বলিয়া অথবা কেবল দুঃখেরই আশঙ্কা করিয়া যাহা লাভ হইয়াছে, তাহা ত' এ পর্য্যন্ত' দেখিয়াছ। এখন একবার দুঃখটাকে উপেক্ষা করিয়া ও সুখের কল্পনা করিয়া দেখ, জীবনে নূতন তেজ ও আশার সঞ্চার হইতে হইতে শক্তিময়ী কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইয়া বসে কি না।

শ্রীকুমুদিনীকান্ত গাঙ্গুলী।

সুহৃদ্

[কবিতা]

১

'সম্পদ্' যখন উথ্‌লে উঠ্‌লো',—
ভাব্‌লুম্‌ সে-টা আমার-'করা'।
পৃথিবীর সব জাক জমকটা,—
নিজের হাতেই ধরিয়ে 'গড়া'॥

২

আজকে যখন খাবার নেইকো,—
জান্‌লুম্ প্রাণে কোথায় ব্যথা!
সম্পদ্ তখন হারিয়ে এবার,—
ভাব্‌লুম্‌ সুধু "তোমার" কথা।

৩

'অভাব' তখন "আমার" কেবল,—
আঁক্‌ড়ে ধরেছে আমার প্রাণ।
আমার "সুহৃদ্" 'অভাব' তখন,—
"তোমার" প্রধান "আশীষ"-দান!

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক।

অবরোধ

(Erckmann Chatriaun লিখিত—
Le Bldcus নামক আখ্যায়িকার বঙ্গানুবাদ)

দ্বিতীয় অধ্যায়

পর দিন খুব ভোরে উঠে চারটি জলপান মুখে দিয়ে কাল্‌সবুর্গ থেকে বার হ'লাম। জেফ্‌্যা আর বারুখ দুজনেই আমাকে থাকবার জন্ত পীড়াপীড়ি করতে লাগল কিন্তু আমি তাদের বুঝিয়ে বল্‌লাম যে আমাকে আর তোমরা আট্‌কে রেখোনা, সেখানে তোমাদের মা আমার জন্ত পথ তাকিয়ে রয়েছে, তার এক মিনিট স্বস্তি নাই। এতক্ষণ হয়তো কতবার উপর নীচে উঠা নাবা করছে, কতবার জানালার কাছে গিয়ে দাড়াচ্ছে তার আর ঠিক নাই। আমাকে আজ অবিশ্যি অবিশ্যি বাড়ী যেতে হবে। ভগবানের ইচ্ছায় তোমরা এখন একটু সুস্থির হয়েছ, তাকে অস্থির করে এখানে আর কি করে বসে থাকি। জেফ্যা একথা শুনে আর কিছু বল্‌লে না। তার ছোট ভাই সাফেনের জন্ত আমার পকেটে কতকগুলো বাদাম, আখরোট, নাসপাতি পুরে দিলে। আমি তার পর ছোট বড় সব কটিকে বুকের গোড়ায় টেনে নিয়ে চুমু দিলাম। বারুখ আমার সঙ্গে গিয়ে বাগান গুলোর শেষে যেখানে প্লিটেনবাক্ আর লুৎজেনবুর্গের রাস্তা তফাৎ হয়ে গেছে, সেই তে মাথা পর্য্যন্ত আগিয়ে দিয়ে গেল।

সেপাই সামন্তর দল সব তখন চলে গেছে কেবল পেছনের দুই এক জন উটকো আর ব্যারামী লোক পড়ে ছিল। অনেক দূরে পাহাড়ের এক ধারে সারাবন্দী গাড়ী গুলা সব পড়ে রয়েছে দেখা যাচ্ছিল। আর দেখলাম রাস্তার আর পাড়ে দলে দলে মজুরেরা সব জুলি কাট্‌তে লেগে গিয়েছে। সেইখান দিয়েই আবার ফিরতে হবে, এই ভাবনা আমাকে কিছু চঞ্চল করে তুলে ছিল। তার পর আমি বারুখের হাত ধরে আশীর্ব্বাদ করে তাকে বিদায় দিলাম। আমি ফের আবার তার ছেলের সুন্নতের সময় আস্‌ব, এ কয়টি কথা আমার মুখ দিয়ে বলিয়ে নিয়ে তবে সে আমার সঙ্গ ছাড়া হয়েছিল। পথে মেলাই শুকনা পাতা পড়েছিল। প্রায় দুই ঘণ্টা আমি উৎরাইয়ের মুখে ঢালু রাস্তা ধরে চল্‌লাম। একলা যেতে যেতে কেবল সেই সোলেই হোটেলের কথা জির্মাণ-এর কথা আর মার্শেল ভিক্টরের কথা মনে হতে লাগলো। বোধ হচ্ছিল সব্‌ চোখের উপর দেখ্‌ছি। প্রকাণ্ড লম্বা জোয়াল চওড়া কাঁধ, মাথায় কাঁচা পাকা চুল, উর্দ্দিতে সাচ্চা কাজ করা। তারপর জেফ্যার ঘর আর মা ছেলে দুজনকার কথা মনে হতে লাগ্‌ল। তার পর যুদ্ধের কথা ভাব্‌তে লাগ্‌লাম। চারি ধার থেকে শত্রু সেনা এসে

ঘিরে ফেলেছে (কত বিপদে যে পড়তে হবে কে জানে। যেতে যেতে মাঝ পথে একবার দাঁড়িয়ে দেখলাম যে এই সব উপত্যকা একটা আর একটায় মিশে ক্রমাগত যোগাযোগ রেখে চলেছে। যত দূর দৃষ্টি যায় কেবল দেবদারু ওক আর বীফ্ গাছ।

আমি মনে মনে বল্লাম প্রাসিয়ান অষ্টিয়ান বা রাসিয়ানরা এই পথ দিয়েই যে শিগগীর যাবে না তাই বা কে বল্তে পারে। কিন্তু আমার ছেলে পিলেদের কথা ভেবে মনটা একটু খুসী হল; মনে মনেই বল্তে লাগলাম ভাবছকি মইস তোমার দুই ছেলে ইট্‌জিগ আর ক্রোযেন ত কামানের গোলায় মরছে না। তারা এতক্ষণ ওপারে মার্কিন মুলুকে খাসা ঘাড়ে মোট নিয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে ব্যবসা করে বেড়াচ্ছে, কোনও বিপদের সম্ভাবনা নাই। তোমার মেয়ে জেঁফ্যা এতক্ষণ দিব্য আরামে ঘুমুচ্ছে, বারুখের খাসা দুটি ছেলে হয়েছে তারা বেঁচে থাকুক যুদ্ধ না শেষ হওয়া পর্য্যন্ত জামাইএর জন্য আর ভয় নাই। যারা যুদ্ধে যাবে সে কেবল তাদের জুতা আর ঝোলার জন্য চামড়া বিক্রি করবে বইত নয় তাকে ত আর কিছু আপন বাড়ী ছেড়ে কোথাও যেতে হবে না। নিজের বয়সের কথা মনে হাসি এল। ভাবলাম আমার মত পাকা দাড়ীওয়ালা বুড়াকে কিছু আর কর্ত্তারা ফৌজে ভর্ত্তী করবে না। আমি বুদ্ধি করে যে আগে থাক্‌তেই ছেলে পিলেদের সুব্যবস্থা করেছি তা ভেবে মনে একটু স্ফূর্ত্তি বোধ হ'তে লাগল। ভাবলাম ভগবান তো আমার পথ নিজেই পরিষ্কার করে দিয়েছেন এখন আর ভাবনা কি? দেখ ফ্রিজ্ নিজেদের একরকম হেসে খুসে চলে যাচ্ছে একথা মনে হ'লে বাস্তবিকই ভারি আনন্দ হয়। এই সব ভাবতে ভাবতে আমি বিনা হাঙ্গামে লুৎজেলবুর্গে এসে পৌঁছিলাম। সেখানে ব্রেষ্টেনের বাড়ীতে গেলাম সে সারসপাখী আঁকা এক সাইনবোর্ড টাঙ্গিয়ে খাসা এক হোটেল খামা খুলেছে ভাবলাম এই খানেই এক বাটী 'কফি' খেয়ে নিই।

ঢুকে দেখি সাবানওয়ালা বার্ণাড আর হার্বার্গের সরকারী জঙ্গলের আগলদার দোনাদিয়ে সেখানে বসে মদ খাচ্ছে। ব্রষ্টেনও বসে গিয়েছে তাদের বোতল থেকে ঢেলে ঢেলে দিচ্ছে। বার্নাড বোধ হয় ফেরী করতে বেরিয়েছিল মোটটা পাশেই রেখে দিয়েছে আর দোনাদিয়ের বন্দুকটা দেওয়ালে ঠেস দেওয়া রয়েছে। বার্নাডকে তুমি বোধ হয় কখনও দেখনি বেঁটে খাটো মানুষটি মাথায় প্রকাণ্ড টাক্ তার উপর আবার গোটাকত বড় বড় আব। বার্নাড আমাকে দেখেই বললে "মোয়াস নাকি, আরে মলো এতো সকালে তুই কোথা থেকে আসছিস?"

দেখলে কথার শ্রী, সে সময় খৃষ্টান বাহাদুররা আমাদের বুড়া বুড়া ইহুদীকেও এই রকম তু তুকারি করতে ছাড়তেন না। আমি বললাম আমি চড়াইএর পথদিয়ে সাভার্ন থেকে আসছি আগলদার মশাই বললেন তা হ'লে তুই লড়াইয়ে যা খেকো বেচারীদের নিশ্চয়ই দেখে আসছিস দেখে কি মনে হয় বল্‌তো? আমি একটু দুঃখু করেই বল্লাম তা আর দেখিনি? কাল সন্ধ্যার সময় সমস্তই দেখছি বাপরে কি ভয়ানক দৃশ্য! সে যাহা হোক কিন্তু আর এক কথা শুনেছো দেশ শুদ্ধ লোক এখন সব পাহাড়ের ধারে গিয়ে জুটেছে; কাদ্রেভার বুড়ো গ্রেদেনে নাকি ঐ একখান গাড়ীর ভেতর থেকে তার ভাইপো জোসেফ ব্যার্থার লাস খুজে বার করেছে। সেই হে সেই খোড়া ঘড়িওয়ালা গুলুঁদার দোকানে গত বছরেও সে কাজ কর্ম্ম কর্ত্ত। শুনছি নাকি গ্রেদেনের এই কথা রাষ্ট্র হয়ে পড়েছে দ্যাগমবুর্গ উপ্ গারবুর্গ থেকে গাঁয়ের লোকেরা সব গিয়ে হাজির হয়েছে সকলেরই মনে বিশ্বাস মড়ার গাদা খুজলে নাজানি তাদেরও আপনার জনা কাউকে না কাউকে হয়তো পাওয়া যাবে। ব্রেস্তেন বল্লে এসব শুনে মন খারাপ হয় বটে কিন্তু যা হবার তা আট্‌কায়

কে? গত দুবছর ধরে ব্যবসা পত্র বন্ধ বল্‌লেই হয়। আমার কারখানার উঠানে তিন হাজার পাউণ্ডের কাঁচা মাল সব পড়ে রয়েছে। আগে হলে এ মাল দুমাস কি দু হপ্তার মধ্যেই কাবার হয়ে যেত আর এখন পড়ে পড়ে পচে যাচ্ছে। সাবু বল, আলসাস বল আর কোনও দিকেই রপ্তানি নাই কেউ কিনছেও না কেউ বেচছেও না। হোটেলখানারও সেই দশা লোকের আর পয়সা কড়ি নাই সবাই এখন আপন আপন বাড়ীতে বসে আলু আর কাঁচা জল খেয়েই খুসি আছেন। এদিকে আমার মদ টকে যাচ্ছে উপরে ছেৎলা জমছে। তাই বলে কি আর পাওনাদারেরা চুপ করে রয়েছে বিলটি ঠিক সময়ে এসে হাজির হচ্ছে। না দাও তো পেয়াদামশায় পরওয়ানা নিয়ে উপস্থিত হবেন।

বার্ণাড বল্‌ল ও আর বেশী কি বল্‌ছ সকলেরই সমান অবস্থা। **লোকের সাবান কি তক্তা বিক্রী হল আর না হল তাতে সম্রাট বাহাদুরের কি এল গেল। তাঁর ট্যাক্স আর লরাইএর রংরুট রীতিমত পেলে আর এসব দেখার আবশ্যকটা কি!**

দোনাদিয়ে দেখ্‌লে তার দোস্ত দুই এক গ্লাস বেশী খেয়ে ফেলেছে। সে আর দেরী না করে তখনই উঠে বন্দুকটা পিঠে ঝুলিয়ে রওনা হল। বল্‌লে ভাই সকল আজ এই পর্য্যন্ত এরপর দেখা হলে এবিষয়ে ফের আবার কথা কওয়া যাবে। কয়েক মিনিট পরে আমিও তার দেখা দেখি দাম মিটিয়ে দিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লাম। ব্রেস্তেন আর বার্ণাড যা বল্‌ছিল আমার মনেও সেই কথাই হচ্ছিল। আমি বেশ বুঝছিলাম যে পুরান কাপড় চোপড় আর লোহালক্কর নিয়ে আর ব্যবসা করা চল্‌ছে না। বেরিয়ে ফের আবার চরাই ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে মনে মনেই বল্‌তে লাগ্‌লাম যোয়াস চন্দ্র আর দেখ্‌ছো কি সবতো এক রকম বন্ধ হতে চললো, এখন একটা অন্য কোনও উপায় দেখ। পুজির শেষ কড়িটি পর্য্যন্ত বসে বসে খেলে আর কি করে চল্‌বে।

এই সব ভাব্‌তে ভাব্‌তে ওক বনের ধারের কুড়েগুলো পার হয়ে টিলার উপরে এসে পৌছিলাম। সেখান থেকে গড়ের নীচের অল্প ঢালু পাড় আর চারিদিক কার উঁচু মাটির ঢিবি বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল। হঠাৎ তোপ পড়্‌তে আরম্ভ হ'ল। বুঝ্‌লাম এবার প্রধান সেনাপতি মহাশয় রওনা হ'লেন। বাঁদিকে তাকিয়ে দেখি দূরে মিটেল ব্রনের ধারদিয়ে সেনাগুলো সারবন্দী হয়ে চলেছে, বড় রাস্তার দুই পাশে যে পপ্‌লার গাছের সারি ছিল তারই ফাঁক দিয়ে দিয়ে তরওয়ালের ঝকমকি দেখা যাচ্ছিল। গাছগুলার পাতা সব ঝড়ে পড়েছিল বলে দেখার কোনও অসুবিধা হচ্ছিল না। হুসার পল্টনদের কাল কলবাক্ টুপি আর পালক লাগান শিরস্ত্রান গুলোর মাঝ্ দিয়েই ঘোড়ায় চড়া কোচমানরা মার্শালের গাড়ী খানা বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে দেখা গেল। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তোপ পড়্‌তে লাগ্‌ল, দূরের সব খাত্ আর উপত্যকার তলা থেকে তার প্রত্যেকটির প্রতিধ্বনি আস্‌তে লাগ্‌ল। এত বড় একজন লোকের সঙ্গে কাল সন্ধ্যা বেলা দেখাশুনা হয়েছিল স্মরণ হয়ে নিজেই যেন অবাক হয়ে গেলাম, এক এক বার ভাবতে লাগিলাম বুঝি বা স্বপন দেখ্‌ছি।

প্রায় বেলা দশটার সময় ফরাসী দরওয়াজার ফটক পার হ'লাম তখনও বারুদ ঘরের বুরুজের উপর থেকে শেষবারের তোপদাগা হচ্ছিল। দেখ্‌লাম সহরের লোকেরা স্ত্রীপুরুষ ছেলে পিলে সবাই মিলে কেল্লার প্রাচীর পার হয়ে নেমে আস্‌ছে সকলেই খুব খুসি যেন কোনও মেলা কি উৎসব আরম্ভ হয়েছে। তাদের জ্ঞান বোধও নাই ভাববার বুঝবার ক্ষমতাও নাই কেবল সব রাস্তায় রাস্তায় "সম্রাট বাহাদুরের জয়" বলে

চীৎকার করে বেড়াচ্ছে।

আমিও কোনও রকমে ভীড় কাটিয়ে বেরিয়ে এলাম। বাড়ীতে সুখবর আন্‌ছি মনটা যে বিশেষ খারাপ ছিল তা নয় আমার স্ত্রীকে উদ্দেস্য করে মনে মনেই বল্‌তে বল্‌তে আস্‌ছিলাম "নাতীর জন্য আর ভাবছ কি সে ভালই আছে"। এমন সময় তাকিয়ে দেখি সর্লে চাঁদনীর কোণে আমাদের সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমি দেখেই হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে লাঠিখানা উঁচু করে ধরলাম, ইসারায় জানালাম "বারুখ বাবাজী বেঁচে গেলেন এখন যত পার হাঁসি খুসি কর"।

আমার ভাব ভঙ্গী দেখে সে তখুনি বুঝ্‌তে পেরে বাড়ীর ভেতর চলে গেল, সিড়িতে উঠতে উঠতে আমি তাকে ধরে ফেল্‌লাম; ধরে বল্‌লাম খাসা ছেলে হয়েছে দিব্যি গোলাগাল যেন গোলাপের মত রং। জেফ্‌ঁ্যার শরীরও বেশ ভাল আছে। বারুখ বলে দিয়েছিল কি করি জামাইএর কথা—তাই ঝুমু দিয়ে তোকে সংবাদটা দিলাম। সাফেন্ কোথায়? সর্লে বল্‌লে সে বাজারে কেনা বেচা কর্চ্ছে। আমি "বহুত খুব" বলে আমাদের শোবার ঘরে গিয়ে বসে বসে জেফ্‌ঁ্যার খোকার ব্যাখানা করতে লাগ্‌লাম, সর্লে আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে আমার কথা শুন্‌ছিল, আর তার বড় বড় কাল চোখ দুটি চেয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আমার কপালের ঘাম মুছিয়ে দিচ্ছিল। বড্ড তাড়াতাড়ি করে এই কয় ক্রোশ রাস্তা হেঁটে এসেছিলাম, পথে একটু দম পর্য্যন্ত নিইনি। আমাদের কথা হতে হতেই সাফেন এসে উপস্থিত হ'ল, আমি তার দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখতে না দেখতে সে একেবারে আমার কোলের উপর এসে চাপ্‌লে আর হাত পুরে দিয়ে আমার পকেটখানা তল্লাসি আরম্ভ কর্‌লে। বেটা ভারি ধূর্ত্ত আগে থেকেই জানে যে জেফ্‌ঁ্যা দিদি তার জন্য কিছু না কিছু পাঠাতে ভুল্‌বে না আর সর্লেরও একটু আপেল নাসপাতি চিবুবার ইচ্ছা হয়েছিল।

আর বল্‌বকি ক্রিটজ তুমিত বুঝ্‌তেই পাচ্ছ একবার সে কালের কথা আরম্ভ কর্‌লে সবই যেন নূতন করে মনে পড়ে, এখন ভাবি বুঝিবা গল্প শেষ করে আর উঠ্‌তে পারবোনা।

সেদিন শুক্রবার আমাদের 'সাবাথ' পরবের আগের বৈকাল। খৃষ্টানী দাসী মার্গিটা এসে সংসারের কাজ কর্ম্ম করছে। আমরা আহারের পর বসে নিজেদের ভেতরই গল্প গাছা করছি। গল্প গাছা আর কি সেই একই কথা; পাঁচ বার কি ছবারের বার বলা হচ্ছিল কেমন করে আমার সঙ্গে জীর্মারএর দেখা হ'ল সে আমায় চিন্‌তে পেরে কেমন করে বড় জাঁদরেল ডুক বাহাদুরের সঙ্গে আলাপ করে দিলে, তাই বর্ণনা করছিলাম। এই সব শুন্‌তে শুন্‌তে আমার স্ত্রী বল্‌লে মার্শাল বাহাদুর আমাদের এখানে এসে তাঁর সব কর্ম্মচারীদের সঙ্গে নিয়ে কেল্লার দেওয়াল টেওয়াল গুলো ঘোড়ায় চড়ে দেখে এসেছেন। বাইরেকার গড় বুরুজ টুরুজ মাটির ঢিবি যা সব আছে কিছুই দেখ্‌তে বাঁকি রাখেন নি। কলেজের রাস্তা দিয়ে ফিরবার সময় নাকি বলেছেন যে এ সহর দিন আঠার ধরে শত্রুদের খুব আটকে রাখ্‌তে পারবে। আর দেরী না করে এখন থেকেই অস্ত্র শস্ত্র লোকজন কামান গোলাগুলির ব্যবস্থা করা উচিত। শুনে মনে হল তিনি আমাকেও কাল জিজ্ঞাসা করেছিলেন "তোমরা আত্মরক্ষা কর্ত্তে চাও কি না?"

আমি সর্লেকে বল্‌লাম দেখ শত্রুরা যে আস্‌বে তা ও ব্যক্তি নিশ্চয় বুঝ্‌তে পেরেছে। দুর্গের প্রাকারে যখন কামান বসানব ব্যবস্থা করেছে তখন সেগুলো কাজে আস্‌বে, এই কথা জেনেই করেছে বুঝ্‌তে হবে। কোনও দরকারও নাই, কিছুই না মাঝ থেকে তিনি কতকগুলো বন্দোবস্তের হুকুম দিয়ে গেলেন এ কখনই সম্ভব হতে পারে না।

এখন যুদ্ধ লড়াইএর দরুন ব্যবসাটা যদি না চলে তা হলে আমাদের দশাটা কি হবে ?

...গুলো তখন আর সহরে ঢুকতেও পারবে না ...তেও পারবে না আমরা বসে বসে কর্‌বো কি ?

সর্লের যে বেশ পাকা বুদ্ধি সে তখনই দেখা গেল, সে বল্লে দেখ এ সব আমি আগে হতেই ভেবে রেখেছি। লোহা, পুরাণ জুতো, কাপড় এসব চাষারা ভিন্ন আর কেউ কিনবে না। এমন একটা ব্যবসা ফাঁদান চাই যে সবারই মধ্যে চল্‌তে পারে। এ রকম একটা জিনিস নিয়ে কারবার কর্ত্তে হবে যে সহরের লোকই হোক্, ফৌজের সিপাইই হোক্, আর মজুরদারেরাই হোক্ কেউ আমাদের কাছে না কিনে পারবে না। বুঝ্‌লেতো এখন এ ব্যবস্থা যাতে হয় তা অবিশ্যি করা চাই। আমি অবাক্ হয়ে তার কথা শুনছিলাম। টেবিলের উপর কুনুইএ ভরদিয়ে সাফেনও চুপটি করে শুনছিল।

আমি বল্‌লাম কথাটা ত বেশ ভালই বল্লে। এখন ব্যবসাটা কিসের কর্‌বো একবার ভেঙ্গে বল দেখি। এমন কি ব্যবসা আছে যাতে সহরের বেবাক লোক মায় মজুরেরা পর্য্যন্ত আমাদের কাছেই কেনা কাটা কর্‌বে। সর্লে বল্‌লে শোন সহরের সিংদরওয়াজা যখন বন্ধ হয়ে যাবে তখন পাড়াগাঁ থেকে চাষী লোক টোক আর হাটে মাছ, ডিম, মাখম টাখম কিছুই আনতে পারবে না, তখন বোনা জিনিস শুকনো তরি তরকারি ময়দা টয়দা যা কিছু মই না হয়ে থাক্‌বে তাই খেয়েই জীবন বাঁচাতে হবে। এখন যারা এসব কিনে রাখ্‌ছে তারা তখন যে দামেই খুসী সেই দামেই বিক্রি কর্‌বে, তারা দেখো সব বড় লোক হয়ে যাবে।" শুনে আমি একেবারে আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। তার স্ত্রী বুদ্ধিকে বাহবা দিয়ে মনে মনেই বল্লাম, সর্লে এ ত্রিশ বৎসর যাবৎ তো হতেই আমার যা কিছু সুখ শান্তি। কত আনন্দ যে তুই দিয়েছিস্ তা আর বলবার নয়। আমি এক্‌শোবার বলি লক্ষ্মী স্ত্রী খাঁটি হীরা কোথাও দাগ পড়ে না। সু পত্নীর মত স্বামীর সংসারে আর কি ধনই বা আছে। শতবার বলেছি আজও বলছি। কিন্তু তোর যে কি মূল্য তা আজ ভাল করে বুঝ্‌লাম আজ থেকে তোকে আরও ভাল করে আদর করতে শিখ্‌বো। "যতই এ সম্বন্ধে ভাব্‌তে লাগ্‌লাম ততই বুঝতে পার্‌লাম এর থেকে পাকা যুক্তি আর কিছুই হতে পারে না। ভেবে চিন্তে শেষে বল্‌লাম দেখ সার্লে ময়দা টয়দা যা লোকে রেখে খেতে পারবে তাতো দোকান আড়তে বোঝাই রয়েছে আর সেপাইদের যাতে অভাব না হয় তা ফৌজের কর্ত্তারা আগে থেকেই ব্যবস্থা করে রেখেছে। যার অভাব হবে বুঝ্‌তে পারছি তা মদ। যারা যুদ্ধে কাটাকাটি করে মর্‌বে তাদের এটি না হলে চল্‌বে না। আমরা আর কিছু না কিনে মদই কিনে রাখ্‌বো। যত পারি কিনে এখন পাতাল কুঠুরী বোঝাই করা যাক, শেষে বিক্রী করতে আরম্ভ করা যাবে। আমাদের বাড়ী ছাড়া এ জিনিস আর কোথাও কেউ পাবে না। আমি তো ভেবে ভেবে এই ঠিক করেছি। সর্লে বল্‌লে এই যুক্তিই ভাল তা হলে তাই কর আমারও খুব সম্পূর্ণ মত আছে। আমি বল্‌লাম আমি তা হলে মহাজনকে লিখ্‌ছি গিয়ে। যা কিছু আছে এই মদের ব্যবসাতেই লাগান যাক্। শুধু খাঁটি আরক আনিয়ে আমরা নিজেরা জল মিশিয়ে নেব। যে যেমন দেবে সেই মত মিশিয়ে দিলেই চল্‌বে। জল মেশান তৈরী মদ আন্‌তে যা খরচা হ'ত এতে তার চাইতে ঢের কম খরচা হবে। এখানে জলের ত আর অভাব নাই মিছে মিছি জলের খরচা দিয়ে মরি কেন ? সর্লে বল্লে বেশ কথা সেই ভাল। আমরা ত দুজনে এই রকম সলা পরামর্শ করে ঠিক কর্‌লাম। সাফেন্‌কে বল্‌লাম দেখ একথা বাহিরে কাকেও ব'লস্‌নে। তার মা তার হয়ে জবাব দিলে "তোমাকে আর ওকে সাবধান কর্ত্তে হবে না। এ সব যে গোপন কথা আর এর উপর যে আমাদের ভাল মন্দ নির্ভর কর্‌ছে তা আর সাফেনের বুঝ্‌তে বাকি নাই। ছেলেটা এর জন্য আমার উপর

রাগ করেছিল, ভেবেছিল বাবা আমাকে নেহাৎ একটা নির্বোধ মনে করে। তখন থেকেই তার পাকা বুদ্ধি। আমি তাকে অবুঝ ভেবেছি মনে করে তার বড় দুঃখ হয়েছিল। এর অনেক বছর পর তার মুখেই এসব কথা শুনে বুঝতে পেয়েছি আমার সে সময় এ কথাটা বলা অন্যায়ই হয়েছিল বটে।

ছেলে বুড়ো সবারই ঘটে কিছু কিছু বুদ্ধি আছে। ছেলেদের লজ্জা দিয়ে খাটো না করে বরং যাতে তাদের উৎসাহ হয় বাপ মা দের সেই ভাবেই ব্যবহার করা উচিত।

(২য় অধ্যায় শেষ)

শ্রীগুরুদাস সরকার।

ঠাকুর মা'র কথা।

(এদেশে সেকালের বন্য জন্তুর কথা)

"দেশে বড় বেশী জঙ্গল আর জলাভূমি ছিল। তাহাতে লাভ ক্ষতি উভয়ই হইত। জঙ্গলে বাঘ, মহিষ, শূকর, সাপ থাকিত; সময় সময় হাতীও আসিয়া কিছুকাল থাকিয়া পাহাড়ে চলিয়া যাইত। হাতীঘাটা, হাতীকান্দা, হাতীরদী, হাতীথলা প্রভৃতি স্থানের নামই ইহার পরিচায়ক। বাঘমারা, বাঘাদাঁইড়, বাঘবেড়, বাঘাটা,—মহিষবেড়, মহিষ খাউরা, মহিষপুর,—প্রভৃতি নামক গ্রাম এখনও বর্ত্তমান আছে। আমি যখন বউ—তখন একবার জঙ্গলী হাতী এদেশে আসিয়াছিল। মানুষ আগুন দেখাইয়া হাতী খেদাইয়া দেয়। বাবার নিকট গল্প শুনিয়াছি,—মহেড়া গ্রামে একবার রাত্রিতে কয়েকটা জঙ্গলী হাতী আইসে। ভবনাথ ভট্টাচার্য্য তখন মার কোলের শিশু। হাতী আসিয়া তাঁহাদের ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলে। তাঁহার মা পুত্র কোলে লইয়া কৃষ্ণধন শিরোমণি মহাশয়ের বাড়ী উপস্থিত হন। শিরোমণি বড় মস্ত তান্ত্রিক লোক ছিলেন। তিনি একান্ত সাহসী এবং শক্তিবানও ছিলেন। কহিলেন—বউ মা ঘরে বসো গিয়ে, হাতী এখানে আসিলে একটা বোঝা পড়া করিব। তারপর এক হাতে মহাশঙ্খের মালা ও অপর হাতে খড়্গ লইয়া পুকুর পাড়ে দাঁড়াইলেন। কহিলেন হাতী আসুক—শুঁড় কাটিয়া দিব না এদিকে সেকেলে বিষয় বুদ্ধির সেরা পণ্ডিত মনোহর তর্কভূষণ পুকুর পাড়ের খড়ের ঘরে আগুন ধরাইয়া দিলেন;—আগুন দেখিয়া হাতী পলাইয়া গেল।

পাটধা গ্রামেও ঢের হাতী আসিত। কখন কখন দু'চার মাস থাকিতও। নল খাগড়ার বনে জলাভূমির চতুষ্পার্শ্বে আবৃত ছিল। জল ও জঙ্গল না হইলে হিংস্র জন্তু থাকে না।

সেকালের মানুষ ছিল [illegible]রা। যেমন তেমন বাঘত কেহ হিসাবই ক[illegible] এমন কি বড় বাঘও (Royal Tiger) কাইয়া ভয়ে আসিলে—গ্রামিকাম মশাল ও হাতীয়ার লইয়া স্বচ্ছন্দে রাত্রিতে বিচরণ করিত। খোয়াড় পাতিয়া বাঘ মারা ভারী আনন্দ ছিল। বাঁশ পুতিয়া বেশ করিয়া খোয়াড় নির্ম্মাণ করিত, খোয়াড়ের এক প্রান্তে একটা কুকুর বা ছাগল-ছানা বাঁধিয়া রাখিত। বাঘ দরজা দিয়া প্রবেশ করিলেই কৌশলে নির্ম্মিত দ্বার ভীষণ শব্দে বন্ধ হইয়া যাইত। তখন সকলে মিলিয়া সেই খোঁয়াড়ের ভিতর অবরুদ্ধ বাঘের প্রাণ নাশ করিত। অনেক সময় শিকারীরা রাত্রিতে খোঁয়ারের উপর বিছানা পাতিয়া নিদ্রা দিত। নীচে আবদ্ধ বাঘ গর্জ্জন করিত। এ সকল গাল গল্প নহে,—সত্যি কথা। এই ত সে দিন—৫০—৫২ বছরের কথা, তোমাদের জ্ঞাতি সুন্দর ঠাকুর বাঘের খোঁয়ারের

উপর রাত্রি কাটাইয়া সকাল বেলার দশখানা গ্রাম নিমন্ত্রণ করিয়া বাঘ দেখাইয়াছিলেন।

ফাঁদ পাতিয়া বাঘ মারাও তখন হইত। বিষাক্ত বাণে অনেক সময় বাঘ ছাড়া অন্য প্রাণীও মরিত।

আমরা ভাঁড়ে করিয়া বাঘের তৈল রাখিতাম। ইহা পোড়া ঘা, বাত প্রভৃতির ঔষধ। বাঘের দাঁত, নখ প্রভৃতি ছেলেদের গলায় বা কটিতে সোনা রূপায় বাঁধাইয়া পরান হইত (বিজয় চিহ্ন কি?)।

গোয়াল ঘরে বাঘের বেশী আক্রোশ। বাঘে গরু আক্রমণ করিলে গৃহস্থ বাঁশের লাঠী, জাঠা প্রভৃতি দিয়া বাঘ তাড়াইত। মোট কথা—বাঘ প্রায়ই জিতিবার আশায় জলাঞ্জলি দিত। ছোট বাঘকে আমরা "মিছি বাঘ" বলিয়া ঠাট্টা করিতাম। এ সকল বাঘ আমাদের নাগালে প্রায় সর্ব্বদাই পড়িত। তাহাতে বড় একটা ব্যস্ত সমস্ত হওয়ার কারণ হইত না। বলাইর মা—"মিছি বাঘের" মুখ হইতে তাহার ছাগল কাড়িয়া রাখিল—লাঠির জোর।

মহিষ বড় বেশী [illegible]। মহিষের পাল্লায় পড়িয়া অনেকে প্রাণ হারা[illegible]। আমার বাবা, মৈশা জগন্নাথ ঠাকুর, মৈশা ক[illegible] চক্রবর্ত্তী, বাঘা পরাণ, মৈশা ধমা (ধর্ম্ম পরায়ণ) প্রভৃতি তাহাদের জয় তিলক নামের সঙ্গে উপাধিরূপে ব্যবহার করিত এবং আজিও বিখ্যাত হইয়া আছে। আমার বাবাকে বন্য মহিষে আক্রমণ করিলে,—তিনি মহিষটীর শিং ধরিয়া বিষহরি (বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত দেবী) দেবীর দুয়ারে টানিয়া আনিয়া বলি দেন। জগন্নাথ অষ্টমী পূজার দিন পথে মহিষ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। হাতে খড়্গ ছিল,—জগন্নাথ এক হাতে মহিষের শিং ধরিয়া 'জয় মা দুর্গা' বলিয়া এক কোপে মহিষ শেষ করে ও কাটা মাথাটী নিয়া পূজার বাটী উপস্থিত হয়।

তোমরা বোধ হয় ভেলানগরের (কুমিল্লা জিলার নবীনগরের এলাকাভুক্ত গ্রাম) গঙ্গাদাস ভট্টাচার্য্যকে দেখিয়াছ। তাঁহাকে একবার মহিষে আক্রমণ করে। তিনি তখন প্রৌঢ়—শরীরে জর, ভট্টাচার্য্য মহাশয় দুই হাতে মহিষের দুই শিং ধরিয়া ঘাড় উল্টাইয়া তাহার গালে আধমণ ওজনের এক কিল বসাইয়া মহিষটী ছাড়িয়া দিয়া বলেন,—'শ্যালা' মহিষ—গঙ্গাদাস শর্ম্মার সে দিন নাই—নৈলে আজ তোমাকে মা দশভূজার দুয়ারে নিয়া বলি দিতাম।"

শূকর প্রায় সকল গ্রামেই আড্ডা করিয়া থাকিত। বড় বড় দাঁতালগুলা অতি ভয়ঙ্কর ছিল। বহু লোক ইহাদের হাতে প্রাণ হারাইত। দেশের চাঁড়ালরা ছিল শূয়রের যম। জঙ্গলে শূয়র বেড়া দিয়া হত্যাকরা হইত। শূয়র মারার গল্প শুনিতে বড় ভয়ানক। একজন সুশিক্ষিত, বলিষ্ঠ ও নির্ভীক শিকারী একটা মজবুত জাঠা লইয়া কোন গাছের মূলে হাঁটু গাড়িয়া বসিত। জাঠার গোড়া ঐ গাছের মূলে আটকাইয়া জাঠার মুখ সম্মুখ দিকে লক্ষ্য করিয়া ধরিত। অন্যান্য জনগণ জঙ্গলে শূয়র বেড় দিয়া চীৎকার করিলে শূয়র ছুটিয়া পলাইত। যে দিকে ঐ ব্যক্তি বসিয়া থাকিত, সেইদিকে শূয়র তাড়া করিয়া নেওয়াই ছিল সকলের উদ্দেশ্য। তাড়া খাইয়া ঘা খাইয়া আহত শূকর যখন সম্মুখ একটী মাত্র মানুষ দেখিত—তখন সে ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিত। সেই শিকারী 'আও' —'আও' বলিয়া গর্জ্জন করিয়া শূকরকে ডাকিত।—শূকরও তীরবেগে তাহার দিকে ছুটিয়া যাইত। শিকারী এই বিপদের সময়েও স্থিরভাবে বসিয়া জাঠা গাছটী সোজা ধরিয়া শূকরের ঘাড়ের এক পার্শ্বে বসাইয়া দিত। শূকর জাঠা বিদ্ধ হইয়া দ্বিগুণ ক্রোধে কেবল অগ্রসর হয় এবং জাঠা ক্রমশঃ বিঁধিতে থাকে,—অবশেষে শূকর ভূতলশায়ী হয়। দৈবাৎ জাঠা ভাঙ্গিয়া গেলে বা লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইলে শিকারীর মৃত্যু অবধারিত।

শেয়াল, বাঘাঙ্গিয়া প্রভৃতির উপদ্রবে হাঁস, পাকা কাঁঠাল রাখা দার হইত। শেজা (শজারু) মানকচু

নির্ব্বংশ করিত। আমাদের গ্রামে একবার একটা কৃষ্ণসার মারা পড়ে। পশু পক্ষী যে কত রকমের দেখিয়াছি, সব বলা সম্ভবপর নহে। এখন সেই রামও নাই, সেই আযাধ্যাও নাই। বাস্তবিক এখনকার দিনের চেয়ে সেকালে আমাদের বড় দুঃখেও সুখ ছিল।

সাপ ছিল দেশে বিস্তর। মাচ্ছুয়া (কেউটে) গোখুর, দুধরাজ, পাতরাজ, শঙ্খিনী, আরো কত সাপ ঘরের আনাচে কানাচে পাওয়া যাইত। কতলোক যে সাপের কামড়ে মারা পড়িত, তাহার সংখ্যা কে করিবে। সাপও সর্ব্বদাই মারাপড়িত। মুসলমানরা বলিত 'সাপ দেখিলে ছাড়িতে নাই'। আমাদের বাড়ী একবার একটা কাল সাপ (কেউটে) মারাপড়ে, বাবা আসিয়া সকলকে মন্দ বলিলেন। তাঁহার বিশ্বাস, ওটা আমাদের বাড়ীর প্রহরী ছিল। (বাড়ীর প্রহরী সাপের কথা এখনো শুনি, সত্য কি না জানিনা তবে সে সকল ভীষণ বিষধরের দ্বারা এ পর্য্যন্ত প্রাণ হানির সংবাদ পাই নাই। অবশ্য সেই সব সর্প খুব নিভৃতে থাকে, কদাচিৎ বাহিরে আসে) সাপের ওঝা ছিল, তন্ত্রমন্ত্র ঔষধেরও অভাব ছিল না। আবার এই প্রবাদও ছিল—

"যারে খায় দাঁত্যির সাপে
কি করবে ওঝার বাপে।"

তবে বহু লোক যে ওঝার হাতে বাঁচিত একথা সত্য। দেশে এমন 'গুণী' লোক ঢের ছিল,—যারা কড়ি দিয়া মন্ত্রবলে সাপ ধরিয়া আনিত এবং সেই সাপ পুনরায় পূর্ব্ব দষ্ট ব্যক্তিকে ছোবল মারিয়া বিষ টানিয়া লইত। গল্প শুনিয়াছি—৪০।৫০ বৎসর আগেও নাকি ঢাকায় এক বেশ্যা এক ভেলা হইতে সাপে কাটা মরা বাঁচাইয়াছিল। এদেশে তেমন ঘটনা বহু হইত। [কিশোরগঞ্জের নিকটে চৌদ্দশ বাজারে এক মুচি কড়ি চালনায় সাপ আনিয়া দষ্ট ব্যক্তিকে আরোগ্য করে—বহুলোক তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছিল।]

আমাদের দেশে তখন জলাভূমি ছিল বেশী—হিংস্র জন্তুও ঢের ছিল। জলা আর জঙ্গল দুটাই হিংস্র জন্তুর আবশ্যক।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

আটিয়া পরগণার গ্রাম্য শব্দ।

ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন স্থানের গ্রাম্যশব্দ বিভিন্ন প্রকার। যেমন কোন কোন স্থানে কটক গ্রাম্যশব্দ 'ভদ্রসন্তান' অর্থেও কোন কোন স্থানে তদ্বিপরীত অশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোন কোন স্থানে টেউন গ্রাম্যশব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, তদনুরূপ অর্থে কোন কোন স্থানে টেটন গ্রাম্যশব্দ ব্যবহৃত হয়। এতদ্ব্যতীত একস্থানে করিব, দেখিব প্রভৃতি (ভবিষ্যত কাল) স্থানে করিতাম, দেখিতাম প্রভৃতি (অসমাপিকা অতীত কাল) ব্যবহৃত হয়। সুতরাং আটিয়া পরগণার গ্রাম্যশব্দ সম্বন্ধে নিম্নে আলোচিত হইল।

অ।

শব্দ	অর্থ
অতটি	এতগুলি।
অবোজ	অবোধ
অশুচ	অশৌচ
অন্দর	ভিতর বাড়ী
অকপাইলা	ভাগ্যহীন
অচম্বিত	আশ্চর্য্য
অক্ষেণে	অসময়ে

* ঠাকুরমার কথার প্রথম দফা গত বৎসরের পৌষ সংখ্যা প্রতিভায় "সোয়াশত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গের মধ্যবিত্ত পরিবারের সাংসারিক অবস্থা" নামে প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রতিভা সম্পাদক।

আ।

আথর	অনবসর
আবাত্তি	অপক্ক, অপরিপক্ক
আয়াম	সময়
আইলা	অগ্নিভাণ্ড
আতারে পাতারে	এখানে
আগারে পাগারে	সেখানে
আজ্ঞি	হাড়
আওয়াজ	শব্দ
আদা	অর্দ্ধ
আতাপাতা	তন্ন তন্ন
আপেচাল	বাজেকথা
আগন	মলত্যাগ
আংকা	হঠাৎ
আনাজ	তরকারী
আইঠা	উচ্ছিষ্ট
আঁচান	আহারান্তে মুখ ধৌতক্র
আচানি	আহারান্তে মুখ ধৌত করিবার স্থান
আলাদা	পৃথক
আনাগোনা	সংগোপনে প্রস্তাব
আন্ধা	অন্ধকার
আকাল	দুর্ভিক্ষ
আরি	ঝুড়ি, শক্রতা
আনারি	অজ্ঞ
আকন	অঙ্গণ
আক্কল	বুদ্ধি

ই।

ইটা	ইট
থিকা	হইতে
মিতা	মিত্র

উ

উচপিচ	উদ্বেগ
উবরণ / উবুরণ	অতিরিক্ত হওয়া
উদাম	আবরণ শূন্য
উসারা	বারেন্দা
উজর	আপত্তি
উজার	নিঃশেষ
উনান	গলিয়া যাওয়া
উকা	হুকা
উষ	শিশির
উম	তাপ
উরাৎ	উরু

এ

এলা	এখন
এম্‌নে	এই প্রকারে

ক

কাইজা	বিবাদ
কাওড়া	মিশ্রিত
কটুনা	যে একজনের দোষ অন্যের কাছে বলে।
কুটনি.	যে স্ত্রীলোকে কাহারও উপপত্নী বা উপপতি স্থিরক্র
কুহক	ধমক দেওয়া।
কামাই	রোজগার, অনুপস্থিত
কেওয়ার	কপাট।
কুব	অস্ত্রের ঘা।
কাইৎ	অস্ত্রের নাম,
কাবু	কায়দা

কাহিল	পীড়িত।
কিচ্ছা	বিবরণ।
কেলেঙ্কার	বিবাদ।
কান্দা	কিনারা।
কেরে	কেন।
কেরাই	পরিহাস।
কিম্মত	বল।
কমিন	অসতী।
কাইল	কল্য।
কাইয়া	কাক।
কিচকামি	অশিষ্টাচরণ।

খ

খামাখা	অনর্থক।
খাই	গভীরতা।
খোড়ল	গর্ত্ত।
খোমা	যে মনে মনে রাগ করে।
খোয়া	শিশির।
খুৎ	হীন।
খিটকাল	আপত্তি।
খেটখেটিয়া	বিবাদ পরায়ণ।
[illegible]	কৃশ
খেজালত	পরিশ্রম।
খারন	দাঁড়ান।

গ

গাবর	অসভ্য।
গাগা	গর্ত্ত।
গুসা	রাগ।
গটি	শুষ্ক গোবর।
গিদর	যে অপরিষ্কার ভাবে থাকে।
গর্দনা	ঘাড়।
গরুমা	অসার।
গরনা	খারাপ।
গয়না	গহনা।
গোয়াইল	গোশালা।

ঘ

ঘসি	শুষ্ক গোবর।
ঘাইড়া	অবাধ্য।
ঘেঘ	গলার ব্যারাম।
ঘাবরান	ভয়ে কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হওয়া

চ

চাঙ্গারী	বড় ঝুড়ি।
চিল্‌তা	অপ্রশস্ত খণ্ড।
চাল্লি	জ্যোস্না।
চুকা / চুকা	টক।
চাপা	চুয়াল।
চোখা	তীক্ষ্ণ।
চিল্লানী	চীৎকার।
চুপাকরা	গালি দেওয়া।
চেগান	অহংকার করা।
চিকন	সরু।

ড

ডর	ভয়।
ডেরা	কুঁড়েঘর
ডাঙ্গর	বড়
ড্যাট	শক্ত
ডিলকি	হঠাৎ উপরের দিকে উঠা।

ঢ	
ঢক	আকৃতি।
ত	
তব্দা	শব্দহীন
থ	
থেত্রাবেত্রা	অসমান
থাআবারি	নিষেধ
থরথইরা	চমকিয়া
দ	
দন	বিবাদ
দুরমুসা	বর্ণবিকৃত, বিশৃঙ্খল।
	বিশিষ্ট লোক
ধ	
ধমক	ভয় প্রদর্শন
ন	
নাড়ামুড়া	পত্রাদি শূন্য
নক্‌নালী	ঠাট্টা করা
নুন	লবণ
নাই	লাউ
প	
পুম্	উর্ব্বরতা
পুলা	পুত্র
পাঁচু	আঘাত
পিছলামী	[illegible]ারামী
পিলা	প্লীহা
ফ	
ফেলফেলিয়া	পাতলা
ফস্কিয়া	পিছলাইয়া
ফাল্	লম্ফ

ব	
বাইৎ	বমি
বাদল	ঘনঘন বৃষ্টি
বিচন	পাখা
বিছন	বীজ
বরাদ্দ	পছন্দ
বড়ই	কুল
বকা	গালি
বিতিকিচ্ছা	বিশৃঙ্খলা
বিয়ান	প্রাতঃকাল
বিয়াই	বৈবাহিক
বুগল	নিকট
বেবাক্	সমস্ত
বাত্তি	পরিপক্ক
বেটা	পুত্র
ভ	
ভাদাইম্মা	যে কোন কাজ-কর্ম্ম করে না
ভাইল	ছলনা
ভোগা	মিথ্যা
ম	
মুচি	ছোট কাঁঠাল
মগরা	অবাধ্য
মেলা	অনেক
মাইচা	কেদারা
য	
য়াই	ক্ষুদাম
র	
রুক	লক্ষ্য
রুঠা	রসশূন্য
রাকুসা	রাক্ষস

ল

লগে	সঙ্গে
লিখন	চিঠি

স

সরম	লজ্জা
সাকুঁ	পুল

হ

হঙ্গন	আঘ্রান লওয়া
হুরণ	ঝাঁটা দিয়া পরিষ্কার করা
হপায়	এইমাত্র
হরান	ক্লান্ত
হাদন	অনুরোধ করা
হেইবেলা	তখন
হত্রিয়াম	পেয়ারা
হাইকান	চাটুবাদ
হারইল	টিকটিকি

শ্রীঅভয়কুমার যৌলিক।

অনুবীক্ষণের আশ্চর্য্য শক্তি।

অনুবীক্ষণ সাহায্যে শুধু অত্যন্ত ছোট বস্তু বড় দেখায় সাধারণের এই রূপই ধারনা, কিন্তু ইহাদ্বারা আরও যে কি আশ্চর্য্য কার্য্য—কি অদ্ভুত আবিষ্কার সাধিত হইতে পারে নিম্নলিখিত ঘটনা দুইটী হইতেই তাহা সম্যক পরিস্ফুট হইবে।

একনৈক ব্যক্তি হত্যাপরাধে অভিযুক্ত হয় কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে কোনও চাক্ষুষ প্রমাণ ছিল না। অনুসন্ধানে তাহার নিকট হইতে শুধু একখানি রক্ত মাখা ছোরা বাহির হয়। ছোরার ফলা ও বাটে রক্ত শুকাইয়া ছিল। আসামী জবাব দেয় যে ছোরা দিয়া সে খানিকটা টাটকা গোমাংস কাটিয়াছিল তাহারই রক্ত লাগিয়া রহিয়াছে। আসামীর জবাবে বিচারক বড়ই মুস্কিলে পড়িলেন এবং নিজে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া পরীক্ষার জন্য ঐ ছোরাখানি একজন দক্ষ আনুবীক্ষণিকের নিকট পাঠাইয়া দিলেন, আনুবীক্ষণিক উহা পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে—

১। ছোরার দাগ প্রকৃতপক্ষে রক্তেরই দাগ।

২। ঐ রক্ত কোন মৃত দেহের নহে, জীবিত দেহের বটে।

৩। ইহা গো, মেষ বা শূকরের রক্ত নহে, মনুষ্যেরই রক্ত।

৪। রক্তের মধ্যে তুলার আঁশের ন্যায় আঁশের অস্তিত্ব পাওয়া গেল।

৫। ঐ আঁশগুলি হতব্যক্তির গলাবন্ধের কাপড়ের আঁশগুলির সহিত বেশ মিলিত আছে।

আনুবীক্ষণিক সিদ্ধান্তে ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে ঐ ছোরা দ্বারা কোন জীবিত মনুষ্যের গলা কর্ত্তিত হইয়াছে। ঐ ব্যক্তির গলা তুলা জাত বস্ত্র দ্বারা বেষ্টিত ছিল।

আসামীর বিরুদ্ধে কোনও চাক্ষুষ প্রমাণ না থাকিলেও আনুবীক্ষণিকের সিদ্ধান্ত তাহার বিরুদ্ধে মারাত্মক প্রমাণ হইয়া দাঁড়াইল। বিচারকও সেই প্রমাণ বলে আসামীর উপযুক্ত শাস্তি বিধান করিলেন।

দ্বিতীয় পরীক্ষাটি আরও আশ্চর্য্য জনক। এক সময়ে কোনও প্রসিদ্ধ আনুবীক্ষণককে জিজ্ঞাসা করা হয়, সে অতি ক্ষুদ্র একখণ্ড বহু পুরাতন শুষ্ক চর্ম্ম তাঁহার

নিকট দিয়ে উহা কিসের চর্ম্ম তিনি অনুবীক্ষণ সাহায্যে তাহা নির্ণয় করিয়া দিতে পারেন কি না। উত্তরে তিনি বলেন যে, তিনি তাহা পারিবেন। পরীক্ষার জন্য অতি ক্ষুদ্র বহু প্রাচীন একখণ্ড শুষ্ক চর্ম্ম তাঁহার নিকট প্রেরিত হইল। চর্ম্ম খণ্ড দেখিলে বোধহয় যেন উহা অতি পুরাতন কোনও তোরঙ্গের উপরিস্থিত চর্ম্ম হইতে ছিঁড়িয়া লওয়া হইয়াছে।

অধ্যাপক অনুবীক্ষণ লইয়া এই চর্ম্ম খণ্ড পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে তাহার পরীক্ষার ফল বলিতে আরম্ভ করিলেন।

১। শুষ্কচর্ম্মে রোমাবলীর পরিষ্কার চিহ্ন দেখা যাইতেছে।

২। ইহা মানুষেরই লোম।

৩। এইরূপ লোম মনুষ্যশরীরে অনাবৃত স্থানেই জন্মিয়া থাকে।

৪। যে ব্যক্তির শরীরে এই লোমাবলী ছিল সে ব্যক্তি গৌরবর্ণ ছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অধ্যাপকের এই সিদ্ধান্তে লোকে একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। কারণ উক্ত শুষ্ক চর্ম্ম খণ্ড যে পুরাতন গির্জ্জার কপাট হইতে গ্রহণ করা হইয়াছিল তাহা সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে—বহু শত বর্ষ অতীত হইল কতকগুলি দিনেমার দস্যু এই গির্জ্জা লুণ্ঠন করে, দস্যুদিগের মধ্যে কয়েকজন ধৃত হইয়া স্থানীয় শাসন কর্ত্তার নিকট আনীত হইলে শাসন কর্ত্তার আদেশানুসারে জীবন্ত অবস্থায় ঐ দস্যুদিগের শরীর হইতে চর্ম্ম তুলিয়া লওয়া হয় এবং অন্যকে শিক্ষা দিবার জন্য ঐ চর্ম্ম ঐ গির্জ্জার কপাটে পেরেক মারিয়া আটিয়া দেওয়া হয়। জল বায়ু ও অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণে সেই কপাটের অনাবৃত স্থানের চর্ম্মের চিহ্ন মাত্র ছিল না—শুধু ছিল পেরেকের চেপ্টা মাথার নিম্নস্থ অংশটুকু। একটী পেরেক উঠাইয়া তাহারই নিম্নস্থ চর্ম্ম খণ্ড আনুবীক্ষণিক পরীক্ষার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল।

আনুবীক্ষণিক পরীক্ষায় বহু প্রাচীন জনশ্রুতি অক্ষরেহ সত্য বলিয়া নির্ণীত হইল। পরীক্ষার্থ প্রেরিত চর্ম্মখণ্ড যে মানুষের চর্ম্ম তাহাতো স্থির হইলই, অধিকন্তু যে দিনেমারগণের ন্যায় গৌরবর্ণবিশিষ্ট লোকের শরীরের চর্ম্ম অধ্যাপক তাহাও সিদ্ধান্ত করিয়া দিলেন।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।

কারে বেশী ভালবাসি ?

১

কারে বেশী ভালবাসি আমি নাহি জানি!
সুরধুনী শিরে রয়,
'কুলু' 'কুলু' 'কুলু' বয়,
মুখ লুকাইয়া বুকে হাসে সতী রাণী!
কারে বেশী ভালবাসি আমি নাহি জানি!

২

কারে বেশী ভালবাসি নাহি জানি আমি!
একজনা তপস্যায়
পেয়েছি স্বপন প্রায়,
অপরে দিয়েছে ধরা মোরে জেনে স্বামী!
কারে বেশী ভালবাসি নাহি জানি আমি!

৩

নাহি জানি আমি বেশী ভালবাসি কারে!
একজনা স্মৃতিময়ী,
গীতিময়ী, ছন্দোময়ী,
অপরে যে প্রেমময়ী নিঠুর সংসারে!
নাহি জানি আমি বেশী ভালবাসি কারে!

৪

নাহি জানি কারে আমি বেশী ভালবাসি !
একজনা মোর তরে
মরণে বরণ করে,
অপরের তরে আমি কাঙ্গাল উদাসী !
নাহি জানি কারে আমি বেশী ভালবাসি !

৫

নাহি জানি আমি কারে ভালবাসি বেশী !
একজনা সারা দিন
মরমে বাজায় বীণ,
অপরে নিশীথে পাশে মুক্তা এলোকেশী !
নাহি জানি আমি কারে ভালবাসি বেশী !

৬

কারে বেশী ভালবাসি আমি নাহি জানি !
দু'জনার প্রাণ মাঝে
মরণের সুধা রাজে,
দু'জনা জুড়াতে চায় দগ্ধ হৃদিখানি !
কারে বেশী ভালবাসি আমি নাহি জানি !

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

দেশী ও বিদেশী

[মেদিনীপুর সাহিত্য-সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণ]

আমরা জাতীয় জীবনের এক সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়েছি। আমরা পল্লীর আনন্দে বিভোর ছিলুম—আজ কোন্ মহাশক্তি টিকি ধোরে আমাদেরকে ঘর থেকে বাইরে নিয়ে জীবন সংগ্রামের সম্মুখীন করেছে। আমাদের ঘরের স্নিগ্ধ প্রদীপটি নিবু-নিবু, বাইরের তীব্র বৈদ্যুতিক আলো আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে শুধু,—এখনও আমরা তা' করায়ত্ত কর্‌তে পারিনি। এইবার বাইরের সংঘর্ষ এসে পড়েছে। যাঁরা দোরে খিল দিয়ে বাইরের এই বন্যা ঠেকিয়ে রাখ্‌তে চাইছেন, তাঁরা পার্‌বেন না। প্রবাদ আছে মিসেস্ পার্টিংটন আট্‌লাণ্টিক সাগরকে তাঁর কুঁড়ের দিকে অগ্রসর হোতে দেখে ঝাঁটা হাতে তার গতিরোধ কর্‌তে দাঁড়িয়েছিলেন। যাঁরা প্রাচীন পাততাড়ি বগলদাবায় করে নিজকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে চাইবেন তাঁরা তা পার্‌বেন না—কিছুতেই পার্‌বেন না। একটা সামঞ্জস্যের দিন এসেছে। কিছু ছেড়ে দিতে হবে—কিছু কিছু বাইরে থেকে নিতেও হবে।

এই বন্যায় আমাদের সব তলিয়ে না যায়—সেই দিকে লক্ষ্য রাখ্‌তে হবে। এখনও খুব ভরসার কারণ পাওয়া যায়নি। জাতীয় জীবনের একটা কলরব শোনা যাচ্ছে মাত্র ; এ কি নব জাগরণ, না অন্তিম চীৎকার ? আমরা শিল্প, সাহিত্য, প্রভৃতি সর্ব্ব বিষয়েই পরায়ত্ত হয়ে পোড়ে আছি। আমরা এখনও নিজকে চিন্‌তে পারিনি। যেদিন আমরা নিজের শক্তি বুঝ্‌তে পার্‌ব, সেদিন আমাদের জীবনের ভরসা হবে।

ধরুন আমাদের চিত্রশিল্প। রবিবর্ম্মার "গঙ্গার অবতরণ" একখানি প্রসিদ্ধ চিত্র ; এই আলেখ্যে শিবঠাকুর ঠিক সাহেবের মত দু পা ফাঁক কোরে কোমরে হাত দিয়ে উর্দ্ধমুখে দাঁড়িয়ে আছেন, যেন এই মাত্র মুখ হোতে চুরুটটি পোড়ে গেছে। দেশীয় লোক কি প্রতীক্ষার ভাবে উপরের দিকে চেয়ে দাঁড়ান না ? রবিবর্ম্মা পুণায় কি তা দেখেননি ? তবে এই উৎকট ভঙ্গীর অনুকরণ কর্‌তে গেলেন কেন ? শকুন্তলা-বিদায়ের ছবি আর-একজন প্রসিদ্ধ চিত্রকর এঁকেছেন। তাতে দেখ্‌তে পাবেন—কণ্বমুনি পাদ্রীর মত বেশ পোরে পাদ্রীর ভঙ্গীতে শকুন্তলাকে আশীর্ব্বাদ কর্‌ছেন। আমার বন্ধু শশীকুমার হেশ ইটালীতে চিত্র-বিদ্যা শিক্ষা কোরে দিগ্‌গজ চিত্রকর হোয়ে ফিরে এসে

"কর্ণকুন্তী" নামক একখানি চিত্র আঁকলেন। ঠিক মেম-সাহেব সাড়ী পোরে গালে আঙুল ঠেকিয়ে বোসে আছেন, তাঁকই আমাদের কুন্তী বোলে মেনে নিতে হবে। অনেক নবীন চিত্রকরের হাতের আঁকা ছবি দেখেছি; তাঁরা কিছুতেই সাহেবের মুখের হাসি, তাদের দাঁড়াবার, কথা বলবার ভঙ্গী ভুলতে পারেন না, বাঙ্গালী আঁকতে গিয়ে সেই-সকল বিদেশী ভঙ্গীর রেখা ছবির মুখে চোখে ফুটে ওঠে। চারদিকে দেশীয় লোকের মধ্যে বাস কোরে তাঁদেরই একজন হোয়ে আমরা যে কতটা আত্মবিস্মৃত হোতে পারি, তা আর কি বলব! অবনীন্দ্র-বাবুর স্কুলের কোনো কোন চিত্র-কর বোসে ২ তুলি ঘোষে ঘোষে ছবি নকল করছেন; দেশীয় ধারা রক্ষা কোরে যাচ্ছেন—প্রাচীন নর্ত্তন-ভঙ্গী, মুদ্রা, এবং হাত পা আঁকবার প্রাচীন রীতি আয়ত্ত করতে চাচ্ছেন—কিন্তু বাঙ্গালী জাতি সেই বহু পূর্ব্বের রীতিতে আঁকা ছবি দেখে বুঝতে পারছে না এগুলি ঠিক তাদেরই ছবি না বিদেশের। কিন্তু বর্ত্তমান জীবনের যতটা প্রতিচ্ছায়া ছবির উপর পড়বে, ছবি ততটা জীবন্ত হবে। বাঙ্গালী-জীবন লক্ষ্য করবার মত চক্ষু কয়জনের যে এদেশে আছে তা' জানি না। গগন-বাবু তাঁর বিদ্রূপব্যঙ্গে রহস্য করতে গিয়ে কতকগুলি ছবিতে বাঙ্গালীজীবনের কিছু আভাস দিয়েছেন, কিন্তু আমাদের জীবনে কি ভাব কিছুই নেই যা' থেকে চিত্রকর প্রেরণা পেতে পারেন? এখুনি কি প্রদীপের শিখা নিবে গেছে, আরতির ধূপ-ধুনোর গন্ধ বাতাসে মিশে গেছে? বাঙ্গালী-জীবনের যে প্রেমের বন্যায় নদীয়া শান্তিপুর ভেসে গিয়ে তা' বিশ্বকে প্লাবিত করবার প্রয়াস পেয়েছিল, সে প্রেমের বন্যা কি একবারে থেমে গেছে?

বাঙ্গালী চিত্রকর, চোখ খুলে নিজের চারদিক্ দেখে ছবি [illegible] শেখ, ছবি দেখে আর কতকাল ছবি আঁকবে, কতকাল আর সওদাগরের বিলাতী ছবি দেখে নকল করবে? জাপানী ঢং এমন কি মোগলাই শিল্প-কলা দেখে আমরা খানিকটা বিস্ময় বোধ করতে পারি, কিন্তু তাতে আমাদের প্রাণের তৃষ্ণা মিটবে না। র‍্যাফেল মাইকেল-এঞ্জেলোকে চিত্রশালা হোতে দূর কোরে দিতে হবে না,—যে দেশের যেটি ভাল তা' আয়ত্ত করতে হবে বই কি। কিন্তু আমরা ঘর যেন না ভুলি, আমাদের সুখদুঃখ যা আমাদের কাছে বড়—তা' যেন তুচ্ছ করতে না শিখি। ম্যাডোনার মুখ নকল না কোরে নিজের মায়ের মুখ দেখে আঁকলে ছবি আঁকা সার্থক হবে। ম্যাডোনা হোতে যশোদা ও মেনকা বরং দেশে অনেক কাছে, তাঁদের ভাব বাঙলা সাহিত্যে ছড়িয়ে আছে, এবং আমাদের কুঁড়েঘরে সে রসের জীবন্ত ধারা এখনও বয়ে যাচ্ছে।

একথা বোধ হয় বলা যায় যে বাঙ্গালীর মত সুকুমার ভাবের চর্চ্চা ভারতের অন্যান্য জাতিরা অল্পই করেছেন। মনস্তত্ত্বের এরূপ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এদেশের অন্যত্র আছে কি না আমি জানি না। উদাহরণ-স্থলে দানকেলি-কৌমুদীর একটি স্থানের উল্লেখ করছি। প্রথম শ্লোকটির জীব-গোস্বামীকৃত ব্যাখ্যাটি পাঠ করুন; দেখবেন "কিলকিঞ্চিৎ" ভাবটি কি অপূর্ব্ব ভাবে চোখের কাছে ধোরে দেওয়া হয়েছে! শ্লোকটিতে মান, লজ্জা, অশ্রু ও হাসিতে মিশে চক্ষের চাউনি কি আশ্চর্য্য জটিল মনস্তত্ত্বের আভাস দেখাচ্ছে! কবি প্রেমিকার চাউনিটিকে ফুলকলির সঙ্গে উপমা দিয়ে গেছেন, কিন্তু সে কথা মুখ ফুটে বলেননি; এই প্রচ্ছন্ন তুলনায় নায়িকার চাউনির কি সুন্দর ও গূঢ় অর্থ ধরা পোড়ে গেছে! নায়কের অসতর্কতায় নায়িকা লোকজনের মাঝে কতকটা অপ্রতিভ হোয়ে পড়েছেন—তখন তাঁর চাউনিটি কেমন হোয়েছে কবি বলে যাচ্ছেন—কতকটা রাগ ও গঞ্জনাশীল ভঙ্গীতে চোখ প্রফুল্ল হোয়েছে, যেন পাপড়ির উপর সূর্য্যের কিরণ এসে পড়েছে; ভয়ে ও ত্রস্ততায় চোখে জল এসেছে, যেন এক বিন্দু নীহার কুঁড়ির উপর টলটল করছে; নায়কের

অসতর্ক আহ্বানে তিনি ক্রুদ্ধা হোয়েছেন, কিন্তু তা' রোধ কর্‌বার শক্তি হৃদয়ে নেই, এজন্য সেই চাউনি সাড়া দিচ্ছে না এবং দিচ্ছেও, যেমন কোরে ফুলের কলিটি হাওয়ার জোরকে ঠেকিয়ে রাখতে চায়, অথচ সেই জোরে শেষে ধরা দিয়ে আস্তে আস্তে দল খুলে প্রসন্নতা দেখায়। "স্তবকিনী" শব্দটি হোতে চাউনির নানা গভীর রস এই ভাবে নিংড়িয়ে বার করা হোয়েছে। একটা চোখের ইসারা যে ভাব জগতের কতটা সুক্ষ্ম সূক্ষ্ম ঐশ্বর্য্য দেখাতে পারে--তার পরিচয় এই শ্লোকটিতে আছে। রূপ-গোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি বই পড়্‌লে পাঠকের চোখের সাম্‌নে ভাবের এক নূতন রাজ্য খুলে যাবে। চৈতন্যদেবের চোখের চাউনিতে শত শত স্বর্গীয় ভাবের ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। তা' থেকে রূপ-গোস্বামী এই সকল তত্ত্ব বুঝেছেন। পদকর্ত্তারা তাঁদের লেখনী মুখে সেইসকল তত্ত্ব প্রচার করেছেন। লেখনী যা' পেরেছে তুলি কি তা' পারে না? একজন বৈষ্ণব কবি লিখেছেন—"নায়িকার চোখদুটি স্থির ভ্রমরের মত—যেন মধুতে মত্ত হোয়ে আছে, উড়তে পার্‌ছে না।" প্রেম-বিভোর চোখের আবেশ বুঝাতে এর চাইতে সরস ভাষা কোথায় জুটবে? "মধুমাতল কিয়ে উড়ই না পার" চোখের এই ভাব কি তুলিতে ফোটে না? তা' না হলে বঙ্গে যে স্বর্গের মানুষ এসেছিলেন, সেই চৈতন্যদেবকে চিত্রকর জগতের কাছে একে দেখাবেন কি কোরে? তাঁর দিব্য চোখের চাউনি কি আমরা এত শীঘ্র ভুলে গেলাম? অন্যত্র কবি অপাঙ্গ-দৃষ্টির কথায় লিখেছেন "কালো তারা চোখের এক কোণে এসে পড়েছে—যেন ইন্দীবরের মাঝ থেকে হাওয়ায় জোর কোরে ভ্রমরটিকে ঠেলে এক কোণে এনেছে।" এই অপাঙ্গ দৃষ্টি কি ছবিতে আঁকা যায় না? "যাঁহা যাঁহা তরল বিলোকন পড়ই। তাঁহা তাঁহা নীল উৎপল ভরই" —এই ছত্রে কবি প্রেমিকের এ নীলস্নিগ্ধ চাউনির ইঙ্গিত দিয়েছেন তা' কবি হোতে চিত্রকরই বেশী স্পষ্ট কোরে দেখাতে পারেন। চোখের দৃষ্টির study বাঙ্গলা কবিরা যে রকম কোরে গেছেন, সেরকম অন্য কোথায়ও তো দেখিনি; তার পাশে বাঙ্গলার চিত্রকর চুপটি কোরে বোসে আছেন, যেন তিনি তাঁদের কেউ নন! ভাবের বৈচিত্র্য চোখে মুখে ফোটাবার মত মালমসলা বাঙ্গালীর সাহিত্যে বাঙ্গালীর ঘরে অনেক আছে। তা' নিয়ে চর্চ্চা কর্‌লে বাঙ্গালী চিত্রকর প্রথম শ্রেণীর আসন অনায়াসে দখল কর্‌তে পারেন। সে পথ ছেড়ে দিয়ে আমরা গ্রীক আদর্শের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন ও নরদেহে স্নায়ুর সমাবেশ বিস্ময়ে হাঁ কোরে দেখ্‌ছি। গঠনের যে পূর্ণতা আমাদের নেই, তা' নিয়ে হতাশ ভাবে নিজ জাতিকে ধিক্কার দিচ্ছি। অথচ সূক্ষ্মতর ভাবের সৌন্দর্য্য, যাতে আমরা জয়ী হয়েছি, সেটি কাছের জায়গা থেকে আবিষ্কার কর্‌বার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছি। কেবল শরীরের গঠন ও হাত-পায়ের ভঙ্গী নকল কোরে কি হবে? আগমনী গান থেকে, রামপ্রসাদের ভাব থেকে—এখনও নরনারীরা এদেশে যে অপূর্ব্ব ত্যাগ ও স্নেহ দেখিয়ে থাকেন তা থেকে তুলি জীবন্ত রস গ্রহণ করুক। এইটি বিশেষ কোরে জান্‌তে হবে, যে আমরা সুকুমার-বৃত্তিগুলিকে তপস্যার রাজ্যে নিয়ে পৌছিয়েছি। অন্য কোনো জাতি সেই মাত্রায় তাদের চর্চ্চা করেননি। এই তপস্যার জিনিষটা তুলির রেখায় অভিব্যক্ত কর্‌তে পার্‌লে, জগৎ তা দেখে মুগ্ধ হবে। আমাদের ঢাকার মস্‌লিন,—আমাদের মনোহরসাই গান—একান্তভাবে বঙ্গের নিজস্ব—তা হারিয়ে ফেলে যদি আমরা ৪৯এর থান বুনে কৃতিত্ব দেখাই কিম্বা অর্‌গানের গানের নকল করি—তা'হলে আমাদের জোরের জায়গাটা ছেড়ে দেওয়া হয়। এসকল বাইরের পাওয়া জিনিষ যে আমরা একেবারে ছেড়ে দিয়ে বস্‌ব—তা বল্‌ছি না। হয়ত নিত্যকার দরকারের জন্য সেসকল সাজসরঞ্জামের দিকে বেশী লক্ষ্য রাখ্‌তে হবে—কিন্তু আমাদের শিল্পসাহিত্যের স্তূপ মণিমন্দির ভেঙ্গে ফেল্‌লে—যেন উষার কপাল

থেকে অরুণরাগ মুছে ফেলা হবে। যা' কিছু এ দেশের গৌরবের, তার জন্য বড় একটা স্থান রেখে শেষে বাজারের হিসেব-নিকেশের ফর্দ্দ প্রস্তুত করতে হবে।

বিদেশী লোকের প্রশংসার একটা মূল্য আছে, কিন্তু তাকে মনের ভিতর বাড়িয়ে ভাবা উচিত নয়। ধরুন, আমাদের ঠাকুর-দেবতার পূজো—এর সঙ্গে বঙ্গীয় নরনারীর কতখানি অশ্রুজল, কতটা উৎকণ্ঠা, কত নিশি-জাগরণ, ধন্না দেওয়া, উপবাস করা এবং চন্দন ঘষা ও শঙ্খধ্বনি হোতে আরম্ভ কোরে, চামর ব্যজন ও আরতির কথা আমাদের মনের পর্দ্দায় পর্দ্দায় জড়িত হোয়ে আছে— এগুলি জাতীয় চিরন্তন তপস্যার সামগ্রী। এই তপস্যাকে চিত্র বা সাহিত্যে উজ্জ্বল কোরে দেখাতে পারলে,জগৎবাসী আমাদের তপস্যায় বিশ্বাস করবে, নতুবা দেবদেবী আঁকতে গিয়ে যদি তুমি জাতীয় পূজার ভাবটি ছেড়ে দিয়ে উদ্ভট কল্পনার সাহায্যে যা কিছু একটা গোড়ে তোল এবং যদি সেই সস্তা কল্পনায় কতকটা বাহাদুরী থাকে—তবে হয়ত ভিন্নদেশবাসী লোকেরা সাময়ীক ভাবে তার পক্ষপাতী হতেও পারেন। তাঁদের যা ভাল লাগে তাই যদি চেষ্টা কোরে গড়তে থাক,—তবে হয়ত বিশ্ব-সভ্যতার এক কোণে স্থান লাভ কোরে দাঁড়াতে পেড়েছ বোলে একটা দর্প্প হোতে পারে। কিন্তু তুমি যে পর্য্যন্ত নিজেকে আবিষ্কার কোরে নিজের মূলধন ব্যয় করতে না পেরেছ সে পর্য্যন্ত তুমি এই শিল্প-সাহিত্যের রাজ্যে স্থায়ী শ্রদ্ধার আসন পাবে না। তাই একান্ত মনে তোমার বিশেষত্ব কি তোমার তপস্যা ও শক্তি কোথায় তা' আবিষ্কার করতে চেষ্টা কর। নতুবা আফিসেও তুমি কেরাণী, শিল্প-সাহিত্যেও তুমি কেরাণী—নকল ভিন্ন তোমার অন্য কাজ নেই; তোমার চিরকালই তা'হলে একটা নিম্নের পংক্তিতে স্থান হবে। যে জাতির মঠধারী, এমন কি জগৎগুরু বোলে স্পর্দ্ধার পরিচয় দিয়ে থাকেন, তাদের আর গৌরব তা'হলে রইল কি? একটা সাড়া পোড়ে গেছে, জগতকে আমাদের জিনিষ দেখাতে হবে, কিন্তু নিজের ঘরের জিনিষ ফেলে বাইরের নকলনবিশী করলে সার্ব্বজনীনত্ব লাভ হবে না—পৃথিবীর প্রত্যেক বড় প্রতিভার উপর তার দেশের ও জাতির যে শীল-মোহরটি আছে সেটি খুইয়ে ফেলে কেউ বড় হন্‌নি, বাল্মীকিও নয়, সেক্‌শপীয়ারও নয়। আমাদের সাহিত্যও নকলনবিশগণের অধিকারভুক্ত হয়ে যাচ্ছে। ইব্‌সেন, বার্ণার্ড শ, ওয়েলস্ প্রভৃতি লেখকগণ তাঁদের সমাজের জটিল প্রশ্নগুলির সমাধান করতে দাঁড়িয়েছেন। সেগুলি তাঁদের সত্যকার প্রশ্ন। বহু শতাব্দী যাবৎ স্ত্রীপুরুষের অবাধ সামাজিক মেলামেশায় যে সকল জটিলতা তাদের নরনারীর সম্পর্কের প্রশ্নকে ঘিরে ধরেছে—য়ুরোপীয় লেখকগণ নানারূপে সেই সমস্যার মীমাংসা করতে চেষ্টিত হয়েছেন। সে দেশে একটি সুন্দরী ও গুণশীলা রমণী যদি গায়িকা, নৃত্যকুশলা বা বাক্‌চতুরা হন, তবে সমাজ তাঁর সেই সকল গুণ উপভোগ করতে দাবী রাখে। তাঁকে সামাজিক অনুষ্ঠানে নেচে, গেয়ে, বাক্‌কৌশল দিয়ে সকলকে পরিতৃপ্ত করতে হয়। সময়ে সময়ে সেই রমণীর উপর সমাজের দাবী ও সহানুভূতি অগ্রগণ্য হোয়ে তদনুপাতে স্বামীর দাবী অস্বীকৃত হোতে পারে। কখনও কখনও সাহিত্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে সামাজিক দাবী ও সহানুভূতির ফলে তিনি স্বামীকে ডিঙ্গিয়ে মার্জ্জনা এমন কি প্রশংসাও লাভ করছেন। যেমন মোনাভানার চরিত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি। সে দেশে দাম্পত্য সম্বন্ধ একনিষ্ঠ হবার পক্ষে অনেক সময় সামাজিক প্রথা-গুলতঃই কিছু কিছু অন্তরায় জুটে যায়। সুতরাং ইব্‌সেন বার্ণার্ড শ বা টলষ্টয় যে সকল চিত্র এঁকেছেন—তা' তাঁদের দেশের খাঁটি চিত্র। নরনারী সম্পর্কের প্রশ্ন তাঁদের চোখের সাম্‌নে বিচিত্ররূপে জটিল হোয়ে উঠেছে, তার মীমাংসা তাঁরা অবশ্যই করবেন।

কিন্তু আমাদের দেশে কি স্ত্রীপুরুষের সমস্যাটা ঠিক সেইরকম দাঁড়িয়েছে? আমাদের দেশে স্ত্রীজাতির যে

একটা স্বাভাবিক লজ্জা ও সংযম আছে, তা কি আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ করি না? যে-সকল প্রেম-সমস্যার সন্ধি-স্থলে কোনো লেখক তাঁদেরকে এনে দাঁড় করাচ্ছেন, তার বীভৎসতা কি আপনারা অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করেন না? আমাদের পারিবারিক জীবন কি সত্যই এই উৎকট প্রেম-লীলার অভিনয়-ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে? এই যে শত শত হিন্দু গৃহস্থ চারিদিকে আছেন, তাঁদের কোনো বাড়ীতে কি এই-সকল দুর্নীতি প্রশ্রয় পেয়ে থাকে? না, বিলাতী সাহিত্যে যা'কিছু পেয়েছি, আমাদের এখানে দেশের নাম কোরে যেমন কোরে হোক তার লীলাটা দেখাতে হবে—এই নকলবাজী না করলে আমাদের লেখক-জীবন মিথ্যা হোয়ে যাবে? কোনো লেখক ছাগলের মুণ্ড নরদেহে কিছুতেই জোড়া না দিতে পেরে মুসলমানী নায়িকার আমদানী কোরে মনের সখ্ মিটিয়েছেন—কিন্তু তাতে কোরে মুসলমানেরা ভারি চোটে গেলেন। আমাদের ব্রাহ্ম ভ্রাতাদের পারিবারিক জীবনটাকে আশ্রয় কোরেই এই প্রেমের তাণ্ডব খেলাটা কোনো কোনো লেখক খুব জমিয়ে নিয়েছেন! কিন্তু সেই-সকল ভদ্র পরিবার যে এইরূপ দুর্নীতি প্রশ্রয় দেন, এটা আমরা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না। হিন্দুজাতির নিষ্ঠা ও প্রীতি প্রত্যেক সৎপরিবারের মজ্জাগত। সে পরিবার গোঁড়া হিন্দু হোন্ বা ব্রাহ্ম হোন, এবিষয়ে কোনো প্রভেদ নেই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় আমাদের ব্রাহ্ম বন্ধুদের তরফ হোতে তাঁদের সমাজের প্রতি এই অসম্মানকর গ্লানির আরোপের কোনো প্রতিবাদ হচ্ছে না। আমরা শুনতে পাচ্ছি ক্ষণিক উত্তেজনা—যার ফলে জীবন একবারে নষ্ট হয়ে যায়—সেই উত্তেজনার নাম নাকি রস,—সেই উত্তেজনার নাম প্রেম, সেই উত্তেজনা জনিত স্বেচ্ছাচার দেখানই আর্ট! এই শ্রেণীর লেখকগণ কেবল হাঁকছেন ভাঙ্গ ভাঙ্গ ভাঙ্গ, হোক্ না কেন তা' তাজমহল—ওগুলি পুরাণো আদর্শ—এখন ওসকল রেখে কি হবে? হোক না তা' নিষ্ঠা, লজ্জা, বিনয়—ওসকল প্রাচীনদের মতে সদ্‌গুণ; এখনকার গুণ হবে—স্বেচ্ছাচার, যা' খুসী মনে হবে তখনই সেই ভাবের দরিয়ায় গা ঢালা। কিন্তু এটি যদি সত্যই আমাদের দেশ চাইতো, তবে কুড়ুল হাতে কোরে আমিও তাদের দলে ভিড়ে যেতুম। কিন্তু যেদেশের স্ত্রীলোকেরা 'মা' ভিন্ন অন্য ডাকে বাইরের লোককে সাড়া দেন না, সে দেশে এ সমস্যা আসেনি, একথা মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি। এইসকল লেখক এদেশীয় নারী-প্রকৃতিতে এরূপ কল্পিত অসংযম আরোপ কোরে তাঁদের মা-বোনদের অপমানিত করছেন। শিক্ষিত লোকদের মধ্যে যাঁরা এই বিলাতী নকল চালাচ্ছেন—তাঁরা তাঁদের মা-বোনদের হাতে তাঁদের রচিত বইগুলি দিয়ে দেখবেন তাঁরা সেইসকল পুস্তক পোড়ে লজ্জায় ঘাড় হেঁট করেন কি না। তাঁদের মন্তব্য আগে নিয়ে তারপর বই প্রকাশ করবেন।

পারিবারিক স্নেহ ও প্রেম আমাদের জাতীয় তপস্যা। বিলাতে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ নিয়ে তর্ক উঠেছে। যেসকল জাতি বিরাট আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জগতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, যাঁরা কথায় কথায় আর্কটিক সমুদ্রের শেষ দেখতে প্রাণের আশা ছেড়ে দিয়ে চোলে যান, গোলকণ্ডা হোতে সুরু কোরে অষ্ট্রেলিয়া ও ক্যানোডা পর্য্যন্ত সমস্ত রত্নখনির প্রতি যাঁরা অভিনিবিষ্ট, সহস্র প্রকারের বিচিত্র বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ও যান দ্বারা যাঁরা সমুদ্রতল আলোড়ন করছেন, আকাশকে রাজপথে প্রবর্ত্তিত করছেন, ঘরে বোসে থাকবার তাঁদের অবসর কোথায়? পারিবারিক সম্পর্ক তাঁদের নিকট খুব উঁচু হোতে পারে না—উহা শুধু কর্ত্তব্যের আকার ধোরে তাঁদের চোখে পড়ে—উহা তাঁদের জীবনের প্রেরণা বা তপস্যা নয়। কিন্তু বাৎসল্য ও দাম্পত্য এখনও বাঙ্গলার তপস্যার সামগ্রী। তার উপরে ঘা দিলে আমাদের যেটা এখনও একমাত্র তীর্থ, তার পবিত্রতা নষ্ট হতে পারে—অন্য কোনো দিক থেকে যে সে ক্ষতিপূরণ হবে—তার তো সম্ভাবনা দেখছি না। বর্ত্তমান বাঙ্গালী-জীবনের সারাদিনের ক্লান্তির পর জুড়োবার যে স্থানটি

আছে, তার মাঝে আনা ক্যারেনিনা ওইনিভিড বা মনাভানাকে দাঁড় করালে যে দুঃসহ অভিশাপ আসবে তাতে কোরে বাঙ্গালীর কুঁড়েঘরখানি জোরে পুড়ে খাক্ হোয়ে যাবে। আপনাদের নিকট আমার এই বিনীত অনুরোধ আপনারা নিজেরা না পোড়ে, কিম্বা কোনো ... লোকের নিকট গল্পটি কেমন তা' না জেনে অন্তঃপুরে কোনো গল্পের বই পাঠাবেন না। যে সংযম ও শুচিতা হিন্দু-রমণীর নিজস্ব, এই গল্প গুলি তা দস্যুর মত অপহরণ করবে। আর্ট এবং রসের নাম দিয়ে ভারতচন্দ্র যা করেছিলেন, এই গল্পলেখকগণ অন্যভাবে তাও ছাপিয়ে উঠেছেন। ভারতচন্দ্রের শিষ্য তখন বাঙ্গলায় বিস্তর জুটেছিল, বিদ্যাসুন্দরের দেখাদেখি "কামিনীকুমার" "জীবনতারা" প্রভৃতি পুস্তক রচিত হয়েছিল—সেইসকল লেখকগণ শারীরিক সুখ-লিপ্সার একটা উৎকট অবতরণিকা করেছিলেন। এ দেশ হোতে সে রুচিবিকার গেল কিরূপে? পেনালকোড্ তা' দমন করতে পারেনি। আমার বিশ্বাস, আমাদের নারীচরিত্রে যে স্বাভাবিক লজ্জা ও নিবৃত্তি আছে, তা' নিজকে প্রকাশ কোরে এই-সকল লেখক-প্রক্ষিপ্ত কালিমার মিথ্যা অপমান থেকে আত্মরক্ষা কোরে এসেছে। এখনকার লেখকেরাও এই যে বিদেশী মকল চালাতে চাচ্ছেন—আমার বিশ্বাস তা এ দেশে দাঁড়াবে না। এ ভাবের অসংযম আমাদের সমাজে নেই, তা' উড়ে এসে কিছুতেই আমাদের অন্তঃপুর অধিকার করতে পারবে না। ভারতচন্দ্র ও তাঁর অনুকরণকারীদের রচনায়ও ছিল রস, তার মধ্যেও ছন্দাদি ও শব্দচয়নের এরূপ অসামান্য নৈপুণ্য ছিল যে, সেগুলি সাহিত্যিক আর্ট-বর্জ্জিত বোলে যদিও বা কেউ এ যুগে উড়িয়ে দিতে চান—সে যুগে যদি কেউ সেরূপ বলতে সাহসী হোতেন তবে পাণ্ডাদের হাতে তাঁদের অনেক-রকম দুর্গতি হোত, একেবারে টিকি ধোরে টানাটানি পোড়ে যেত! কারণ সেইসকল লেখক সে যুগের পাণ্ডিত্যে বড় কম ছিলেন না। আমাদের দেশ একনিষ্ঠ ও সহৃদমনোরঞ্জনী লালসা এ দুয়ের প্রভেদ বিলক্ষণ জানে—সীতাকে উদ্ধার করবার জন্য ঘোরতর যুদ্ধ হোয়েছে, কিন্তু শূর্পনখার নাক কান কাটতে কিছুমাত্র দ্বিধা হয়নি। কোন্ রস ভ্রমরের পেয় এবং কোন রস্ মক্ষিকার পেয়, সে-সম্বন্ধে অনেকগুলি শ্লোক আছে। 'রস' কথা শুনেই আমাদের রসনেন্দ্রিয় আর্দ্র হোয়ে উঠবে না। নগ্নতাই যদি আর্ট হয়, তবে পোষাক-পরিচ্ছদের পাছে আধুনিক কালে এত খরচ বাহুল্য হচ্ছে কেন?

আমার বক্তব্য এই যে, বিলাতী বই পোড়ে পোড়ে সেই নকলে এ দেশে যাঁরা গল্প লিখ্‌ছেন—তাঁরা আমাদের সমাজের ছবি দিচ্ছেন না। বিলাতী সমাজের প্রশ্ন আমাদের প্রশ্ন নয়। যখন ফরাসী বিপ্লব খুব জোরে চল্‌ছিল তখন টিপু সুলতান দেখাদেখি নিজেকে "সিটিজেন টিপু" বোলে পরিচয় দিয়ে কাগজপত্র সেইরূপ দস্তখৎ করতেন। আধুনিক লেখকগণ সেইরূপ একটা কিছু অভিনয় করছেন। পূর্ব্বেই বলেছি এই ক্ষেত্রে সাহেবদের প্রশংসাবাদে আমাদের কিছু আসবে যাবে না, তাঁরা যে বিষয়গুলি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, তার একটা সুর যদি আমরা এখান থেকে ধরি, তা তাঁদের অবশ্যই ভাল লাগবে—তোতা-পাখীর মুখে হরিনাম শুনে যেরূপ হরিভক্তেরা বাহবা দিয়ে থাকেন। কেবল জিজ্ঞাস্য এই যে সে সুরটা আমাদের নিজের সুর, না একটা বেসুরো বিলাতী আমদানী? কেউ হয় ত বলবেন—এই সকল সমস্যা এখন জগতের সমস্যা হোয়ে দাঁড়াবে, ভবিষ্যতে সমাজ যা হবে এ তার পূর্ব্বাভাস; কিন্তু আমাদের সমাজে যে কখনও এ সমস্যা আসবে তা যাঁরা ঘর-গেরস্থালি করছেন তাঁরা বলুন, তার কোনো আভাস পাচ্ছেন কি না। শুধু কয়েকজন পুরোমাত্রায় বিদেশী ঢংএ গড়া ইঙ্গ-বঙ্গ পরিবারে যদি কিছু অভিনয় হোয়ে থাকে ত' সমস্ত বাঙ্গালী জাতির নামে চালাবেন না। বাঙ্গালী রমণীরা তার কোনো খবর রাখেন না, তা জানতে চান্ না—আপনারা পর্দ্দা সরিয়ে সেই খবর তাঁদের দিচ্ছেন কেন,—

এই আমার জিজ্ঞাস্য। আমাদের সমস্ত সমাজ থেকে একটা ধিক্কার-বাণী উঠে এই স্রোত থামিয়ে দেওয়া উচিত। যদি ধর্ম্ম-মূলক পুরাণ-কথাগুলি এ দেশে এখন সেকেলে হয়ে থাকে, তবে আমাদের বর্ত্তমান সমাজে ঢের-ঢের সত্যিকার সমস্যা এসে পড়ছে, তা' নিয়ে বেশ গল্প ও কাব্য লেখা চলতে পারে—সেই সকল প্রশ্নের সমাধান আমাদের দেশ প্রত্যেক চিন্তাশীল শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট চাইছেন। যাঁরা বিলাতী বইএর চরিত্রগুলি না দেখে এ দেশের জীবন্ত চরিত্রগুলি দেখছেন—তাঁরা জানেন এখনকার উপন্যাসগুলির অধিকাংশই নিজের ঘরের পাশ কাটিয়ে বাইরের কথা নিয়ে ব্যস্ত হোয়ে পড়েছে। মূলকথা নিজে চোখে দেখে লেখার একটা শক্তি আছে, তা সহজে অর্জ্জন করা যায় না, তা হোতে একখানি তৈরী বই থেকে প্লট ও চরিত্রের ছায়া নিয়ে তাড়াতাড়ি কুড়ি ফর্ম্মার একখানি বই লিখে প্রেসে দেওয়া সহজ।

প্রত্যুত স্ত্রীজাতির অবাধ প্রেম এখন আমাদের সমস্যা নয়। বাঙ্গালার পল্লীতে-পল্লীতে ঘুরে দেখুন—বাঙ্গালী জীবনের কোন্‌গুলি গুরুতর প্রশ্ন?

প্রথম প্রশ্ন—উদরান্ন সংস্থান। কবি ও ঔপন্যাসিক কর্ম্মের মন্ত্র শিখিয়ে এই প্রশ্নের সমাধান করতে পারেন কি? বাঙ্গালী ভদ্রলোকশ্রেণী যে ধীরে ধীরে ধ্বংসের মুখে যাচ্ছেন,—এখানে আমাদের মহা করুণার ক্ষেত্র; অনন্ত শ্মশানের বিভীষিকা। কোন্ কবি বা জ্ঞানী আজ আমাদেরকে বাঁচবার পথ দেখাবেন?—ভাবী নিরবচ্ছিন্ন আঁধার আকাশে কেউ কি একটি তারায় আলো জালিয়েও ত্রাণের পথ দেখিয়ে দিতে পারেন?

দ্বিতীয় প্রশ্ন—কন্যা-দায়। শক্তিমান্ লেখক নারীজাতির স্বাবলম্বন, কৌমার্য্য-ব্রত এবং অর্জ্জনোপায়ের কোনো সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে আসন্ন বিপদ হোতে সমাজকে উদ্ধার করার পথ আবিষ্কার করুন।

তৃতীয় প্রশ্নও সেই প্রথম প্রশ্নটির অন্তর্গত—দারিদ্র্যের ফলে আমাদের সন্তানদের অকালমৃত্যু, নানা রোগশোক, কুলললনার আত্মহত্যা অথবা গণিকা-বৃত্তি অবলম্বন। বঙ্গদেশের ষ্টাটিষ্টিক্‌স্ দেখলে গা শিউরে উঠবে।

সাহিত্য শুধু একটা রস নিয়ে থাকবার কথা নয়। যে সময় আমাদের দেশ কর্ম্ম সম্বন্ধে মূঢ়তায় আচ্ছন্ন, নিতান্ত অভাব ও দৈন্যপীড়িত জাতির যা হোয়ে থাকে—সেই হিংসা দ্বেষ, আসন্নমৃত্যু কোনো জীবের সম্মুখীন গৃধ্র ও শকুনীর ন্যায়, পরস্পরকে আরো ধ্বংশের মুখে ঠেলে দিতে যাচ্ছে, বিলাতের নকল করতে গিয়ে পল্লীবাসীরা পর্য্যন্ত বিলাসের সামগ্রীর দিকে ঝুঁকেছে, অথচ কোনো নিকট-আত্মীয় অনশনে নগ্নদেহে পথ্যের অভাবে প্রাণত্যাগ করছে সে দিকে দৃষ্টিপাত নেই—এই সময় আমরা রসিক সেজে বিলাতী-প্রেমের পালাটা গেয়ে আসর জমাবার চেষ্টা করছি। শুনেছি, কোনো নবাব শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়ে একটা অর্দ্ধসমাপ্ত গানের অবশিষ্টাংশ গেয়ে নেবার একটু অবকাশ চেয়ে নিয়েছিলেন—আমরা বিদেশী ভাবে এমনই মসগুল হয়ে পড়েছি যে,ঘরের বিপদ্‌কে বিপদ্ বলেই মনে করছি না।

চতুর্থ সমস্যা,—নিপীড়িত জাতিদিগের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য স্থির করা। আমাদের প্রাচীন শুচিতা নেই, অথচ তার দর্পটি আছে। অনেক হিন্দুই ছদ্মবেশী,—জাতিঘটা মুখোসে দাঁড়িয়েছে। মুখোসটা ঋষিমুনিদের—কিন্তু ভিতরটা সম্পূর্ণ বিপরীত। এই মুখোস পোরে আমরা নিম্নশ্রেণীর লোকদের ভয় দেখাচ্ছি, ও নিজেরা যথেচ্ছাচার কোরে পরের সহিত বৈষম্যের রেখা জোর কোরে বাড়িয়ে দিচ্ছি। এই প্রকাণ্ড মিথ্যাটা তারা কি করে সইবে? সুতরাং সকল জাতির মধ্যেই একটা বিদ্রোহের শিখা জ্বোলে উঠছে। আমাদের জাতিগত এই বৈষম্য ক্রমশঃ জটিল হোয়ে উঠছে, ও পল্লীর পাড়ায় পাড়ায় বিদ্বেষের আনল সৃষ্টি করছে। কবি ও ঔপন্যাসিক আমাদের সমাজের এই সমস্যা হোতে নানারূপ প্লট সংগ্রহ কোরে কি ভাবে শান্তি ও মৈত্রী স্থাপিত হোতে পরে তা' দেখিয়ে দিতে পারেন।

এর সমস্যা,—আমাদের সন্তানেরা শ্রদ্ধাবিহীন হোয়ে পড়ছে। জাতীয়তাই হোক কিংবা পারিবারিক আদর্শ হোক,—শিশুকাল হোতে যদি কেউ আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে চায়, কোনো নিয়মের নিকট মাথা হেঁট না কোরে, নিজের অপরিপক্ব বুদ্ধিকেই প্রধান মনে কোরে কিম্বা কোনো দলে ভিড়ে, যে স্থানে অবনতি জানালে প্রকৃত জ্ঞানের উন্মেষ হয়, সেই স্থানে হঠকারিতার সঙ্গে উপস্থিত হয়—তা' হলে সমাজের ভিত ধ্বসে পড়বে। এই স্বেচ্ছাচারিতার যুগে বালকেরা নির্ম্মম এবং সর্ব্বপ্রকার ভক্তিশ্রদ্ধাবিবর্জ্জিত হয়ে পড়ছে। এই দুর্ব্বিনয়ের মধ্যে ভাবী ধ্বংসের ছায়া দেখতে পেয়ে শিউরে উঠতে হয়। সেদিন একজন উচ্চশিক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূষণস্বরূপ তরুণ অধ্যাপক আমাকে প্রকাশ্য ভাবে বললেন, "আমি ধর্ম্ম মানি না, ঈশ্বর মানি না!" নিশ্চয়ই কপট ধার্ম্মিকের থেকে সত্যবাদী চরিত্রবান্ নাস্তিককে আমরা উচ্চ আসন দিতে বাধ্য, কিন্তু আমাদের তরুণ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এত বড় স্পর্দ্ধা কি কোরে এল! এই দেশে না "তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরপি সহিষ্ণুনা" এ পর্য্যন্ত ঘরে ঘরে ধ্বনিত হয়েছে, এই দেশের বহু-স্থানের মাটী ভক্তিমান্ নরনারীর শ্রদ্ধানত কপালের স্পর্শলাভ কোরে তীর্থে পরিণত হোয়ে আছে—এ দেশে এ নাস্তিকতা কোথা থেকে এল? পৃথিবীর ইতিহাস পড়লে দেখা যায়, ধর্ম্ম ও ঈশ্বরপ্রেমই সর্ব্বপ্রধান শক্তি-রূপে প্রত্যেক জাতির জীবনে কাজ করেছে। যীশু যে শক্তি দিয়ে গেছেন—সেই শক্তি সমস্ত জগতে এখনও কাজ করছে। যুদ্ধবিগ্রহ হচ্ছে বোলে যে শক্তির উৎস যে শুকিয়ে গেছে, এরূপ যেন কেউ মনে না করেন। সেদিনও যীশুর দ্বিতীয় অবতার কাউণ্ট টলষ্টয় জীবন-ব্যাপী তপস্যা দ্বারা প্রকৃত খ্রীষ্টধর্ম্মের অস্তিত্বের প্রমাণ দিয়ে গেছেন। মধ্যযুগে র‍্যাফেল মাইকেল-এঞ্জেলো প্রভৃতি শত শত চিত্রকর—ম্যাডোনা, দান্তে, সিয়েনা-ক্যাথারিন্ আর এরেস্মাস প্রভৃতি শত শত সাধু সেই ধর্ম্মের উন্নত আদর্শ দ্বারা য়ুরোপকে সভ্যতার উচ্চ হোতে উচ্চতর স্তরে নিয়ে গেছেন; মার্টিন্ লুথার ধর্ম্মকে সুনির্ম্মল করতে চেষ্টা পেয়ে যে বিরাট আন্দোলন উপস্থিত কোরেছিলেন—শিক্ষিত য়ুরোপ এখনও সেই স্বাধীন চিন্তা হোতে প্রেরণা লাভ করছেন। আরব হোতে মহম্মদ ধর্ম্মবলে পৃথিবীর যুগ উল্টে দিয়েছেন, আর মহাবীর, বুদ্ধ, চৈতন্য এ দেশের অফুরন্ত ধর্ম্মভাবের নব নব প্রেরণায় জন্মলাভ কোরে পৃথিবীকে উদ্ধার কোরে গেছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র মন্দির, সর্ব্বত্র ভজনাগার, সর্ব্বত্র তীর্থ—এই সকল স্থান হোতে কবিতার গঙ্গাস্রোত, চিত্রের ও ভাস্কর্য্যের পারিজাত-কুসুম, নীতির বিশুদ্ধ ফুলমালা,—তপস্যার দুর্জ্জয় শক্তি, সান্ত্বনা ও আশার অভয়বাণী—মানবজাতির নিকট নিরবধি আসছে, তাই আমাদের এই ক্ষণস্থায়ী ঘর বাসযোগ্য হোয়েছে। হঠকারী আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠা কোরে বাল্যকাল হোতে সেই মহাশক্তিকে প্রতিরোধ করতে গেলে জীবনটা তাসের ঘরের মত একটু জোরে হাওয়া বইলেই ভেঙ্গে পড়বে। এই নাস্তিকতা ও অবিশ্বাসের সমস্যা আমাদের সমাজে এসেছে,—এই সমস্যায় পোড়ে অপর জাতির যাদের বহুবিধ সদ্গুণ আছে, তারা হয় ত বা সামলে নিতে পারবেন; কিন্তু আমাদের ভরা যে একেবারে ডুববে—তার কোনো সন্দেহ নাই। কবি ও ঔপন্যাসিক এই সমস্যা কি ভাবে পূরণ করতে চান—তা দেখতে চাই।

তারপর দেশের বারো মাসের তেরো পার্ব্বণ গেছে, দোল দুর্গোৎসব যায়-যায়—মন্দির ভেঙ্গে ধ্বসে পড়ছে, মহোৎসব নামে মাত্র পর্য্যবসিত, যে আনন্দধারায় উচ্চ-নীচ এক সময়ে ডুবে যেত—দেশের সে আনন্দ কোথায়? দুর্গোৎসবে দোলোৎসবে হরির লুটে যে অজস্র আনন্দ ও ভক্তি ছিল—তা আর-কোনোরূপে আমরা পাচ্ছি কি? মাঘোৎসবে মুষ্টিমেয় লোকের আনন্দ,- বায়স্কোপ, থিয়েটার বায়নাথা—তার শিক্ষা অনেক সময়ই অহিতকর —এখনকার উপযোগী কোরে কি আনন্দ সমাজকে

দিতে পারা যায়, তা কে ভাবছেন?—প্রত্যুত যে রস জাতীয় জীবনকে পোষণ করে, তা হোতে আমরা ক্রমশঃ বঞ্চিত হচ্ছি, যে রস সুরার স্থায় সমাজকে ধ্বংস করে, তাই বিদেশ হোতে আমদানী করা হচ্ছে।

এইরূপ শত শত প্রশ্নের মধ্যে আমরা কর্ম্মবিমূঢ় হোয়ে বোসে রয়েছি। বাঙ্গালী-জীবন পড়া মুখস্থ কোরে সেই পড়া আওড়াতে-আওড়াতেই অবসান হোয়ে যাচ্ছে! স্কুলে বই পড়া কি ছবি আঁকা, আবার বই দেখে বই লেখা ও ছবি দেখে ছবি আঁকা, আফিসে সাহেবের লেখা দেখে লেখা—সমস্ত বঙ্গদেশটা একটা বিরাট কেরানীখানায় পরিণত হোয়েছে! আমাদের লেখকদের মধ্যে যাঁদের কথা নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা করা গেল, তাঁদের মধ্যে অনেকেরই লেখার বেশ ক্ষমতা আছে, তাঁরা শিক্ষা-দীক্ষায় বড়, প্রতিভায় বড়, অথচ অনেকেই সম্মুখ না দেখে দূরটা দেখেন; এখন যেন মনে হয় কাছের জিনিষটা দেখার মত শক্ত কিছু নেই। কাছের বিপদটা দেখলে—তার প্রতিকারের চেষ্টা করতেই হবে—কতকটা উদ্ভাবনী শক্তির প্রয়োগ করতেই হবে—এই চেষ্টার দুরূহতা দেখেই হোক বা অন্য যে-কোনো কারণে হোক—তাঁরা নকল করাটাই সহজ মনে করেছেন,—পরনীতির যে একটা মোহ ও নূতনত্ব আছে, অনায়াসে তা' দিয়ে চমকিয়ে দিতে পারলেই সহজে খ্যাতিটা আয়ত্ত হোতে পারে, কারু কারু এরূপ প্রতিষ্ঠা-লিপ্সাও যেন আছে বোলেই বোধ হয়।

সম্প্রতি বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বাঙ্গলা ভাষায় এম-এ পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হোয়েছে। এই ব্যবস্থায় আমাদের যে মহোপকার হওয়ার সম্ভাবনা হোয়েছে, সে সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা দরকার।

এ পর্য্যন্ত আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় বাঙ্গলাসাহিত্য সম্বন্ধে খুব কমই খবর রাখতেন। বাঙ্গলা-সাহিত্যটা যদি হাজার বছরের পুরণো হোয়ে থাকে, তবে এর ৯৫০ বছরের বিবরণ সম্বন্ধে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের শতকরা ৯৯ জনই অনভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা দয়াপরবশ হোয়ে বাঙ্গলা-সাহিত্যের কিছু চর্চ্চা করতেন, তাঁরা কাছের জিনিষটা, যার অনেকটাই বিলাতী নকল, তা' এত বড় কোরে দেখতেন, যে, গোড়াকার খবরটার যে কিছু মূল্য আছে তা স্বীকার করতেই কুণ্ঠিত হোতেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে আবার রামমোহন রায় এমন কি বিদ্যাসাগর মহাশয়কেও বাঙ্গলা ভাষার প্রবর্ত্তক বোলে মনে করতেন। শিক্ষিত সম্প্রদায় ঠাকুর দেবতার প্রতি বীতস্পৃহ হলেন, কথকতা কীর্ত্তন ও প্রাচীন যাত্রা মেয়েদের জিনিষ মনে কোরে তা হোতে আলগা হোয়ে গেলেন। কৃত্তিবাস কাশীদাস কবিকঙ্কণকে মুদির দোকানের মেটে প্রদীপের পাশে স্থান নির্দ্দেশ কোরে নিশ্চিন্ত হোলেন; চৈতন্যদেবকে মুচি-মুদ্দ-ফরাসের ঠাকুর মনে কোরে তাঁকে আপনার জন মনে করতে কুণ্ঠিত হোলেন; কেবল সেক্‌স্‌পীয়র, মিল্টন, বাইরন; কেবল টেনিসন্, ব্রাউনিং, শেলী; কেবল বার্নার্ড'শ, মেয়েরলিঙ্ক, ইউজিন সু। এই পাঠই পাঠ,—বিলাতী থিয়েটারই আমোদের স্থান, দেশ কোথায় পোড়ে রইল। দেশের জিনিষ দেখে শুনে তার পর তা অগ্রাহ্য করলে কথা থাকে না। কিন্তু সে জিনিষ দেখলেন না, শুনলেন না, নাক সিঁটকে বিদায় কোরে দিলেন,—যেমন ভাবে কোনো কোনো শিক্ষিত হটকারী যুবক তার মা বাপকে অগ্রাহ্য করে, পিতৃপুরুষের পূজার স্থানকে ঘৃণা করে, তেমনই ভাবে প্রাচীন সাহিত্যকে বর্জ্জন করলেন। কিন্তু কালো চামড়াটা ত বদলান যায় না, আর পিতৃপুরুষ হোতে পাওয়া মনটার বৃত্তিও যে দেশীভাবের অনুকূল—বাইরে ঘুরে "বা-হা-বা" করতে করতে হয়রান হোয়ে শেষে শিশু যেমন তার মায়ের আঁচল খোঁজে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ আজ তেমনই কোরে মায়ের ডাক শুনেছে, তারা যেন ধাত্রীর কাছ থেকে মায়ের কোলে এসে পড়ছে, এমনই তাদের আনন্দ! দেখুন গিয়ে কি আগ্রহ সহকারে তারা কবিকঙ্কণচণ্ডী ও

জয়দেবের গীত গোবিন্দ পড়্‌ছে, কত টীকা টিপ্পনী কোরে তারা দেশের ইতিহাসের হারানো খেই সেই-সকল বইয়ের মধ্য থেকে দেখে চম্‌কে উঠ্‌ছে, বৈষ্ণব মহাজনদের পদ থেকে তারা বিলাতী কবিতার যা পায়নি সেরূপ আনন্দ পেয়ে, যা ছাই পাঁশ বোলে ফেলে দিয়েছিল, তার মধ্যে রতন মাণিক খুঁজে পেয়ে আহ্লাদিত হয়েছে। চৈতন্যচরিতামৃত পড়াতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-শিক্ষিত অধ্যাপক ঘর্ম্মাক্তকলেবর হোয়ে পড়্‌ছেন! যে-সকল ছাত্র শীলতার দুরূহ উত্তুঙ্গ শিখরে উঠ্‌তে অভ্যাস হয়নি, যা এতদিন সহজ হোতেও সহজ মনে কোরে অগ্রাহ্য করা হয়েছিল—সেই পথে এসে বিস্ময় ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। আর-কোন বিষয়েই শত শত নোট বুক ও টীকা টিপ্পনী বাজারে কিন্‌তে পাওয়া যায়। কিন্তু বাঙ্গলার টীকা টিপ্পনী অধ্যাপক ও ছাত্র উভয়ে মিলে মিশে নূতন কোরে কর্‌তে হচ্ছে। পরের ছেলে যেন ঘরে ফিরে এসেছে, এ হোটেলের রান্না নয়, এখানে নিজেদের রান্নাবান্না নিজেদের কর্‌তে হবে, তার মত মিষ্ট ও সুস্বাদু কি আছে।

প্রথম ভয় হোয়েছিল বাঙ্গলায় এম-এ পড়্‌তে দুজন একজন ছাত্রই জুটবে কি না সন্দেহ। কিন্তু এই প্রথম বৎসরেই ৩২ জন ছাত্র হোয়েছে। তা' ছাড়া পলিতকেশ, প্রবীণ গ্রাজুয়েট দলের মধ্যে অনেকে non-collegiate ছাত্র হোয়ে পরীক্ষা দেবেন বোলে কোমর বেঁধেছেন—তাঁদের কি উৎসাহ!

বাঙ্গলায় এম্‌-এ দিতে হোলে প্রাকৃত পালীর ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সঙ্গে আর ১২টি ভাষার মধ্যে কোনো একটি জান্‌তে হবে। সেই ভাষাগুলি হচ্ছে উড়িয়া, মৈথিলী, আসামী, হিন্দী, গুজরাটী, তেলুগু, তামিল, মরাঠী, মলয়ালম, কন্নাড, সিংহলী এবং উর্দ্দু। এই ভাষা-গুলির প্রত্যেকটির জন্য একটা বৃত্তির সংস্থান আছে; সেই লোভে প্রত্যেক ভাষারই অন্ততঃ একটি কোরে ছাত্র আমরা পেয়েছি। আর সুখের বিষয় বর্ত্তমান সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে এই দ্বাদশটি ভাষা শেখাবার জন্য দ্বাদশটি অধ্যাপকও পাওয়া গেছে। এ বছর যতগুলি ছাত্র পাওয়া গেছে, ভবিষ্যতে তার চাইতে ঢের বেশী ছাত্র পাওয়ার সম্ভাবনা। গড়পড়্‌তা একটা হিসাব ধর্‌লে আর পাঁচ বছরের মধ্যে খুব সম্ভব বিশ্ববিদ্যালয় হোতে আড়াই শত ছাত্র বার হবেন, যাঁরা সমষ্টিগত ভাবে ভারতবর্ষের সমস্ত ভাষা জান্‌বেন। এখন ভারত-ইতিহাস আবুল ফাজল প্রভৃতি কৃত রাজনৈতিক বিবরণ, বিদেশী ভ্রমণকারীদের অতি অল্প বিবৃতি এবং যুদ্ধজয়পরাজয় ও ভূমিদানসূচক কয়েকখানি তাম্রশাসন ও প্রস্তরলিপি হোতে সংগ্রহ হচ্ছে। কিন্তু দেশের, লোকসমাজের, দেশের ধর্ম্মের ইতিহাস অতি সামান্যই আমরা পেয়েছি। সেই ইতিহাস প্রাদেশিক ভাষাসমূহের মধ্যে আত্মগোপন কোরে আছে। এই আড়াই শত শিক্ষিত ব্যক্তির দ্বারা পাঁচটি বৎসর পরে ভারত-ইতিহাসের, ভারত-সাহিত্যের, ভারত-ভাষাতত্ত্বের নূতন যুগ আরম্ভ হবে। বিদেশী পণ্ডিতগণ তখন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সমস্ত তত্ত্বের জন্য আমাদের মুখাপেক্ষী হবেন, এখন যেমন আমরা তাঁদের মুখাপেক্ষী হোয়ে আছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষার এই নব-অভিযান একটা প্রকাণ্ড দিগ্বিজয়ের পূর্ব্বাভাস দিচ্ছে। এর মূল্য যে কতটা তা এখন নিরূপণ করা অসম্ভব। এ বিদেশী আপেল নয়, আমরা সত্যই নেংড়া ও ফজ্‌লী আমের চারা বুনেছি। আমাদের নূতন বাগানের যিনি মালী সেই আশুতোষের সর্ব্বতোমুখী শক্তির আশ্রয়ে এই নবীন তরুটি আমাদের কল্পতরুতে পরিণত হবে, এই আশা কোরে আমরা বোসে রয়েছি।

কিন্তু আপনারা শুনে দুঃখিত হবেন, বাইরের উৎসাহ অভাবে এই উদ্যম শুকিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আধুনিক সময়ে বঙ্গসাহিত্যের সেবা কোরেই আমরা যা কিছু কৃতিত্বলাভ করেছি। আজ রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-বিজয়ী হোয়ে আমাদের এই ভাষাকে জগতের চক্ষে উজ্জ্বল কোরে দেখিয়েছেন। কিন্তু দেশীয় লোকের উৎসাহ কই? বাঙ্গলার জন্য এক কপর্দ্দকও কেউ দিচ্ছেন না। আমরা দাঁড়াব কোথায়? বিজ্ঞানের আকাশ-

কুসুম এখনও অনাঘ্রাত—কিন্তু আশায় প্রলুব্ধ হোয়ে দাতাগণ লক্ষ লক্ষ টাকা সেই দিকে ঢালছেন। কিন্তু যা পাওয়া গেছে তার মূল্য আপনারা বুঝবেন না। একমাত্র কাশিমবাজারের মহারাজা এবং জমিদার গোপালদাস চৌধুরী সামান্য টাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এ দিকে হিন্দী ও মৈথিলী, যা এখনও মূল পরীক্ষার বিষয় হোয়ে দাঁড়ায়নি, তার জন্য সেইসকল দেশ হোতে প্রায়ই দশ হাজার, বিশ হাজার টাকার দান আসছে।—বাঙ্গলার জন্য কেউ দাঁড়াচ্ছেন না! যাঁরা ধনী তাঁরা কিছু করছেন না—আমাদের দীনা বঙ্গভাষা তাঁর ধনী সন্তানদের নিকট হাত পেতে আছেন আপনারা ৩০০০।৪০০০।৫০০০।১০০০০ যা' কিছু তুলে দিতে পারেন, তাতে আমরা কৃতার্থ হব। পড়াবার পুস্তকগুলি টীকাটিপ্পনী শুদ্ধ ছাপাবার খরচ জুটছে না; অধ্যাপকগণ যতটা সম্ভব স্বার্থত্যাগ করছেন, কিন্তু এইভাবে কত কাল চলবে?

আজ আমি আমার জননী বঙ্গভূমির পক্ষ হোতে আমাদের মায়ের কাছে শেখা ভাষার জন্য আপনাদের কাছে দাঁড়াচ্ছি, এতে আমার অপমান নেই, লজ্জা নেই, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গলায় এম্-এর ভার আপনারা গ্রহণ করুণ, তা না হোলে কে করবে? আমাদের যে ভাষা মা শিখিয়েছিলেন, যে ভাষা আমাদের মুখে যখন প্রথম ফুটত তখন আমাদের মা তা অমৃত জ্ঞান কোরে শুনতেন—তাঁর কান জুড়িয়ে যেত; সেই মায়ের দান, সেই মায়ের কানের অমৃতের মর্য্যাদা আপনারা করবেন—এইটি আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। একবার কৌতূহল-পরবশ হোয়ে আমাদের নবগঠিত বাঙ্গলা ক্লাসটি গিয়ে দেখুন,—আপনাদের আনন্দ হবে। ছেলেরা কি অপূর্ব্ব উৎসাহে পড়ছেন—তাঁরা অপরাপর শিক্ষা-প্রকোষ্ঠকে ধাত্রীগৃহ নাম দিয়েছেন—এবং বাঙ্গলার ক্লাস-ঘরটিকে মাতৃমন্দির বোলে জেনেছেন। এইখানে যে শিক্ষা হচ্ছে, তাতে কোরে আমাদের দেশের ইতিহাস নূতন কোরে লিখতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে আর-একটি শাখা আছে, তাঁরা ভারতের প্রাচীন ইতিহাস খুঁজে বার করছেন। দুঃখের বিষয় সেই ইতিহাসটা একেবারে মাটিচাপা পড়ে গেছে, অনেক খুঁড়ে পাথর ও মুদ্রা বার কোরে সেই ইতিহাসটাকে উদ্ধার করতে হবে। কোনো কোনো স্থানে, যথা সুন্দরবনে, সেই ইতিহাস জানবার জন্য বাঘ ও অপরাপর শ্বাপদের বিবর খুঁজতে হবে। কিন্তু সে অর্থ কোথায়?

সম্প্রতি সিংহল দেশের শিক্ষাকমিশনের সভ্য ফ্রেজার সাহেব কলিকাতায় এসেছিলেন। তিনি সেই দেশের কেনো কলেজের অধ্যক্ষ; তিনি সেই দেশের শিক্ষা সম্বন্ধে যে রীতির প্রবর্ত্তন কোরেছেন—আমার মতে তাই প্রকৃত রীতি। তিনি তাঁর ছাত্রদের ডেকে বলেছেন,—"বৎসরের কয়েক মাস তোমরা বাইরে থাকবে, নিজের চোখ মেলে নিজের দেশকে দেখবার জন্য।" একদলকে বললেন, "তোমরা তোমাদের গাঁয়ের আশেপাশে কতকগুলি স্থান নির্দেশ কোরে একটা গণ্ডী ঠিক কোরে নাও,—সেই গণ্ডীর ভিতরে যত-রকম রূপকথা, প্রবাদ-বচন, চলিত কথা আছে তা সংগ্রহ কোরে এনে সে-সম্বন্ধে পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হও,—যাদের লিখিত সন্দর্ভ আর-সবার চাইতে ভাল হবে, তারা গুণানুসারে পুরস্কার ও স্কলারসিপ পাবে।" আর একদলকে বললেন,—"তোমরা যেখানে পুরাণো মন্দির, স্তূপ এবং পুরাণো কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ আছে, তোমাদের গাঁয়ের আশপাশ থেকে তার একটা তালিকা তৈরী কোরে সেগুলি ভাল কোরে খুঁজে, ভগ্নকীর্ত্তির খোদিত লিপি' ভগ্ন দেবগণের বৃত্তান্ত এই সকল দেখে শুনে বার কোরে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাক।" এই ভাবে পুরাণো হাতে-লেখা পুঁথি, দেশের ঐতিহাসিক কথা—সমস্তের বিবরণই তন্ন তন্ন কোরে খুঁজবার জন্য অধ্যক্ষ মহাশয় ছাত্রদের নিয়োগ করেছেন। পল্লীতে পল্লীতে

বারমাসে যে তের পার্ব্বণ হোয়ে থাকে, তা' জান্‌বার জন্যও তিনি সেইরূপ ব্যবস্থা করেছেন। যারা এইভাবে ঐতিহাসিক তত্ত্ব কতকটা আয়ত্ত কোরে ফেলেছে,—তাদের তিনি ভারতবর্ষের নানা স্থানে পাঠিয়ে দিয়ে এ দেশের প্রসিদ্ধ কীর্ত্তিকলাপ দেখ্‌বার জন্য নিয়োগ কোরে থাকেন। তারা ঘুরে ঘুরে তাজমহল দেখ্‌ছে, পুরীর মন্দির দেখ্‌ছে, অজন্তা, কোণার্ক ও মাদুরা মন্দিরে দেখে বেড়াচ্ছে। তিনি বল্‌লেন,—"জাতীয় শিক্ষা, নিজের দেশের ইতিহাস এ যে না জানলে—তার আর কি শিক্ষা হলো?" তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, "বিশ্ব-বিদ্যালয় কি এই শিক্ষা-পদ্ধতির অনুমোদন করেছেন?" তিনি হেসে বল্‌লেন,—তাঁরা তাঁর কলেজটি প্রথমতঃ disaffiliate করার ভয় দেখিয়েছিলেন, ক্রমাগত তাঁকে সতর্ক কোরে দিয়েছেন। কিন্তু তিনি বিলাতের বাঙ্গাল অর্থাৎ স্কচ্‌ জাতীয়—তাঁর গোঁ তিনি কিছুতেই ছাড়েননি। অবশেষে তাঁর কলেজ যে-বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত তাঁরা হয়রান হোয়ে গেছেন, এমন কি, তাঁর প্রবর্ত্তিত শিক্ষা প্রণালী তাঁরা ধীরে ধীরে গ্রহণ কর্‌ছেন। এই হোয়ে থাকে। পুরাণো অলিগলির অন্ধকার-পথ ভেঙ্গে যাঁরা রাজপথ গড়্‌বেন, তাঁদের পায়ে লোক-বাধার কাঁটা বিঁধবেই—তাঁরা সে-সকল গ্রাহ্য কর্‌লে পৃথিবীটা ত চিরকালই পিছিয়ে পোড়ে থক্‌ত।

আমাদের দেশের শিক্ষা সম্পূর্ণ না কোরে বিদেশী শিক্ষাতরুর মূলে জলসেচন কর্‌লে তার যে ফল দাঁড়াবে—তা কুফল হবে নিশ্চয়। আমরা কি সাঁওতাল না ভীল যে, আমরা নূতন কোরে সভ্যতার পাঠ শুরু কোরে দেব?—একটা পেণ্টালুন পোরে ও সোল্যাহ্যাট মাথায় দিয়ে একেবারে চেহারা বদ্‌লিয়ে ফেল্‌বে? দশহাজার বছরের তপস্যার ফল আমরা; ঐই দশ হাজার বছরের স্মৃতি মুছে ফেল্‌লে আমাদের প্রবীণতার কি রইল? সভ্যতার ইতিহাসে ত'হলে যে আমরা বালক হোয়ে হামাগুড়ি দিতে আরম্ভ কর্‌ব! এখন আমরা দেশের ইতিহাস পরের মুখে শুন্‌ছি, দেশের সাহিত্য পরের চোখ দিয়ে দেখ্‌ছি।—রামায়ণের তত্ত্ব ওয়েবারের মুখে শুন্‌ছি, —মহাভারত সম্বন্ধে হপকিন্স কি লিখেছেন তাই জান্‌তে উদ্‌গ্রীব হোয়ে আছি। আমাদের সম্বন্ধে বাইরে কে কি বলেন, তা জান্‌বার অবশ্য আমাদের দর্‌কার আছে—কিন্তু আমাদের সর্ব্ব-প্রথম দর্‌কার আমাদের কি আছে, তা নিজেদের জানা। আমরা কয়জনে সমগ্র বাল্মীকির রামায়ণখানি কিংবা সংস্কৃত মহাভারতখানি পড়েছি? অথচ সংস্কৃতে এম্‌-এ পাশ কোরে ওয়েবার ও ম্যাক্সমুলার সম্বন্ধে প্রাজ্ঞ হোয়ে উঠেছি।

নিজের দেশের শিক্ষার বর্ণপরিচয় না হোতেই আমরা বিলাতে গিয়ে শিক্ষালাভের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। এই জন্যই দেশের যা' কিছু তার উপর অবজ্ঞার ভাবটি নিয়ে আমাদের মুখ বন্ধ। এই জন্য যাঁরা তথাকথিত শিক্ষা লাভ করেছেন তাঁরা নিজেদের আদর্শ একেবারে বিসর্জ্জন দিয়ে বোসেছেন; দশমীর দিন আমরা যেরূপ দুর্গাঠাকরুণকে বিসর্জ্জন দিয়ে থাকি—সেই ভাবে বিসর্জ্জন দিয়েছেন। আর যাঁরা নূতন শিক্ষায় ততটা অগ্রসর হন্‌নি—তাঁরা বাহিরের আলো ও হাওয়ার রন্ধ্র একবারে বন্ধ কোরে ঘরখানিকে অচলায়তন কোরে রেখেছেন।

এই দুর্দ্দিনে ভারত-লক্ষ্মীকে আমরা উদ্বোধন করছি। তাঁর করুণাবলে ও প্রসন্ন দৃষ্টিতে যেন আমরা দেশের প্রতি অনুরাগ ফিরে পাই। তাঁর পায়ের আলতার দাগ দেখে দেখে যেন আমরা ঘরের পথ চিনে চল্‌তে পারি। তাঁর শুভ ঘট যেন ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠা কর্‌তে পারি, তাঁর নৈবেদ্য ও চন্দনার্দ্র পুষ্প নিয়ে যেন আমরা সমস্ত জাতি সম্মিলিত হোতে পারি। দেশকে অন্তরের সহিত ঘৃণা কোরে যেন আমরা দেশহিতৈষীর ছদ্মবেশ পোরে সভাসমিতিতে গিয়ে চীৎকার কোরে করতালির চটা-পট শব্দে কানে তালা না লাগাই। যে সকল প্রাচীন আচার রীতি-নীতি এখনকার কালের উপযোগ্য নয় তা' ঝরা-ফুলের মত খসে পড়ুক; আর যা আমাদের সার জিনিষ,—তা যেন, কাঠুরে যেরূপ মাণিক পেয়ে ঢেলা বোলে ফেলে দিয়েছিল, সে ভাবে ফেলে না দিই। গোপাল উড়ে বড় খেদেই গেয়েছিলেন—"কাঠুরে এক মাণিক পেল, ঢেলা বোলে ফেলে দিল—অভিমানে কাঁদ্‌ছে মাণিক মহাজনে টের পেল না।" আমরা বিদেশ হোতে অনেক নেব, কিন্তু স্বদেশকে ছাড়্‌ব না, বরং নিজের দেশকে আগে পেয়ে পিতৃপুরুষগণের চিরন্তন সাধনার ধূলি মাথায় মেখে বাইরে হোতে কি আন্‌তে পারি সেই অভিযানে বার হব।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।
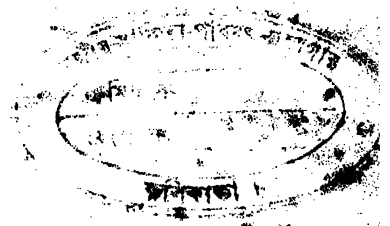
ভাটীয়াল গান।

(৯০) *

জাগলরে চৈতন্যের জাহাজ
সুরধনীর ঘাটে রে।
ভক্তি ষ্টেশন হইয়াছে
ঘাটের নিকটে রে॥

চৈতন্যের জাহাজখানা,
অহিংসা তাহার নিশানা,
যেতে পারে যার হয়েছে
উপাশনা ;
ওরে মধুমাখা প্রেমিক যারা,
ওই জাহাজে উঠে রে॥

টিকিট কাটে নিত্যানন্দ,
দূরবীনদার অদ্বৈতচন্দ্র,
জলমাপে গদাধর আর
রামানন্দ ;
ওই প্রেমের কলে জাহাজ চলে,
কামের ধুয়া উঠে রে॥

এই ঘাটে টিকেট করে,
যে গিয়াছে বিষয় ছেড়ে,
পুনঃ আর আসতে হয় না
এ সংসারে ;
ওরে এক টিকেটে যেতে পারে
কালিন্দী তটে রে॥

ভক্তিধন বিহীন যারা,
তাদের হয় না টিকিট করা,
দণ্ড হয় ভণ্ডামিতে
পইলে ধরা ;
ওরে হরিচরণ টিকেট হারা,
পড়েছে সঙ্কটে রে॥

(৯১)

ওই যে কালা বাজায় বাঁশী গো সখী,
ওই যে কালা বাজায় বাঁশী।
তোমরা যেয়ে বল তারে গো সখী,
আমি কেমন করে বনে আসি

আমার গৃহ কাজে মন থাকে না,
শাশুরী দেয় বড় গঞ্জনা গো ;
তবু সে যে বাঁশীর স্বরে
মন হ'রে গো সখী,
আমায় করে যে উদাসী॥

বাঁশী যতই বলে রাধা রাধা,
ননদী দেয় ততই বাধা গো ;—
আমি রাগের ভরে বসে ঘরে গো সখী
সদা নয়ন জলে ভাসি॥

গোপী বলে এত ভাবনা কেন,
প্রেমের রীতি এমি জেনে গো,
ওগো প্রেম পাথারে
যে সাতারে গো সখী,
মুছে যায় তার মুখের হাসি॥

(৯২)

কালার প্রেমের এত জ্বালা সই,
আগে ত জানিনা।
আগে জানলে কিগো

---

* বিগত চৈত্র সংখ্যার প্রকাশিত ভাটিয়াল গানের ক্রমিক সংখ্যা ৭৯ হইতে ৮৯ হইবে। মুদ্রাকরেরর দোষে উহা ১ হইতে ১২ লিখিত হইয়াছে। প্রঃ সঃ।

প্রাণ সঁপিতাম,
এখনে উপায় কি বল না ॥

আমিত অবলা নারী,
বক্ষে আমার দিয়ে ছুরি,
আমি মরি মরি বাঁচি বাঁচি,
এখনে করি কি তাই বল না ॥

মন নিয়াছে যে জন যারে,
কেমনে পাসরে তারে,
এখন দিবা নিশি নয়ন ঝুরে,
না দেখিলে তারে
জীবন বাঁচে না ॥

গোসাই কাশীচন্দ্র বলে,
প্রেম কি কৌশলে মিলে,
ওরে প্রেমের প্রেমিক না হইলে,
প্রেম ধনের মর্ম্ম জানে না ॥

(৯৩

ত্রিবেণী শুকায়ে যায়,
কারে মন স্নান করিতে যাই।
কোন্ ঘাটেতে স্নান করিলে রে মন,
জন্ম মরণ ভবে নাই ॥

আমি যদি স্নান করিতে,
ত্রিনয়ন রেখো নয়নেতে,
মাসান্তে হয় এক জোয়ার তাতে ;—
তিন ধারাতে তিন দিন বহেরে মন,
ঘাটে স্নান করিতে সময় চাই ॥

সে ঘাটেতে স্নান করিতে,
থেকো তুমি সাবধানেতে,
সাড়ে চব্বিশ রেখো মনে,
কোন্ ঘাটেতে স্নান করিবে মন,
রেখো তারে নিশান সই ॥

গোসাই গৌরপ্রিয়া বলে,
স্নান করলিনারে সময় কালে,
চূড়ামণি যোগটী গেল বিফলে ;
ভোর হয়েছিল, বৃথায় গেলরে বালক,
আর জনমে হয়কি না হয়,
বিশ্বাস নাই ॥

(৯৪)

গউর রূপে যে ভুইলাছে
প্রবোধ না মানে।
রূপ বিহনে ধৈরয ধইরে,
গৃহে রয় সে কেমনে ॥

গউররূপ কাল ভুজঙ্গে,
দংশন করে যার অঙ্গে,
তার প্রাণ জানে ;
ওগো বিষের জ্বালায়
হইয়ে জ্বালাতন,
বারিধারা নয়নে ॥

জ্ঞান চৈতন্য হইয়ে হারা,
সদায় দেয় রূপের পাহাড়া
নয়নের কোনে ;
তারা জীবন যৌবন ধর্ম্ম কর্ম্ম
অর্পণ করে চরণে ॥

অধীনের নাই সে রুচি,
কিসে গউর হয় প্রাপতি,
একান্তি বিনে ;

আমি মায়া জালায়
সেগে থাকি,
ফির্‌তেছি বনে বনে ॥

---

(৯৫)

পিরিতের যে এমনি রীতি
আমি আগে ত জানি না।
জানিলে কি প্রেম করিতাম,
হইল বিষম যাতনা ॥

মন প্রাণ দিয়াছি যারে,
কেমনে পাসরি তারে;
সদাই জাগে হৃদ্‌ মাঝারে
তারে ভুলিতে পারি না ॥

গোসাই উদয়চান্দে বলে,
ওই রীতি কি জানে সকলে,
নিতাইরে তোর কর্ম্মফলে,
হল না প্রেম সাধনা ॥

---

(৯৬)

ভাবের ঘরে ডুবলে
ভাবের মানুষ পায়।
এই মানুষকে নিত্য কররে মন,
ভজ ওই মানুষের রাঙ্গা পায় ॥

গোপীর ভাব অঙ্গে পর
সেই মানুষের সঙ্গ কর,
সঙ্গ পেয়ে মজে থাক
তার সেবায়;
ওরে মানুষ ভজন রসের করণ,
যেমন,
তবে রূপমঞ্জরীর দয়া হয় ॥

ভাবের মানুষ রূপের ঘরে,
বিরাজে বিরজার পারে,
সেই মানুষ অটল ঘরে;
অটল টলিয়া গেলেরে মন,
তবে সে কি রূপের দেখা পায় ॥

গোসাই গৌর প্রিয়ায় বলে,
ডুব্‌লি না ত্রিপিণীর জলে,
ভাবের মানুষ সেই ঘাটেতে রয়;
তোর কর্ম্মফলে জন্ম মরণ রে,
বালক,
ভজ্‌লি না মানুষের পায় ॥

---

(৯৭)

মন মানুষে মন নিলগো,
প্রাণ গেল তার পাছে।
আমি হইলাম হইলাম
কলঙ্কিনী গো,
আমায় নিয়ে চল তার কাছে ॥

সখিগো,
একদিন জলের ছলে গেলাম
সুরধনী কূলে,
ওখানে সুমান হারাইলাম
না পইনে পাছে;
সেই অবধি মন গো প্রাণ
কিছুতে না আর রুচে ॥

...গো,
... বলিতে অন্ধকার,
... বলিতে হইলাম ছাড়খাড়,
...' বলিতে প্রাণ রাধা
হইল মিছে ;
ওগো তিনের রাজ্যে টলমল,
আমার ভাগ্যে হইল মিছে ॥

...গো,
তিনের ঘরে ছয় ধ'রে,
শূন্য দিয়া যে পূরণ করে,
সেই জনা যে যেতে পারে,
ওই জনার কাছে ;
অধীন বালক দাসের
মনের আশা গো,
সময় কালে রাখ্‌বা কাছে ॥

(৯৮)

আমার মন সদা কান্দেরে,
পেতে গউর চান্দে—
আমার মন সদা কান্দে
গৌর কথা শুন্‌লে কানে,
পুলকে পুরিয়ে দেহ
প্রেমের তুফান বহে প্রাণে,
আমার মন পারেনা ছুটে যেতেরে,
পড়ি ছয় রিপুর ফান্দে ॥

ভেবে মরি কি যে করি,
খুজে পাইনা—আপনঘরে
ফাঁদ কাটিবার কাটারী ;
...ফেলিতে পাই না
সুযোগরে,
পাড়ি অষ্টপাশের দৃঢ় বান্ধে।
গউর বলে গা'-ঝাড়িলে,
গোপী বলে সকল বন্ধন
অনায়াসে যায় খুলে ;
তাই ভক্তি ভরে নাম সাধিয়েরে,
ডুবে থাক্ মন প্রেমানন্দে ॥

(৯৯)

বিরজার পরে মানুষ আছে।
নবীন বয়স, নবীন নারীরেমন,
তারা বিলাসে মত্ত আছে ॥

ত্রিভঙ্গের ভঙ্গিমারূপ,
দাড়াইয়াছে অপরূপ,
দিব্য নয়ন হইলে সে দেখ্‌তে পারে ;
ওরে সখী সঙ্গে প্রেমতরঙ্গেরে মন,
আছেরূপ মঞ্জুরী তার কাছে ॥

আঠার দণ্ড নিশাকালে,
তালা চাবি খুলিও কলে,
নয়ন দুটী—রেখে রূপের সাধনে ;
ওরে—রত্ন বেদীর উপরে রে মন,
তারা প্রেমরসে খেল্‌তে আছে ॥

আমার হইল কপাল মন্দ,
শব্দস্পর্শরূপ রস গন্ধ,
সেই সম্বন্ধ নাহি আমাতে ;
অ যার আশ্রয়ে আরূপে সিদ্ধিরে মন,
আছে সেই সম্বন্ধ তার কাছে ॥

(প্রথম খণ্ড সমাপ্ত)

১০ম বর্ষ | আষাঢ় ১৩২৭ | ৩য় সংখ্যা

বেদান্তের সার্ব্বভৌমিক আদর্শ।

ভারতীয় বেদান্তবাদ উদার সার্ব্বভৌমিক আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত। উপনিষদই মুখ্যতঃ বেদান্ত। এই উপনিষদই বেদের শিরোভাগ। বেদের সংহিতা ভাগে যে আদর্শ অঙ্কুরিত হইয়াছে উপনিষদে তাহাই অপূর্ব্ব বিকাশ লাভ করিয়াছে। একমাত্র উপনিষদেই আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য ও সমগ্রতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এই কারণেই আপাতদৃষ্টিতে বোধ হয় যে, উপনিষদে পরস্পর বিরোধী মতবাদ স্থান লাভ করিয়াছে। আর এই বিরোধের মীমাংসার জন্য উত্তরমীমাংসা—, যাহা সচরাচর বেদান্ত দর্শন নামে অভিহিত হয়,—তাহার উদ্ভব হইয়াছে। বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র মীমাংসা দর্শনের মূল গ্রন্থ। এই গ্রন্থ বিবিধ প্রকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তন্মধ্যে ভগবান শঙ্করাচার্য্য কৃত ব্যাখ্যাই ভারতবর্ষে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ইহার কারণ এই যে তিনিই উপনিষদের আপাতবিরোধী মতবাদের সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তাঁহারি ব্যাখ্যাতেই উপনিষদের সার্ব্বভৌমিক আদর্শ সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। অতএব আমরা তাঁহার মত অবলম্বন করিয়াই বেদান্তের সার্ব্বভৌমিকতা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

সকল দেশের সকল প্রকারের দার্শনিক ও ধর্ম্ম প্রবক্তারাই সর্ব্ববাদীসম্মতরূপে স্বীকার করেন যে, জগৎকারণ সান্ত বা সীমাবদ্ধ বস্তু নহেন; তিনি অনন্ত। শ্রুতিতেও তাহাই বলা হইয়াছে। 'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম।' কিন্তু শঙ্করমতাবলম্বী অদ্বৈতবাদী বলেন যে তাঁহাকে যদি অনন্ত বলিয়া স্বীকার করা হয় তবে তাঁহাকে অদ্বিতীয় বলিয়াও স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, দুইটী অনন্ত পদার্থ ধারণা করা যাইতে পারে না। অনন্ত পদার্থ অপেক্ষা বৃহত্তর কোন পদার্থত কল্পনায়ই আসিতে পারে না; উহার সমান কোন পদার্থও অঙ্গীকার করা যাইতে পারে না। 'ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে'। এবং সেই কারণেই একটী অসীম ও আরেকটী,

সসীম পদার্থের পৃথক্ অবস্থানও ধারণা করা অসম্ভব। অনন্ত বলিতেই সীমাহীন বুঝায়। অনন্ত পদার্থের বাহিরে এবং তাহা হইতে পৃথক ভাবে আরেকটী পদার্থের অস্তিত্ব কল্পনা করিলেই অনন্তকে সান্ত, সসীম বস্তুতে পরিণত করা হয়। সুতরাং ব্রহ্মকে দ্বিতীয় রহিত না বলিলে তাঁহার অনন্তত্ব খর্ব্ব হইয়া যায়। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে তিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ং'। এই শ্রুতি বচনের এরূপ অর্থ নয় যে, ঈশ্বর এক বই দুই নাই। এই বাক্যকে বহু দেবতাবাদের (polytheism) প্রতিবাদ স্বরূপ ব্যবহার করা সঙ্গত নহে; ইহাকে দ্বৈতবাদের (dualism) প্রতিবাদ রূপে ব্যবহার করা উচিত। ইহার দ্বারা একেশ্বরবাদ (monotheism) সমর্থিত হয় নাই; ইহা দ্বারা অদ্বৈতবাদ (monism) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে এক ব্রহ্মই আছেন, আর কিছুই নাই।

কিন্তু এ সম্বন্ধে আরও একটু সূক্ষ্ম কথা আছে। যাহা অনন্ত তাহার অংশ কল্পনা করাও সম্ভব নহে। অনন্ত পদার্থকে ভাগ করা যাইতে পারে না। যাহা ভাগ করা যায়, যাহার অংশ কল্পনা করা সম্ভব, তাহাকে আর অনন্ত বলা চলে না। সমুদ্র যদি প্রকৃতপক্ষেই অসীম হইত, তবে তাহা হইতে এক বিন্দু জল পৃথক করা সম্ভব হইত না; কারণ ঐ একবিন্দু জল সমুদ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সমুদ্রের অসীমত্ব নষ্ট করিত। সুতরাং যাহা অনন্ত তাহা যে কেবল অদ্বিতীয়, তাহাই নহে, তাহা নিরংশও বটে। আর যদি অনন্ত পদার্থের অংশই কল্পনা কর তবে উহার প্রত্যেক অংশকেই অনন্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। পূর্ণ হইতে যদি পূর্ণও গ্রহণ কর তবে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকিবে।

"পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।"

এই জন্য অদ্বৈতবাদী বলেন যে, ব্রহ্ম যে 'একমেবাদ্বিতীয়ং' তাহাত বটেই, পরন্তু তিনি সর্ব্বপ্রকার ভেদরহিত, তিনি অপাস্তসমস্তবিশেষ, তিনি নিরংশ, নির্ব্বিশেষ। তাঁহাতে সজাতীয়, বিজাতীয়, স্বগত, কোনপ্রকার ভেদই সম্ভবে না।

এ সম্বন্ধে আরও কথা এই যে, ব্রহ্ম যখন অনন্ত, তখন তাঁহার আদিও নাই, মধ্যও নাই, অন্তও নাই; 'তিনি অনাদিমধ্যান্তং'। তাঁহার ভূতও নাই, বর্ত্তমানও নাই, ভবিষ্যৎও নাই। তিনি 'অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ'।

তাঁহার যখন আদি অন্ত মধ্য নাই, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান নাই, তিনি যখন সর্ব্বত্র সর্ব্বদা এক অবস্থায়ই বিরাজমান তখন বলিতে হইবে যে, তাঁহার বিকারও নাই। তিনি নিত্য এবং নির্ব্বিকার। এক কথায় তিনি দেশ কাল ও নিমিত্তের (Time, space and causality) অতীত। অতএব তিনি নিরুপাধি ও নির্গুণ। তিনি সমস্ত বিশেষণ বর্জ্জিত, তিনি 'অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম', তিনি 'অবাঙ্‌মনসগোচর' মন তাঁহাকে ধারণা করিতে পারে না। বাক্য তাঁহাকে প্রকাশ করিতে সক্ষম হয় না। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"। মন সেখানে পঙ্গু; ভাষা সেখানে মূক। বিধিমুখে তাঁহাকে নির্দ্দেশ করা যায় না। নিষেধ মুখে তাঁহাকে কথঞ্চিৎরূপে লক্ষিত করা যায়। শ্রুতি এইজন্য তাঁহাকে 'নেতি নেতি' এই লক্ষণে লক্ষিত করিয়াছেন।

"স এষ নেতি নেতি আত্মা অগৃহ্যো নহি গৃহ্যতে।"

তবে যদি বিধিমুখে তাঁহাকে নির্দ্দেশ করিতে হয় তবে তাঁহার সম্বন্ধে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, তিনি এক অদ্বিতীয়, নির্ব্বিশেষ, নির্ব্বিকার, চৈতন্যসত্তা; তিনি 'সচ্চিদানন্দং'; তিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ং।' একমাত্র সেই অনন্ত চিৎসত্তাই আছেন, আর কিছুই নাই।

এখানেই মায়াবাদের বীজ নিহিত রহিয়াছে। এক ব্রহ্মই যদি থাকেন আর কিছুই যদি না থাকে তবে এই বিবিধবৈচিত্র্যময় জগৎ,—যাহা আমরা প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করিতেছি, যাহার দুরতিক্রমনীয় প্রভাব আমাদিগকে একেবারে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে—ইহা কি অলীক? ইহার কি প্রকৃত অস্তিত্ব নাই? উত্তরে, শঙ্কর মতাবলম্বী বৈদান্তিক বলেন, ব্রহ্ম সত্য হইলে প্রকৃতিকে আর সত্য বলিয়া অঙ্গীকার করা যাইতে পারে না। ব্রহ্ম চিৎ, প্রকৃতি অচিৎ। ব্রহ্ম জ্ঞানময়,

প্রকৃতি অজ্ঞান। ব্রহ্ম নির্ব্বিকার, প্রকৃতি বিকারশীল। ইহার মধ্যে কোন্‌টী সত্য? সাংখ্য বলেন উভয়ই সত্য। বৈদান্তিক বলেন যে, দুইটীই সত্য হইতে পারে না। কারণ তাহা হইলে চিন্ময় ব্রহ্ম পদার্থের অনন্তত্ব বা অদ্বিতীয়ত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে না। অতএব অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্ত এই যে এই প্রকৃতি মায়া, ইহার কোন প্রকৃত অস্তিত্ব নাই। ইহা সৎ নয়; একমাত্র ব্রহ্ম পদার্থই সৎ। এই অচিৎ জড় প্রকৃতি চিন্ময় ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তু, সুতরাং ইহা অবস্তু। "বস্তু সচ্চিদানন্দমদ্বয়ং ব্রহ্ম। অজ্ঞানাদিসকলজড়বস্তু সমূহঃ অবস্তু।"

কিন্তু প্রকৃতি যেন সৎ নয়, কিন্তু তাই বলিয়া কি ইহাকে একেবারে অসৎ বলিতে পারা যায়? শঙ্করমতাবলম্বী বৈদান্তিক বলেন প্রকৃতিকে একেবারে অসৎ বলাও সঙ্গত নয়। কারণ ইহার অস্তিত্ব ত আমরা ব্যবহার ক্ষেত্রে প্রতিনিয়তই অনুভব করি। সুতরাং ইহাকে শশবিষাণের মত একেবারে অলীক বলিতে পারি না। ইহা এই অর্থে অসৎ যে, তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে ইহার অস্তিত্ব থাকে না। স্বপ্ন নিশ্চয়ই অসৎ বা মিথ্যা, কারণ জাগরিত হইলে ইহার অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু স্বপ্ন মিথ্যা হইলেও স্বপ্নদর্শন মিথ্যা নহে। শশবিষাণও মিথ্যা, স্বপ্নও মিথ্যা; উভয়ই মস্তিষ্কের বিকার মাত্র। কিন্তু তথাপি এই দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে। শশবিষাণ কেহ কখনও দেখে নাই বা দেখিতে পারে না; স্বপ্ন কিন্তু নিদ্রিতাবস্থায় আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। সুতরাং স্বপ্নের অস্তিত্ব নিদ্রিতাবস্থায় সিদ্ধ, জাগ্রতাবস্থায় অসিদ্ধ। মায়াও সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানের অনুদয়ে সিদ্ধ, তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে অসিদ্ধ। অতএব মায়াকে একেবারে অসৎও বলা যায় না। তবেই হইল, মায়া সৎ ও নয়, অসৎও নয়, এবং খানিক সৎ ও খানিক অসৎ এরূপও নয়। ইহা অনুভব সিদ্ধ বলিয়া ইহা অভাবরূপও নয়; অতএব ইহা এক অনির্ব্বচনীয় কিছু। মায়া সম্বন্ধে ইহার অধিক আর কিছুই বলিবার যো নাই। "অজ্ঞানন্তু সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধি ভাবরূপং যৎকিঞ্চিৎ।"

কিন্তু স্বপ্নদৃষ্ট প্রপঞ্চ কি জগৎপ্রপঞ্চের সর্ব্বাংশে অনুরূপ? বৈদান্তিক বলেন, তাহাও নহে। কারণ স্বপ্নদৃষ্ট প্রপঞ্চের প্রতিদিনই বাধ হয়, কিন্তু ব্রহ্মাত্মদর্শনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জগৎপ্রপঞ্চের বাধ হয় না। স্বপ্ন ও জগৎ উভয়ই মিথ্যা হইলেও উহাদের মধ্যে এই প্রভেদ। এই কথা আরেক ভাবেও প্রকাশ করা যাইতে পারে। স্বপ্নের প্রাতিভাসিক সত্তা আছে, কিন্তু ইহার ব্যবহারিক সত্তা নাই; কারণ জাগ্রত অবস্থায় ইহার বাধ হয়। জগতের ব্যবহারিক সত্তা আছে, কিন্তু পারমার্থিক সত্তা নাই; কারণ তুরীয় অবস্থায় ইহার বাধ হয়। একমাত্র ব্রহ্মেরই পারমার্থিক সত্তা আছে; কারণ কোন কালেই কোন অবস্থায়ই তাঁহার বাধ হয় না। "একরূপেন হ্যবস্থিতো যোঽর্থঃ স পরমার্থঃ।" একমাত্র অনন্ত পদার্থই ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান,—সকল সময়েই, এবং সুষুপ্তি স্বপ্ন জাগ্রত তুরীয়,—সকল অবস্থায়ই নির্ব্বাধ হইতে পারে। অতএব একমাত্র ব্রহ্মই পরমার্থ, একমাত্র তিনিই সৎ। জগৎ প্রপঞ্চ ব্যবহারতঃ সৎ, কিন্তু তত্ত্বতঃ অসৎ।

তত্ত্ব দৃষ্টিতে জগৎ যখন অসৎ তখন অদ্বৈতবাদীর মতে জগৎসৃষ্টিও তত্ত্বদৃষ্টিতে অসৎ। কারণ, ব্রহ্ম নির্ব্বিকার। কোন অবস্থায়ই এবং কোন কালেই তাঁহার বিকার হইতে পারে না। এই জন্য অদ্বৈতবাদী বলেন যে, জগৎ সৃষ্টি ব্রহ্মের বিকার বা পরিণাম নহে; ইহা বিবর্ত্ত মাত্র। পরিণাম কাহাকে বলে? "পরিণামভাবো নাম বস্তুনো যথার্থতঃ স্বস্বরূপং পরিত্যজ্য স্বরূপান্তরাপত্তিঃ; যথা দুগ্ধমেব স্বস্বরূপং পরিত্যজ্য দধ্যাকারেণ পরিণমতে"। আর বিবর্ত্ত কি? "বিবর্ত্তভাবস্তু বস্তুনঃ স্বস্বরূপাপরিত্যাগেন স্বরূপান্তরেণ মিথ্যা প্রতীতিঃ; তথা রজ্জুস্বরূপাপরিত্যাগেন সর্পাকারেণ মিথ্যা প্রতীয়তে।"

দুগ্ধ যেমন দধিতে পরিণত হয় ব্রহ্ম সেরূপ জগদ্রূপে পরিণত হন না। রজ্জু যেমন সর্পরূপে

বিবর্ত্তিত হয়, ব্রহ্মও সেইরূপ জগদ্রূপে বিবর্ত্তিত হন। রজ্জুকে সর্পের মত দেখা গেলেও রজ্জুর যেমন প্রকৃতপক্ষে কোন পরিবর্ত্তন হয় না, সেইরূপ জগৎসৃষ্টি আমাদের অনুভবসিদ্ধ হইলেও ব্রহ্মের কোন পরিবর্ত্তন বা বিকার হয় না। অদ্বৈতবাদী বলেন এই বিবর্ত্তবাদ না মানিলে অনন্ত চিৎপদার্থের নির্ব্বিকারত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে না।

কিন্তু জগৎ যদি পরমার্থতঃ অসত্যই হইল তবে জীব কি? জীবও কি মিথ্যা? যে হেতুবাদে, যে যুক্তিমূলে প্রকৃতির অস্তিত্ব খণ্ডিত হয় সেই যুক্তি দ্বারাই কি জীবেরও অস্তিত্ব খণ্ডিত হয় না? বৈদান্তিক বলেন, না তাহা হয় না। কারণ জীব ও ব্রহ্ম পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মাক্রান্ত পদার্থ নহে। প্রকৃতি অচেতন, ব্রহ্ম চৈতন্যময়; সুতরাং এই উভয় এক হইতে পারে না। কাজেই একটীকে মিথ্যা বলিতে হইবে। কিন্তু জীব সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। কারণ জীব প্রকৃতির মত অচেতন নহে; জীব চৈতন্যময়। সুতরাং এক অনন্ত চৈতন্য পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে জীবকেও ব্রহ্মই বলিতে হইবে। 'জীব ব্রহ্মৈব না পরঃ'। জীব ব্রহ্মের অংশও নয়, কারণ অনন্ত পদার্থের অংশ কল্পনা করা সম্ভব নহে। তবে কি জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই? উত্তরে বৈদান্তিক বলেন যে, জীব সোপাধিক, ব্রহ্ম নিরুপাধিক। ঘটাকাশ ও মহাকাশে যে পার্থক্য, জীব ব্রহ্মেও সেই পার্থক্য। ঘট ভাঙ্গিলে যেমন তন্মধ্যস্থ আকাশ মহাকাশে লীন হইয়া যায়, ভ্রমের অপনোদন হইলে জীবও সেইরূপ ব্রহ্মে বিলীন হইয়া যায়। মায়ার গতিকে একদিকে যেমন বোধ হয় যে, জগৎ সত্য, সেইরূপ আরেক দিকে বোধ হয় যে, জীব ও ব্রহ্ম পৃথক্। এই জন্য বৈদান্তিকেরা বলেন যে, অজ্ঞানের দুইটী শক্তি আছে। একটীর নাম আবরণ শক্তি; আরেকটীর নাম বিক্ষেপ শক্তি। অজ্ঞানের আবরণ শক্তি আত্মার যথার্থ স্বরূপ ঢাকিয়া রাখে, সেই জন্য আমরা আত্মগত সর্ব্বব্যাপকত্বাদি অনুভব করিতে পারি না। ক্ষুদ্র একখণ্ড মেঘ কোন মতেই বহু যোজনায়তন আদিত্যমণ্ডলকে ঢাকিতে পারে না; কিন্তু তথাপি উহা আমাদের চক্ষু এবং সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী হইলে আমাদের বোধ হয় যেন ঐ ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড সূর্য্যকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। এই মেঘকর্ত্তৃক সূর্য্যমণ্ডল আবরণের মত অজ্ঞান আমাদের আত্মাকে আবৃত করিয়া রাখে। সেইজন্য আমাদের মনে হয় যে, আমরা ব্রহ্ম হইতে পৃথক্। অজ্ঞানের বিক্ষেপ শক্তির গতিকে জগৎভ্রম উৎপন্ন হয়; বস্তুতে অবস্তু, রজ্জুতে সর্প ভ্রম জন্মে, অর্থাৎ প্রকৃতি তত্ত্বতঃ অসৎ হইলেও সৎ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। "বিক্ষেপ শক্তি র্লিঙ্গাদি ব্রহ্মাণ্ডান্তং জগৎ সৃজেদিতি।" অতএব এই অজ্ঞানের নিরাস হইলে উভয় প্রকার ভ্রমই বিদূরিত হয়; একদিকে দেখা যায় যে, জগৎ মিথ্যা, উহার কোন ব্রহ্মাতিরিক্ত সত্তা নাই; অপর দিকে দেখা যায় যে, 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম।' এই অজ্ঞান নিরাসের উপায় কি? তত্ত্বজ্ঞান। বৈদান্তিক বলেন যে, যখন আমাদের তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইবে তখন দেখা যাইবে যে, এই প্রকৃতি নাই, সৃষ্টি নাই, ছায়ার মত ইহা বিলীন হইয়াছে; এক ব্রহ্মই আছেন এবং আমরাও সেই ব্রহ্ম।

> অনাদি মায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে।
> অজমনিদ্রমস্বপ্নমদ্বৈতং বুধ্যতে তদা॥

অতএব বৈদান্তিক বলেন যে, আমাদের এই ভ্রম নিরাস করিতে হইবে। যে হেতু এই জগৎ অসৎ মিথ্যা, অতএব ইহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। সংসার পরিত্যাগ করিয়া ভাবনা করিতে হইবে যে, আমিই সেই; 'সোঽহং।' যখন এই জ্ঞান যথার্থরূপে পরিস্ফুট হইবে, কেবল মৌখিক উক্তিতে পর্য্যবসিত না হইয়া জীবনে উপলব্ধি হইবে, তখনই মুক্তি। অতএব শঙ্করমতাবলম্বী বৈদান্তিকের সিদ্ধান্ত এই যে, জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি হইতে পারে না। জ্ঞানই মুক্তির একমাত্র উপায়।

কিন্তু শঙ্কর মতাবলম্বী অদ্বৈতবাদীগণ যদিও নির্গুণ ব্রহ্মকেই পরম তত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করেন তথাপি তাঁহারা সগুণ ব্রহ্মকে বা ঈশ্বরকে একেবারে প্রত্যাখ্যান করেন না। এবং সগুণ ব্রহ্মোপাসনাও একেবারে নিরর্থক মনে করেন না। যদি করিতেন, তবে তাঁহারা উপনিষদের সার্ব্বভৌমিক আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইতেন। পূর্ব্বেই বলা

হইয়াছে যে, তাঁহারা জগতের ব্যবহারিক সত্তা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করেন। সত্য বটে, তাঁহারা স্থানে স্থানে জগৎকে স্বপ্নের মত অলীক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তদ্দারা এই সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত হইবে না যে, তাঁহারা স্বপ্ন সৃষ্টির ও জগৎ সৃষ্টির পার্থক্য একেবারেই স্বীকার করেন না। জগৎ সৃষ্টি পরমার্থতঃ সত্য নয় বলিয়া তাহার সহিত স্বপ্ন সৃষ্টির তুলনা করা হইয়া থাকে। কারণ এক বিষয়ে স্বপ্নের সহিত জগৎ সৃষ্টির বেশ সাদৃশ্য রহিয়াছে; উভয়েরই বাধ হয়। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে যে আরেক বিষয়ে উহাদের বিশেষ পার্থক্য আছে। একটীর মাত্র প্রাতিভাসিক সত্তা, আরেকটীর ব্যবহারিক সত্তা। যেখানে কেবল উভয়ের সাদৃশ্য দেখানই উদ্দেশ্য, সেখানে উভয়ই একরূপ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; কিন্তু যেখানে পার্থক্য দেখান আবশ্যক হইয়াছে, সেখানে স্পষ্টতঃ সেই পার্থক্যের উল্লেখ করা হইয়াছে। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ব্যবহারিক সত্তার অনুরূপ আর কোন সত্তাই নাই। সুতরাং ব্যবহারিক সত্তার অনিত্যতা বুঝাইবার জন্য প্রাতিভাসিক সত্তার আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে এ উভয় সর্ব্বাংশেই একরূপ,—এরূপ বলা তাহাদের অভিপ্রেত নহে। 'বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ' এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে, জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন সৃষ্টির বাধ হয়, কিন্তু (তত্ত্বজ্ঞানের অবস্থা ভিন্ন) আর কোন অবস্থায়ই জগৎ সৃষ্টির বাধ হয় না। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, স্বপ্ন স্মৃতির ফল মাত্র, কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় বাহ্যজগতের যে জ্ঞান হয় তাহা সাক্ষাৎ উপলব্ধির ফল।

ব্রহ্ম যে অর্থে সৎ জগৎ সেই অর্থে সৎ নহে; অথচ উহা একেবারে মিথ্যাও নহে; কারণ একটা সদ্বস্তুর উপর উহা প্রতিষ্ঠিত। এইজন্য জগৎ কেবল মাত্র আমাদের কল্পনার বিষয় নহে; উহা আমাদের উপলব্ধির বিষয়। প্রাতিভাসিক সত্তাই হউক আর ব্যবহারিক সত্তাই হউক, যাহা কোন সত্য বস্তুকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত নহে, তাহা কখনও অনুভূতির বিষয় হইতে পারে না; তাহা শশবিষাণের মত মনঃকল্পনাতেই পর্য্যবসিত হয়। সৌরকর না থাকিলে মৃগতৃষ্ণিকা দেখা যাইত না। রজ্জু-সর্পের দৃষ্টান্তে রজ্জু না থাকিলে সর্প দর্শন সম্ভব হইত না। সর্পরূপ প্রাতিভাসিক সত্তা রজ্জুরূপ ব্যবহারিক সত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে বলিয়া সর্প আমাদের জ্ঞানগোচর হয়। সেইরূপ জগৎরূপ ব্যবহারিক সত্তা ব্রহ্মরূপ পারমার্থিক সত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জগৎ আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হইয়াছে। বৌদ্ধেরা ইহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে, জগৎ প্রপঞ্চ নিরালম্বন; ইহার পশ্চাতে কোন সদ্বস্তু বিরাজমান নাই; ইহার অন্তরালে শুধুই শূন্য। Subjective idealist দিগের মত তাঁহারাও বলেন যে এই বাহ্য জগৎ কেবলই মনঃকল্পনা মাত্র; মনের বাহিরে ইহার কোন অস্তিত্ব নাই। শঙ্করাচার্য্য এই উৎকট বিজ্ঞান-বাদের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি 'না ভাবোপলব্ধেঃ' এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন যে, উপলব্ধি হয় বলিয়া বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব মানিতে হইবে; যাহা উপলব্ধি হয় তাহা নাই বলিতে পারা যায় না। "ন খল্বভাবো বাহ্যস্য অর্থস্য অধ্যবসাতুং শক্যতে। কস্মাৎ? উপলব্ধেঃ। * * নচ উপলভ্যমানস্য এব অভাবঃ ভবিতুমর্হতি।" এই সমস্ত বৌদ্ধমত খণ্ডনে অপূর্ব্ব কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন বলিয়াই শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধবিজেতা বলিয়া সর্ব্বত্র খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। সুতরাং কোন স্থানে অনাবশ্যক বোধে তিনি যদি স্বপ্ন দৃষ্ট প্রপঞ্চের সহিত জগৎ প্রপঞ্চের পার্থক্য সূচিত না করিয়াও থাকেন তবু এরূপ কথা বলা সঙ্গত হইবে না যে, তিনি জগতের ব্যবহারিক সত্তা অস্বীকার করেন। এবং যাঁহারা জগতের ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করেন, তাঁহারা জগতের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর,—শ্রুতি যাঁহাকে সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, অন্তর্য্যামী প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন,—তাঁহাকে শশ-বিষাণের মত একেবারে অলীক বলিতে পারেন না। জগতের ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করেন বলিয়াই শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মকে জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ বলিয়াছেন। সত্য বটে যে মায়াবাদীরা বলেন যে, সগুণ ব্রহ্ম মায়ায় বিজৃম্ভিত; সমষ্টি অজ্ঞান উপহিত চৈতন্যই ঈশ্বর কিন্তু তাহার অর্থ

এই নয় যে, তিনি বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় মস্তিষ্কের বিকার মাত্র। কারণ, মায়া কি? মায়া বা অজ্ঞান জগৎ ভ্রম উৎপাদন করে। ইহার অর্থ এই যে মায়ার গতিকে যাহা অনন্ত তাহা সান্ত, যাহা অসীম তাহা সসীম, যাহা নির্ব্বিকার তাহা বিকারশীল, যাহা এক তাহা বহুরূপে প্রতীয়মান হয়। জীব যখন মায়া প্রপঞ্চের মধ্য দিয়া ব্রহ্মকে দেখিবার চেষ্টা করে, তখন তিনি জীবের নিকট সগুণ ও সোপাধিক বলিয়া প্রতীয়মান হন। ক্ষুদ্র গবাক্ষের মধ্য দিয়া যখন আমরা আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তখন সমগ্র আকাশ আমাদের নয়ন গোচর হয় না; কিন্তু তাই বলিয়া যে অংশ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় সেই অংশ মিথ্যা নহে। যতক্ষণ গবাক্ষ থাকিবে এবং আমরাও গবাক্ষের মধ্য দিয়া আকাশ দেখিতে চেষ্টা করিব ততক্ষণ আকাশ সীমাবদ্ধ থাকিবেই। গবাক্ষ ভাঙ্গিয়া ফেলিলে আকাশের কৃত্রিম সীমা চিহ্ন বিলুপ্ত হইবে। সেইরূপ যতক্ষণ জগৎ ভ্রম থাকিবে ততক্ষণ ব্রহ্ম সগুণ ও সোপাধিকই থাকিবেন। জগৎ ভ্রমের অপনোদনে জগৎও থাকিবে না, জগতের সৃষ্টিকর্ত্তাও থাকিবেন না, আমিও থাকিব না। শঙ্কর বলিয়াছেন "যদা তত্ত্বমসীত্যেবং জাতীয়কেন অভেদ নির্দ্দেশেনাভেদঃ প্রতিবোধিতো ভবতি, অপগতং ভবতি তদা জীবস্য সংসারিত্বং ব্রহ্মণশ্চ স্রষ্টৃত্বম।" কিন্তু তাহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সবই থাকিবে। আমি যতক্ষণ থাকিব আমার উপাস্যদেবতাও ততক্ষণ থাকিবেন। আপত্তি হইয়াছে যে এক ব্রহ্ম ব্যতীত আর সবই যদি মিথ্যা তবে বিধি নিষেধাত্মক শাস্ত্রও মিথ্যা এবং যে বেদকে অপৌরুষেয় বলিয়া মায়াবাদীরাও স্বীকার করেন, সেই বেদ এবং বেদোক্ত দেবদেবী এবং বেদবিহিত যাগযজ্ঞ প্রভৃতি সমস্তই মিথ্যা। উত্তরে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে,তাহা নহে। ব্রহ্মাত্মদর্শনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সমস্তই সত্য এবং সেই পর্য্যন্ত লৌকিক ও বৈদিক ক্রিয়া কলাপাদিও অনুষ্ঠেয়। অবশ্যই তিনি কর্ম্ম কাণ্ড অপেক্ষা জ্ঞান কাণ্ডের প্রাধান্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। গীতাতেও তাহা করা হইয়াছে। 'ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।' কিন্তু তজ্জন্য সকলেরই অনুষ্ঠান পূজাদি একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে এরূপ সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত নহে।

শঙ্করাচার্য্য ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার অস্তিত্বও মানেন। তবে তিনি বলেন যে এগুলি পদের নাম। যে কেহ তপস্যা বলে এই সমস্ত পদলাভ করিতে পারে। যিনিই সৈন্যচালনার ভার পান তিনিই যেমন সেনাপতি বলিয়া অভিহিত হন, সেইরূপ যিনি ইন্দ্রত্ব পদ লাভ করেন তিনিই ইন্দ্র বলিয়া পরিচিত হন। পুরাণেও দেখা যায় যে নহুষ প্রভৃতি ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছিলেন। 'ইন্দ্রোঽভূন্মহিষা সুরঃ"—চণ্ডী।

অবশ্যই শঙ্কর স্বীকার করেন না যে, সগুণ ব্রহ্মই একমাত্র বা পরমতত্ত্ব, এবং সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা ব্যতীত আর কোন উপাসনাই চলে না। তিনি নিশ্চিতই একথা বলেন যে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও সমাধিদ্বারা স্ব স্বরূপ চৈতন্যের সাক্ষাৎকার হয়, এবং সেইরূপ উপাসনাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা। কিন্তু শ্রেষ্ঠ কিসে? নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসকের আত্মার উৎক্রান্তি হয় না; সগুণ ব্রহ্মের উপাসকের তাহা হয়। উৎকৃষ্ট সগুণোপাসক ক্রম-মুক্তির অধিকারী হন,আর, নির্গুণোপাসক বিদেহমুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। উভয়েই চরম মুক্তি লাভ করেন, তবে একজন শীঘ্র ও আরেকজন বিলম্বে লাভ করেন, এই মাত্র বিশেষ। সগুণোপাসনা একেবারে নিরর্থক, এইরূপই যদি শঙ্করের অভিমত হইত, তবে তিনি উভয় প্রকার সাধনার ফলাফলের তারতম্য লইয়া এত বিচার করিতেন না। শঙ্কর যদিও নির্গুণোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করেন তথাপি তিনি একথাও স্বীকার করেন, ঐ পথ নিতান্ত ক্লেশকর ও অতি অল্পসংখ্যক উচ্চ অধিকারীর উপযোগী। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে,—

ক্লেশোঽধিকতর স্তেষামব্যক্তাসক্ত চেতসাং।

অব্যক্ত বা নিরুপাধি ব্রহ্মে যাহাদের চিত্ত আসক্ত তাহাদের সাধনা (সগুণোপাসকদিগের সাধনা অপেক্ষা) অধিকতর ক্লেশকর। এই শ্লোকের ভাষ্যে শঙ্কর এই উক্তির প্রতিবাদ করেন নাই। এই পথ যে ক্লেশকর তাহা তিনি অস্বীকার করেন না। তারপর শঙ্কর বলেন যে, ঐ অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া উনবিংশতি শ্লোক পর্য্যন্ত অক্ষরোপাসক অর্থাৎ

নির্গুণ ব্রহ্মোপাসকদিগের বর্ণনা করা হইয়াছে। সে বর্ণনা কিরূপ? অক্ষরোপাসকেরা সর্ব্বভূতের অদ্বেষ্টা, নিস্পৃহ, সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী হইবেন; তাঁহারা শীতোষ্ণ, সুখদুঃখ, মানাপমান, নিন্দা স্তুতি প্রভৃতির দ্বারা অভিভূত হইবেন না; তাঁহাদের হর্ষ দ্বেষ, শুভাশুভ, শোক বা আকাঙ্ক্ষা কিছুই থাকিবে না ইত্যাদি। বেদান্তসারেও উক্ত হইয়াছে যে নির্গুণোপাসকের শম দম উপরতি তিতিক্ষা সমাধান ও শ্রদ্ধা সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক; তন্মধ্যে তিতিক্ষার অর্থ শীতোষ্ণ সুখ দুঃখ মানাপমান প্রভৃতি দ্বন্দ্ব (যুগল) সহ্য করা। এরূপ ব্যক্তি কয়জন মিলে? কিন্তু অনেকে নিজেদের অধিকার বা যোগ্যতার বিষয় একেবারেই বিবেচনা করেন না। তাঁহারা মনে করেন যে নির্গুণ উপাসনা যখন শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে তখন তাহা সকলের পক্ষেই উপযোগী ও তাহাই এক মাত্র পথ। এই সংস্কারের বশে তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার সগুণোপাসনার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন, অথবা সগুণোপাসকদিগকে কৃপার চক্ষে অবলোকন করিয়া থাকেন। ইঁহারা জগতের ব্যবহারিক সত্তাও অস্বীকার করেন। এই জাতীয় লোকেরা যে বেদান্তের সার্ব্বভৌমিক আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া নিতান্ত সাম্প্রদায়িক ও সংকীর্ণ মতের প্রচার করেন তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই। কিন্তু ইহা শঙ্কর প্রচারিত মায়াবাদের অপব্যবহার মাত্র; এজন্য মায়াবাদের দোষ দেওয়া চলে না।

মায়াবাদের বিরুদ্ধে এক গুরুতর অভিযোগ আনয়ন করা হইয়া থাকে। 'মায়াবাদ; অসচ্ছাস্ত্র ইহা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত।' কিন্তু সে কোন্ মায়াবাদ? যে মায়াবাদ বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়া জগতের ব্যবহারিক সত্তার প্রতিষ্ঠা করিয়াছে সেই মায়াবাদকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলা ভাষার অপব্যবহার বই আর কিছুই নহে। ফলতঃ বৌদ্ধবিরোধী শঙ্করের মায়াবাদের প্রতি এই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধাপবাদ কোনমতেই প্রযোজ্য নহে। এই অপবাদ কেবল সেই সমস্ত সংকীর্ণ লাক্ত বৈদান্তিকদিগের মায়াবাদের প্রতিই প্রযোজ্য হইতে পারে, যাঁহারা জগতের ব্যবহারিক সত্তা অস্বীকার করেন এবং যাঁহারা সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা একান্ত নিরর্থক বলিয়া মনে করেন। পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে শঙ্করের সেরূপ অভিপ্রায় নহে। তাঁহার মতবাদে শাস্ত্রোক্ত সর্ব্বপ্রকার যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়া কলাপেরও স্থান আছে। "প্রাক্‌ব্রহ্মাত্মতাপ্রতিবোধাদুপপন্নঃ সর্ব্বো লৌকিকো বৈদিকশ্চ ব্যবহারঃ।" তিনি কিছুই একান্ত ভাবে প্রত্যাখ্যান করেন নাই। আর যিনি অদ্বৈতবাদী হইয়াও জগতের ব্যবহারিক সত্তা অস্বীকার করেন না তিনি অনুষ্ঠান পূজাদি একেবারে প্রত্যাখ্যান করিতেও পারেন না। তিনি কোন্‌টী উৎকৃষ্ট, কোন্‌টী নিকৃষ্ট তাহা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু কোনটীই সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষা করেন নাই। এখানেই শঙ্কর প্রচারিত মতবাদের উদারতা। উহাতে অধিকারীভেদে সকলেরই যথাযোগ্য স্থান রহিয়াছে।

বর্ত্তমান কালের উৎকট সাম্যবাদের দিনে এই অধিকারভেদবাদ কেহ আর মানিতে রাজি নহে। সকল মানুষেরই যখন সমান অধিকার তখন একের পক্ষে যাহা বিধি তাহা অপরের পক্ষে অবিধি হইবে কেন? অন্যের যাহাতে অধিকার আছে, আমার তাহাতে থাকিবে না কেন? আমি অন্যাপেক্ষা কিসে কম? কিসে খাট? A man is a man for a' that. এই সমস্ত যুক্তিদ্বারা অনেকে ভারতীয় অধিকারভেদ বাদ নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু রাজনৈতিক অধিকার ও আধ্যাত্মিক অধিকার এক বস্তু নহে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সকলের সমান অধিকার থাকিলে কাজ চলে; বরং ভাল চলে। কিন্তু আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তাহা চলে না। মানবের ধর্ম্ম ও সাধনা মানব প্রকৃতির মত বৈচিত্র্যময় হইবেই হইবে। ইউরোপীয়দিগের মনেও এই সত্য ক্রমে ক্রমে উদ্‌ভাসিত হইতেছে। ইদানীং আমেরিকার সুবিখ্যাত দার্শনিক উইলিয়ম জেম্‌স্ তাঁহার *Varieties of Religious Experience* নামক গ্রন্থে এই মতের প্রচার করিয়াছেন।

A psychological investigation proves great differences with respect to inner nature

among men; so that we must assume that they need different spiritual sustenance, and must differ from one another in religion.—Harold Hoffding on William James in *"Modern Philosophers" p. 215.*

উইলিয়াম জেম্‌স্ বলেন যে মানুষে মানুষে ধর্ম্মের পার্থক্য থাকিবেই কারণ প্রত্যেকের প্রকৃতিই বিভিন্ন। এই বৈচিত্র্যকে মানিয়া লইতে হইবে। এরূপ কোন ধর্ম্ম প্রচারিত হইতে পারে না যাহা সর্ব্ববাদীসম্মতরূপে সকলেই গ্রহণ করিতে পারে। মুখে ২ গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু কার্য্যতঃ গ্রহণ করিতে কখনই পারিবে না। অধ্যাপক সেইস (Sayce) বলিয়াছেন, The Christianity of a Negro is quite different from the Christianity of an Englishman. মনস্তত্ত্বের আলোচনা করিয়া উইলিয়াম জেম্‌স যে স্থানে পৌঁছিয়াছেন, ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করিয়া অধ্যাপক সেইস ও ঠিক সেই স্থানে গিয়া পৌঁছিয়াছেন। Uncle Tom যে অর্থে খ্রীষ্টান প্রিন্স বিসমার্ক সেই অর্থে খ্রীষ্টান হইতে পারেন না। অতএব জগতে এক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। তবে এরূপ ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে যাহাতে সকল প্রকার সাধন পদ্ধতিরই স্থান আছে, যাহা এই বৈচিত্র্যময় জগতে সকল বিভিন্ন চরিত্রের লোকেরই আধ্যাত্মিক তৃপ্তি বিধান করিতে সমর্থ হয়। এইরূপ ধর্ম্মই সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। একমাত্র বেদান্ত শাস্ত্রই এই সার্ব্বভৌমিকতার দাবী করিতে পারে। ইহার সহিত কোন ধর্ম্মেরই বিরোধ হইতে পারে না। গীতাতে উক্ত হইয়াছে যে—

> যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।
> মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥

এতদপেক্ষা উদার আদর্শ পৃথিবীতে আর প্রচারিত হয় নাই। গীতা বেদান্তের প্রস্থানত্রয়ের অন্যতম প্রস্থান। উপনিষদই মুখ্যতঃ বেদান্ত হইলেও বেদান্তের তিনটী প্রস্থান কীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রথম শ্রুতি প্রস্থান অর্থাৎ উপনিষদ; দ্বিতীয় ন্যায় প্রস্থান অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্র এবং তৃতীয় স্মৃতি প্রস্থান অর্থাৎ ভগবদ্‌গীতা। এই গীতা সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে।

> সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপাল নন্দনঃ।
> পার্থোবৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥

গীতা উপনিষদেরই সারভাগ। অনেক স্থলে গীতাতে উপনিষদের মূল শ্লোকগুলিই উদ্ধৃত হইয়াছে দেখা যায়। বেদান্ত শাস্ত্রে গীতার এতই প্রাধান্য যে শঙ্করাচার্য্য কেবলমাত্র উপনিষদ ও ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই তিনি গীতারও ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। গীতা যখন উপনিষদেরই সারভাগ তখন যে গীতা উপনিষদের আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এইজন্য গীতায় জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি যোগ প্রভৃতি বিবিধ সাধন পদ্ধতির সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। এবং উপনিষদের ন্যায় গীতাতেও সগুণ নির্গুণ উভয় তত্ত্বেরই প্রচার দৃষ্ট হয়।

আমরা এ পর্য্যন্ত প্রধানতঃ যুক্তির দিক দিয়াই শঙ্কর প্রচারিত বেদান্ত মতের আলোচনা করিয়াছি। যে আশ্চর্য্য ও অকাট্য যুক্তিপরম্পরাদ্বারা তিনি অদ্বৈতমতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, জগতের দার্শনিক সাহিত্যে তাহা অতুলনীয়। আমরা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু শঙ্কর আস্তিক দার্শনিক। তিনি শ্রুতি বিশ্বাসী। যুক্তিকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন না; কিন্তু যুক্তিই তাহার একমাত্র বা প্রধান অবলম্বন নহে। তাঁহার প্রধান অবলম্বন শ্রুতি। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, শ্রুতি বচনে আপাতবিরোধ দৃষ্ট হয়। শ্রুতি একদিকে ব্রহ্মকে 'নেতি নেতি' লক্ষণে নির্দ্দেশ করিয়াছেন; আবার অপরদিকে তাঁহাকেই সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, অন্তর্য্যামী প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। একবার বলিয়াছেন যে, তিনি নির্গুণ, বাক্য মনের অগোচর; আবার বলিয়াছেন যে, তিনি সগুণ, জগতের ধাতা ও পাতা। একবার তাঁহাকে বলিয়াছেন, 'স', আবার তাঁহাকেই বলিয়াছেন, 'তৎ'। কিন্তু ভারতীয় সমস্ত আস্তিক দার্শনিকদিগের মতেই শ্রুতি অভ্রান্ত। তবে তাহাতে এই সগুণ নির্গুন ঘটিত বিরোধ

কেন? বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে বিকল্প কল্পনা করা সম্ভব; কিন্তু যাহা পরমতত্ত্ব তৎসম্বন্ধে এইরূপ বিকল্প কল্পনা করা কিরূপে সম্ভব? পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে,এই বিরোধের মীমাংসার জন্যই বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র রচিত হইয়াছিল। আর এই সংক্ষিপ্ত ও দুর্ব্বোধ ব্রহ্মসূত্রে অবলম্বন করিয়াই অদ্বৈতবাদী শঙ্কর, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ ও দ্বৈতবাদী মাধব প্রভৃতি সকলেই শ্রুতির আপাতবিরোধের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অনেকে বলেন যে, শঙ্কর অনেক স্থলেই ব্রহ্মসূত্রের কষ্টকল্পিত বা বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া স্বীয় মত সংস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। ডাঃ থিব (Dr. Thibaut) স্বকৃত শঙ্কর ভাষ্যের ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকায় প্রথমতঃ এই মতই প্রকাশ করতঃ ব্রহ্মসূত্রের অপব্যাখ্যাকারী বলিয়া তাঁহাকে খুব গালাগালি দিয়াছেন; কিন্তু অবশেষে বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মসূত্রকারের প্রকৃত মত কি, তিনি এই সগুণ নির্গুন ঘটিত সমস্যার কিরূপ মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারণ করার উপায় নাই। আমাদের মতে ওরূপ বিচারের বিশেষ আবশ্যকতা নাই। কারণ এই যে, সংক্ষিপ্ত ও দুর্বোধ ব্রহ্মসূত্রের অর্থ নির্দ্ধারণ সম্পর্কে মতভেদ থাকিলেও উহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই। কি অদ্বৈতবাদী, কি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, কি দ্বৈতবাদী সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, শ্রুতির বিরোধের মীমাংসাই ব্রহ্মসূত্রের এক মাত্র উদ্দেশ্য এবং এই জন্যই উহার নাম মীমাংসাদর্শন। সুতরাং দেখিতে হইবে যে কাহার ব্যাখ্যা দ্বারা ব্রহ্মসূত্রের সেই সর্ব্ববাদীসম্মত উদ্দেশ্য বিশিষ্টরূপে সিদ্ধ হইয়াছে; কাহার ব্যাখ্যা দ্বারা শ্রুতিবিরোধ সন্তোষজনকরূপে মীমাংসিত হইয়াছে। অতএব শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন কি না, এই বিচার অপেক্ষা, তিনি উপনিষদের বিবিধ আপাতবিরোধী বচনের সমন্বয় সাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন কি না, এই বিচারই অধিকতর প্রয়োজনীয়। এই ভাবে বিচার করিলে শঙ্করের কৃতিত্ব অস্বীকার করিবার উপায় থাকে না। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীগণ বলেন যে, শ্রুতিতে যে ব্রহ্মকে নির্গুণ বলা হইয়াছে তাহার অর্থ এই যে তিনি সর্ব্বপ্রকার হেয়গুণবর্জ্জিত; অপরা, তিনি যখন কারণাবস্থায় থাকেন তখন তিনি নির্গুণ, যখন কার্য্যাবস্থায় থাকেন তখন তিনি সগুণ। এই মীমাংসা সন্তোষজনক বলিয়া গ্রহণ করিবার উপায় নাই। ব্রহ্ম যদি হেয়গুণবৰ্জ্জিত হন, তবে হেয়গুণ আসে কোথা হইতে? তাঁহাতে যদি গুণেরই আরোপ করিতে হয় তবে কল্যাণগুণ ও হেয়গুণ উভয়েরই আরোপ করিতে হইবে। ব্রহ্ম কখন (কারণাবস্থায়) নির্গুণ, কখন (কার্য্যাবস্থায়) সগুণ এই মতও বিচারসহ নহে। কারণ তাঁহার সম্বন্ধে 'এখন'ও 'তখন' এরূপ কোন কথাই প্রযোজ্য হইতে পারে না। তিনি কালের অতীত। তাঁহার ভূতও নাই, ভবিষ্যৎও নাই; অগ্রও নাই, পশ্চাৎও নাই; পূর্ব্বও নাই, পরও নাই। তিনি 'অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ'; তিনি 'অপূর্ব্বমনং পরমনন্তরবাহ্যম্'। সুতরাং তিনি কখন নির্গুণ, কখন সগুণ এইরূপ বলিলে সকল শ্রুতি বচনের সুমীমাংসা হয় না। যুক্তিক্ষেত্রেও এরূপ মতের সমর্থন করা যায় না। বাস্তবিক অদ্বৈতবাদী ভিন্ন অপর সকলেই ব্রহ্মের কালভেদ, অবস্থা ভেদ কল্পনা করিয়া শ্রুতিবচনের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া থাকেন। 'নৌকা অচল', 'নৌকা সচল', এই দুই বাক্যের বিরোধ মীমাংসা করিতে হইলে যেমন বলিতে হয় যে, নৌকা কখন অচল, কখন সচল; 'ব্রহ্ম নির্গুণ', 'ব্রহ্ম সগুণ,' এই দুই বাক্যের সামঞ্জস্য করিতে যাইয়া বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীগণও ঠিক সেইরূপ বলিয়া থাকেন যে, ব্রহ্ম কখন নির্গুণ, কখন সগুণ। কিন্তু পার্থিব পদার্থ দেশকাল নিমিত্তের অধীন; ব্রহ্ম দেশকাল নিমিত্তের অতীত। সুতরাং ব্রহ্মের কালভেদ, অবস্থাভেদ কল্পনা করা অসম্ভব। শ্রুতি বলিয়াছেন যে তিনি নিষ্কল, কূটস্থ; সুতরাং তাহাতে কোন সময়েই কোন প্রকার বিকার বা পরিবর্ত্তন সম্ভবে না। এ সম্বন্ধে শঙ্করের মীমাংসা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের। তিনি বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম পরমার্থতঃ নির্গুণ, ব্যবহারতঃ সগুণ। এই ব্যবহারিক ও পারমার্থিক ভেদনির্দ্দেশই শঙ্কর দর্শনের অপূর্ব্ব বিশেষত্ব। ইহাই তাঁহার অতুল কীর্ত্তি। ইহাই তাঁহার নাম অমর করিয়া

রাখিবে। ডাঃ পল ডয়সেন (Paul Deussen) এই মীমাংসার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন এবং ইহা জগতের অন্যান্য ধর্ম্ম মীমাংসকদিগেরও অনুকরণযোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

Taking the Upanishads, as Shankara does, for revealed truth with absolute authority, it was not an easy task to build out of their materials a consistent philosophical system; for, the Upanishads are in Theology, Cosmology and Psychology full of the hardest contradictions. [আমরা বলিব apparent contradictions] So in many passages the nature of Brahman is painted out in various and luxuriant colours, and again we read, that the nature of Brahman is quite unattainable to human words, to human understanding;—so we meet sometimes longer reports explaining how the world has been created by Brahman, and again we are told that there is no world besides Brahman, and all variety of things is mere error and illusion; ....Shankara in these difficulties, created by the nature of his materials, in face of so many contradictory doctrines, which he was not allowed to decline and yet could not admit altogether,—has found a wonderful way out, which deserves the attention, perhaps the imitation of the Christian dogmatists in their embarrassments. He constructs out of the materials of the Upanishads two systems; one esoteric, philosophical (called by him *nirguna vidya* sometimes *paramarthik avastha*) containing the metaphysical truth for the few ones, rare in all times and countries, who are able to understand it; and another exoteric, Theological (*saguna vidya*, *vyavahariki avastha*) for the general public, who want images, not abstract truth, worship, not meditation.

এই পারমার্থিক ও ব্যবহারিক ভেদ স্বীকার দ্বারাই শ্রুতিবাক্যের আপাত বিরোধের সন্তোষজনক মীমাংসা হয়। শঙ্কর বিরোধী ডাঃ থিবও এই কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের অপব্যাখ্যা করিয়াছেন বলিয়া তিনি শঙ্করের প্রতি দোষারোপ করিলেও উপনিষদের মীমাংসায় রামানুজ অপেক্ষা শঙ্কর অধিকতর কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, একথা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। ডাঃ থিবর শঙ্কর ভাষ্যের অনুবাদের ভূমিকাটী বড়ই কৌতূহলজনক। ইহার প্রথম ভাগে তিনি যে সমস্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন আবার শেষ ভাগে নিজেই তাহার প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

It has been said before that the task of reducing the teaching of the whole of the Upanishads to a system consistent and free from contradictions is an intrinsically impossible one. But the task once being given, we are quite ready to admit that Sankara's system is most probably the best which can be devised. While unable to allow that the Upanishads recognise a lower and higher knowledge of Brahman, in fact the distinction of a lower and higher Brahman, (ভূমিকার পরবর্ত্তী অংশে তিনি এই মতের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। সেই অংশও আমরা পরে উদ্ধার করিতেছি) we yet acknowledge that the adoption of that dis-

tinction furnishes the interpreter with an instrument of extraordinary power for reducing to an orderly whole the heterogeneous material presented by the old theosophic treatises. This becomes very manifest as soon as we compare Sankara's system with that of Ramanuja. The latter recognises only one Brahman which is, as we should say, a personal God, and he therefore lays stress on all those passages of the Upanishads which ascribe to Brahman the attributes of a personal God, such as omniscience and omnipotence. Those passages, on the other hand, whose decided tendency it is to represent Brahman as transcending all qualities, as one undifferenced mass of impersonal intelligence, Ramanuja is unable to accept frankly and fairly and has to misinterpret them more or less to make them fall in with his system. The same remark holds good with regard to those texts which represent the individual soul as finally identifying itself with Brahman; Ramanuja cannot allow a complete identification but merely an assimilation carried as far as possible. Sankara, on the other hand, by skilfully ringing the changes on a higher and lower doctrine, somehow manages to find room for whatever the Upanishads have to say. Where the text speaks of Brahman as transcending all atitrbutes, the highest doctrine is set forth. Where Brahman is called the Allknowing ruler of the world, the author means to propound the lower knowledge of the Lord only.........Sankara's method thus..........................is not only more pliable, more capable of amalgamating heterogeneous material than other systems, but its fundamental doctrines are manifestly in greater harmony with the essential teaching of the Upanishads than those of other Vedantic systems.

বলা যাইতে পারে যে, শঙ্কর সগুণ অপেক্ষা নির্গুণেরই অধিকতর প্রাধান্য দিয়াছেন। কিন্তু উপনিষদেও তাহাই করা হইয়াছে। উপরি উদ্ধৃত বাক্যে ডাঃ থিব বলিয়াছেন যে, উপনিষদে সগুণ নির্গুণ ভেদ স্বীকৃত হয় নাই। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই এই মত প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিয়াছেন যে, শঙ্কর যে সগুণ অপেক্ষা নির্গুণের প্রধান্য কীর্ত্তন করিয়াছেন তাহাও উপনিষদ্-সম্মত,—

Above we were unable to allow that the distinction made by Sankara between Brahman and Iswara is known to the Upanishads; but we must now admit that if, for the purpose of determining the nature of the highest being, a choice is to be made between those texts which represent Brahman as *nirguna* and those which ascribe to it personal attributes, Sankara is right in giving preference to texts of the former kind.........The older Upanishads, at any rate, lay very little stress upon personal attributes of their highest being, and hence Sankara is right in so far as he assigns to his hypostatised personal Iswara a lower place than to his absolute Brahman.

ডাঃ থিব সম্পর্কে এখানে বলা আবশ্যক যে, তিনি শ্রুতির প্রতি সম্যক্ শ্রদ্ধাশীল নহেন। তিনি সংকীর্ণচেতা খ্রীষ্টান। তিনি কিছুতেই উপনিষদ্ অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। সুতরাং উপনিষদে যে কোন সামঞ্জস্য-পূর্ণ মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে তাহা তিনি স্বীকার করেন না। কিন্তু তিনিও এইটুকু স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, যদি উপনিষদ্ মানিতেই হয় তবে শঙ্কর ব্যাখ্যারই আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত; কারণ তৎসাহায্যেই উপনিষদের বিরোধের সুন্দররূপে মীমাংসা করা যায়। থিবর মত সংকীর্ণচেতা ইউরোপীয়েরা বুঝিতে পারেন না যে, উপনিষদে অতি উদার সার্ব্বভৌমিক সত্য প্রচারিত হইয়াছে। উহা সর্ব্বপ্রকার আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার অপূর্ব্ব ভাণ্ডার। এই জন্যই শ্রুতির এত গৌরব। ভারতবর্ষে ঈশ্বর না মানিলে কেহ নাস্তিক বলিয়া অভিহিত হইত না; কিন্তু শ্রুতি না মানিলে নাস্তিকতার অপবাদ হইতে কেহই পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিত না। ডাঃ থিব পুনঃ পুনঃই বলিয়াছেন যে উপনিষদ নানা অসম্বদ্ধ তথ্যে পূর্ণ (full of heterogeneous material) কিন্তু উপনিষদ্ প্রচারিত সত্যের উদারতা ও সমগ্রতাই যে ঐরূপ প্রতীতির কারণ তাহা তিনি ধারণা করিতে পারেন নাই। যাহা সংকীর্ণ তাহা সর্ব্বদাই স্ববিরোধদোষ-বর্জ্জিত (consistent) বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আর যাহা উদার তাহা অনেক স্থলেই স্ববিরোধদোষদুষ্ট (inconsistent) বলিয়া প্রতিভাত হয়। উপনিষদে সংকীর্ণতার লেশ মাত্র নাই। 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'। উদারতার ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর নিদর্শন কোথায়? দুঃখের বিষয় সকলে ইহার প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিতে পারে না। ডাঃ থিবও তাহাদের মধ্যে একজন।

ডাঃ থিব এক জায়গায় বলিয়াছেন যে, জ্ঞানপিপাসা মিটাইবার জন্য আধুনিক তত্ত্ব জিজ্ঞাসুগণের ভারতীয় দার্শনিক শঙ্কর আলোচনায় ব্যাপৃত হওয়ার সম্ভাবনা অল্প। উপনিষদ্ ডাঃ থিবর জ্ঞান পিপাসা মিটাইতে অসমর্থ হইতে পারে, কিন্তু তাঁহা অপেক্ষা অনেক উচ্চদরের চিন্তাশীল দার্শনিক সোপেনহাওয়ার (Schopenhauer) যে এই উপনিষদ্ সাগরে অবগাহন করিয়া স্বীয় জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করিয়াছিলেন, ভবজ্বালায় শান্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন তাহা কি তিনি জানেন না? তিনি কি জানেন না যে, সোপেনহাওয়ার বলিয়াছেন,—

In the whole world there is no study so beneficial and so elevating as that of the Upanishads......It has been the solace of my life,—it will be the solace of my death?

তিনি কি জানেন না যে ম্যাক্সমূলার (Maxmuller) বলিয়াছেন,—

The Upanishads are the......sources of ......the Vedanta philosophy, a system in which human speculation seems to me to have reached its very acme?

ডাঃ থিব নিজের সম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা তাহা বলিতে পারেন, কিন্তু অপরের সম্বন্ধে মত প্রকাশ করা কি তাঁহার সঙ্গত হইয়াছে?

আমরা ডাঃ থিবর মতামত বিস্তৃত ভাবে উল্লেখ করিয়াছি এই জন্য যে, তিনি শঙ্কর বিরোধী হইয়াও, এবং উপনিষদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হইয়াও শঙ্কর প্রচারিত মীমাংসা প্রণালীর প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বিরুদ্ধবাদীর প্রশংসাই অধিকতর মূল্যবান।

মানুষ নিজের ছাঁচেই চিরকাল দেবতা গড়িয়াছে। সে নিজে অশক্ত; তাই সে কল্পনা করে যে, ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান। নিজে অজ্ঞানী, তাই সে মনে করে যে, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ। নিজের মধ্যে সে যাহা কিছু ভাল দেখে তাহাই ঈশ্বরে আরোপ করিয়া তৃপ্তি লাভ করে। আর নিজের মধ্যে সে যাহা কিছু হেয় বলিয়া অনুভব করে ঈশ্বরে তাহা নাই মনে করিয়া চরিতার্থ হয়। বাস্তবিক মানুষের উচ্চতম আদর্শেই ঈশ্বর কল্পিত হইয়াছেন। হার্ব্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer) বলিয়াছেন যে, শূকরেরও যদি ঈশ্বর ধারণা করিবার সামর্থ্য

থাকিত তবে সে মনে করিত যে, ঈশ্বর একটী প্রকাণ্ড শূকর! ইহারই নাম anthropomorphic conception of God. কি সাকারবাদী কি নিরাকারবাদী সকলের ধারণাই এইরূপ anthropomorphic. একমাত্র উপনিষদই এই anthropomorphism এর উর্দ্ধে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। একমাত্র উপনিষদ ব্যতীত আর কোন্ শাস্ত্রে এমন কথা আছে,—

ওঁ পূর্ণমিদং পূর্ণমদঃ পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥ ?

কোন্‌শাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে, তিনি 'অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘম্', তিনি 'অপূর্ব্বমনপরমনন্তরবাহ্যং;' তিনি 'অন্যত্রধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ, অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ;' তিনি 'ন সৎ ন চাসৎ শিব এব কেবলঃ' ? কোন্ শাস্ত্রে তাঁহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, 'নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা', 'যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমচক্ষুঃ শ্রোত্রং তদপানিপাদম্' ? এই উপনিষদ্ ভিন্ন আর কোথায় তাঁহার এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়,—

নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং
ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্
অদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যং
অব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং
প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং
চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ ॥ ?

একথা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে যে উপনিষদে ব্রহ্মের যে ধারণা করা হইয়াছে এ পর্য্যন্ত তাহা অতিক্রান্ত হয় নাই। যে যুক্তিবাদ ইউরোপীয় ধর্ম্মজগতে তুমুল বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছে তাহা একমাত্র উপনিষদের নিকটই মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হয়। ঈশ্বর নাই, যুক্তিবাদ ইহার অধিক আর কি বলিতে পারে? উত্তরে আস্তিক্যবাদীরা (Theists) বলেন যে, তিনি আছেন। উপনিষদ ইহাদের বহু উর্দ্ধে উঠিয়া ঘোষণা করেন যে, তিনি 'ন সৎ ন চাসৎ শিব এব কেবলঃ'।

শঙ্করদর্শনে কিন্তু যুক্তির প্রাধান্য কম নহে। তবে তাঁহার যুক্তি পাশ্চাত্য দেশের উচ্ছৃঙ্খল যুক্তিবাদের অনুরূপ নহে। তিনি শ্রুতির অবিরোধী যুক্তিরই পক্ষপাতী। তথাপি এই যুক্তির অত্যধিক প্রাধান্য দিয়াছেন বলিয়া তিনি তার্কিক বলিয়া নিন্দিত হইয়াছেন। শঙ্কর মতাবলম্বীদের মতে বিচার তত্ত্বজ্ঞান লাভের এক প্রধান সহায়। কাজেই তাঁহারা যুক্তিকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারেন না। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য পুনঃ পুনঃই বলিয়াছেন যে, যুক্তি দ্বারা ব্রহ্মকে ধারণা করা সম্ভব নহে। 'ব্রহ্ম সৎও নহেন অসৎও নহেন', ইহার ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া শঙ্কর বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম অতীন্দ্রিয় পদার্থ; ইহা ঘটাদি ইন্দ্রিয়বেদ্য বস্তুর ন্যায় 'আছে' বা 'নাই এই দুই প্রকার বুদ্ধির মধ্যে কোন একটী বুদ্ধির বিষয় হইতে পারেন না। অতএব তিনি আছেন, এ কথাও বলা যায় না এবং তিনি নাই, এ কথাও বলা যায় না। এরূপ বলিলে ইন্দ্রিয়াতীত ব্রহ্ম বস্তুকে ইন্দ্রিয়গম্য পদার্থের সহিত এক পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া ফেলা হয়। কিন্তু তিনি যদি সৎও না হন, অসৎও না হন তবে তিনি কি? তিনি যে কি, তাহা মানুষের ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। 'অস্তি' এবং 'নাস্তি', 'আছে' এবং 'নাই' ইহার মধ্যবর্ত্তী বা ইহার অতিরিক্ত কোন অবস্থা মানুষের ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। মানুষের বুদ্ধি, মানুষের মনও এরূপ কোন অবস্থা ধারণা করিতে পারে না। এই জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন, 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।' ইহা কেবল অর্থবাদ নহে। 'সমুদ্র অসীম,' এই বাক্য যেমন সমুদ্রের অর্থবাদ মাত্র—প্রকৃতপক্ষে সমুদ্র অসীম নহে,—সেইরূপ ব্রহ্ম 'বাক্য মনের অগোচর,' এই উক্তি ব্রহ্মের কেবল প্রশংসামূলক স্তুতিবাদ নহে। প্রকৃত পক্ষেই তিনি 'অবাঙ্‌মনসগোচর'; প্রকৃত পক্ষেই মানুষের ভাষা ও মানুষের বুদ্ধি তাঁহাকে প্রাপ্ত না হইয়া নিবর্ত্তিত হয়। ব্রহ্ম কিরূপ, ইহা যখন জিজ্ঞাসা করা হইল তখন উপনিষদের ঋষি তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তিনি তদ্দ্বারা বুঝাইতে চাহিলেন যে, তাঁহার সম্বন্ধে ভাষায় কিছুই ব্যক্ত করা

যায় না। তবে কি তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই বলিব না? বলিতে হয় বল যে, তিনি কেবল শিব। 'শিব এব কেবলঃ'। অথবা বল যে, তিনি 'শান্ত', তিনি 'সুন্দর', তিনি 'অদ্বৈত'। এইরূপ যাহা হয় একটা কিছু শব্দ প্রয়োগ করিতে পার। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, তোমার ভাষার ভাণ্ডার শূন্য করিলেও, অভিধান নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেও তাঁহাকে বর্ণনা করিতে পারিবে না। যাঁহাকে বর্ণনা করা যায় না, যাঁহাকে ধারণা করা অসম্ভব, যাঁহা অতীন্দ্রিয়, যাঁহা দেশ কাল নিমিত্তের অতীত তাঁহা যুক্তির বিষয় হইতে পারেন না। কারণ যুক্তি দেশ কাল নিমিত্ত ছাড়িয়া এক পদও অগ্রসর হইতে পারে না। এই জন্য যে শঙ্করাচার্য্যকে লোকে তার্কিক বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকে সেই শঙ্করাচার্য্য স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম 'শব্দৈকপ্রমাণগম্য', ; শ্রুতিই তাঁহার এক মাত্র প্রমাণ। কারণ ঋষিরা সমাধিযোগে তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সম্যগ্‌দর্শনের ফল উপনিষদে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আর শ্রুতিতে এই অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা, এই অপরোক্ষ অনুভূতি লিপিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই ভারতবর্ষে শ্রুতির এত গৌরব। এই গৌরবের কারণ এতক্ষণে আমরা বোধ হয় কিছু ২ বুঝিতে পারিয়াছি। মানুষের অনুভূতি যে কত উর্দ্ধে উঠিতে পারে, উহা যে বুদ্ধির ভূমিকেও অতিক্রম করিয়া তদপেক্ষা উচ্চতর গ্রামে আরোহণ করিতে সমর্থ হয় একমাত্র উপনিষদের আলোচনায়ই তাহা পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হয়। উপনিষদ প্রচারিত সত্য যদি 'আপ্ত' না হয় তবে আপ্ত বাক্য আর কি?

কোন দার্শনিক মতবাদ যদি এই আপ্ত বাক্যের প্রতি সম্যক্ শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করে, অথবা যদি ইহাকে পাশ কাটাইয়া যাইতে চেষ্টা করে তবে সেই মতবাদ কখনই সম্যক্ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে না। ভারতীয় আস্তিক দার্শনিক মাত্রেই শ্রুতি মানিয়াছেন সন্দেহ নাই; কিন্তু অনেকেই পাশ কাটাইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। শঙ্কর তাহা করেন নাই। একমাত্র তিনিই শ্রুতির প্রতি সম্যক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ," 'ন সৎ ন চাসৎ শিব এব কেবলঃ' প্রভৃতি নির্গুণত্ব প্রতিপাদক বচনগুলি একমাত্র তিনিই নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন এবং তৎকৃত অপূর্ব্ব ব্যাখ্যার সাহায্যেই আমরা সে গুলির প্রকৃত মর্ম্ম কথঞ্চিৎরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হই। তিনি নির্গুণকে একটুও খাট করিবার চেষ্টা করেন নাই; অথচ তিনি এরূপ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন যাহাতে উপনিষদোক্ত সগুণ ব্রহ্মও প্রত্যাখ্যান করিতে হয় না। যাঁহারা ব্যবহারিক ও পারমার্থিক ভেদ মানেন না তাহারা বাধ্য হইয়া, হয় দ্বৈতাত্মক, না হয় অদ্বৈতাত্মক বচনগুলি প্রত্যাখ্যান করিয়া থাকেন। তাক্ত বৈদান্তিকেরা—যাঁহারা জগতের ব্যবহারিক সত্তা অস্বীকার করেন—তাঁহারা ব্রহ্মের সগুণত্ব প্রতিবাদক বচনগুলি, এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ও দ্বৈতবাদীগণ নির্গুণত্ব প্রতিবাদক বচনগুলির পরিহার বা কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কিন্তু শঙ্করের পক্ষে কিছুই পরিহার করার আবশ্যকতা নাই। ব্যবহারিক ও পারমার্থিক ভেদ স্বীকার করিয়া তিনি অর্থবিকৃতি না করিয়াও সকল বচনের প্রতিই যথাযোগ্য সমাদর প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই জন্যই বলিয়াছিলাম যে, তাঁহার ব্যাখ্যাতেই উপনিষদ বা বেদান্তের সার্ব্বভৌমিক আদর্শ সম্পূর্ণরূপে পরিরক্ষিত হইয়াছে। ফলতঃ এতদপেক্ষা উদার সমন্বয়বাদ আর এ পর্য্যন্ত জগতে উদ্ভাবিত হয় নাই। ইহাতে ব্রহ্ম সম্বন্ধে সকল প্রকার ধারণারই স্থান আছে, সকল প্রকার উপাসনা প্রণালীরই ব্যবস্থা আছে। বর্ত্তমান কালের উৎকট যুক্তিবাদীগণের জগৎ কারণ সম্পর্কিত কোন ধারণাই শঙ্কর ব্যাখ্যা সমুদ্ভাসিত উপনিষদোক্ত ব্রহ্মবাদের উর্দ্ধে উঠিতে পারে না। ভারতীয় ঋষিগণ অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা যোগে যে ব্রহ্মের সন্ধান পাইয়াছিলেন তাঁহার সহিত ভক্ত, যোগী ও কর্ম্মীর আরাধ্য দেবতার অপূর্ব্ব উপায়ে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া শঙ্করাচার্য্য জগতে এক বিশ্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এবং এই

সুপ্রশস্ত বেদান্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াই তিনি হিন্দু ধর্ম্মকে প্রখর যুক্তিবাদী বৌদ্ধদিগের তীব্র আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আর, এই বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞানবলদৃপ্ত rationalism (যুক্তিবাদ) যে আজ ইউরোপের সমস্ত ধর্ম্ম-বিশ্বাসের চূর্ণীকৃত ধ্বংসাবশেষের উপর দিয়া ভারতের অভিমুখে প্রবল অভিযান করিয়াছে,—যাহার প্রচণ্ড অভিঘাতে ভারতীয় ধর্ম্ম ও সমাজের ভিত্তি পর্য্যন্ত প্রকম্পিত হইয়া উঠিয়াছে,—সেই দুরন্ত অভিযানের প্রতিরোধ করিতে হইলেও শঙ্কর প্রচারিত বেদান্তবাদেরই পুনরায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। কোন অনুদার সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক মতবাদের দ্বারা তাহা প্রতিরুদ্ধ হইবার নহে। যে মতবাদ মানবের আবিষ্কৃত সমস্ত সাধনপদ্ধতির মহা মিলন ভূমি, যে মতবাদ যুক্তি বা বিচারকে একেবারে প্রত্যাখ্যান না করিয়াও অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার মহিমা ঘোষণা করে, যাহা মানব প্রকৃতির অনন্ত বৈচিত্র্যকে অস্বাভাবিক উপায়ে মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা না করিয়া এই বৈচিত্র্যের মধ্যেই অধিকার ভেদে এক উদার ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করে, যাহা সমস্ত বিরোধের মধ্যে শান্তি, সমস্ত অসামঞ্জস্যের মধ্যে সমন্বয়ের অনুসন্ধান করে, তাহা এই পাশ্চাত্য সঙ্কীর্ণ যুক্তিবাদের উপর কেবল যে আত্মপ্রাধান্য সংস্থাপন করিতেই সমর্থ হইবে তাহা নহে, তাহা ঐ যুক্তিবাদকেও স্বীয় উদার গণ্ডীর মধ্যে আনয়ন করতঃ উহার একাংশে যুক্তিবাদের যথাযোগ্য স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিবে।

(ঢাকা সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত)

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহ।

মতিঝিল।

ঝলকিছে বারিরাশি স্বচ্ছ নিরমল
—গলিত রজত যেন—অরুণ কিরণে।
সরসীর নীলবুকে রক্ত শতদল
উল্লাসে বিকশি' উঠে ভ্রমর চুম্বনে!
তীরতরু কুঞ্জ মাঝে দেখা যায় দূরে
উন্নত ইমাম বাড়া শুভ্র, সুশোভন;
আম্র মুকুলের গন্ধে, বসন্তের সুরে
পরিপ্লুত ফাল্গুনের উদার গগন।
ভাবুকের মুগ্ধচক্ষে ভাসে মতিঝিল
—আঁকা যেন চিত্রপটে কবির কল্পনা
অতীতের স্মৃতিঘেরা স্নিগ্ধ অনাবিল
শিল্পীর পরাণ ঢালা সৌন্দর্য্য রচনা!
কালের কঠোর হস্ত করেনি লুণ্ঠন
আজো তার নৈসর্গিক সম্পদ ভাণ্ডার;
নাই শুধু নর্ত্তকীর নূপুর শিঞ্জন
প্রমোদ-তরণী-বক্ষে, সঙ্গীত ঝঙ্কার;
ফুরায়েছে আজ শুধু বিলাসের দাবী—
সিরাজীর স্রোত, আর নবাব, নবাবী।

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী।

ছোটো লেখা।

[দৃষ্টি ও চিন্তা]

(১)

'লেখা'—জিনিষটার প্রাণ হ'লো যে লেখে তার ভেতর; এক-এক দিন সেই 'প্রাণের'ই সন্ধান পাওয়া যায় না,—সে-দিন কারুই লেখা হয় না।

আবার এক-এক দিন 'প্রাণটা' এত 'সাড়া' দিতে থাকে,—কখনো খেলায়, কখনো হাসিতে, কখনো বা

কান্নায়,—যে তাকে সে-দিন আর কিছুতেই 'বিদেয়' করা যায় না।

সে-দিন যিনি 'লেখেন' তাঁকে লিখ্‌তে হয়; যিনি 'লেখেন না' তাঁকে কাঁদ্‌তে হয়। নিশ্চেষ্ট হাসি হাস্‌বার 'ফুরসুত' সে-দিন কারু নাই।

(২)

নুন্, ঝাল, তেতো,—এসব্‌ যদি না থাক্‌তো তবে মিষ্টি-টা বোধ হয় চিরকাল ভালই লাগ্‌তো না।

এক-একটা 'রান্না'-করা তরকারী খেয়েও মনে হয় যেন "নিউ-মার্কেটের" কাঁচা কপি আর শালগম খাচ্ছি। বেশ ভাল জিনিষ,—কিন্তু 'রান্না' হয় নি।

আমাদের এক-একটা ছাপার অক্ষরের 'লেখা' প'ড়লেও মনে হয়:"মেটিরিয়াল্‌স" (materials) গুলো খাসা ছিল,—কিন্তু 'রান্না হয় নি।—হায় নুন্, ঝাল!

যে ছবিটা কখনো দেখি-নি তাকে আঁকা যায় না,—আঁক্‌লে দোষ হয়।

যে ভাবটার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই, তাকে 'লেখায়' আনা যায় না,—আন্‌বার চেষ্টা ক'রলে অপরাধ হয়।

'ফ্রেম' ক'রে ছবি বাঁধানো যায়,—কিন্তু সে-টা সর্ব্বাগ্রে 'ছবি' হওয়া চাই; 'ছবির' ভেতর প্রাণ থাকা চাই,—তার পর তার চার-ধারে আলো ও ছায়ার সমাবেশ চাই। কিন্তু যদি তাতে সুধু আলো অথবা সুধু ছায়াই প'ড়্‌লো, যদি ছবির ভেতরের প্রাণটা না জাগ্‌লো,—তবে তাকে না-বাঁধ্‌লেও চলে।

ছবি ঠিক হ'লে ভালো 'ফ্রেমে' বাঁধানো চাই বই কি!

(৪)

মনযোগ জিনিষটে একটা 'হাত-লণ্ঠন',—যখন যে-দিকে ঘুরিয়ে ধরা যায় সেই দিকটেতে আলো প'ড়বে। সেই আলোতে 'কেন্দ্র-প্রদেশটা' আলোকিত হবে,—তার পর ক্রমশঃ অল্প বেশী আলো অথবা অন্ধকার।

তাই 'সে-কালের' মুন্সির গলায় এক রাজা সাপ ঝুলিয়ে দিলেও তিনি তা টের পান নি; একালে "অন্য-মনস্ক" হ'য়ে রাস্তা চ'ল্‌লে মোটর গাড়ী বা ট্রাম্‌-চাপা প'ড়তে হয়।

—মনটা যে আরেক যায়গায় তাই!

ফটোগ্রাফের 'গ্রুপ' (gronp) নেবার সময় কেন্দ্রস্থ মূর্ত্তি (central figure) ঠিক ক'রে'ফোকাস্' (focus) করা চাই।

লেখায়ও 'ফোকাস্' চাই।

—তাই সব সময় আমাদের হয় না ব'লে দেখি আমাদের কতকগুলো লেখার অনে[illegible]লোকচরিত্র,—তাদের ওপর আলো ছায়ার ভাগ হয় নি; অথবা কারু হাতখানা পা ছাড়িয়ে লম্বা হ'য়ে নেমেছে, কারু আঙুলটা একগাছা লাঠির মতন দেখাচ্ছে; আবার কোথাও বা চিত্রের এক পাশে দাঁড়ানো একটা নগ্ন মূর্ত্তি সুন্দর, সুসজ্জিত মধ্য-মূর্ত্তিকে ডিঙ্গিয়ে উঠে' সমস্ত জিনিষটাকে যেন খালি উপহাস ক'চ্ছে!

লক্ষ্য-চ্যুতি দেখ্‌লে হাসিও পায়, কান্নাও পায়।

(৬)

মানুষের মধ্যে কত 'দেবতা' থাকেন।

তাঁদের কাউকে দেখা যায়,—পূজোর ব্যবস্থা নিজেকেই ক'রে নিতে হয়; ফুল কুড়োনোর জন্য লোক পাঠাতে হয়; ঢাক বাজানোর জন্য নিজের কড়ি দিয়ে ঢুলী ঠিক কর'তে হয়;—তারপর শেষটায় পূজোর আসনে গম্ভীর হ'য়ে ব'সে পূজোর 'চাল-কলাটা'ও তুলে' নিতে হয়।

আবার কাউকে দেখি, তাঁর পূজোর জোগাড় অনায়াসেই অপরে ক'চ্ছে; তিনি জানেনই না যে পূজো' হবে আর হ'লেই বা কার জন্য পূজোর জোগাড় হ'চ্ছে। তাঁর পূজোর জন্য "বেদী" গ'ড়তে হয় না—যে-কোনো আসনেই লোকে তাঁকে 'দেবতা' ক'রে বসাচ্ছে; পূজোর ঢাক-বাদ্য আপনা হ'তেই বেজে উঠ্‌ছে; রাস্তায় চল্‌বার সময় সকলে তাঁকে আগে যেতে দিচ্ছে।

এমন যে দিন দেখি সেদিন বাস্তবিকই "দেবদর্শন" হয়!

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক।

অবরোধ

(Erckmann Chatrian লিখিত 'Le Blocus' নামক আখ্যায়িকার বঙ্গানুবাদ)

তৃতীয় অধ্যায়।

আমি ত পেজেনার মহাজনকে চিঠি লিখিলাম। পেজেনা সহর সিদি জেলায় সেখানে ব্রাণ্ডী, মদ, ভেড়ার লোমের খুব কারবার। সেখানে ব্রাণ্ডীর যা দর ধরে দেয় তাই থেকে ইউরোপের সব জায়গায় বাজার নরম গরম হয়ে থাকে। ব্যবসায় যে ব্যক্তি হাত দিতে যায় তার এ সকল খোঁজ রাখ্‌তেই হয়। রোজ রোজ কাগজে বাজার দর আর ব্যবসা বাণিজ্যের খবর রীতিমত পড়ে থাকি বলে এ সব সন্ধান আমার আগে থেকেই জানাছিল। খবরই হল ব্যবসার গোড়া বাকী যা কিছু, তা এর পর হাতে কলমে শিখ্‌তে হয়। আমি পেজেনায় বড় মহাজন 'ফাভায়া' সাহেবকে আমার নামে বার পিপে মদের আরক পাঠিয়ে দিতে লিখ্‌লাম। হিসাব করে দেখ্‌লাম মায় গুদাম জাত করার খরচা সমেত ফিপিপেয় হাজার 'ফাঁ' করে পড়্‌বে। গত বছর থেকে লোহার ব্যবসা আর চলছিল না। কোনও রকমে কেবল মজুত মালগুলা সব কাটিয়ে দিয়েছিলাম। বার হাজার ফাঁ যে যোগার করে দিতে হবে সেজন্য আমাকে তত ভাবতে হয়নি। তবে ফ্রিজ তোমাকে বল্‌তে কি টাকাটাও ত নেহাত কম নয়, আমার হাতে যাকিছু ছিল এ তার আধা আধি বল্লেও হয়; পনের বছর ধরে যা কিছু রোজগার করেছিলাম তা এককালে যে ধরে দিতে কি কম সাহসের দরকার তা তুমি নিজেই বুঝে দেখ্‌তে পার। চিঠি পাঠিয়েই মনে হতে লাগ্‌ল পারিত সেখানা ফেরৎ নিয়ে আসি কিন্তু তখন আর উপায় ছিল না। আমি বাহিরে সাহস দেখিয়ে আমার স্ত্রীকে বল্লাম "কোনও ভাবনা নাই সব ভালয় ভালয় হয়ে যাবে দেখো এখন। দুগুণ তিন গুণ লাভ মারে কে ?" আমার মত সেও বাহিরে, হাসি মুখ দেখালে বটে কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমরা দুজনেই বেশ ভয় পেয়েছিলাম।

চিঠির জবাব আর চালান বিলটি শুদ্ধ মাল এসে পৌঁছাতে যে হপ্তা ছয়েক লাগ্‌বার কথা সে কয়দিন আমার রাত্রে ভাল করে ঘুমই হতো না। কেবল ভাব্‌তাম মোয়াস রে এইবার বুঝি সব হারাতে বস্‌লি, আর কিই বা থাক্‌ল বুঝি গুলা ডুবিই বা হয়ে পড়ে। এই সব দুর্ভাবনায় আমার গা দিয়ে গল্‌ গল্‌ করে ঘাম বেরুত কিন্তু তাই বলে যদি কেউ আমায় বল্‌তো "মোয়াস তুই স্থির হ তোর বখ্‌রাট আমিই মাথায় করে নিচ্ছি" তাহলে কিন্তু আমি কোনও মতেই তার কথায় রাজি হ'তাম না। তার মানে আর কিছুই নয়—আমার লোক-সানের ভয় যত বেশী, দু পয়সা লাভ করার ইচ্ছাও তার চেয়ে বড় কম ছিল না। এই রকম দুদিক ভেবে যারা চল্‌তে জানে তাদের মধ্যেই বড় সেনানায়ক কি আপন হিক্‌মতে কাজ করুনেওয়ালা ব্যবসাদার লোক দেখ্‌তে পাওয়া যায়। আর বাঁকি যারা তারা সব শুধু কলের পুতুল তারা পারেন কেবল তামাক বেচতে, ঢুকু ঢুকু গেলাস টান্‌তে আর না হয় শুধু বার কতক বন্দুক ছুড়তে। বড় ব্যবসাদারের যা সম্মান তা জাঁদরেল সাহেবদের থেকে বড় কম নয়। ধর্ত্তে গেলে মোটের উপর ছোটয়-বড়য় বড় তফাৎ থাকে না বটে কিন্তু মজাটি দেখ, ইয়েনা ওয়াগ্রাম কি অষ্টারলিজ্‌ যে যুদ্ধেরই কথা হোক্‌ না সুখ্যাত কর্ত্তে হলে লোকে করে কেবল নেপোলিয়ন বাহাদুরের আর যত সবজাঁ ক্লোদজা নিকোলো যারা সব সেপাই হয়ে গিয়েছিলেন তাদের নামও নাই গন্ধও নাই। নিজেকে নেপোলিয়নের সঙ্গে তুলনা করব এমন আস্পর্দ্ধা আমার নাই তবে ধর্ত্তে গেলে আমার প্রায় যথা সর্ব্বস্ব খুইয়ে বার পিপে মদের ইস্পিরিট কেনা অষ্টার্লিজের যুদ্ধের চেয়ে বড় কম বাহাদুরীর কথা নয়।

আমি যখন এই সব নিয়ে ভাবনায় অস্থির সেই সময় সম্রাট বাহাদুর বারিতে পৌঁছিয়েই হুকুম কর্ল্লেন যে তার চল্লিশ কোটি চল্লিশ লক্ষ ষাট হাজার লোক চাই ই চাই। তখন শক্রর দল যে আমাদের ভাল রকম করেই আক্রমন কর্চ্ছে একথা বুঝ্তে কারও বাকী রইল না। সকলেই তখন যে দামেই হোক মাল বেচে দিয়ে টাকা গছিয়ে রাখ্তে ব্যস্ত। আমিই কেবল তাদের দেখা দেখি সে পথে না গিয়ে তখনও ব্যবসার টাকা চাল্তে চলেছি। একথা স্মরণ হ'লে বাস্তবীকই নিজে নিজেই একটু বড়াই কর্ত্তে ইচ্ছে করে। ভাবি আমিই বা সাহসে কম কোথায়?

এই সব গোলমালের ভেতর ছোট নাতি এসড্রাসের সুন্নত দেওয়ার সময় এসে পড়ল। আমার মেয়ে জেফ্যা তখন বেশ সেরে উঠেছে। পাছে আমি ব্যস্ত হই সেই জন্য বারুথ বাবাজী লিখে পাঠিয়েছিলেন যে আমাদের আর যাতায়াতের হাঙ্গামে কাজ নেই, তিনি নিজেই ছেলে পুলে নিয়ে ফাল্সবুর্গে উপস্থিত হবেন। গিন্নি ত তাই শুনে খাবার দাবার মেঠাই মণ্ডা তৈয়ারী কর্ত্তে লেগে গেলেন তা নামই বা কত করব বি—কুগেল্ আয়ান্ স্নাথ মনেস আরও কত কি। এসব খাবার অতি সুখাদ্য একদম মেওয়া চীজ আমাদের বুড়ো রাব্বি (পুরহিত) আরমানকে দিয়ে আমার ঘরের ভাল মদটা একবার পরখ করিয়ে নিয়েছিলাম। আর এই উপলক্ষে জন কয়েক বন্ধু বান্ধবকেও নিমন্ত্রণ করেছিলাম। মিডেল ব্রণের লিজার আর তার স্ত্রী বৌনে, সাভারনে হির্শ আর বুর্গে মাষ্টার। বুর্গে আমাদের স্বজাতী নয় বটে কিন্তু তার যে রকম বিদ্যা বুদ্ধি আর আশ্চর্য্য ক্ষমতা তাতে তার যে ইহুদি ঘরে জন্ম হলেই ভাল হত। সম্রাট বাহাদুর সহরের ভেতর দিয়ে চলে যখন অভিনন্দন দেওয়ার আবশ্যক হত তখন বুর্জেই তা লিখে টিখে ঠিক করে দিত। সরকারি উৎসব উপলক্ষে গাল বাধার দরকার হলে বুর্জেই তাহা ভাঁর ছুই বিয়ার টান্তে টান্তে বেঁধে দিত। ওকালতি বা ডাক্তারের পরীক্ষার জন্য যদি কারও প্রবন্ধ লিখ্তে লিখ্তে আটকে যেত তা লাটিন ভাষাতেই হোক আর ফরাসী ভাষাতেই হোক্ বাড়ীতে গেলেই বুর্জে তার সুবন্দোবস্ত করে দিত। ছেলে পিলেদের প্রাইজ দেওয়ার সময় যদি বাপ মাদের মন গলিয়ে চোখের জল ফেলনের আবশ্যক হত লোকে বুর্গেকেই গিয়ে পাকড়াও করত। বুর্গে একতাড়া কাগজ টেনে নিয়ে এমন বক্তৃতা লিখে দিত যা অন্য লোকে দশ বৎসরেও পার্বে না। যদি কারুর রাজ সরকারে কি পুলিশের দারগার নিকট কোনও আর্জ্জি লেখার আবশ্যক হ'ত সে অম্নি বুর্গের শরণ নিত। যদি কোনও ফেরারী সেপাইএর পক্ষ নিয়ে বুর্গে ফৌজি আদালতে তার মকর্দ্দমা চালাত তা হ'লে আসামী গোড়া বারিকের পাচিরের ধারে গুলির ঘায়ে না মরে খাসা খালাস হয়ে চলে যেত। বুর্গে যখন এই সব কাজ কর্ম্মের পর খাসা নিশ্চিন্ত হয়ে সাল্সাল্ বসে সেই বেটে ইহুদি বেটার সঙ্গে একহাত খেল্তে বসে যেত আর তার কাছে প্রতি নিয়ত টাকা পয়সা হারত তখন কিন্তু বুর্গের ভালর জন্য কারুর মাথা ব্যথা হত না। আমি প্রায়ই ভাবতাম যে বুর্গে বাইরে যাদের টুপি খুলে সেলাম করে সে তাদের অনেককেই মনে মনে খুব ঘৃণা করে থাকে। যে সব আকাঠ মুর্খেরা আদালতের পেস্কারী বা পাড়াগাঁয়ে পুলিশের জমাদারী করে বলে খুব সরফবাজী করে বেড়ায় তাদের লম্বা লম্বা কথা শুনে এমন একজন পণ্ডিত লোক কখনই মনে মনে না হেসে থাক্তে পারে না। তবে লোকটা খুবই ভদ্র ব্যবহার কর্ত্তে জান্তো আর সকল রকম মহবৎ আদব কায়দা তার ভাল করেই অভ্যাস ছিল সেই জন্য মুখ্ ফুটে কখনও কিছু বল্তো না।

বুর্গে আগেকার আমলে পাদরীগিরি কর্ত্তো, লম্বা চৌড়া লোকটি যেমন খোস চেহারা তেমনি মিষ্টি কথা। তার গলার মিষ্ট আওয়াজে ইচ্ছা না থাক্লেও মন

আপ্‌নিই নরম হয়ে যেত। কিন্তু অদৃষ্টের ফের লোকটা নিজের ভাল মন্দর দিকে মোটেই দৃষ্টি ছিল না। যে কেউ এসে তার গালে চড় দিয়ে টাকা পয়সা নিয়ে যেতে পার্‌তো। আমি কতবার তাকে বলেছি যে বুর্গে দোহাই তোমার জোচ্চোরদের সঙ্গে আর বাজী রেখে তাস খেল্‌তে যেওনা ও সব লক্ষীছাড়া বেটারা কেবল ফাঁকি দিয়ে নেয় বইত নয়। ওরকম করে আর ওদের ঠকাতে দিও না। কলেজে মাইনে পত্তর যা পাও আমাকেই এনে দিও যদি কেউ তোমাকে ঠকাতে আসে আমি নিজে দাঁড়িয়ে দেখ্‌বো বেটারা কেমন করে কি করে। আমি তোমার নোট টোট সব গুণে গেঁথে নিয়ে তোমার পাই পয়সার হিসাব মিলিয়ে দেব। কিন্তু বল্লে কি হয়? আখেরের ভাবনা তার মোটেই ছিল না সে আগের মতই নিস্পরোয়া ভাবে চল্‌তে লাগ্‌ল।

তখন নভেম্বর মাস। সে দিন নাতীর সুন্নত হবে বলে আমি আমার জন কয়েক পুরান বন্ধুকে সকাল সকালেই মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ করে এসেছিলাম। যথা সাধ্য আয়োজনও করেছিলাম কোন কিছুরই অভাব ছিল না। জামাই মেয়ে খোকা আর তার ধর্ম্ম বাপ ধর্ম্ম মাকে সঙ্গে নিয়ে বড় একখান গাড়ী করে খুব ভোরেই এসে পৌঁছে ছিল। প্রায় এগারটার সময় আমাদের ধর্ম্ম ঘরে শাস্ত্র মত যা কিছু কাজ সব হয়ে গেল। সুন্নতের সময় খোকা একটি বারও কাঁদেনি! এতে আমাদের সকলেরই বড় আহ্লাদ হয়ে ছিল। তারপর আমরা বাড়ী ফিরে এলাম। খাবার টাবার সব আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। প্রথমেই একখান বড় টেবিল ফুল টুল দিয়ে সুন্দর করে সাজান। তারপর খাসা রূপ দস্তার রেকাবিতে খাবার সামগ্রী পরিপাটি করে পরিবেশন করা। ফল গুলো ছোট ছোট ঝুড়ি করে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। আমরা সব মহা আনন্দে খেতে বসে গেলাম। আমার ডাহিন ধারে বসেছিল লিসে বুর্গে আর আমাদের বুড়ো পুরুত আযমান আর বাঁদিকে ছিলেন সাফেন, হির্শ আর আমাদের বারুখ বাবাজী। মেয়েদের ঠাঁই হয়েছিল টেবিলের অপর ধারে। তারা চারজন সর্লে, জেফ্যা, জেৎলে আর বৌনে আমাদের সামনা সাম্‌নি খেতে বসেছিল। মেয়েদের আর পুরুষদের ভিন্ন ভিন্ন ঠাঁই হবে,—এই হচ্ছে ভগবানের আদেশ। ভোজের সময় নানা রকম গরম খাবার খাওয়া হয় তার সঙ্গে আবার মদও চলে একেই রক্ত আপনা হতেই গরম হয়ে উঠে তার উপর থাকে নেশার আমেজ। সেই জন্য আমাদের শাস্ত্রে পুরুষ আর স্ত্রীলোকের এক সঙ্গে খেতে বসতে নাই। বুর্গে বেশ জাকাল রকম পোষাক করেই নিমন্ত্রণ রক্ষে কর্ত্তে এসেছিল। গায়ে খাসা ফ্রক কুর্ত্তা তার নীচে লেশ লাগান ফুলদার কামিজ গলায় ধপ ধপে সাদা টাই। সে সুন্দর ভঙ্গী করে উচু গলায় বিদ্বান লোকেরই উপযুক্ত নানা গভীর তত্ত্বের বিষয় আলোচনা কর্‌ছিল। আমাদের জাতের সাবেকী আচার ব্যবহার—আমাদের নানা রকম ক্রিয়াকর্ম্ম।—পাসোভার পরব—নুতন বছরের পরব, কি সুরা প্রায়শ্চিত্তের নিয়ম—এই নিয়ে সে যে কত কথাই বল্‌তে লাগ্‌ল যেন খাঁটি ইহুদি বংশেই তার জন্ম। আমাদের ধর্ম্মের আর আমাদের শাস্ত্রকার মুসা পায়গম্বরের নিয়মাবলীর সে কতই না প্রশংসা কর্ত্তে লাগ্‌ল। আমাদের গোপনীয় 'কাবালা শাস্ত্র' যারা জানে তাদের মত বুর্গেও কাল্‌দীয়ান ভাষায় সুপণ্ডিত। যারা সাভার্ণ থেকে নিমন্ত্রণে এসেছিল তারা কানাকানি কর্ত্তে লাগ্‌ল এ লোকটি কে এযে এমন সুন্দর সুন্দর শাস্ত্র কথা এমন জোরের সঙ্গে বুঝিয়ে দিয়ে যাচ্ছে একি আমাদের জাতের পুরুত না মোড়ল সর্দ্দারদের মধ্যে কেউ?

তারা যখন শুন্‌লে যে সে মোটেই ইহুদী নয় তখন সকলেই অবাক হয়ে গেল। আমাদের বুড়ো রাব্বি আয়মান ছাড়া আর কেহই তার সঙ্গে জবাব কর্ত্তে পারছিল না। একই শাস্ত্র পড়া পণ্ডিতদের মধ্যে অন্যান্য

বিষয় নিয়ে যেমন কথা বার্ত্তা হয় এদের দুজনের মধ্যেও সেই রকমই কথা বার্ত্তা চল্‌ছিল। শুনে বোধ হচ্ছিল দুজনের বেশ মতের মিল আছে।

আমাদের পেছনে আমার নূতন নাতি এদ্রা তার দিদিমার বিছানায় মশারীর ভেতর ঘুমুচ্ছিল মুখখানি হাসি হাসি হাত দুটো মুঠো করা। এমনঅসার হয়ে ঘুমুচ্ছিল যে আমাদের হাসির গড়রা, কথাবার্ত্তার শব্দ, গেলাসের ঠন্ ঠনি কিছুতেই তার ঘুম ভাঙ্গছিল না। মাঝে মাঝে এক এক জন গিয়ে তাকে দেখে আস্‌ছিল, সকলেই বলছিল "খাসা ছেলে হয়েছে ঠিক তার মোয়াস দাদা মহাশয়ের মত।" শুনে আমার ভারি আহ্লাদ হল আমিও গিয়ে তার বিছানার উপর ঝুঁকে অনেকক্ষণ ধরে দেখে এলাম, কিন্তু আমি দেখলাম আমার চেয়ে আমার বাবার চেহারার সঙ্গেই তার মুখের আদল বেশী মিলছে। প্রায় বেলা তিনটার সময় অন্যান্য খাবার সব উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে মিষ্টি টিষ্টি দিয়ে গেল। আমি এক বোতল ভাল মদের খোঁজে নিচে নেমে গেলাম দেখলাম —অন্য বোতল গুলোর তলায়,—ধুলো মাখা—মাকড়সার জাল জড়ান খুব পুরানো এক বোতল রুসিল মদ রয়েছে। আমি আস্তে আস্তে বোতলটি তুলে নিয়ে এসে টেবিলে সাজান ফুল গুলার মধ্যে রেখে বল্‌লাম তোমরা ত আগেকার বোতলের খুব সুখ্যাতি করছিলে এটা কেমন একবার খেয়ে বল দেখি।

বুর্গে পুরান মদের ভারী সমজদার এর চাইতে আর সে কিছুই ভাল বাসে না। হাঁসতে হাঁসতে বোতলটার উপর হাত তুলে পণ্ডিতি ঢঙ্গে বল্‌তে লাগ্‌ল "হে মহিমান্বিতা সুরাদেবী এই দুঃখ কষ্টময় সংসার ক্ষেত্রে সামান্য মানবের তুমিই বলদাতৃ তুমিই এক মাত্র হিতকারিণী, হে বোতল দেব! প্রাচীন আভিজাত্যের যা কিছু চিহ্ন তা সব তোমাতেই বিদ্যমান দেখ্‌ছি"। এক মুখ খাবার নিয়ে তাকে এই সব কথা বল্‌তে শুনে ঘর শুদ্ধ লোক সকলেই হেসে উঠ্‌ল।

আমি সর্লেকে তখনই বোতল—খোলা কর্ক স্ক্রুটা আন্‌তে বল্‌লাম। সর্লে যাবে বলে যেমন উঠেছে অমনি বাইরে রনভেরী বেজে উঠ্‌ল। শুনে সকলেই জিজ্ঞাসা কর্ত্তে লাগ্‌ল "ব্যাপার খানা কি"?

ঠিক সেই সময়ে আবার রাস্তা দিয়ে প্রকাণ্ড অনেক গুলো ঘোড়া যাওয়ার শব্দ শোনা যেতে লাগ্‌ল। তাদের পায়ের ভারে বনিয়াদ শুদ্ধ বাড়ী গুলা যেন কেঁপে উঠ্‌তে লাগ্‌ল মনে হল পৃথিবীটার উপর হঠাৎ কি যেন একটা বিষম ভার এসে পড়েছে। সকলেই খাবার টাবার ফেলে জানালার ধারে দৌড়ে গেল।

চেয়ে দেখি ফরাসী দরওয়াজা থেকে ছোট চক পর্য্যন্ত সমানে গোলান্দাজ সেনার দল চলেছে মাথায় মোমজামা মোড়া বড় বড় সাকো টুপি, জিনের উপর ভেড়ার চামড়া বিছান। তারা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাড়ী বোঝাই করে গোলা, গুলি, বোমার খালি খোল, আর মাটি খুড়বার অস্ত্র শস্ত্র সব নিয়ে যাচ্ছিল।

দেখে আমার মনটা কিরকম হয়ে গেল যে ক্লিজ তা তুমি বুঝ্‌তেই পারছ।

বুর্গে বলে উঠ্‌ল ভাই সকল দেখ ওই রণচণ্ডী আগিয়ে আস্‌ছেন আমাদের কাছে এসে পৌঁছালেন আর কি? এখন আমাদের বিশ বছর ধরে "ওর খোরাক পোষাক যোগাতে হবে।"

আমি জানালার চৌকাটের উপর হাত রেখে ভাবতে লাগলাম "তাই তো" দেখ্‌ছি, এখন তো আর শত্রু আসতে বিলম্ব নাই। এরা ত সহরটা গড় বন্দী কর্ত্তেই এসেছে। আমার মদ এসে পৌঁছাবার আগে যদি শত্রুরা সহর ঘিরে ফেলে কি পথে আস্‌তে আস্‌তে যদি রুসরা কি অষ্ট্রীয়ানরা গাড়ী গুলো আটকে ফেলে তাহ'লে উপায় কি হবে। মাল পাই না পাই দাম ত নেবেই মাঝ থেকে ঘরে এক কানা কড়িও থাক্‌বে না। "দুর্ভাবনায় আমার মুখ শুকিয়ে গেল। সর্লে আমার দিকে চেয়েছিল তার মনেও তখন নিশ্চয়ই এই ভাবনাই

ছিল কিন্তু সে মুখ ফুটে কিছুই বল্‌লে না কেবল চেয়ে রইল। গাড়ী ঘোড়া রাস্তা বয়ে না চলে যাওয়া পর্য্যন্ত আমরা সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম, রাস্তা লোকে গস্‌ গস্‌ কর্‌ছিল। কয়েক জন বুড়ো সেপাই মিসর যুদ্ধের ফের্‌তা—দেমারে, গোলান্দাজ, পারাদি, রোলফো মিস্ত্রি ফৌজের ফেজার, বেরাজিনার পরাজয়ের সময় ছিল বলে যাকে লোকে বেরেজিনা বলে ডাকতো এরা সকলে আরও কয়েক জনের সঙ্গে মিলে সম্রাটের জয় হোক বলে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল তাই শুনে ছোট ছোট ছেলেরা গোলান্দাজদের গাড়ির পেছনে পেছনে সম্রাটের জয় বলে ছুট্‌তে লাগল কিন্তু বেশীর ভাগ লোকই ঠোঁট চেপে চুপটি করে দেখ্‌তে লাগল, দেখে বোধ হল সকলের মনেই ভাবনা ঢুকেছে। শেষ গাড়ীখান 'ফুকে'র মোড় ঘুরে চোকের বাহির হতেই সকলেই মাথা নীচু করে আপন আপন বাড়ীতে ঢুকে পড়ল। আমরাও খাবার ঘরে ফিরে গিয়ে সকলের মুখ চাওয়া চাওয়ি কর্‌তে লাগলাম। ফের আবার খেতে বস্‌বার কারুর বড় ইচ্ছা দেখা গেল না। বুর্গে বল্লে মইস তোমাকে যেন কেমন কেমন দেখাচ্ছে কি হয়েসে বলত"।

আমি বল্লাম আমাদের এই সহরে এখন কত দুর্ঘটনা ঘট্‌বে তাই ভাব্‌ছি বুর্গে।

ভয় কি ? সহর রক্ষার যে রীতিমত বন্দোবস্ত রয়েছে, এখন বাকী ভগবানের হাত। যা ঘটবার তা আটকায় কে ; ছেড়ে পালাবার যখন জো নাই তখন মাথা পেতে লওয়া ছাড়া আর উপায় কি ; ভাবছ কেন এসো সকলে বসে পড়া যাক্‌, একটু পুরানো মদ চাখ্‌লেই মন চাঙ্গা হয়ে যাবে।

তাই শুনে সকলেই আপন আপন জায়গায় এসে বস্‌ল। আমি বোতলটার কাক্‌ খুলে ফেল্‌লাম বুর্গের কথাই সত্যি হল। পুরান রুসির্লি একটুতেই কাজ করে, আমাদের মুখে আবার হাঁসি ফিরে এল।

"বুর্গে আসুন আমরা খোকা এড্রার স্বাস্থ্য দান করি। ভগবান যেন ডান হাত খানি বাড়িয়ে তার মাথার উপর মঙ্গল আশীর্ব্বাদ বর্ষন করেন যেন তাকে সকল বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করেন।" আমরা পরস্পরের গেলাসে গেলাস ঠেকিয়ে স্বাস্থ্য পান কর্‌লাম। একজন বল্লে 'মোয়াস ঠাকুর্দ্দা' আর সার্ল ঠাকুর মা যেন দীর্ঘজীবী হয়ে বহুদিন সুখ ভোগ করে এস আমরা তাদেরও স্বাস্থ্য পান করি"

শেষে মদের ঝোঁকে সবই গোলাপী পরদার ভিতর দিয়ে দেখা যেতে লাগ্‌ল সকলেই সম্রাটের যশোগান কর্ত্তে কর্ত্তে বল্‌তে লাগ্‌ল তিনি সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের রক্ষা করার জন্য এসে পড়বেন আর লক্ষীছাড়া শত্রু বেটাদের রাইন নদীর অপর পাড়ে গুড়ো করে রেখে আস্‌বেন।

কিন্তু সে যাই হোক পাঁচটা বাজতে যখন বাড়ী ফেরার সময় এল তখন সকলেই এমন কি বুর্গেকেও যেন মন মরা মন মরা ঠেক্‌তে বোধ হতে লাগ্‌ল। সিড়ির নীচে আমার হত ধরে বিদায় নেবার সময় তাকে বড়ই ভাবিত বলে বোধ হল—বল্‌লে স্কুলের ছেলে গুলোকে দেখ্‌ছি আপন আপন বাপ মায়ের বাড়ী পাঠিয়ে দিতে হ'লো। আমাদের এখন হাত গুটিয়ে চুপটি করে বসে থাকৃতে হবে। সাভার্নের কুটুম্বেরা জেফ্যা বারুখ আর তাদের ছেলে পিলের সঙ্গে নিঃশব্দে রওনা হয়ে গেল ঘোড়া দুটোকে ছুটাবার জন্য একবার চাবুকের আওয়াজও কর্‌লে না।

শ্রীগুরুদাস সরকার।

প্রতিধ্বনি।

যে রূপসী ছায়ার সখি মুগ্ধা তরুণী
প্রীতির গীতি পাঠায় তোরে নিত্য ধরণী।
কানন দেবীর কন্যা তুমি স্বাধীন ললনা
কাহার ধ্যানে মগ্ন থাক আমায় বলনা?
যাও যে ক্ষণে অন্য মনে কুসুম চয়নে
নদীর কূলে দাঁড়াও কভু সজল নয়নে।
আপন মনে বেড়াও তুমি গিরির গায়েতে
ভুবন প্রেমের অর্ঘ্য ঢালে তোমার পায়েতে।
কোন্ শবরীর সঙ্গী তুমি চটুল চরণা
স্বচ্ছ সরল রূপের পরী নিরাভরণা।
শ্বেত বরণী তপস্বিনী পুণ্য চরিতে
লওনা তুমি কথার ডালি ফিরাও ত্বরিতে।
হৃদয় চাহ নিদয় তুমি বিজনবাসিনী
ভাষায় তোমার ভুলায় না'ক বিরলভাষিণী।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

ঢাকায় সঙ্গীত চর্চ্চা।*

(ঢাকা নগরী ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের
সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিগণের এবং যাত্রা
নাটকাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণী)

সঙ্গীত সম্বন্ধে বলা যায়ঃ—

কে তোমারে আনিল গো এ ধরণী তলে
সুধার নির্ঝর সম জ্বালা জুড়াইতে?
বসন্তের কুঙ্গরেণু পূরিত অনিলে
সাথে আন হৃদিক্ষতে হাত বুলাইতে।
অনন্ত কালের কথা মনে যেন পড়ে,
কখনো বা সুখভরে কেঁদে ওঠে প্রাণ,
তোমার ও ধ্বনিগুলি হৃদি-পদ্ম ঘিরে
যখনে গো ফুটে ওঠে হ'য়ে মূর্ত্তিমান।—
সবি যেন আপনার, কেহ নহে পর,
এ ধরণী মোরি যেন স্নেহময়ী মাতা,
বিশ্বের সকলি যেন কেহ গো আমার
মনে হয় ঘুরে' ফিরে এই সব কথা।
ওগো, তোমার মধুর ধারা ঝরিয়া নিয়ত
ফেলুক এ চিত্ত ছেয়ে—অপূর্ব্ব অমৃত।

এমন এক সময় গিয়াছে যখন ঢাকা নগরীতে এই সুমধুর সঙ্গীত চর্চ্চা প্রচুর পরিমাণেই ছিল। নবাবি আমলে ঢাকার সৃষ্টিকাল হইতে আরম্ভ করিয়া ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্তও উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতে এ নগরী মুখরিত হইত। শান্তিময়ী সন্ধ্যার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সহস্র দীপমালায় ভূষিতা হইয়া নগরী যখন নক্ষত্র খচিত নীল নভের সঙ্গে স্পর্দ্ধা করিত, তখন হইতেই প্রত্যেক কলাভবন হইতে কলাবত-কণ্ঠের উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরলহরী,—সেতার, সুরবাহার, এস্রাজের কলগুঞ্জন, মৃদঙ্গের গম্ভীর নির্ঘোষ ও তবলার চঞ্চলনাদ আকাশে বাতাসে খেলিয়া বেড়াইত। মনে হইত নগরী যেন প্রতি রজনীতেই উৎসবে মগ্ন হইয়া আছে।

কিন্তু আর সে দিন নাই। উদরান্নের চিন্তায় আর কেহ তেমন করিয়া সঙ্গীত শিখে না। শিখিলেও তাহার আদর হয় না। দেশে উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত বোদ্ধারও অভাব হইয়াছে। বেণা বনে মুক্তা ছড়াইতে কাহার সাধ যায়? তাই অভ্যস্ত বিদ্যারও হ্রাস হইতেছে।

ভারতীয় সঙ্গীতের ধ্রুপদ, খ্যাল, টপ্পা ও ঠুম্‌রি এই চারিটি অঙ্গ। ইহার মধ্যে ধ্রুপদ যেন গভীর গম্ভীর জলনিধি, খ্যাল যেন প্রবল তরঙ্গিনী, টপ্পা যেন বেগবতী পার্ব্বত্য নির্ঝর, আর ঠুম্‌রি যেন মৃদুগামিনী লহর গুচ্ছ। ইহা ব্যতীত ভজন ও গজল জাতীয় আরও দুই প্রকারের

---

* ঢাকা সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

সঙ্গীত আছে, উহা ভক্তজন মনোমুগ্ধকারী। এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে ধ্রুপদ, ঠুম্‌রি ও ভজন হিন্দুগণের উদ্ভাবিত, আর খ্যাল, টপ্পা ও গজল মুসলমানদের সৃষ্ট। এই কয়প্রকার সঙ্গীতের মধ্যে ধ্রুপদই সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর। কিন্তু আজকাল ধ্রুপদ বড় কেউ শুনিতে চায় না। উহাতে ত চটুল স্বরকম্পন লীলা নাই; আজকাল এই তরলতার দিনে কে তাহার সেই সমুদ্র তরঙ্গবৎ গম্ভীর গতি-সৌন্দর্য্যের রসাস্বাদ করিবে? তাই আজ ধ্রুপদী নীরব। সঙ্গে সঙ্গে মেঘগর্জ্জনের অনুকারী মৃদঙ্গের (পাখোয়াজের) "স্নিগ্ধ গম্ভীর নির্ঘোষ"ও লুপ্ত। পাখোয়াজি খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। খ্যালের আদর ও বড় একটা নাই। তারও যে রাজসিক চাল। এখন কথঞ্চিৎ আদর টপ্পা ও ঠুম্‌রির। এগুলি যে সরবৎ ও চাট্‌নিরই মত আশু তৃপ্তিদায়িনী। এখন মহাকাব্য কে পড়ে? রামায়ণ, মহাভারত পাঠ করার সময়, সামর্থ্য ও ধৈর্য্য কোথায়? বেঁচে থাক্ গীতগোবিন্দ। এখন চম্পক, বকুল, বেলা, যুঁই, চামেলির আদর আর বড় দেখিনা, বাগানে বাগানে রঙ্গদার ঋতু-ফুল (season flower) আর পাতাবাহারেরই আদর। কিন্তু এও ত আর চলে না। হিন্দিগান দূরে থাক গম্ভীর ভাবের বাঙ্গলা গানও যে অচল হইয়া উঠিতেছে! কেবলই যে হাসির গানের ফরমাস হয়? তানপুরা, সেতার, এস্রাজ দূরে নিক্ষিপ্ত, এখন হারমোনিয়ামের কর্কশ ধ্বনির সঙ্গে প্রাণপন চিৎকার না করিলে সঙ্গীত হয় না। যেখানে গান সেইখানেই ঐ বদখৎ স্বরপূর্ণ এককেটি বাক্স। এই যন্ত্র আমাদের জাতীয় সুরবোধ শক্তি নষ্ট করিয়া দিতেছে। ইহা যে দেশের যন্ত্র সেই দেশের একজন গুণী—আমাদের দেশে ইহার প্রচলন বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রনিধান যোগ্য। তিনি বলিয়াছেন :—

"...If the mohammadan "sitar" singer knew that the harmonium which he accompanies himself was ruining his chief asset, his musical ear, and if the girl who learns the pianoforte could see that all the progress she made was as sure a step towards her own denationalization as if she crossed the black sea water and never returned—they would pause before they laid such sacrilegious hands on saraswati. Excuses may be made for such practices, but there is one objection fatal to them all; the instruments are borrowed.......To dismiss from India these foreign instruments would not be to check the natural but to prune away an unnatural growth."—page 16, "The music of Hindus than" by A. H. Fox Strangways, Oxford, Clarandon Press.

অর্থাৎ :—"যদি মুসলমান ওস্তাদ জানিতেন যে, যে হারমোনিয়াম যন্ত্রের সঙ্গে তিনি গান করেন উহা তাঁহার প্রধান সম্পত্তি সুরবোধ শক্তিই নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে, এবং যদি পিয়ানো যন্ত্র শিক্ষার্থিনী বালিকা দেখিতে পাইতেন যে যতই তিনি উক্ত যন্ত্রে উন্নতি লাভ করিতেছেন ঠিক সেই অনুপাতেই তিনি জাতীয় আদর্শ হইতে বিচ্যুতা হইতেছেন, এ যেন তাহার পক্ষে "কালাপানি" পার হইয়া চিরতরে বিদেশ যাত্রারই মত হইতেছে,—তাহা হইলে তাঁহারা সকলেই সরস্বতীর অঙ্গে এইরূপ অপবিত্র হস্তার্পণের পূর্ব্বে একটু থমকিয়া দাঁড়াইতেন। এরূপ অভ্যাসের সপক্ষে বলিবার থাকিতে পারে বটে কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে একটি মারাত্মক আপত্তি আছে, তাহা এই যে ঐ সকল যন্ত্র সবগুলিই ধার করা। এই সকল বিদেশীয় যন্ত্রগুলিকে ভারত হইতে উঠাইয়া দিলে সঙ্গীতের স্বাভাবিক উন্নতির দিকে বাধা দেওয়া হইবে না, কিন্তু উহার অস্বাভাবিক পরিণতিই দমন করা হইবে।"

তবে অল্প কএক বৎসর যাবৎ একটু পরিবর্ত্তন লক্ষ করা যাইতেছে। সব বিষয়েই যেমন সঙ্গীত সম্বন্ধেও সেইরূপ—আমাদের জাগরণ যেন কিছু কিছু উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। আবার কলাবতকুল মায়ফল মজলিশে নিমন্ত্রিত হইতেছেন। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও সঙ্গীত চর্চ্চার যেন একটু আভাস পাইতেছি। আমাদের কন্যাগণ সেতার এস্রাজে ও কণ্ঠ সঙ্গীতে নৈপুণ্য লাভের চেষ্টা করিতেছেন। যদিও এখন কণ্ঠ সঙ্গীতের সাহায্যকল্পে হারমোনিয়াম যন্ত্রেরই প্রাবল্য তবু আশা করা যায় তারের যন্ত্রের মধুর নিক্বন শুনিতে শুনিতে ক্রমে তাহাদের কান ঠিক হইবে এবং তাঁহারাও তানপুরা ও এস্রাজ প্রভৃতির সঙ্গে গান করিতে অভ্যাস করিবেন। এখনই কেহ কেহ সেইরূপ করিতেছেন, ইহা নিশ্চয়ই শুভ লক্ষণ।

এখন প্রকৃত বিষয়ের অবতারণা করিতেছি। যে সকল গুণীদিগের বিষয়ে কিছু জানিতে পারিয়াছি প্রথমে তাঁহাদের নাম দিয়া পরে উহার সঙ্গে বিবরণ লিখিয়াছি। ইহাতে সময়ের পৌর্ব্বাপর্য্য রক্ষা করিতে পারি নাই। কারণ একদিন পরে সঠিক খবর পাওয়া একপ্রকার অসম্ভব, তা ছাড়া সব বিবরণ সংগ্রহের আশায় বসিয়া থাকিলে শীঘ্র আর এ প্রবন্ধ লেখা হয় না। এ কথাও ঠিক যে আমাপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি এ প্রবন্ধ লিখিলে অধিকতর মনোজ্ঞ হইত। যাহা হউক বিবরণ সংগ্রহ করিতে আমি সহরের বহু লোকের নিকট গিয়াছি, এবং অনেকেই অনুগ্রহ করিয়া অতি আগ্রহের সহিত সব কথা বলিয়াছেন। যাঁহারা এরূপ সাহায্য করিয়াছেন বা ভবিষ্যতে করিবেন তাঁহাদিগকে আমি সর্ব্বাগ্রেই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

৺ কালীচরণ রক্ষিত রায়ঃ—ইনি ঢাকা কেরাণীগঞ্জ থানার এলাকাধীন আটী নামক গ্রামের কায়স্থ ভূম্যধিকারী বংশোদ্ভব। ইঁহার পিতার নাম ৺ পরশুরাম রক্ষিত রায়। ইনি বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখক হইতে অন্ত ধারায় ঊর্দ্ধতন ষষ্ঠ পুরুষ। কালীচরণ রায় নবাবী আমলে ঢাকায় সদর দেওয়ানের পদে নিযুক্ত ছিলেন। পারশ্য ভাষায় ইনি সুপণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার কণ্ঠ অতি মধুর ছিল, এবং সুললিত স্বরে "গজল" গান করিয়া নবাব ও আমির ওমরাহদিগকে ইনি মোহিত করিতেন। ঢাকার তদানীন্তন নবাব কালীচরণের "গজল" গান সাধ করিয়া শুনিতেন। এই কারণে তিনি নবাবের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। কিন্তু "বড়র পিরীতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ,"—একটি ঘটনায় কালীচরণের কপাল ভাঙ্গিল, তাঁহার সেরেস্তা হইতে কোন এক পরগণার একটি অতি আবশ্যকীয় দলিল হারাইয়া গেল, কিছুতেই উহা খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। নবাব শুনিয়া সন্দেহ ক'রলেন যে কালীচরণই ঘুস লইয়া উক্ত দলিল সরাইয়াছেন। নবাব ভয়ঙ্কর ক্রোধাভিভূত হইয়া হুকুম দিলেন "কালীচরণকো পেট্ ফারুকে উওঃ দলিল নেকালো!" আমীর ওমরাহগণ এই হুকুম শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহারা সকলেই কালীচরণকে ভালবাসিতেন; তৎক্ষণাৎ তাঁহারা কৌশলে কালীচরণকে অবিলম্বে পলায়ন করিতে উপদেশ জানাইলেন। কালীচরণও প্রাণ ভয়ে পলাইয়া গেলেন। বহুদিন চলিয়া গেলে উক্ত দলিলের অনুসন্ধান হইল। উহা কালীচরণের এক কেরাণী স্বার্থযুক্ত লোকের নিকট বহু অর্থলাভের প্রলোভনে চুরি করিয়াছিল। তখন ঘটনাক্রমে ঐ দলিল পাওয়া গেল এবং কালীচরণের নির্দ্দোষিতা প্রমাণিত হইল। তখন নবাব কালীচরণের জন্য বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়া আমির ওমরাহদিগকে তাহার অনুসন্ধান নিতে অদেশ করিলেন।

এদিকে কালীচরণ বহুকাল দেশে দেশে ঘুরিয়া কিছুদিন যাবৎ নিজ বাড়ীতে অতি গোপনে অবস্থান করিতেছিলেন। নবাবের একজন ওমরাহ ইহা জানিতে পারিয়া স্বয়ং কালীচরণের বাটীতে গেলেন ও তাঁহাকে সব কথা বলিয়া অভয় দিলেন, এবং কালীচরণকে

সঙ্গে নিয়া নবাব সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। নবাব এতদিন পরে তাঁহার প্রিয় কালীচরণকে পাইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করিয়া বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

কালীচরণ ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন। প্রথম বয়সে একবার সংসার বিরাগী হইয়া চলিয়া যান; কিন্তু প্রত্যাদেশ পাইয়া গৃহে ফিরিয়া আসেন এবং একটি পুত্র লাভ করিয়া নবাবের কার্য্য গ্রহণ করেন। তিনি "ভায়া কালীচরণ" নামে অভিহিত হইতেন। কালীচরণ অনুমান প্রায় ১৭৫ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন।

৺ রাধাকৃষ্ণ রায়:—ইনি ঢাকা কেরাণীগঞ্জ থানার এলাকাধীন পাইনা গ্রামের কায়স্থ ভূম্যধিকারী বংশোদ্ভব। পিতার নাম ৺ জিৎরাম রায়। ইনি কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন রাজ সরকারে দেওয়ানের কার্য্য করিতেন। রাধাকৃষ্ণের ভ্রাতা ৺ প্রাণকৃষ্ণ রায়ও ঢাকার তৎকালীন নবাব সরকারে দেওয়ান ছিলেন। ইঁহারা দুই ভ্রাতাই সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন, এবং প্রসিদ্ধ কলাবৎদিগকে বিশেষ পুরস্কার দিতেন। রাধাকৃষ্ণের দুই পুত্র কৃষ্ণমোহন এবং ব্রজমোহন রায়ও সঙ্গীতে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইঁহাদের সময়ে দেবার্চ্চনার ন্যায় উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত চর্চ্চার জন্যও বাৎসরিক ব্যয় নির্দ্দিষ্ট ছিল। রাধাকৃষ্ণ অনুমান প্রায় ১২৫ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন।

৺ গোপীমোহন রায়—ইনি উক্ত ৺ ব্রজমোহন রায় মহাশয়ের পুত্র। কথিত আছে ইনি ইংরাজি, সংস্কৃত, আরবি, পার্শি, উর্দ্দু, হিন্দি, ওড়িয়া প্রভৃতি ভাষা অল্পাধিক জানিতেন। ইনি প্রথমতঃ মুন্সেফের কার্য্য করিয়া পরে আলাসদর আমিনের (সবজজ) পদে উন্নীত হন। সংস্কৃতে গোপীবাবু এতদূর অভিজ্ঞ ছিলেন যে তাহার বাড়ীতে পণ্ডিতগণ সমবেত হইলে তিনি নিজে তাঁহাদের সঙ্গে শাস্ত্রীয় বিচার করিয়া যোগ্যতা অনুসারে বিদায় দিতেন। ইনি উভয় কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীতে দেশ বিখ্যাত ছিলেন। কণ্ঠ অতি মধুর ছিল। ধ্রুপদ, খ্যাল ও টপ্পায় তাঁহার সমান অধিকার ছিল। প্রথম বয়সে তিনি খ্যাল ও টপ্পা শিক্ষা করেন, এবং শেষ বয়সে ধ্রুপদ শিক্ষা করিয়া উহাই গাইতেন। তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। বাদ্য যন্ত্রের মধ্যে সেতার, সারঙ্গ, এস্রাজ, বেহালা, বাঁশী, রোশন চৌকি, পাখোয়াজ, তবলা, ঢোলক, খোল, ঢাক, ঢোল, এমন কি নাগাড়া, টিকাড়া পর্য্যন্ত বাজাইতে পারিতেন। পঞ্জাব প্রভৃতি দেশ হইতে প্রায়ই বড় বড় ওস্তাদগণ আসিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গীত চর্চ্চা করিতেন। তাঁহারা এক বাক্যে স্বীকার করিতেন যে এতদঞ্চলে এত বিবিধ প্রকারের যন্ত্রে ও সঙ্গীতে এমন সমভাবে অধিকার আর কাহারও নাই। ঢাকায় অনেকে তাঁহার নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তিনি অবসর সময়ের অধিকাংশই বিদ্যালোচনা ও সঙ্গীত চর্চ্চায় অতিবাহিত করিতেন। তাহার বাড়ীতে ২।১ জন ওস্তাদ প্রায় সর্ব্বদাই থাকিতেন। কাহারও কণ্ঠস্বর মিষ্ট হইলেই তিনি তাহাকে নিজ বাড়ীতে রাখিয়া লেখা পড়া ও সঙ্গীত শিখাইতেন। কথিত আছে তিনি জমিদারির আয় হইতে সাংসারিক সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া স্বোপার্জ্জিত অর্থ সঙ্গীত চর্চ্চায় ব্যয় করিতেন। ইনি ১২৭০ সনের আশ্বিন মাসে পরলোক গমন করেন।

৺ আনন্দমোহন রায়:—আনন্দমোহন উক্ত গোপী মোহনের কনিষ্ঠ। ইনিও ভাল গাইতে বাজাইতে পারিতেন। খ্যাল, টপ্পা, ও ঠুম্‌রি এই তিন প্রকার সঙ্গীতেই তাঁহার অধিকার ছিল। তবে টপ্পা গাইতেই ভালবাসিতেন। তিনি অতি সুকণ্ঠ ছিলেন। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিতেন "ধ্রুপদ যেন মিশ্রীখণ্ড, খ্যাল মিষ্ট সন্দেশ, আর টপ্পা সুমিষ্ট শরবৎ।" তিনি তবলায় বড় ওস্তাদ ছিলেন, তাঁহার হাতের বোল অতি পরিস্কার ছিল। তিনিও পাখোয়াজ, সারঙ্গ, বেহালা ও সেতার বাজাইতে পারিতেন। কীর্ত্তনের সময়ে তিনি ও তাহার

ভ্রাতা গোপীমোহন খোল বাজাইয়া শ্রোতাদিগকে মুগ্ধ করিয়া দিতেন। গান বাজনার জন্ম ইনিও বহু অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। আনন্দমোহন বলিতেন যাহারা গান বাজনা ভালবাসে না তাহাদের মুখ দর্শন করা উচিত নহে।" সেক্সপীয়রের কথা মনে পড়ে:—"The man that hath no music in himself;

Nor is not moved with concord of sweet sounds,
Is fit for treasons, stratagems, and spoils;
The motions of his spirit are dull as night,
And his affections dark as Erebus;
Let not such man be trusted."

—Merchant of venice, Act V. Se. I.

আমাদের নবীনচন্দ্রও গাইয়াছেন:—

"হতভাগ্য সেইজন, যে জন বঞ্চিত
সরস সঙ্গীত রসে—রসের প্রধান।"

৺ হরিমোহন রায়:—ইনি পূর্ব্বোক্ত গোপীমোহন রায়ের পুত্র। পিতা ও পিতৃব্যের ন্যায় হরিমোহনও পাখোয়াজ, তবলা ও সারঙ্গে সুদক্ষ ছিলেন। তাঁহার রাগ রাগিনী বোধ ছিল, কিন্তু তাঁহার কণ্ঠ মিষ্ট ছিল না। ইনি কলিকাতার সুবিখ্যাত ৺ কেশবচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নিকট পাখোয়াজ এবং স্বনাম ধন্য তবলচি আতা হোবেণের পিতা হোবেণ বক্সের নিকট তবলা শিক্ষা করেন। তাঁহার হাত বড়ই মিষ্ট ছিল। পশ্চিম দেশীয় বড় বড় ওস্তাদদের সঙ্গে প্রতিযোগীতায় অনেক সময়ে তিনি জয়ী হইতেন। তিনি এতদূর সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন যে ৺ শারদীয় পূজার সময় কোন ভাল ওস্তাদ আসিলে ছয় মাসের পূর্ব্বে তাহাকে ছাড়িতেন না। পরিবারের সকলে, এমন কি তাঁহার কর্ম্মচারীবর্গ এইরূপ অতিরিক্ত ব্যয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করিলে তিনি বলিতেন "উহাদের গান শুনিয়া আমি যে পরিমাণ আন্তরিক তৃপ্তি পাই তাহার উপযুক্ত প্রতিদানের ক্ষমতা আমার নাই।" তিনিও সুকণ্ঠ ব্যক্তিদিগকে নিজ বাড়ীতে রাখিয়া সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন। ইঁহার খুল্লতাত-ভ্রাতা সুবিখ্যাত গায়ক ৺ রাধিকামোহন রায় মহাশয় ইঁহার নিকটই যন্ত্র শিক্ষা করেন। ১২৯০ সনের ২৯শে ফাল্গুন দোল পূর্ণিমা দিন ইনি পরলোক গমন করেন।

৺ রাধিকা মোহন রায়:—ইনি পাইনা জমিদার বংশের শেষ সুবিখ্যাত ওস্তাদ। পূর্ব্বোক্ত ৺ আনন্দ মোহন রায় ইঁহার পিতা। বাল্যকালে ইঁহার পিতৃ বিয়োগ হয়। রাধিকা বাবুর কণ্ঠের ন্যায় সুমিষ্ট কণ্ঠ আর কখনও আমরা শুনি নাই। এরূপ দেব-দুর্লভ কণ্ঠ পাওয়া বড় তপস্যার ফল। বুঝি এ বংশের সঙ্গীত-ধারা রাধিকা বাবুতেই লুপ্ত হইবে বলিয়া পূর্ব্বপুরুষানুক্রমে চর্চ্চিত হইয়া তাঁহাতেই কণ্ঠস্বর চরমোৎকর্ষতা লাভ করিয়াছিল। তিনি যখনই গান ধরিয়াছেন তখনই উহা শ্রোতার "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া প্রাণ আকুল" করিয়া ফেলিয়াছে। রাধিকা বাবু ঢাকায় এখানকার সুপ্রসিদ্ধ টপ্পা গায়ক হস্নু মিঞার নিকট, এবং কলিকাতায় পশ্চিম দেশীয় প্রসিদ্ধ ওস্তাদ বড় গুনিখাঁর নিকট টপ্পা ও ঠুম্‌রি শিক্ষা করেন। তিনি সময় সময় পথ চলিতে চলিতে শিশ দিয়া রাগরাগিনী-গুলি এমন চমৎকার ভাবে আলাপ করিতেন যে রাস্তার উভয় পার্শ্বে বহু লোক থমকিয়া দাঁড়াইত। তবলায় তাঁহার অতি মিষ্ট হাত ছিল। সারঙ্গ, এস্রাজ, সেতার, বেহালা—যাহাতে হাত দিতেন তাহাই অতি চমৎকার বাজাইতেন, মন মোহিত হইয়া যাইত। একবার বিক্রমপুর বহর গ্রামে শ্বশুর বাড়ী গিয়াছিলেন। তথায় এক ঢাকির ঢাক বাজান দেখিয়া তৎক্ষণাৎ উহা বাজাইয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। অথচ পূর্ব্বে উহা কখনও বাজান নাই। বৈরাগীর সারিন্দা বাজাইয়া এমন মধুর দেহতত্ত্ব গান গাইতেন যে তা আর কি বলিব! তাঁহার কণ্ঠে ও হাতে সকলই মধু হইয়া যাইত, এমনই তাঁহার সঙ্গীত-প্রতিভা ছিল। তিনি

একজন প্রসিদ্ধ গল্পী ছিলেন ; এবং নানা দেশীয় কথার নকল করিতে তাঁহার সমকক্ষ এ সহরে কেহ ছিলেন না। শুনিলে হাসিতে হাসিতে দম আটকাইয়া যাইত। তিনি বড় রঙ্গ লাগাইয়া কথা বলিতেন। একটি নমুনা দিলাম :—

একবার ঢাকা পিলখানায় বহু নূতন হাতী ধরিয়া আনা হয়। সহরের বহু লোক উহা দেখিতে যান। বিখ্যাত মল্লবীর বিপুল কায় শ্রীযুত পরেশনাথ ঘোষ মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া রাধিকা বাবুও হাতী দেখিতে যান। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া রাধিকা বাবু আমাদের এক দিন বলিলেন "আমি আর পরেশ যখন গাড়ি হইতে নামিয়া হাতীগুলির কাছে গেলাম, তখন ছোট ছোট হাতীগুলি পরেশকে দেখিয়া "ঠাকুর ভাই, ঠাকুর ভাই" বলিয়া সসম্ভ্রমে পিছু হাটিতে লাগিল।"

বিগত ১৩১৬ সনের ১৫ই আষাঢ় তাঁহার পরলোক গমন হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত হরিমোহন রায়ের পুত্র মোহিনীমোহন রায়ও তবলা শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও কতিপয় মাস মাত্র হয় ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। হায়, মোহিনী বাবুর পরলোক গমনের আর "একজন না রহিল বংশে দিতে বাতি!" নিম্নে রাধিকা বাবুর রচিত একটি বাঙ্গলা গান দিলাম :—

রাগিণী লুম্ ঝিঁঝিট্—ঝাঁপতাল।

কাঁদালে কাঁদিতে হবে, তাকি তুমি জাননারে!
দেবের দুর্লভ ধনে, তেয়াগিলে অকারণে,
এখন জীবন দানে পাবে না আর সে রতনে!

৺কৃষ্ণদাস কর্ম্মকার :—ইঁহার নিবাশ ছিল ঢাকা ঠাঁঠারিবাজার। ইনি প্রসিদ্ধ পঞ্জাবী ওস্তাদ কালে খাঁ ও মহম্মদ খাঁ, এবং পশ্চিম বঙ্গের বিখ্যাত ওস্তাদ ভোলানাথ চৌধুরীর নিকট ধ্রুপদ শিক্ষা করেন। নিজে খুব নামজাদা ধ্রুপদী ছিলেন। ইনি ঢাকার প্রধান ওস্তাদ হরি কর্ম্মকারের সঙ্গীতগুরু। অনুমানে ৪০ বৎসর পূর্ব্বেইনি জীবিত ছিলেন।

৺দীনবন্ধু গোপ ও দাশু ঠাকুর প্রভৃতিও ইঁহার সাকরেদ। ৭০।৭৫ বৎসর বয়সে ইনি পরলোক গমন করেন। ৩।৪ বৎসর হয় উল্লিখিত সাকরেদদ্বয়ও পরলোক গমন করিয়াছেন।

৺ মিঠন খাঁ :—ইনি পশ্চিম দেশীয় লোক। ঢাকায় বিবাহ করিয়া এখানেই স্থায়ী হন। উর্দ্দু বাজারে বাস করিতেন। ইনি খ্যাল গানে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ৭০।৭৫ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়। অনুমান প্রায় ৬০ বৎসর হয় মিঠন খাঁ জীবিত ছিলেন।

৺ হবিব্ মিঞা :—ঢাকা একরামপুর মিঞা সাহেবের ময়দানে ইঁহার বাড়ী ছিল। ইনি সুবিখ্যাত টপ্পা গায়ক ছিলেন। স্বর এত উচ্চ ও মিষ্ট ছিল যে সচরাচর সেরূপ শোনা যায় না। ইনি সপ্তম সুরে গান করিতেন। প্রসিদ্ধ টপ্পা গায়ক ৺হস্নু মিঞা হবিবের প্রথম সাকরেদ ছিলেন। ইনি তন্নুও আমির খাঁ প্রভৃতি অনেক বিখ্যাত টপ্পা গায়কের নিকট শিক্ষালাভ করেন। কথিত আছে ইনি বিবাহের তিন দিন পরেই সঙ্গীত সাধনার ব্যাঘাত হইবে বলিয়া স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেন। নিজে পালোয়ান ছিলেন এবং নিয়মিত ভাবে ডন কুস্তি করিতেন। প্রায় ৮০ বৎসর বয়সে ৫২ কি ৫৩ বৎসর পূর্ব্বে পরলোক গমন করেন।

৺ নটবর বণিক্য :—ঢাকা কায়েতটুলিতে ইঁহার নিবাস ছিল। ইনি ৺খয়রাতি জমাদারের নিকট তবলা শিক্ষা করেন। রাগরাগিণীতেও ইঁহার দখল ছিল। নিজে বিমুগ্ধ চিত্তে ভজন গান করিয়া সকলকে বিমোহিত করিতেন ২৭ কি ২৮ বৎসর পূর্ব্বে প্রায় ৭৫ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়।

৺সুব্রাতি মিঞা :—অনুমান প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে ইনি জীবিত ছিলেন। ইহার নিবাস ছিল ঢাকা চামার টুলিতে। ইনি অতি উৎকৃষ্ট ঢোলক বাদক ছিলেন। শাঁখারি বাজারের অনেকে তাঁহার সাকরেদ হয়। কণ্ঠস্বর অতি মিষ্ট ছিল। বিদ্যাসুন্দরের টপ্পা খুব ভাল গাইতে

পারিতেন। ইঁহার মধুর কণ্ঠে বিমোহিতা হইয়া অনৈকা রমণী ইঁহার প্রণয়াশক্তা হয়। কিন্তু কিছুদিন পরে কোনও কারণবশতঃ ঝগড়া হওয়ায় প্রণয়ের প্রতিফল স্বরূপ ইঁহাকে কৌশলে সিন্দুর খাওয়াইয়া ইহাঁর স্বর নষ্ট করিয়া দেয়। এই শোচণীয় ঘটনার পর সুব্রাতি মিঞা আর গাইতে পারিতেন না, একেবারে স্বরভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল।

৮ হৃদয়নাথ রায় :—ইনি ঢাকা মাণিকগঞ্জ মহকুমার শ্রীবাড়ী নামক গ্রামের কায়স্থ ভূম্যধিকারী দত্ত রায় বংশ সম্ভূত ছিলেন। ইহার পিতা ৮ দেওয়ান হরগোবিন্দ রায়। শ্রীবাড়ীর বর্ত্তমান জমিদার শ্রীযুত অক্ষয়নাথ রায় মহাশয় হৃদয় বাবুর পুত্র, এবং ঢাকা সাহিত্য পরিষদের সদস্য রায়সাহেব শ্রীযুত অমর নাথ রায় বি, এ, মহাশয় তাঁহার পৌত্র। হৃদয় বাবু বহু পশ্চিম দেশীয় সুবিখ্যাত ওস্তাদদের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেন। সব রকমের গানই গাইতেন, তবে খ্যাল গানেই তাঁহার বিশেষত্ব ছিল। পাবনা জিলা নিবাসী তদানীন্তন প্রসিদ্ধ ওস্তাদ রাজমোহন রায় দিল্লি হইতে গান শিক্ষা করিয়া আসেন, তাঁহার নিকটও হৃদয় বাবু গান অভ্যাস করেন। মুরশিদাবাদের স্বনাম ধন্য তবলচী হোসেনবক্স খাঁ বহুদিন হৃদয় বাবুর নিকট ছিলেন। ঢাকা ইছলামপুরে কতক দিন তাঁহার বাসা ছিল। বীণা, সেতার, এস্রাজ, সারঙ্গ, সেহালা, পাখোয়াজ, তবলা প্রভৃতি যন্ত্রে এবং কণ্ঠ সঙ্গীতে তিনি অতি বড় ওস্তাদ ছিলেন। রৌসনচৌকিও তিনি উত্তম বাজাইতে পারিতেন। একবার তিনি পাংসার জমিদার ভৈরবচন্দ্র রায় মহাশয়ের বাটীতে বিবাহের নিমন্ত্রণে যান। একদিন ভোরের সময় মই বাহিয়া নাগারচিদের নহবৎখানার মঞ্চে উঠিয়া অতি অপূর্ব্ব শানাই বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। এদিকে ভৈরব রায় মহাশয় প্রভাত রাগিনীর এমন সুমধুর আলাপ শুনিয়া নিদ্রোত্থিত হইলেন, এবং বিস্মিত হইয়া সকলকে বলিলেন "বেটারাত আর্জ বড় চমৎকার বাজাইতেছে"। কিন্তু গোলাব কলিকা যেমন ক্রমে বিকসিত হইয়া পরিণত সৌন্দর্য্যে ঢুলিতে থাকে, শানাইর মনমুগ্ধকর সুরে রাগিণীটি যখন তেমনই পরতে পরতে কৌশল বিস্তার করিয়া পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল এবং চারিদিকের স্নিগ্ধ প্রকৃতিকে সুরাবেশে ছাইয়া ফেলিল, তখন আর ভৈরব রায় কিছুতেই মনে করিতে পারিলেন না যে নাগারচীরা বাজায়। তিনি নিজেও সঙ্গীতে ওস্তাদ ছিলেন। বিশেষ অনুসন্ধানে যখন জানিলেন যে হৃদয় বাবুরই এ কাজ, তিনিই শানাই বাজাইতেছেন, ভৈরব বাবু তখনই সোৎসাহে মই বাহিয়া নহবৎখানায় উঠিলেন এবং নিজেও সেই সঙ্গীতে যোগ দিলেন।

ত্রিপুরার তদানীন্তন মহারাজা বাহাদুর এবং যশোহর চাঁচরার রাজা বরদা কণ্ঠ রায় মহোদয়গণ ছদ্মবেশে একবার হৃদয় বাবুর গান শুনিবার জন্য তাঁহার শ্রীবাড়ীর বাটীতে যান। ঢাকার রাজাবাবু এবং তৎসাময়িক নবাব হৃদয় বাবুকে সঙ্গীতের জন্য যথেষ্ট আদর করিতেন। বিখ্যাত গায়ক মধুকান্ন তাঁহার নিকট কিছুদিন সঙ্গীত শিক্ষা করেন।

ওস্তাদ রাজমোহন রায় এবং হৃদয় বাবু যখনই সঙ্গীত চর্চ্চা করিতেন সেই সময়ে হৃদয় বাবুদের এক আত্মীয় বেচু বাবু সেস্থানে উপস্থিত থাকিলে সঙ্গীত আরম্ভ হওয়া মাত্রই তিনি অন্যত্র চলিয়া যাইতেন। একদিন রাজমোহন রায় তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বেচু বাবু বলিলেন "তোমাদের ও ক্যাচর ম্যাচর আমার ভাল লাগে না।" তাহাতে রাজমোহন বাবু বলিলেন "আপনি কাল ভোরে অনুগ্রহ করিয়া আমার অনুরোধে আমাদের সঙ্গীত শুনিবেন।" কথামত ভোরে সঙ্গীত আরম্ভ হইল, বেচু বাবুও খুব মনোযোগের সহিত শুনিতে লাগিলেন। ক্রমে ভৈরবী রাগিনীর একটি গান শুনিয়া বেচু বাবু হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, এবং এমনই মুগ্ধ হইলেন যে তদবধি রীতিমত সঙ্গীত রস উপভোগ করিতেন। পূর্ব্বে কোন দিন মনোযোগ

দেন নাই, সে দিন যেই প্রাণ ঢালিয়া দিলেন অমনি অপার আনন্দে আকুল হইয়া পড়িলেন।

হৃদয় বাবু চৌকোশ লোক ছিলেন। বহু প্রকারের কলাবিদ্যায়ই তিনি অতি আশ্চর্য্য দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি নিজ হাতে পাখোয়াজ, তবলা, তানপুরা, সেতার, এস্রাজ, বীণ প্রভৃতি যন্ত্র অতি উৎকৃষ্ট-রূপে প্রস্তুত করিতে পারিতেন। ঢাকার সুবিখ্যাত শুকলাল মিস্ত্রী যন্ত্র নির্ম্মাণ বিষয়ে তার নিকট অনেক শিক্ষা করেন। হৃদয় বাবুর নিজ হাতের তইরি একটি গজদন্ত নির্ম্মিত বাক্স ও একখানি তলোয়ার এখনও আছে। তিনি অতি সুশ্রী পুরুষ ছিলেন। রীতিমত ব্যায়াম করিতেন এবং তাঁহার দেহে অমিত বল ছিল। টাকাগুলি ধরিয়া বুড়ো আঙ্গুলে টিপিয়া বেকা করিয়া ফেলিতেন। সাঁতার দিতে দিতে দুই হাতে দুইটি কলসী লইয়া জলপূর্ণ করিতেন এবং একটির পর একটি উর্দ্ধে তুলিয়া জল ফেলিয়া দিতেন। তিনি অতি সৎস্বভাব, বদান্য ও দয়াবান ছিলেন। কবিরাজি চিকিৎসায় তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি সখ করিয়া চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ছিলেন। ২।৩ জন কবিরাজকে বাড়ীতে রাখিয়া নানা প্রকারের ঔষধ প্রস্তুত করাইতেন এবং প্রার্থীদিগকে বিনামূল্যে বিতরণ করিতেন আর গরীব দুঃখীর চিকিৎসা করিতেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভাই রূপনাথ রায় মহাশয়ের উপর সংসারের সমস্ত ভারার্পণ করিয়া নিজে সঙ্গীত, শিল্প এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের চর্চ্চা করিতেন। তাঁহাদের সময়ে ঐ অঞ্চল হৃদয়নাথ ও রূপনাথ বাবুকেই লোকে বাবু বলিত।

হৃদয় বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র ঈশান বাবু তাঁহারই সঙ্গীত শিষ্য ছিলেন। ঈশান বাবু তখনকার ঢাকা ব্রাহ্ম সমাজে গান করিতেন। হৃদয় বাবুর পুত্র হরনাথ বাবু গানে প্রসিদ্ধ ওস্তাদ ছিলেন। শোনা যায় হরনাথ বাবুর মত গাইয়ে তাঁহার সময়ে এখানে আর কেহই ছিলেন না। তাঁহার এমন আশ্চর্য্য প্রতিভা ছিল যে তিনি পিতা এবং পিতৃসমীপাগত বড় বড় কলাবতকুলের সঙ্গীত আড়াল হইতে শ্রবণ করিয়াই উহা শিখিয়া ফেলিয়াছিলেন। পরে যখন তাঁহার নাম প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিল তখন একদিন তাঁহার পিতা নেপথ্যে তাঁহার সঙ্গীত শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন, এবং পুত্র ওস্তাদের সাহায্য বিনা কিরূপে তাঁহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গান শিখিল ইহা চিন্তা করিতে লাগিলেন, পরে যখন জানিলেন যে শুনিয়া শুনিয়াই হরনাথ এইরূপ অপূর্ব্ব কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন তখন আর তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। কিন্তু দুঃখের বিষয় হৃদয় বাবুর জীবিতাবস্থায়ই তদীয় গুণী পুত্রের মৃত্যু হয়। ১২৬৪ সালের শেষ ভাগে মাত্র ২২ বৎসর বয়সে দারুণ বসন্তরোগে হরনাথ অকালে ইহধাম ত্যাগ করেন। পুত্র শোকাতুর পিতৃহৃদয় এই ঘটনায় একেবারে মথিত হইয়া যায়। তিনি গান বাজনা একপ্রকার ছাড়িয়া দেন। ইহার পর তাঁহার পরিবারে আরও মৃত্যু এবং নানারূপ দুর্ঘটনা ঘটে। ছেলের মৃত্যুর কতকদিন পরে একদিন নিজের বাসায় হৃদয় বাবু মায়ফল করিলেন। সহরের বড় বড় কলাবৎ ও যন্ত্রীকুল সকলে সমবেত হইলে সবাইকে বলিলেন "ভাই, সব যন্ত্র মিলাও।" যন্ত্র মিল হইলে প্রাণ ভরিয়া নিজে সঙ্গীত করিলেন ও অন্যের সঙ্গীত শুনিলেন, এবং সেই দিন হইতে জীবনের তরে গান বাজনা পরিত্যাগ করিলেন।

১২৬৬ সনের আশ্বিন মাসে ৭মী পূজার দিন প্রায় ৪৮ বৎসর বয়সে পক্ষাঘাত রোগে পরম গুণী হৃদয়নাথ রায় মহাশয় ইহধাম ত্যাগ করেন।

৮ কানা গণেশ:—ইনি পশ্চিম বঙ্গের লোক। এখানে পাইনার বাসায় ছিলেন। সারঙ্গ ও তবলা বাজাইতেন। তবলা বাজাইতেন পা দিয়া। এজন্য কেহ কেহ আবার তাঁর নিন্দাও করিত। প্রায় ৪৮ বৎসর পূর্ব্বে ইনি জীবিত ছিলেন।

৺ কৃষ্ণ ঘোষ :—কায়স্থ সন্তান, নিবাস ছিল ঢাকা, চান্দহর গ্রামে। পাইনার বাসায় থাকিতেন। পশ্চিমে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। টপ্পা ও ঠুম্‌রি গাইতেন। ইনি কানা গণেশের সমসাময়িক ব্যক্তি।

৺ চৈতন দাস বাবাজি :—ইঁহার পিতা রাণাঘাট নিবাসী ছিলেন; পরে ঢাকায় বিবাহ করিয়া এখানেই স্থায়ী হন। চৈতন দাস এখানেই শিবু পাগল ও পাগ্‌লা হিঙ্গুর নিকট সেতার শিক্ষা করেন। উত্তম সেতার বাজাইতেন। খোল বাজাইয়া সুমধুর কণ্ঠে কীর্ত্তন গান করিতেন। ইঁহার ছেলে গোবিন্দ দাস খ্যাল ও টপ্পা গানে ওস্তাদ ছিলেন। তাহার কণ্ঠও অতি মিষ্ট ছিল প্রায় ৫৮ বৎসর পূর্ব্বে ইনি জীবিত ছিলেন।

৺ রতন দাস বাবাজি :—ইহার পিতার নাম ৺ নারায়ণ দাস বাবাজি। ইনি প্রথমে চৈতন দাস বাবাজির নিকট সেতার এবং কলিকাতার বেণী বাবু, হাইদার খাঁ ও মহাম্মদ খাঁ নামক ওস্তাদের নিকট এস্রাজ শিক্ষা করেন। তাঁহার সময়ে রতন দাস বাবাজিই এখানকার সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ সেতারী ছিলেন। ইনি ৪১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। প্রসিদ্ধ ধনী ৺ রূপলাল দাস মহাশয় ইহার নিকট সেতার শিক্ষা করেন। ঢাকার বর্ত্তমান সর্ব্বপ্রধান সেতারী শ্রীযুত ভগবান দাস ও শ্যামচাঁদ দাস বাবাজি ইহারই পুত্র। ৪৮।৪৯ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন।

সেতারী ৺ গুরুদাস সেন রায় :—ঢাকা রূপগঞ্জ থানার অন্তর্গত আমদিয়া গ্রামে বৈদ্য বংশে গুরুদাস সেন মহাশয় জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম ৺ কেবলকৃষ্ণ সেন রায়। ইনি ময়মনসিংহে পিতার নিকট থাকিয়া বাঙ্গলা-ও পারস্য ভাষা শিক্ষা করেন। পারস্য ভাষায় বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করেন; তাঁহার পার্শি হস্তাক্ষর অতি উৎকৃষ্ট ছিল। তাঁহার স্বহস্ত লিখিত অনেক পার্শি গ্রন্থ ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় গৃহদাহে সেগুলি ধ্বংশ হইয়া গিয়াছে। পিতার মৃত্যুর পর গুরুদাস কাহাকেও কিছু না বলিয়া বিদেশে চলিয়া যান। তিনি কোথায় গেলেন বহুদিন পর্য্যন্ত তাঁহা জানা যায় নাই। নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া পরে তিনি মুরশিদাবাদে আসেন এবং তথায় নবাব সরকারের একজন অতি উচ্চ শ্রেণীর সেতারীর নিকট সেতার শিক্ষা করেন। তিনি মুরশিদাবাদে আছেন এই খবর পরম্পরা শুনিতে পাইয়া তাঁহাদের বাড়ীর একজন শিকদার তাঁহাকে দেশে আনিবার জন্য মুরশিদাবাদ যায়। সেই শিকদার তাঁহাদের ভৃত্য হইলেও অভিভাবক স্বরূপ ছিল। তখনকার দিনের শিকদাররা এইরূপই ছিল বটে। শিকদার মুরশিদাবাদে পৌঁছিয়া বহু অনুসন্ধানে গুরুদাস সেতারী মহাশয়ের বাসায় গিয়া দেখিল যে তিনি বাসায় নাই। সে তাঁহার শয্যার উপরে নিদ্রার ভান করিয়া চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া রহিল। অল্পক্ষণ পরে গুরুদাস বাবু বাসায় ফিরিয়া দেখিলেন, কে একজন তাঁহার বিছানায় শুইয়া আছে। তিনি যেই চাদরটি উঠাইয়া ফেলিলেন, শিকদার অমনি উঠিয়া তাঁহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল এবং আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল, পরে অবিলম্বে তাঁহাকে লইয়া দেশে ফিরিল। এই ঘটনার কিছুদিন পরে তিনি ঢাকায় আসেন এবং পাগলা হিঙ্গুর নিকট সেতার শিখেন। কলিকাতার বিখ্যাত পাখোয়াজি ৺ কেশবচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের ও পাইনার ৺ হরিমোহন রায় মহাশয়ের সঙ্গে সেতার বাজাইতেন। তিনি বৈজ্ঞানিক প্রণালিতে সেতার শিক্ষা করেন, শুধু নকল করিয়া শিখেন নাই। এ অঞ্চলে তাঁহার ন্যায় সেতারী বিরল ছিল। তিনি বিশুদ্ধ রাগরাগিনীর আলাপ করিয়াই সুখী হইতেন। তিনি বলিতেন যে ক্রমশঃই সেতার বাজাইবার ঢঙ্গের পরিবর্ত্তন হইতেছে, গম্ভীর রাগ রাগিনীর বিশুদ্ধতা রক্ষার দিকে এখন আর ঝোঁক নাই, রঙ্গদার অলঙ্কার লাগাইয়া বাজাইতে পারিলেই লোকে বাহাদুরি মনে করে। তিনি তুলনা দিয়া বলিতেন "দেখ শালের পাকা রঙ

এখন আর কেহ পসন্দ করে না, এখন চক্‌চকে রঙেরই বাহার, উহাতেই লোক মুগ্ধ, সেতার সম্বন্ধেও ঐরূপ, কিন্তু আমার কাছে 'এ সব ভাল লাগে না। খাস্ রাগ রাগিনী আলাপ করিয়া যে গভীর আনন্দ পাই, চটক্‌দার অলঙ্কারে তাহার কিছুই পাই না।" তিনি সেতার বড় মধুর বাজাইতেন, হাত বড় মিঠে ছিল। লোকও বড় খোস মেজাজি ছিলেন। অতি নিম্ন শ্রেণীর কোন লোক আসিয়াও যদি তাঁহার সেতার শুনিতে চাহিত তথাপি তিনি অতি আনন্দের সহিত তাহাকে সেতার শুনাইতেন। তাঁহার আত্মতৃপ্তির জন্য বাজাইবার অন্য সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল। প্রতিদিন গভীর রাত্রে নির্জ্জনে বসিয়া তিনি সেতারে ঝঙ্কার দিয়া যখন রাগরাগিনী আলাপ করিতে করিতে উহাতে মগ্ন হইয়া যাইতেন, তখনই তাঁহার চরম ক্ষমতা প্রকাশ পাইত। স্তব্ধ গম্ভীর নৈশ প্রকৃতিও যেন তন্ময় হইয়া যাইত। করুণ মধুর স্বরগুলি যেন রনিয়া রনিয়া ধীরে ধীরে নীরব নক্ষত্র লোকের দিকে উঠিয়া যাইত।

ঢাকার বিখ্যাত যন্ত্র নির্ম্মাতা ৺ শুকলাল মিস্ত্রী মহাশয় গুরুদাস বাবুর সেতার শুনিয়া এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে নিজহাস্তে অতি যত্নের সহিত একটি অতি ক্ষুদ্রকায় উৎকৃষ্ট সেতার প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে উপহার দেন। সেতারটি লম্বায় পৌণে দুই হাতের বেশী ছিল না। গুরুদাস বাবুর ওটি বড় প্রিয় ছিল, তিনি অনেক সময় উহা রাস্তায় লইয়া বাহির হইতেন এবং চলিতে চলিতে রাগরাগিনী আলাপ করিতে থাকিতেন।

মানিক গঞ্জের জনৈক ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট গুরুদাস বাবুর সেতার শুনিয়া আগ্রহের সহিত তাঁহাকে নিয়া তত্রত্য ফৌজ দারির মহা পেস্কের কাজ দেন। তিনি অনেক দিন উক্ত কাজে ছিলেন। পরে ঐ পদটি উঠিয়া (abolish) যায় এবং তিনি বালিয়াটির জমিদার দিগুবাবুর সরকারে কার্য্যে নিযুক্ত হন। দিগুবাবুর সঙ্গে তিনি কাশী, গয়া, লক্ষ্ণৌ, মথুরা, শ্রীবৃন্দাবন, ও জয়পুর প্রভৃতি বহু স্থানে ভ্রমন করেন, এবং সর্ব্বত্রই সুমধুর সেতার বাদন জন্য বিশেষ ভাবে আদৃত হন। পশ্চিমের কোন একজন বড় ওস্তাদ তাঁহার বাজনা শুনিয়া তাঁহাকে বলেন "আপ্‌কো হাম্ বহোৎ শেখানে শক্তাহৈ, লেকেন্ য্যায়সা হাত হামারা কভি নেহি হোয়েগা।"

গুরুদাস বাবুর সম বয়সী ৺ দুর্গাদাস সেন নামক তাঁহার এক জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। দুর্গাদাস উৎকৃষ্ট তবলা বাজাইতেন। রাগরাগিনীতেও তাঁহার অধিকার ছিল। তিনি গুরুদাস বাবুর সঙ্গে সঙ্গীত করিতেন। শেষ বয়সে বাতে ধরায় গুরুদাস বাবুর হাত আর পূর্ব্বের মত দ্রুতবৎ চলিত না, কিছু ধীরে বাজাইতেন। প্রথম বয়সে তিনি গান ও করিতেন, কিন্তু শেষ বয়সে গলা ধরিয়া যায়। তিনি ঢাকার ৺ রতনদাস বাবাজির সঙ্গে সেতার বাজাইতেন। রতন দাসের পুত্র শ্রীযুত ভগবান দাস সেতারীর বাজনা শুনিয়া তিনি বড় খুসি হইতেন এবং তাহার হাতের মধুর তার অত্যন্ত প্রশংসা করিতেন। ১২৯২ সনের কার্ত্তিক মাসের প্রথম ভাগে ৭২ বৎসর বয়সে সামান্য জ্বর রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়। গুরুদাস বাবুর তিন পুত্র——প্রথম ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের ভূতপূর্ব্ব সর্ব্বপ্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভুবন মোহন সেন,* এবং তৃতীয় রাজসাহি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীযুত রাম মোহন সেন।

৺ হস্নু মিঞা—ঢাকা, মিঞা সাহেবের ময়দানে ইহার নিবাস ছিল। ইনি হবিব মিঞার শিষ্য। হস্নু মিঞা অতি প্রসিদ্ধ টপ্পা গায়ক ছিলেন। কণ্ঠ বড়ই মিষ্ট ছিল। সপ্তম সুরে গান গাইতেন। আগরতলায় মহারাজ বীরচন্দ্র মানিক্য বাহাদুরের দরবারে বেতন ভোগী গায়ক ছিলেন। ইনি পাইনার রাধিকা বাবুকে টপ্পা শিক্ষা দেন। রূপগঞ্জ থানার শ্রীযুত নরসিং ঠাকুরও ইহারই শিষ্য। প্রায় ৮০ বৎসর বয়সে হস্নু মিঞা পরলোক গমন করেন। এ বয়সেও ইহাকে সপ্তম সুরে গান করিতে শোনা গিয়াছে। প্রায় ১৩।১৪ বৎসর হয় ইনি মারা গিয়াছেন।

* দ্বিতীয় ঢাকা বারের সুপ্রসিদ্ধ প্রবীণ উকিল শ্রীযুক্ত কালী মোহন সেন

৺ সুপ্পন খাঁ—ইনি মিঠন খাঁর নাতি, নিবাস ঢাকা উর্দুবাজার। ইনি অতি প্রসিদ্ধ সুমধুর তবলা বাদক ছিলেন। সুপ্পন খাঁ, হোসেন বকস, মিয়া খাঁ, সালারি খাঁ, আবেদ আলি খাঁ এবং গোলাম আব্বাস প্রভৃতি পশ্চিম দেশীয় অতি উচ্চ শ্রেণীর ওস্তাদের নিকট তবলা শিক্ষা করেন। অতি উত্তম উত্তম বোল ইহার জানা ছিল। বোল পরণ বাজাইবার সময়ে যেন ফুল ফুটাইয়া যাইতেন। কত রকমে রকমে তেহাই দিয়া শ্রোতাদের মনোহরণ করিতেন তাহার অবধি নাই,—মনে হইত যেন একেকটি ফুলের ঝাড় বসাইয়া দিলেন। তিনি বড় খোস মেজাজি লোক ছিলেন। নিতান্ত আনাড়ি গাইয়েকেও অপদস্থ করিতেন না। ইনি ত্রিপুরার মহারাজকে তবলা শিক্ষা দিতেন। ঢাকার নবাব সার আবদুলগণি বাহাদুরের নিকট তিনি মাসিক বৃত্তি পাইতেন। প্রসিদ্ধ ৺ দুর্গাপ্রসাদ আলা ও তাঁতিবাজারের শ্রীযুত শশিমোহন বসাক প্রভৃতি তাঁহার শিষ্য। প্রায় ১৫।১৬ বৎসর হয় সুপ্পন খাঁর মৃত্যু হইয়াছে।

৺ কালী শীল:—ইনি তাঁতিবাজারে ছিলেন। জাতিতে নাপিত। "সীতার বনবাস" যাত্রার পালা রচনা করিয়া বেশ প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার অনেক গান ৺ নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "সঙ্গীত মুক্তাবলী" নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। অনুমান প্রায় ৫৫ বৎসর পূর্ব্বে ইনি জীবিত ছিলেন।

৺ একবারি খলিফা,
৺ সাকু মিঞা,
৺ ইমামবক্স মিঞা,
৺ গঙ্গারাম কর্ম্মকার।

ইঁহারা সকলেই উৎকৃষ্ট বেহালা বাদক ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে একবারি খলিফা ও ইমামবক্স মিঞা প্রায় ৪৮ বৎসর, গঙ্গারাম কর্ম্মকার প্রায় ৪৩ বৎসর এবং সাকু মিঞা প্রায় ৩৮ বৎসর পূর্ব্বে পরলোক গমন করেন।

৺ অমরচাঁদ শঙ্খবণিক—ইঁহার নিবাস ছিল ঢাকা শাঁখারী বাজার। ইনি ধ্রুপদী ছিলেন। ইনি অনুমান প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। ক্রমশঃ

শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত।

৺ রঘুনাথ গোস্বামী।

আজ যে সাধক শ্রেষ্ঠ পল্লী কবির জীবন বৃত্তান্ত সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম তিনি এতদঞ্চলবাসী আপামর সর্ব্বসাধারণের নিকট বিশেষ ভাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি কোন্ সময় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা ঠিক করিয়া বলা যায়না। তবে বর্ত্তমান সময় হইতে প্রায় ১৬০।১৭০ বৎসর পূর্ব্বে যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার বিশেষ প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। তিনি সংসারানসক্ত হইয়া নিজ বিষয় সম্পত্তি কালিয়াকুর নিবাসী ৺ দীনবন্ধু চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে দান করিয়া কালিয়াকুরের পূর্ব্বদিকে ৩ মাইল দূরবর্ত্তী প্রকৃতির বিচিত্রলীলানিকেতন শাল গজার বৃক্ষ পরিপূর্ণ নিবিড় অরণ্য প্রদেশে রাঙ্গামাটিয়া নামক স্থানে আশ্রম করিয়া শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। উক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে ১ম পুরুষ ধরিলে তাঁহার বংশধর ৪র্থ পুরুষ আজ আমরা দেখিতে পাই। ৩ পুরুষে ১০০ শত বৎসর ধরিলে গোস্বামী মহাশয়ের মৃত্যুর সময়কে আমরা বর্ত্তমান সময় হইতে প্রায় ১০০ শত বৎসর পূর্ব্বে ধরিয়া লইতে পারি। তাঁহার জীবিতকাল যদি ৬০।৭০ বৎসর হইয়া থাকে তাহা হইলে ১৬০।১৭০ বৎসর পূর্ব্বে যে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা ধরিয়া লওয়াটা অযৌক্তিক হইবে না। পক্ষান্তরে এদেশ নিবাসী অশীতিপর বৃদ্ধদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিয়াছি যে তাঁহারা যখন ৮।১০ বৎসর বয়স্ক বালক তখন এদেশে ৺ গোস্বামী মহাশয়ের নাম সাধারণ্যে খুব প্রচলিত ছিল এবং সেই সময়ের ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে যে তিনি মানবলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন এইকথা একবাক্যে সেই সময়ের সকলেই বলিতেন। এই দেশ প্রচলিত সর্ব্ববাদিসম্মত প্রবাদ বচন হইতেও নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে তিনি বর্ত্তমান সময় হইতে প্রায় ১০০ শতবৎসর পূর্ব্বে মানবলীলা সংবরণ করিয়া গিয়াছেন। দেশ প্রচলিত প্রবাদ বচন, বৃদ্ধদের মুখের কথা, জমিদারী সংক্রান্ত কাগজ পত্রকে ইতিহাস বা জীবনীর উপকরণ করিয়া

ঐতিহ্যতত্ত্বের আলোচনা করিলে যে ভ্রম প্রমাদে পতিত হইতে হইবে তাহা সকলেরই বিদিত।

ঢাকা জিলার অন্তর্গত তালিপাবাদ পরগণাস্থিত কালিয়াকুর একটী গ্রাম। ক্ষীণস্রোতা তুরগা ইহার উত্তর প্রান্ত দিয়া পূর্ব্ববাহিনী ও ইদানীং রুদ্ধস্রোতা বংশী (বংশাই) এই গ্রামের পশ্চিম প্রান্ত দিয়া দক্ষিণবাহিনী। গ্রামে ১টী থানা, ১টী সাবরেজিষ্টারী আফিস, ১টী পোষ্ট আফিস, ১টী সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয়, ১টী দৈনিক বাজার, ও ১টী নিঃ প্রাঃ বিদ্যালয় আছে। বহু কুম্ভকার এই গ্রামে বাস করিয়া থাকে। ২ ঘর ব্রাহ্মণ ২ ঘর সূত্রধর ও অল্প সংখ্যক মুসলমানও এখানে অবস্থান করে।

এই গ্রামেই মহাত্মা ৺রঘুনাথ গোস্বামী জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৺জয়কৃষ্ণ গোস্বামী। মাতার নাম ৺নারায়ণী দেবী। পূর্ব্বে এদেশে কন্যাপণ প্রথা প্রচলিত ছিল। অর্থাভাব প্রযুক্ত তিনি নিজব্যয়ে বিবাহ করিতে অসমর্থ হইয়া, নিজ ভাগিনেয়ীকে বিনা পণে বিবাহ দিয়া তৎপরিবর্ত্তে সেই ঘরে বিবাহ করেন। বিবাহের কিছুদিন পরেই তাঁহার স্ত্রী নিঃসন্তানা অবস্থায় পরলোক গমন করেন। এই আকস্মিক দৈব বিপদপাতে তাঁহার মনে দারুণ আঘাত লাগে এবং মন ক্রমশঃ সংসারানসক্ত হইয়া পড়ে। পরিশেষে মনে একান্ত বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়। তখন নিজ বিষয় সম্পত্তি পূর্ব্বোক্ত দীনবন্ধু চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে দিয়া কিছুদিন নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। তৎপর বেতিলা নিবাসী পরম ভাগবত ৺মাণিকচাঁদ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট জপমালা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সঙ্গে নিয়া ৭।৮ বৎসর কাল ভারতের নানাতীর্থে পর্য্যটন ও ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন পূর্ব্বক কবিরাজ ৺কিশোর সরকার, ৺রামকুমার দাস, ৺রামগোবিন্দ ঘোষ, ৺দশরথ বাউল, ৺ফতুচাঁদ বাউল, ৺প্রেমচাঁদ বাউল, ৺রাধাচরণ বাউল, ৺গুরুচরণ বাউল প্রভৃতি মহাপুরুষগণকে সঙ্গে লইয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন। দেশে আসিয়া নিজ বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া রাজা মাটিয়া গ্রামে আশ্রম স্থাপন করেন এবং উক্ত ভক্ত মহাপুরুষগণের সহিত শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। এই সময় হইতেই তাঁহার রচনায় অধিকার জন্মে। তাঁহার ৺গৌরাঙ্গ বিষয়ক, রূপরস, বিচ্ছেদ, মিলন, উপাসনা, দেহতত্ত্ব, ষড়চক্র, সংকীর্ত্তন, বাউলিয়া প্রভৃতি নানা বিষয়ক বহু গান এদেশে অদ্যাপি সর্ব্বসাধারণে অতি আদরের সহিত ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে গান করিয়া থাকে। আমরা তাঁহার বহু গান সংগ্রহ করিয়াছি। প্রতিভার পাঠক মহাশয়গণকে কয়েকটী গান উপহার না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি নিজেও একজন শ্রেষ্ঠ গায়ক ছিলেন। স্বরচিত পদগুলি বিশুদ্ধ তাল লয় সংযোগে গভীর ভাবাবেশে যখন গান করিতেন তখন আপামর সর্ব্বসাধারণ মন্ত্র মুগ্ধবৎ হইয়া শুনিত। অতি পাষাণ হৃদয়ও দ্রব হইয়া যাইত। "রঘুর মত গায়ক" এই বাক্যটী এদেশে এখনও প্রচলিত আছে। ইহাদ্বারাই তাঁহার গান করিবার শক্তির মহিমা অদ্যাপি ঘোষিত হইতেছে।

তিনি যখন যেস্থানে যে অবস্থায় অবস্থান করিতেন তখন সেই স্থানেই ভাবাবেশে গান রচনা করিতেন। সঙ্গীয় লোকেরা তাহা লিখিয়া রাখিতেন। রাত্রি দ্বিপ্রহরে হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইল অমনি তৎক্ষণাৎ গান রচনা করিয়া গৃহ ভিত্তিতে কাঠিদিয়া অন্ধকার মধ্যেই লিখিয়া রাখিতেন। পরদিন ভক্তগণ তাহা লিখিয়া লইতেন।

(১) মনরে বৈরাগ্য ক'রে ত্বরাও আমারে পারে ধ'রে বলি বারে বারে।

১। জ্ঞান জলে স্নান ক'রে, ভাবের ডোর কৌপিনপ'রে, ভক্তি বহির্ব্বাসে ঘিরে রে'খ কটিপরে, সৌভাগ্য তিলক দিয়ে, প্রেম টুপিতে শির সাজাইয়ে, চিন্তাকাঁথা গলে দিয়ে, কাঙ্গাল হ'য়ে ডাক তারে।

২। গৌরপদে আখড়া ক'রে, সেই আখড়াতে থাক প'ড়ে, পাঁচ ছয় বৈরাগী ক'রে, বেঁধে থাক ঘরে, তারা সবে ভিক্ষায় যাবে, সুধামধু এ'নে দিবে, সুধাখে'য়ে ক্ষুধা যাবে, তবে অমর হবেনা রে।

৩। আশাঝুলি স্কন্ধে ক'রে, বিনয় করঙ্গ ধ'রে, সুধা মধু ভিক্ষা ক'রে রে'খ স্তরে স্তরে, তৃষ্ণা থাকে মধু খুঁ'য়ে আয়োপেক্ষে

চিত্ত দিয়ে, মধু খে'য়ে মত্ত হ'য়ে বেড়াও খে'য়ে প্রেম খুঁজারে।

৪। রঘুনাথে ভেবে বলে, মনের বৈরাগ্য ন'লে, কি হবে কৌপিন পরিলে, বেশ ধ'রে কি তরে, প্রশস্ত রাখালের বেশে, রাখালে মিশিল এ'সে, স্বভাব হে'রে অবশেষে', কৃষ্ণ তারে প্রাণে মারে।

(২) সাক্ষাতে বস্তু থা'ক্‌তে চিন্‌লি নারে "ও" দিন কানা। যার সাথে, বেড়াও জগতে, তার সাথে তোর নাই ঠিকানা।

(১) আচার বিচার ক'রেছিলি, কত সন্ধ্যা পূজা জপ জপিলি, নর্ত্তন কীর্ত্তন করিলি, বর্ত্তমানে কেও এ'লনা, আপন গুরু না চিনিলি, পরের মে'য়ে ধ'রে সে'ধেছিলি, পরের হাতে প্রাণ সপিলি পর কখন আপন হ'ল'না।

(২) সিদ্ধি নামে শিক্ষা ক'রে ওমন না দেখিয়ে ভাব্‌লি কারে, অনুমানে ভাব্‌লি যারে সে এ'সে দেখা দিলনা। রঘু বলে শাস্ত্র ছাড়, মানুষের সঙ্গধর, মানুষের সঙ্গ হ'লে পূরিবে মনের বাসনা।

(৩) শুক্‌নায় তরী সুখে চলে, কলের তরী গঠন বিধি করেছে কলে।

১। আছে তরীর মধ্যে দাড়া, বন্ধে বন্ধে জোড়া, গুড়া চাড়া বিধি কতই দিলে, তরীর দুই চাকা যায় হে'টে, দুই হাত দুই বইঠে, গলইর পরে দুইটা মাণিক জ্বলে।

২। তরীর মন হয় কাণ্ডারী, ছয়জনা হয় দাঁড়ী সারি সারি ব'সে দাঁরিবলে, তাতে ব'সে মনুরায় হে'সে হাল ঘুরায়, যে দিক চালায় তরী সেই দিক চলে।

৩। গোসাঞি রঘুনাথে কয়, তরী মিথ্যাময়, আত্মা সত্য হয়, নিত্যস্থলে ইহা ব'লেছে গোসাঞি; ব্রহ্মাণ্ডে যা নাই, তরীর মধ্যে তাই খুঁজ্‌লে মিলে।

(৪) দেখ ভাই উল্টা গাছ চ'লেছে।

১। গাছে উল্টা শাখা উল্টা শিকড় উল্টা সকল ডাল মে'লেছে। কি খেলা, কি আজবলীলা, দেখ গাছের রূপে প্রাছু ফু'টেছে।

২। গাছে উল্টা লতায় আছে জড়ি, অ তার উল্টা ফুলে পাঁচ পাপ্‌ড়ি, চা'র ফুলে চন্দ্র কুঁড়ি, সারি সারি বাগ ক'রেছে।

৩। পাখীসব থাকে বাসায়, তারা বাস করে আহারের আশায়, পাখীর আহারের লাগি পাকাকাঁচা ফল ধ'রেছে।

৪। সাত কোটর গাছের গোড়ে, চা'র পাখী তার চলে ফিরে তিন কোটরে কপাট পড়ে চার কোটর খোলাসা আছে।

৫। সাত বিঘা গাছের নিয়ম, আছে নয় কোটরে গাছের গঠন উপড়ে দুই কোটরে জল ঝরে আর মল গ'লেছে।

৬। যখন হয় মদন ঝড়ি, গাছে গাছে হয় জড়াজড়ি, ভূমে যায় গড়াগড়ি, বোটাছিড়ে ফল পড়েছে।

৭। সাধু সে ফল কুড়ায়, আপ্‌নে খায়, আর পরকে বিলায়, ফল আশে রঘু বসে, রাধাকৃষ্ণ নাম জ'পেছে।

(৫) আমার মন খে'লেছ কি খেলা, ঐ দেখ ভবের খেলা সাঙ্গ হ'ল। ভবের খেলা সাঙ্গ হ'ল ঐ দেখ বেলা অস্ত গেল।

১। খেল্‌তে এ'লেম আশার পাশা, দান প'লনা ভগ্নদশা, আমি কার উপরে কর্‌ব গোসা, আট গুটি মোর কাঁচা'রল।

২। দশ ছয় আঠার ষোল, যোগে যোগে এ'লেম ভাল, ও মন যখন গুটি ঘরে যাবে, বে-দানে পাঞ্জুড়ি প'ল।

৩। তিন "প" র কালে হয় "প" বার, তেরর বেলায় কচ্চে বার, গোসাঞি রঘুবলে পাশা ছাড়, পাশা বে'দ্ধে হরিবল।

অধিক গান দিয়া পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে ইচ্ছা নাই। তাঁহার ভণিতাযুক্ত পঞ্চদশ সর্গে সমাপ্ত আধ্যাত্মিক ভাবে পরিপূর্ণ সংস্কৃত "জ্ঞান কল্প" নামক হস্তলিখিত একখানা প্রাচীন পুথি আমরা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

পুস্তকখানার ভাব ও ভাষা দৃষ্টে লেখকের গভীর ভগবদ্ ভক্তি ও রচনা নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। যে যে বিষয়ের

বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে "জ্ঞান কল্প" লেখকের জ্ঞানকে আমরা বাস্তবিকই "জ্ঞানকল্প" আখ্যা দিতে বাধ্য। তত্ত্ব জিজ্ঞাসু ভক্তের পক্ষে পুস্তকখানা অমূল্য রত্ন। গ্রন্থে জীব জিজ্ঞাসু। মনঃ উত্তর দাতা।

১ম সর্গে—দেব দেবীর বন্দনা। ২য় সর্গে—সত্ত্বঃ রজঃ তমঃ এই তিন ধর্ম্ম বিষয়ের বর্ণনা। ৩য় সর্গে—দেহের বর্ণনা। ৪র্থ সর্গে—গুরু বিষয়ক বর্ণনা। ৫ম সর্গে—রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক বর্ণনা। ৬ষ্ঠ সর্গে–সম্ভোগ স্বপ্ন বর্ণনা। ৭ম সর্গে—শ্রীশ্রীরাধাস্তুতি। ৮ম সর্গে—শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্তুতি। ৯ম সর্গে—শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ বর্ণনা। ১০ম সর্গে—শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ রূপগুণ বর্ণনা। ১১শ সর্গে—৺নরোত্তম জন্মদীক্ষাদি বর্ণনা। ১২শ সর্গে—বিগ্রহ সেবা। ১৩শ সর্গে—রাগভক্তি বর্ণনা। ১৪শ সর্গে—জন্ম মৃত্যু বর্ণনা। ১৫শ সর্গে—১ম সর্গ হইতে ১৪শ সর্গ পর্য্যন্ত সর্গগুলির বর্ণিত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও স্তুতি। বারান্তরে এই সংস্কৃত পুস্তকখানার বিষয় আলোচনা করিতে প্রবৃত্তি রহিল।

আমাদের দেশের প্রত্যেক মহাপুরুষের সম্বন্ধেই নানা অলৌকিক কথা প্রচলিত আছে। ইঁহার সম্বন্ধেও সেইরূপ অনেক কথা দেশে প্রচলিত আছে। তাঁহার সঙ্গে একটী ৺গোপাল বিগ্রহ ছিল। বিগ্রহের নিয়মিত পূজা করিয়া সেই প্রসাদ মাত্র ভক্ষন করিতেন। অনেক কঠিন রোগগ্রস্ত ব্যক্তি রোগ মুক্তির জন্য তাঁহার নিকট আসিত। তিনি রোগীগণকে উক্ত ৺ বিগ্রহের সম্মুখে গড়াগড়ি দিতে বলিতেন। রোগীগণও সেই প্রকার করিয়া রোগ মুক্ত হইত। কথিত আছে তিনি এই প্রকারে বহু রোগীকে রোগমুক্ত করিয়া দিতেন। তিনি যখন গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া যান সেই অবধি আর গৃহীর ধর্ম্ম, সামাজিক আচার ব্যবহার মানিতেন না। কথিত আছে:—সাবাজপুর নিবাসী ৺ গোবিন্দমোহন বিশ্বাস (ব্রাহ্মণ) মহাশয় একদিন কোনও কার্য্যব্যপদেশে রাঙ্গামাটিয়াতে ৺ গোস্বামী মহাশয় আশ্রমে উপস্থিত হন। ৺ গোস্বামী মহাশয়ের বিশ্বাস মহাশয়কে আহার করিতে অনুরোধ করেন। তিনি যার তার হাতে খান, এই মনে করিয়া বিশ্বাস মহাশয় খাইতে অস্বীকৃত হন। ৺ গোস্বামী মহাশয় ইহার অর্থ বুঝিতে পারিয়া বলিলেন:—"বিশ্বাস মহাশয় আপনি ব্রাহ্মণ, আমার অন্ন আহার করিতে সংশয় করিতেছেন, অন্ন শোধন করিয়া আহার করুন।" তিনি তাহাতেও অস্বীকৃত হন। তৎপর সকলেই দেখিতে পাইলেন যে ৺ গোস্বামী মহাশয় অন্ন শোধন করিতে বসিয়াছেন। সেই পক্ক অন্নের উপর অগ্নিদেব শত জিহ্বা বিস্তার করিয়া জ্বলিতেছেন। এই ঘটনাতে সকলেই অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন ও তাঁহাকে সাধক শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ বলিয়া বিশ্বাস করিলেন। তিনি কুম্ভক করিয়া জলের উপর ভাসিয়া নদীর এক বাক ছাড়াইয়া অন্য বাকে যাইয়া উপস্থিত হইতেন। দর্শকমণ্ডলীতে নদীর উভয় তীর পরিপূর্ণ হইয়া যাইত।

তিনি প্রতি বৎসর ৩ দিন ব্যাপী একটী মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিতেন। তাহাতে নানা দেশ হইতে অনেক সাধু সন্ন্যাসীর আগমন হইত। তাঁহার সঙ্গীয় ভক্তগণ সহ তিনি এই দিবসত্রয় শ্রীশ্রীনামকীর্ত্তন, মহাপ্রসাদ বিতরণ, দরিদ্র ভোজন প্রভৃতি কর্ম্ম করিয়া নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিতেন। যে বৎসর তিনি মানবলীলা সংবরণ করিয়া তাঁহার সাধনোচিত ধামে মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন, সেই বৎসর পর্য্যন্ত এই বার্ষিক ক্রিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন।

বঙ্গের কত স্থানে এইপ্রকার কত মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া নিজ কর্ম্মদ্বারা দেশের কত উপকার করিয়া গিয়াছেন, কে তাহার সন্ধান লয়? ক্ষুদ্র লেখকের লেখা পাঠ করিয়া যদি কেহ এই প্রকার লোকের জীবনী আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হয়, তবে লেখক নিজকে কৃতার্থ মনে করিবে।

শ্রীমহিমচন্দ্র নন্দী।

কল্যাণ-পরশ।

ধন্য করিলে জীবন আমার
স্নিগ্ধ মধুর পরশ-দানে,
উজ্জ্বল তব উজ্জ্বল রূপ
ভাতিল দেবতা আমার প্রাণে।
সফল হইল ঊষর হৃদয়,
টুটিল আঁখির অন্ধ-ঘোর;
হে প্রিয় তোমার পরশ লভিয়া
হরষে ভরিল পরাণ মোর।
চির মধুময় কল্যাণ ওগো—
লহ বন্দনা হৃদয় কান্ত,
বিতরি আশীষ লক্ষ ধারায়
তাপিত জীবন করিলে শান্ত।

শ্রীভক্তিসুধা রায়।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

সরল সঙ্গীত ও হারমোনিয়াম শিক্ষক, প্রথমভাগ, মূল্য ১৸৵০ এবং দ্বিতীয় ভাগ, মূল্য ১।০ শ্রীযুত রজনীকান্ত রায় দস্তিদার, এম্, এ, প্রণীত। এই গ্রন্থ দুইখানির ছাপা, কাগজ, এবং বাঁধান উত্তম। এই গ্রন্থের প্রথম ভাগের প্রথম হইতে পঞ্চম পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত পরে পরে সপ্তস্বর, মাত্রা, তাল, ধরজ পরিবর্তন, রাগরাগিনীর ঠাঁট, এবং উহাদের পরিচয়, ও বাদী, বিবাদী সুর প্রভৃতির সম্বন্ধে অতি সরল ভাষায় গ্রন্থকার যে প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা দিয়াছেন উহা বাস্তবিকই উপাদেয় হইয়াছে। এই উপদেশানুযায়ী অভ্যাস করিলে কণ্ঠসঙ্গীত ও হারমোনিয়াম যন্ত্রে অনেকটা প্রবেশ লাভ হইবে। স্বরলিপিগুলি, প্রথমেই কণ্ঠে বা যন্ত্রে অভ্যাস করিবার চেষ্টা না করিয়া আগে ওগুলিকে মাত্রা দিয়া কেবল শুদ্ধরূপে পাঠ করিবার উপদেশটি অত্যন্ত উপযোগী। প্রথম ভাগে যে সকল গানের স্বরলিপি দেওয়া হইয়াছে উহা বেশ সহজ, পরিশিষ্টে যে কএকটি তান দেওয়া হইয়াছে উহাও অনায়াস-সাধ্য। প্রথমশিক্ষার্থীগণ অতি অল্প সময়ের মধ্যে এইগুলি আয়ত্ত করিতে পারিবেন।

গ্রন্থকার ললিত, বেহাগ, ও বেহাগড়া রাগিণীকে খাড়ব (ছয় সুরের) জাতীয় বলিয়াছেন, এবং ভৈরবীতে প্রকৃত "রি" সুর লাগে লিখিয়াছেন। এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। ললিত, বেহাগ, ও বেহাগড়া—"সম্পূরণ" জাতীয় রাগিণী বলিয়া অনেকেই বলেন এবং সেই ভাবেই গাইয়া থাকেন। ভৈরবীতে প্রকৃত রেখাব সুর বহু ওস্তাদই লাগান না। এ কথা-গুলি গ্রন্থে উল্লেখ করা উচিত ছিল। বেহাগ রাগিণীতে গ্রন্থকার নিজেই এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের ৮৭ পৃষ্ঠায় সুবিখ্যাত "তারা পরমেশ্বরী, কখন পুরুষ হও মা,কখন ষোড়শী নারী" এই আস্থায়ী যুক্ত গানটিতে সম্পূর্ণ সাতটি সুর ব্যবহার করিয়াছেন।

ভৈরব রাগ ভোরে গাওয়াই এ দেশের প্রচলিত রীতি। উহার সময় বেলা প্রথম প্রহর পর্য্যন্ত কি? ঝিঁঝিট ও পিলু, ক্ষুদ্র রাগিনী বটে, কিন্তু ঐ সকল রাগিনীরও ধ্রুপদ আছে; যথা:—"ভেরোই নয়না বান" (ঝিঁঝিট), এবং "ছত্রপতি আকবর" (পিলু)। প্রথমোক্ত ঝিঁঝিটের ধ্রুপদটির সুরেই রবীন্দ্রনাথের ঝিঁঝিট রাগিনীর "তোমার মধুররূপে ভরেছ ভুবন" এই বিখ্যাত গানটি রচিত হইয়াছে। ঝিঁঝিটের আর একটি নাম "সোহাগিনী", এই রাগিনী সকল সময়েই গাওয়া যায় এরূপ একটি মতও আছে। বারোয়ার ধ্রুপদ অবশ্য আমরা শুনি নাই। কিন্তু একেবারেই নাই এমন কথা কি করিয়া বলা যায়?

গ্রন্থকার তদীয় গ্রন্থের প্রথম ভাগের তৃতীয় পৃষ্ঠার পাদটিকায় লিখিয়াছেন:—"কেহ কেহ বলেন, ঐ সকল যন্ত্রের (হারমোনিয়াম্, পিয়ানো) সুরগুলি হিন্দু সঙ্গীতের উপযোগী নহে। কিন্তু এই কথার কোন মূল্য নাই। উপপত্তিক ও সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক হিসাবে হারমোনিয়াম বা পিয়ানোর সুরগুলির কিঞ্চিৎ উচ্চ নীচ হইলেও, এই উচ্চতায় বা নীচতার সামান্য প্রভেদ কর্ণে উপলব্ধি হয় না

এবং শ্রুতি কটুও হয় না, এবং এই সকল যন্ত্রের সুর সাহায্যে হিন্দু সঙ্গীত শুদ্ধরূপে গীত বা বাদিত হইতে পারে। অবশ্য এই সকল যন্ত্রে মিড়, কম্পন ইত্যাদি গানের অলঙ্কার প্রকাশ করা যাইতে পারে না, কিন্তু এই সকল যন্ত্রের সুর বিশুদ্ধ সঙ্গীতের অনুপযোগী নহে।" আমরা বলি এই সকল যন্ত্রের সুর ভারতীয় উচ্চাঙ্গের বিশুদ্ধ সঙ্গীতের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। মিড় কম্পন ছাড়া হিন্দু সঙ্গীত কি পদার্থ? উহা সুঠাম মানব দেহের ত্বকমাংসহীন কঙ্কালেরই মত, চঞ্চল গামিনী কল্লোলিনীর মধুর কুলু কুলু ধ্বনির পরিবর্ত্তে স্বর্ণকারের হাতুরি পেটা শব্দেরই মত, কালিদাসের "পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার" পরিবর্ত্তে উহার পুষ্পপল্লব শূন্য লীলায়িত সঞ্চরণহীন চাঁছা ছোলা আকৃতিরই মত নহে কি? ভারতীয় সঙ্গীতের যাহা বিশেষত্ব সেই মিড় কম্পনই যদি বাজান না গেল তবে হারমোনিয়াম বা পিয়ানো যন্ত্র কি করিয়া এই সঙ্গীতের উপযোগী হইল? হিন্দু সঙ্গীতে ব্যবহৃত ২২টি শ্রুতি হারমোনিয়াম যন্ত্রে নাই, শ্রুতির ব্যবহার ছাড়া হিন্দু সঙ্গীত "শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্য গ্রে" বৎ শ্রবণ কঠোর। তা ছাড়া অতি কোমল, তীব্র কোমল সুরগুলি উক্ত যন্ত্রে বাজান চলে কি? তবে কি করিয়া রাতপুরিয়া, কানাড়া, হিন্দোল, মালকোশ, টোরী বা আশাবরী প্রভৃতি রাগরাগিনীগুলি শুদ্ধরূপে হারমোনিয়ামে বাজান সম্ভব হয়? উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত না শিখিয়া সাধারণ গান বা ইংরেজি সুরের ঢঙ্গে যে সকল আধুনিক গান বাহির হইয়াছে সেই সকল গান যাহারা বাজাতে চান তাহাদের কাজ হারমোনিয়ামে চলে বটে, এই পর্য্যন্ত।

তার পরে গ্রন্থের অন্যত্র লেখা হইয়াছে যে, হারমোনিয়াম যন্ত্র দ্বারা "সঙ্গীতে অধিকার জন্মে।" রাম বলুন! হারমোনিয়াম যন্ত্রের দ্বারা সুরবোধই হয় না তা "সঙ্গীতে অধিকার", সে ত অনেক বড় কথা। এ যন্ত্র বরং শক্তি নষ্টই করে। দেখুন একজন মহানুভব ইংরেজ সঙ্গীতজ্ঞ হারমোনিয়াম সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন:—"If the Mahomedan "star" singer knew that the harmonium which he accompanies himself was ruining his chief asset, his musical ear, ...(he) would pause before (he) laid such sacrilegious hands on saraswati"—page 16, Music of Hindusthan by A. H. Fox Strangways, Oxford, Clarendon press. সুরবোধ হওয়ার জন্য আমাদের পুরাতন তানপুরাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

তৎপরে গ্রন্থকার রাগরাগিনী গাওয়ার সময় সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নিতান্ত অসমীচীন। তিনি লিখিয়াছেন "সকল সময়েই সকল রাগিনী গাওয়া যাইতে পারে।" শেষ রাত্রির রাগিনীগুলি হইতে আরম্ভ করিয়া বেলা ৮টা পর্য্যন্তের রাগিনীগুলিতে আস্তে আস্তে কোমল-সুর ব্যবহার করিয়া কোমল হইতে গম্ভীর এবং গম্ভীর হইতে কোমলে ঠিক প্রকৃতির সঙ্গে মিল রাখিয়া কেমন মনোরম ভাবে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। পরে ক্রমে প্রকৃত সুরের ব্যবহার করিয়া আবার ধীরে ধীরে ভাটি বেলায় কোমল সুর প্রয়োগ করিয়া সন্ধ্যায় গিয়া পৌঁছান হইয়াছে। পুনরায় সন্ধ্যার পর হইতে ক্রমে শেষ রাত্রির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বুঝিয়া বুঝিয়া প্রকৃত ও কোমল সুরের ব্যবহার। প্রত্যেক সময়েই নিসর্গের সঙ্গে সুর বাঁধা। যাঁরা এসব করিয়া গিয়াছেন, প্রকৃতির সঙ্গে তাঁদের বড় মাখামাখি ছিল, তাঁহারা যেমন প্রকৃতিকে তাঁহাদের কাব্যে, গানে ও জীবনে একীভূত করিয়া নিয়াছিলেন, তেমন আর কেহ করে নাই। রাগ রাগিনী গাওয়ার সময় সম্বন্ধেও তাঁহাদের ব্যবস্থা আশ্চর্য্য প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণের ফল, উহা না বুঝিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। রাগরাগিনী অসময়ে গাইলে গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা হয় না বটে, কিন্তু সঙ্গীতের মাধুর্য্য হত্যা হয়।

সরল সঙ্গীত ও হারমোনিয়াম শিক্ষকের দ্বিতীয় ভাগে অনেকগুলি ভাল ভাল গানের অতি সহজ স্বরলিপি দেওয়া হইয়াছে। এই স্বরলিপির সাহায্যে অনায়াসে গানগুলি অভ্যাস করা যায়। এই গ্রন্থের ১৭ পৃষ্ঠায় "জেনেছি জেনেছি তারা তুমি জান ভোজের বাজি, যে ভাবে যে তোমায় ডাকে

তাতে তুমি হও মা রাজী।" এই প্রসিদ্ধ গানটির প্রচলিত সুরটি দিলেই ভাল হইত।

সমালোচনা করিতে যাইয়া কর্ত্তব্য বোধে কএকটি অপ্রিয় মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইলেও উপসংহারে গ্রন্থকার মহাশয়কে তাঁহার এই অতি সহজ বোধ্য দুই ভাগ গ্রন্থের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। সঙ্গীত শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের বাঙ্গলা ভাষায় কম গ্রন্থই আছে, তাঁহার এই বই দুইখানি দ্বারা প্রথম শিক্ষার্থীদিগের বিশেষ উপকার দর্শিবে।

ঠাকুরমা'র কথা।

(৩)

সেকালের ছাত্র।

চারিদিকে চতুষ্পাঠীর ছাত্রগণের মধ্যে আমার জন্ম,—তাহাদেরই মধ্যে এতদিন কাটাইয়াছি। আমাদের কর্ত্তা পণ্ডিত,—তাঁহার চতুষ্পাঠী ছিল প্রায় ৩০ বৎসর। আমার কাকা বিদ্যামণি মহাশয়ের টোল দেশ বিখ্যাত। তা ছাড়া রামলোচন সিদ্ধান্তের টোল, আমার ভাই বিশ্বনাথ বিদ্যারত্নের টোল—আমার ছেলের টোল, গ্রামে তর্কভূষণের টোল, প্রভৃতি আরো ৫।৬টী টোল ছিল এবং বহুসংখ্যক ছাত্র তাহাতে অধ্যয়ন করিত। আজীবন এই সকল ছাত্রদের কার্য্যকলাপ দেখিয়াছি। সুতরাং আমি তাহাদের অনেক কথাই জানি। তাহাদের রীতি নীতি আচার ব্যবহার আমার মত অনেকেই জানেন না।

সেকালের ছাত্রেরা আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মপরায়ণ, পরস্পর সহানুভূতি সম্পন্ন, নৈতিক আচার নিষ্ঠ ও কান্তিমান্ ছিল। কি সুন্দর স্বাস্থ্যযুক্ত ছেলেরা এক একটা চতুষ্পাঠী আলো করিয়া থাকিত। তাহাদের কলহাস্যে আমাদের প্রাঙ্গন আনন্দময় হইয়া উঠিত। বাস্তবিক ছাত্র বলিতে তাহারাই ছিল। ছাত্রেরা ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া স্তব পাঠ করিত। মুখ ধুইয়া সন্ধ্যা বন্দনা করিয়া কেহ ফুল বেলপাতা আনিতে যাইত, কেহবা পড়িতে বসিত। কিন্তু সকলেই সন্ধ্যা বন্দনা করিত। তিলক কাটা, ত্রিসন্ধ্যা, পূজা, ব্রত উপবাস ছাত্রগণের কর্ত্তব্যের মধ্যে ছিল। তারপর পড়া আরম্ভ হইত।

চতুষ্পাঠী ঘরে—দরজার দুইদিকে চাটাইর উপর পাটীদিয়া অর্দ্ধবরময় বিছানা করা হইত। বিছানার সম্মুখে মোটা সরল ও চাঁছা ছোলা একটী বাঁশ দিয়া সীমানা ঠিক করা থাকিত। আর তিন দিক দিয়া তিন খানি করিয়া বাখারি বাঁধা থাকিত। উহার নাম ছিল—'লাখিকুড়া'। উহাতে ছেলেরা হেলান দিত এবং হুড়াহুড়ির বিপদ হইতে বেড়া রক্ষা করিত।

ছাত্রেরা তারস্বরে পাঠ আবৃত্তি করিত। কি সুন্দর সেই সুর। কি আনন্দ হইত সেই আবৃত্তি শুনিয়া। বেলা দশটা পর্য্যন্ত সেই আবৃত্তি চলিত,—তারপর "পাঠ চাওয়া" বা "বিশদ ব্যাখ্যা" আরম্ভ হইত। এই 'পাঠ চাওয়া' ব্যাপারে সময় সময় মনে হইত যেন দেবাসুরের যুদ্ধ লাগিয়া গিয়াছে। অধ্যাপকে ছাত্রে তখন মহাতর্ক লাগিত। অধ্যাপক ছাত্রের বুদ্ধির পরখ করিতে যাইয়া সময় সময় ভুল বুঝাইতেন, বুদ্ধিমান ছাত্র তাহা ধরিয়া ফেলিত। তখন উভয় পক্ষে তর্ক যুদ্ধ হইত। কখনওবা অধ্যাপকের খাঁটী ব্যাখ্যাতে দোষ দিয়া ছাত্র নূতন অর্থ করিয়া লড়াই করিত। কোন দিন যদি সেই তর্কে জোর বাঁধিত তবে ২।৩ টার পূর্ব্বে স্নানাহার হইত না। আর একবার পাঠ চাওয়ার সময় ছিল—রাত্রি কাল। রাঁধা বাড়া করিয়া ভাত লইয়া বসিয়া থাকিতাম—যুদ্ধে ক্ষান্ত না হইলে খায় কে? ছাত্রেরা মধ্যাহ্ন কালের আহার শেষ করিয়া পরস্পরের বিদ্যা পরীক্ষা করিত। দিবা নিদ্রা অনেকেই করিত না। বিকালে পুকুর পাড়ে, মাঠের পথে, উঠানে কেবল আলোচনা হইত। কেবল পুরাতন পড়া লইয়া পরস্পরের ক্ষমতা প্রকাশ করা চলিত। ফলে কেহই পুরাতন পড়া ভুলিবার অবকাশ পাইত না।

কোন কোন ছাত্র বিকালে 'সুখে খাইবার' আশায় বড়শী লইয়া পুকুরে বসিত, কেহ পুথি নকল করিত; কেহবা গান গাহিত। কোন কোন ছাত্র দুরূহ পত্র রচনা করিয়া * পণ্ডিতের বুদ্ধি পরীক্ষার জন্য মাথা ঘামাইত। কোন ছাত্র ছবি আঁকিত কেহ বা কাগজ তুলট করার সরঞ্জাম সংগ্রহ করিত। তাস খেলাটা নূতন—পরে দেখিয়াছি; পূর্ব্বে ছাত্রেরা পাশা ও দাবা লইয়া আড্ডা বসাইত। কিন্তু বড় গোপনে। কোন কোন ভোজন-লোলুপ ছাত্র আসিয়া আমাদের তোষামুদ-করতঃ চিড়া মুড়ি আদায় করিত। অনেক ছাত্রই 'পেটের দায়ে' না হউক 'সখের খাতিরে' এবং নিজের চাতুরী দেখানের জন্য, খাদ্য দ্রব্য চুরি করিত। আমি কোন দিন এই মহা অন্যায়ের প্রশ্রয় দেই নাই, কিন্তু আমার রুক্ষ শাসন উপেক্ষা করিয়াও ছাত্রেরা নারিকেল, কলা, কাঁঠাল, আম যখন যাহা সুবিধা পাইত,—চুরি করিত। আমার বাপের বাড়ীতে (স্বামীর বাড়ীর অতি নিকটেই সেই বাড়ী), সরখেল বাড়ীতে বহু নারিকেল গাছ ছিল। প্রত্যেক বাড়ীতেই দুই পাঁচটা গাছ ছিল। ঐ সকল নারিকেলের অধিকাংশ ছাত্রেরা চুরি করিয়া খাইত। ছাত্রেরা ৫০।৬০ হাত লম্বা, মজবুত দড়ি পাকাইত। ঐ দড়ির মধ্যে বাঁশের চোঙ্গা পরাইয়া—ঐ দড়ি লইয়া গাছে উঠিত। নারিকেল গাছের মাথায় ও নিরাপদ কোন স্থানের বৃক্ষ মূলে ঐ দড়ি বাঁধিয়া,—ঐ বাঁশের চোঙ্গায় নারিকেল ছড়া শক্ত করিয়া বাঁধা হইত। তারপর নারিকেল ছড়া কাটিয়া দিলেই হড়্ হড়্ করিয়া উহা অভিলষিত স্থানে পৌঁছিত। কেহ কেহ নারিকেল চুরি করিতে গাছ হইতে পড়িয়া হাত পা ভাঙ্গিয়াছে। ধরা পড়িলে শাস্তি ছিল ভয়ঙ্কর। যে বাড়ীতে চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িত, সেই বাড়ীর কর্ত্তা পরদিন অপরাহ্নে সমস্ত ছাত্রকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভাজা চিড়, ও নারিকেল খাওয়াইয়া দিতেন। হয়ত কৃতজ্ঞ ছাত্রেরা সেই রাত্রিতে সেই বাড়ীর হাঁড়ি সমেত চিড়া বা ভাণ্ড সমেত দই চুরি করিয়া খাইত। চোরের জ্বালায় সকলেই অস্থির থাকিত। তবে এক সুবিধা ছিল এইযে,— এই সকল চোরের ভয়ে পেশাদার চোরেরা বড় কাবু হইয়া গিয়াছিল।

অনেক ছাত্রই বেশ খাইতে পারিত। উহাদেরে খাওয়াইতে আরাম বোধ হইত। আহারের সময় এখন যেমন না—না—আর পারিব না ধ্বনি শোনা যায়,—সেকালে ছিল তার বিপরীত শব্দ—দেহি দেহি। নিমন্ত্রণে, শ্রাদ্ধ, বিবাহ উৎসবে ছাত্রেরা সব কাজ করিত। রাঁধা, পরিবেশন, সব তাহারা করিত। ভাণ্ডার তাহাদের জিম্মা থাকিত। পিঁপড়ার সাধ্য ছিলনা যে একটী ক্ষুদ চুরি করিয়া নেয়। কিন্তু কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া, তাহারা ঘরের দুই চারিটা দ্রব্য বাদে প্রায় সবই আত্মসাৎ করিয়া উঠানময় ভোজনের মহোৎসব লাগাইয়া দিত। কি আনন্দ দেখিয়াছি! আজও মনে পড়ে—আর চক্ষে জল আইসে।

ছাত্রেদেরবড় ধুম ছিল—শ্রীপঞ্চমীতে। শ্রীপঞ্চমীর দ্রব্য চুরি করিতে নাই, ইহা তাহারা দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করিত। দশ পনর দিন লেখা পড়ার আলোচনা বন্ধ থাকিত। ঘর সাজানো, পত্র রচনা, দ্রব্য সম্ভার সংগ্রহ, অর্থ সংগ্রহ, গানের ব্যবস্থা ইত্যাদি লইয়া ছাত্রেরা আহার নিদ্রা ভুলিয়া যাইত। অন্য বাড়ীর চেয়ে সব বিষয়ে ভাল করা চাই—এই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। কেবল গোপনে পরামর্শ হইত। দুই তিনজন হইত নেতা। আমাদের ছাত্রেরা তখন হাটিয়া ঢাকা হইতে অধ্যাপকের জন্য শাল ও অধ্যাপক পত্নীর জন্য বানারসী শাড়ী কিনিয়া আনিত। যাত্রার দলের অধিকারীর হাতে পৈতা বাঁধিয়া—সেই ধর্ম্মভীরু দলপতির দ্বারা শ্রীপঞ্চমীতে গান করাইত। দলপতিরা ইহাতে আনন্দিত হইতেন। নিমন্ত্রিতগণকে কোন বাড়ীতে জল খাবারে কয়খানি জিনিস দেওয়া হইত—তাহার হিসাব থাকিত। যাত্রা, কবি, কীর্ত্তন—বাই খেমটার নাচ পর্য্যন্ত শ্রীপঞ্চমীর উৎসবের অঙ্গ ছিল। একবার কলিকাতায় নাটক (থিয়েটার) হোসেনপুরে আইসে—তাই দেখিয়া ন' পাড়া আর মহুয়ার ছাত্রেরা নাটকের সূত্রপাত করে।

* "সেকালের পত্র ব্যবহার" প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে আলোচনার ইচ্ছা রহিল।— লেখক।

শ্রীপঞ্চমীর নিমন্ত্রিতগণের অভ্যর্থনা শেষ হইলে মধ্যরাত্রে ছাত্রেরা আমোদে মত্ত হইত। ভাঙ্ খাওয়া এই আমোদের একটা বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল। নেশায় কেহ চুর হইয়া থাকিত, কেহ উলঙ্গ নৃত্য করিত; কেহ বা বাড়ী ঘর, পুকুর পাড় ঝাঁট দিত আর কেহ মাঠে গিয়া খেসারি মশুরী ক্ষেতের সমস্ত অপক্ব ফসল তুলিয়া ক্ষেত্র স্বামীর সর্ব্বনাশ করিত। কেহ সারা রাত্রিই প্রহরে প্রহরে স্নান করিয়া পুণ্যলাভ করিত। শ্রীপঞ্চমীর নেশা ছুটিলে পুনরায় যে যাহার পড়া লইয়া বসিত। বৎসরে ৬।৭ মাস পড়ার ব্যবস্থা ছিল। কোন কোন ছাত্র ৮।৯ মাসও অধ্যাপকের গৃহে থাকিত। তুখার ছাত্রেরা নিজ জ্ঞান পিপাসা ও তর্ক যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে অনেক সময় বড় বড় পণ্ডিতকে আক্রমণ করিতেও ভীত হইত না। 'ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের' প্রসঙ্গ বলিবার সময় এ সকল কথা বলিব।

ছাত্রেরা সন্ধ্যার পর কেহ কেহ রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, পড়িত। কোন দিন সঙ্কীর্ত্তন করিত। "পোড়া পেটের আগিয়া" চুরি করা ছাড়া ইহাদের মধ্যে অন্য কোনও দোষ কদাচিৎ দেখা যাইত। চুরির সন্ধান পাইলে জীবন মরণ পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইত। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই তাহা বুঝা যাইবে। আমার ছেলের ছাত্রেরা পূজার পর আবার আসিয়াছে। রামচন্দ্র অধিকারী আসিয়াছে অগ্রহায়ণ মাসের শেষ ভাগে ঠিক সন্ধ্যার সময়। টোল ঘরের পেছনে যে কাঁঠাল গাছটা কাৎ হইয়াছিল তাহাতে ৮।৯ হাত উচ্চে এক মস্ত ভীমরুলের চাক ছিল। প্রস্রাব করিতে গিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারের আবছায়ায় রামচন্দ্র মনে করিল একটা 'অকালে কাঁঠাল'। মনে মনে দুষ্ট ফন্দী আটিয়া রামচন্দ্র ঐ কাঁঠাল চুরি করার অবসর খুঁজিতে লাগিল। ছাত্রেরা খাইতে গেলে রামচন্দ্র দা হাতে লইয়া কাঁঠাল কাটিতে গেল। নীচে কচুবন—কাঁঠাল পড়িলেও পতন শব্দ অন্দরে পৌছিবে না, মনে করিয়া রামচন্দ্র কাঁঠালের বোঁটা লক্ষ্য করিয়া কোপ মারিল। তার পর যাহা হইল—বলিতে এখনো শরীর শিহরিয়া উঠে। রামচন্দ্র এক মাসে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়াছে এবং তাহার প্রায় সর্ব্বাঙ্গে বসন্তের দাগের মত চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। রামচন্দ্র আজিও জীবিত। তাহার মুখে সেই সকল চিহ্ন এখনও নিঃশেষ লুপ্ত হয় নাই।

ইদানীং টোলের ছাত্রসংখ্যা ক্রমে কমিয়া আসিতেছিল। ইস্কুলে পড়ার বাতিক বৃদ্ধির সহিত টোলের অবস্থা খারাপ হইয়া গিয়াছিল। ছাত্রেরাও একটু বিলাসী হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রীপঞ্চমীর উৎসব শ্রীহীন হইয়া গেল। ছাত্রেরা নির্জ্জীব হইয়া পড়িতেছিল। পড়া শুনাও ভাল হইতেছিল না। আমার বোধ হয় আমি টোলের উন্নতির শেষ অবস্থা ও অবনতির সূত্রপাত দেখিয়া গেলাম। ধীরে ধীরে আচার অনুষ্ঠান সাত্ত্বিকতা, ধর্ম্মজ্ঞান প্রভৃতির যে অধঃপতনের চিহ্ন দেখিলাম—তাহা পূর্ণাঙ্গ হইলে দেশের কি দুর্দ্দশা হইবে, তাহা ভাবিতেও শিহরিয়া উঠি।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

হতাশায়।

(পঞ্চ চামর ছন্দের অনুসরণে)

জীবন জীবন আঁধার জীবন,
জীবন জমাট্ আঁধার আঁধার।
সকল সময় অবুঝ্ বেদন
ঝরায় কেবল নয়ন্-আসার!

আঘাত আঘাত কিসের আঘাত!
সে সব অবোধ মনেরই বাহির;
চতুর্দ্দিকেই মিছাই তাকাই,
মিছাই আকুল আশার বাণীর!

দূরের পথিক কাঙাল ফকির,
তাদের জীবন মধুর জীবন;
তাদের কোমল প্রাণের ভিতর
আশার আলোক দেখায় স্বপন।

আমার অতীত্ সুখের সুদিন!
আমার প্রাণের সরল পিয়াস!
তোদের দরশ পাবার আশায়
হেথায় হোথায় বেড়াই নিরাশ!

বেড়াই ভোরের নীরব সময়,
বেড়াই গভীর দুপুর বেলায়,
বেড়াই উদাস সাঁঝের আলোয়,
বেড়াই নিবিড় গভীর নিশায়!

চকোর যেমন সুধার আশায়
চাঁদের নিকট বেড়ায় কেবল,
পরাণ আমার তেমন করে'-ই
সুখের আশায় বড়ই চপল!

পাখীর কুজন, চাঁদের সুহাস,
ধানের শীষের মধুর দোলন,
দিবস নিশায় এখন এসব
বাড়ায় হিয়ার আকুল কাঁদন!

বোনের আদর, মায়ের সোহাগ,
প্রিয়ার পেলব হাসির লহর,
এখন এসব বড়ই ঘৃণার,
আগুন জ্বালায় প্রাণের ভিতর!

কোথায় আমার হিয়ার দোসর,
কোথায় আমার প্রাণের ঠাকুর!
বাঁচাও আমায়, বাঁচাও আমায়,
বাঁচাও এমন কাঙাল আতুর!

উদার প্রেমের ভরাট্ প্লবন
বহুক্ প্রাণের স্তরের ভিতর!
নীরসজীবন সরস হউক্
সরস করুক্ জীবন অপর!

আসুক্ প্রাণের ভিতর আবার
অতীত্ দিনের সাধের জীবন!
উঠুক্ বিমল সুখের লহর,
দেখুক্ হৃদয় দিবস-স্বপন!

নিরাশ মেঘের আঁধার ছেদন
করুক্ আশার তরুণ তপন!
আবার গভীর প্রেমের নেশায়
চলুক্ প্রাণের ভাঙন গড়ন!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

কিঙ্কর সেন।

দিল্লীর সম্রাট আওরঙ্গজেব বাদশাহের রাজত্বের শেষ সময়ে মুরশিদকুলি খাঁ বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার সুবাদারী পদ লাভ করেন। এই সময়ে জৈনুদ্দিন নামক এক ব্যক্তি হুগলী চাক্‌লার ফৌজদার ছিলেন। পূর্ব্বে ফৌজদারীগণ সুবাদারের অধীন থাকিয়াই নিজ নিজ চাক্‌লা শাসন করিতেন। কিন্তু আওরঙ্গজেবের আমলে এ নিয়মের কতকটা পরিবর্ত্তন ঘটে। তিনি ফৌজদারগণকে অনেকটা ক্ষমতা প্রদান করায় তাহারা এরূপ স্বাধীন ভাবেই নিজ নিজ চাক্‌লা শাসন করিতে আরম্ভ করেন—সুবাদারকে গ্রাহ্যই করিতেন না। মুরশিদকুলি খাঁ দেখিলেন এ এক বিপদ, চাক্‌লার ফৌজদারগণের উপর যদি তাহার প্রভুত্ব না থাকে তবে তিনি কি করিয়া দেশ শাসনে রাখিবেন, তাহার সুবাদারী পদের মান সম্ভ্রমইবা কি! তখন আওরঙ্গজেব বাদশাহের মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র বাহাদুরশাহ নাম ধারণ করিয়া দিল্লীর রাজতক্তে আসীন। মুরশিদকুলি খাঁ সম্রাটকে এ ব্যবস্থায় দোষ প্রদর্শন করিয়া হুগলীর

ফৌজদারকে তাঁহার শাসনাধীন করিয়া দিবার প্রার্থনা জানাইলেন। সম্রাট বাবাদুর শাহ সুবাদারের এ প্রস্তাবের সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া ফৌজদার জৈনুদ্দিনকে সুবাদারের অধীন থাকিয়া কার্য্য করিবার আদেশ করিলেন। কিন্তু স্বাধীন চেতা আত্মসম্মানাভিমানী ফৌজদার সম্রাটের এ প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলেন না। কাজেই তিনি পদচ্যুত হইলেন।

এদিকে সুবাদার মুরশিদকুলি খাঁ ওয়ালীবেগ নামক একজন মোগলকে ফৌজদার নিযুক্ত করিয়া হুগলী প্রেরণ করিলেন। জৈনুদ্দিন স্থির করিয়া ছিলেন যে, ওয়ালীবেগ হুগলীতে আসিলেই তাঁহাকে কাগজ পত্র বুঝাইয়া দিয়া তিনি দিল্লী চলিয়া যাইবেন। ইহা স্থির করিয়াই তিনি পূর্ব্ব হইতেই নিজ আত্মীয় স্বজন ও অনুচরবর্গ সহিত সহরের বাহিরে গিয়া পটমণ্ডপ স্থাপন পূর্ব্বক তাহাতে বাস করিতে থাকেন। কিন্তু ওয়ালীবেগ বলিয়া পাঠাইলেন—যদি আপনি দিল্লী যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া থাকেন তবে কাগজ পত্র দিয়া যাইতে পারেন। কিন্তু আমার কাগজ পত্র দেখা ও হিসাব কিতাব পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আপনার পেশকার কিঙ্কর সেনকে এখানে রাখিয়া যাইতে হইবে।

জৈনুদ্দিন পদচ্যুত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার যথেষ্ট আত্ম সম্মান জ্ঞান ছিল। তিনি ওয়ালীবেগের এ প্রস্তাবে বিশেষ অপমান বোধ করিলেন; বিশেষতঃ অনুগত প্রভুভক্ত কার্য্যকারক কিঙ্করকে হিসাব নিকাশের দায়ে এ বিপদের মুখে ফেলিয়া যাইতে তিনি কিছুতেই প্রস্তুত হইলেন না। সুতরাং পদচ্যুত ও নব নিযুক্ত ফৌজদারের মধ্যে যুদ্ধ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। জৈনুদ্দিন চুঁচুড়ার ওলন্দাজ ও চন্দননগরের ফরাসীদিগের সাহায্য প্রার্থী হইলে তাহারা জৈনুদ্দিনের পক্ষ অবলম্বন করিল। এদিকে ওয়ালীবেগও নবাবের নিকট সৈন্য সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। নবাব তাহার সাহায্যার্থ হিন্দুবীর দিলপৎ সিংহের নেতৃত্বে একদল সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। উভয় দলই [illegible] নগরের নিকট সৈন্য সমাবেশ করিয়া [illegible] প্রতীক্ষায় রহিল। অনেক দিন ধরিয়া উভয় পক্ষেই শুধু যুদ্ধের উদ্যোগ আয়োজন চলিতে লাগিল। কিন্তু জৈনুদ্দিনের এইরূপ অলসতা ভাল লাগিল না। তাই তিনি মনে মনে এক সঙ্কল্প আঁটিয়া নবাবের সৈন্যাধ্যক্ষ দিলপৎ সিংহের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া এক দূত প্রেরণ করিলেন।

এই সময় দিলপৎ পরিখা ও দুর্গ প্রাকার নির্ম্মাণ কার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। তিনি দূতকে সেই স্থানেই আনয়ন করিবার আদেশ দিলেন। দূত আসিলে তিনি তাহার সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত আছেন এমন সময় বিরুদ্ধ পক্ষীয় জনৈক ফরাসী গোলন্দাজ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বারুদে আগুণ দিল, চক্ষের পলক পড়িতে না পড়িতে বজ্রনির্ঘোষে কামান গর্জ্জিয়া উঠিল আর সঙ্গে সঙ্গে বীরবর দিলপতের দেহ শতধা ছিন্ন হইয়া সৈন্যমণ্ডলীর মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। সৈন্যাধ্যক্ষের এইরূপ আকস্মিক হৃদয় বিদারক মৃত্যুতে নবাব-সৈন্য ভীত ত্রস্ত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। জৈনুদ্দিন দেখিলেন এই সুযোগ;—তিনি ভীম-বেগে তাহাদিগের উপর আপতিত হইলেন। বিশৃঙ্খল সৈন্যদল পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া রণক্ষেত্র ছাড়িয়া হুগলী দুর্গে আশ্রয় লইল। আপন জেদ আপন সম্মান বজায় রাখিয়া বিজয়ী জৈনুদ্দিন সদল বলে নিশ্চিন্ত মনে আপন গম্য স্থান দিল্লী চলিয়া গেলেন। দিল্লীতে অল্প দিনের মধ্যে জৈনুদ্দিনের মৃত্যু হয়।

জৈনুদ্দিনের মৃত্যুর পর কিঙ্কর সেন দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া মুরশিদাবাদে উপস্থিত হইলেন এবং নির্ভীক চিত্তে নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার অধীনে কর্ম্ম প্রার্থনা করিলেন।

নবাব কিঙ্কর সেনকে চিনিতেন। জৈনুদ্দিনের লোক বলিয়া কিঙ্করের উপর তাঁহার রাগও ছিল, কিন্তু তিনি

তখন তাঁহাকে কিছু বলিলেন না বরং মুখে আপ্যায়িত করিয়া অতি শীঘ্রই তাঁহাকে হুগলীর কর সংগ্রাহকের পদে নিযুক্ত করিলেন। এক বৎসরের শেষে সালতামামীর সময় বাৎসরিক হিসাব-নিকাশ দিতে কিঙ্কর মুরশিদাবাদে নবাব সরকারে হাজির হইলেন। কিন্তু এই আসার কিঙ্করের কাল হইল, তিনি আর হুগলী যাইতে পারিলেন না। এখন হাতে পাইয়া পূর্ব্ব ক্রোধ শোধ দিবার অভিপ্রায়ে তহবিল তছরূপের মিথ্যাপবাদ অজুহাতে নবাব তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। কারাগারে প্রত্যহ তাঁহার আহার ও পানীয় জন্য লবণ মিশ্রিত মহিষ দুগ্ধের বরাদ্দ হইল। এই বিষসদৃশ আহারে কিঙ্কর অল্পদিনের মধ্যেই কঠিন উদরাময়ে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু নবাবের আদেশ অন্যথা হইবার উপায় নাই। অবশেষে এই পীড়াতেই তিনি নবাবের ক্রোধ ও অত্যাচার এবং কারাগৃহের দুঃখ ও যন্ত্রণার হাত এড়াইয়া পরলোক গমন করিলেন। প্রভুভক্ত কিঙ্কর নিজের প্রাণ বলি দিয়া প্রভুর অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন।

কিঙ্কর সেনের কোন বংশধর জীবিত নাই। সুতরাং তিনি কোন জাতীয় ছিলেন কিম্বা তাঁহার বাসস্থান কোথায় ছিল, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তবে শুনিয়াছি, বৈদ্যেরা তাঁহাকে স্বজাতীয় বলিয়া দাবী করেন এবং ফরাসী চন্দন নগরের 'কিঙ্কর সেনের গড়' তাঁহারই বাসভূমির ধ্বংসাবশেষ বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। সত্য-নির্ণয় প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকগণের অনুসন্ধান ও বিচার-সাপেক্ষ।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।

শ্রীরাধা বা ব্রজগোপীর প্রেম ধর্ম্ম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সুতরাং জীব রসগ্রাহী সৌন্দর্য্যের উপাসক। রস ও সৌন্দর্য্য জীবের সার সম্পত্তি। আস্বাদন করাই জীবের স্বভাব। এজন্য জীব জগত্‌কে আস্বাদন করিবার জন্য ব্যস্ত। জগৎ জীবের আস্বাদন করিবার বস্তু হইলেও পরম অস্বাদ্য নহে। জীবের পরম আস্বাদ্য একমাত্র সকল রসের আধার শ্রীভগবান। রসলোলুপ জীব শ্রীভগবান্‌কে সর্ব্বতোভাবে আস্বাদন করিতে পারে। শ্রীভগবান্‌কে জীব আস্বাদন করিতে পারিলেই তাহার জন্য জীবন সার্থক হইয়া যায়। জীবে যে লোভরূপ একটা শ্রেষ্ঠ প্রবৃত্তি রহিয়াছে সেই শ্রেষ্ঠ লোভ প্রবৃত্তিটী শ্রীভগবান্‌কে আস্বাদন করিবার জন্য। আর শ্রীভগবান্‌কে আস্বাদন করিতে পারিলেই জীবের লোভের প্রকৃত চরিতার্থতা লাভ হয়। লোভ প্রবৃত্তিময় জীব লোভের বশীভূত হইয়া ধন মান যশঃ প্রভৃতি পার্থিব অসার বস্তুর অনুসন্ধান ও আহরণ করিতেছে; কিন্তু বাস্তবিক-পক্ষে সেই সমস্ত অসার, অকর্ম্মণ্য, অচিরস্থায়ী, ক্ষণভঙ্গুর বস্তুতে লোভী হইয়া জীব আর শান্তি পাইতেছে না, যতই জীবের লোভ বাড়িতেছে, ততই আবার সেই দুর্দ্দমনীয় লোভের সঙ্গে সঙ্গে অশেষ জ্বালা পোড়া, বিঘ্ন বিপদ আসিয়া বিষয় লোভী জীবকে যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা দিতেছে; কাজেই জীবের আর শান্তি নাই; কিন্তু সেই লোভ যদি শ্রীভগবানের দিকে যায় তাহা হইলে জীব লোলুপ হইয়া শ্রীভগবান্‌কে আস্বাদন করিয়া কৃত কৃতার্থ হইতে পারে। জীবের এত লোভ তাহা কেবল ভগবানের জন্য লুব্ধ হওয়ার জন্য। ভগবানের জন্য জীব লোভী না হইয়া ধন জন যশ মানের জন্য, অকিঞ্চিৎকর ভোগসুখের জন্য লালায়িত হওয়াতেই জীবের এত দুঃখ, এত জ্বালা, এত অশান্তি। লোক সমাজে এত মারামারি কাটাকাটি।

ভোগব্যাকুল হইয়াই জীব বুঝিতে পারিবেন যে, তাহার এত লোভ কেন? কোন পরম বস্তুর লাভ হইলে তাহার লোভের যথার্থ সার্থকতা হয়। লোভের প্রেরণাতেই জীব ভগবান্‌কে আস্বাদন করিবে ইহাই লোভের উদ্দেশ্য।

শ্রীভগবান্‌ই জীবের শ্রেষ্ঠ আস্বাদনের বস্তু। শ্রীভগবানে এত রস আছে যে, সেই রসের আস্বাদনের তুল্য আর আস্বাদনই নাই। সেই ভোগের তুল্য আর ভোগ্য বস্তুই জগৎ সংসারে নাই। রসময় শ্রীভগবান্ জীবের পরম আস্বাদ্য ও পরম ভোগ্য! জীব ভোগী, জীব লোভী। এই লোভী ভোগী জীবের মহাকলঙ্ক ভোগ আর লোভ। আর জীবের যত দুঃখ দুর্দশা এই ভোগ ও লোভের কারণে। শাস্ত্রকার শাস্ত্র করিয়া এই ভোগ আর লোভ বিষবৎ ত্যাগ করিতে উপদেশ দিতেছেন, এই লোভ আর ভোগের প্রতিকূলে যত যুক্তি দেখাইতেছেন। কিন্তু, প্রেমিক মহাজনেরা শাস্ত্রের সেই শুষ্ক উপদেশ উড়াইয়া দিয়া বলিতেছেন, জীবের ভোগ আর লোভের জন্য এত ভয় কেন? জীব যদি লোভ আর ভোগ ছাড়িয়া দেয় তাহা হইলে জীবের পরম ভোগ্য পরম আস্বাদ্য বস্তু শ্রীভগবান্‌কে সম্ভোগ ও আস্বাদন করিবে কিরূপে? আর তাহা হইলে ত জীবের জন্মজীবন সকলই বৃথা হইল।

শ্রীভগবান্ রসময় রসিক। ভগবানের জীবও কি রসময় রসিক নহে? তারপর রস আস্বাদন করা কি জীবের প্রকৃতি বিরুদ্ধ হইতে পারে? কদাচ নহে। রস আস্বাদন করা জীবের চিরন্তন প্রকৃতি। রস আস্বাদন ভিন্ন জীব বাঁচিতে পারে না, বাঁচিয়া থাকিলেও বৃদ্ধি পাইতে পারে না, বৃদ্ধি পাইলেও সিদ্ধ হইতে পারে না। সিদ্ধ না হইতে পারিলে জীবের অনন্ত দুঃখ দূর হয় না। রসময় রসিকের জীব রস বিনা সিদ্ধ হইতে পারে না। রসেই জীব যথার্থ সিদ্ধ হইতে পারে। আর যে জীব রসে সিদ্ধ হইল, সেই জীবই রসিক শেখর শ্রীভগবানের সহিত চিরন্তন রসের সম্বন্ধটী গাঢ়তর করিয়া ভগবানের মহামিলনের মহোৎসবে পঁহুছিতে সমর্থ হইল। শ্রীভগবানের মহামিলনের প্রসঙ্গ পরে বলিব।

জীব অরসিক নহে, প্রকৃত পক্ষেই রসিক। জীব সকল রসে রসিক বলিয়াই সে চিরদিন ভোগী; আর সেই ভোগের জন্যই জীব ত্যাগী। রসিক জীবের জন্যই ভগবান রসের সৃষ্টি করিয়াছেন। রসিক জীব রস আস্বাদন করিবে, রস আস্বাদনের জন্যই জীব ভোগী লোভী হইবে, ভোগী লোভী হইয়া জীব রস আস্বাদন করিতে করিতে রসময় রসিক শেখর শ্রীভগবানের দিকে অগ্রসর হইবে, ইহাই হইল রস সৃষ্টির মুখ্য উদ্দেশ্য। আর এই মহান্ উদ্দেশ্য সংসিদ্ধির নিমিত্তই রসের এত আকর্ষণ এত মাধুর্য্য।

আচ্ছা, জীব যদি রসিকই হইল, জীব যদি রসের নিমিত্ত লোভী ভোগীই হইল, তবে সকল জীবেরই রস বোধ দেখি না কেন, আর রসের আস্বাদন করিতেই বা দেখিনা কেন? রস বোধ না থাকিলে, রসের আস্বাদন না করিলে জীব এতদিনে রসিক শেখর ভগবানের এই ক্ষুদ্র রসরাজ্য জগৎসংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাইত। সৃষ্টি সংহার হইত। জীবের বেশ রস বোধ আছে। জীব রসিক বটে। তোমরা আমার রসময় শ্রীভগবানের জীবকে কেহ অরসিক, লোভী ভোগী বলিয়া গালি দিও না। এ কথায় আমার বড় দুঃখ হয়। আমি জানি জীব অরসিক নহে, রস বোধ তাহার যথেষ্ট আছে। তবে তাহার রসের পাত্রগুলি মলিন এই যা ত্রুটি।

তবে রসিক জীবের যথার্থ রসের পাত্র কে? কাহার সহিত রসের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া রস আস্বাদন করিলে জীবের রসবোধ সার্থক হয়? সেই রসিক শেখর শ্রীভগবানের সহিত রসের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া,—রসের সম্বন্ধ তো চিরদিনই আছে, তা থাকিলেও, আবার স্থাপন করিয়া রস আস্বাদন করিলেই জীবের রসিক উপাধি সার্থক হইল। নচেৎ উপাধি ত ব্যাধি হইয়া পড়ে।

শ্রীশরৎচন্দ্র ধর।
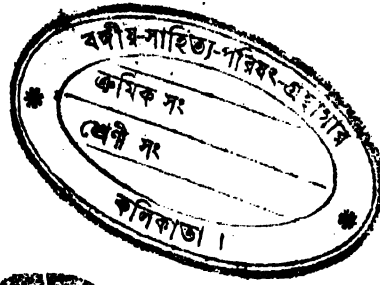
১০ম বর্ষ | শ্রাবণ ১৩২৭ | ৪র্থ সংখ্যা

ম্লেচ্ছ।

বাঙ্গালা অভিধান খুলিয়া "ম্লেচ্ছ" শব্দের অর্থ বাহির করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে অভিধান-কার "অসভ্যজাতি, কিরাত, শবর, পুলিন্দ, যবন প্রভৃতি", "পাপরত পাপিষ্ঠ" লিখিয়াই সন্তোষ লাভ করিয়াছেন *। অভিধান-কারের যে দোষ হইয়াছে, অথবা তাঁহার প্রদত্ত পরিভাষা অপেক্ষা সহজে সুষ্ঠুতর উপায়ে আমরা উহার মর্ম্ম বুঝাইতে পারি, তাহাও বলিতেছি না। এখন "ম্লেচ্ছ" বলিলে, প্রায়ই আমরা "অহিন্দু", অথবা বিদেশী, বিধর্ম্মী, —এইরূপ বুঝিয়া থাকি। আধুনিক ভাষায়, অহিন্দুর মত আচরণ বুঝাইতে, নিন্দাবাচক "ম্লেচ্ছাচার" শব্দও বেশ ব্যবহৃত হইতেছে। আবার কোন কোন প্রাত্নতত্ত্বিক এবং শব্দতাত্ত্বিক মহাশয় প্রাচ্যভারতের "মেচ" নামক জাতির নাম "ম্লেচ্ছ" এই শব্দের অপভ্রংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

জাতি-তত্ত্ব,—বিশেষতঃ ভারতের জাতিতত্ত্ব,—এত বিস্তৃত এবং বিবাদবহুল যে, উহাতে হস্তক্ষেপ মাত্র করাও, বর্ত্তমান প্রস্তাবে অন্ততঃ, আমাদের উদ্দেশ্য নহে। প্রাচীন ভারতবর্ষে, "আর্য" এবং "অনার্য" বলিতে কি বুঝাইত, তৎসম্বন্ধে আমাদের যৎসামান্য অনুসন্ধানের ফল, ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতেছে †। বর্ত্তমান প্রস্তাবে "ম্লেচ্ছ" এই শব্দ উচ্চারণ করিলে প্রাচীন কালে এ দেশের লোকে কি বুঝিতেন, এবং ক্রমশঃ কালের গতি এবং পরিবর্ত্তনের সহিত উহার অর্থের কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, আমরা তাহাই, সাধ্যমত সংক্ষেপে, দেখিবার চেষ্টা করিব। এই শব্দের ক্রম-বিকাশের ধারা

* ৺ সুবল মিত্রের বাঙ্গালা অভিধান।

† "প্রতিভা" ১৩২৬ সনের মাঘ মাস হইতে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে।

বুঝাইতে আমাদিগকে সংস্কৃত-সাহিত্যেরই সাহায্য লইতে হইবে; সুতরাং সর্ব্বাগ্রে আমরা পাঠক-পাঠিকাবর্গের ধৈর্য্য ভিক্ষা করিতেছি।

কেবল বাঙ্গালা অভিধান কেন, প্রসিদ্ধ সংস্কৃত অভিধানেও "ম্লেচ্ছ" শব্দের অর্থ "কিরাত, শবর ও পুলিন্দ জাতি" লিখিত হইয়াছে ‡। ফলতঃ সংস্কৃত-সাহিত্যের ব্যবহার লক্ষ্য করিয়াই অভিধান-কারেরা "ম্লেচ্ছ" শব্দের অর্থ-নির্ণয় করিয়াছেন। পুরাণের ভৌগোলিক অংশ "ভারতবর্ষ" বর্ণনায় লিখিত হইয়াছে,—

"এই ভারত দ্বীপে মধ্যে মধ্যে ম্লেচ্ছগণ বাস করিয়া থাকে; ইহার পূর্ব্বভাগে কিরাতগণ, পশ্চিমভাগে যবনগণ এবং মধ্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্রগণ যথা যোগ্য যজ্ঞে যাজন, যুদ্ধ ও বাণিজ্যাদি ব্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্বক বাস করেন।" ¶

পরন্তু প্রাচীন কালে "ম্লেচ্ছ" শব্দের অন্যরূপ অর্থ প্রচলিত ছিল। সংস্কৃত ভাষাভাষিব্যক্তিবৃন্দ যে সকল জাতির ভাষা বুঝিতে পারিতেন না, অথবা তাঁহাদের মতে যাঁহারা অশুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করিতেন, সেই সকল জাতিকে সাধারণতঃ তাঁহারা "ম্লেচ্ছ" জাতি, এবং তাঁহাদের ভাষাকে "ম্লেচ্ছ ভাষা," এবং তাঁহাদের দেশকে "ম্লেচ্ছদেশ" বলিতেন।

বর্ত্তমান পারস্যরাজ্যের পশ্চিমে অবস্থিত "মেসো-পোটামিয়া" নামক রাজ্যের নাম এখন অনেকেরই পরিচিত হইয়াছে। প্রাচীন কালে এইদেশ "আসিরিয়া" নামে বিখ্যাত ছিল এই দেশের প্রধান দেবতার নাম অসুর, প্রধান নগরের নামও অসুর ছিল। এই অসুর দেশের লোককেই প্রাচীন কালের আর্য্যেরা "অসুর" বলিতেন। প্রাচীন কালে আর্য্যাবর্ত্তের পশ্চিমে "কালকবন" নামক এক বিখ্যাত স্থান ছিল, তাহা পাণিনি ব্যাকরণের পতঞ্জলিকৃত মহাভাষ্যে দেখিতে পাওয়া-যায় *। আসিরিয়া রাজ্যে "নিনেভ" নগরীর অনতি দূরে "কালক" নামক বিখ্যাত নগর ছিল, তাহাও জানিতে পারা গিয়াছে; † ইহারই প্রাচী নাম "অসুর" ছিল। মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায় যে দেবরাজ ইন্দ্রের শত্রুবর্গের মধ্যে "কালকেয়" অসুরগণ প্রধান ছিলেন, এবং মহাবীর অর্জ্জুন তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। এই অসুরেরা যে ভাষার ব্যবহার করিতেন, সংস্কৃতভাষিগণ তাহাকে "মেচ্ছ" ভাষা বলিয়াছেন।—মহাভাষ্যকার বলিতেছেন,—

"তাঁহারা অসুর। সেই অসুরেরা "হেলয় হেলয়" এইরূপ করিয়া পরাভবপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই জন্য, ব্রাহ্মণের পক্ষে ম্লেচ্ছভাষা অথবা অশুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করা উচিত নহে। অশুদ্ধ শব্দকেই "মেচ্ছ" বলে।

---

‡ "ভেদাঃ কিরাত শবর পুলিন্দা ম্লেচ্ছজাতয়ঃ।"
অমর কোষ।

¶ "দ্বীপো হ্যপনিবিষ্টোঽয়ং ম্লেচ্ছৈরন্তেষু নিত্যশঃ।
পূর্ব্বে কিরাতাহ্যস্যান্তে পশ্চিমে যবনাস্থিতাঃ ৮২॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা মধ্যে শূদ্রাশ্চ ভাগশঃ।
ইজ্যা যুদ্ধ বাণিজ্যাভির্ব্বর্ত্তয়ন্তো ব্যবস্থিতাঃ ॥৮৩॥"
বায়ু পুরাণ, ৪৫ অধ্যায়। মৎস্যপুরাণ, ১১৪ অধ্যায়।

* পাণিনি সূত্র "শূকানাম নিরবসিতানাম্" ২।৪।১০॥ ভাষ্যে কে পুনরার্য্যবর্ত্তাঃ প্রাগদর্শাৎ প্রত্যেক্ কলিকবনাৎ --ইত্যাদি।"

† Another important city was Calak, the Kalakh of the inscription, about 12 miles south of Nineveh. It is now represented by the mounds known as Nimrad.—Nelson's Encyclopædia, Vol. II page 316. Also, Old Testament, Genesis. Also, Encyclopædia Britanica, Vol II, pp 788—789 11th Ed.

ম্লেচ্ছ আমরা না হই, এই কারণে ব্যাকরণ পাঠ করিতে হয়। তাঁহারা অসুর ‡ ।"

মহাভারতের কর্ত্তা মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ম্লেচ্ছ ভাষাকে "প্রলাপ" শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। বারণাবত নগরযাত্রী পাণ্ডবগণের আসন্ন বিপদ বুঝিয়া মহাবুদ্ধি বিদুর যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার প্রথমেই উক্ত হইয়াছে,—

"প্রাজ্ঞ প্রাজ্ঞপ্রলাপজ্ঞ প্রলাপজ্ঞকে এই বাক্য বলিলেন ¶" অর্থাৎ ম্লেচ্ছভাষা ও সংস্কৃতভাষাবিদ্ জ্ঞানী বিদুর ম্লেচ্ছভাষাবিদ্ যুধিষ্ঠিরকে এই বাক্য বলিলেন।—বহু লোকের বিশেষতঃ ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পুত্রগণের, সম্মুখে ও শ্রুতি গোচরে বিদুর এমন এক অদ্ভুত ভাষায় যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিলেন যে বক্তা এবং শ্রোতা ভিন্ন আর কেহই তাহা বুঝিতে পারিলেন না। মহাভারতের বিখ্যাত টীকাকার পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ নীলকণ্ঠ এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিতেছেন,—

"কেবল মাত্র সাধারণ নগরবাসি জনগণের নিকট হইতে গোপন রাখার জন্য নহে, যাহাতে এক যুধিষ্ঠির ভিন্ন নিকটের অন্য আর কেহই কিছুমাত্র বুঝিতে না পারেন, এই উদ্দেশ্যে কবি বলিতেছেন—প্রাজ্ঞ ইত্যাদি। "প্রাজ্ঞ"=বুদ্ধিমান্=অনেক ভাষা জানেন বলিয়া। প্রাজ্ঞত্ব কি, তাহা বলিতেছেন "প্রাজ্ঞ প্রলাপজ্ঞ"=প্রকৃষ্টরূপে অজ্ঞান, পশুপ্রায় বেদ বিরোধী ম্লেচ্ছগণের প্রলাপ অর্থাৎ অর্থশূন্য, প্রকৃতি প্রত্যয়ের যোগে ব্যাকরণের নিয়ম মত নিষ্পন্ন নহে সুতরাং অর্থ বুঝাইতে অক্ষম এরূপ দেশভাষা প্রচলিত বাক্য, কোথাও একটি বর্ণ নাই, কোথাও আবশ্যকের অতিরিক্ত বর্ণ প্রয়োগ, কোথাওবা বিকৃত বর্ণের প্রয়োগ, এইরূপ পদ সকল যে ভাষাতে থাকে সেরূপ ভাষা জানেন যিনি—এই অর্থ। তাহার মধ্যে বর্ণ চ্যুতির উদাহরণ,—কাণ্বশাখার শতপথ ব্রাহ্মণে অসুরগণের প্রতি ইন্দ্রের উক্তি-"আপনাদের অগ্নিতে এই আমার 'চিত্র' নামক ইষ্টকা খানি দিতে পারি কি?" এই প্রশ্নের "উপধাস্যে?"—কথার উত্তরে অসুরেরা "দিন—উপধেহি—" না বলিয়া "উপহি" এবং "তুলিয়া লই—আদাস্যে?" এই প্রশ্নে, "লউন—আদেহি" না বলিয়া "আহি" বলিয়া উত্তর দিয়াছিল।—এখানে "উপধেহি" র "ধে" এবং "আদেহি" র "দে" বর্ণটি অসুরেরা উচ্চারণ না করিয়া লোপ করিয়াছিল। অধিক বর্ণের দৃষ্টান্ত,—"গৌ" এই কথা বলিতে "গাবী", গোণী", গোতা", "গোপো তলিকা" এইরূপ প্রয়োগ হয়। বিকৃত বর্ণের দৃষ্টান্ত—"সেই অসুরেরা 'হেলয়ঃ হেলয়ঃ' এইরূপ বলিতে বলিতে পরাজয় প্রাপ্ত হইল"—বেদেও অসুরের ভাষায় "অরয়ঃ'—শত্রুগণ বলিতে গিয়া "র"স্থানে "ল"কারের প্রয়োগ দেখা যায়। যদ্যপি বিদুর ম্লেচ্ছভাষার সাহায্যেই যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিয়াছিলেন, তথাপি ব্যাসদেব তাহা সংস্কৃত ভাষাতেই লিখিয়াছেন।"*

---

‡ "তেঽসুরাঃ। তেঽসুরা হেলয়ো হেলয় ইতি কুবন্তঃ পরাবভূবুঃ। তস্মাদ ব্রাহ্মণেন ন ম্লেচ্ছিত বৈ নাপ ভাষিত বৈ। ম্লেচ্ছো হ বা এষ যদপশব্দঃ। ম্লেচ্ছা মা ভূমেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। তে ঽসুরা ঃ।" মহাভাষ্য, প্রথম আহ্নিক, ২য় পৃষ্ঠা। (বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট সংস্করণ)

¶ "প্রাজ্ঞঃ প্রাজ্ঞপ্রলাপজ্ঞঃ প্রলাপজ্ঞ মিদং বচঃ। প্রাজ্ঞং প্রাজ্ঞঃপ্রলাপজ্ঞঃ প্রলাপজ্ঞং বচোঽব্রবীৎ ॥২০"
আদিপর্ব্ব, জতুগৃহ পর্ব্বাধ্যায়, ১৪৪ অধ্যায়, (বোম্বাই সংস্করণ)।

* "ন কেবলং পৌরেভ্য এব তদ্বচনং গোপনীয়মপিতু সমীপস্থৈরপি যুধিষ্ঠিরাদন্যৈর্ণজ্ঞাতুং শক্যমিত্যাহ প্রাজ্ঞ ইতি প্রাজ্ঞো বুদ্ধিমাননেক ভাষাভিজ্ঞত্বাৎ। প্রাজ্ঞত্বমেবাহ প্রাজ্ঞ প্রলাপজ্ঞ ইতি প্রকর্ষেণাজ্ঞানাং পশুপ্রায়ানাং বেদবিরোধিনাং ম্লেচ্ছানাং প্রলাপোঽনর্থকং সম্যক্ প্রকৃতি প্রত্যয় বিভাগেনা নিষ্পন্নত্বাদর্থানববোধকং

উপরে মহাভাষ্যেও নীলকণ্ঠের উক্ত' "সেই অসুরেরা হেলয় হেলয়—ইত্যাদি" লিখিত হইয়াছে। "অরি" সংস্কৃত শব্দ, অর্থ শত্রু; কিন্তু অসুরগণের মুখে উহা "হলি" উচ্চারিত হইত। বৈদিক সংস্কৃত ভাষায় রচিত ঋক্ সংহিতায় ব্যবহৃত শব্দের সহিত প্রাচীন পারসীকগণের ধর্ম্মগ্রন্থ বিখ্যাত "আভেস্তা"য় ব্যবহৃত শব্দের তুলনা যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহারা উভয়ের সাদৃশ্য এবং পার্থক্য উভয়ই বেশ অনুভব করিতে পারিয়াছেন। সংস্কৃত যে সকল শব্দের প্রথমে "স" আছে, প্রাচীন "আভেস্তার" ভাষায় (যাহাকে পণ্ডিতেরা "জেন্দ" বলিয়াছেন এবং প্রাচীন পারসীক ভাষায়ও) ঐ সকল শব্দের "স" প্রায়ই "হ" কারে পরিণত হইয়াছে। ম্যাকসমূলর প্রমুখ পণ্ডিতেরা বৈদিক এবং "আভেস্তিক" ভাষার তুলনা করিয়া মত দিয়াছেন যে উভয় ভাষা নিতান্ত নিকট সম্বন্ধে সম্বদ্ধ এমন কি উহাদিগকে একই ভাষার ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিকরূপ বলা যাইতে পারে।

বচনং দেশভাষারূপং লুপ্তবর্ণঅধিকবর্ণং বিকৃতবর্ণং চ পদজাতং যত্র তাদৃশ ভাষাভিজ্ঞ ইত্যর্থঃ। তত্র লুপ্তবর্ণং কাথশতপাথ ইন্দ্রেণাসুরান্ প্রতি ভবতামপৌ ইমাং চিত্রাখ্যাং মদীয়াং ইষ্টকামুপধাস্তে ইতি পৃষ্টে উপহীত্য সুরবচনং তথা আদাদ্যোইত্যুক্তে আহীতি প্রতিবচনম্। তত্র উপধেহি আদেহীতি বক্তব্যে বর্ণলোপঃ। অধিকবর্ণস্ত গৌরিতি বক্তব্যে গাবী গোণী গোতা গো পোতলিকেতি প্রযুজ্যতে। তথা বিকৃতবর্ণং তেঽসুরা হেলয়ো হেলয় ইতি বদন্তঃ পরাবভুবুরিতি অরয় ইত্যপেক্ষিতে রেফ স্থানে লকার প্রযুজ্যতে বেদেপ্যসুর ভাষানুবাদে। যদ্যপি যুধিষ্ঠিরং প্রতি বিদুরেণ ম্লেচ্ছভাষয়োক্তং তথাপি ব্যাসেন তৎসংস্কৃতে নেবোপ নিবদ্ধমিতি।"

প্রাগুক্ত জতুগৃহ পর্ব্বাধ্যায়ের ১৪৪ অধ্যায়ের ২০শ শ্লোকের নীলকণ্ঠী টীকা। বোম্বাই সংস্করণ।

যাহা হউক, উপরিলিখিত প্রমাণে দেখা গেল যে, প্রথমে "ম্লেচ্ছ" শব্দের অর্থে অশুদ্ধ ভাষা এবং যে সকল জাতি সংস্কৃত ভাষিগণের মতে অশুদ্ধ ভাষার ব্যবহার করিতেন, তাঁহাদিগকেই বুঝাইত। আরও, সংস্কৃত ভাষিগণ যাঁহাদিগের ভাষা আদৌ বুঝিতে পারিতেন না, তাঁহাদিগকেও "ম্লেচ্ছ" বলিতেন। সংস্কৃত ভাষায় "ম্লেচ্ছ" নামে একটি ধাতুও পাওয়া যায়, উহার অর্থ অব্যক্ত শব্দ, অস্ফুট শব্দ, অপ শব্দ ইত্যাদি।

প্রাচীন অসুরগণের বাস আসিরীয়া রাজ্যে ছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। "মিডিয়া" অথবা "উত্তরমদ্র" দেশেও অসুরদিগের রাজ্য ছিল। মহাভারতের সময়ে মদ্র দেশের রাজা শল্য ছিলেন কিন্তু উত্তর মদ্রের রাজা জটাসুর ছিলেন (যথা, মহাভারত, সভাপর্ব্বে, ৪র্থ অধ্যায়ে "জটাসুরো মদ্রকানাং চ রাজা ইত্যাদি ২৫শ শ্লোক) আবেস্তা গ্রন্থের প্রধান উপাস্যদেবের নাম "অসুরমজ্দ" (অসুর মদ্র), অসুর নগরের প্রধান দেবের নাম Marduk বা মরদুক (মদ্রক) বেদেও বরুণদেব "অসুর" বলিয়া উক্ত হইয়াছেন এবং পশ্চিমদিকের অধিপতিও বরুণ। প্রাচীন পারসীক জাতি বৈদিক অসুরগণেরই বংশধর বলিয়া অনুমান হইতেছে।

ভাষা,—কোনও একটি বিশেষ ভাষা, অবশ্যই কোন এক বিশেষ মানবজাতির চিরস্থায়ী সম্পদ নহে। সকল দেশের পুরাণেই অবশ্য এমন এক প্রাচীন সময়ের আভাস পাওয়া যায়, যখন মানুষের এক জাতি এবং এক ভাষা ছিল। পুরাতন বাইবেলে, মানুষের ভাষা ভেদের যে গল্প প্রচলিত আছে,—অর্থাৎ, বাবেল নামক নগরে সকল মানুষ মিলিয়া স্বর্গে যাইবার এক স্তম্ভ (বা সিঁড়ি) প্রস্তুত করিতেছিল দেখিয়া সর্ব্বশক্তিশালী জিহোবা উহাদের ভাষা পৃথক্ করিয়া দিয়া সেই মিলন ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন,—কাজেই কর্ম্মীদের কেহ কাহারও কথা বুঝিতে না পারিয়া কেবল গোলমাল করিতে করিতে অবশেষে পৃথিবীর দিকে চলিয়া গেল,—তাহা সকলেই জানেন। আমরাও দেখিতেছি সংস্কৃতভাষ

ব্রাহ্মণের বংশধর এখন তমিড় ভাষা ভিন্ন আর কোনও ভাষা বুঝেন না,এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়। মুঘল বাদশাহ জহাঙ্গীরের সময়ে যে সকল বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ রাজ মানসিংহের সহিত অম্বরে গিয়া তথায় বাস করিয়াছিলেন, —তাঁহাদের বংশধরেরা "বঙ্গালী বোলী" ভুলিয়া গিয়াছেন। তাই,—ভাষার উপর একান্ত নির্ভর করিয়া প্রাচীন ভারতে মানুষের জাতির মর্য্যাদা নির্দ্ধারিত হয় নাই।

রামায়ণ এবং মহাভারতেরও পূর্ব্বে ভারতে "বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের" প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। সেই বর্ণ-প্রতিষ্ঠার মূল অবশ্য বৈদিক সুপ্রসিদ্ধ পুরুষসূক্তের মন্ত্রে,—"ব্রাহ্মণ ইঁহার মুখ হইলেন, বাহুকে ক্ষত্রিয় করা হইল, উরু যাহা, তাহা হইল বৈশ্য, এবং পদদ্বয় হইতে শূদ্র জন্মগ্রহণ করিল" *। মনুসংহিতা এই ঋঙ্মন্ত্রেরই অনুবাদ করিয়া বলিয়াছেন, "মনুষ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে সৃষ্টিকর্ত্তা মুখ, বাহু, উরু এবং পদ হইতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের সৃষ্টি করিলেন †।" এই চারিবর্ণের ব্যাখ্যা যাহাই কেন হউক না, ভারতীয় আর্য্যজাতির আভিজাত্যের মূল এই চারিবর্ণের রহস্যের মধ্যে নিহীত আছে। এই চারিবর্ণের মধ্যে প্রথম তিন বর্ণ দ্বিজ এবং শেষ বর্ণ "একজাতি" অথবা শূদ্র ‡। এই চারিবর্ণের বাহিরে যাহারা, তাহারা কেবল অনার্য্য নহে,—তাহারা বাহ্য, তাহারা দস্যু; তাহারা যদি খুব বিশুদ্ধ ভাবে সংস্কৃত ভাষা শিখিয়া কেবল সেই দৈবী ভাষাতেই আপন আপন কথা বার্ত্তা ও অন্যান্য কার্য্য নির্ব্বাহ করে, তথাপি তাহারা দস্যু; ভগবানের মুখ, বাহু, উরু অথবা পাদ হইতে যাহাদের জন্ম হয় নাই, তাহারা আর্য্যভাষা অথবা ম্লেচ্ছ ভাষা যাহাই কেন ব্যবহার করুক না, তাহারা 'দস্যু" ‡।

যেহেতু চাতুর্ব্বর্ণের লোকেরা সংস্কৃতভাষা ব্যবহার করিতেন,—এবং বর্ণের বাহিরের লোকেরা অসংস্কৃত অর্থাৎ অশুদ্ধ অথবা ভিন্ন প্রকার ভাষা ব্যবহার করিতেন,—সুতরাং বর্ণের বাহিরের লোক দিগকেই "ম্লেচ্ছ" বলা হইত। চাতুর্ব্বর্ণের লোকেরা প্রায়ই বৈদিক যাগযজ্ঞ করিতেন, বাহিরের লোকেরা তাহা করিতেন না,—তাই সেরূপ লোকের দেশকে "ম্লেচ্ছ দেশ" বলা হইত ¶। যাগযজ্ঞের পুরোহিত বা উপদেষ্টা ব্রাহ্মণ যে দেশে নাই, তথায় যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইত না, হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল না; সুতরাং সেরূপ দেশ হইতে বৈদিক আচার ক্রমশঃ উঠিয়া যাওয়ায় বেদাঙ্গ ব্যাকরণের অধ্যাপনা ও অধ্যয়ণও লোপ পাইল। ব্রাহ্মণ এবং বৈদিক আচার বিরহিত দেশের লোকেরা ক্রমশঃ সংস্কৃত ভাষার বিশুদ্ধিতা রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া গেলেন, সুতরাং তাঁহারা "ম্লেচ্ছ" এবং তাঁহাদের দেশ "ম্লেচ্ছদেশ" বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিলেন। এইরূপে বৈদিক ক্রিয়া লোপ এবং ব্রাহ্মণগণের অদর্শন জন্য—পুণ্ড্র, ওড়্র, দ্রবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ ও খশ প্রভৃতি প্রকৃত ক্ষত্রিয়

* ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্‌বাহূ রাজন্যঃকৃতঃ।
উরূতদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥১১॥

† "লোকানাং তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরু পাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রং চ নিরবর্ত্তয়েৎ ॥৩১॥
মনুসংহিতা, প্রথম অধ্যায়।

‡ "ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য স্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ ॥৪॥
মনুসংহিতা দশমাধ্যায়।

‡ মুখবাহূরুপজ্জানাং যা লোকে জাতয়ো বহিঃ।
ম্লেচ্ছবাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্ব্বেতে দস্যবঃ স্মৃতাঃ ॥৪৫॥ ঐ

¶ চাতুর্বর্ণ্য ব্যবস্থানং যস্মিন্ দেশে ন বিদ্যতে।
ম্লেচ্ছদেশঃ সবিজ্ঞেয় আর্য্যাবর্ত্ত স্ততঃ পরমং॥"
স্মৃতিবাক্য।

বর্ণের লোকে ধর্ম্মহীন—বৃষল—হইয়া গেল §। এই দ্রবিড় এবং এইরূপ বহু ক্ষত্রিয় জাতি ক্রমশঃ "ম্লেচ্ছ" বলিয়া পরিচিত। উহাদের "বৃষলত্ব" অথবা "ম্লেচ্ছত্ব" প্রাপ্তি সম্বন্ধে পৌরাণিক আখ্যান এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় ;—

সূর্য্যবংশে বাহু নামক এক সম্রাট্ ছিলেন। যদু-বংশীয় হৈহয় এবং তালজঙ্ঘ ক্ষত্রিয়গণ শক, যবন, পারদ, কাম্বোজ এবং পহ্লব এই পঞ্চ পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় জাতির সহিত মিলিত হইয়া বাহুরাজাকে পরাস্ত ও নির্ব্বাসিত করেন। পরাজিত বাহু রাজা পত্নীদ্বয়ের সহিত হিমালয় সন্নিহিত বনে গমন করেন এবং কালক্রমে তাঁহার তথায় মৃত্যু হয়। তাঁহার পত্নীদ্বয়ের মধ্যে একজন সসত্ত্বা ছিলেন কিন্তু তাঁহার সপত্নী হিংসা করিয়া তাঁহাকে গর্ভস্থ শিশুর সহিত বিনষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে বিষ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ভৃগুবংশীয় ঔর্ব্ব ঋষির আশীর্ব্বাদে রাণীর জীবন রক্ষিত হয় এবং তিনি যথাকালে পুত্র প্রসব করেন। এই পুত্র মাতার ভক্ষিত গর (বিষ) সহ প্রসূত হওয়ায় তাঁহার নাম "সগর" হয় এবং তিনি ঔর্ব্ব ঋষি ও কুলগুরু বশিষ্ঠের নিকট অস্ত্রশাস্ত্র সুশিক্ষিত হইয়া তাঁহার শত্রুগণকে পরাস্ত করিয়া নিজ পৈতৃক রাজ্য উদ্ধার করেন এবং অবশেষে প্রতিজ্ঞা করেন যে শক যবনাদি জাতিকে তিনি নির্ম্মূল করিবেন। উক্ত পরাজিত জাতিরা ভীত হইয়া প্রাণরক্ষার জন্য বশিষ্ঠের শরণাপন্ন হওয়ায় বশিষ্ঠ উহাদিগকে "জীবন্মৃত" করিয়া সগরকে বলেন, 'আমি তোমার প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য ইহাদিগকে নিজধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মণ সঙ্গ পরিত্যাগ করাইয়াছি। সগর ও গুরুর বাক্য প্রতিপালন করিয়া উহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন বটে কিন্তু চিরদিনের জন্য উহাদিগকে অন্যপ্রকার বেশ ধারণ করিতে এবং বেদপাঠ ও যাগযজ্ঞ হইতে বিরত থাকিতে বাধ্য করিলেন। কাম্বোজ ও যবনদিগের মস্তক সম্পূর্ণ মুণ্ডিত, শকদিগের মস্তক অর্দ্ধমুণ্ডিত, পারদদিগের লম্ব কেশ এবং পহ্লবদিগের লম্বশ্মশ্রু করিয়াদিলেন এবং তাঁহারা আত্মধর্ম্ম পরিত্যাগের জন্য ম্লেচ্ছ হইয়া গেলেন *।"

§ "শনকৈস্তু ক্রিয়া লোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতালোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ ॥৪৩॥
পৌণ্ড্রকাশ্চোড্র দ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ ॥৪৪॥ ঐঐ
"বৃষো হি ভগবান্ ধর্ম্মস্তস্য যঃ কুরুতে হ্যলম্।
বৃষলং তং বিদুর্দেবাস্তস্মাদ্ধর্ম্মং ন লোপয়েৎ ॥১৬॥"
ঐ অষ্টমাধ্যায়।

* এই গল্প বায়ুপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশে পাওয়া যায়, সম্ভবতঃ অন্যান্য পুরাণেও আছে। বায়ু পুরাণের শ্লোক এইরূপ,—

"সগরঃ স্বাং প্রতিজ্ঞাং চ গুরোর্ব্বাক্যং নিশম্য চ।
ধর্ম্মং জঘান তেষাং বৈ বেষান্যত্বং চকার হ ॥১৩৯॥
অর্দ্ধংশকানাং শিরসো মুণ্ডয়িত্বা ব্যসর্জ্জয়ৎ।
যবনানাং শিরঃ সর্ব্বং কাম্বোজানাং তথৈব চ ॥১৪০॥
পারদা মুক্ত কেশাশ্চ পহ্লবাঃ শ্মশ্রুধারিণঃ।
নিঃস্বাধ্যায় বষট্কারাঃ কৃতাস্তেন মহাত্মনা ॥১৪১॥"

বায়ুপুরাণ, ৮৮ অধ্যায়।
হরিবংশ, হরিবংশপর্ব্ব, ৩য় অধ্যায়।

বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ অংশ, ৩য় অধ্যায়। অবশেষে আছে "এতে চাত্মধর্ম্ম পরিত্যাগাদ ব্রাহ্মণৈঃ পরিত্যক্তা ম্লেচ্ছতাং যযুঃ॥" শ্রীধর স্বামীরও "বিষ্ণুচিত্তী" টীকায় "জীবন্মৃত" শব্দের অর্থ আছে,—

"স্বধর্ম্মাদ যঃ পরিভ্রষ্টো বৃদ্ধৈশ্চৈব বহিষ্কৃতঃ।
স জীবন্নেব লোকে ঽস্মিন্ মৃত ইত্যভিধীয়তে ॥" ইতিস্মৃতেঃ।
সুতরাং দেখা যাইতেছে সেকালেও "বয়কট্" করার রীতি অতি ভয়ানক ছিল।

ক্রমশঃ "ম্লেচ্ছ" শব্দের অর্থ খুব বিস্তৃত এবং ঘৃণিত হইয়া গেল এবং ম্লেচ্ছ জাতির উৎপত্তির সম্বন্ধে নানারূপ প্রবন্ধের সৃষ্টি হইল, যথা,—*

(১) বিশ্বামিত্র—বশিষ্ঠ বিবাদে বশিষ্ঠ ঋষির গাভীর ফেন হইতে,—

(২) উক্ত বশিষ্ঠ ঋষির গাভীর রোমকূপ হইতে,

(৩) যযাতি রাজার চতুর্থ পুত্র (শর্মিষ্ঠার দ্বিতীয় পুত্র) অনু হইতে,—

(৪) স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় অধার্ম্মিক রাজার দেহ-মন্থন হইতে, ইহারা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ,

(৫) ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের সংযোগ ভিন্ন অন্ত্যজাতি হইতে,—আরও যে গোমাংস ভক্ষণ করে, বহু বিরুদ্ধ ভাষা প্রয়োগ করে, এবং সকল প্রকার আচার শূন্য, তাহাকেই ম্লেচ্ছ বলে। †

ম্লেচ্ছের ভাষা শিক্ষা করিতে নাই ‡, ম্লেচ্ছের সাক্ষাতে মন্ত্রণা করাও নিষিদ্ধ ¶ এবং ম্লেচ্ছ জাতির সহিত সম্ভাষণ করিলে অথবা সংস্পর্শে আসিলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইতে হয় §।

তবেই দেখা যাইতেছে যে প্রথমে অশুদ্ধ ভাষা প্রয়োগকারীকেই "ম্লেচ্ছ" বলা হইত,—এখন শূদ্রের ও অধম, অস্পর্শ্য ও ঘৃণ্য অহিন্দুকেই ম্লেচ্ছ বুঝাইতেছে। এইরূপ অর্থ বৈকল্যের মূলে ধর্ম্মনীতি অথবা রাজনীতি অথবা উভয়ই কার্য্য করিয়াছে, তাহার মীমাংসা ও সিদ্ধান্তের ভার পণ্ডিতগণের উপর দিয়া আমরা বিদায় লইতেছি।

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

---

* (১) "সসর্জ্জ ফেনতঃ সা গৌ ম্লেচ্ছান্ বহু বিধানপি ॥৩৮॥" মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ১৭৫ অধ্যায়।

(২) "রোমকূপেষু ম্লেচ্ছাশ্চ হারীতাঃ স কিরাতকঃ ॥৩॥ রামায়ণ, বালকাণ্ড, ৫৫ সর্গ।

(৩) "দ্রুহ্যো সুতাস্তু বৈ ভোজা অনোস্তু ম্লেচ্ছজাতয়ঃ ॥৩৪॥" মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ৮৫ অধ্যায়।

(৪) "তৎকায়ান্ মথ্যমানাত্তু নিপেতু ম্লেচ্ছজাতয়ঃ।

মৎস্যপুরাণ, ৩৪ অধ্যায়, ৩০ শ্লোক।

শরীরে মাতুরংশেন কৃষ্ণাঞ্জন সমপ্রভাঃ ॥৮॥

মৎস্যপুরাণ, ১৩ অধ্যায়।

(৫) ব্রহ্মক্ষত্রিয় বিট্ শূদ্রা জাতা স্তেহনু ক্রমেণ তু।

ক্রমাতিক্রম যতশ্চান্যে ম্লেচ্ছাস্ত্ববর্ণ সম্ভবাঃ ॥

বৃহৎ পরাশর, ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

† "গোমাংস খাদকোযশ্চ বিরুদ্ধং বহু ভাষতে।
সর্ব্বাচার বিহীনশ্চ ম্লেচ্ছ ইত্যভিধীয়তে॥"
(প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্ব ধৃত বৌধায়ন স্মৃতি।)

‡ "ন ম্লেচ্ছ ভাষাং শিক্ষেত নাকর্ষেচ্ছপদাসনম্॥"
কূর্ম্মপুরাণ, ১৫ অধ্যায়।)

¶ "স্ত্রীম্লেচ্ছব্যাধিতব্যঙ্গান্ মন্ত্রকালেহপসারয়েৎ
॥১৪৯॥ মনুসংহিতা, সপ্তম অধ্যায়।

§ "ন ম্লেচ্ছান্ত্যবা পতিতৈঃ সহ সম্ভাষণং কুর্য্যাৎ।"
বিষ্ণুস্মৃতি, ৬৪ অধ্যায়।

" ম্লেচ্ছলূনাশনস্পর্শে ক্ষেত্রে বা যদি বা স্থলে।
উপস্পর্শে শিরঃ প্রোক্ষ্য সংশুদ্ধো জায়তে দ্বিজঃ॥"
বৃহৎপরাশর, ৬ঠ অধ্যায়।

আত্ম জিজ্ঞাসা।

জিজ্ঞাসা মানব মনের স্বাভাবিক বৃত্তি। শৈশবে জ্ঞানোন্মেষের প্রথম মুহূর্ত্ত হইতে অন্তিমে জীবন প্রদীপ নির্ব্বাণের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত মানবের চিত্ত বৃত্তি তরঙ্গ সঙ্কুল সাগর বক্ষের ন্যায় জিজ্ঞাসার ঘাত প্রতিঘাতে নিরন্তর আন্দোলিত হইতে থাকে। বয়োবৃদ্ধির সহিত ইন্দ্রিয়-গুলি ক্রমশঃ বিকাশ প্রাপ্ত হয়। সংসার চিত্রশালার (museum) নব প্রবিষ্ট শিশুর ইন্দ্রিয় পথে পতিত অসংখ্য পদার্থ উহার জিজ্ঞাসা বা প্রশ্নের বিষয়ীভূত হয়। মানবের ইন্দ্রিয় শক্তি দিন দিন প্রখর হইতে যত প্রখরতর হইতে থাকে, উহার বস্তু তত্বাব বোধ ক্ষমতাও ক্রমশঃ তদনুরূপ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ইতর জীব জন্তুর মত মানুষও ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তু সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞানের আজন্ম অধিকারী। এই স্বতঃসিদ্ধ বা নির্বিকল্পক-জ্ঞান (Intuitive knowledge) জীব মাত্রেরই অস্ফুট আত্ম স্বরূপ। অতি নিকৃষ্ট আণুবীক্ষনিক নিমেষজীবী কীট হইতে অত্যুন্নত মানব বা সিদ্ধ পুরুষগণ যে ভূমিষ্টকাল হইতেই বায়স কুলায় জাত কোকিল শিশুর ভ্রান্ত পিতৃ-জ্ঞানের প্রায় "আমি আমার ইত্যাকার অবোধপূর্ব্ব জ্ঞানের অধিকারী হন, ঐ অবিচারিত অব্যক্ত আত্ম সংবেদনই জীবের জ্ঞান-মূর্ত্তি আত্মা। অধ্যাত্ম শাস্ত্র এই অখণ্ড অদ্বয়, একরস ও একাকার জ্ঞানকেই আত্মা বলিয়াছেন। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎএকমেবা দ্বিতীয়ং" ছান্দোগ্য ৬, ২, ১। হে প্রিয় দর্শন (শ্বেতকেতো) এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব-প্রপঞ্চ সৃষ্টির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম (আত্মা) বিদ্যমান ছিলেন। আচার্য্য শিরোরত্ন শঙ্করের বাক্য,—

> "অনি রূপ স্বরূপং যৎ মনো বাচা মগোচর।
> এক মেবা দ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ না নাস্তি কিঞ্চন॥":
>
> বিবেক চূড়ামণি, ৪৭১।

যাহার লক্ষণ অনিরূপনীয় যিনি বাক্য ও মনের অগোচর (কল্পিত নাম রূপময় বাক্য ও সংসার বিক্ষিপ্ত চিত্তের সাহায্যে যাঁহাকে বলিতে বা চিন্তা করিতে পারা যায় না) সেই একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্মই এই জগতে বিদ্যমান, তদ্ভিন্ন অপর কোন বস্তু নাই। মহর্ষি দ্বৈপায়ন বলেন—

> "বদন্তি তৎতত্ত্ববিদ স্তত্বং যজ্জ্ঞান মদ্বয়।
> ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দতে॥"
>
> শ্রীমদ্ভাগবত, ১ম, ২য়, ১১।

তত্বজ্ঞ (ব্রহ্মবিৎ) ব্যক্তিগণ অদ্বয় অর্থাৎ একাকার যে জ্ঞান তাহাকে তত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ঐ তত্ত্ব উপাসকের যোগ্যতা অনুসারে, আবির্ভাবের তারতম্যে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান শব্দে অভিহিত হয়। এই প্রমানগুলির সরল সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা,

> "জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনের বশে।
> ব্রহ্ম আত্মা ভগবান ত্রিবিধ প্রকাশে॥"
>
> চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যলীলা, ৯২।

অতএব স্থূলতঃ আমরা যেটাকে আত্মা বলিয়া থাকি, সেটার নাম আভাস বা জীব চৈতন্য (Selb consciousness) আর ঐ আভাসের যিনি আশ্রয় বা অধিষ্টান ভূমি তিনিই পরমাত্মা বা ব্রহ্ম (The highest Self.) ভিত্তি গাত্রে প্রতিফলিত সূর্য্য কিরণের ছটার (Reflection) ন্যায় চিৎ প্রতিবিম্বিত পরমাত্মাকেই আমরা এখানে জীব চৈতন্য বলিতেছি। সূর্য্য ও ছটার ন্যায় পরমাত্মা ও জীবাত্মার ভেদাভেদ প্রকাশই আমাদের এই জন্মলব্ধ আত্মজ্ঞানের মূল প্রস্রবণ। এই স্বতঃসম্ভূত জ্ঞানের প্রেরণাতেই আমরা আবাল্য নূতন নূতন বস্তু সকল প্রত্যক্ষ করিয়া উহাদের ভালরূপ চিনিবার জন্য কুতুহলী হই, কৌতুহল জননী অনাদি জ্ঞান পিপাসাই আমাদের স্বরূপ বা আত্মা জিজ্ঞাসার নামান্তর মাত্র। প্রথম হইতে "এটা কি" "ওটা কি" প্রণালীতে যতই আমরা উচ্চতর বস্তু সংক্রান্ত জ্ঞান লাভ করিতে থাকি,

ক্রমে ততই মহত্তম বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষা আমাদের হৃদয়ের অধিকাংশ স্থান আত্মসাৎ করে। ভোগলোলুপ ইন্দ্রিয়ের ভোগাকাঙ্ক্ষার মত জ্ঞানপিপাসু জীবের জিজ্ঞাসা ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করে। ভোগ হইতে ভোগান্তরের ন্যায় জ্ঞান হইতে জ্ঞানান্তরের উৎপত্তি প্রকৃতিসিদ্ধ। ভোগ্য বস্তু যতই নিকৃষ্ট হয়, ঐ বস্তু ভোগকর্ত্তা ততই নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিশীল ও নীচ যোনি-জাতরূপে নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। এইরূপ জ্ঞেয় তত্ত্ব বা জ্ঞানের বিষয় (objects) যত উচ্চ গ্রামের (Highest Standard) হইবে, জ্ঞাতা (knower) তত উত্তরোত্তর সূক্ষ্মতম বস্তু বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে না। এতাদৃশ উৎকৃষ্ট জ্ঞানলিপ্সার প্রতি মানব মনের স্বাভাবিক গতি অনাদি। নগ্ন বালক ধূলাখেলায় আমোদ পায়, কিন্তু যখনই সে ধূলা ছাড়া অপর কোন ভাল খেলনার সন্ধান পায়, তখনই ধূলা খেলা ছাড়িয়া ঐ নব প্রাপ্ত ক্রীড়নকেই আসক্ত হইয়া পড়ে। এইরূপ বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্যের চিত্তবিনোদন দ্রব্য জাতের উপর মানব মনের সহজ নিঃসংহতার প্রতি সতর্ক দৃষ্টিক্ষেপ করিলে অসত্য হইতে সত্য, অশিব হইতে শিব, ও অসুন্দর হইতে সুন্দরের সুখ সান্নিধ্য লাভের জন্য জ্ঞানবান মানব যত্নশীল, ইহা অনায়াসে প্রতীতি হয়। মহাত্মা মিল (I. S. Mill) ভোগ ও জ্ঞান রাজ্যের উৎকর্ষাপকর্ষের তুলনা করিয়া দেখিয়াছেন, "It is better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied; better to be Socratis dissatisfied than a fool satisfied." ভোগ তৃপ্ত শূকর জন্ম অপেক্ষা অসন্তুষ্ট দরিদ্র মানব জীবন শতগুণে শ্রেয়স্কর। মূর্খ ভোগতৃপ্ত ধনাঢ্যরূপে জন্মগ্রহণ অপেক্ষা নিষ্কিঞ্চন জ্ঞান যোগী সক্রেটিসের জন্ম কোটি গুণে শ্রেষ্ঠ। ভারতের অতি প্রাচীন জনপ্রবাদও ঘোষণা করে, দানব রাজ বলি একশত মূর্খের সহিত স্বর্গে না যাইয়া সাতজন মাত্র জ্ঞানীর সঙ্গে পাতালে গিয়াছিলেন। সুতরাং জ্ঞানবত্তাই যে মানবের উৎকর্ষাপকর্ষের মাত্রা নির্দ্ধারণের যোগ্যতম মানদণ্ড, এ বিষয়ে বোধহয় সকলেই সমমতাবলম্বী। এই স্বতঃসিদ্ধ বা সহজ জ্ঞানটী শিক্ষা ও সংসর্গেরগুণে ক্রমশঃ নির্ম্মল, পবিত্র ও সূক্ষ্ম হইয়া থাকে। শাণ ঘৃষ্ট স্বর্ণরত্নাদির ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধির ন্যায় অনুশীলনের সাহাচর্য্যে এই স্বপ্রকাশ জ্ঞানরত্নও মহোজ্জ্বল হইয়া থাকে। ছায়াময় স্থান যেরূপ স্বপ্রকাশ সূর্য্য কিরণের পূর্ণ প্রকাশের প্রতিবন্ধক, আত্ম-স্বরূপ স্বপ্রকাশ জ্ঞানও তেমনি অজ্ঞান তামসাচ্ছন্ন হৃদয়-গুহার নিরোধে পূর্ণ জ্যোতিতে প্রকাশ পায় না। ছায়ার অপগমে সৌরকর নিকরের ন্যায় অজ্ঞান তামসের অপসারণে উহা স্বয়ংই উদ্ভাসিত হয়। এই অজ্ঞান যবনিকা সরাইয়া ফেলিবার একমাত্র যন্ত্র আত্মজ্ঞান। মানবের স্বভাবসিদ্ধ অশিক্ষিত জ্ঞান অনুশীলন ও সংসর্গের প্রভাবে উন্নতির উচ্চ ধারায় পড়িয়া যখন চরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়; তখন উহা প্রকৃত জ্ঞান নামে অভিহিত হইতে পারে। অসংস্কৃত ইক্ষুরস গুড় প্রভৃতি পরিণামের মধ্য দিয়া আসিয়া যেমন বিশুদ্ধ মিশ্রীর নির্ম্মল আকার ও সুমধুর স্বাদ ধারণ করে, মানবের জন্মলব্ধ অনুন্নত জ্ঞানও ঠিক তেমনি চর্চ্চা, পর্য্যবেক্ষণ ও বিচারাদির দ্বারা ক্রমিক বিশুদ্ধি লাভ করে। ভোগ জগতের উপাদেয় বস্তুগুলির সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচিত মানব যখন স্বভাবের নিয়মে ধীরে ধীরে নিবৃত্তির পথে অগ্রসর হয়, তখন তাহার হৃদয়ে যে এক নিত্য অচঞ্চল অনন্ত জ্ঞানের তীব্র আকাঙ্ক্ষা অস্ফুট ভাবে জাগিয়া উঠে, উহাই আত্ম জিজ্ঞাসার মূল সূত্র। ইতর জীব জন্তুর ন্যায় ভোগ লম্পট মানবের হৃদয়ে উহার একান্ত স্থানাভাব। পার্থিব সুখৈশ্বর্য্যেরও আগতিক সর্ব্ববিধ জ্ঞানের অধিকারী হইয়াও মানব যখন হৃদয়ে শান্তির সুবিমল মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিতে পায় না, তখন সে ঐগুলি দূরে পরিহার করিয়া কোনও অপার্থিব বৈভব ও জ্ঞানের লালসায় ব্যাকুল হইয়া থাকে। যে অর্থকে আত্মদর্শী ঋষিকুল অনর্থের প্রতিমূর্ত্তি

বলিয়া চিনিয়া ছিলেন, আমরা দৃষ্টি দোষে সেই অর্থকেই পরমার্থরূপে সানন্দে বরণ করিয়া লইয়াছি। জীবন রক্ষার জন্য ভোজনের আবশ্যক, কিন্তু অতি ভোজন মন্দাগ্নি রোগের নিদান হইয়া জীবন রক্ষার পরিবর্ত্তে উহার ধ্বংসেরই কারণ হয়। সংসারে অর্থ অতি প্রয়োজনীয় বস্তু এবং সাংসারিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রধান উপায় হইলেও উহা কখনও বিবেকী মানবের জ্ঞান-নির্ম্মল-হৃদয়ে পরম আনন্দের স্রোত প্রবাহিত করিতে পারে না। আমাদের পরমার্থ দ্রষ্টা যোগ শাস্ত্র রচয়িতা স্পষ্টই বলিয়াছেন, পার্থিব দ্রব্যরাশি আপাততঃ যতই সুখময়রূপে প্রতীয়মান হউক না কেন, পরিণামে বিবেকীর চক্ষে উহা দুঃখজনকরূপেই প্রতীত হইয়া থাকে। "পরিণামে তাপ সংস্কার দুঃখৈগুণ বৃত্তি বিরোধাচ্চ দুঃখ মেব সর্ব্বং বিবেকীনঃ।" পাতঞ্জল দর্শন ২য় পাদ ১৫ সূত্র। আদি-বিদ্বান সাংখ্যকর কপিলদেবও বুক ঠুকিয়া বলিয়াছেন, এই পরিণাম ধর্ম্মী, ক্ষণ বিনশ্বর সংসারে জীবের সুখের আশা বিড়ম্বনা মাত্র। রুবায়েতে উল্লিখিত কবিবর ওমার খৈয়ামের সুগভীর মর্ম্মোচ্ছাসের প্রতিধ্বনি প্রচার করে,

"মানবের সুখ আশা এ ছার জগতে
ফলে কিংবা শুধু ভস্মে হয় পরিণত,
কোথা মিলাইয়া যায় ক্ষনেক উজলি
ধূলিময় মরামুখে তুষারের মত॥"

পার্থিব বৈভবদেবের একনিষ্ঠ উপাসক পাশ্চাত্য জাতির জ্ঞান গুরু সুপণ্ডিত স্মাইল (Smile)ও মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিয়াছেন, "Wealth is not necessary for comfort. Luxury requires wealth, but not comfort" সুখশান্তি উপভোগের জন্য ধনই একমাত্র প্রয়োজনীয় নহে। ভোগ বিলাস চরিতার্থতা অর্থের অনুগ্রহ সাপেক্ষ, সুখ শান্তি কখনও অর্থের মুখাপেক্ষী নহে। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানঋষি সার জগদীশচন্দ্রও তাঁহার জ্ঞান সাধনার মুক্তিপীঠ বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠার স্বস্তি বাচনে বলিয়াছেন, "আমি মনে করি জ্ঞান বিধাতার দান, তাহা অর্থ লাভের উপায় নহে। * * * অমরত্বের বীজ চিন্তায় (জ্ঞানে) চিত্তে নহে"। এখন বোধহয় প্রাজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, জ্ঞানই মানবের জীবন সর্ব্বস্ব, আর এই জ্ঞান যখন উহার উচ্চতম কোটিতে আরূঢ় হয়, অর্থাৎ যে জ্ঞান লাভ করিলে আর জ্ঞানান্তর লাভের কামনা থাকে না, তাহারই নাম আত্মজ্ঞান। জন্ম মৃত্যুর ক্রীতদাস মানবের ভাগে এরূপ উচ্চ অবস্থা অতি অল্পই আসিয়া থাকে। অল্প হইলেও ধর্ম্ম ক্ষেত্র ভারতের মাটিতে ইহার অত্যন্তাভাব ঘটে নাই। বৃহস্পতি তুল্য তীক্ষ্ণধী রাজমন্ত্রী সনাতন যখন পতিতবন্ধু নবদ্বীপেন্দুর শান্তি শীতল শ্রীচরণকমলে আত্ম সমর্পণ করেন, তখন তাঁহার মনে সর্ব্বাগ্রে এই মহান প্রশ্নের উদয় হইয়াছিল,—

"কে আমি? আমারে কেন জারে তাপত্রয়।
ইহা না জানিলে জীবের কৈসে হিত হয়॥"

চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যলীলা ২০ পরি।

আমি কে, আমার যথার্থ স্বরূপ কি? আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক নামক তাপত্রয় কেন আমাকে সর্ব্বদা সন্তাপিত করে? আমি যদি ইহা না জানি, অর্থাৎ আমি যদি যথার্থ "আমি কে" না চিনিতে পারি, অথচ নিয়ত সংসারজ্বালায় জ্বলেপুড়ে মরি, তাহা হইলে আমার হিত হইবে কি প্রকারে? যে নিজে নিজকে চিনে না, সতত সংসারের দুঃখ কষ্টে জর্জ্জরিত; সংসারে তাহার সুখের আশা কোথায়? তাই আত্মতত্ত্বসন্ধিৎসু ভোগ বিতৃষ্ণ জ্ঞানী সনাতন আমাদের ন্যায় অবোধ জীবের পক্ষ হইয়া কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "হে দয়াল প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ! কৃপা করিয়া আমার প্রকৃত স্বরূপ বুঝাইয়া দিয়া এই অপার দুঃখ পারাবার হইতে উদ্ধার করুন।" যতদিন মানব নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে না পারে, ততদিন সে বাষ্পসম্ভূত জল ও জলসম্ভূত বাষ্পের ন্যায় চিরকাল

এই সংসারে যাতায়াত করিয়া জন্ম মরণের ঘৃণিত দাসত্ব করিয়া থাকে। আমরা মহাত্মা সনাতনের বিদ্যাবুদ্ধি, যশমান, পদগৌরব, অর্থবৈভব কিছুরই অভাব দেখিতে পাই না। অথচ সব থাকিতেও কিছুই নাইর মত তিনি অতি দীনহীন দরিদ্র আর্ত্তের ন্যায় কি যেন একটা অজানা বস্তু পাইবার আশায় অহরহ ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন। এই যে ছট্‌ফটানি (Restlessness) বা তীব্র ব্যাকুলতা, ইহাই আত্ম জিজ্ঞাসার প্রসূতি। মহাত্মা পরমহংসদেব শিক্ষা দিয়াছেন, জলের ভিতর মাথা ডুবাইয়া ধরিলে মনের মধ্যে যে বৈক্লব্য (Uneasiness) জন্মে, উহা হইতে আত্ম জিজ্ঞাসার তত্ত্ব অনুমিত হইতে পারে। অনাদি সৃষ্টিপ্রবাহের ন্যায় অনাদি কাল হইতে আত্ম সংক্রান্ত জটিল প্রশ্ন আত্মজিজ্ঞাসু মানব সমাজে প্রচলিত রহিয়াছে। জগতের আদিম জ্ঞান-বিজ্ঞান-ভাণ্ডার বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, দর্শন, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, কাব্য, নাটক, আখ্যান, উপাখ্যানেও কথাচ্ছলে সর্ব্বত্র এই মহৎ তত্ত্ব বুঝাইবার বহুমুখী চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে যত্নের কোন ত্রুটি না থাকিলেও যত্নানুরূপ ফল লাভের পর্য্যাপ্ত অভাব লক্ষিত হয়। আত্ম তত্ত্বের উপদেশ মূলকগ্রন্থ, প্রবন্ধ, নিবন্ধাদির অতি বাহুল্য আমাদিগকে সাধকবর তুলসীদাসের "গুরু মিলে লাখ লাখ চেলা নাহি মিলে এক।" এই মহাবাক্যের যথার্থ্য স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতেছে। হাটে বাজারে সর্ব্বত্র গ্রন্থ ও উপদেষ্টার ছড়াছড়ি, কিন্তু উপদিষ্ট বিষয়ের বোদ্ধা ও অনুভাবিতার অভাব পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। মুদ্রিত গীতা ও চণ্ডীর পত্রে (কাগজে) বেনে দোকানের মসলা বাঁধার ন্যায় ঐ সকল শাস্ত্র গ্রন্থ যত্রতত্র ধূলি ধূসরিত ও পদদলিত হইয়া "কলৌ বেদান্তিনঃ সর্ব্বে ফাল্গুনে বালকা ইব॥" প্রবচনের মান রক্ষা করিতেছে। ফলতঃ মৃত ব্যক্তি যেমন মৃত্যুর পর পারের সংবাদ দিতে পারে না, তত্ত্ববিৎ মুক্তজীবও সেইরূপ স্বসাক্ষাৎকৃত পরমাত্ম তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য বদ্ধমানব সমাজে ফিরিয়া আসেন না। কাজেই "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং" নীতিতে পরম রহস্যময় সুদুর্ব্বোধ আত্মতত্ত্ব চিরদিন অজ্ঞান গুহায় অবরুদ্ধ রহিয়াছে। উহা বুঝাইবার কথা মুখে আনিবার সাহস বা ধৃষ্টতা আমার নাই। কেবল পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনগণের পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া দু' একটা কথা বলাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। মুখরোচক মিষ্টান্ন শব্দের উচ্চারণে ও শ্রবণে মিষ্টতার অনুভব হয়। পরম ধর্ম্ম আত্মতত্ত্বের যথামতি আলোচনায় কথঞ্চিৎ আত্মপ্রসাদ লাভের আশা নিতান্ত অন্যায় নহে। সহজে বোধগম্য হইবে বলিয়া প্রথমতঃ দু' একজন সাধক ও ভাবুক বঙ্গ কবির রচিত গানের প্রসঙ্গে দেখা যায়—

"বল ভাই সুধাই তাই
ম'লে আমরা কোথায় যাই;
পূর্ব্ব জন্মে কি ছিলাম তা' আমাদের মনে নাই।
পাঁচে পাঁচ মিশাবে বলে, আত্ম কেবা কোথা বলে,
আত্মা বহির্গত কালে কে দেখে খাতাই;
চর্ম্ম চক্ষুর অগোচর, জ্ঞান চক্ষুর কই গোচর
কৃষ্ণধন ভাবে বহুতর শোনা কথা কস সবাই॥"
পাঁচালী গায়ক ৺কৃষ্ণধন দাস।

সাধক শিরোমণি রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন;—

"বল দেখি ভাই কি হয় মলে,
এই বাদ অনুবাদ করে সকলে
* * * * * *
প্রসাদ বলে যা ছিলি ভাই তাই হবিরে মরণ কালে,
যেমন জলবিম্ব জলে উদয় জল হ'য়ে সে মিশায় জলে॥"

উদ্ধৃত বহুজন বিদিত পদ দুইটীতে আমরা আত্মার জন্মে মৃত্যুর স্পষ্ট খবর পাইতেছি। একজন (কৃষ্ণধন) ভ্রান্ত মানব বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া আত্মার পৃথক অস্তিত্ব সম্বন্ধে ঘোর সন্দিহান। দ্বিতীয় বিশ্বাসী মাতৃভক্ত সন্তান রাম প্রসাদ জলবিম্বের উপমা দিয়া সুপ্রসিদ্ধ চরিতামৃত গ্রন্থের,

"ব্রহ্ম হইতে জন্মে বিশ্ব ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্ম পুনরপি হয়ে যায় লয়॥"

এই মহা সত্যের কিংবা,—

"যথানন্ত সুখা ভোধৌ বহুধা বিশ্ব বীচয়ঃ।
উৎপাদ্যন্তে বিলীয়ন্তে মায়া মারুত বিভ্রমাৎ॥"

বিঃ, চূঃ, ৪৯৮।

পরিপূর্ণ সুখ সাগর আমাতে বহুবিধ ভব তরঙ্গাবলী মায়ারূপ বায়ুদ্বারা আন্দোলিত হইয়া উৎপন্ন ও বিলীন হইতেছে। গুরু শঙ্করের এই সুগম্ভীর উপদেশের; অথবা লেখকের পূর্ব্বোক্ত পর্য্যায় ঘটিত (Alternate) বাষ্প সলিল দৃষ্টান্তের দৃঢ় সমর্থন করিতেছেন। মনুষ্য প্রবল অবিদ্যার মোহে সম্মোহিত হইয়া দেহ, গেহ, বিত্ত, পরিজন প্রভৃতি যে সকল অনিত্য অনাত্ম পদার্থকে আত্মা বা আমি বলিয়া জড়াইয়া ধরিয়া থাকে, উহার কোনটীই আত্মা নহে। সৎ, চিৎ, আনন্দই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ। যাহা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তিন কালেই কোনওরূপে পরিবর্ত্তিত, ক্ষয় ও ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না, তাহাই সৎ। যাহা অন্য বস্তুর সাহায্য না লইয়া সূর্য্য ও প্রদীপের ন্যায় স্বপ্রকাশ (Self luninous) এবং যাহা নিজেতে আরোপিত সকল পদার্থের প্রকাশক, তাহাই চিৎ। আর যাহা নিত্য, নিরতিশয় (যাহার সমান ও অধিক নাই) ভূমানন্দময় পরপ্রেমের আধার, তাহাই আনন্দ। এই নিত্য সত্য, নিত্য জ্ঞান ও নিত্যানন্দের অনাদি, অনন্ত ও মধুর সমবায়কে আত্মা কহে। বায়ু, পিত্ত, কফ ত্রিধাতুর সাম্যাবস্থা যেমন মানবের স্বাস্থ্য ও জীবনের পরিচায়ক, ভূমা সত্তা, ভূমা জ্ঞান, ভূমানন্দও তেমনি পরমাত্মার পরিপূর্ণ অবস্থার অভিব্যঞ্জক। যেখানে এ তিনের একটীরও কিছুমাত্র অঙ্গহানি ঘটে, তথায় ধাতু বৈষম্য-জনিত মানবের স্বাস্থ্য বিকৃতির ন্যায় আত্মার পূর্ণাভিব্যক্তির ব্যাঘাত জন্মে। সুধীবর টেনিসন্ (Tennyson) তাঁহার "The palace of art" শীর্ষক কবিতার প্রস্তাবনায় (prologue) "That beauty, Good and knowledge are three sisters" ইত্যাদি বর্ণনায় এই সৎ, চিৎ ও আনন্দ বা সন্ধিনী, সংবিৎ, হ্লাদিনী-রূপিনী পরমাত্মা শক্তিকে তিনটী অভিন্ন হৃদয়, বিচ্ছেদ ভীরু সহোদরা ভগিনীর সহিত উপমিত করিয়া উহাদের ক্ষণিক বিচ্ছেদে মর্ম্মন্তুদ বেদনার আভাস দিয়াছেন। কবিবরের সমাসোক্তি (Personification) আমাদের অচেতন ভাবময় শাস্ত্র বাক্যকে বেশ সজীব করিয়া তুলিয়াছে। যাহা সত্য, জ্ঞান ও সুন্দর শিক্ষিত মানব মনের মতি স্বভাবতঃই সেদিকে। আমাদের পান্থধাম মায়িক জগতটী অসত্য, অজ্ঞান ও অসুখের একটী বিরাট পন্থশালা। আমার দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া ইহার দশদিকে যে বস্তুস্তূপ বিরাজ করিতেছে ইহার সকলগুলিই অল্প বিস্তর পরিমাণে অসৎ, অজ্ঞান ও দুঃখাস্বাদ। মায়ার ছাঁচে ভ্রান্ত মানবের মনগড়া নাম রূপময় এই জগৎ প্রপঞ্চ, ইহার কোনটীই আত্মা নহে।

ভূমির উপরিস্থিত সুবৃহৎ অট্টালিকার মত চৈতন্য-সত্তার অবলম্বনে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড দণ্ডায়মান। অট্টালিকার উৎপত্তির পূর্ব্বে ও ধ্বংসের পরে ভূমির স্বরূপে অবস্থিতির ন্যায় জগতের সৃষ্টির আদিতে ও লয়ের অন্তে কোন এক অখণ্ড চৈতন্য সত্তার চির অধিষ্ঠান। বর্ষার জলদমালা সমাবৃত অমাবস্যা নিশীথিনীর ঘোর অন্ধকারে বিভিন্ন নামরূপধারী বস্তু সকল একাকার দেখায়। মহা বন্যা প্লাবিত ভূখণ্ডে উচ্চ নীচ সকল ভূমিই সমতল ও জলময় দেখাইয়া থাকে। আত্মদর্শীর ব্রহ্মদৃষ্টিতে জাগতিক সকল পদার্থ সেইরূপ ব্রহ্মময় হইয়া যায়। তিনি স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল; দেব, দানব, মানব; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য; কূপ, নদী, সাগর; বৃক্ষ, লতা, গুল্ম; সমগ্র জগৎ এক সমুজ্জ্বল চৈতন্যের গাঢ় রঙ্গে রঞ্জিত দেখেন। জ্ঞানী পর্য্যায়ভুক্ত একালের একজন আকুমার ব্রহ্মচারী বৈষ্ণব ঋষি কৃষ্ণদাস কবিরাজ দেখাইতেছেন,

"স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তার ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি।।"

জ্ঞানী বাহ্যদৃষ্টিতে স্থিতিশীল ও গতিশীল চরাচর জগৎ প্রত্যক্ষ করিলেও তাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টি প্রসারিত হওয়ায় ঐ সকলের জড়ীয় মূর্ত্তি তাঁহার মানস নেত্রে প্রতিফলিত হয় না। বিষদন্তহীন বিষধরের ন্যায় তাঁহার বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলি অকর্ম্মণ্য হওয়ায় তিনি তখন ভিতরে কেবল মনোময়ীর চৈতন্য মূর্ত্তি বা আত্ম সাক্ষাৎকারে নিরত থাকেন। ঐ মহাত্মা আর একটু অগ্রসর হইয়া পূর্ব্বোক্ত পয়ারের বিশদ ব্যাখ্যা স্থলে লিখিয়াছেন,

"ভক্ত আমাপ্রেমে বাঁধিয়াছে হৃদয় ভিতরে।
যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা দেখয়ে আমারে॥"

বস্তুতঃ প্রেমে ভক্তের অন্তর্দৃষ্টি উন্মীলিত হইলে তিনি তখন বাহিরের কোনও বস্তু দেখিতে পান না। সে সময় তিনি তাঁহার হৃদয় সিংহাসনের একমাত্র অধীশ্বর পরমেশ্বরের ভুবনমোহন রূপের ভাণ্ডার উন্মুক্ত দেখিয়া আত্মহারা হইয়া যান। যে অবস্থায় জীব আপনাকে ভুলে, সে অবস্থায় পরের কথা মনে উদয় হইবে কিরূপে? ফলকথা, বাহ্যেন্দ্রিয়গুলি জ্ঞান আহরণের যন্ত্র হইলেও মনের পরিচালনার অভাবে সময়ে সময়ে উহাদের কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়। মন যখন ভিতরে মনের মনকে (আত্মাকে) দর্শন করিতে তৎপর, তখন মনসংযোগ না থাকায় বাহ্য ইন্দ্রিয় চক্ষুরাদির কার্য্য নিরোধ হইয়া থাকে। এরূপ অন্যমনস্কতার অবস্থায় চক্ষুর সমক্ষে পাহাড় পর্ব্বত উপস্থিত হইলেও মানব তাহা দেখিতে পায় না, এটা সহজ সত্য দার্শনিক তথ্য। ইহাতে সরলপ্রাণ আদিম শাস্ত্রকারদিগের প্রতারণামূলক কোনওরূপ বুজরুগীর (Humbuggery) গোলক ধাঁদার (Labyrinth) গন্ধ পাওয়া যায় না। পিত্ত বিদগ্ধ দৃষ্টি বা রাতকানার দল এ জগতে চন্দ্র নাই বলিয়া গগনভেদী চীৎকার করিলে, চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি উহাতে উপহাসেরই সুযোগ পাইবেন। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, আমরা দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ প্রভৃতি যেটাকেই আত্মা বলিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া থাকি না কেন, উহাদের ভিতরে তুষাচ্ছাদিত তণ্ডুলের মত যে বিরাট্ আত্ম-সত্তা বিরাজিত আছেন, তাঁহার সম্বন্ধে যদি কিছু মাত্র ধারণা থাকে, আর ঐ মহতী ধারণাকে উপাসনাদির সাহায্যে ক্রমশঃ পরিশুদ্ধ করিতে যত্নশীল হই, তাহাহইলে একদিন না একদিন, আঘাতে (Husking) তুষের চ্যুতিতে তণ্ডুলোৎপত্তির ন্যায় তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলনে ও ক্রম পরিপাকে এই অনাত্ম পদার্থগুলি একে একে স্বরূপ চ্যুত হইলে অবশেষে এক অদ্বিতীয় পরমাত্মাই আমাদের দৃষ্টিপথে দ্যোতমান থাকিবেন। নাম বা রূপ কখনও বস্তুর প্রকৃতির বিকৃতি ঘটাইতে পারে না। জল,পানি,(Water)যে নামই দাও উহাতে জলের জলত্ব লুপ্ত হইবে না। লাল, কাল, সবুজ যে রঙ্গেই রঞ্জিত কর উহার জলত্ব নষ্ট হইবার নহে। সিংহচর্ম্মাবৃত গর্দ্দভ, ময়ূরপুচ্ছশোভিত দাঁড়কাক, নীলাবর্ণ শৃগাল ইহারা যেমন চর্ম্মাদি আবরণে সমাবৃত হইয়া গর্দ্দভ, কাক ও শৃগালই ছিল; সেইরূপ নাম রূপাদি উপাধির যোগে আত্মার কণাংশ মাত্র স্বরূপ চ্যুতি হয় না। ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিতে বায়ু সংযোগ হইলে উহা যেরূপ তৎক্ষণাৎ প্রজ্বলিত হয়, নাম রূপাদি উপহিত আত্মা তত্ত্বজ্ঞান সম্পর্ক হইবা মাত্র সেরূপই প্রকাশ পাইয়া থাকেন। নামরূপ উপাধির তুচ্ছতাসম্বন্ধে পাশ্চাত্য কবিগুরু সেকস্পীয়ার উচ্চকণ্ঠে সাক্ষ্য দিতেছেন,

"What's Montogue ? it is nor hand nor foot"
Nor arm nor face, nor any other part
Belonging to a man, O ! be some other name
Whats' in a name ? that which we call a rose
By any other name would smell as sweet, etc.

Romeo & Juliet, act II, scene I.

এই পদ্যাংশের মর্ম্ম ও উদাহরণ পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে; সুতরাং ব্যাখ্যা পুনরুক্তি মাত্র। এই দুরূহ

প্রবন্ধের কলেবর পুষ্টির জন্য আর বাগ্‌বাহুল্য অশোভন। সুবিখ্যাত পাশ্চাত্য কবির ভাব ঝঙ্কার একজন অতি প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক কবির প্রশস্ত হৃদয়ে কতকাল পূর্ব্বে কিরূপ অনুরণিত হইয়াছিল, উহা দেখাইয়া এ প্রবন্ধের সমাপ্তি করিতেছি। বিষ্ণু পুরাণের দ্বিতীয়াংশের তৃতীয় অধ্যায়ে ৯৭ ও ৯৮ সংখ্যক শ্লোকে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ জড় ভরত আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসু সৌবীর নরপতিকে অতি সরল ও সংক্ষিপ্ত ভাবে বুঝাইতেছেন;

"ত্বং কিমেবং স্থিতঃ কিন্তু শিরস্তব তথোদরং।
কিমু পাদাদিকং ত্বং বী-ত বৈতৎ কিং মহীপতে॥
সমস্তাবয় বেভ্যস্ত্বং পৃথক্ ভূপ ব্যবস্থিতঃ।
কোঽহমিত্যত্র নিপুনো ভূত্বা চিন্তয় পার্থিব।"

'হে মহারাজ! আমার সম্মুখে তুমি অবস্থিত; অথবা তোমার মস্তক ও উদর অবস্থিতি করিতেছে? তুমি কি চরণ প্রভৃতি স্বরূপ, অথবা এই চরণাদি তোমার? হে নরেন্দ্র? এস্থলে কি বলা উচিত? ভূবস্তুত? তুমি চরণাদি সকল অবয়ব হইতে পৃথক ভাবে অবস্থিত; অর্থাৎ, তোমার' কেশাগ্র হইতে নখাগ্র পর্য্যন্ত কোনটাই তুমি বা আত্মা নহ। এখন "নেতি নেতীতি" বিচার মুখে ঐ সকল অনাত্ম পদার্থ ত্যাগ করিয়া নৈপুণ্য সহকারে চিন্তা করিয়া দেখ "আমি কে?" দর্শন শাস্ত্রের এই নারিকেল ফলে পম রসগর্ভ আত্মোপদেশ পাশ্চাত্য কবির কাব্যের ভাষায় পাণ্ডুলেখ (Manuscript) মাত্র। "মণ্টেগু কাহাকে বলে? তোমার হস্ত, পদ, বাহু, বদন কোনটাই মণ্টেগু নহে (আত্মা) নহে। গোলাপ ফুলকে যে নামেই ডাক, উহার স্নিগ্ধ শীতল মধুর সৌরভের গৌরব কিছুমাত্র লুপ্ত হইবে না," ইত্যাদি বাক্য পুরাণের সহিত কোন বর্ণতঃ বিভিন্ন। মানুষ সবই এক। বর্ণভেদে জাতিভেদ ও মর্য্যাদার ন্যূনাধিক্য আধুনিক সমাজের একটা গণ্ডের উপর প্রকাণ্ড বিস্ফোটক' আমরা আত্মজিজ্ঞাসা সম্পর্কে যথাসাধ্য ও যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম। যে তত্ত্ব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের উপযুক্ত ভাষা অদ্যাপি জগতে আবিষ্কৃত হয় নাই, পূর্ব্বোক্ত দেশী কেন্দ্রগণ যাহাকে "গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়ঃ" বলিয়া নীরব ব্যাখ্যার কৌশলে জিজ্ঞাসুর সংশয় নিরাসের আভাস দিয়াছেন, ঐ দুর্ব্বোধ বিষয় লইয়া নাড়াচাড়া করায় অন্ততঃ নিজের কিছু উপকার আছে বলিয়া মনে করি। মনুষ্যরূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের সহিত অল্পাধিক পরিচিত থাকা মানব মাত্রেরই প্রধান কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চারিটী পুরুষার্থের মধ্যে ধর্ম্ম প্রথম স্থান পাইয়াছেন। সকল প্রকার ধর্ম্মের মধ্যে আত্মদর্শন সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। ভগবান গীতাকার "রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং" বলিয়া আত্ম জ্ঞানকে জ্ঞানরাজ রাজেশ্বর পদবীতে ভূষিত করিয়াছেন। যোগাচার্য্য যাজ্ঞবল্ক্য আত্ম জ্ঞানের পরম ধর্ম্ম আখ্যা দিয়াছেন,—

ইজ্যাচার দমাহিংসা তপঃ স্বাধ্যায় কর্ম্মনাং।
অয়ন্তু পরমোধর্ম্মো যদ্ যোগে নাত্ম দর্শনং॥"

'যজ্ঞ সদাচারাদি সকল প্রকার ধর্ম্ম হইতে যোগ সহকারে আত্ম দর্শন শ্রেষ্ঠ বলিয়া ইহা পরম ধর্ম্ম।' কেনোপনিষদ তারস্বরে শিক্ষা দেন;

"আত্মনা বিন্দতে বীর্য্যং বিদ্যয়া মৃতমশ্নুতে॥" ২, ৪।

লোক আত্মদ্বারা অমৃতত্ব লাভের বীজবীর্য্য লাভ করে, এবং ব্রহ্মবিদ্যাদ্বারা সাক্ষাৎ অমৃতের অধিকারী হয়। এই আত্মজ্ঞানরূপ অমৃত লাভের প্রথম ও প্রধান উপায় আত্মজিজ্ঞাসা। সংসার চক্রনেমির গুরুভার লৌহ বেষ্টনীর গুরুতর আঘাতে পুনঃ২ পিষ্ট মানব যদি নিকৃষ্ট জীব জন্তুর ন্যায় কেবল সুলভ আহার, বিহার, নিদ্রা ও বার বার জন্মমরণকেই মনুষ্যত্বের চরম লক্ষ্য মনে করে; তাহাহইলে ঐ সকল আত্মপ্রতারিত (Self deluded) দুর্ভাগ্যের ইহ জীবনে যেমন সুখের আশা ও ধন পিপাসার নিবৃত্তি ঘটনায় দুরন্ত, অশান্তি, পর জীবনেও তদ্রূপ অনন্ত নরক। ইহারা কারাগার হইতে পলায়িত বন্দী। স্বকৃত দুষ্কর্ম্মের ফলে কারাগারে যেমন অশেষ ক্লেশ ভোগ করে,

কারাগৃহ ভাঙ্গিয়া পলায়নের পর ধৃত হইলে ততো অধিক দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া থাকে। প্রাচীন উপনিষদশাস্ত্র ইহাদের কঠোর দণ্ডের বিধান করিয়াছেন :

"অসূর্য্যা নামতে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভি গচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনোজনাঃ॥

আত্মঘাতিগণ চিরকাল নিবিড় তিমিরাচ্ছন্ন ঘোর নরকে পচিতে থাকে। দার্শনিক চূড়ামণি শ্রীমদ্ ভাগবতকারও ইহাদিগকে "পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাং" রূপে বর্ণনা করিয়া পশুঘাতী নিষ্ঠুর ব্যাধ ও মহাপাতকী বলিয়াছেন। এই সকল মানব মাত্রেরই মহাকল্যাণপ্রসূ আত্ম জিজ্ঞাসায় ব্রতী হওয়া একান্ত বিধেয়।

শ্রীনিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ।

শল্যতন্ত্রে উদর চিকিৎসা।

"উদর বাদরী যক্ষ্মা
এ তিনে নাই রক্ষা।"

এই প্রাচীন পূর্ব্ববঙ্গের গ্রাম্য প্রবচনটি না জানেন এমন ব্যক্তি খুব কমই আছেন। বাস্তবিক সংসারে মারাত্মক ব্যাধি অনেকই আছে, কিন্তু উদরী ও যক্ষ্মা ব্যাধি হওয়া মাত্র রোগী ও তাহার আত্মীয় স্বজন যে প্রকার হতাশ হইয়া পড়েন, আর কোন ব্যাধিতে সেরূপ হয় না। যাহার যক্ষ্মার কোন সংস্রব নাই, এরূপ সুস্থ সবলকায় ব্যক্তি ও অনেক কুচিকিৎসকের ভ্রমে (মুখের উপর যক্ষ্মা হইয়াছে বলাতে) এত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে, সেই দুর্ব্বলতা হইতেই অনেক সময় তাহার ক্ষয়ের উৎপত্তি হইয়া থাকে। চরক বলিয়াছেনঃ—

"মরণায়েহ রূপাণি পশ্যতাপি ভিষগ্‌বিদা।
অপৃষ্টেন ন বক্তব্যং মরনং প্রত্যুপস্থিতম্।
পৃষ্টেনাপি নবক্তব্যং তত্র যচ্চোপঘাতুকম্
আতুরস্য ভবেদ্দুঃখ মথবান্যস্য কস্যচিৎ॥"

"চিকিৎসক রোগীর মৃত্যুচিহ্ন দেখিয়া বিপদ্ হইবে স্থির করিলেও, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহা রোগী বা তাহার আত্মীয়ের নিকট প্রকাশ করিবে না। এবং বিশেষভাবে জিজ্ঞাসিত হইলেও যে স্থলে তাহা শ্রবণ করিলে রোগীর অনিষ্ট হইবে বা তাহার আত্মীয় স্বজনের কষ্ট হইবে বুঝিতে পারা যায় তাদৃশ সাংঘাতিক অবস্থাও প্রকাশ করিবে না।

যাক্, এই দুই ব্যাধির নিষ্কৃতির চেষ্টায় পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ বহু প্রকার পরীক্ষাকার্য্যে লিপ্ত আছেন। আর আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায়ীগণ তাহাদের পরীক্ষিত অব্যর্থ চিকিৎসা প্রণালীগুলি হারাইয়া অন্ধপরম্পরা ন্যায়ে হাতড়াইয়া বেড়াইতেছেন। আমাদের দেশে চেষ্টাবান্ লোকের অভাব নাই, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদের মত ছেঁড়া কাঁথা সেলাই করিতে কেহই অগ্রসর হইতেছে না। এমন অপূর্ব্ব তন্ত্র আমাদেরই স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য, আমাদের পূর্ব্বপুরুষের শত সহস্র বর্ষের অসীম গবেষণার ফল, এই প্রকারে আমাদেরই অনাদরে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে, ইহা বড়ই ক্ষোভের বিষয়! আমরা পরাধীনতাকে ঘৃণা করিতে শিখিতেছি কিন্তু বিপথে পরিচালিত হওয়ায়, আমরা অশনে, বসনে, জীবন রক্ষায় উপকরণে পর্য্যন্ত পরের মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছি।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের প্রভূত পরিশ্রমের ফলেও উক্ত ব্যাধি দুইটির সম্বন্ধে বিশেষ কোন উপায় পাওয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। আয়ুর্ব্বেদে উদর ব্যাধিকে যক্ষ্মা ব্যাধির মত একবারে অসাধ্য বলা হয় না। সুশ্রুত বলিয়াছেন :—

"অষ্টাবুদরানি, তেষ্বসাধ্যং বদ্ধদ পরিস্রাবিচ, অবশিষ্টানি কৃচ্ছ্র সাধ্যানি।"

আমাদের দেশে জলোদরের সংখ্যাই বেশী হইয়া থাকে। একটু চেষ্টা করিয়া চিকিৎসা করিলে জলোদরে রোগীর বিপদ্ হইতে পারে না বলিয়াই বিশ্বাস করি। পাশ্চাত্য মতে পুনঃ পুনঃ ট্যাপ (Tap) করিয়া জল বাহির করিয়া দেওয়াই প্রধান চিকিৎসা, কিন্তু পথ্যেরই

নিয়মের অভাবে ও ভবিষ্যতে আর যাহাতে জল জমিতে না পারে এমন ভাল কোন ঔষধ না থাকায়, তাঁহাদের চিকিৎসায় তেমন সুফল হইতে দেখা যায় না এবং আজকালকার কবিরাজী চিকিৎসাতেও ঐ ব্যাধির ভাল ভাল ঔষধ প্রযুক্ত হইলেও যথাবৎ নিয়মের অভাবে ও দরকার হইলে একটু শাস্ত্রক্রিয়ার সাহায্যের অভাবে অনেকে ভাল ফল করিতে পারেন না।

অতি প্রাচীন কাল হইতে সুশ্রুত ও চরকসংহিতায় এ সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে চিকিৎসার প্রণালী লিখিত রহিয়াছে। আমরা তাহা যথাবৎ অনুসরণ করিয়া বহু জলোদর রোগীকে নিরাময় করিতে সমর্থ হইয়াছি। আজকাল আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায়ী মাত্রেরই চক্রদত্ত, ভৈষজ্য রত্নাবলী, ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি সংগ্রহগ্রন্থ চিকিৎসার প্রধান অবলম্বন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সব গ্রন্থ আয়ুর্ব্বেদের অবনতির যুগে সংগৃহীত হইয়াছে। কোন কোন গ্রন্থ মূল গ্রন্থের নকলের নকল হওয়ায় তাহাতে আসল 'খাস্তা' হইয়া গিয়াছে। সুতরাং তাদৃশ গ্রন্থ আমাদের একমাত্র উপজীব্য হইলে উন্নতির আশা কোথায়? চক্রপাণি বলেন :—

"জাতং জাতং জলং স্রাব্যং শাস্ত্রোক্তং শস্ত্র কর্ম্ম চ।
জলোদরে বিশেষেণ দ্রবসেবাং বিবর্জ্জয়েৎ।"

জলোদর ব্যাধিতে শল্য-শাস্ত্রোক্ত শস্ত্র কর্ম্ম অনুসারে সঞ্চিত জলস্রাব করাইয়া দিবে ও বিশেষ ভাবে দ্রব পদার্থের সেবন পরিত্যাগ করিবে। এই পর্য্যন্তই তাঁহার উপদেশের শেষ হইয়াছে। এই অবস্থা দেখিয়া আমাদের অনুমান হয়, চক্রপাণি হাতে কলমে কোন কাজ করিতে জানিতেন না। এবং জলোদরে 'দ্রব' মাত্রকেই নিষেধ করায় ভুল করিয়াছেন। ঐ ব্যাধিতে দুধই এক মাত্রপথ্য তাহা দ্রব পর্য্যায়েই পরিগণিত হয়।

সুশ্রুত সংহিতাকার বলেন :—

উদকোদরিণন্তু বাতহর তৈলাভ্যক্তস্য * * * এবং সংবৎসরেন অগদো ভবতি।"

অর্থাৎ জলোদর রোগীকে প্রথমে নারায়ণ তৈলাদি মাখাইয়া (বিশেষ ভাবে উদরে) গরম জলের স্বেদ দিতে হইবে। উত্তমরূপে স্বেদ দেওয়া হইলে তাহাকে বসাইয়া পিছের দিক হইতে একজন বলবান ব্যক্তি তাহাকে ধরিয়া রাখিবে। তারপর একখান চওড়া কাপড়ের ব্যাণ্ডেজ দিয়া ষষ্ঠ পশুকার সমসূত্র হইতে নাভির সামান্য নীচে পর্য্যন্ত বেষ্টন করিয়া আটিয়া বাঁধিতে হইবে। পরে ব্রীহিমুখ শস্ত্র (Trokers) দ্বারা নাভির নীচে রোমাবলীর বামদিকে ৪ অঙ্গুলি দূরে এক বট পরিমিত বিদ্ধ করিয়া তাহাতে জল স্রাবের জন্য দুই মুখো কোন ধাতুনির্ম্মিত নল বা হাসের সরু পেনের অগ্রভাগ লাগাইয়া দিয়া শস্ত্র উঠাইয়া লইবে। এই প্রকারে যথারীতি উদরস্থ সঞ্চিত জল বহির্গত হইয়া যাইবে। পাশ্চাত্য মতে এই বেধ রোমরাজির উপরেই করা হয়। তাহাতে একটু বিপদের আশঙ্কা আছে; যদি বস্তি অধিক মূত্র পূর্ণ থাকে, তবে ঐ স্থানে বেধ করিলে বস্তি বিদ্ধ হইতে পারে। উদরে যদি প্রভূত জল সঞ্চিত থাকে তবে একদিনে সকল স্রাব করা হইবে না। ঐ সব রোগীর শরীরে সার পদার্থ না থাকায় ঐ মলাংসেই জীবনী শক্তি অব্যাহত থাকে, হঠাৎ সমস্ত মল বাহির হইয়া গেলে তৃষ্ণা, জ্বর, অতিসার, শ্বাস প্রভৃতি উপসর্গ হইতে পারে। সুতরাং দরকার হইলে ১০।১৫ দিন পর পর অল্প অল্প করিয়া জল বাহির করিতে হইবে। প্রমাণ মত জল বাহির হইয়া গেলে নলটি বাহির করিয়া ফেলিয়া বিদ্ধ স্থান তৈল ও সৈন্ধব চূর্ণদ্বারা অভ্যক্ত করিয়া উপযুক্ত ভাবে বন্ধন করিয়া রাখিবে। জল নির্গত হইয়া উদরের আয়তন কমিয়া যাওয়া মাত্র উদরটি ফ্লানেল দ্বারা না কষা না ঢিলা ভাবে সর্ব্বদা বান্ধিয়া রাখিবে। নতুবা পেট খালি হইলেই ঐ শূন্য স্থান বায়ুপূর্ণ হইয়া আবার সত্বরই জল জমিবার আশঙ্কা করা যায়। তারপর রোগীকে অন্যূন ৬ মাস কেবল দুধ খাওয়াইয়া রাখিবে আর তিন মাস দুধ ও

অন্ন মণ্ড পথ্য দিবে তারপর তিন মাস দুধ অন্ন ও লবণ-বিহীন তরকারী দিতে হইবে। এইরূপে এক বৎসর অতীত হইলে রোগী নিরাময় হইল মনে করা যায়।

চরক সংহিতাকারও সুশ্রুতের ব্যবস্থায় সর্ব্বথা সমর্থন করিয়াছেন ও পথ্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

"অতঃপরন্তু ষন্মাসান্ ক্ষীরবৃত্তির্ভবেন্নর।
ত্রীন্ মাসান্ পয়সা পেয়াং পিবেৎ, ত্রীংশ্চাপিভোজয়েৎ
শ্যামাকং কোরদূষং বা পয়সাহলবনং নরঃ।
সংবৎসরে নৈবঞ্জয়েৎ প্রাপ্তুষ্ণেব জলোদরম্।"

সুতরাং জলোদর রোগীর কেবল দুগ্ধ সেবন করিয়া থাকা সর্ব্ববাদীসম্মত। চরকে ঐরূপ পথ্য সম্বন্ধে হেতুও দিয়াছেন :—

"প্রয়োগা পাচিতাঙ্গানাং হিতং হৃদরিণাং পয়ঃ।
সর্ব্বধাতুক্ষয়ার্ত্তানাং দেবানামমৃতং যথা॥"

কিন্তু পরবর্ত্তী চিকিৎসকেরা এই অমূল্য উপদেশ হারাইয়া আজ উদর ব্যাধিকে অসাধ্য বলিয়া ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না। আমরা উক্ত প্রণালী অনুসারে চিকিৎসা করিয়া রোগীর তাদৃশ অরিষ্ট লক্ষণ না হইলে শতকরা ১০০টি রোগীই আরোগ্য করিতে সমর্থ হইয়াছি। আশাকরি সকলেই এই প্রণালী অনুসরণ করিয়া প্রাচীন চিকিৎসার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের ও দশের উপকার সাধন করিবেন।

ছিদ্রোদর ও বদ্ধগুদোদরকে কায়চিকিৎসা মাত্র আশ্রয় করিলে অসাধ্য বলা হইয়াছে। শল্যতন্ত্রে এতৎ সম্বন্ধেও বিশেষ বিধান আছে। পাশ্চাত্য মতে কলিকাতা ব্যতীত অন্যত্র যে এ প্রণালীতে অস্ত্রচিকিৎসা হইতে পারে তাহা বোধহয় না। বিশিষ্ট শল্যতন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি ব্যতীত এ কার্য্যে পারদর্শী হওয়া কঠিন। প্রাচীন কালে যে প্রণালীতে এই দুই ব্যাধির চিকিৎসা হইত তাহার একটু উল্লেখ করিলাম। চরক বলেন :—

বামং কুক্ষিং মাপয়িত্বা নাভ্যাশ্চতুরঙ্গুলম।
মাত্রা যুক্তেন শস্ত্রেন পাটয়েন্ মতিমান্ ভিষক্।
বিপাট্যান্ত্রং ততঃ পশ্চাৎ বীক্ষ্য বদ্ধক্ষতান্ত্রয়োঃ।
সর্পিষা ভ্যক্ত্য কেশাদীনবমৃজ্য বিশোধয়েৎ।
মূর্চ্ছনাদ্ যন্ত্রসংমূঢ় মন্ত্র তচ্চাবমোক্ষয়েৎ।
ছিদ্রান্ত্রস্য তুস্থূনৈ দংশয়িত্বা পিপীলিকৈঃ।
বহুশঃ সংগৃহীতানি জ্ঞাত্বা ছিত্বা পিপীলিকান্।
প্রতিযোগৈঃ প্রবেশ্যান্ত্রং প্রেয়ৈঃ সীব্যেদ্ ব্রনংততঃ॥

বদ্ধগুদোদর ব্যাধি অন্ত্রের মধ্যে কোন বাহ্য পদার্থ বা কঠিন মল আবদ্ধ হইয়া অথবা বিস্তনীভূত বায়ুদ্বারা অন্ত্রে পেঁচ লাগিলে হইয়াথাকে ও অন্নের সহ ভক্ষিত কাঁটা তুষ প্রভৃতি শল্যাক্রান্তে অন্ত্রে ছিদ্র হইলে তাহাকে ছিদ্রোদর বলা হয়। এই উভয় প্রকার ব্যাধিতেই নাভির চার আঙ্গুল নীচে রোমরাজির বামভাগে কুশপত্র বা অন্তর্মুখ শস্ত্রদ্বারা পেট চিরিয়া অন্ত্রপরীক্ষা করিয়া ব্যাধির অন্ত্রাংশে ঘৃত মাখাইবে পরে তাহাতে আবদ্ধ মলাদি থাকিলে তাহা বাহির করিয়া দিবে ও পেঁচ লাগিয়া থাকিলে তাহা খুলিয়া ঠিক করিয়া দিয়া আবার উত্তমরূপে ঘৃতাভ্যক্ত করিয়া যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়া দিবে। আর অন্ত্রেছিদ্র হইয়া থাকিলে ছিদ্রের স্থান লক্ষ্য করিয়া তাহা পরিষ্কারকরতঃ তাহাতে কতগুলি কৃষ্ণ পিপীলিকা * কামড় দেওয়াইয়া তাহার শরীরটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিবে। এইরূপে ঐ পিপীড়ার মাথা দিয়াই ঐ ছিদ্রটা সম্পূর্ণ সেলাই করিতে হইবে। তারপর অন্ত্র ঘৃতাভ্যক্ত করিয়া যথাস্থনে সন্নিবিষ্ট করিয়া বাহিরের উদরপ্রাচীর ঘোড়ার বালচি আদি দিয়া যথাবৎ সেলাই করিয়া ব্রণের চিকিৎসা করিবে। এবং রোগীকে কেবল দুগ্ধ পথ্যদিয়া রাখিবে। এ সব প্রক্রিয়া বিশিষ্ট হাঁসপাতালেও হয় কি না জানি না। প্রাচীন কালে এরূপ প্রক্রিয়ায় সক্ষম বৈদ্য ছিল শোনা যায়। এখন পাশ্চাত্য চিকিৎসাভিজ্ঞ কবিরাজবৃন্দ শুধু পেটেন্ট ঔষধের কারবার না করিয়া এ সব বিষয়ে চেষ্টা করিবেন কি?

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র সরস্বতী।

---

* ইহাকে রাজসাহী জেলায় "মাসকাটা ডাই" বলে। ইহারা কামড় দিলে মাথা কাটিয়া ফেলিলেও কামড় ছাড়ে না।

অমূলক সংস্কার।

পৃথিবীতে এমন দেশ বোধহয় কমই আছে, যেখানে সমাজবন্ধন অন্ততঃ কতক পরিমাণেও প্রভাব বিস্তার করে নাই। এই সমাজ বন্ধন কতকগুলি পরিবারের আচার ব্যবহার নিয়াই শৃঙ্খলিত। এক সমাজের আচার নিয়ম অপর সমাজে আদৃত ও পরিগৃহীত হয় না। এমন কি একই পরিবারভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন খেয়াল অনুসারে বিভিন্ন মত ও সংস্কার বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়া থাকে। এমন কতগুলি ধারনা আছে যাহা শুধু এক সমাজের স্ত্রীলোকগণই অধিকাংশ পোষণ করিয়া থাকে। সমাজের পুরুষগণ সেই সমস্ত ধারণা বা সংস্কার সম্বন্ধে সর্ব্বদা ঔদাসীন্যই প্রদর্শন করে। শুধু আমাদের দেশ বলিয়া নয়, সুদূর ইউরোপেও একসময় কতক সংখ্যক লোক এই সমস্ত ভ্রান্ত সংস্কারের বশবর্ত্তী ছিল। ইংলণ্ডের বিখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক জোসেফ এডিসন (Joseph Addison) প্রায় দুইশত বৎসরেরও অধিক পূর্ব্বে "ভ্রান্ত ধারণা" (Popular Superstitions) নামে যে একখানি রচনা লিখিয়া গিয়াছেন, উহা পড়িয়া তাঁহার সমসাময়িক সামাজিক অবস্থা কতকটা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। বাঙ্গালা দেশেও ঘরে ঘরে এমন অনেক নিয়ম বিধান প্রচলিত আছে, যাহা মেয়ে মহলেই খুব গ্রাহ্য। এই সমস্ত বিধানকে আমরা "মেয়েলী শাস্ত্র" রূপে কতকটা মান্যও করি কতকটা অবহেলাও করি। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিতে হইবে সেই সমস্ত মেয়েলী শাস্ত্রের কোনও মূল্য আছে কিনা এবং উহাদের উৎপত্তিই বা কোথায়? আমাদের মনে হয় এক একটা বিষয় অবলম্বন করিয়া সেই বিষয়ের ভূয়োদর্শনের ফলে যেই উপসংহার বা প্রমাণে আসিয়া পৌঁছা যায় সেই প্রমাণই শাস্ত্রীয় বিধানরূপে পরিগণিত হয়। মেয়েলি শাস্ত্রকে আমরা আপ্তবাক্য (Authority with reliable source) বা অনুমান (Inference) প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত করিতে না পারিলেও উহাতেও যে ভূয়োদর্শনের তথ্য আবিষ্কৃত হইয়া আছে তাহা আমরা কিছুতেই অগ্রাহ্য করিতে পারি না। তাই বলিয়া যেমন তেমন একটা কুসংস্কারও যে কুসংস্কাররূপে গৃহীত হইবে তাহা কখনও স্বীকার্য্য নহে। শুধু মেয়েলোক বলিয়া নহে, পুরুষদের মধ্যেও অনেকে 'শুচিবায়ু' বা 'শুচিবাই' সম্পন্ন ঢের আছেন। এমন কি ঐ সমস্ত সংস্কার বা ধারণা অবলম্বনে গোটা বাঙ্গালায় কত ছড়া, কত শ্লোক, কত কবিতা, কত বচনইনা রচিত হইয়াছে।

বহু গবেষণার ফলে ভারতবাসী লীলাবতী গণিত জ্যোতিষে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। সুবিখ্যাত খনার বচন এখনও বঙ্গের গৃহে গৃহে সম্মানিত ও আদৃত হইয়া আছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়টী যদিও তাদৃশ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রমাণীকৃত হইবে না—তথাপি বক্ষ্যমাণ-'সংস্কার' গুলিতে দেশ ও কাল ভেদে আমাদের পক্ষে কতদূর উপযোগী বা অনুপযোগী তাহারই যৎকিঞ্চিৎ আভাস এই স্থানে প্রদান করিতে চেষ্টা করিব। প্রথমতঃ আমি ইংরেজ কবি এডিসন কর্ত্তৃক উল্লিখিত সংস্কারসমূহ এই স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি—

১। কোনও এক গৃহকর্ত্রী স্বামীকে বলিতেছেন "You may now see the stranger that was in the candle last night." এই দেখ সেই নবাগত অতিথি, যাহার আগমন আমরা গত কল্য রজনীর "ক্যাণ্ডল" জ্বলিবার ভঙ্গী দেখিয়াই অনুমান করিয়াছিলাম। অর্থাৎ সেই দেশের লোকের মধ্যে এমন একটা সংস্কার বদ্ধমূল আছে যে যদি কোনও সময় একটী ক্যাণ্ডল্ আলো জ্বলিতে জ্বলিতে উহার প্রদীপ্ত শিখাতে এক প্রকার অদ্ভুত জ্যোতিঃ প্রকাশ পায়, অথবা বিনা কারণে (বায়ুর অভাবে) প্রদীপটী মাঝে মাঝে কাঁপিয়া কাঁপিয়া ক্ষীণ রশ্মিতে জ্বলে তবে ইহা কোনও নূতন লোকের আগমন সূচনা করে।

আমাদের বাঙ্গালা দেশে এমন কোনও প্রথা আছে কি? ক্যাণ্ডেলের নাম এবং ক্যাণ্ডেলের ব্যবহার ইংরেজ সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে পদবিস্তার করিয়াছে, কাজেই ক্যাণ্ডেলের আলো নিয়া কোন সংস্কারই আমাদের দেশে দৃঢ়

মূল হইতে পারে না। তবে শুনা যায় বাঙ্গালা দেশের কোন কোনও স্থানে এমন একটী ধারণা নাকি লোকের মনে জাগুরুক আছে যে তিলের তৈল বা সরিষা তৈলের (স্নেহ পদার্থের) আলোর বর্ত্তিকাতে যদি কালো রংএর বর্ত্তুলাকৃতি একটা 'টোপ্' জন্মে (যাহা প্রায়শই জন্মে না) তবে নাকি উহা দ্বারা শুভ সূচনা হয়। সেই শুভ সূচনাটা হাতে কলমে কেহও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন কিনা জানিনা। তথাপি তুলনা মূলক বিষয় বলিয়া এই স্থানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না।

(২) মাতা বিদ্যারম্ভের জন্য প্রস্তুত শিশু সন্তানকে বলিতেছেন "No my child, if it please God, you shall not begin upon Thursday (childermasday) না বৎস, ঈশ্বর না করুন, তুমি যেন বৃহস্পতিবার বিদ্যাশিক্ষা (হাতে খড়ি) আরম্ভ করিও না।

খ্রীষ্টের জন্মের অল্প কতক সময় পূর্ব্বে জেরুজেলামের রাজা হেরড্ তাঁহার রাজ্য মধ্যে নাকি এরূপ আদেশ করিয়াছিলেন যে একবৎসর হইতে তিন বৎসর বয়স্ক সমস্ত শিশুকে হত্যা করিতে হইবে। তদনুসারে এক বৃহস্পতিবার এই হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হয়। সেই দিনটাকে Innocent day (=অবুঝ বালকদের হত্যার দিন) বা childermas-day (Massacre of children=শিশু হত্যার দিন) বলা হয়। সেই অবধি প্রত্যেক বৃহস্পতিবারই কোন একটা শুভ কর্ম্ম আরম্ভ করিতে নিষিদ্ধ।

এই ঘটনা দ্বারা আমাদের মথুরাপতি কংস রাজের কথা মনে পড়ে। তিনিও শ্রীকৃষ্ণের জন্মকালে নগর মধ্যে এইরূপ একটা আদেশ প্রচার করেন যে সমস্ত শিশু সন্তানকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে আমরা পূতনা রাক্ষসীর বৃত্তান্তও অবগত আছি। কিন্তু এমন কথা কখনও শুনি নাই যে বৃহস্পতিবার দিবস বিদ্যারম্ভের জন্য অপ্রশস্ত। বরং আমাদের (জ্যোতিষ) শাস্ত্রের মতে বৃহস্পতিবারেই (গুরুবাসরে) বিদ্যারম্ভের প্রশস্ত দিন বলিয়া উল্লেখ আছে। যথা—

"বিদ্যারম্ভে গুরুঃ শ্রেষ্ঠো মধ্যমৌ ভৃগুভাস্করৌ।"

কেহ কেহ এরূপ ব্যাখ্যাও করিতেছেন যে বৃহস্পতিবারের শেষ দুইহোরা বারবেলারূপে উল্লিখিত বলিয়া এবং সেই বারবেলাতে কোনও শুভকর্ম্ম করিতে নাই বলিয়া এডিসনের রচনায় উদ্ধৃত উক্তির সঙ্গে আমাদের দেশের ধারণারও কতকটা সাদৃশ্য আছে। কিন্তু টীকাকারের এই ব্যাখ্যা আমাদের নিকট সমীচীন বলিয়া মনে হয় না।

৩। The spilling of salt by chance from any one's hand forebodes some sort of disaster. অর্থাৎ (কাহাকেও লবণ দেওয়ার কালে) কাহারও হাত হইতে বা ভাণ্ড হইতে যদি হঠাৎ সেই লবণ মাটিতে পড়িয়া যায় তবে ইহাও নাকি মহা অশুভের লক্ষণ। কোনও গৃহকর্ত্রীর নিকট মিষ্টার এডিসন্ স্বয়ংই এই বিষয়ে অপরাধী হইয়াছিলেন। গৃহকর্ত্রী স্বামীর নিকট বলিতেছেন "হায় হায়, বিপদের উপর বিপদ! রাত্রিতে কি কুস্বপ্নইটা না দেখিলাম, ভোর হইতে না হইতেই ক্যাণ্ডেলের অতিথি" আসিয়া উপস্থিত, অথচ ছেলেটাও বৃহস্পতিবার দিন বিদ্যারম্ভে যাত্রা করিয়াছিল; আর তার উপর এই নবীন অতিথি লবণগুলি আমায় উপর নিক্ষেপ কর্‌লে? (বস্তুতঃ এই পর্য্যন্ত কোনঅমঙ্গলই কিন্তু হয় নাই।) তবু গৃহিণী আক্ষেপের সহিত পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিলেন "সেই দিনের কথা তোমার মনে আছে কি—সেই দিন আমাদের চাকরটা টেবিলের উপর-খানিকটা লবণ ফেলিয়া [illegible] ঠিক সেই দিনই বৈকাল বেলায় কবুতরের টংখানা পড়িয়া যায়।"

স্বামীও সহধর্ম্মিনীর কথায় সায় দিয়া বলিলেন "বটে বটে, মনে আছে বৈকি, যেই দিন কবুতরের টংটী পড়িয়া যায়, তার পরের দিনের ডাকেই কিন্তু খবর আসিয়াছিল যে "আল্‌মঞ্জা'তে যুদ্ধ বাঁধিয়া গিয়াছে।"

পাঠকগণ! কবুতরের টং মাটিতে পড়িয়া যাওয়াটা কতদূর অশুভের চিহ্ন নিজেই অনুমান করিয়া নিবেন। ইহাও লক্ষ্য করিতে আপত্তি নাই, যেই দিন নাকি ভূতোর

হস্ত হইতে লবণ পড়িয়া গেল তার পরের দিনের ডাকে (সেই দিনের ডাকে নয়) খবর আসিল যে কোথায় একটা যুদ্ধ বাঁধিয়াছে। অথচ যুদ্ধ যে কোন্ তারিখে বাঁধিয়াছে তাহার সঙ্গেও কিন্তু লবণ পড়ার সঙ্গে কোন সম্পর্কই নাই। পাঁচ দিন পূর্ব্বেও হইতে পারে দুই দিন পূর্ব্বেও হইতে পারে।)

এখন আমাদের দেশের কথা। আমাদের দেশে হাত হইতে লবণ পড়িয়া গেলে কোন অশুভের আকাঙ্ক্ষা করা হয় না বটে; কিন্তু যদি কোনদিন কোনও বস্তু বারংবার হস্ত হইতে অলক্ষিত ভাবে স্খলিত হয় তবে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা মনে করিয়া থাকেন যে ঐদিন বাড়ীতে কোনও আত্মীয় বা অভ্যাগতের আগমন হইবে। অতিথি ও অতিথের এই উভয়ের মধ্যে কোনরূপ মানসিক আকর্ষণ বশতঃ পরস্পরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে চঞ্চলতা উপস্থিত হয় কি না মনস্তত্ত্ববিদগণ আলোচনা করিবেন। আমাদের দেশের কি পুরুষ কি রমণী সমুদয়ের মধ্যেই (যদিও অশিক্ষিতেরা মধ্যেই ইহার প্রভাব বেশী) এইরূপ একটা খেয়াল চলিয়া আসিতেছে যে এক জনে অপরকে খাইবার জন্য হাতে হাতে লবন দিবে না। অর্থাৎ এক ব্যক্তি নিজ হস্তে অপরের হস্তের উপর লবন অর্পণ করিবে না। ইহাতে নাকি "নেমকের স্বত্ব" রাখিতে পারিবে না বলিয়া আত্মসঙ্কোচ জ্ঞাপন করা হয়।

তাহা ছাড়া—আমাদের দেশে একজনের উচ্ছিষ্ট পাত্রে অপরের খাওয়ার বিধি আছে। সন্তান জনক জননীর পাত্রে, স্ত্রী স্বামীর পাত্রে, শিষ্য গুরুর পাত্রে বা কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের (পূজনীয়ের) পাত্রে ভক্ষ্য দ্রব্য গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু সেই পাত্রের ভুক্তাবশিষ্ট লবণ কেহও গ্রহণ করিতে বাধ্য নয়। উহাতেও নাকি 'নেমক হারামি'র আশঙ্কা আছে।

এইস্থানে ইহাও উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে আমাদের দেশের হিন্দুরমণীগণ পূজনীয়ের উচ্ছিষ্ট পাত্রে আহার্য্য গ্রহণ করে বটে কিন্তু কখনও ভাসুরের (স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া যদিও পূজনীয় তথাপি) তাঁহার ভুক্ত পাত্রে আহার করে না। সমাজের দিক দিয়া লক্ষ্য করিতে গেলে এই নিয়মটা বাঙ্গালী রমনীদের পক্ষে একটী উৎকৃষ্ট সতী-ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইবে সন্দেহ নাই। নিজকে পরপুরুষের সংশ্রব হইতে দূরে রাখিবার নিমিত্ত সাধ্বী রমণীগণ পূজনীয় ভাসুরের ছায়াও স্পর্শ করিবে না, তাহার প্রসাদ নেওয়াত দূরের কথা, হক্‌না তিনি এক পরিবারভুক্ত, হক্‌না তিনি স্বামীর জ্যেষ্ঠ সহোদর! শুধু এই একমাত্র কারণেই আমাদের দেশের মহিলাগণ ভাসুরের সঙ্গে বা বয়স্ক দেবরের সঙ্গে আলাপ পর্য্যন্ত করে না,—অন্য পুরুষের সঙ্গে মেশা মিশিত দূরেরই কথা। এই সংস্কারটা বাঙ্গালী রমণীর সভ্যতার নিদর্শন বা বর্ব্বরতার লক্ষণ তাহা কেহও বলিয়া দিবেন কি?

৪। A knife (spoon?) and a fork should not be laid cross-wise. অর্থাৎ একখানা চাকু বা চামচে অপর একখানা উক্ত ঠ্যাঙ্গার (প্রান্তভাগে দুই তিনটী দাড়া যুক্ত চামচে) সঙ্গে বজ্রাকারে + (cross-wise?) স্থাপন করা নিষিদ্ধ। ইহার হেতু কি তাহা স্বয়ং এডিসনও কিছু উল্লেখ করিয়া যান নাই। আমাদের দেশে ছুড়ি চামচে দিয়া খানা খাওয়ার প্রথা নাই, কাজেই ওসম্বন্ধে কোন ভাল বা মন্দ ধারণা আসিতেই পারে না।

৫। The shooting of a star spoils a night's rest. অর্থাৎ রাত্রিতে নক্ষত্রপাত পরিলক্ষিত হইলে সেই রাত্রির সুনিদ্রাই নষ্ট হয়। আমাদের দেশে নক্ষত্রপাত হওয়াটাকে পৃথিবীর একটা দৈবী শক্তি তিরোহিত হইল বলিয়া কল্পনা করা হয়। এবং শান্তির জন্য অর্থাৎ সেই শক্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য যেই ব্যক্তি সেই নক্ষত্রপাত দর্শন করে সে দ্বাদশটী বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের নাম ও দ্বাদশটী ফলের নাম উচ্চারণ করে। ইহার ভিতর কোনও গূঢ় রহস্য রহিয়াছে কিনা কে বলিবে? প্রকৃত পক্ষেই নক্ষত্রপাত হইল কিংবা অপর কোনও জ্যোতিষ্ক পদার্থের স্পন্দন পরিলক্ষিত হইল তাহারই ঠিকানা নাই তবু তাহা নিয়া মাথা ঘামান কেন

উল্কাপাতে পৃথিবীতে কিছু না কিছু উপদ্রব সংঘটিত হয়—তাহা আমরা জানি, কিন্তু উল্কাপাত ও নক্ষত্রপাত (shooting of star) এক কথা কিনা বলিতে পারিব না। মেঘের গর্জ্জনে কাহারও কাহারও মাথাধরা রোগ উপস্থিত হয় এবং রাত্রিতে সুনিদ্রা হয় না সেই খবর বোধহয় অনেকেই রাখেন। এমন কি দিবা ও রাত্রির সন্ধি সময়ে মেঘ গর্জ্জন হইলে শাস্ত্রচিন্তা ও গভীরতত্ত্বের আলোচনা নিষিদ্ধ; এই কথা আমাদের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজে বহু দিন অবধিই চলিয়া আসিতেছে।

সূর্য্য ও চন্দ্রের চতুষ্পার্শ্বে মণ্ডলাকারে যদি কোনও একটা বর্ত্তুলাকৃতি রেখা দৃষ্ট হয় তবে কেহ কেহ অনুমান করেন যে কোনও দেশে নূতন রাজা হইতেছে, এবং তন্নিমিত্ত আকাশে (স্বর্গে ?) ধর্ম্ম-সভা বসিয়াছে। এই ধারণার মূলে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কিছুই নাই বরং বিজ্ঞানের অপলাপই করা হইয়াছে। সূর্য্য ও চন্দ্রের চারিধারে নানা বর্ণের মণ্ডল লক্ষিত হইলে উহা আকাশে মেঘ সঞ্চয়ের সূচনা করে মাত্র।

৬। The screaming of a screech owl at midnight alarms a family more than a band of robbers. মধ্যরাত্রে পেচকের অব্যক্ত ধ্বনি দস্যুর ভীষণ গর্জ্জন হইতেও অধিকতর কানে বাজে। এই উক্তির সঙ্গে আমাদের দেশের উক্তিরও সৌসাদৃশ্য আছে। এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে মধ্যরাত্রিতেই হউক বা পূর্ব্ব রাত্রিতেই অথবা শেষ রাত্রিতেই হউক পেচকের জাতীয় ডাকে সে ডাকিবেই কিন্তু ঐ পেচক যদি কোনও বাড়ীর সংলগ্ন বৃক্ষে বা অপর কোনও সন্নিহিত স্থানে বসিয়া কর্কশ রব করিতে থাকে তবে সেই বাড়ীর ভবিষ্যৎ অমঙ্গল আশঙ্কা করা হয়। পেচকের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট অপর একটী বড় জাতীয় পাখী (হেতোম ভূতোম = হুতোম পঁাচা) আছে। উহার ডাকেও ভাবী অশুভ শঙ্কিত হয়। দিবাভাগে শিবাধ্বনি বা রাত্রিতে বায়স রব বস্তুতই দেশের মহামারী সূচনা করে। বাড়ীর সীমানায় বসিয়া 'ইষ্টি কুটুম্' পাখী ডাকিতে থাকিলে শীঘ্রই যে বাড়ীতে ইষ্টি (আত্মীয়) বা কুটুম্বের' আগমন হইবে তাহা বুঝা যায়।

৭। The voice of a cricket (worm) hath struck more terror than the roaring of a lion. The ticking of a death—watch (insect) and the whinning of a dog are all evils in some way or another. অর্থাৎ গুবরে পোকা, গঙ্গাফড়িঙ্ ও অন্যান্য দুই এক প্রকারের ঝিঁঝিঁ (ঝিল্লী) পোকা যদি অস্ফুট ধ্বনি করে তবে উহাও শুভ লক্ষণ নহে। একদিন প্রবীণ ধরণের একটা রমণী গৃহ কুকুরের 'ঘেউ ঘেউ' শুনিয়া নাকি দাঁতের ব্যাথায় কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং কুকুরের ডাকই যে সেই দাঁতের ব্যাথার কারণ এবং ইহাতে যে ইনি প্রাণও হারাইতে পারেন ততদূর পর্য্যন্ত তাঁহার দুশ্চিন্তা উপস্থিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ কে কোথায় শুনিয়াছেন যে দাঁতের ব্যাথায় মানুষ মরে ?

আমাদের দেশে দিবাতে শিবার ধ্বনির কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এইক্ষণ টিক্‌টিকির ডাকের ফল সংক্ষেপে কিছু বলিব। দুইটা দলের মধ্যে বা দুইটী লোকের মধ্যে পরস্পর কথোপকথন হইতেছে এবং এক পক্ষ নিজের উক্তির দৃঢ়তা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিতেছে ঠিক সেই সময়ে যদি সমীপে টিক্‌টিকির ধ্বনি হয় তবে তাহার উক্তিটী যে বস্তুতই সত্য তাহাই ধরিয়া নিতে হইবে কেননা টিক্‌টিকির টিক্‌টিক্ ধ্বনিতেই সত্য! সত্য !! সত্য !!! প্রমাণিত হইয়া গেল। এইত গেল উক্তির দৃঢ়তা (affirmation) প্রতিপাদনের কথা। বাক্যের বিপরীত অর্থ (negation) প্রতিপাদনের বেলায়ও ঐরূপ সংস্কার। সাধারণতঃ যাত্রা সময়ে হাঁচি শুনিলেই অশুভ সূচিত হয়। সেই হাঁচি যদি সর্দ্দির হাঁচি হয় অথবা উপর্য্যুপরি যদি তিন চারিবার হাঁচি পড়ে তবে কোনরূপ মন্দ ফল হইবে কিনা তাহার উল্লেখ নাই। আধুনিক কেহ কেহ বলিতে চান, একবারের হাঁচিতেই যাত্রায় বাধা, দুই বারে বিধি, তিনবারে কার্য্যসিদ্ধি। যাত্রা প্রসঙ্গে এমন অনেক কথাই বলা যাইতে পারে। তিন ব্রাহ্মণের একত্র যাত্রা নিষ্ফল কিন্তু চারি ব্রাহ্মণে শুভকর, পঞ্চ ব্রাহ্মণ হইলে ত কথাই নাই

যাত্রাকালে বামদিকে যদি কোনও পাখীর ডাক শুনা যায়, অথবা সম্মুখের বৃক্ষসকল নবপল্লবশোভিত থাকে অথবা বায়ু যদি অনুকূলে প্রবাহিত হয় তবেই সেই যাত্রা শুভশংসিনী।

যাত্রাকালে যদি বামপার্শ্বে শব শিবা বা পূর্ণকুম্ভ দৃষ্ট হয় অথবা দক্ষিণ পার্শ্বে সবৎসা গাভী, বৃষ, হরিণ বা ব্রাহ্মণ দৃষ্ট হয় তবে সেই যাত্রা শুভ।

আরও আছে। গমনকালে যদি স্তন্যপানরত বৎস ও গাভী একত্র দেখা যায়, অথবা বৃষ, গজ, অশ্ব, দক্ষিণাবর্ত্ত,—অগ্নি, সুন্দরী স্ত্রী, পূর্ণকুম্ভ, ব্রাহ্মণ, রাজা, বেশ্যা, ফুলের মালা, পতাকা, সদ্যঃমাংস, ঘৃত, দধি, মধু, রূপা, সোণা, আমন ধান, এই সমস্ত দ্রব্যের যে কোনটী পরিদৃষ্ট হয় অথবা অপরের মুখে যদি উহার কোনও একটীর নাম শুনা যায় কিংবা নিজে পাঠ করা যায় তবে যিনি যাত্রা করিতেছেন তিনি নিশ্চতই সফলকাম হইবেন।

যাত্রার প্রতিবন্ধকও কতকগুলি বচনের উল্লেখ আছে ঐ সমস্ত প্রকাশ করিয়া আমি সরলপ্রাণ শাস্ত্রবিশ্বাসীদিগের মনে সন্দেহ (শুচিবাই) ঢুকাইয়া দিতে ইচ্ছা করিনা।

এইক্ষণ জোসেফ্ এডিসনের উল্লিখিত শেষ দুইটী সংস্কার সকলের নিকট উপস্থাপিত করিতেছি।

(৮) I have seen a man in love grow pale and lose his appetite upon the plucking of a merry thought. মিঃ এডিসন্ বলিতেছেন ভালবাসায় পড়িয়া একব্যক্তি কৃশ হইয়া যাইতেছে এবং তাহার অগ্নিমান্দ্য উপস্থিত হইয়াছে ইহা তিনি দেখিয়াছেন। এই সম্বন্ধে সেই দেশে নাকি অদ্ভুত একটা নিয়ম প্রচলিত আছে। একই রমণীর প্রতি অনুরক্ত দুইজন পুরুষ কোনও কুক্কুটের একটী লম্বা অস্থি হাতে নিয়া দুইজনে দুইদিকে টানাটানি করিতে থাকে। ফলে হাড়টী ভাঙ্গিয়া যায়। যাহার হাতে ছোট (হ্রস্ব) টুক্‌রাটী রহিল তাহারই জিত্, অর্থাৎ সেই বিবাহের যোগ্য। আর যার হাতে লম্বা টুক্‌রাটী রহিল তাহার দশাত বুঝিতেই পারা যায়। কি বাহিরে কি ভিতরে কোথাও তার শান্তি নাই, রাত্রিতে নিদ্রা নাই, খাইলে হজম হয়না, শরীর কৃশ, চক্ষুঃ কোটরগত, বিরহের সমস্ত লক্ষণ তাহার মধ্যে প্রকাশিত।—আমাদের দেশে কিন্তু এমন কোনও আজগুবি নিয়ম আজ পর্য্যন্তও পদবিস্তার করে নাই।

৯। এডিসন বলিতেছেন একদিন তিনি নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ কোনও এক বাড়ীতে উপস্থিত হন। আরও দুই চার জন ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা সেই বাড়ীতে উপস্থিত ছিল। এমন সময় জনৈক রমণী গণনা করিয়া দেখেন যে সেইস্থানে স্ত্রী ও পুরুষে তেরজন লোক উপস্থিত! কি সর্ব্বনাশ! তেরজনের সমবায়ে একজনের মৃত্যু যে অবশ্যম্ভাবী! কি ব্যবস্থা করা যায়! সকলেই প্রমাদ গণিল। এবং সেই সম্মিলন হইতে দুই এক জন লোক চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করিলেন। এমন সময় কবি এডিসনের একবন্ধু বলিয়া উঠিলেন যে মাভৈঃ মাভৈঃ; আপনারা কি জানেন না যে শ্রীমতী……আসন্ন প্রসবা। সুতরাং তাহার গর্ভস্থিত সন্তানটী সহ আমরা সকলে মিলিয়া চৌদ্দ হইয়াছি; ত্রয়োদশ সম্মিলনের কোন আশঙ্কাই নাই। তখন সকলের মধ্যে এক অট্টহাস্যের রোল বহিয়া গেল। যেই স্থলে এক ব্যক্তির মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা ছিল সেইস্থলে একব্যক্তির জন্ম হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইল! ইহাকে কি ভ্রান্ত সংস্কার বলিব না "শুচিবাই" আখ্যা প্রদান করিব?

সংস্কৃত ও বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যদিয়া আমরা যে সমস্ত সংস্কারের সঙ্গে পরিচিত, তন্মধ্যে যাত্রাকালীন পাখীর ডাক অনুকূল বাতাস প্রভৃতি যে অন্যতম তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। অযোধ্যাধিপতি দশরথের পুত্র শ্রীরামচন্দ্র যখন মুনি বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাক্ষসদল-দলনার্থ দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করিতেছিলেন তখন কবি ভর্ত্তৃহরি তাঁহার প্রণীত ভট্টিকাব্যে পাখীর ডাকের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

এই স্থানে অপর একটী সাহিত্যিক-সংস্কারও উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। পুরুষ ও নারীভেদে শরীরের স্থানবিশেষের স্পন্দণ ও ভাবী ফলাফল নির্দ্ধারণ করিয়া

থাকে। পুরুষের দক্ষিণ অঙ্গ স্পন্দিত হইলে পত্নী বা কীর্ত্তি লাভ, বামঅঙ্গ স্পন্দিত হইলে অমঙ্গল। স্ত্রীলোকের তদ্বিপরীত (vice versa)।

আমরা কিন্তু বাহুস্পন্দন অপেক্ষা চক্ষুর স্পন্দনই মাঝে মাঝে অনুভব করিয়া থাকি। যাক্, এ সমস্ত অবান্তর কথা পরিত্যাগ করিয়া আবার বক্তব্য বিষয়েরই অনুসরণ করা যাউক।

বাঙ্গালার কোন কোন স্থানে এমন একটা সংস্কার বলবান্ আছে যে বহু দূরদেশে থাকিয়া একব্যক্তি যদি নিজের অজ্ঞাতসারে অপর এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের নাম মুখে উচ্চারণ করে তবে সেই উচ্চারিত ব্যক্তি যে কয়েক দিন যাবৎ অনাহারে আছে তাহাই কল্পনায় ধরিয়া নেওয়া হয়। মনে করুন বিদেশে থাকিয়া ছেলে অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে। জননী গৃহকর্ম্ম ব্যপদেশে অপর একটী কন্যাকে ডাক দেওয়ার কালে ভুলক্রমে বিদেশের সেই ছেলেটীকে নাম ধরিয়া ডাকিয়া ফেলিলেন। তখন জননী বড় বিষন্ন হইয়াই দুঃখ প্রকাশ করিবেন "আহা বাছার আমার পেটে ক্ষুধা।" অর্থাৎ সেই ছেলেটী তখন পর্য্যন্ত উপবাসী আছে ধরিয়া নেওয়া হয়। সেই সময়টায় যদি বেলা ১২টাও বাজিয়া গিয়া থাকে তবু জননীর অন্তরাত্মা বলিয়া দেয় যে ছেলের হয়ত আজ কোনও কারণে এখন পর্য্যন্ত খাওয়া হয় নাই। কে জানে ইহার মধ্যে কোনও সত্য নিহিত রহিয়াছে কিনা! তবে বর্ত্তমান সময় কেহ কেহ নাকি ইহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে যদি দুইটী বন্ধুর মধ্যে অথবা দুইজন আত্মীয়ের মধ্যে উভয়েই বহুদূরে বাসকরে এবং কোনও প্রসঙ্গ ব্যতীত যদি এক বন্ধু অপর বন্ধুর নাম হঠাৎ মুখে উচ্চারণ করিয়া ফেলে বা তাহার বিষয় চিন্তা করে তবে টেলিগ্রাম দ্বারা জানা গিয়াছে যে ঠিক সেই দিনের সেই মুহূর্ত্তে অপর বন্ধুটীও বিদেশস্থ সেই বন্ধুর চিন্তায় জড়িত ছিল। মনোবিজ্ঞানের আশ্চর্য্য নিদর্শন নহে কি? ইহাকেই বলে মনের গতি ও মানসিক আকর্ষণ!

গভীর রাত্রিতে বংশীধ্বনি শুনিলে নাকি গর্ভিণীর গর্ভনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা! কেহ কেহ বলেন যে তাহা নহে, সর্পদংশনের ত্রাস। আমরা শেষ মতেরই পক্ষপাতী। কেননা শুনিতে পাই সর্প নাকি বাঁশীর মধুর রব বড়ই ভালবাসে। তাই বুঝি সাপুড়িয়াগণ বংশীধ্বনির বলেই সর্পগণকে এত সহজে নিকটস্থ করিয়া থাকে।

ভাঙ্গা কাঁসরের ধ্বনিতে নাকি বাড়ী হইতে লক্ষ্মী (শ্রী ও সম্পদ) পলাইয়া যায়। কথাটার একটা অর্থ হইতে পারে এই—বাড়ীতে সর্ব্বদা ভাঙ্গা জিনিষ ব্যবহার করা দরিদ্রতার চিহ্ন।

নিদ্রার প্রবল তাড়নায় ঝিমাইতে ঝিমাইতে একব্যক্তি যদি অপর এক ব্যক্তির গায় ঢলিয়া পড়ে তবে সম্বৎসরের মধ্যেই নাকি এতদুভয়ের মধ্যে একজনের প্রাণহানির সম্ভাবনা থাকে। গ্রহাচার্য্যকে তিল বা সোনা দান করিয়া অথবা কুলপুরোহিতকে ভোজ্য ও দক্ষিণা প্রদান করিয়া উপরি বর্ণিত পাপের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাওয়ার বিধানও রহিয়াছে।

কেহও হাঁচি দিবার কালে অপর একব্যক্তি যদি উহা শুনে তবে, ইনি প্রত্যেক হাঁচির সঙ্গে "জীব জীব" "জীবতু" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন। হাঁচি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেও কি আয়ুক্ষয়ের সম্ভাবনা আছে?

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন কাব্যতীর্থ, সিদ্ধান্তবাগীশ।

সফল সঙ্গীত।

আজিকে থামায়ে দিয়ে সংসারের যত কোলাহল,
ওরে মোর প্রাণ।
সুগভীর স্তব্ধতার মাঝে বসি আনন্দে বিহ্বল
তুমি গাহ গান,

তোমারি সঙ্গীত তানে আজি ওরে আসুক ভাসিয়া
স্বপনের রাজ্য হতে, দিশি দিশ স্তব্ধতা রচিয়া
মৃদু ঘুম ঘোর,
মানবের আঁখি তারা হয়ে যাক্ আজি হারা
আবেশ বিভোর।

দিবসের কর্ম্মময় বিশ্বব্যাপী জাগ্রত স্পন্দন
ধীরে ধীরে ধীরে
একটী নিশার তরে কর তুই আজি বিসর্জ্জন
স্তব্ধতার নীরে,
ঐ উর্দ্ধে মহাকাশে চন্দ্রপুরে রয়েছে জাগিয়া
বিশাল নক্ষত্র সভা তোরি গান শুনিবে বলিয়া
আমোদ বিকল,
আজি তুই থামা ওরে মোদের এ বিশ্বপুরে
ব্যর্থকোলাহল।

তোরি গীতি সুরটুকু বহি ওরে রজনী বিঘোরা
মৌন সুপ্তিলীন।
উর্দ্ধে উর্দ্ধে অতিউর্দ্ধে, আরোউর্দ্ধে, উর্দ্ধে সীমাহারা
বাজাইয়া বীন
মহা বিশ্বব্যাপ্ত করি, তোরি গানে তুলিয়া দোহার
মঙ্গল যাচিয়া নিয়া দ্বার হতে বিশ্ব দেবতার
শান্তি প্রীতিময়,
মোদের ধরণীটীরে যেনরে দানিতে পারে
সান্ত্বনা অভয়।

উজ্জ্বল আলোক হরী আজিকার এ মৌন রজনী
মায়ামন্ত্র ঘোরা
চতুর্দ্দশ বিশ্ব খুঁজি আনি' ল'বে দীপ্ততম মনি
স্বর্গ আ'লো করা।
ওরে প্রাণ, তুই তারে দেবতার আশীর্ব্বাদ সম
নত শিরে বরি লয়ে দেব তরে প্রকাশি সম্ভ্রম
মানবের তরে,
মানবের সভামাঝে গীতীতে সকল কাজে
এনে দিবি ধরে।

ওরে প্রাণ, তবে তোর আজীবন সঙ্গীত সাধনা
পরিপূর্ণ ভবে
তোরি তরে করে দেবে যোগ্যতম আসন রচনা
সফল গৌরবে
ঘৃণা গ্লানি লুপ্ত করি ধরা হতে ওরে তোর সুর
স্থাপিবে আনন্দ রাজ্য বিশ্বমাঝে পুলকে প্রচুর,
ওরে মোর প্রাণ!
আশা ভরা প্রাণ লয়ে স্বরগের পানে চেয়ে
তুমি গাহ গান।

চৌধুরী শ্রীহরিকৃপা দেববর্ম্মা।

(৺ রায় অভয়াচরণ চৌধুরী) *

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন এতদ্দেশে সাহিত্যের গতি অত্যন্ত মন্দীভূত হইয়াছিল, যখন স্বল্প সংখ্যক পাঁচালী পুথি ইত্যাদি তথা বিধ গ্রন্থনিচয়ের সহায়তা মাত্র লাভ করিয়া সাধারণের মধ্যে কোনও কাব্যপিপাসু চিত্ত আপন আপন কাব্যামৃত রসাস্বাদের চরম সার্থকতা স্বরূপ জ্ঞান করিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন, তখন সাহিত্যের সেই স্বল্পপরিসর ক্ষেত্রে চট্টগ্রামের যে দুই একজন প্রতিভাবান্ পুরুষ, তৎকালীন লোক সাহিত্য গঠনে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে কধুরখীলের তথা সমগ্র চট্টল প্রদেশের বরেণ্য সন্তান ৺ রায় অভয়াচরণ চৌধুরী অন্যতম ছিলেন।

---

* কধুরখীল সাহিত্য সভার ১১শ বার্ষিক উৎসবে পঠিত।

তৎকালীন চট্টল সমাজের যে কয়েকটী কায়স্থ পরিবার মুসলমান রাজত্বের অভ্যুদয় কাল হইতে, আপনার বৈশিষ্ট রক্ষা করিয়া আসিতেছিল, তাহাদেরই একটীতে খৃঃ ১৮৩১ অব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মপল্লী কধুরখীল তৎসময়ে সমগ্র চট্টগ্রামের সর্ব্ববিষয়িনী উন্নতির কেন্দ্রভূমি ছিল বলিয়া জানা যায়। কধুরখীলের বিখ্যাত ৺ রায় কীর্ত্তি নারায়ণ চৌধুরীর ইতিহাস-বিশ্রুত পরিবার তাঁহার মত সুপুত্র লাভ করিয়া সমধিক গৌরবান্বিত হইয়া উঠে।

বাল্যজীবনে নানা বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়া ১৯ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি বিদ্যাশিক্ষা সমাপন করেন। তৎকালীন বঙ্গ সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র ঢাকা নগরী হইতে তিনি "ওকালতী" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করেন।

কথিত আছে, ওকালতী ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইয়া উত্তর রাউজানে অবস্থানকালীন তিনি সর্ব্বপ্রথম সাহিত্য সাধনায় প্রবৃত্ত হন। এই সময়েই তিনি তথায় স্বরচিত দক্ষযজ্ঞ নাটকের অভিনয় করেন। বলা বাহুল্য, তৎপূর্ব্বে চট্টগ্রাম বাসী কর্ত্তৃক ঈদৃশ কোনও অনুষ্ঠান হইয়াছে বলিয়া জানা নাই। ফলতঃ, ইহাতে তাঁহার প্রশংসাধ্বনি চতুর্দ্দিকে এতই বিকীর্ণ হইয়া পড়ে যে, তৎকালীন জজ আদালতের হেডক্লার্ক স্বনামধন্য গীতিবাদ্য নিপুন ৺ শ্যামাচরণ খাস্তগিরী মহাশয়ের ঐকান্তিকতায় তাঁহাকে অবশেষে সদরে উঠিয়া আসিতে হয়। এখানে আসিয়া তিনি "দ্বারিকা-মিলন," "ব্রজবিহার" প্রভৃতি আরো কয়েকখানি গীতিনাট্য রচনা করিয়া শ্যামাচরণ বাবুর সহযোগে অভিনয়াদি করেন। কাতালগঞ্জের মিঞা মোবারেক আলী খাঁর একমাত্র কন্যার বিবাহ উৎসবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তদেশাগত বহুসংখ্যক শ্রোতৃবর্গের সম্মিলনে এবং আমোদ অনুষ্ঠানের বিপুলক্ষেত্রে তাঁহার "দ্বারিকা মিলন" অভিনয় যে সম্যক সফল এবং চিত্তবিনোদনের অপূর্ব্ব সামগ্রী হইয়াছিল, তাহা প্রাচীনদের মুখে আজিও শ্রুত হয়, এবং নবীনদের নিকট এক একটী উদ্ভট কাহিনী বলিয়া বিবেচিত হয়। পরম শ্রদ্ধেয় প্রবীন সাহিত্যিক মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহোদয় লোকমুখে শ্রুত হইয়া সাহিত্য ক্ষেত্রে স্থায়ী করিবার মানসে উক্ত নাটকাবলীর অন্তর্ভুক্ত কতিপয় গান সংগ্রহ করিয়া "প্রাচীন কবির গান" শীর্ষক একাধিক প্রবন্ধে কলিকাতার বিখ্যাত পাক্ষিক পত্রিকা "সম্মিলনীতে" প্রকাশ করিয়া আমাদের অশেষ ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র নাগ মহাশয়ের স্মৃতি হইতে, আমিও যে কয়েকটী সংগ্রহ করিয়াছি, তথা হইতে দু' একটীর উল্লেখ করিয়া আপনাদের চিত্ত বিনোদন করিতে চেষ্টা করিব। তাঁহার "ব্রজবিহারের" রাধিকার মুখে :—

"শ্যামের বংশীধ্বনি শুনে ধনি গৃহে রৈতে নারি।
শুনগো চিত্রে, স্থিরচিত্তে, রসময় বাজায় বাঁশরী॥
ধৈরয না ধরি শুনে বাঁশরী,—
চল সখী যাই জীবন জুড়াই ব্রজের জীবন হেরি।
আহা মরি মরি প্রাণে মরি—
আমার কাল হৈল মোহন বাঁশী, সহচরি।
ওই শোন বিপিনে বাজে শ্যামের বাঁশরী॥" ১॥

অথবা—"দ্বারিকা মিলনে"র—

"শুন প্রাণসই, ধৈর্য্য কিসে সই,
যতন করে আর রাখিতে নারি সই,
হইয়ে (?) পরবাসে এ তুচ্ছ আকাসে
অভাগিনীর বাসে এলোনায়ে সই॥
বঁধুর পরশে নিকুঞ্জ নিবাসে
সুখের নিশিদিন গেছে অনায়াসে,
(এখন) বিনে সে ত্রিভঙ্গ বিচ্ছেদ ভুজঙ্গ,
দংশিতেছে অঙ্গ, সই, কিসে সই"॥২॥

কিম্বা—"চরণ ধরি ননদী গো, দুঃখের নদী কররে পার।
দেখে আসি কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণধন, জীবন রাধার॥
শ্যাম প্রতি যে রাগ তোমারো
সম্প্রতি আজ ক্ষমা করো,
মোর প্রতি করুণা করো
নয়ন ফিরাও একবার॥
দেখাও যদি ব্রজের জীবন
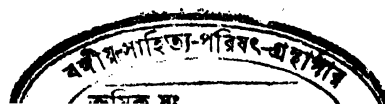
পাব জীবন হবে জীবন,
দুঃখ সয়েও রবে জীবন
জীবনের জীবন রাধার" ॥৩॥

ইত্যাদি গানের ভিতর দিয়া আমরা বুঝিতে পারি এই কবির অনুভূতিতে রাধিকার ব্যাকুলতা কি ভাবে ধরা পড়িয়াছিল। বর্ত্তমানের অধিকাংশ প্রাণহীন কাব্য-সাহিত্যের সহিত তুলনায় এই সমুদয় গানের স্থান কোথায় রচিত হইতে পারে, তাহার বিচার আপনাদের উপরই ন্যস্ত হইতেছে।

প্রাচীন সাহিত্যানুশীলনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট শ্রদ্ধের মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ মহোদয়ও তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ অনুসন্ধিৎসার বলে এবম্বিধ প্রায় তিরিশটী সঙ্গীত সংগ্রহ করিয়াছেন। তৎসম্বন্ধে তিনি যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁহার মূল্য কত অধিক, তাহা, বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যে মুন্সী সাহেবের প্রতিপত্তির বিষয় যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন। তিনি লিখিতেছেন," সংগৃহীত কয়েকটী গান হইতে বুঝা যায়, যখন বাংলা সাহিত্যের গতি অপেক্ষাকৃত শিথিল এবং অনিয়ন্ত্রিত ছিল, তখনো কেমন সুসঙ্গত বৈষ্ণব কবিতার মাধুরীমণ্ডিত গীতিনাট্য এতদ্দেশবাসী কর্ত্তৃক রচিত এবং অভিনীত হইয়া লোক সাহিত্য সংগঠনে সহায়তা করিয়াছিল।" আমার নিজের বিবেচনায়ও কবি কৃষ্ণকমল গোস্বামী প্রমুখ শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবিগণের কাব্যপ্রতিভা এবং বক্ষ্যমান বিষয়ের নায়ক ৺ রায় অভয়াচরণের কাব্য প্রতিভা সমশ্রেণীর বলিয়া মনে হয়। চট্টগ্রামে দুই বৎসর কাল ব্যবহারজীবের কার্য্য করিয়া তিনি যখন কুমিল্লার মুন্সেফ পদ গ্রহণ করেন, তৎকালে শাস্ত্রানুশীলনে এবং গ্রন্থ সংকলনে সমধিক মনোনিবেশ করেন। ত্রিপুরা নিবাসী জনৈক ভদ্রলোক শ্রীযুক্ত কেদার নাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় "রায় অভয়াচরণ চৌধুরীর জীবন কথা" নাম দিয়া বঙ্গ বিখ্যাত "বসুমতী" পত্রিকায় তাঁহার জীবনের একটা গৌরবময় কাহিনী প্রকাশ করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন।

কুমিল্লায় কিছুকাল "মুন্সেফি" করার পর তিনি সবজজের পদে উন্নীত হন, এবং মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে খৃঃ ১৮৭১ অব্দের শেষ ভাগে রংপুরের অস্থায়ী জেলা জজের পদ প্রাপ্ত হইয়া ১॥ মাস কার্য্য করার পর দুরন্ত পৃষ্ঠব্রণ রোগে ইহলীলা সম্বরণ করেন। রাজকার্য্য ব্যপদেশে এবং পিতামহের বিস্তৃত জমীদারীর উত্তরাধিকারীত্বে তিনি পর্য্যাপ্ত উপার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং বিপুল অর্থব্যয়ে নানাস্থান হইতে খ্যাতনামা পণ্ডিতমণ্ডলী আনয়ন করিয়া অসংখ্য গ্রন্থাদি সংকলন এবং সংগ্রহ করিয়া এই দেশের জন্য একটা বিরাট পুস্তকালয় রাখিয়া গিয়াছিলেন, ফলতঃ এতদর্থে তিনি নিজেকে নিঃস্ব করিয়া গিয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

কিন্তু আজ আমি এই খানেই ক্ষান্ত হইব। আমার হাতে তাঁহার সংগৃহীত অনধিক দেড়শত পুঁথি এখনো বর্ত্তমান আছে। যদি কোনও দিন সুবিধা পাই, তবে আপনাদের সমক্ষে আবার তাহা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। আজ তাঁহারই স্বদেশে, বাণী পূজার মিলন অনুষ্ঠানে আমরা তাঁহার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া ইহার সম্পূর্ণ সফলতা কামনা করি।

চৌধুরী শ্রীভগবতীপ্রসাদ দেববর্ম্মা।

থাক্ সে বিচার।

১

কারে বেশী ভালবাসি থাক্ সে বিচার!
আমি জানি গঙ্গা গৌরী দু'জনা আমার!
দু'জনার বক্ষোময়
যে অমিয় উথলয়,
নিমগ্ন হইয়া তায় ভুলিনু সংসার!
কারে বেশী ভালবাসি থাক্ সে বিচার!

২

কারে বেশী ভালবাসি কি হবে বিচারে?
আমি যে প্রেয়েছি ধন্য পেয়ে দু'জনারে!
শ্মশানে মশানে বাস,

তারা তো ছাড়েনা পাশ,
আপনা বিস্মৃতা সুখী করিতে আমারে!
কারে বেশী ভালবাসি কি হবে বিচারে!

৩

কারে বেশী ভালবাসি বিচার কে করে!
মোর তরে দোঁহে কত সয় অকাতরে!
ভূত প্রেত সাথী মোর,
রহি যে নেশায় ভোর,
তবু তারা নিশিদিন তোষে সমাদরে!
কারে বেশী ভালবাসি বিচার কে করে!

৪

কারে বেশী ভালবাসি বিচারে কি ফল!
শুষ্ক চিত্ত করে দোঁহে পীযূষ শীতল!
আমি তাই অবিচারে
ভালবাসি দু'জনারে,
পারি করিবারে পান তীব্র হলাহল!
কারে বেশী ভালবাসি বিচারে কি ফল!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

"সে কাল এ কাল"।

সে কাল এ কাল।—শ্রীচন্দ্রশেখর কর প্রণীত। পয়ারে লিখিত ক্ষুদ্র পুস্তিকা। মূল্য চারি আনা। কিন্তু গ্রন্থখানি দেশ-কাল্-পাত্রের হিসাবে অমূল্য।

সে কাল্ এ কালের রচনা সুন্দর। রচনার উদ্দেশ্য আরও সুন্দর। যে সদ্ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সহৃদয় কর মহাশয় সে কালের সহিত এ কালের তুলনা করিয়া সে কালের পবিত্র স্মৃতির উদ্বোধন করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর।

গ্রন্থের পরিচয় দিবার পূর্ব্বে গ্রন্থকারের ছবি মনে পড়িতেছে। চন্দ্রশেখর বাবু এ কালের লোক কিন্তু সে কালের ছাঁচে ঢালা। চন্দ্রশেখর কর নামে 'বাবু, কিন্তু মনে সেকেলে পণ্ডিত। চন্দ্রশেখর বাবু এ কালের শিক্ষায় শিক্ষিত, কিন্তু সে কালের দীক্ষায় দীক্ষিত। তিনি ধর্ম্মভীরু, দেবদ্বিজে ভক্তিপরায়ণ, সে কেলে হিন্দু। চন্দ্রশেখর বাবু হাকিম ছিলেন, কিন্তু চিরজীবন, ধর্ম্মের, নীতির, শাস্ত্রের সংস্কারের ও বাঙ্গালীর সামাজিক বিশ্বাসের 'হুকুম' মানিয়া আসিয়াছেন। সে কাল তাঁহাকে এ কালে জীবিত রাখিয়াছে। এ কালেও তাঁহার জীবনের, তাঁহার সাহিত্যের অবলম্বন—সে কালের সুখস্মৃতি। তিনি সে কালের ভাবে ভোর। এ কালে চন্দ্রশেখর করের গ্রাজুয়েট্, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট চন্দ্রশেখর করের আবির্ভাব,এবং তাঁহার সে কালের ভাবে ভোরপূর সাহিত্যের অভ্যুদয় amomaly বলিয়াই মনে হয়। anomaly বটে, কিন্তু ঈশ্বরের দান, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

চন্দ্রশেখর বাবু সে কালের উকীল, নজীর, পৌরাণিক, ও ব্যাখ্যাতা। এসমাজে চন্দ্রশেখর বাবুর উপযোগিতাও আছে, আবশ্যকতাও আছে। আমাদের সৌভাগ্য, নবভাব প্লাবিত বঙ্গে চন্দ্রশেখর বাবু স্রোতে ভাসিয়া যান নাই। রোজ-পমেডপাউডারের পার্শ্বে বিলাসিনী বঙ্গভাসিনী-দিগের ড্রেসিং 'টেবিলে' সজ্জিত এ কালের 'বিশুদ্ধ' উপন্যাস-সাহিত্যের সঙ্গে চন্দ্রশেখরের 'অনাথ বালক' ঠাঁই পায় না বটে, কিন্তু আমাদের সমাজে তাহার স্থানাভাব হইয়াছে, এমন কথাও বলা যায় না। চন্দ্রশেখর বাবুর সাহিত্য বহু প্রচারিত না হউক, তাহা বহুল সমাদৃত বটে। তাহার বিস্তৃতি অল্প, কিন্তু প্রভাব গভীর। ইহাই স্বাভাবিক। খাসা মোণ্ডা বাতাসার মত বিকাইতে পারে না। তাহার কারণ সুস্পষ্ট। খাসা মোণ্ডার স্থান স্বতন্ত্র। মানুষ গুণের আদর করে, কিন্তু অনেক সময়ে 'চটকের' আদর গুণের ভাগ্যে ঘটে না। ইহাতে গুণের লাঘব হয় না; গুণগ্রাহীর অল্পতাই সূচিত হয়। চন্দ্রশেখর বাবুর গ্রন্থাবলী—বাঙ্গালীর নিজস্ব রত্ন-

অতুলা—বাঙ্গালাদেশে সেরূপ সার্ব্বজনীন সমাদর লাভ করে নাই, ইহাতে জাতির মানসিক দৈন্যই সূচিত হয়। ইহাও—এই ঔষধে বিতৃষ্ণা, এই পথ্যে অরুচি, এই অমৃতে বিরাগও এ কালের লক্ষণ। এই জন্যই এ কালকে—নানাবিধ উন্নতির আশাপ্রদ আভাসের আভায় সমুজ্জল এ কালকে ভয় করিতে হয়। অন্ততঃ আমরা ভয় করি। বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতির অভ্যুদয়েই জাতির উপচয়। বাঙ্গালা সেই অভ্যুদয়ের অরুণাভায় উদ্ভাসিত—আশার কথা বটে। কিন্তু এই অভ্যুদয়ের ভিত্তি কি?

যে মনুষ্যত্ব জাতির ভিত্তি, সে মনুষ্যত্ব কি আমাদের বর্ত্তমান উন্নতির সহিত সমবেগে অগ্রসর হইতে পারিতেছে? অতীতের অবদান ও স্মৃতি জাতির নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস। সে অতীতের স্বরূপকে আমরা কি বর্ত্তমানের অবলম্বন করিয়াছি?

অতীতের সব ভাল, এবং বর্ত্তমানের সকলমন্দ নহেই। অতীতেও যুগ ধর্ম্মের বিরোধী, অনুপযোগী, সুতরাং বর্জ্জনীয় বিষয়ের অভাব ছিল না। অতীতের পাপেই বর্ত্তমানের দুর্দ্দশা। কিন্তু অতীতের পুণ্যেই বর্ত্তমানের জীবন ও সত্ত্বা, তাহাও স্মরণীয়। অতীতকে অবলম্বন করিয়াই বর্ত্তমানের পারম্পর্য্য রক্ষিত হয়। পূর্ব্বপুরুষ অতীতের ভাব ও সংস্কারের আধার। আর, পূর্ব্বপুরুষের পরিণতিই উত্তর পুরুষ। অতীতের উদ্বোধন জাতির উদ্বোধনের জন্যই আবশ্যক। বিজিত, পরতন্ত্র, দেশাত্মবোধহীন জাতির পক্ষে অতীতের শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন কেবল আবশ্যক নয়, অপরিহার্য্য।

এই জন্য আমরা "সে কাল এ কাল" নামক ষোল পৃষ্ঠার পুস্তিকার প্রসঙ্গে ষোল কাহন কথার অবতারণায় ব্রতী হই। বাঙ্গালায় 'বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি' লইয়াই ত অনেকে কারবার করেন। যাহা "হিতং মনোহারিচ," তাহার প্রচারের জন্য আমরা সেই মহাজন 'পয়ার' পথিক হইয়াছি।

"সে কাল এ কালে" বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর ছবি আছে। সে কাল তাহার আলো এ কাল তাহার ছায়া। আলোও সত্য, ছায়াও প্রত্যক্ষ। ছায়া বলিয়াই তাহা মায়া নহে। এ কাল সম্মুখে জাজ্বল্যমান। সে কাল তত্ত্বভাবুকের মনশ্চক্ষে দেদীপ্যমান। 'সে কাল ও এ কালের' প্রণেতা সে কালের পক্ষপাতী; ভক্ত। বোধ করি, দুইটী বিশেষণই পর্য্যাপ্ত হইল না। তিনি সে কালের উপাসক। চন্দ্রশেখর এই নব্য বঙ্গে, নবভাবপ্রবুদ্ধ নবপথের পথিক নব্য বাঙ্গালীর সমবায়ে ও রুচির-লীলা-বিহ্বল নব-সাহিত্যে এক জন সেকাল পন্থী। তিনি পয়ারে সে কালের জন্য আক্ষেপ করিয়াছেন। ইহাই স্বভাবিক।

সে কাল পয়ারেই আপনার ছবি রাখিয়া গিয়াছে। ত্রিপদী, ত্রোটক, প্রভৃতি পয়ারের সাহচর্য্য করিয়াছে। কিন্তু পয়ারই বাঙ্গালীর অনুষ্টুপ। কালীদাস, কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ, ঘনরাম প্রভৃতির ভাবের বাহনই পয়ার। সে কালে পয়ারই বাঙ্গালীর মানস-ভাবের মুকুর ছিল। পয়ারই বাঙ্গালীর প্রতিবিম্ব ধরিয়া রাখিয়াছে। সেকালপন্থী চন্দ্রশেখরও সে কালের স্মরণে পয়ারকেই বাহন করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ইহাই স্বাভাবিক। এ কালের পয়ারে অরুচি সেকালপন্থীতে থাকিতে পারে না। আবার

"পঞ্চশরে ভস্ম করে করেছ এ কি সন্ন্যাসী,
বিশ্ব মাঝে দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।"

এই অতুলনীয় ছন্দের ঝঙ্কারেও চন্দ্রশেখরের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত না। যে ছন্দে কৃত্তিবাস কালীদাস বাঙ্গালীকে মনের অমৃত পরিবেশন করিয়াছিলেন, যে ছন্দে ঘনরাম লিখিয়াছিলেন,—

'ধুম্‌সীর ধমকেতে ধুলো উড়ে যায়',

এবং যে ছন্দে কবিকঙ্কণ লিখিয়াছিলেন—

'তুমি খাও ঘটে জল, আমি খাই ঘাটে',

সেই ছন্দই চন্দ্রশেখর বাবু বাছিয়া লইয়াছেন। নব যুগের অনেক বরেণ্য কবি এ ছন্দকে বরণ করিয়া লইয়াছেন। প্রাচীন পয়ার নবীনের উপহাসে হাসিয়া থাকিবে, কিন্তু মরিয়া যায় নাই। জীবনীশক্তি ছিল, তাই বাঁচিয়া আছে, এবং নব সাহিত্যেও আপনার প্রভাব বিস্তার

করিয়াছে। মেঘদূতের মন্দাক্রান্তায় যে সৌন্দর্য্য ফুটিয়াছে, খর্ব্বা এলায়েছে তার মেঘময়ী বেণী'তে পয়ার তাহারই কতকটা ধরিয়া রাখিয়াছে। নব্য বাঙ্গালার মহাকবির কাব্যে পয়ার উদাত্ত ভাবে ভোর হইয়া ধ্বনিত করিয়াছে—

'মনে হয় সুখ অতি সহজ সরল।"

চন্দ্রশেখরের পয়ার সে পর্য্যায়ের আত্মবিস্মৃত ও বিবর্ত্তিত পয়ার নহে। তাহা বাঙ্গালীর জীবনকথায় অভ্যস্ত 'সেকেলে' পয়ার। আমাদের মনে হয়, এই জন্যই চন্দ্রশেখরের পয়ার সে কালের স্মরণে এত উপযোগী হইয়াছে।

এক জন সমালোচক চন্দ্রশেখরের এই পয়ার পড়িয়া বলিয়াছেন—"কৃত্তিবাসকে মনে পড়ে।" প্রশংসা বটে, কিন্তু ভিত্তিহীন। কৃত্তিবাস প্রধানতঃ পয়ারে রামায়ণ গান করিয়া পয়ারকে ও বাঙ্গালীকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন সত্য, কিন্তু পরে তাঁহার পরবর্ত্তী কবিকঙ্কণের কাব্যে তাঁহার পয়ারেরও বিবর্ত্ত হইয়াছিল। কৃত্তিবাসে যাহার উন্মেষ, ভারত চন্দ্রে তাহার বিকাশ। কৃত্তিবাসের পয়ার ছন্দশাস্ত্রের নিগড়ে সর্ব্বত্র নিয়মিত নহে। তাহা কতকটা আছি, সুতরাং আদিমতার, চিহ্ন বর্জ্জিত নহে। চন্দ্রশেখরের পয়ার কৃত্তিবাস ও ভারতচন্দ্রের মধ্যবর্ত্তী কবি-গণের পয়ারের মত বিষয়ানুগত; তাহাতে স্বৈরাচার নাই, যাঁহারা সে কালের ভক্ত, চন্দ্রশেখরের পয়ার তাঁহাদিগকে তৃপ্ত করিতে পারিবে।

চন্দ্রশেখর বাবু সে কালের বড় কথার সহিত ছোট কথাও স্মরণ করিয়াছেন। আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সাহিত্য সম্মিলনের অভিভাষণে ম্যালেরিয়ার প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া একশ্রেণীর উপহাস উপহার পাইয়াছিলেন; চন্দ্রশেখরের 'সে কাল এ কাল' তাঁহাদিগকে নাসিকা কুঞ্চনের অবকাশে দিবে, ইহাও আমরা লাভ বলিয়া মনে করি। দেশ ম্যালেরিয়ায় মুমূর্ষু, এবং দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, সাহিত্যেও ম্যালেরিয়ার সমস্ত উপসর্গ বর্ত্তমান। কিন্তু এই ম্যালেরিয়াগ্রস্ত সাহিত্যেও ম্যালেরিয়ার উল্লেখ করিবার উপায় নাই। যে সাহিত্যে সর্ব্বত্র জোছনা, চাঁদিনী, পীরিতি, পিরিতি, কিন্তু তাহার ধাতু প্রকৃতি ম্যালেরিয়ার বিষে জর্জ্জরিত, সে সাহিত্য কঙ্কালসার, জীবনী-শক্তি শূন্য। ম্যালেরিয়ায় জীর্ণ দেশের সাহিত্যেও কারণগুণে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অবশ্যম্ভাবী। তথাপি সে সাহিত্যে যদি কেহ সিন্‌কোনার চাষ করে, নব্য বাঙ্গালী তাহাকে উপহাস করে। ইহাও এ কালের ধর্ম্ম। কিন্তু যাঁহারা দেশের কল্যাণ কামনায় সে উপহাসকে শিরোধার্য্য করেন, তাঁহারা আমাদের নমস্য।

"সে কাল এ কাল" প্রাচীন যুগের "কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং" এই লক্ষণে উপেত মহাকাব্য নহে, খণ্ডকাব্যও নহে। ইহা পয়ারে রচিত, সুকৌশলে কথিত, 'তথ্যবিবৃতি'। সে তথ্য বাঙ্গালীর অবশ্য জ্ঞাতব্য। তাহা বার বার বাঙ্গালীকে শুনাইলে ভাল হয়। গদ্যে, পদ্যে, যেমন ভাবে ও ভাষায় হউক, আমরা বাঙ্গালীকে তাহা শুনাইতে চাহি। চন্দ্রশেখর বাবু তাহাই করিয়াছেন।

পূর্ব্বকালে গ্রাম্য কবিরা পয়ারে এইরূপ অনেক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতেন। চন্দ্রশেখর বাবু সেই পথের পথিক হইয়াছেন। কবিত্বের বিভায় বঙ্গ বিভাসিত করিবার জন্য "সে কাল এ কালের" সৃষ্টি হয় নাই। দরদী গ্রন্থকার সে কালের মামুলী প্রথায় বাঙ্গালীর শোচনীয় অবস্থার চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। এই পুস্তকায় 'আদ্য বস্তে চ মধ্যে চ' তাহার প্রমাণ সুস্পষ্ট।

"সে কাল এ কালে" যদি কেহ কমলবিলাসী কবির কমনীয় কবিতার বা মেঘদূতের মেঘমন্দ্রের আশা করেন, নিশ্চয়ই নিরাশ হইবেন। সে কালের পাঁচালীকার কবিরা এক ক্ষেত্রে যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতেন, চন্দ্রশেখর বাবুও সেই পথে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য পয়ারের রেখাপাতে এই ছবি আঁকিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে।

আমাদের সাহিত্য বড় বড় কথায় পূর্ণ। কিন্তু সমাজে ছোট ছোট কথারও প্রয়োজন আছে। আপাততঃ "আমাদের বড় বড় কথার শ্রীধর কথকেরা যাহাকে অত্যন্ত ছোট মনে করিয়া উপেক্ষা করিতেছেন, তাহা অনেক বড় কথা অপেক্ষাও বড়, ইহা স্মরণ করিবার সময় আসিয়াছে।

সে সকল কথা অত্যন্ত ছোট বটে। কিন্তু তাহার সমষ্টিতেই জাতির ব্যষ্টি গঠিত হয়। আর সেই ব্যষ্টির সমষ্টিই জাতি, ইহা যেন আমরা কখনও বিস্মৃত না হই। ছায়ায় ঢাকা, পাখী ডাকা পল্লীবাটে গীতি কবিতার ঝঙ্কার আছে, কিন্তু পল্লীর দারিদ্র্য সুকোমল গীতি কাব্য নহে, কঠোর 'ট্রাজিডী।' শুধু 'সোণার বাঙ্গালা'ই কবিত্বের একমাত্র উপজীব্য বা উদ্দীপক নহে। তাহাতে তাঁহারও অধিকার আছে। আমরা তাহা ভুলিয়া যাইতেছি। চন্দ্রশেখর—ঔপন্যাসিক চন্দ্রশেখর তাহা বিস্মৃত হন নাই। তিনি উপন্যাসে, প্রবন্ধে, এবং সেকেলে পয়ারে বাঙ্গালীকে তাহা স্মরণ করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। "সে কাল এ কাল" তাঁহার এই ব্রতের অন্যতম উপকরণ—'কুচো-নৈবেদ্য।' "সেকাল একালে" যাহা বিবৃত হইয়াছে, চন্দ্রশেখরের সাহিত্য-সৃষ্টির তাহাই প্রাণ, 'সে কাল এ কাল' সেই ভাব প্রবাহের একটীক্ষুদ্র ঊর্ম্মি, কিন্তু উপেক্ষনীয় নহে।

"সে কালের পল্লীবাসী খেত দুধ ভাত
অনেকে দুবেলা এবে পাতে নাক পাত ?

সে কাল এ কাল ৭ পৃষ্ঠা।

বাঙ্গালার কোনও কাব্যপ্রকাশে কোনও অলঙ্কারের উদাহরণ স্বরূপ উদাহৃত না হউক, উদ্ধৃত দুই পংক্তির যুগল তথ্য অত্যন্ত সত্য। সেকালের সহিত এ কালের এই প্রসাদটুকু পয়ারের ভাষায় পল্লীবাসীর মনে যদি মুদ্রিত হইয়া যায়, তাহা হইলে জাতির লাভ আছে। সে কালের সহজলভ্য দুধ ভাত কোথায় গেল? কেন গেল? এ কালে যাহারা দু'বেলা পাত পাতিতে পায় না, তাহাদের দুর্ভাগ্যের কারণ কি? এইরূপ জিজ্ঞাসাই জাতীয় মুক্তির জননী।

(২) "বেচিত না ভদ্র লোক বাগানের ফল,
খেত, আর বিলাইত দরিদ্রে সকল।
এবে যদি কেহ কারো পাড়ে দুটী কুল,
চোর বলি ধরে দিয়া করে হুলস্থূল!"

ইহাও অত্যন্ত সত্য। যে বাঙ্গালী বাগানের ফল লুটাইয়া দিত, সেই বাঙ্গালী কেন কুল চুরী করে, সেই বাঙ্গালী কেন কুল চোরকে জেলে পাঠায়? এ প্রশ্ন উচ্চ সাহিত্যের অঙ্গ না হইতে পারে, বাঙ্গালার খাস বিশ্বসাহিত্যেও তাহার স্থান না থাকিতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালা দেশে এ প্রশ্নের যথেষ্ট অবকাশ আছে, ইহাত অস্বীকার করিতে পারি না।

"সে কাল এ কাল" বর্ত্তমান যুগের পাঁচালী।

পাঁচালী সর্ব্বসাধারণের সাহিত্য; সৌখীন সাহিত্য নহে। যাহা সৌখীন নয়, তাহাই যদি সাহিত্য না হয়। তাহা হইলে আমরা নাচার।

(৩) জলো দুধ খেয়ে মলো শিশু ছেলে যত,
সাজ পোষাকের ব্যয়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত।"

শিশু 'জলো' দুধ খাইয়া সত্যই মরে, অথচ সাজ পোষাকের ব্যয়ে গৃহস্থের প্রাণ ওষ্ঠাগত, সমাজগত এই দারুণ দুর্দ্দশা ত অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এ উক্তি কবিত্ব নয়, সহজ, সরল, খাঁটী সত্য। এ সত্য এই পরস্পর বিরোধী দুইটী সত্যকে এক সূত্রে গাঁথিয়া 'সে কাল এ কালের' বাঁধনদার আমাদের বুদ্ধির উপর যে কটাক্ষ করিয়াছেন, আশা করি, আমরা তাহার মর্ম্ম বুঝিয়া লাভবান হইতে পারিব।

"সে কালের মুচী শুচি শ্রীকৃষ্ণে ভজিলে,
এ কালে মেথর মান্য পয়সা থাকিলে।"

১৩ পৃষ্ঠা।

ইহা রসরচনায় Epigramatic; সে কালের সহিত এ কালের সমস্ত সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট প্রভেদের হস্তামলক! "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পশ্যতি" যে দেশের উপদেশ, সে দেশে "পতিত জাতির উদ্ধার" করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইতেছে, ইহা সত্যই শোচনীয়! কিন্তু কাঞ্চন-কৌলীন্য যে দরিদ্র মহাকুলীনকেও পতিত করিতেছে, সমৃদ্ধ অকুলীনকে কুলীন করিতেছে। মুচী শ্রীকৃষ্ণ বা পরব্রহ্ম, যাহাকেই হউক, এক জনকে ভজুক, শুচি হউক, তাহাকে মাথায় করিয়া রাখিব। কিন্তু 'অখণ্ডমণ্ডলাকার' স্বর্ণ-পাত্র সঞ্চয় করিয়া যে সকল মুচী কোনও দেবতাকে না ভজিয়াই সমাজে সিংহ হইয়া হুঙ্কারে দশদিক প্রতিধ্বনিত

করিতেছে, তাহাদের ক্রীতদাস হইয়া আমরা কি এ কালের সাম্যের গৌরব উজ্জ্বল করিতেছি? সে কাল যতই মন্দ হউক, তাহার অচল আয়তনে 'ম্যামনে'র প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেকেলে লোক এমন একনিষ্ঠ-ভাবে তাহার উপদেশ করিত না।

"পূজা বিনা উপবাসী পৈতৃক ঠাকুর,
রুটী মংস খায় মুখে পালিত কুকুর।"

১৫ পৃষ্ঠা।

কি মর্ম্মান্তিক! ইহাও অত্যুক্তি নহে। কঠোর সত্য। এক দিনের কথা মনে হইতেছে। কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে কোনও মাসিক পত্রের কার্য্যালয়ে বসিয়া নবীন সম্পাদকের সঙ্গে গল্প করিতেছি। এক জন ঔপন্যাসিক—তিনি এখন বঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ—সেই গরীবখানায় উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে একটী খেঁকী কুকুর; আমাদের স্বদেশী কুকুর—'কালো কুচ্‌কুচে' রঙ্গ; বেশ হৃষ্টপুষ্ট। কিন্তু খেঁকী কুকুর! প্রতিভাশালী ঔপন্যাসিকের পোষা, পেয়ারের কুকুর—দেশী ও খেঁকী! বিলাতী টেরিয়ার নহে, কলী নহে, শেফার্ড নহে, বুল নহে, স্প্যানিয়াল নহে, গ্রে হাউণ্ড নহে, জাপানী পুতুল নহে, চীনের চাউ নহে। এমন কি নেপালের, ভুটানের ঝাঁকড়া লোমওয়ালা 'কুত্তা' ও নহে। খাঁটী স্বদেশী খেঁকী কুকুর? গুপ্ত কবির—"বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া" মনে পড়িল। শুনিলাম, কুকুরটী মানুষের ভাড়াদিয়া সুদূর সাগরপারে গিয়াছিল, আবার প্রভুর সঙ্গে ফিরিয়া আসিয়াছে। সে এইরূপ যাতায়াত করে। শুনিলাম, সে প্রত্যহ দু'টাকার খাবার খায়, সন্দেশ, রসগোল্লা, গজা, খাজা; আবার চপ, কাট্‌লেট, কোপ্তা ইত্যাদিতেও তাহার অরুচি নাই। মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া শুনিলাম। নীতিশাস্ত্রে পড়িয়াছিলাম, কাহাকেও হিংসা করিতে নাই। "বুকে হাত দিয়া" বলিতে পারি তখন সেই প্রতিভাশালী ঔপন্যাসিকের সৌভাগ্যশালী কুকুরকে ঘুণাক্ষরেও হিংসা করি নাই।

তাহার পর সারমেয়-স্বামী ঝনাৎ করিয়া টেবিলের উপর একটা টাকা ফেলিয়া দিলেন সন্নিহিত হোটেল হইতে চপ, কাট্‌লেট্ আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই খেঁকী কুকুর নীরবে নিশ্চিন্ত চিত্তে একটাকার চপ, কাট্‌লেট উদরস্থ করিল। আনন্দে একবার ও লাঙ্গুল নাড়িল না। বুঝিলাম, এইরূপ ভোজেই সে অভ্যস্ত। তখন তখন ত্রিফলাক্বাথ-বিনিন্দী চা পান করিতে করিতে সেই ভাগ্যবান কুকুরকে একটু হিংসা করিয়া ফেলিয়াছিলাম।

কুকুরের চপ ভক্ষন দেখিতে দেখিতে শুনিতেছিলাম, নিম্নে রাজপথে কে কাতর কণ্ঠে হাঁকিতেছে 'দুঃখী কানাকে একটী পয়সা দাও বাবা'। দুঃখী কানা—ভাবিলাম সে দুঃখী, অন্ধ, ভিখারী বটে, কিন্তু কোনও সৌখীন প্রভুর কুকুর নহে। সে কাহারও পালিত ও প্রিয় নহে। সে শুধু দুঃখী, অন্ধ ভিখারী। মানব-সমাজে এমন বিড়ম্বনার সংখ্যা হয় না। এ বিড়ম্বনা সার্ব্বভৌমিক। ইহা নিশ্চয়ই বঙ্গের নিজস্ব বা বাঙ্গালীর একচেটে নহে। কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বেও বাঙ্গালায় কুকুরেরও পেট ভরিত, ভিখারীও উপবাসী থাকিত না। পৈতৃক ঠাকুরের কথা আর না তুলিলেও চলে। অতএব, উল্লিখিত শ্লোকটী কবির কল্পনা বা পাঁচালীর জল্পনা নহে; খাঁটী সত্য, ধ্রুব সত্য, দ্বিজেন্দ্র বাবুর ভাষায় সার-সত্য এবং আমার চাক্ষুষ সত্য। 'সেকেলে' চন্দ্রশেখর বাবু এই সত্য epigramatic ভাষার পয়ারে ব্যক্ত করিয়াছেন।

'সে কাল এ কালে' পূর্ব্বে যাহা ছিল,তাহার পরিচয় আছে। তাহাকে নির্ব্বাসিত করিয়া পরে যাহা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহারও পরিচয় আছে। পল্লবিত ও পুষ্পিত ভাষায়। কোমল-কান্ত পদাবলীতে কাব্যের সৌরভ মাখাইয়া সে তালিকা রচিত হয় নাই সত্য, তাহা নবনীতি কাব্যের ধারা, রস ও নীতির অনুগামী নহে, তাহাও সত্য। কিন্তু তাহাতে বৈশিষ্ট্য আছে। সে বৈশিষ্ট এই যে, তাহা স্মৃতির উদ্দীপক, পৃচ্ছার প্রবর্ত্তক, চিন্তার জনক। তাহাতে রচয়িতার সহৃদয়তা ও জাতির প্রতি মমতার পরিচয় আছে। বৃন্তের উপর যেমন ফুল ফুটিয়া থাকে, 'সে কাল এ কালের' শ্লোকের বৃন্তেও তেমনই চিন্তাশীল ভাবুকের মনোরম ভাবনার ফুল ফুটিয়াআছে। সে ফুলে মা'র পূজা চলিতে পারে।

কবিদের যদি ঈশ্বর ভিন্ন অন্য অবলম্বন না থাকে, তাহা হইলে কবিরা কখনও এই সকল মর্ম্মান্তিক ও সাংঘাতিক তথ্যের আশ্রয় হইতে পারিবে না। কিন্তু যাহা আবশ্যক, সুষমা-সৌন্দর্য্যে হীন হইলেও তাহা বরণীয়। "হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ।" কিন্তু সে কালের স্মরণ, এ কালের সহিত তাহার তুলনায় সমালোচন 'হিত' ও বটে, এবং দেশের কথা, স্বর্গের কথা বলিয়া 'মনোহারী'ও বটে। 'সেকেলে' চন্দ্রশেখর বাঙ্গালীকে এই সকল কথা ভাবিবার অবকাশ দিয়া ধন্যবাদের ভাজন হইয়াছেন। সমাজের সকল স্তরের জন্যই সাহিত্য চাই। 'অনাথ বালকে'র রচয়িতা পাঁচালী-ছন্দে দেশের কথা গাইয়া দেশী লোক-সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। 'সোণার তরীর' সহিত এই দেশী তাল কাঠের ডোঙ্গা যদি বাঙ্গালীর ঘাটে লাগে, তাহা হইলে বিশ্বসাহিত্য যা হউক, বাঙ্গালী কল্যাণ লাভ করিবে। তথাকথিত 'ছোটকথা' আর না ভাবিলে নয়। তাই চন্দ্রশেখরের সে কাল গ্রন্থের এই অসম্পূর্ণ পরিচয় লিপিবদ্ধ করিলাম।

আমরা আদার ব্যাপারী। জাহাজের খবর রাখি না। এই উপলক্ষে আমি যাহা বলিলাম, তাহাও আমাদের সমশ্রেণীর ব্যাপারীদের জন্য। জাহাজে বোঝাই দিয়া ইয়ুরোপে পাঠাইবার জন্য নয়। ইহাই আমার কৈফিয়ৎ।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

সে কালের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত *

আমাদের বাড়ী ছিল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের একটা আড্ডা। ইদানীং এই গরীবের দুয়ারে লক্ষ্মীর পা পড়িতেছিল সুতরাং দুই দশজন 'পণ্ডিত ভায়া' তাঁহাকে অনুগ্রহ করিয়া আপ্যায়িত করিতেন। সে কালে এই শ্রেণীর বন্ধু সমাগমের সৌভাগ্য বড় বড় যাগ যজ্ঞের অপেক্ষা কম বোধ হইত না।

আমাদের বাড়ীতে ৩০।৩৫ জন দেশী ও বিদেশী ছাত্র পড়িত। গ্রামের ছাত্রেরা নিজ নিজ বাড়ীতে খাইত সত্য;—কিন্তু মাসে গড়ে ১০।১২ দিনই এখানে খাইত। ছাত্রেরা পড়িত, পড়াইত, হল্লা করিত। এখন যেমন ইস্কুলের ছেলেরা সকল কাজে অগ্রণী; তখন টোলের ছেলেরাই অনেক কাজ করিত। তখন অবশ্য এত কাজ ছিল না; কিন্তু যাহা ছিল,—তাহা ছাত্রেরাই করিত। তাহাদিগকে সাধারণে 'হিসাব' করিয়া চলিত এবং সম্মান করিত। বছরে কয়েক মাস পড়িয়াই এক একটা ছাত্র দিগ্‌গজ পণ্ডিত হইয়া যাইত।

ছাত্রেরা নিষ্ঠাবান ছিল। অনেকে নিরামিষ খাইত; আবার কেহ আমিষ ভিন্ন গ্রাস ধরিত না। কোন কোন ছাত্র অধ্যাপকের সঙ্গে লড়াই করিবার মত বিদ্যালাভ করিত। কেহ বা বিষম তার্কিক হইত। সেকালে "ফাঁকি" ছিল মস্তবড় পরীক্ষা। 'ফাঁকি' অর্থে কূট প্রশ্ন। এই ফাঁকির জবাব দিবার ক্ষমতা লাভ করিতে না পারিলে কোন পণ্ডিত উপাধি প্রচারে সাহসী হইতেন না। ফাঁকির উত্তর দিতে হইলে সমগ্র শাস্ত্রখানি—সহ টিকা টিপ্পনী আয়ত্ত করিতে হইত। এখন যেমন একজন পঞ্চতীর্থ বা সপ্ততীর্থ হইয়া পাঁচ সাত শাস্ত্রের সমগ্র বিদ্যা জাহির করিতে চান, সেকালে তাহা কদাচিৎ সম্ভব হইত। এখন সরকারী নির্দ্দিষ্ট বইএর নির্দ্দিষ্ট অংশ মাত্র পড়িয়া তীর্থত্ব লাভ হয়; সেকালে এক একটা শাস্ত্রে অধিকার লাভ করিতে জীবন-সায়াহ্ন উপস্থিত হইত। এখন ত কাঁচা বয়সেই সব পণ্ডিত হয়। এখন আর তেমন 'অজা গজা' পণ্ডিত হয় না; সেকালে হইত। আমাদের আমলে অধ্যাপক পণ্ডিত ছিলেন মহুয়ার মনোহর তর্কভূষণ। তাঁহার মত পণ্ডিত না কি তখন দেশ বিদেশে আর ছিল না। বিক্রমপুর নবদ্বীপের ছাত্রও আসিয়া তাঁহার টোলে পড়িত। ন্যায়শাস্ত্র আর স্মৃতি তাঁহার মুখস্থ ছিল। তাঁহার নামে পণ্ডিতসমাজ মাথা নোয়াইত। তাঁহার সমসাময়িক কয়েকজন বড় পণ্ডিতের নাম করিতেছি।

---

* ঠাকুরমার কথার চতুর্থ দফা। 'সে কাল' বলিতে পোয়াশত বৎসর পূর্ব্ব ধরিতে হইবে।

ইঁহাদের নামে দেশ গৌরবান্বিত ছিল। ভিন্ন জিলা আমাদের জিলাকে খুব মানিয়া চলিত। মনোহর তর্কভূষণ ব্যতীত এ জিলার আর কোন পণ্ডিত বিক্রমপুর হইতে 'ষোলআনা বিদায়' প্রাপ্ত হন নাই। মনোহর তর্কভূষণের সমসাময়িক ও কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী প্রধান পণ্ডিত—উস্থির রামশঙ্কর বিদ্যামণি, মহুয়ার লোকনাথ চূড়ামণি (ইহাকে বিদেশে ময়মনসিংহের গবর্ণর পণ্ডিত বলিত), ও কবি রামগঙ্গা বিদ্যাবাচস্পতি মহীনন্দের শিবানন্দ বিদ্যাবাচস্পতি, কুলহরের হরিপ্রসাদ সিদ্ধান্ত-বাগীশ, গছিহাটার গৌরদাস তর্কপঞ্চানন, আশুজিয়ার ফকির তর্কভূষণ বা কৃষ্ণমঙ্গল তর্কভূষণ, রামমোহন তর্কবাগীশ, তারাকান্ত ন্যায়রত্ন, কাটিহালীর কাশীনাথ শিরোমণি এবং পরবর্ত্তী সময়ে নওপাড়ার আনন্দকিশোর ন্যায়লঙ্কার, আমতলার গুরুদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, আশুজিয়ার কালীকান্ত ন্যায়রত্ন, ষর্শীকুড়ার কালিদাস সিদ্ধান্ত, চাকদার কালীকিঙ্কর ন্যায়পঞ্চানন ও কমলা-কান্ত শিরোমণি, শিবপুরের তারাকান্ত ন্যায়রত্ন প্রভৃতি তখন দেশবিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। শিবানন্দ ভূখার পণ্ডিত ছিলেন। শুনিয়াছি নবদ্বীপের কোন বিখ্যাত পণ্ডিত ইঁহার সহিত ১৭ বার তর্কযুদ্ধে পরাস্ত হইয়া-ছিলেন। লোকনাথ চূড়ামণি ও ফকির তর্কভূষণ যেমন বড় পণ্ডিত তেমনই সুপুরুষ ছিলেন। সে কালে পণ্ডিত সভা দেখিলে দেব সভা মনে হইত। কি এক একটী দেব পুরুষ! কি মনোহর কান্তি! কি অনবদ্য স্বাস্থ্য-সম্পদ! কি সরল উচ্চ হাসি! কি উদার হৃদয়! কি অকপট বন্ধুতা! যাহা দেখিয়াছি, বুঝিয়াছি, তাহার তুলনা জগতে নাই!

আর একজন ছাত্র ছিল কমল চক্রবর্ত্তী বা "সোনার কমল।" শুনিয়াছি ইহার মত অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন ছাত্রের কথা কেহ নাকি শুনেনও নাই। কমল দুই হাতে সমানে দুইটা বই লিখিতে পারিত। যে কোন কথা লইয়া যে কোন সংস্কৃত ছন্দে অনর্গল কবিতা রচনা করিতে পারিত। তাহার গুণে মুগ্ধ হইয়া দেশের লোক তাহাকে 'সোনার কমল' ডাকিত। বাস্তবিকই সে সোনার কমল ছিল। একবার তাহার অধ্যাপকের নিমন্ত্রণ ছিল এক জমিদার বাড়ীতে। পত্রে প্রতিনিধি প্রেরণের নিষেধ ছিল। অধ্যাপক পীড়িত থাকায় কমল চক্রবর্ত্তী শত নিষেধ সত্ত্বেও নিমন্ত্রণে উপস্থিত হইলেন। ম্যানেজার প্রতিনিধিকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। কমল ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। তিনি স্বয়ং শ্রাদ্ধ সভার নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন জানিলেন, শ্রাদ্ধ কর্ত্তা দত্তক পুত্র। কমল চক্রবর্ত্তী সহজ ভাবেই বলিয়া ফেলিলেন,—

"যত্র প্রতিনিধির্লেভে কুশমান ধনানিচ,
হাহা প্রতিনিধিস্তত্র ভোজনিয়া সুদুর্লভা।"

শ্রাদ্ধকর্ত্তা চমৎকৃত হইয়া কমলকে পণ্ডিতের সমান সম্মান প্রদান করিলেন। কোনও বিশেষ সমারোহ ব্যাপারে বহু পণ্ডিত সমাবৃত সভায় জনৈক রুক্ষভাষী পণ্ডিতকে বিচারে পরাস্ত করিয়া কমল শতকণ্ঠের জয়ধ্বনির মধ্যে পরাজিত পণ্ডিতের "ব্রহ্মশাপ" প্রাপ্ত হইলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ইহার দেড়মাস মধ্যে কমল ইহলোক ত্যাগ করে। তখনও তাহার ছাত্রাবস্থা!

ছাত্রাবস্থায় হরিপ্রসাদ সিদ্ধান্তবাগীশও দুর্দ্ধর্ষ লোক ছিলেন। তিনি যখন মহুয়া মনোহর তর্কভূষণ মহাশয়ের টোলে অধ্যয়ন করেন, তখন শুনিলেন, ঢাকা জিলার চক্রধা গ্রামে কালীকিঙ্কর ন্যায়পঞ্চানন ও কমলাকান্ত শিরোমণি নামে দুইজন বড় পণ্ডিত আছেন। হরিপ্রসাদ সেইখানে বিচারার্থ গিয়া উপস্থিত। হরিপ্রসাদের ভয় তখন পণ্ডিত মহলে বর্গীর ভয়ের মত ছিল। খুঁটিয়া, খোঁচাইয়া যুদ্ধ করার বাতিক তখন সকলেরই ন্যূনাধিক ছিল, কিন্তু হরিপ্রসাদের মত শক্তি আর কাহারও তখন ছিল না। শুনিয়াছি যে লোকনাথ চূড়ামণি কোন দিন বিচারে পরাস্ত হন নাই, তিনিও একবার হরিপ্রসাদের নিকট নিরুত্তর হইয়াছিলেন। শুনিয়াছি, বিক্রমপুরের

পণ্ডিতপ্রবর জগৎচন্দ্র সার্ব্বভৌম হরিপ্রসাদকে আহাজো পণ্ডিত বলিতেন।

আমাদের বাড়ীতে অনেক পণ্ডিতই একত্র হইতেন। আজকাল দেশে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র সমাজে যে একটা বিষম ভেদ দেখা যায়,—আমরা তাহা দেখি নাই। এমন কি কে রাঢ়ী কে বারেন্দ্র জানিবার সুযোগ ঘটিত না। আহারে বিহারে কথাবার্ত্তায় কোনও ভেদ চিহ্নই ছিল না। দাদা, ভায়া প্রভৃতি সম্বোধনই পণ্ডিতগণের পরস্পরের ডাক ছিল।

হরিপ্রসাদ বারেন্দ্র ছিলেন এবং তাঁহার মনে রাঢ়ী বিদ্বেষ ছিল। ইনি ভয়ানক দাম্ভিকও ছিলেন। তাঁহার বংশ লুপ্ত হইয়াছে। আজ হরিপ্রসাদের একটা বিচারের কথা বলিয়া বক্তব্য শেষ করিব।

মুড়াপাড়ার জমিদার ঈশান বাবুর মায়ের শ্রাদ্ধ। তত্রত্য দ্বার—পণ্ডিত ত্রিলোচন তর্কালঙ্কার (শাক্তা নিবাসী) মুড়াপাড়ার ইষ্টদেবতা উথড়াশাল নিবাসী দীননাথ ভট্টাচার্য্যকে কহিলেন—"মহাশয়, সাবধানতার সহিত ময়মনসিংহের পণ্ডিত নিমন্ত্রণ দিবেন। এবার পণ্ডিত "বাজাইয়া লইব।" এই সভায় সিদ্ধান্তবাগীশ—যে শাস্ত্র কখনো পড়েন নাই, সেই স্মৃতিশাস্ত্রের এক অতি কূট প্রশ্নের সদুত্তর দিয়াছিলেন। তাঁহার নবদ্বীপস্থ অধ্যাপক সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনিও বিস্ময়ের সহিত, কিরূপে হরিপ্রসাদ এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন, জিজ্ঞাসা করিলেন। হরিপ্রসাদ উত্তর করিলেন, "আমার জনৈক বন্ধু তাঁহার অধ্যাপকের নিকট এই অংশ অধ্যয়ন করার সময় আমি সেখানে উপস্থিত থাকিয়া প্রায় ৫ঘণ্টা ব্যাপী তর্কযুদ্ধ ও মীমাংসা শ্রবণ করিয়াছিলাম। আজ ভগবতী বীনাপাণির কৃপায় ১৭।১৮ বৎসর পর সেই সমস্ত কথা আমার মনে আসিয়াছে।" শুনিয়া সকলে স্তম্ভিত হইলেন।

আমাদের বাড়ী পণ্ডিতগণের আড্ডা ছিল, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বিক্রমপুর বা নবদ্বীপ যাইতে হইলে ১০।১৫ জন ছাত্র এখানে আসিয়া মিলিত হইয়া যাত্রা করিতেন। ঘরের বউ হইয়াও আমরা চৌপাড়ি ঘরের পণ্ডিত তর্কযুদ্ধের চেঁচামেচিতে অতিষ্ট হইয়া উঠিতাম। কতদিন দুপুরের ভাত সন্ধ্যার পূর্ব্বে আর রাত্রির ভাত ঊষাগমে কর্ত্তারা উদরস্থ করিয়াছেন, তাহার ঠিকানা নাই। সুখের বিষয় ছিল এই যে সেই ভয়ানক তর্কযুদ্ধেও মনোমালিন্য কখনো হয় নাই। সে কালের চৌপাড়ির ছাত্রেরা পণ্ডিত পাইলেই ফাঁকি করিত। 'ফাঁকির' উত্তরে 'ফাঁকি' দিয়া পণ্ডিতেরা ছাত্রের কেরামত পরীক্ষা করিতে কসুর করিতেন না। শুনিতে পাই আজকাল পণ্ডিতেরা—'আপোষে বিচার' করেন 'ছাত্রের ফাঁকি' গ্রহণ করেন না এবং বিবিধ'তীর্থ' হইয়াও নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীতে 'ফাঁকি' আবদ্ধ রাখেন। সে কালের তর্কযুদ্ধ,রাম রাবণের যুদ্ধবৎ হইত। উভয়পক্ষ হুঙ্কার করিয়া অগ্রসর হইতেন এবং সতরঞ্চি আসন গুটাইয়া লওয়া হইত। আর এখন নাকি পরিচিত পণ্ডিতে তর্কযুদ্ধ হাস্য পরিহাসে মীমাংসিত হয়।

সে কালের পণ্ডিতেরা অনেকেই দীর্ঘায়ু ছিলেন। আচারের অধীনে তাঁহারা জীবন যাপন করিতেন। ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে তাঁহাদের সময় ব্যয় হইত। সংযমে তাহারা আত্মরক্ষা করিতেন। কি উন্নত গৌরকান্তি গন্ধর্ব্ব পুরুষগণকে একত্র সমাসীন দেখিয়াছি,—আজও মনে পড়ে। যেন এক একটী দিক্‌পাল। আজকাল তেমন সুশ্রী, সুগঠিত, স্বাস্থ্যপূর্ণ, সরল প্রশান্ত মুখ—মানুষই চক্ষে পড়ে না। কোন আড়ম্বর নাই, বেশভূষার কোন পারিপাট্য নাই,—কাঁধে উত্তরীয় নগ্নদেহ—বিপুল উন্নত চেহারা কি দৃশ্যই—সেই সকল পণ্ডিতমণ্ডিত সভায় ছিল, তাহা অনুমান করাও এখন শক্ত। কাহারো গলায় রুদ্রাক্ষ, কাহারো তুলসী মাল্য। কাহারো রক্ত চন্দনের ত্রিপুণ্ড্র—কাহারো শ্বেতচন্দনের ফোঁটা বা গোপী চন্দনের তিলক। আমার বোধ হয় তোমরা সে সকল সভা দেখিলে নিঃসন্দেহ 'দেবসভা'

বলিতে পারিতে। প্রত্যেক ব্রাহ্মণ-গ্রামে দুই চারিজন পণ্ডিত ছিলেন, দুই চারিটা টোল ছিল। ছাত্রেরা অপরাহ্নে দল বাঁধিয়া অপর টোলে যুদ্ধার্থ যাইত। কেবল আলোচনা—কেবল আলোচনা তখন পরীক্ষা ছিল না, তাই শিক্ষা হইত।

পণ্ডিতদের মধ্যে, সমাজিকগণের মধ্যে অনেকেই প্রচুর আহার করাটাকে গর্ব্বের বিষয় মনে করিতেন। অবশ্য যে যতটা সামলাইতে পারিত সে তত খাইত। খাবার সামগ্রী সুলভ ছিল—লোকে খাওয়াইতেও পারিত। প্রচুর মাছ দিয়া মাষের ডাইল,—এক একজনে যাহা খাইতেন, এখন দশ জনেও তাহা পারে না। খাওয়া ও খাওয়ান উভয় কাজেই উৎসাহ ছিল। অনেকে সময় সময় বড় বড় নামজাদা ভোজন-পটু লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন। মাছ, মাংস, তৈল, ঘি, দুধ অপর্য্যাপ্ত পাওয়া যাইত। খাওয়ায় জেদও চলিতে দেখা গিয়াছে। ব্রহ্মানন্দ চক্রবর্ত্তী নামক কুমিল্লার একটি ব্রাহ্মণ দ্বাদশ জনের ভোজন কার্য্য একাকী সমাধা করিতেন। আর আজ যেন কেবল কোন প্রকারে জীবন ধারণ জন্য পথ্যরূপে আহারের ব্যবস্থা! তখনকার লোকের খাটুনী ছিল, শান্তি স্বস্তি ছিল, নির্ম্মল আরামের অবকাশ ছিল—শরীরে হাতীর বল ছিল—অভাব বড় সামান্য ছিল, সুতরাং ভোজন পটুতার সার্থকতা ছিল।

পণ্ডিতেরা ছাত্রাবস্থায় দেশে বিদেশে জ্ঞান অর্জ্জন করিতেন। ধুতি নামাবলী সম্বল করিয়া বিক্রমপুর, নবদ্বীপ প্রভৃতি দেশে আমাদের ছাত্রেরা পড়িতে যাইত। আর এখন পড়িতে গেলে বাক্স বিছানার কুলী দুইজনের কমে হয় না। ছাত্রেরা অনেক স্থানেই নিজেরা রাঁধাবাড়া করিয়া খাইত। ব্যাকরণ, সাহিত্য, ন্যায়,স্মৃতি প্রভৃতির গ্রন্থ স্বয়ং নকল করিয়া লইত—তারপর পড়িতে হইত। আর এখন ঘরে ঘরে ছাপান পুঁথি। সে কালে সুন্দর হস্তাক্ষরের বিশেষ আদর ছিল। অনেকে এমন সুন্দর লিখিতে পারিত যে—'মুক্তা পাঁতির মালা' বলিয়া তাহার আখ্যা হইত। বাঁশের কলম, কজ্জের কালীতে, তুলট কাগজে—এক একটা দিগ্গজ পণ্ডিতের কীর্ত্তি শতাব্দী ধরিয়া অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। কেহ কেহ সুন্দর লেখাও অতি দ্রুত শেষ করিয়া প্রশংসা পাইত। আমার ভাই বিশ্বনাথ বিদ্যারত্ন প্রাতঃস্নান করিয়া তালপাতা ও কালী কলম লইয়া বসিত,—আর সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে সমগ্র মার্কণ্ডের চণ্ডী লিখিয়া তবে আহারাদি করিত। এরূপ প্রশংসার্হ তখন দুই দশজন পাওয়া যাইত।—আর এখন?

পণ্ডিতগণের মধ্যে সুগায়ক ছিলেন অনেক। হরিনাম কীর্ত্তন আর রামপ্রসাদী মালসীই তখন দেশে বিশেষ প্রচলিত। কবির গান, দুর্গাপুরাণ ও কীর্ত্তন প্রভৃতিই তখন বড় বড় মজলিস মুগ্ধ রাখিত। পণ্ডিতের মধ্যে কাহারও কাহারও চটি জুতা ছিল,—শুনিলে বিস্মিত হইবে যে এক জোড়া জুতা ১৫।২০ বৎসর বেশ চলিত। ছাতা ছিল গোল পাতার। সে কালে চশমার ব্যবহার কদাচিৎ ছিল। জীবমানে প্রায় কেহই চক্ষু আর দাঁতের মাথা খাইত না। বাত, অজীর্ণ, আর আলস্য বড় ছিল না। মন ভরা ভক্তি ছিল, দেহে প্রচুর শক্তি ছিল। প্রাণে বল ছিল। এ সকল ছিল বলিয়াই—ভরা ব্রহ্মপুত্রের স্রোতে ভীষণ ঝড় তুফানের মধ্যেও লোকনাথ চূড়ামণি গুরুবাক্য রক্ষার জন্য ঝাঁপ দিয়া সাঁতারিয়া—ব্রহ্মপুত্র পাড় হইয়াছিলেন। গল্প শুনিয়াছি, বিদ্যাসাগর নাকি দামোদর পাড়ি দিয়াছিলেন; কিন্তু লোকনাথের ব্রহ্মপুত্র পাড়ি দেওয়ার তুলনা চলে না। শঙ্কর বিদ্যামণি বলিয়াছিলেন,—লোকনাথ, আমার শ্রাদ্ধে তুমি 'বিরাট' পড়িও। অধ্যাপকের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া লোকনাথ বহু চেষ্টায়ও ভয়ঙ্কর ঝড় বৃষ্টিতে নৌকা পাইলেন না। তাই গুরু আজ্ঞা রক্ষা করিতে আশ্বিন মাসে ব্রহ্মপুত্র সাঁতার কাটিয়া পার হইয়াছিলেন। তোমার মাতামহ ধানের খড়ের ছাউনী

ও সুপারি পাতার বেড়া দেওয়া ঘরে বাস করিয়া প্রথম জীবন যাপন করেন। আমার শাশুড়ী বলিয়াছিলেন "যাদের শ্রাদ্ধে বড় বড় পণ্ডিত সমাগম হয়—তাদের সৌভাগ্য।" কর্ত্তা কথাটা মনে রাখিলেন। ক্রমে তাঁহার অবস্থার উন্নতি হইতে লাগিল। তিনি তাঁহার মায়ের শ্রাদ্ধে একরূপ সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া বিক্রমপুর, নবদ্বীপ, পূর্ব্বস্থলী প্রভৃতির পণ্ডিতবর্গ নিমন্ত্রণ করিয়া মায়ের সাধ পূর্ণ করিয়াছিলেন। তাঁর পুণ্যফলেই আজ তোমরা এই কুটীরের ভিটায় দালান দেখিতেছ। সেই বামুন পণ্ডিতের মনের বল কিন্তু বর্ত্তমান সম্পত্তির অধিকারীর নাই। আর একজন পণ্ডিত ভ্রাতৃশোকে অবশিষ্ট জীবন উন্মাদ হইয়া কাটাইয়াছেন।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

লাঞ্ছিতা।

দ্বাদশ বরষে যবে একদা সন্ধ্যায়
গঙ্গাজলে গেল মোর শাঁখা দুটি ভাসি,
সমাজে সাপের মত বিষফণা তুলি
অভাগী বিধবা বেশে দাঁড়াইনু আসি।
সমাজ মুকুট যারা—দেয় নিত তারা
অধীর হৃদয়ে কভু প্রবোধ সান্ত্বনা,
লভিয়াছি চিরদিন ঘৃণা অপমান'
বিধবা পায় না বুঝি বিশ্বের করুণা!
তারপর কতদিন সমাজের কাছে
যাচিনু তৃষিত—চিত্ত এক ফোঁটা জল,
আগুনের শলা দিয়ে নেতা তার যত—
দগ্ধ করিয়া দিল মরমের তল।
অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা আর অনন্ত বেদনা
বক্ষে বহিয়া জাগে লাঞ্ছিতা ললনা!

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

ঢাকায় সঙ্গীত চর্চ্চা। *

(২)

৺ হরিচরণ কর্ম্মকারঃ—ইঁহার আদি নিবাস ছিল বিক্রমপুর-শেখরনগর গ্রামে। তথা হইতে যাত্রার ছোক্‌রারূপে ঢাকায় আসেন। সেই সময়ে ঢাকা মৈষণ্ডীতে "নন্দবিদায়" যাত্রার অভিনয় হয়, উহাতেই হরি গান করিতেন। তৎপর ঢাকা উয়ারি "মদনমোহন বসাক" রোড খালপার বাড়ী করেন। সর্ব্বপ্রথম হরি পূর্ব্বোক্ত কৃষ্ণদাস কর্ম্মকারের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। সে সময়েও ঢাকা নগরী একটি বিখ্যাত সঙ্গীত-কেন্দ্র ছিল। নানা দিদেশ হইতে ওস্তাদগণ প্রথমতঃ অতি বড় সঙ্গীত রসজ্ঞ ত্রিপুরাধিপতি মহারাজ বীরচন্দ্র মানিক্য বাহাদুরের রাজধানী আগরতলায় উপস্থিত হইতেন, তৎপরে মহারাজকে সঙ্গীত শুনাইয়া ঢাকা এবং জয়দেবপুর ও কাশিমপুর হইয়া অন্যত্র যাইতেন। হরি পরে এই সকল ওস্তাদদের মধ্যে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ধ্রুপদী ভোলানাথ চৌধুরী, অদ্বিতীয় প্রতিভাশালী তানরাজ যদুভট্ট, কালে খাঁ, মহাম্মদ খাঁ, রসুলবক্স ধ্রুপদী, আমিন খাঁ এবং অন্যান্য হিন্দু মুসলমান গায়ক যাঁহারা এখানে আসিয়াছেন তাহাদের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া আপন জ্ঞান-ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছেন। বহু পুরাতন সঙ্গীত রত্ন তাঁহার ভাণ্ডারে সঞ্চিত ছিল। তিনি অতি বড় সুরবোদ্ধা ছিলেন। তানপুরাটি হাতে নিয়া মুখে মুখে যাবতীয় গানের স্বরলিপি করিয়া দিতেন। পরজীবনে স্কুলসমূহের ভূতপূর্ব্ব ইন্‌স্পেক্টর ৺ রায় দীননাথ সেন সাহেব এবং বাইনাজুড়ির জমিদার পরলোকগত রামবাবুর সঙ্গে বহু ধ্রুপদ ও খেয়াল গানের স্বরলিপি করেন। এ যাবৎ বঙ্গদেশে যে সকল স্বরলিপি প্রণালী প্রকাশিত হইয়াছে, আমাদের ঢাকার উদ্ভাবিত প্রণালী তৎসর্ব্বাপেক্ষা সহজ-

* ঢাকা সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

বোধ্য। ইহাতে তাল মাত্রা শিক্ষার ব্যবস্থাও অতি সুন্দর ও সরল। ১০।১২ বৎসর হয় ৬২।৬৩ বৎসর বয়সে হরি কর্ম্মকার পরলোক গমন করিয়াছেন। তদীয় মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আজীবন সংগৃহীত সঙ্গীতরাজি এবং স্বরলিপিসমূহ নষ্ট প্রায় হইয়াছে। হরিকর্ম্মকার ধ্রুপদ ও খ্যাল উভয়ই গাইতেন, কণ্ঠ উত্তম ছিল। শেষজীবনে তারা গ্রামের সুর ভাল গাইতে পারিতেন না, কিন্তু উদারার সুর এমন চমৎকার গাইতেন যে মনে হইত যেন কোন যন্ত্র হইতে স্বর নির্গত হইতেছে। অতি অপূর্ব্ব ও আশ্চর্য্য কৌশলে তালের বাঁট করিয়া ধামার প্রভৃতি কঠিন গান অনায়াসে গাইতেন।

ঢাকার ভূতপূর্ব্ব উকিল সরকার বহু দরিদ্র ছাত্রের অন্নদাতা ৺রায় ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর সঙ্গীতের একজন বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি নিজেও কিছু কিছু বেহালা বাজাইতে জানিতেন এবং উচ্চকণ্ঠে "স্বপ্নবিলাস" "রাই উন্মাদিনী" প্রভৃতির গান উত্তম গাইতেন। ঈশ্বরবাবুর বাসায় একটি সঙ্গীত বিদ্যালয় ছিল। হরি ওস্তাদ উক্ত বিদ্যালয়ের এবং তৎপূর্ব্বে জগন্নাথ স্কুলের সঙ্গীত বিদ্যালয়ের সঙ্গীত অধ্যাপক ছিলেন। হরি কর্ম্মকারের প্রধান শিষ্য ঢাকার বর্ত্তমান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গায়ক শ্রীযুত এম্‌দাদ্ খাঁ। শ্রীযুত অনাথ কর্ম্মকার, মহেন্দ্র বসাক, বৃন্দাবন কর্ম্মকার, সুভাঢ্যা নিবাসী শ্রীযুত আদিত্যচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রভৃতিও তাঁহার সাকরেদ। বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখকেরও কএকদিন মাত্র তাঁহার নিকট সঙ্গীতের পাঠ নেওয়ার সৌভাগ্য হইয়াছিল।

হরি ওস্তাদ নিজে অনেক উৎকৃষ্ট উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। নিম্নে তাঁহার একটি গান উদ্ধৃত করিলামঃ—

ধ্রুপদ।

সুরট—চৌতাল।

আস্থায়ীঃ—ঝুলত মোহন মুরত শ্যামসঙ্গ প্যারী
আজ কুঞ্জমে মনিময় রতন জড়িদ হেঁদোরে।
অন্তরাঃ— কোন সখী বাজাওয়ে বীণ,
কোন সখী গাওয়ত গুণ,
কোন সখী বাজায়ে মৃদঙ্গ
মধুর বোলে।
সঞ্চারীঃ—গরজে বাদর বিমান,
বারি করত বরষণ,
এতে সুগন্ধ শাওনি পওয়ন
মন্দ মন্দ চলত ;
আভোগঃ--হরিভনতা নন্দলাল,
সরোবর ভর হুয়ে,
তীরপর হংস সারস লোলে বোলে।

একদা উপেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য্য নামে পশ্চিম বঙ্গের একজন গুণী ওস্তাদ ঢাকায় আসেন। তিনি বড় গাইয়ে, এবং সানাইর সঙ্গে গলদেশে নিস্তরঙ্গ যন্ত্র বাজাইতেও সুদক্ষ ছিলেন। রূপবাবুর বাড়ীতে উপেন্দ্র বাবুর গানের মজলিস হয়, তাহাতে তিনি অন্যান্য গানের সঙ্গে একটি ধ্রুপদ তিন রকম বিভিন্ন রাগিনীতে ও তালে গান করেন। ইহাতে সকলেই তাঁহাকে বিশেষভাবে প্রশংসা করেন। উপেন্দ্র বাবু বোম্বাই প্রদেশে ঐরূপ শিক্ষা করেন ; তিনি এরূপভাব প্রকাশ করেন যে এদেশে ওরূপ কেউ গাইতে পারে না। ঐ মজলিসে ঢাকার হরি কর্ম্মকার উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন যে এ আর এমন কি কঠিন যে এ দেশের অন্য কেউ পারিবে না? উপেন্দ্র বাবু হরিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি পারেন কি না? তখনই রূপবাবু বলিলেন যে হরি ওরূপ তিনটি বিভিন্ন রাগিনী ও তালে একটি নির্দ্দিষ্ট গান গাইতে পারিলে তিনি ১০০৲ একশত টাকা পুরস্কার দিবেন। আর যদি হরি অক্ষম হন তবে উক্ত পুরস্কারের টাকা উপেন্দ্র বাবুকে দেওয়া হইবে। হরি সম্মত হইয়া এক মাসের সময় চাহিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে হরিকে ঐ সময় দেওয়া হইল, এবং "জয়জয়ন্তী" রাগিনীর নিম্নলিখিত প্রসিদ্ধ ধ্রুপদটি ঠিক করিয়া বলা হইল যে ঐটিকেই বিভিন্ন সুরতালে গাইতে হইবেঃ—

জয়জয়ন্তী—চৌতাল।

আস্থায়ীঃ—প্রথম মানে ওঁকার, দেবন মানে মহাদেব,।
জ্ঞানন মানে গোরখ, বেদ মানে ব্রহ্ম।

অন্তরাঃ— গীত কো সঙ্গীত মানে, সঙ্গীত কো আল্লার মানে,
তাল মানে মৃদঙ্গ, নেত্ত মানে রস্তার।

সঞ্চারীঃ— রাজন মানে ইন্দ্ররাজ, গজন মানে ঐরাবত,
বিদ্যা মানে সরস্বতী, নদীন মানে গঙ্গা;

আভোগঃ—কহে ব্রজবাঁওয়ারা শুনিয়ে গোপাললাল,
দেনন মানে সূরজ, রয়না মানে চন্দ্র।

দেখিতে দেখিতে এক মাস সময় চলিয়া গেল। নির্দ্দিষ্ট দিনে রূপবাবুর বাড়ীতে অতি জমকাল মজলিস বসিল। সহরের যত ওস্তাদ, সমজদার সকলেই ঔৎসুক্যের সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন। ওস্তাদ উপেন্দ্র বাবুও তথায় সগৌরবে সমাসীন। রায় দীননাথ সেন সাহেব প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গও সেই সঙ্গীত সভার গৌরব বৃদ্ধি করিয়া বসিয়াছিলেন। মধ্যস্থ হইলেন পারশ্য ভাষায় সুপণ্ডিত গুণগ্রাহী অধ্যাপক ৺ হরিমোহন দাস। তখন প্রধান পাখোয়াজি সাধু বণিক্য পাখোয়াজ ধরিলেন, সেতারী, এস্রাজি যে যার যন্ত্র মিলাইলেন, হরির নিজ হাতে এক তানপুরা আর তাঁর শিষ্য এমদাদ মিঞার হাতে অন্য আর একটি তানপুরা। সকল যন্ত্র মিল হইলে সুরের এমনই জমাট বাঁধিয়া গেল যে সভা যেন ইন্দ্র ভবনে পরিণত হইল। হরি গান ধরিলেন। সরস্বতীর কৃপায় ধরা মাত্রই গান জমিয়া গেল। ক্রমে ক্রমে হরি সাতটি বিভিন্ন রাগিনী ও সাতটি ভিন্ন ভিন্ন তালে গানটি সুমধুর ভাবে গান করিলেন, পরে আরও ৩৪ টি অপ্রচলিত রাগিনী এবং রুদ্র তাল, ব্রহ্মতালে ঐ গানটি গাইয়া শেষ করিলেন। চারিদিক হইতে প্রশংসা ধ্বনিতে সভামণ্ডপ মুখরিত হইল। সকলেই একবাক্যে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের সম্মান রক্ষা হইল। যথার্থ গুণী উপেন্দ্র বাবুও বিস্মিত হইয়া হরির প্রশংসা করিলেন। কথিত পুরস্কারের ১০০৲ একশত টাকা তখনই হরিকে দেওয়া হইল।

আর একবার কলিকাতার সুবিখ্যাত পাখোয়াজি কেশবচন্দ্র মিত্র মহাশয় ঢাকায় আসেন। কেশব বাবু বঙ্গমাতার সুসন্তান হাইকোর্টের স্বনাম ধন্য বিচারপতি পরলোক গত সার রমেশচন্দ্র মিত্র মহোদয়ের সহোদর। সেই সময়ে ঢাকা মালীটোলার গোসাই বাড়ীতে গানের মজলিস হয়। তথায় হরি ওস্তাদ এবং ঢাকার পাখোয়াজি রামকুমার বসাক মহাশয় প্রমুখ গুণীগণ উপস্থিত ছিলেন। হরি ওস্তাদ অপেক্ষাকৃত বিলম্বিত লয়ে ধ্রুপদ গাইতেন, তাহাতে রামকুমার বাবুর পাখোয়াজের সঙ্গত করিতে কিছু অসুবিধা হইত বলিয়া তিনি হরিকে একটু ব্যঙ্গ করিতেন। হরি কেশব বাবুকে সে কথা বলেন। কেশব বাবুর সঙ্গে হরির পূর্ব্বেই বিশেষ পরিচয় ছিল, এবং তাঁহার সঙ্গে অনেকবার সঙ্গীত করিয়া প্রশংসা-লাভ করিয়াছেন। এদিন প্রথমতঃ রামকুমার বাবু হরির সঙ্গে সঙ্গত করিতে ছিলেন। হরি বিলম্বিত লয়ে গান ধরায় সঙ্গতে বড় সুখ হইতে ছিল না। রামকুমার বাবু অতি বড় সুরবোদ্ধা হইলেও দৈবক্রমে সে সময়ে পাখোয়াজও সামান্য একটু বেসুরা হইয়া পড়িয়াছিল। তখন কেশব বাবু একটু বিদ্রুপের ভাবে বলিলেন "রামকুমার বাবু, এতো খোল নয় যে মুচি একদিনই সুর বেঁধে দিয়েছে, আর কোনদিন বাঁধতে হবে না? সুরটা মিলিয়ে নিন।" এই কথার উপরে রামকুমার বাবু কেশব বাবুর হাতে পাখোয়াজ দিলেন, তিনিও যন্ত্রের সুর মনোমত বাঁধিয়া হরিকে ইচ্ছামত বিলম্বিত লয়ে গাইতে বলিলেন। হরিও যথাসাধ্য বিলম্বিত লয়ে গান ধরিলেন। অতি অপূর্ব্ব সঙ্গত হইতে লাগিল। গানও চমৎকার জমিয়া গেল। ঘণ্টাকে ঘণ্টা পার হইয়া যাইতে লাগিল, কেহই বিলম্বিত লয় ছাড়েন না। কেশব বাবু দেখিলেন যে হরি কর্ম্মকার তাঁহার শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছেন, আর বেশীক্ষণ ঐরূপ গাইলে কণ্ঠে আর কুলাইবে না। সভা শুদ্ধ লোক মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনিতেছে, এমন সময়ে অপূর্ব্ব কৌশলে ও অসামান্য

শিক্ষার পরিচয় প্রদান করিয়া কেশব বাবু চমৎকার একটি তেহাই দিয়া দ্রুত লয় ধরিয়া দিলেন, হরিও বাহাদুরির সহিত ঠিক সেই লয়ে গান ধরিয়া যেন হাফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন! সভাগৃহে যেন একটা বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। উল্লাস সূচক বাহবা ধ্বনিতে গৃহ পূর্ণ হইয়া গেল।

আর একদিনের কথা বলিয়াই হরি ওস্তাদের কথা শেষ করিব। বরিশাল রায়ের কাঠীর দক্ষিণ বাড়ীর কায়স্থ জমিদার রাজা নরনারায়ণ রায় একবার ঢাকায় আসিয়াছিলেন। তিনি পাখোয়াজে অতি উচ্চ শ্রেণীর গুণী ছিলেন। ঢাকায় অনেক মজলিসই তাঁহাকে লইয়া হইল, কিন্তু সব দিনের কথা বলিব না, এক দিনের কথা মাত্র বলিব। গুণগ্রাহীরা সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিলেন যে সকল সময়েই অপরাহ্ণ এবং রাত্রির রাগরাগিণী গুলিই কেবল শোনা হয়, ভোরের রাগরাগিণী কোথাও শোনার সুযোগ সুবিধা হয় না, অতএব এবার ভোরের রাগরাগিণী শোনার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। অতএব স্থির হইল যে জরিয়াটুলি নিবাসী গোবিন্দ জরিয়াদের বাড়ীতে নির্দ্দিষ্ট দিনে ভোর রাত্রে গান হইবে। গান করিবেন হরি কর্ম্মকার এবং সঙ্গৎ করিবেন রাজা নরনারায়ণ রায়। রাত্রি ৩টা হইতেই লোক জড় হইতে আরম্ভ হইল। ৪টার মধ্যে গৃহ ভরিয়া গেল। রাজা নরনারায়ণ রায়, রায় সাহেব দীননাথ সেন, শ্রীযুত আদিত্যচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং অন্যান্য বহু ভদ্র, সজ্জন, ওস্তাদগণ ক্রমে ক্রমে সম্মিলিত হইলেন। যন্ত্রাদি যখন সুন্দররূপে মিল হইয়া গেল, তখন বাড়ীর কর্ত্তা অশীতিপর বৃদ্ধ ৺ কৃষ্ণচন্দ্র জহুরী তাঁহার শুভ্র দেহ, শুভ্র কেশ গুম্ফ, এবং শুভ্র পরিচ্ছদ সহ সভামণ্ডপে উপস্থিত হইয়া কর যোড়ে গদগদ কণ্ঠে যখন বলিলেন "আজ আমার কি সৌভাগ্য! আজ এই দীনহীনের কুটীরে কত রাজা মহারাজা রায়-বাহাদুরের শুভাগমন হইয়াছে, আমি কি দিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিব?" এবং এই কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধ যখন আবেগ ভরে কাঁদিয়া ফেলিলেন, তখন হইতেই সভায় যেন কেমন একটি করুণ গম্ভীর ভাব বিরাজ করিতে লাগিল। সেই পবিত্র উষা কালে হরি রাগরাজ "ভৈরব" রাগের আলাপ আরম্ভ করিলেন। আলাপ এমনই জমিল যে বোধ হইল যেন মূর্ত্তিমান রাগ সেই স্থানে আবির্ভূত হইলেন। কি জানি কেন সকলেরই চক্ষে জলধারা বহিতে আরম্ভ হইল। সে কি এক অনাবিল পবিত্র আনন্দ স্রোতে সকলেরই হৃদয় গলিয়া গিয়াছে, কর্ণে মধুধারা বর্ষিত হইতেছে, আর প্রাণের আনন্দ অশ্রুরূপে প্রবাহিত হইতেছে। এমন দৃশ্য ঢাকায় আর কখনও কেহ দেখিয়াছে বলিয়া বলিতে পারেন না। বহুক্ষণ আলাপের পর ভৈরব (ভয়রোঁ) রাগেরই ধ্রুপদ গীত হইল। শ্রোতাগণ সকলেই কি এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় ভাব হৃদয়ে লইয়া গৃহে ফিরিলেন।

৺ রাম কুমার বসাক:—ঢাকা নবাবপুরে ইঁহার বাসস্থান ছিল। ইনি তন্তুবায় কুলসম্ভূত। রাম কুমার বাবুর পিতার নাম ৺ নন্দকুমার বসাক। ইনি সঙ্গীত শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। উচ্চ শ্রেণীর পাখোয়াজি বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। ইনি ৺ খয়রাতি জমাদারের নিকট পাখোয়াজ শিক্ষা করেন। রাগরাগিণীতে তার বিশেষ দখল ছিল। বিদেশ হইতে ঢাকায় কোনও ওস্তাদ আসিলে তাঁহার ভবনেই তাঁহাদের আহ্বান হইত, এবং তাঁহার বৈঠক খানায় গান বাজনা না করিলে কাহারও তৃপ্তি হইত না। ইনি সঙ্গীত চর্চ্চার জন্য লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়াছেন। রামকুমার বাবু আগরতলায় বীরচন্দ্র মানিক্য বাহাদুরের দরবারে পাখোয়াজ বাজাইতেন। তিনি "দানকেলি কৌমুদী" এবং "কোকিল সংবাদ" নামে দুইখানি যাত্রার পালা লিখিয়াছেন। দানকেলি কৌমুদী "ঢাকা বাঙ্গলা যন্ত্রে" মুদ্রিত হইয়া ১২৬৯ সনের ২১শে ভাদ্র তারিখে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে লিখিত

হইয়াছিল। ইহার রচনা বড়ই কট মট, তবে গান-গুলির সুর তাল অতীব পরিপাটী। নমুনাস্বরূপ একটি গানের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।—

"চল চল সখী যূথ, মথুরাতে হবে ব্রত,
যেচে ঘৃত, পাবে ক্রত ফল, মনোমত।
আর্য্যে জরতী প্রতি, ভগবতীর যুকতি,
পতি গতি রতি সতি যত॥" ইত্যাদি—

"কোকিল সংবাদ" প্রকাশিত হয় ১২৮৫ সনের ১লা আশ্বিন। প্রকাশক পারজোয়ার শুভাঢ্যা নিবাসী ৺ জগবন্ধু চক্রবর্ত্তী। উক্ত গ্রামের দীনবন্ধু চক্রবর্ত্তী মহাশয় এবং অন্যান্য কতিপয় ব্যক্তির উৎসাহে ও অর্থব্যয়ে এই যাত্রায় অভিনয় হয়। ইহার রচনা অপেক্ষাকৃত সরল, সুর বিন্যাসও সুন্দর। এ গ্রন্থও কৃষ্ণলীলা ঘটিত বিবরণ অবলম্বনে লিখিত। নিম্নে ২টি গান দেওয়া গেল ঃ—

১। রাগিনী সিন্ধু—তাল জলদ তেতালা।

"ওরে শঠ মধুকর নিঠুর নিদয়।
প্রণয় ব্রতের হেন সুদাক্ষিণ্য নয়॥
অহো গুঞ্জরি গুঞ্জরি, চুম্বিয়ে চুত মঞ্জরী,
লভিলে নব নলিনী ভুলি সে প্রণয়;
যে সঁপিল প্রাণ মনে, ভুলিলে তারে কেমনে,
এ নহে পিরীতি রীতি, কঠিন হৃদয়॥"

এটি শকুন্তলার বক্ষ্যমান শ্লোকটির অতি সুন্দর অনুবাদ ঃ—

"অহিণব মহুলোলুবো তুমং তহপরিচুম্বিঅ চুঅমঞ্জরিং।
কমলবসইমেত্ত নিব্বুদো মহুঅর বিসুমরিদোসিণং কহং॥"

দ্বিতীয় গানটির বিষয় হইতেছে এই ;—একদা উদ্ধব বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া রাখালদিগকে বলিলেন "প্রভু দু'দিন পরে বৃন্দাবনে আসবেন। আমি এ সংবাদ নিয়ে আপনাদের নিকট এসেছি।" রাখালদের মধ্যে একজন এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া গাইলেন—

২। রাগিনী দেশ—তাল পোস্ত।

"হউক মেনে জুড়ালেম মোদের এই ত ভাল।
অন্ধের স্বপন দেখা ঐও ভাল।
কৃষ্ণ পুনঃ আসবে হেথা, কেউ ত বলে না কোথা,
সুসংবাদের মিথ্যা কথা সেও ত ভাল।
যদবধি সখা গিছে, এমন শুনি নাই কার কাছে,
বাক্ রোধ বিকারের প্রলাপও ভাল।"

নবাবপুরের কোন একস্থানে একদিন একটি মজলিসে গান বাজনা হইতেছিল। সঙ্গীত খুব জমিয়াছে, এমন সময় রামকুমার বাবু তথায় উপস্থিত হইলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়াই বলিলেন যে নিশ্চয়ই কোন যন্ত্র বেসুরা আছে। ওখানে সেতার, এস্রাজ, তানপুরা, তবলা প্রভৃতি নানা যন্ত্রই বাজিতেছিল। শেষে অনুসন্ধানে দেখা গেল যে একটি এস্রাজ একটু সামান্য বেসুরা আছে বটে। এমনই তাঁহার সুরবোধ ছিল। রামকুমার বাবু তদীয় পুত্র শ্রীযুত উপেন্দ্রকুমার বসাক মহাশয়ের হস্তে নিজের পাখোয়াজের বিদ্যা ন্যস্ত করিয়া ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। প্রায় ৩০ বৎসর হয় ইনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

৺ সাধুচরণ বণিক্য ঃ—ইঁহার নিবাস ছিল ঢাকা কায়েৎটুলিতে। ইনি সুবর্ণ বণিক কুলোদ্ভূত। সাধুচরণ পূর্ব্বে খয়রাতি জমাদার এবং পরে পশ্চিম দেশীয় ব্রাহ্মণ ওস্তাদ রাজারামজির নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া পাখোয়াজ ও তবলায় অতি বড় ওস্তাদ হন। কলাবতগণ এখনও বলেন যে সাধুর মত "সুঘর" সঙ্গতিয়া তাঁহারা কদাচিৎ দেখিয়াছেন। নিতান্ত আনাড়ির সঙ্গেও তিনি অনায়াসে সঙ্গত করিয়া গিয়াছেন, কাহাকেও অপদস্থ করেন নাই। হাতের বোল অতি পরিষ্কার ও সুমিষ্ট ছিল এবং গানের সঙ্গে তাঁহার বোল পরণ এমন মিলিয়া যাইত যে গায়ক মাত্রই তাঁহার বাদ্যের সুখ্যাতি করিতেন। যত বড় গাইয়েই আসুন না কেন, সভাস্থলে সাধু নির্ভীক হৃদয়ে তাঁহার সহিত সঙ্গত করিতেন। তিনি গান ধরা মাত্রই বুঝিয়া লইতেন, কোন্ তাল বাজাইতে হইবে, এমনই তাঁহার আশ্চর্য্য প্রতিভা ছিল। তিনি মহাতাপ ও গোলাপ নামে দুই পুত্র রাখিয়া প্রায় ২৫ বৎসর হয় পরলোক গমন করিয়াছেন। ইহারা উভয় ভ্রাতাই অতি সুন্দর তবলা বাজান।

৺ গৌরমোহন বসাক :—ইনি ঢাকা নবাবপুর নিবাসী ছিলেন। ইনিও খয়রাতি জমাদারের নিকট তবলা শিক্ষা করেন। ভাল বাজাইতেন। গৌরমোহন বাবুও প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন।

৺ আনন্দ মোহন বসাক :—ইনিও নবাবপুর নিবাসী। আনন্দ মোহন পাখোয়াজি ছিলেন। কলিকাতার ৺ পাচুমিত্রের নিকট তিনি মৃদঙ্গ বাদ্য শিক্ষা করেন। পরে ঢাকায় রামকুমার বসাক এবং গৌর মোহন বসাক এই উভয়ের নিকটই শিক্ষা করেন। শ্রবণ মাত্র তিনি বোল শিখিয়া ফেলিতেন। ঢাকার বর্ত্তমান শ্রেষ্ঠ তবলা বাদক শ্রীযুত প্রসন্ন কুমার বণিক্য মহাশয় বলেন যে আনন্দ বাবুর মত পাখোয়াজি ঢাকায় আর কখনও হয় নাই। তবলাও অতি উৎকৃষ্ট বাজাইতেন। তিনি যখনই যে সভায় বাজাইতেন সেখানেই আনন্দের ঢেউ খেলিয়া যাইত—তাঁহার আনন্দ নামের সার্থকতা হইত।

একদিন রামকুমার বাবু দুই একজন বন্ধু সঙ্গে বিকাল বেলা নদীর ধারে বেড়াইতে যাইবেন বলিয়া ধীরে ধীরে নবাবপুরের পুলের প্রায় নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন, এমন সময় শুনিতে পাইলেন যেন অতি দূরে গম্ভীর মেঘ গর্জ্জনের শব্দ হইতেছে। আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন যে নীলাকাশ সুনির্ম্মল—এক বিন্দু মেঘও নাই। সঙ্গীরাও ঐ শব্দ শুনিতেছিলেন। তাঁহারা আর নদীর ধারে গেলেন না, ফিরিয়া চলিলেন। রামকুমার বাবু যতই নিজবাটীর নিকটবর্ত্তী হইতেছিলেন শব্দ ততই স্পষ্টতর হইতেছিল। আরও নিকটবর্ত্তী হইলে বুঝিতে পারিলেন যে উহা মৃদঙ্গনিনাদ। কে বাজায়? কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া নিজ বৈঠকখানায় গিয়া দেখিলেন আনন্দ বাদ্য অভ্যাস করিতেছেন। মুখে আনন্দকে বলিলেন "সাবাস," কিন্তু নিজ গৌরবলোপাশঙ্কায় মনে মনে কিছু অসন্তুষ্ট হইলেন। আনন্দও ভাবে ভঙ্গীতে তাহা না বুঝিলেন এমন নহে। আনন্দ এই ঘটনার পর আর বেশী দিন বাঁচিয়াছিলেন না। ঢাকার দুর্ভাগ্য যে অকালে কাল তাঁহাকে কবলিত করিল। অনুমান ৩৫ বৎসর হয় আনন্দমোহনের মৃত্যু হইয়াছে।

৺ কিশোরীমোহন বসাক :—ইহারও বাসস্থান ছিল নবাবপুরে। ইনি রামকুমার বাবুর শাক্‌রেদ্। অতি মিষ্ট তবলা বাজাইতেন। প্রায় ২০ বৎসর হয় ইনি পরলোকে যান।

৺ দ্বারকা নাথ নট্ট :—ইঁহার নিবাস ছিল ঢাকা ফরিদাবাদ। ইনি বিখ্যাত আতাহোসেন খাঁর পিতা হোষেন বক্সের শাক্‌রেদ্। অতি সুন্দর তবলা বাজাইতেন। ইনি "বড় দ্বারিকা" নামে পরিচিত ছিলেন। প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে ইনি জীবিত ছিলেন।

৺ শ্রীদামচন্দ্র দাস:—ইহার নিবাস ঢাকা নবাবগঞ্জ, বাঘলপুর। ইনি সাহা কুলোদ্ভব। ইনিও উক্ত হোষেন বক্সের শিষ্য। অতি উত্তম তবলা বাজাইতেন।

৺ দুর্গাপ্রসাদ লালা :—ইঁহার নিবাস ছিল ঢাকা উর্দ্দু বাজারে। ইনি পশ্চিম দেশীয় কায়স্থ সন্তান নবাবী আমল হইতেই কএক ঘর পশ্চিম দেশীর ভদ্রলোক নানা কার্য্যব্যপদেশে ঢাকায় আসিয়া উর্দ্দু বাজারে বসবাস করিতেছেন। দুর্গাপ্রসাদ লালা সুবিখ্যাত সুপ্পন খাঁর শিষ্য। ইনি তবলায় বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। রায় বাহাদুর ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গীত বিদ্যালয়ে ইনি তবলা শিক্ষা দিতেন। ইঁহার রচিত তবলা শিক্ষা বিষয়ক উৎকৃষ্ট মুদ্রিত গ্রন্থ আছে। অনুমান ১৫ বৎসর হয় লালাজি স্বর্গে গিয়াছেন।

৺ শ্যামাপ্রসাদ রায় চৌধুরী:—ইনি ঢাকা, কাশিমপুরের সুবিখ্যাত কায়স্থ জমিদার বংশোদ্ভব। ইনি সঙ্গীতের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এবং নিজেও উৎকৃষ্ট তবলা বাজাইতেন। ওস্তাদ হোষেণ বক্সের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। ইঁহার পুত্র শ্রীযুত সারদাপ্রসাদ রায় চৌধুরী মহাশয়েরও তবলায় বেশ হাত।

৺ মহিমাচরণ রায় চৌধুরীঃ—ইনি ঢাকা, গাছার প্রাক্তন জমিদার সন্তান। ভাল তবলা বাজাইতেন। মহিম বাবুর আত্মজ বর্ত্তমানে বলদার জমিদার শ্রীযুত নরেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয় উত্তম এস্রাজ বাজান। নরেন্দ্র বাবু বহু অর্থ ব্যয় করিয়া পশ্চিম দেশীয় ভাল ভাল ওস্তাতদের নিকট হইতে এস্রাজের উৎকৃষ্ট গদ সমুহ সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং উহার কতকাংশ "সঙ্গীত শিক্ষা" নামক গ্রন্থে প্রকাশ করিয়া দিয়া এস্রাজ শিক্ষার্থীদিগের মহৎ উপকার সাধন করিয়াছেন। বইখানির মূল্যও খুবই সস্তা, মাত্র চারি আনা। মহিম বাবু সুবিখ্যাত সুপ্পনখাঁর নিকট তবলা শিক্ষা করেন।

৺ বাজপাইলাল :—ঢাকা উর্দ্দু বাজার ইঁহার নিবাস ছিল। ভাল তবলা বাজাইতেন।

৺ রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ রায় :—ইনি ঢাকা ভাওয়াল পরগণার জয়দেবপুরের সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ রাজকুলসম্ভূত। স্বর্গীয় রাজা কালীনারায়ণ রায় মহোদয় ইঁহার পিতা। রাজা কালীনারায়ণও সঙ্গীত রসজ্ঞ ছিলেন। রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ অতি উৎকৃষ্ট তবলা বাজাইতেন। এদেশে তাঁহার মত দ্রুত লয় আর কেহই বাজাইতে পারিতেন না। তাহার হাতও বড় মিঠে ছিল। ভারত-বিখ্যাত তবলচি আতা হোষেণ খাঁ তাঁহার তবলা শুনিয়া বলিয়াছিলেন :—"মহারাজ, আপ কো হাম বহোৎ রোজ বাত লানে শকৃতাহৈ, লেকেন য়্যায়সা হাত হামারা কভি নেহি হোয়েগা। হাম্ যব্ বাজাতাহৈ, তব্ মালুম হোতা কি লকড়ি [illegible] তাহৈ, আউর্ মহারাজ যব্ বাজাতেহে তব্ মালুম হোতা কি তবলাপর য়্যায়সা বাকি বোল্তা।"

রাজা বাহাদুর অতি মধুর বাঁশী বাজাইতেন। তিনি বিশেষভাবে সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষণ করিতেন। বিদেশ হইতে যখনই কোন ওস্তাদ এখানে আসিয়াছেন তখনই তিনি তাঁহাদিগকে বরণ করিয়া নিয়াছেন, এবং যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। ভারতবিখ্যাত রবাবী ৺ কাশী-মালী খাঁ সাহেবকে বহু দিন তিনি বেতন দিয়া রাখিয়া ছিলেন। ঢাকার প্রত্যেক ওস্তাদই তাঁহার নিকট যথেষ্ট সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছেন, সকলকেই তিনি যোগ্যতা অনুসারে অর্থ দিয়া পরিতোষ করিতেন। তাঁহার এবং ঢাকার নবাব সার আবদুলগনি বাহাদুরের অভাবে ঢাকার ওস্তাদকুলকে বড়ই বিপন্ন হইতে হইয়াছে। এখন আর এমন কেহ নাই যে এই সকল গুণীর উপযুক্ত পুরস্কার করে। ১৯০১, ২৬ শে এপ্রিল তিনি স্বর্গে যান।

৺ তীর্থবাসী মাল :—ঢাকা এনায়েৎগঞ্জের চাঁদ-পুর নামক পল্লীতে ইঁহার নিবাস ছিল। ইনি জাতিতে কৈবর্ত্ত। সুন্দর টপ্পা গাইতেন এবং উৎকৃষ্ট বেহালা বাজাইতেন। "সীতার বনবাস" এবং কৃষ্ণকমল গোস্বামী মহাশয় রচিত "ভরত মিলন" যাত্রার অভিনয় করিয়া বেশ নাম করিয়া ছিলেন? সর্ব্ব সাধারণে তীর্থবাসীর যাত্রা বড়ই পছন্দ করিত। মুসলমানদের মধ্যে নিম্ন শ্রেণীর অনেকে বলিত "যাত্রা শোনত বাস্ তিথা" অর্থাৎ যাত্রা শুনিতে হইলে তীর্থবাসীর যাত্রাই শোনা উচিত। অনুমান ৪০ বৎসর পূর্ব্বে ইনি জীবিত ছিলেন।

৺ গগনচন্দ্র দাসঃ—ইহার নিবাস ঢাকা সূত্রাপুরে। ইনি সাহা বংশোদ্ভব। ইনি সাধু বণিক্যের নিকট তবলা শিক্ষা করেন। পাখোয়াজও বেশ বাজাইতেন। ভাল লয়ের বাট করিবার ইঁহার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। বৃদ্ধাবস্থায় অল্পদিন হইল পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার বহু শিষ্য আছেন।

৺ মঙ্গল শঙ্খবণিক্য :—ইহার নিবাস ছিল ঢাকা শাঁখারী বাজার। তবলা ও ঢোলকে বেশ হাত ছিল। অনুমান ১৫ বৎসর হয় ইনি জীবিত ছিলেন।

৺ ভানু কর্ম্মকার ও
৺ দ্বারকা শঙ্খবণিক্য }—প্রথম ব্যক্তির নিবাস তাঁতিবাজার কামারনগর এবং দ্বিতীয়ের নিবাস শাখারী বাজারে। ইহারা দুইজনই ঢুলির গান রচনা করার জন্ম প্রসিদ্ধ ছিলেন। দোলের সময় লক্ষীবাজার রাজাবাবুর

বাড়ীতে এবং উর্দ্দু বাজারে সহরের বাসিন্দা লোকদিগের মধ্যে যে হুলি গানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়, উহার ইসলামপুর পক্ষের বহু গানই প্রতি বৎসর ইহারা রচনা করিতেন। এই সকল গান হিন্দিতে রচিত হইয়া থাকে, এবং ইহার একেকটি গানে নানা রকমের রাগ রাগিনী ও তালের কৌশল দেখান হয়। একটি গানে ৫টি তাল থাকিলে উহাকে "পঞ্চরঙ্গ", ৭টি তাল থাকিলে "সপ্তরঙ্গ" বলে। অল্প কয়েক বৎসর হয় দ্বারকা শাঁখারী এবং কএক মাস হয় ভানু কর্ম্মকার পরলোক গমন করিয়াছেন।

মধুসূদন মাগ:—ইঁহার নিবাস ঢাকা এনায়েৎগঞ্জ। ইনি কৈবর্ত্ত জাতীয়। ইনি একজন ধ্রুপদী। উর্দ্দু বাজারের হুলির দলে ইনি বহু গান রচনা করেন।

৮ বঙ্গচন্দ্র রায়:—পারজোয়ার মান্দাইল নামক গ্রামে ইঁহার নিবাস। ইনি কায়স্থ সন্তান। কণ্ঠসঙ্গীতে ইঁহার অভিজ্ঞতা ছিল। উৎকৃষ্ট হুলির গান রচনা করিতেন। ইঁহার এক ছেলে ঢাকা কালেক্টরীতে কাজ করেন। অনুমান ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে ইনি জীবিতছিলেন।

৮ মদনমোহন বসাক:—ইনি ঢাকা নবাবপুর নিবাসী। ইঁহাকে নবাবপুরের লোকেরা "মুরগী মদন" বলিত। সেতার, এস্রাজ, কানন, জলতরঙ্গ প্রভৃতি নানাবিধ যন্ত্রে ইঁহার অধিকার ছিল। অনুমান ১৫।২০ বৎসর হয় ইনি পরলোকে গিয়াছেন।

৮ কৃষ্ণকমল গোস্বামী:—কৃষ্ণকমল নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী কৃষ্ণগঞ্জ থানার অধীন ভাজন ঘাট গ্রামে ১২১৭ সালের আষাঢ় মাসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি বৈদ্যকুল সম্ভূত। পিতার নাম ৮ মুরলীধর গোস্বামী। কৃষ্ণকমল ১২৯৪ সনের ১২ই মাঘ পরলোক গমন করেন। ২৫ বৎসর বয়সে ঢাকা আসেন। বহুদিন তিনি এখানে ছিলেন, এবং "স্বপ্নবিলাস", "রাইউন্মাদিনী", "বিচিত্র বিলাস" এবং "ভরত মিলন" নামক উৎকৃষ্ট যাত্রার পালাগুলি রচনা করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তদীয় "স্বপ্নবিলাস" ও "রাইউন্মাদিনী" প্রকৃত সাহিত্য রসযুক্ত গ্রন্থ। এই গ্রন্থদ্বয়ের গানগুলি অপূর্ব্ব,—যেমন পদবিন্যাস তেমনই উপযুক্ত সুর সংযোগ। সেই সময়ে ঢাকা এই সকল যাত্রার সঙ্গীত শ্রবণে আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়া থাকিত। তখন ওপর্য্যন্ত যাত্রা গানে বর্ত্তমান জুরিপ্রথা এবং নাটকীয় ঢঙ্গে "মধ্যম পাণ্ডব!" এবং "ওরে পাপাত্মা" সম্বোধনে কর্ণপীড়া দায়ক উৎকট বক্তৃতার প্রাদুর্ভাব হয় নাই। এখনকার যাত্রাগুলি না নাটক না যাত্রা, ইহাতে নাটকের অভিনয় এবং বাক্যবিন্যাস নৈপুণ্যও নাই সঙ্গীতের মধুরতাও নাই। পূর্ব্বে যাত্রার গান শুনিয়া লোকে চোখের জলে ভাসিয়া গিয়াছে। আর এখনকার জুরির গানে এবং ছোকরাদের ঐক্যতানহীন সম্মিলিত শিবাধ্বনি নিন্দিত চিৎকারে কর্ণজ্বালা উৎপাদন করে। তখনকার যাত্রার গানে যাঁহারা সুর দিতেন তাঁহারা সঙ্গীত শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন, তাই সময়ানুযায়ী সুন্দর সুর সংযোগ করিয়া গানগুলি রচনা করিতেন, এবং বিশুদ্ধ ভাবে সেগুলি গীত হইত। ৮ কৃষ্ণকমল গোস্বামী মহাশয়ের গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে আমার বিশেষ কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন, কারণ এ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক রায় সাহেব শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তদীয় "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক পুস্তকে, এবং ঢাকা সাহিত্য পরিষদের সহকারী সম্পাদক আমার প্রিয় বন্ধু শ্রীযুত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় এই পরিষৎ গৃহেই আলোচনা করিয়াছেন। গোস্বামী মহাশয়ের প্রথমোল্লেখিত ৩খানি পুস্তকই "কৃষ্ণকমল গ্রন্থাবলী" নামে তদীয় সুযোগ্য দৌহিত্র শ্রীযুত ক[illegible]র গোস্বামী মহাশয় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। কৃষ্ণকমলের একটি ক্ষুদ্র সঙ্গীত মাত্র এখানে উদ্ধৃত করিলাম। রাধিকা চিত্র লিখিত নিখিলশরণ শ্যামসুন্দরকে সজীব ভ্রমে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

রাগিনী মনোহরসাহী—তাল লোভা।

"এস এস নাথ রাখি হিয়ার মাঝারে ভরিয়ে
দু'টি নয়ন প্রহরী করিয়ে।

১। আসিয়ে কংশের চর, কাটিয়ে মোর এ পাঁজর
বঁধু তোমায় নিতে আর নারিবে হরিয়ে।
২। আমার হৃদয় মাঝে, বিচিত্র পালঙ্ক আছে,
তাহে সুখে শয়ন কর তুমি,
দুটি শীতল চরণ সেবি আমি,
বঁধু তোমায় প্রাণান্তে না দিব ছাড়িয়ে।"

৬ রাজচন্দ্র দাস :—নিবাস সূত্রাপুর, ঢাকা। ইনি মালাকার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। রাগ রাগিনীতে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। ইনি জগচন্দ্র রায় এবং ভক্ত চৈতন বাবুর সাহায্যে "রূপ অভিসার লীলা" নামক একটি যাত্রার পালা রচনা করিয়া ছিলেন। এই গ্রন্থ ঢাকা "নূতন যন্ত্রে" মুদ্রিত হইয়া সূত্রাপুর হইতে ১২৬৭ সনের ২৭শে মাঘ তারিখে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থও কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে লিখিত। ইহার রচনায়ও কোন বিশেষত্ব নাই, নটখটে শব্দ সমাবেশের বাহুল্য। কিন্তু রাগরাগিনী ও তাল লয় অত্যন্ত মুন্সিয়ানা ও বাহাদুরীর সঙ্গে বিন্যস্ত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি গান দিলাম। ইহাতে অষ্টাদশটি বিভিন্ন রাগিনী ও পঞ্চদশটি তাল ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা গাওয়ার সময় লোকে চমৎকৃত হইয়া যাইত। সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য নিম্নে রাগিনী ও তালগুলির নাম প্রদত্ত হইল—

রাগিনী—(১) কাণাড়া, (২) মধুমাধবী, (৩) সারঙ্গ, (৪) রারোয়াঁ, (৫) সিন্ধু, (৬) বাগেশ্রী, (৭) মূলতান, (৮) গৌরী, (৯) গারা, (১০) সিন্ধু-ভৈরবী, (১১) লগ্নিধুন, (১২) খাম্বাজ, (১৩) ঝুম, (১৪) বেহাগ, (১৫) খাম্বাজ, (১৬) বিহঙ্গরা, (১৭) ভাটিয়াল-বেহাগ, (১৮) দরবারি কানাড়া।

তাল—(১) চৌতাল, (২) তেওড়া, (৩) ফরদস্ত, (৪) আড়খেমটা, (৫) একতালা, (৬) যৎ, (৭) ব্রহ্ম, (৮) ভগ্যা, (৯) ঝাঁপ, (১০) রূপক, (১১) রুদ্র, (১২) সোয়ারি, (১৩) মধ্যমান, (১৪) তথ্যা, (১৫) ইন্দ্র।

গানটি বৃন্দার উক্তি। উহা এই :—

রাগ সাগর—তাল ফেরতা।

"ধরম করিয়ে সাখি হে বহু বল্লভ কান,
বল মম উপদেশ কভু না করিবে আন।
মোদের রাই রসবতী, বিনে তার অনুমতি,
জলবিন্দু খলমতি, আর না করিবে পান।
রাই আজ্ঞা বিনে রাখাল পতি,
পদ আধ কোথা না করিবে গতি,
দিয়ে দাস খত, তার অনুগত,
রহিবে শদত, দিবস রাতি
কদাচ ভরমে চন্দ্রাবলী নাম,
মুখে না আনিবে হে লম্পট শ্যাম,
কুঞ্জে দিশে তার না চাহিবে আর,
কর অঙ্গীকার করিয়া শপথি।
প্রতিপক্ষগণ সনে, না করিবে আলাপনে,
চিরদিন বৃন্দাবনে,
দেখা হইলে কোন স্থান।
পরিহরি হরি অমূল্য মাণিক,
তুচ্ছ কাচে তব লম্পট লালস অধিক।
হইয়ে উন্মত্ত, ত্যজিয়ে অমৃত,
ক্ষারে হইলে রত। তেই তোমায় ধিক ২।
অকলঙ্ক শশী করি অনাদর,
ক্ষুদ্র নক্ষত্রে সদা সমাদর।
শিরের ভূষণে ঠেলিয়ে চরণে,
অরসজ্ঞজনে কি কব অধিক।
ছিছি মরি লাজে, কি সাহসে এহি সাজে,
প্রভাতে রাই কুঞ্জ মাঝে,
করিয়েছিলে পয়ান।
শুধু জান শ্যাম নয়ন ভঙ্গীতে,
কুলবতী সতী যুবতী ভুলাতে।
শ্রীরাধার পিরীতি, অলৌকিক রীতি,
তুমি অজ্ঞ অতি, জানিবে কি মতে।
সুপুরুষে যদি প্রিয়ে করে মান,
পায় ধরে মান করে সমাধান।
রাই পদ ধরি, রইতে যদি পারি,
অবশ্য কিশোরী হৈত দয়াবিতে।
বিধি তোমায় প্রতিকূল,
লাভে হারাইলে মূল, হাসাইলে বৈরিকুল,
ধিক তোমার বিধান।

ক্রমশঃ

শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত।
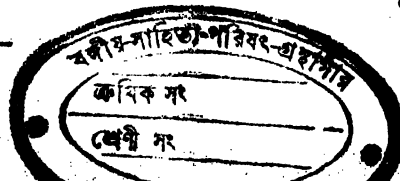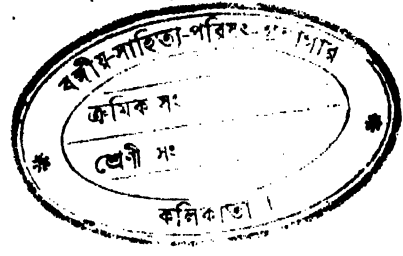
১০ম বর্ষ ভাদ্র ১৩২৭ ৫ম সংখ্যা

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ*

সভাপতি মহাশয় ও বন্ধুবর্গ! প্রবন্ধ লেখক তাহার নূতন চিন্তা শ্রোতৃবর্গদিগকে উপহার দিবার ইচ্ছা প্রণোদিত হইয়াই সাহিত্য-সভায় প্রবন্ধ পাঠ করিয়া থাকেন, শ্রোতৃবর্গও তাহার নিকট নূতন কিছু প্রত্যাশা করেন, উভয় পক্ষেরই এই ইচ্ছা ও প্রত্যাশা সম্পূর্ণ সঙ্গত ও স্বাভাবিক। আমার নির্ব্বাচিত বিষয়টী অতি পুরাতন। আপনারা সকলেই এই বিষয়ে চিন্তা ও আলোচনা করিয়াছেন, নূতন কিছু আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিবার শক্তি ও সামর্থ্য আমার নাই। তবে আপনাদের মত শিক্ষিত বন্ধুবর্গের সহিত আলোচনা করিয়া উপকৃত হইব এই বাসনার বশবর্ত্তী হইয়াই আপনাদের কাছে উপস্থিত হইয়াছি। আমাদের পরিষদের সুযোগ্য সম্পাদক আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু উপেন্দ্র বাবুর নিকট একটী প্রবন্ধ পাঠ করিব, হাসিতে হাসিতে একদিন বলিয়াছিলাম। কিন্তু প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়া দেখি ইহা আমার কাজ নহে। তাঁহার নিকট অব্যাহতি চাহিয়াছিলাম, তিনি ছাড়েন নাই। আমার আলোচ্য বিষয় "ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ" বা "প্রকৃতি ও পুরুষ"।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অতি অমূল্য গ্রন্থ। আপনারা সকলেই ইহা পাঠ করিয়াছেন। উহার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের নাম "ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিবেক অধ্যায়" বা "প্রকৃতি-পুরুষবিবেক অধ্যায়"। অদ্য সভায় ঐ অধ্যায়েরই একটু আলোচনা করিব।

১ম শ্লোক—

ইদং শরীরং কৌন্তেয়! ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ॥

* ঢাকা সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

শ্রীভগবান বলিতেছেন—হে কৌন্তেয়, এই যে শরীর ইহাকে ক্ষেত্র বলে, যে ইহাকে জানে তাহাকে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞবিদ্‌গণ ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া থাকেন।

মন, ইন্দ্রিয় ও প্রাণাদি সম্বলিত যে ভোগায়তন দেহ ইহার নাম ক্ষেত্র, আর দেহাভ্যন্তরে থাকিয়া যে পুরুষ ইহার তত্ত্ব অবগত হইতেছেন, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ পদ বাচ্য। এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ নাম—ভগবান বলিতেছেন—আমি দিতেছি না, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞবিদ্ অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ, উভয়কে যাঁহারা জানিয়াছেন, তাঁহারাই এই আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

২য় শ্লোক—

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্‌জ্ঞানং মতং মম॥

সকল ক্ষেত্রের মধ্যে আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিও; ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যে জ্ঞান তাহাই জ্ঞান, ইহাই আমার মত।

আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত যাহা কিছু উপাধিবিশিষ্ট ক্ষেত্র বা সত্ত্ব আছে, তৎসমুদয়কে ঈশ্বর জানিতেছেন—এজন্য ঈশ্বর সর্ব্বক্ষেত্র মধ্যে ক্ষেত্রজ্ঞ। এই যে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান ইহাই তত্ত্বজ্ঞান।

যে কিছুর থাকিতে হইলেই উহা কাহারও জ্ঞানে থাকিতে হইবে। জ্ঞান বলিলেই জ্ঞাতা ও জ্ঞাতব্য দুইই থাকা চাই। ক্ষেত্রজ্ঞকে ছাড়িয়া ক্ষেত্রের অস্তিত্ব যেমন অসম্ভব আবার ক্ষেত্রজ্ঞ আছেন ক্ষেত্র নাই ইহাও সম্ভব নহে। উপমাভিন্ন প্রকৃতি ও পুরুষকে বুঝাইবার কোনও ভাষা নাই। কৃষক তাহার ক্ষেত্রকে যেমন জানে—জানা কেবল চিনা নহে—ঐ ভূমি কি ফল প্রদানে সমর্থ—কি উপায়ে কখন কি ভাবে ব্যবহার করিলে উহা ঈপ্সিত ফল প্রদান করিবে, কৃষক যেমন জানে, ক্ষেত্র ও কৃষকের যেমন নিত্য সম্বন্ধ, পুরুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধও অনেকটা সেইরূপ।

ভগবান বলিতেছেন ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যে জ্ঞান তাহাই জ্ঞান। জ্ঞান অর্থাৎ অনুভূতি realisation. মানব জীবনের বিশেষত্ব এইখানেই। আমাদের শরীরস্থ আত্মা যে কেবল শরীরকে জানিয়া থাকেন তাহা নহে, তিনি নিজের স্বরূপকেও জানিতে সমর্থ। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ—দেহ ও সর্ব্বভূত এবং দেহস্থিত ও সর্ব্বভূতস্থিত আত্মাকে জানাই প্রকৃত জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান।

তৃতীয় শ্লোকে ভগবান বলিতেছেন—

তৎক্ষেত্রং যদ্ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যোযৎ প্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু॥

এই ক্ষেত্র কি, ইহার লক্ষণ কি, ইহা যাহা হইতে এবং যে যে কার্য্যরূপে উৎপন্ন হয় এবং ইহা হইতে যাহার যাহার উৎপত্তি হইয়া থাকে আর সেই ক্ষেত্রজ্ঞ ও বা কি এবং তাহার প্রভাবই বা কি, সংক্ষেপে তোমাকে বলিব।

৪র্থ শ্লোক—

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ॥

অনাদিকাল হইতে বশিষ্ঠাদি ঋষিরা পৃথকভাবে বহু প্রকারে বেদউপনিষদাদি দ্বারা এবং অসংশয়িত যুক্তিযুক্ত বাক্য দ্বারা ইহারই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

স্বভাবতঃই মনে হইবে—ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ বা লক্ষণ বর্ণনা করিতে গিয়া হঠাৎ ভগবান বেদ উপনিষদ ও ঋষিদের দোহাই দিলেন কেন? অর্জ্জুন হয়ত ভাবিতেছিলেন, আমি আজ যাহা শুনিতে যাইতেছি ইহা কেহ কখন বলেও নাই শুনেও নাই। অন্তর্দর্শী ভগবান অর্জ্জুনকে সতর্ক করিয়া বলিতেছেন--নূতন কথা বলিতেছি না, অর্জ্জুন! অনাদিকাল হইতে বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণ অসংশয়িত ও যুক্তিযুক্ত বাক্য দ্বারা ইহার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন এবং বেদ উপনিষদাদিতে ইহারই কথা বর্ণিত হইয়াছে। আজকাল অপরের নূতন কথা ও নূতন চিন্তা নিজের আবিষ্কৃত ও চিন্তাপ্রসূত বলিয়া দশজনের নিকট প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আমাদের কত প্রবল। আর যাঁহার চরণারবিন্দ হইতে বেদ উপনিষদ প্রসূত, যাঁহাকে জানিয়া

বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ মহিমান্বিত তিনি শাস্ত্র ও ঋষিগণের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া অর্জ্জুনকে শিক্ষা দিতেছেন। কি সুন্দর শিক্ষা!

আরও একটী দিক আছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রারম্ভে পাণ্ডবকুল-ভরসা, শ্রীশ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখা, ধর্ম্ম সংস্থাপনো প্রধান সহায়কারী কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন যুদ্ধ করিবেন না বলিয়া বাঁকিয়া বসিয়াছেন; দেহাত্ম বোধ তাহাকে এমনই মোহাচ্ছন্ন করিয়াছে যে ধর্ম্মার্থে বা আত্মরক্ষার জন্যও তিনি স্বজন নিধন করিতে প্রস্তুত নহেন, এ অবস্থায় ভগবানে বা ভগবদ্বাক্যে অবিশ্বাস অর্জ্জুনের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কেবল নিজের মতে আর কাটিতেছে না। নজির না দেখাইতে পারিলে যুক্তি তর্ক কিছুই টিকিতেছে না; কাজেই শ্রীকৃষ্ণকেও যুদ্ধের পক্ষে ওকালতি করিতে গিয়া নজিরের উল্লেখ করিতে হইয়াছিল। মানুষ অনেক সময় ভগবানকে না মানিতে প্রস্তুত কিন্তু ঋষি বাক্য বা শাস্ত্র উল্লঙ্ঘন করিতে প্রস্তুত নহে।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোক—

মহা ভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ। ইত্যাদি

মহাভূত সকল—ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুৎ ব্যোম বা পঞ্চ তন্মাত্র; অহংকার, বুদ্ধি, অব্যক্ত অর্থাৎ মূল প্রকৃতি বা মায়া, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক; পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ ও মন; পঞ্চ ইন্দ্রিয় গোচর পদার্থ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ; ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ সংঘাত বা শরীর, চেতনা বা জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তি, ধৃতি বা ধৈর্য্য অর্থাৎ অবসাদপ্রাপ্ত দেহ ও ইন্দ্রিয়গণকে যে শক্তি ধারণ করিয়া রাখে, বিকার সহিত এই সকলকেই সংক্ষেপতঃ ক্ষেত্র বলিয়া উক্ত হইতেছে।

অব্যক্ত বা মায়া হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে অহংকার, অহংকার হইতে মহাভূত সকলের সৃষ্টি। অহং বহু স্যাম— আমি বহু হইব; প্রকৃতি অষ্টধা ভিন্না—প্রকৃতি আট ভাগে বিভক্ত হইলেন—মায়া, বুদ্ধি, অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র। পঞ্চতন্মাত্র হইতে একাদশ ইন্দ্রিয়—মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দ সৃষ্টি হইল। ইহাই চতুর্বিংশ তত্ত্ব। এই সকলের সমাবেশ হেতু ইচ্ছা, সুখ, দুঃখ, চেতনা, ধৃতি ইত্যাদি সম্বলিত দেহ। ভগবান বলিতেছেন ইহা সবিকার ক্ষেত্র।

অব্যক্তকে, মূল প্রকৃতি, মায়া, পারমেশ্বরী শক্তি নানা নামে বর্ণনা করা হইয়াছে। মায়া অনতিক্রমনীয়া নহে তবে দুরতিক্রমনীয়া, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মায়াকে অতিক্রম করাই মানব জীবনের চরম লক্ষ্য। এই মূল প্রকৃতিকে অব্যক্ত বা অনির্ব্বচনীয় বলা হইয়াছে। বুদ্ধি উহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। ভাষা তাহাকে প্রকাশ করিতে অসমর্থ। বুদ্ধি ও বাক্ উভয়ই এই প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত। জড় বিজ্ঞানও বলিতেছেন উহা অব্যক্ত। Atom যে জড় জগতের মূলীভূত কারণ সেই theory এক্ষণে exploded theory. Ether theory &, Electron theory সব একে একে গিয়াছে বা যাইতেছে। বর্ত্তমান জড়বিজ্ঞান বলিতেছে রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধাত্মক যে এই জড়জগৎ ইহার কারণ এক energy বা শক্তি; যাহা কিছু সমুদয় সেই একই energyর manifestation বা অভিব্যক্তি মাত্র। প্রশ্ন উঠিবে—সেই energyর স্বরূপ কি? বিজ্ঞানবিদ বলিবেন উহা আজও অব্যক্ত। Inductive বা Deductive Logic এর সাহায্যে এই অব্যক্তের স্বরূপ বা এই অব্যক্ত দ্বারা আবৃত ক্ষেত্রজ্ঞকে বুঝিবার বা প্রকাশ করিবার সাধ্য নাই। এই যে সংকল্প ও বিকল্পাত্মক মন এই মন মহাভূত ও অহংকারাদির বিকার বা প্রকৃতির একটী অবস্থা। এবং অহংকারাদি বুদ্ধির এবং বুদ্ধি মায়ার পরিণত একটী অবস্থা; কাজেই প্রকৃতি বা মায়া মনোবুদ্ধির অগোচর। যদি এই প্রকৃতিকে সেই জড় বিজ্ঞানবিদের ভাষায় জড় আখ্যা প্রদান করিতে চাহেন, তবে মন জড়েরই একটী অবস্থা মাত্র। সেই মন মূল প্রকৃতি বা পারমেশ্বরী শক্তি বা

জড় বিজ্ঞানের অব্যক্ত energyকে কেমন করিয়া ধারণা করিবে? বড় বড় অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ মনের বাহিরে আর যাইতে পারেন নাই এবং মনকেই অব্যক্ত বলিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞান-বিদ্ পণ্ডিত হারবার্ট স্পেন্সার তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ The Principles of Psychologyর এক স্থানে বলিতেছেন—

Carried to whatever extent, the enquiries of the psychologist do not reveal the ultimate nature of mind any more than do the enquiries of the chemist reveal the ultimate natare of matter. Though the chemist is gravitating towards the belief that there is a primitive atom out of which by varriously arranged unions are formed the so-called clements, as out of these by varriously arranged unions are formed oxides, acids and salts and multitudinous more complex substanes yet he knows no more than he did at first about this hypohetical primitive atom and similarly though we have seen reason for thinking that there is a primitive unit of consciousness that sensations of all orders are formed of such units combined in various relations, that by compounding of thsre sensations and their various relations are produced perceptions and ideas and so on up to the highest thoughts and emotions yet this unit of consciousness remains unscrutable. Suppose it to have became quite clear that a shock in consciousness and a molecular atom are the subjective and objective faces of the samellting : we continue utterly incapable of uniting the two, so as to conceive that reality of which they are the opposite faces.

ভাবার্থ—

মনোবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত তাহার গবেষণা যতই প্রসারণ করুন না কেন, মন যে কি বস্তু, তাহা তাঁহার নিকট অজ্ঞাত। আবার Chemist তাহার গবেষণা যতই প্রসারণ করুন না কেন, জড় যে প্রকৃত কি বস্তু তাহা তাহার নিকট অজ্ঞাত। Chemistএর বিশ্বাস মূল atom বা জড়াণু হইতে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি কিন্তু সেই atom কি বস্তু বা তাহার প্রকৃতি কি, সে সম্বন্ধে তিনি পূর্ব্বেও যেমন অজ্ঞ ছিলেন, এখনও তেমনই। সেইরূপ মূল চৈতন্য-অণু হইতে এই বিশাল চিন্তা ও ভাব রাজ্যের সৃষ্টি, মনোবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতের ইহা ভাবিবার যথেষ্ট যুক্তি আছে কিন্তু এই চৈতন্যাণুর স্বরূপ কি তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। এই জড় ও চৈতন্য একই সত্বার দুই দিক—ইহা পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিলে বড়ই ভাল হইত কিন্তু এখনও আমরা ইহা ধারণা করিতে পারিতেছি না।

আর গীতা বলিতেছেন,তুমি যাহাকে মন ও চেতনা বল আর যাহাকে জড়াণু বা জড়জগৎ বল, এ সমুদয়ই এক মূল প্রকৃতি বা মায়া বা পারমেশ্বরী শক্তি বা অব্যক্ত energyর দুই তিন স্তর নিম্নের অবস্থা। তুমি যদি মূল প্রকৃতিকে জড় বলিতে চাও, তবে সেই জড়ের বিকার এই মন ও চেতনা।

হারবার্ট স্পেন্সার ঐ পুস্তকেরই আর এক স্থানে বলিতেছেন—

See then our predicament. We can think of matter only in terms of mind, we can think of mind only in terms of matter. When we have pursued our explorations of the first to the uttermost limit we are referred to the second for a final answer and when we have got th:

final answer of the second, we are referred back to the first for an interpretation of it. We find the value of x in terms of y, then we find the value of y in terms of x and so on we may continue for ever without coming nearer to a solution. The antethesis of subject and object—never to be transcended while consciousness lasts—renders impossible all knowledge of that ultimate reality in which subject and object are united.

ভাবার্থ—

আমাদের অবস্থাটা একবার ভাবুন। জড় মনের সাহায্যে আমাদের চিন্তার বস্তু। আর মন ও জড়ের সাহায্যেই আমাদের চিন্তার বিষয়। জড় সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়া দেখি যে উহার প্রকৃত মিমাংসা মনে। আবার মনের শেষ মিমাংসার জন্য পুনরায় জড়েরই আশ্রয় লইতে হয়। equation করিতে গিয়া দেখি, x এর ফল হয় y এবং y এর ফল হয় x। যতই অঙ্ককসি না কেন x এর ফল x দ্বারা এবং y এর ফল y তে পাওয়া যাইতেছে না। চুড়ান্ত মিমাংসা অসম্ভব। জড় ও চেতনা subject ও object, ভিতর ও বাহিরের এই যে antithesis বা দ্বন্দ্ব ভাব যতক্ষণ আমাদের consciousness বা জ্ঞান আছে উহাকে অতিক্রম করা অসম্ভব এবং কাজেই যে সত্বাতে এই উভয়ের স্থিতি, সেই যে ultimate reality বা শেষ সত্বা, তাহা জানাও অসম্ভব।

গীতা বলেন, অসম্ভব নহে।

এই প্রাকৃত জগতের অতীত মনোবুদ্ধির অগোচর কোনও জগৎ থাকা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে বিশেষ মত ভেদ আছে। হিগেল প্রমুখ মনস্বী পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ বুদ্ধির অগম্য কোনও বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাহারা বলেন আমাদের অভিজ্ঞতা যে দুইটী জগতের সাড়া দেয় তাহাদের একটী একাদশইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ গন্ধাত্মক জড় জগত; আর একটী বুদ্ধিবৃত্তির জগত। বিজ্ঞান, দর্শন, আইন, ধর্ম্ম-নীতি, সমাজতত্ব, ললিত-কলা সমস্তই চিন্তাপ্রসূত ও বুদ্ধি বৃত্তির গম্য। আর ক্যাণ্ট,হ্যামিণ্টন, স্পেন্সার প্রভৃতি দার্শনিক পণ্ডিতগণ বুদ্ধি বৃত্তির অতীত চিন্তাশক্তির অগম্য এক জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করেন কিন্তু তাহারা বলেন উহা অজ্ঞেয়। উভয় পক্ষ এ বিষয়ে এক প্রকার এক মত যে বুদ্ধির অগম্য জগত থাকিলেও তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়।

ঐজগৎ, গীতাও বলিতেছেন, বুদ্ধির অগম্য। আমাদের মন ও বুদ্ধি যে শক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে সেই অব্যক্ত মায়া বা পারমেশ্বরী শক্তিকে মন ও বুদ্ধি ধারণা করিতে কি ভাবা প্রকাশ করিতে পারে না, ইহা সত্য কিন্তু উহাকে জানা যায় না এমন নহে। এমন কি, মায়া দ্বারা আবৃত যে পরম পুরুষ তাঁহাকেও জানা যায়। এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যে জ্ঞান তাহাই প্রকৃত জ্ঞান বা তত্ত্ব-জ্ঞান। ইউরোপীয় মনস্বী দার্শনিক পণ্ডিতগণ অনেকেই মন ও বুদ্ধি ব্যতিরেকে জ্ঞানলাভের অপর কোনও ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। কিন্তু সর্ব্বদেশীয় ঋষিগণ মন ও বুদ্ধ্যাতীরিক্ত অপর এক অতীন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং সেই অতিন্দ্রিয়-লব্ধ জ্ঞানই realisation বা অনুভূতি।

সেণ্ট ম্যাথু ত্রয়োদশ অধ্যায়—The kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field, the which when a man hath found, hideth; and for joy thereof goeth, and selleth all that he hath and buyeth that field.

স্বর্গরাজ্য কোনও ক্ষেত্রে লুক্কায়িত গুপ্ত ধনের মত। যখন সেই গুপ্ত ধনের মানুষ অনুসন্ধান পায় তখন সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া সেই ক্ষেত্র ক্রয় করে।

হজরত মহম্মদ বলেন—It is what the eye hath

not seen, nor eaer heard nor ever flashed across the mind of man.

সেই পরম বস্তু চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় ও মনের অতীত বস্তু।

ক্রম-ক্রম স্তর অতিক্রম করিয়া, অব্যক্ত বা মায়ার আবরণ উন্মোচন করিয়া সেই সর্ব্বভূতে অবস্থিত ও আমাদের দেহাভ্যন্তরে অবস্থিত ক্ষেত্রজ্ঞ কে জানাই মানব জীবনের চরম লক্ষ্য। এজন্যই মানব হৃদয়ে জ্ঞান লাভের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা।

ভগবান ২য় শ্লোকে বলিতেছেন—ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যে জ্ঞান বা অনুভূতি তাহাই সম্যক জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান। এই জ্ঞান কি বস্তু, জ্ঞানের স্বরূপ কি এবং জ্ঞেয় বস্তু কিরূপ জ্ঞান লাভ করিয়াই বা কি ফল লাভ হয় ইহাই হইতেছে প্রশ্ন।

সপ্তম হইতে একাদশ শ্লোকে জ্ঞান কাহাকে বলে তাহাই বলা হইয়াছে। মূল প্রকৃতি বা মায়া অব্যক্ত। এই জ্ঞান বা অনুভূতি—ইহাও ভাষা দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। তবে যে ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করেন, তাহার কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এজন্যই গীতাকার জ্ঞানীর লক্ষণ বা জ্ঞান-সাধন-গুণগুলিকে জ্ঞান বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই জ্ঞান বিংশতি প্রকার। যে প্রকৃত জ্ঞানী, সন্ন্যাসী, কি মুক্ত তাঁহার এই গুণগুলি থাকিবেই। আজকাল শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে সদ্‌গুরু লাভের জন্য বিশেষ আকাঙ্ক্ষা দৃষ্ট হইতেছে। ইহা উত্তম। তাঁহারা অনেক সময়ে জিজ্ঞাসা করেন—সদগুরু কে, তাহাকে কেমন করিয়া বুঝিয়া বা বাছিয়া লইব? গীতার ১৩শ অধ্যায়ের সপ্তম হইতে একাদশ শ্লোক তাহাদিগকে বিশেষ সাহায্য করিবে ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। যথা

(১) অমানিত্ব—আত্মশ্লাঘাকে বলে মানিত্ব, তাহার অভাব অমানিত্ব।

(২) অদম্ভিত্ব—নিজের কর্ম্ম প্রকটী করন বা প্রচারের নাম দম্ভিত্ব, উহার অভাব অদম্ভিত্ব।

(৩) অহিংসা—হিংসার অভাব। প্রাণীপীড়ন পরপীড়ন বর্জ্জন।

(৪) ক্ষান্তি—ক্ষমা, অপর কেহ অপরাধ করিলেও কোনও retaliation বা প্রতিশোধ নাই।

(৫) আর্জ্জবম্—ঋজু ভাব, অবক্রত্ব, সরলতা।

(৬) আচার্য্যোপাসনা—যিনি মোক্ষসাধনে উপদেষ্টা তাহার সেবা শুশ্রূষা অর্থাৎ গুরু সেবা।

(৭) শৌচং—কায়িক শৌচ ও মানসিক শৌচ; মৃত্তিকা,জল অথবা আজকালকার অবস্থানুসারে সাবান ও জলাদি দ্বারা প্রক্ষালন। হিন্দুদের স্নান ও আচমনাদি, মুসলমানের শশ্রু কায়িক শৌচ। আর প্রতিপক্ষ ভাবনা অর্থাৎ ক্রোধাদি অপনয়ন—মানসিক শৌচ, মনের নির্ম্মলভাব, মনের স্বচ্ছ অবস্থা। এই অবস্থায় ঠিক ঠিক সকল জিনিষ মনের নিকট প্রতিভাত হয়।

(৮) স্থৈর্য্যং—স্থির ভাব। স্থির ভাবকেই মোক্ষ মার্গ বলা হইয়াছে। সকলই চলমান। স্থাবর জঙ্গম জীব জন্তু জগত সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র আর আমাদের এই ক্ষণভঙ্গুর জীবন সকলই চলিতেছে—যে দিকে দৃষ্টিপাত করুন দেখিবেন কেবলই অস্থিরতা, কেবল চঞ্চলতা। স্থৈর্য্যকে শ্রীশ্রীভগবান জ্ঞান বলিতেছেন। জ্ঞানী স্থির। শরীর তাঁহার স্থির, বাক্য তাহার স্থির, মন তাহার স্থির। কায়িক স্থৈর্য্য—শরীরকে স্থির করা কি সহজ? শরীর সর্ব্বদাই চপল। কায়া স্থির করিবার জন্যই আসন ও প্রাণায়ামাদির ব্যবস্থা। উহা জ্ঞানীকে জ্ঞানলাভে, মোক্ষকামীকে মুক্তিলাভে বিশেষ সহায়তা করে।—বাচিক স্থৈর্য্য-উহা সহজ নহে। বাচালতা আমাদের কত অনিষ্ট করে তাহা বর্ণনীয় নহে। অসত্য কথন, অর্দ্ধসত্য কথন, অতিরঞ্জন, পরনিন্দা, আত্মশ্লাঘা ইত্যাদি এ সকলই কি বাচালতার ফল নহে? মানসিক স্থৈর্য্য—প্রকৃতিতে মনের মত আর বোধ হয় চঞ্চল বস্তু কিছুই নাই। কি চঞ্চল! মহিষ শৃঙ্গে সরিষার স্থায়িত্বও যতটুকু সম্ভব,মনের স্থিরতা ততটুকুও সম্ভবপর নহে। কেবল ছুটিতেছে, কেবল

চলিতেছ, ধরা বড় শক্ত। মনের স্থিরতা, নির্ব্বাত নিষ্কম্প দীপ-শিখার মত।

(৯) আত্মবিনিগ্রহঃ—প্রবৃত্তিমার্গের নিরোধ। কেহ হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন—প্রবৃত্তির আবার নিগ্রহ কেন? মনুষ্য ও পশু জীবনে পার্থক্য এই নিগ্রহেই। যত নিগ্রহ, তত জ্ঞান; কেন জানি না। ইহাই নিয়ম। আহারে ক্ষুধা নিবৃত্তি—জলপানে পিপাসা নিবৃত্তি যেমন নিয়ম, প্রবৃত্তি দমনে জ্ঞানলাভ, ইহাও তেমনই নিয়ম।

(১০) ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যম্—শব্দ রূপ রস গন্ধ স্পর্শ হইতে উদ্ভূত ভোগ্য বস্তুতে বিরাগ ভাব।

(১১) অনহঙ্কার—অহঙ্কারের অভাব।

(১২) জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখ দোষানুদর্শনম্—

এই জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধিতে যে দুঃখ তাহার দোষ অনুদর্শন করিয়াই শাক্যসিংহ পরম প্রেয়সী ভার্য্যা, মায়ার আকর পরম স্নেহ ভাজন সুকুমার আত্মজ, পরম স্নেহশীল পিতা মাতা, সমৃদ্ধি শালী সাম্রাজ্য এক কথায় সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া পরম সর্ব্বধন বা বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

(১৩) অসক্তিঃ—বিষয়ে যে প্রীতি তাহার অভাব।

(১৪) পুত্রদারগৃহাদিষু অনভিষঙ্গঃ—পুত্র দারা গৃহাদিতে অভিষঙ্গের অভাব। আমার পুত্র, আমার স্ত্রী, আমার বাড়ী, আমার ধন, স্ত্রী পুত্রাদির সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী, তাহাদের জীবন মরণে নিজের জীবন ও মরণ, এই ভাবের অভাব।

(১৫) নিত্যং সমচিত্তত্বম্ ইষ্টানিষ্ট উপপত্তিষু—ইষ্ট কি অনিষ্ট উপস্থিত হইলে সর্ব্বদা সমচিত্ততা।

(১৬) ময়ি অনন্যযোগেন অব্যভিচারিণী ভক্তিঃ—অপৃথক সমাধি দ্বারা অর্থাৎ ভগবান ভিন্ন আর অন্য কেহ নাই, তিনি ভিন্ন আর গতি নাই এইরূপ নিশ্চিত একমনা ভক্তি।

(১৭) বিবিক্তদেশসেবিত্বম্—নির্জ্জনদেশসেবা। গভীর অরণ্য, বিরাট পর্ব্বত চূড়া, নির্জ্জন নদীসৈকত গভীর নিশিথে নক্ষত্র খচিত উন্মুক্ত আকাশতল, জনশূন্য শ্মশান, এই সকল স্থানে বাস করিবার ইচ্ছা।

(১৮) অরতির্জনসংসদি—জনতার মধ্যে থাকিতে অনিচ্ছা।

(১৯) অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বম্—নিত্য অধ্যাত্ম জ্ঞান-সেবা। সর্ব্বদা আত্মবিষয়ে জ্ঞান বা উপলব্ধি।

(২০) তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শনম্—তত্ত্ব জ্ঞানাবলোকনে এবং তৎসাধনানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি, মোক্ষের জন্য তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন ইহা দর্শন, নিত্যানিত্য বস্তুর বিচার, জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ জ্ঞান প্রভৃতিকে জ্ঞান বলা হইয়া থাকে। ভোগ্য বস্তুর অনিত্যতা সম্বন্ধে সর্ব্বদা বিচারও এই যে ক্ষণভঙ্গুর দেহের অন্তরাল জীবাত্মা আর এই সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল জড় জগতের অবলম্বন পরমাত্মা এই উভয় একই, এই যে অভেদ জ্ঞান ইহার নাম অধ্যাত্ম জ্ঞান নিত্যত্বম। ক্ষণিক নহে, সংশয়াবিষ্ট নহে, এই আসিল আবার গেল এমন নহে। স্থায়ী জ্ঞান, দৃঢ় জ্ঞান।

এই যে অমানিত্ব হইতে অধ্যাত্ম জ্ঞান—বিংশতি অবস্থা এই সকলই জ্ঞান আর যাহা কিছু ইহার বিপরীত তাহাই অজ্ঞান। মানিত্ব, দম্ভ, হিংসা, ক্ষমার অভাব, অসরলতা, গুরুসেবায় অনিচ্ছা, অশৌচ, চাপল্য,বাসনার বশবর্ত্তীতা, ভোগ্য বস্তুতে আসক্তি, অহংকার, জন্ম মৃত্যুজরাব্যাধির মধ্যে থাকিয়াও তৎসম্বন্ধে আলোচনার অভাব, সঙ্গপ্রাপ্তেচ্ছা, পুত্রদারা গৃহাদিতে আত্মবোধ, সামান্য ইষ্ট উপস্থিত হইলে উল্লাস এবং একটু অনিষ্টের আশঙ্কায় বিষন্নতা, ভগবানেতর বস্তুতে ভক্তি, সর্ব্বদা লোকালয়ে থাকিবার ইচ্ছা, সভা সমিতি ও আমোদ উল্লাস, ক্লাব বা বৈঠকখানার প্রতি অনুরক্তি, দেহাত্ম বোধ ও অনিত্য বস্তুতে নিত্যবোধ ইত্যাদিকে অজ্ঞান বলিয়া উক্ত হইতেছে।

এই বিংশতি প্রকার অবস্থাকে জ্ঞান বলিয়া উল্লেখ করিয়াই ভগবান ক্ষান্ত হইলেন না। দ্বাদশ শ্লোকে তিনি

বলিতেছেন—যাহা বা যিনি জ্ঞেয় পদার্থ, যাহাকে জানিলে অমৃত প্রাপ্ত হওয়া যায়, যিনি অনাদিমৎ পরব্রহ্ম, আছেন কি নাই এইরূপ কোনও কথা দ্বারা তাহাকে ব্যক্ত করা যায় না। ইন্দ্রিয় ও মনোগোচর পদার্থকেই আমরা 'আছে' বলি। ঘট আছে, ঘট ভাঙ্গিয়া গেল; ঘট নাই। আমাতে তাহার কত স্নেহ ছিল—এইরূপ 'থাকা ও না থাকা' কথা দ্বারা সেই অনাদিমৎ পরব্রহ্মকে প্রকাশ করা যায় না। আর তাঁহাকে জানিতে পারিলে অমৃতত্ব লাভ করা যায়। উপনিষদে এই ব্রহ্মকে সম্বন্ধ রহিত, অদ্বয়, অবিষয় আত্মা বলা হইয়াছে। যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে—যেখানে গিয়া বাক্য ফিরিয়া আসে—অবাঙ্‌মনসোগোচর—তিনি বাক্য ও মনের অগোচর।

ইহা হইল প্রকৃত স্বরূপের লক্ষণ। কিন্তু একটু মুস্কিল হইল। তাহাকে বলা যায়না, তাহাকে মন দ্বারা ধারণা করা যায় না, অর্জ্জুনের নিকট এ সকল কথা বলিয়া ভগবান ভাবিলেন, এত কিছু হইল না। জ্ঞেয় বস্তুকে বুঝাইতে গিয়া তাহাকে বুঝান যায় না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিলে অর্জ্জুন যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিয়া যইতেছেন। শ্রীভগবান সেই ভাষার অতীত বস্তুকে ভাষা দ্বারা কিঞ্চিৎ আভাবে বা ঈঙ্গিতে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন।

ত্রয়োদশ শ্লোকের ভাবার্থএই—তাঁহার সকল স্থানে হস্ত ও পদ, সকল স্থানেই তাঁহার চক্ষু মস্তক ও মুখ, সকল স্থানেই তাঁহার কর্ণ, সকল লোকে তিনি সকল আবরণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন। অর্থাৎ তিনি অনন্তপানি, অনন্তপাদ, অনন্ত চক্ষু, অনন্ত মুখ, অনন্তমস্তক, অনন্তশ্রুতিসম্পন্ন, তিনি অনন্ত গুণ সম্পন্ন। তিনি সকল দেখিতেছেন, সকল শুনিতেছেন, সকল জানিতেছেন, সকল ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান।

আবার একটু মুস্কিল হইল; একটু আগে যে সকল ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুকে তিনি প্রকৃতি বা ক্ষেত্রের বিকার বলিয়া বর্ণনা করিলেন, একণে সেই প্রকৃতির বিকার বা তৎবোধক শব্দ দ্বারা অবিকারী ক্ষেত্রজ্ঞ বস্তুকে প্রকাশ করিতে যাইতেছেন। অর্জ্জুনের পক্ষে প্রশ্ন করা খুবই স্বাভাবিক—এই না তুমি বলিলে একাদশ ইন্দ্রিয় সবিকার ক্ষেত্র আবার এক্ষণেই বলিতেছ তিনি একটা বড় চক্ষু, বড় পা, বড় হাত, বড় মাথা, বড় মুখ, বড় কান, তিনি সকল আবরণ করিয়া রহিয়াছেন—বুঝিলাম তিনি না হয় একটা বড় আকাশ তিনি হউন্‌না যতই বড় ক্ষেত্র বিকার তো বটেন সেই ক্ষেত্রের মধ্যেই গিয়া তিনি তো দাঁড়াইলেন। যিনি অবাঙ্‌ মনসারগোচর—তাহাকে বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিতে যাইয়া শ্রীশ্রীভগবান দেখিলেন তিনি self-contradicted হইতেছেন। আর একটু পরিষ্কার করিতে চেষ্টা করিলেন—ভাষায় যতদূর সম্ভব অথচ ভাষায় একেবারেই অসম্ভব কিন্তু সাধকের অনুভূতি সাপেক্ষ। ক্ষণকালের জন্য মোহাচ্ছন্ন হইয়া থাকিলেও অর্জ্জুন সাধক তো বটেন।

চতুর্দশ শ্লোক—সর্ব্বেন্দ্রিয় গুণাভাসংসর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিতম্ ইত্যাদি। তিনি সকল ইন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত কিন্তু সকল ইন্দ্রিয় গুণ প্রকাশক। দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্পর্শ, আস্বাদ, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের যে শক্তি এবং পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের যে শক্তি এবং মনঃশক্তি এই সকল শক্তিরই মূলাধার তিনি। অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চ—কিছুতেই লিপ্ত নহেন অথচ সকল ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। নির্গুণং গুণভোক্তৃচ—তাঁহার কোনও গুণ নাই অথচ সকল গুণের ভোক্তা।

পঞ্চদশ শ্লোক—ভুতানাং বহিঃ চ অন্তঃ চ—তিনি সকলের ভিতরেও বাহিরেও। অচরং চরং এব চ—স্থাবর জঙ্গমাদি যাহা কিছু তাহা হইতে অতিরিক্ত কিছুই নহে অথচ এসকল কিছুই তিনি নহেন। সূক্ষ্মত্বাৎ অবিজ্ঞেয়ং—তিনি এত সূক্ষ্ম যে অবিজ্ঞেয়। দুরস্থং অন্তিকে চ তৎ তিনি অতি দূরে আবার অতি নিকটে।

ষোড়শ শ্লোক—অবিভক্তঞ্চ ভুতেষু ইত্যাদি তিনি

অবিভক্ত হইয়াও সকল বস্তুতে বিভক্ত রূপে স্থিত, তিনি ভূতভর্ত্তৃ—সকল বস্তুর পোষক, তিনি গ্রসিষ্ণু, প্রলয়কালে গ্রসনশীল; তিনি প্রভবিষ্ণু, তাহাতেই অস্তিত্ব বা বিকাশ in whom we all live, move and have our being, তাহাতেই জীবন, তাহাতেই চলন, তাহাতেই স্থিতি। তিনি জ্ঞেয়।

অনেকেই বলিবেন ইহা Hopeless, irreconcilable contradiction শুনিয়াছি মহামান্য লাট লর্ড রোণাল্ডসে বাহাদুর এখানকার পণ্ডিত মণ্ডলীর সারস্বত সভার নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে বেদান্ত দর্শনের অদ্বৈত বাদের সহিত এই জড় জগতের সত্বার মিলন বা সামঞ্জস্য কোথায়? শিক্ষার্থীর এই প্রশ্ন অতি সমীচীন ও সুসঙ্গত। কেহ কেহ বলেন পণ্ডিত সমাজ ইহার উত্তর দিতে পারে নাই ইহা বড়ই লজ্জার কথা। আমি লজ্জিত হই নাই। যে প্রশ্নের উত্তর ভাষায় প্রকাশ করিতে গিয়া হিন্দু দর্শনশাস্ত্রে দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্ট দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্ট দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ইত্যাদি—কত প্রকার বাদপ্রতিবাদের সৃষ্টি হইয়াছে আমাদের পণ্ডিতমণ্ডলীর ইহার উত্তর দিতে পারিবেন না একথা আমি আদৌ বিশ্বাস করিতে পারি না। মহামান্য লাট বাহাদুর আমাদের শাস্ত্র পড়িতেছেন—বড় সুখের ও গৌরবের কথা, কিন্তু দর্শন (philosophy) এক পদার্থ আর দর্শন (realisation) অপর এক জিনিষ। কেবল মন বুদ্ধি প্রভৃতির দ্বারা বুঝিতে চাহিলে irreconilable contradiction কিন্তু সাধকের নিকট সহজ লভ্য। যদি মহামান্য লাট বাহাদুর প্রকৃত পক্ষে জানিতেই চাহেন তবে তাঁহাকে অন্য প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। প্রশ্নোত্তর দ্বারা উহার মিমাংসা নাই। কোনও system of philosophy তেও নাই—গ্রীক দর্শনেও নাই জর্ম্মণ দর্শনেও নাই। সাধকের অভিজ্ঞতার সহিত বেদান্ত শাস্ত্রের সম্পূর্ণ মিল। সাধক জানেন যে আমি যাহা কিছু দেখিলাম, শুনিলাম বা বুঝিলাম ইহা কল্পনা বা morbid imagintion নহে, ঋষিরাও এইরূপ অনুভূতি করিয়া তাঁহাদের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়া লিখিয়াছেন। শাস্ত্র সাধকের অভিজ্ঞতার বা স্বানুভূতির Corroboration মাত্র। শাস্ত্র বা দর্শন পড়ার যথেষ্ট উপকারীতা আছে স্বীকার করি কিন্তু আমার মনে হয় সাক্ষীরূপে সাধকের শাস্ত্র বা দর্শন ব্যবহারে উপকারীতা অনেক বেশী।

শ্রীশ্রীভগবান দেখিলেন আরও কিছু বলা প্রয়োজন। জ্ঞান বলিলাম, জ্ঞেয় বলিলাম কি জানি পাছে অর্জুন মনে করেন জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞানগম্য বা জ্ঞানফল এগুলিতো ভিন্ন ভিন্ন। তাই সপ্তদশ শ্লোকে বলিতেছেনজ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিঃ—ব্রহ্মজ্যোতির জ্যোতি,তমসঃ পরং—অন্ধকার বা অজ্ঞান তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, জ্ঞান— অমানিত্বাদি অবস্থা, জ্ঞেয়ং—ব্রহ্ম বা পরমপুরুষ, জ্ঞানগম্য সদজ্ঞানফল অর্থাৎ অমৃত—সকলই ব্রহ্ম। তিনি সকলের হৃদয়ে অবস্থিত—বড় আশার কথা।

অষ্টাদশ শ্লোকে ভগবান বলিতেছেন—ক্ষেত্র কি, জ্ঞান কি, জ্ঞেয় কি সংক্ষেপে তোমাকে বলিলাম। আমার ভক্ত ইহা জানিয়া আমার ভাব প্রাপ্ত হন, আমাতে যুক্ত হন অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করেন।

ঊনবিংশ শ্লোকে ভগবান বলিতেছেন—প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিবে। ইহাদের কাহারও আরম্ভ বা শেষ নাই। প্রকৃতি হইতেও পুরুষের উৎপত্তি নহে, পুরুষ হইতেও প্রকৃতির উৎপত্তি নহে। বিকারাদি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির গুণ অর্থাৎ সুখদুঃখমোহাদি প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত বলিয়া জানিবে। বিকার ষোলটী—পঞ্চ মহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়। বুদ্ধি, অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র এই সাতটীকে প্রকৃতি বলে।

বিংশ শ্লোকের ভাবার্থ—কার্য্য কারণ প্রকৃতি সম্ভূত। জল হইতে বাষ্প, বাষ্প হইতে মেঘ, মেঘ হইতে জল। বিষয়ের ধ্যান করিতে করিতে সঙ্গ, সঙ্গ হইতে কাম, কাম হইতে ক্রোধ ইত্যাদি—

ইহার নাম প্রকৃতি। বাসনার পরিতৃপ্তিতে সুখ, অপরিতৃপ্তিতে দুঃখ—বাসনাই সুখ দুঃখের কারণ। আর পুরুষ বা জীব সুখ দুঃখ ভোগ করেন বলিয়াই পুরুষ।

একবিংশ শ্লোকে—পুরুষ নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নির্দ্ধর্ম, প্রকার্থ তবে তিনি কেমন করিয়া সুখ দুঃখাদি প্রকৃতির গুণ বা বিকার ভোগ করেন? এ প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদয় হইবে। এজন্য ভগবান বলিতেছেন—পুরুষ প্রকৃতিস্থ হওয়াতে অর্থাৎ প্রকৃতির সহিত যুক্ত হওয়াতে অথবা প্রকৃতির সহিত যোগ হওয়া হেতু দেহাত্মবোধ হওয়াতে দেহ বা প্রকৃতি হইতে জাত সুখ দুঃখ মোহাদি ভোগ করেন। রাম সুখী, আমি দুঃখী, ওব্যক্তি মূঢ়, তিনি পণ্ডিত এইরূপ ভাব অবিদ্যা প্রসূত এবং পুরুষ অবিদ্যাচ্ছন্ন হইয়াই এইরূপ মনে করে। আর এই গুণ সঙ্গই ভিন্ন ভিন্ন জন্মের কারণ। কাহারও দেব জন্ম, কাহারও মানব জন্ম, কাহারও পশু জন্ম। পুরুষের এইরূপ প্রকৃতিস্থ হওয়াই অথবা অপ্রকৃতিস্থও বলিতে পারেন, সুখ দুঃখ ও জন্মের কারণ। আর পুরুষের অপ্রকৃতিস্থ হওয়াই সুখ দুঃখ ও জন্ম মৃত্যুর হাত হইতে এড়াইবার একমাত্র উপায়। মানব জীবনের চরম লক্ষ্য পুরুষের অপ্রকৃতিস্থ হওয়া। আমি যে নির্গুণ ও নিষ্ক্রীয়, দেহাতিক্রমা ইহা realise বা অনুভব করা।

দ্বাবিংশ শ্লোক—উপদ্রষ্টা অনুমন্তা ইত্যাদি—এই দেহে স্থিত যে পরম পুরুষ, তিনি দেহ মন ইন্দ্রিয় ও অমিয়ের সহিত যুক্ত থাকেন বলিয়াই তিনি উপদ্রষ্টা—অর্থাৎ পৃথক হইয়াও সামীপ্যহেতু সাক্ষী প্রকৃতিই সব কাজ করেন, তিনি সাক্ষী মাত্র। তিনি অনুমন্তা—অনুমোদন কারক ইহাও সামিপ্য হেতু। কিছু করেন না আর সকলই অনুমোদন করিতেছেন। অন্যের কৃত কার্য্য কিন্তু কোনও প্রতিপক্ষভাব নাই—সন্তোষ ভাবে দেখিতেছেন। তিনি ভর্তা, বিধায়ক। আত্মার সান্নিধ্য না থাকিলে দেহ মন ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি কিছুরই স্ফুরণ হইত না। তিনি ভোক্তা—পালক অর্থেও কেহ কেহ ব্যবহার করেন। তিনি মহেশ্বর এবং পরমাত্মা।

ত্রয়োবিংশ শ্লোক—যিনি এই পুরুষকে এবং স্বগুণা এই প্রকৃতিকে জানেন তিনি সর্ব্বথা সকল স্থানে বর্ত্তমান থাকিয়াও আর জন্ম গ্রহণ করেন না। জন্ম মৃত্যুর হাত হইতে উদ্ধার পাইবার একমাত্র উপায় এই পুরুষ ও প্রকৃতিকে জানা।

শ্রীভগবান বুঝিলেন অর্জ্জুন এখনই জিজ্ঞাসা করিবে কেমন করিয়া উহা পাইব? এই প্রশ্ন সমীচীন হইবে। প্রশ্নের প্রতীক্ষা না করিয়াই চতুর্ব্বিংশ শ্লোকে বলিতেছেন—কেচিৎ ধ্যানেন আত্মনি (দেহে) আত্মনা (মনসা) আত্মানং পশ্যন্তি। কেহ কেহ ধ্যানে নিজের দেহ মধ্যে আত্মাকে দর্শন করেন। ধ্যান কাহাকে বলে? রূপ, রস,গন্ধ, স্পর্শ শব্দাদি হইতে ইন্দ্রিয় গুলিকে সংযত করিয়া মনেতে স্থাপন করার নাম ধ্যান। একাগ্রতার সহিত চিন্তনই ধ্যান। আরাধ্য বা ধ্যানের বস্তু ভিন্ন হইতে পারে, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। শিবই হউন, কালীই হউন, শ্রীকৃষ্ণই হউন, নারায়ণ-চক্রই হউন, শ্রীশ্রীগৌরনিতাই হউন বা শ্রীশ্রীগুরুচরণ-পঙ্কজই হউন, প্রণালী বা কৌশল একই। আত্মনি আত্মানং পশ্যন্তি অন্যে সাংখ্যেন যোগেন—আর কেহ আত্মাকে দর্শন করেন সাংখ্য যোগ দ্বারা অর্থাৎ নিত্যানিত্য বিবেক সাধন দ্বারা।

অপরে কর্ম্মযোগেন—আর কেহ কেহ কর্ম্ম যোগ দ্বারা, ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকল কর্ম্ম ব্রহ্মে সমর্পণ করিয়া কর্ত্তব্য জ্ঞানে কার্য্য করিয়া যাওয়ার নাম কর্ম্মযোগ।

পঞ্চবিংশ শ্লোক—অন্যে তু এব অজানন্তঃ অন্যেভ্যঃ শ্রুত্বা আত্মানং উপাসতে। অজ্ঞানী যাহারা আচার্য্যের নিকট শুনিয়া বা উপদেশ গ্রহণ করিয়াই আত্মাকে উপাসনা করেন। এইরূপ শ্রুতিপরায়ণ যাহারা তাঁহারাও মৃত্যুকে অতিক্রমন করে। আমাদের মত

লোকের পক্ষে ইহা বড়ই আশার কথা।

আবার শ্রীভগবান একটু পুনরুক্তি করিতেছেন—অর্জ্জুন বা পাছে ভুলিয়া যান। কথাটা দৃঢ়রূপে তাহার মনে যেন বদ্ধমূল হয়, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা।

ষড়বিংশ শ্লোক—হে ভরতর্ষভ! যে কিছু স্থাবর জঙ্গম বস্তু, সমুদয়ই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগে জন্ম হয়, ইহা জানিও। পরের কথাগুলি বলিবার জন্যই এই পুনরুক্তি।

সপ্তবিংশ শ্লোক—সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু ইত্যাদি। সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত, বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াও অবিনশ্বর, এই পরমেশ্বরকে যিনি জানেন, তিনিই প্রকৃত দেখেন। এতক্ষণে আসল কথাটা বলিলেন এই যে কালের করালগ্রাসে প্রতি মুহূর্ত্তে সমস্ত প্রবেশ করিয়া ধ্বংশ প্রাপ্ত হইতেছে—যেদিকে চাই কেবল ধ্বংস, কেবল মৃত্যু, কেবল বিনাশ,—এই সকলের মধ্যে সমভাবে অবিনশ্বর বস্তু পরমেশ্বরকে যিনি দেখিতে পান তিনিই প্রকৃত দ্রষ্টা।এই স্থানে ভগবান বিনাশও মৃত্যুর কথা উত্থাপন করিতেছেন কেন? সকল নষ্ট হইয়া যাইবে, এই ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে আত্মীয় স্বজনের ধ্বংসের কারণ তুমি হইতেছ জানিয়া তুমি শোকাকুল হইতেছ কেন? হে ভরতর্ষভ, তুমি যেমন তেমন লোক নও। তুমি প্রকৃত দ্রষ্টা হও। যার-তার মত অজ্ঞানীর মত দেখিও না। এই বিনাশের মধ্যে অবিনশ্বর যে পরমেশ্বর তাঁহাকে দেখ।

অষ্টবিংশ শ্লোকের ভাবার্থ এই—সর্ব্বত্র সম-অবস্থিত ঈশ্বরকে দেখিয়া নিজ নিজকে হিংসা করেন না। যিনি আত্মাকে সর্ব্বত্র সমঅবস্থিত দেখিতে পান, তিনি আর কাহাকেও হিংসা করেন না। তিনি হত হন না, হত করেন না। হত বা আহত করিলাম বা হত বা আহত হইলাম এরূপ মোহ তাহাকে অভিভূত করে না। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ উপস্থিত, অর্জ্জুন অস্ত্রধারণ করিয়াছেন। একদিকে হিংসা ও অপরদিকে মৃত্যুভয়, জ্ঞাতি নাশ আশঙ্কা, মোহ ও শোক উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক। সর্ব্বত্র সম অবস্থিত ঈশ্বরকে তিনি দেখিবেন। তিনি এ সকলের অতীত। তিনি পরাগতি লাভ করিয়া থাকেন। প্রকৃত তত্ত্ব জানিয়া বা প্রকৃত দ্রষ্টা হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। যদি মৃত্যু হয়, ভয় কি,—পরাগতি লাভ হইবে। সংসার সংগ্রামেও ইহাই ধ্রুব সত্য।

উনত্রিংশ শ্লোক—সকল বস্তুর মধ্যে আমি এবং আমার মধ্যে সকল বস্তু এরূপ দেখার নাম আত্মদর্শন। আত্মদর্শন হইলে মানুষের আত্মপরভেদ, হিংসা, দ্বেষ কিছুই থাকে না যাহা কিছু ক্রিয়া সে সকলই প্রকৃতির। আত্মাকে যিনি অকর্ত্তা বা কর্ত্তৃত্বাদিশক্তিশূন্য দেখিতে পান, তিনিই আত্মাকে দেখিতেছেন—হে অর্জ্জুন, দেহাত্মাভিমানী হইয়া ভাবিওনা তুমি মারিতেছ বা তুমি মরিতেছ? তুমি কে?

ত্রিংশ শ্লোক—যৎকালে যাহা কিছু এই আত্মাতেই অবস্থিত ইহা জীব যখন দেখিতে পারে-এই আত্মা হইতে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি বুঝিতে পারে, তখনই জীব ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়।

একত্রিংশ শ্লোক—হে কৌন্তেয়! এই যে অব্যয় পরমাত্মা তিনি অনাদি এবং নির্গুণ বলিয়াই শরীরস্থ হইয়াও তিনি কিছুই করেন না। কর্ম্মফলও তাহাকে স্পর্শ করে না।

কেবল তুমি কর্ত্তৃত্বাভিমানী হইয়া ভ্রান্ত হইতেছ—তুমি নির্গুণ, অনাদি, অব্যয়,অবিকারী পরমাত্মা।

শ্রীভগবান আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতেছেন—উপমা বা দৃষ্টান্তের সাহায্যে। আকাশ ও সূর্য্য দ্বারা তাঁহাকে কথঞ্চিৎ বুঝান যাইতে পারে। অসীমতা ও সূক্ষ্মতা ও সর্ব্বগততা আকাশের প্রধান ধর্ম্ম। ব্রহ্মকে বুঝাইবার জন্য এই গুণগুলির সহায়তা গ্রহণ করিয়া দৃষ্টান্ত দিতেছেন।

দ্বাত্রিংশ শ্লোক—আকাশ যেরূপ সর্ব্বগত হইয়াও সূক্ষ্মতা নিবন্ধন কোনও বস্তুর সহিত লিপ্ত হয় না সেইরূপ আত্মা সর্ব্বদেহগত হইয়াও কিছুর সহিতই লিপ্ত হয় না।

ত্রয়োত্রিংশ শ্লোকে আরও একটী দৃষ্টান্ত দিতেছেন—হে অর্জ্জুন, যেমন এক সূর্য্য সমস্ত লোককে প্রকাশ করে, সেইরূপ ক্ষেত্রী বা আত্মা সমস্ত ক্ষেত্র বা 'জড়' বস্তুকে প্রকাশ করে।

চতুস্ত্রিংশ শ্লোক—যিনি জ্ঞান চক্ষু দ্বারা এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের অন্তর বা বৈলক্ষণ্য দেখিতে পান, ভূত সকলের প্রকৃতি স্বরূপা অবিদ্যা ও তাহার বিক্ষোভনের তত্ত্ব অবগত হন, তিনি পরম বস্তু প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

পরম বস্তু বা পরমপদ বা অমৃতত্ত্ব লাভের একমাত্র উপায় ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান লাভ। আর অন্য কোনও উপায় নাই।

পুরাতন বিষয়ের আলোচনা করিতে গিয়া আপনাদের কত মূল্যবান সময় নষ্ট করিয়াছি। মার্জ্জনা করিবেন।

শ্রীবিধুচরণ গুহ ঠাকুরতা।

পৃথিবী।

অশ্রুতে ভেসেছে গণ্ড, বাষ্পে কণ্ঠ রোধ,
সহিয়াছি জালা ঝঞ্ঝা, প্রকৃতির ক্রোধ।
অকরুণ পুরে কত কাটায়েছি কাল,
সহিয়াছি নির্য্যাতন, কতই জঞ্জাল।
উষর এ দীন বক্ষ সৌন্দর্য্য বিহীন
আশা পথ চেয়ে শুধু হয়ে এলো ক্ষীণ।
শুধু হিংসা শুধু দ্বেষ অত্যাচার কত
তার মাঝে ছিনু আমি কুরূপার মত।
একদিন শুভদিনে তুমি এলে হরি,
ক্ষুদ্র এ শ্রীহীন বক্ষ তোলপাড় করি।
তুমি এলে প্রেমময় রূপের পাথার,
কৃপা করি পরশিলে এ দেহ আমার।
ছিলাম কুৎসিৎ কুব্জ কত যে বরষ
করিলে সুন্দরী শ্যামা শ্যামের পরশ।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

ছোট লেখা।

[দৃষ্টি ও চিন্তা]

(১)

এই 'হাসি' আর 'কান্না' জিনিষটে নিয়ে মাঝে মাঝে ভাবতে ব'সতে হয়।

এক একটা দিন হয় তো সকাল থেকেই হাসতে হয়,—সে বড় কম। এক—এক দিন এমন হয় যেন সকাল থেকেই কাঁদতে ইচ্ছা ক'রে।

কেন কান্না পায়?—'রাম' আর 'যুধোর' 'কত' আছে, আমার নেই, এই ব'লে কি?

—না, না, মোটেই না।

(২)

মনে হয় 'রাম' আর 'যুধো' আমার চেইতে কত বড়,—তাই তাদের 'অত' আছে; আমি তাদের চেইতে কত ছোট! তা'তে ও আমার 'এত' আছে কেন? কে এত দিয়ে দিলে? কেন দিলে?—তা আমার কেন?

এই 'দানের' বোঝাটা যত বড় তা সইবার সাধ্য আমার কই? আর বোঝাটা এত 'আমার', এত 'চিরন্তন' যে তাকে ফেলে দিয়েও পালানোর উপায় নেই,—আর পালিয়ে কোথায়ইবা যাওয়া যাবে?—তাই কান্না তো পায়ই, আবার হাসিও পায়।

(৩)

কাঁদ্‌তে—কাঁদ্‌তে হাসি, আর হাস্‌তে-হাস্‌তে কান্না,—এই কি একটা খেলা চিরকাল চ'ল্‌ছে।

মানুষের জীবনে এই 'সমতা' আর 'বৈচিত্র্য,—'সমতার' ভেতর 'বৈচিত্র্য',—'বৈচিত্র্যের' ভেতর 'সমতা',—যেন 'আইনের' কড়া নিয়মে পরিচালিত।

(৪)

সমস্ত মানব জীবন 'সমষ্টিটা' যেন একটা সুদীর্ঘ 'কাটা' নালা,—তার দুটো ধার যেন ইঁট—পাথরে বাঁধানো; মধ্যদেশ দিয়ে জল চ'লে যাচ্ছে, কখনো জলে ঢেউ উঠ্‌ছে, কখনো বা জল 'সমান' ভাবে চ'ল্‌ছে।

জল যখন সমভাবে চ'লছে তখনো তার ভেতর দেখে যেন ঢেউগুলোর 'শেঁকড়' গজিয়ে উঠ্‌ছে; যখন জলের উপর ঢেউ দেখা যাচ্ছে তখনো তার নিম্নদেশ থেকে একটা সমতা সৃষ্টি করবার শক্তি জন্মাচ্ছে। ঢেউগুলি তারপর থেমে আস্‌ছে, তারপর জল আবার স্থির।

বাঁধানো 'ধারের' ওপর একবার ঢেউ-এর 'মাথা'-'গা' ভেঙে পড়্‌ছে; কাটা নালার ওপর জলের লক্ষ বুদ্‌বুদ্‌গুলো পড়ছে,—আর মিশে যাচ্ছে।

বুদ্‌বুদ্‌ গুলোর ওপর কখনো আকাশ থেকে সূর্য্য কিরণ পড়ছে,—কখনো বা খালি মেঘের ছায়াই প্রতিবিম্বিত হ'চ্ছে।

(৫)

এমন একটা 'খেলা' বড় দেখা যায় না।

এক-এক দিন স্থির জলের ওপর রোদের আলো পড়ছে বটে, কিন্তু নীচে খালি ঢেউ; আবার যেদিন আকাশে খালি মেঘ, জলে খালি ঢেউ, তখন হয়তো নীচে সমতা সৃষ্টির ক্রিয়া চ'ল্‌ছে।

একবার ঝড়ে সব ওলট্‌ পালট্‌, আবার সব স্থির।

কান্না দিয়ে হাসি গড়াচ্ছে, হাসিতে কান্না।

(৬)

জলের বুদ্‌বুদ্‌গুলো খালি জন্মাচ্ছে, ভাঙ্‌ছে, মিশে যাচ্ছে; আবার জন্মাচ্ছে, আবার হাসি-কান্না।

তাদের এতটুকু হাসি, এতটুকু কান্নাও কোথাও 'ফেলানো' যাচ্ছে না; অনন্ত দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট, সুবদ্ধ-প্রান্ত সেই 'নালার' ভেতর সমস্তই জমা থাক্‌ছে। সেগুলো দিয়ে আবার হাসি-কান্নার সৃষ্টি হ'চ্ছে।

(৭)

কে এই 'নালাটা' কাটালে? আমরা কত বুদ্‌বুদ্‌ তা ভাবতেও বুঝি পারি না।

তবু বুদ্‌বুদ্‌রা হাস্‌ছে, কাঁদ্‌ছে;—ভাঙছে, গড়ছে, আর ওপর থেকে একজন একটা উদার হাসি হাস্‌ছেন।

(৮)

একদিন ক-রকম হাসি শুন্‌লুম।

—হাসির ভেতরও 'জাতিভেদ' আছে বোধ হয়। তাই বল্‌ছি।

(৯)

[প্রথম] রাম হাস্‌ছে, বন্ধুকে দেখে। অপরকে দেখে হাসি, খুব জমেছে; "হোঃ, হোঃ", অর্থাৎ

"তুমি কত ছোট, আমি কত বড়!" কিন্তু সে হাসিতে যদুর উপর, মানব জাতির উপর বোধ হয় অনাস্থা নাই, তাই লোকে সে হাসিটা শুনছে, যদিও হয়তো অনেকে পছন্দ কচ্ছে না।

(১০)

[দ্বিতীয়]—করালী হাসছে, ভীষণ হাসি।

তার কারু উপর আস্থা নাই,—নিজের ওপরো নয়। সে হাসিটা শুনলে গা চম্ চম্ করে,—মানুষ শিউরে উঠে।

(১১)

[তৃতীয়] মধু হাস্‌ছে নিজেকে দেখে,—তার হাসিটার সুর কান্নার রাগিণীতে বাঁধা। কিন্তু সে নিজেকেও বিশ্বাস করে, অপরকেও বিশ্বাস করে।

যদি সে কখনো যদুর দিকে তাকিয়েও হাসে, তবু সে হাসিটার লক্ষ্য খালি যদু নয়,—যদু আর তার নিজের ভেতর হাসির হিসাবে যেটা সাধারণ সেইটাই তার লক্ষ্য।

সে হাসিটা মন্দ নয়।

(১২)

[চতুর্থ] আর একটা হাসি,—সেটী শোন্‌বার নয়, দেখ্‌বার; তার কথা বল্‌বার নয়, ভাববার।

ছোটো ছোটো ছেলে গুলো খেলা ক'চ্ছে,—নিকটে জননী দাঁড়িয়ে। ছেলেরা হাস্‌ছে, শিশু হাস্‌ছে,—জননী হাস্‌ছেন।

জগতের প্রভাত থেকে এই শিশু খেলা ক'চ্ছে, এই জননী হাস্‌ছেন!

এই হাসি সাধু, সিদ্ধ মহাত্মা মানব সমাজে বাস ক'রে এবং পর্ব্বত-কন্দরে ব'সে হেসেছেন, হাসেন।

এ হাসি দেবতার,—তাই মানুষ সব সময় এটী ভাল দেখ্‌তে পায় না; যখন দেখে তখন তার একটা 'তীর্থ দর্শন' হয়!

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক।

আমার পরীক্ষা গ্রহণ।

গত বৎসর এই নামের প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে আমি বিএ পরীক্ষার বাঙ্গলা রচনা দেখিয়া যে অভিজ্ঞতা তৎকাল পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছিলাম, তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছি। এ বৎসরও পরীক্ষার্থীদিগের রচনা হইতে বাঙ্গলার রচনা-পদ্ধতি যে দিকে যাইতেছে ও যাইবার সম্ভাবনা দেখা যায় তাহা কতিপয় দৃষ্টান্ত দ্বারা বিশদ করিবার চেষ্টা করিব। যাহারা আজি ছাত্র, তাহারই কালি সমাজ পরিচালক হইবে। সুতরাং ইহাদিগের রচনা হইতেই ভবিষ্যৎ অবস্থা উপলব্ধি করা যায়। গত বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও ছাত্রদিগের মানসিক অবস্থার যেরূপ পরিচয় পাইলাম তাহাতে এতদ্দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তাযুক্ত না হইয়া উপায় দেখি না।

আমি যে সকল পরীক্ষার্থীদিগের উত্তর দেখিয়াছি তাহারা সকলেই ঢাকায় পরীক্ষা দিয়াছে। সম্ভবতঃ তাহাদের মধ্যে অনেকেই ঢাকা অঞ্চলের ছাত্র। যদিও আমার কথাগুলি সকল অঞ্চলের ছাত্রদিগেরই বিবেচ্য, তথাপি ঢাকা অঞ্চলের ছাত্রগণ একটু বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিলে আমি কৃতার্থ হইব। আমি যে সকল কথা বলিব তাহার মধ্যে প্রধান কথাই এই যে জাতীয় উন্নতি অবনতি জাতীয় ভাবের এবং জাতীয় ভাষার উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। ভাব সংযত হইলে কর্ম্মও সংযত হয় এবং দৃঢ়তার সহিত দীর্ঘকাল অনুষ্ঠিত হইতে পারে। ভাব আকস্মিক উত্তেজনা অথবা নিরর্থ অনুকরণ মূলক হইলে কর্ম্ম দৃঢ়তার সহিত অনুষ্ঠিত হইতে পারে না; এবং দীর্ঘ কাল স্থায়ী হয় না। দেখা যাইতেছে, কি ধর্ম্ম বিষয়ে, কি সমাজ সংস্কারে, কি অর্থনীতির আন্দোলনে, কি রাজনীতির আন্দোলনে—সকল বিষয়েই রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে বিদ্যাসাগর যুগের মধ্য

দিয়া বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত আমাদিগের কোন অনুষ্ঠানই দৃঢ়তার সহিত স্থায়ী ভাবে প্রবর্ত্তিত হইতে পারিল না। প্রায় সকলেই দুইদিনের জন্য অনুষ্ঠিত হইয়া মরিয়া গেল। এ ভাব জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী। আমাদিগের এই ভাব বিধি সঙ্গত নিয়মে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবেই। সেই সকল বিধি অন্যত্র বহুবার আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু ইহার প্রধান কথাই হইতেছে, উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ। উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি যাহা যখন সুবিধা বোধ করে, তাহাই করে। তাহার কার্য্যের মধ্যে সংযম থাকে না; পূর্ব্বের আচরণের সহিত শৃঙ্খলা থাকে না। স্বভাব পরিবর্ত্তনশীল, সন্দেহ নাই। কিন্তু সে পরিবর্ত্তন পূর্ব্বের আচরণের সহিত সংযোগ রক্ষা না করিলে তাহাকে ক্রম পরিবর্ত্তন বলা যায় না। উহারই অপর নাম ধ্বংশ। পুরাতনকে ধ্বংশ করিতে হইবে না; উহাকে ক্রমে বিবর্ত্তিত করা আবশ্যক হইতে পারে। নোঙ্গর ঠিক থাকিলে ঝড়ে নৌকা ডুবে না; নোঙ্গর ছিঁড়িয়া গেলেই ডুবে। যে ব্যক্তি নিয়মের অধীন নহে, সেই উচ্ছৃঙ্খল। সে মানব সমাজকে ধ্বংশ করিতে পারে, রক্ষা করিতে পারে না; উন্নতি করা তো দূরের কথা। গোলা গুলির সংগ্রামেও যেমণ, জীবন সংগ্রামেও তেমনই নিয়মের অধীন হইয়া কার্য্যকরা জয়ী হইবার প্রধান মন্ত্র। সে নিয়মও দীর্ঘকাল প্রচলিত জাতীয়ভাবের সহিত গুরুতর রূপে অসমঞ্জস হইলে জয়ী হইবার আশা সুদূরপরাহত হয়। পূর্ব্ব, স্থিতিভাঙ্গিতে সকলেই পারে; গড়াই অত্যন্ত কঠিন। এ স্থলে একটী দৃষ্টান্ত দিব। কোন গায়ক উত্তম গাইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার লয় বোধ নাই। হারমোনিমের সহিত গান করেণ ভালই। কিন্তু এতদ্দেশীয় তবলা অথবা পাখোয়াজের সহিত গান ককিতে গেলেই ওস্তাদ বাদককেও বাদ্য ছাড়িয়া দিতে হয়। এই অবস্থায় তিনি সময় সময় লজ্জাও পাইয়াছেন। তখন তিনি ইহার দার্শনিক অর্থ বাহির করিয়া আত্ম প্রতারণা করিতে লাগিলেন। এক্ষণে তাঁহার দুরবস্থা এমণ হইয়াছে যে দেশীয় সঙ্গীত সমাজ ইাদিতে বাদ্যের সহিত তিনি আর গান করিতেই পারেণ না। তিনি দার্শনিক অর্থ বাহির করিলেন যে, সঙ্গীত ভাবের উচ্ছাশ; ভাব উচ্ছাসিত হইলে তাহা কি বাঁধা নিয়মের শিকল পায়ে দিয়া মামুলী ধরণে চলে? সুতরাং নিয়মের বাঁধ ভাঙ্গিয়া ফেল; ভাব যে দিকে যতক্ষণ যাইতে চাহে, তাহাকে সেই দিকেই ততক্ষণ যাইতে দেও। লয় কি? লয় তো শৃঙ্খল, লয় তো বাঁধ। ও সকল উচ্ছসিত ভাবের নিকট কিছুই নহে। ....এইরূপ যুক্তিতে যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই গাও, যেমন ইচ্ছা তেমনই করিয়াই যাও। তাহাই সঙ্গীত। তাব লয়ের মিল অগ্রাহ্য।

ইহাকেই বলে উচ্ছৃঙ্খলতা। ইহাতে ভাঙ্গাযায়; গড়াযায় না। এরূপ করিলে সকলে সমবেত হইয়া অনুষ্ঠান, করা অসম্ভবহয়। সংযত এবং নিয়মের অধীন হইল গভীর আনন্দের মধ্য দিয়া যে সফলতা আসে, তাহা উচ্ছৃঙ্খলেরা কেমন করিয়া বুঝিবে? আকাশের গ্রহ নক্ষত্র সকল নিয়মের অধীন না হইলে যথা তথা ছুটা ছুট ঠোকাঠুকি করিয়া ভয়ঙ্কর প্রলয় উপস্থিত করিতে পারিত, ইহা নিশ্চিত। কিন্তু তাহারা নিয়মের অধীন হইয়া চলিতেছে; সেনিয়ম সকল পর্য্যালোচনা করিলে গভীর আনন্দের সহিত ভক্তিরস হৃদয়কে ছাইয়া ফেলে। সকল বিষয়েই যুবকগণ একথা মুলমন্ত্র স্বরূপ যেন হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া রাখেন। উচ্ছৃঙ্খলতা সর্ব্বনাশের নামান্তর মাত্র। নিয়ম পালনেই সংযম; সংযমেই সফলতা। পরীক্ষার্থীদিগের উত্তর পরীক্ষা করিতে করিতে সংযমের অভাব এবং উচ্ছৃঙ্খলতার আবির্ভাব লক্ষ্য করিয়া বহুবার পরিতপ্ত হইয়াছি। বর্ত্তমান সময়ে, প্রাচীনে আস্থাহীন ব্যক্তিগণ মধ্যে কেহ কেহ প্রচার করিতেছেন যে, কথা ভাষা ও লিখিত ভাষা মিশাইয়া রচনা করা উচিত; তাহাতে ভাবে জোর বাঁধে। একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা নহে। আমার একটী বন্ধু দৃষ্টান্ত স্বরূপে একটি অশ্লীল বাক্য

উচ্চারণ করিয়া মনের ভাব যেরূপ দৃঢ় ও সুস্পষ্ট করিয়াছিলেন তাহা তিনি দশ পংক্তি সাধু ভাষা লিখিলে ও পারিতেন না। কিন্তু তাই বলিয়া সেরূপ রচনা কি দূষনীয় নহে? যাহা হউক, সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয় কুমার সরকার প্রভৃতি মনীষী ব্যক্তিগণ বহুবার তীব্র ভাষায় এরূপ কার্য্যের নিন্দা করিয়াছেন। আরও অনেক গণ্য মান্য ব্যক্তি এইরূপ রচনাকে দূষনীয় মনে করেন। কথ্য ভাষা রচনায় ব্যবহার করা, বিশেষতঃ গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট শব্দ এবং বিশেষ বিশেষ স্থানের উচ্চারণ ভঙ্গি সর্ব্বজন পাঠ্য রচনায় প্রয়োগ করা আমি অত্যন্ত দোষাবহ মনে করি। এরূপ করিলে যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই লিখিতে পারে। সে রচনাও বাঙ্গালা ভাষা হইবে সত্য, কিন্তু এক অঞ্চলের বাঙ্গালার রচনা অন্য অঞ্চলের বাঙ্গালী বুঝিবেনা। বিদেশীয় ব্যক্তিগণ তো বাঙ্গালা শিক্ষা করা অসম্ভব মনে করিবে। তাহ হইতে বাঙ্গলা ভাষার হিত না অহিত হইবে; বাঙ্গালীর শ্রীবৃদ্ধি হইবে, না হ্রাস হইবে? "সে পুনঃ পুনঃ বায়না ধরিয়া সকলকে অস্থির করিয়া ফেলিল"—এই পদ এক দিন একখানি গ্রন্থে পাঠ করিয়ে আমার একজন উত্তরবঙ্গ নিবাসী বন্ধু বুঝিতে পারেন নাই। "বায়না" উত্তর এবং পূর্ব্ববঙ্গে অপ্রচলিত শব্দ দক্ষিণ বঙ্গে প্রচলিত আছে। যদি দক্ষিণ বঙ্গের প্রচলিত শব্দ সকল বাঙ্গালীর পাঠ্যগ্রন্থে ব্যবহার করা দোষের না হয়, তবে উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গের প্রচলিত শব্দ ও গ্রন্থাদিতে ব্যবহার করিলে দূষ্য বলা সঙ্গত নহে। বোধ হয় এই ভাবের বশবর্ত্তী হইয়াই অনেক পরীক্ষার্থী লিখিয়াছেন,—

দুঃখ বুগ ১; ভ্রাতৃবিরুধ ২; কুনে ৩;
দোজনে একত্র পরিভাম ৪; আমুদ ৫;
মনুযুগ ৬; লেখা পড়ি ৭; পরিবার ৮;
মধুসুদন ৯; যগড়া ১০; কাধ ১১;
ডুকিয়াছে ১২; অন্ন ১৩; দুমন্ত তাহাদের
কুশল বার্ত্তা জিগাইলেন। ১৪

ভোগ অর্থে বুগ এবং ঝগড়া অর্থে যগরা বুঝিয়া উঠা এ অঞ্চলে বড় কঠিন। কেহ কি ইচ্ছা করেন যে বাঙ্গলা গ্রন্থাদি এই ভাষায় লিখিত হউক।' কথ্য ভাষা যাঁহারা লেখাতে প্রচলিত করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের মত এই সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা যেরূপ ভাবে খণ্ডিত হইয়াছে সেরূপ অন্য প্রকারে বোধ হয় হইতেই পারে না। এই সকল পরীক্ষার্থী সকল তর্ক নিরস্ত করিয়ে দিয়াছে। কেহ বিবেচনা করিবেন না যে ইহারা জানেনা বলিয়া ঐরূপ লিখিয়াছে। না, আমার সে ধারণা হয় নাই। ইহাদিগের মধ্যে অনেকেই উচ্চশ্রেণীর নম্বর পাইয়াছে এবং ভাষাজ্ঞানের উত্তম পরিচয় দিয়াছে। ইহারা বোধ হয় জেদের বশবর্ত্তী হইয়াই ঐরূপ করিয়াছে। কলিকাতায় লেখক যদি গেলুম, কচ্ছি ইত্যাদি লেখে তবে তাহারা কেন বুগ লিখিবে না? এইরূপ জেদ তাহাদিগের মনে উদয় হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অথবা শুধু অনুকরণ স্পৃহাও এরূপ রচনা হইতে পারে বন্ধুবর রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ মহাশয় যদি পূর্ব্ববঙ্গ নিবাসী হইয়াও—

দাঁড়িয়েছি; ছিলুম; বাইরে; বাঁধিয়ে; একেছেন; খোরে; বোলে; ইত্যাদি লিখিতে পারেন; তবে ঈদৃশ নিরর্থক অনুকরণ প্রিয়তা সংক্রামক হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য জনক নহে। তাদৃশ ব্যক্তি ঢাকায়

---

(১) দুঃখ ভোগ; (২) ভ্রাতৃবিরোধ; (৩) কোণে; (৪) দু'জনে একত্র পরিশ্রম; (৫) আমোদ; (৬) মনোযোগ; (৭) লেখা পড়া; (৮) পরিবার; (৯) মধুসূদন; (১০) ঝগড়া; (১১) কাঁদ; (১২) ঢুকিয়াছে (১৩) অন্ন; (১৪) দুষ্মন্ত...... জিজ্ঞাসা করিলেন।

লোন হইয়াও "ছিলেন" লেখেন! তবে পূর্ব্ববঙ্গবাসী পরীক্ষার্থীদিগের সঙ্কীর্ণ স্বদেশপ্রিয়তা তাহাদিগকে "জিগাইলেন" লিখিতে প্রবৃত্ত করিবে না কেন? এইরূপ একটা বিদ্রোহ ভাব, বিকৃত আত্মমর্য্যাদাবোধ, তাহাদিগকে উচ্ছৃঙ্খলতার দিকে লইয়া গিয়া লিখিত ভাষার চির প্রচলিত নিয়মের বাঁধ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে, ইহাই আমার ধারণা হয়। কথ্য ভাষা এতাদৃশ দুষ্টভাবে সাধু রচনায় স্থান পাইতে পারে না। আমি যদি ঠিক বুঝিয়া থাকি তবে সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, যাহারা ঐরূপ লিখিয়াছে তাহারা পরিণত বয়সে সমাজের অনেক বাঁধ, অনেক সুনিয়ম ভঙ্গ করিয়া সমাজকে অবনত করিবে; তাহাদিগের অনেক ভাব ও কর্ম্ম অমঙ্গলজনক হইবে; তাহারা শিক্ষিত গণ্য হইলেও আচরণে সমাজ মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া ঘৃণিত হইবে। সংযম ও সাধনা এক পদার্থের দুইদিক। ইহা না হইলে জাতীয় উন্নতির আশা করাই বৃথা। এই সকল চিন্তা মনে উদয় হইয়া এবং এতদ্দেশীয় যুবকগণের উদ্ধত ভাব লক্ষ্য করিয়া আমার চিত্তে এমন অবসাদ আসে যে, আমি তাহা প্রকাশ করিতেই পারি না। হা, ভগবান, তুমি এ দেশের ভাগ্যে কি লিখিয়াছ, তাহা তুমিই জান। আমাদিগকে সুমতি দেও, কালব্যাপী সাধনার উপযোগী কর, ইহাই এই দীনের একান্ত প্রার্থনা।

যাহা পরস্পরের সহিত মিশে না; মিশিলেও ভয়ঙ্কর শঙ্করবর্ণ উৎপন্ন হয়; তাহা একটী পরীক্ষার্থী যেমনভাবে মিশাইয়াছে, তাহা দেখিবার বিষয়। এই ভাবে আমাদের কথা, খেলা, গৃহসজ্জা, সঙ্গীত, পরিচ্ছদ—এক কথায় সমস্ত প্রকার জাতীয় চিন্তা ও জাতীয় বিকাশ খিচুড়ি হইয়া গিয়াছে। ইহারা মেটে ফিরিঙ্গীর সহিত তুলনীয়। পরীক্ষার্থী লিখিয়াছে। "একবার না পেড়ে উটা ফেলে রাখ্‌তে গেলুম।" এই বর্ণশঙ্কর কোন্ জাতি? ইহার অর্থ কি? অতি কষ্টে ইহার অর্থ বুঝিয়া লইয়া আমাকে নম্বর দিতে হইয়াছে! উপরের উদ্ধৃত দৃষ্টান্তটী পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গের ভাষা-শঙ্কর। কিন্তু বিদেশীয় ভাষা-শঙ্কর ও ভাবশঙ্কর আসিয়া আমাদিগকে প্রায় সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত ও আত্মমর্য্যাদাহীন করিয়া তুলিয়াছে। খাঁটী এখন আর আমাদিগের প্রায় কিছুই নাই। যেমন মানুষ মেটে ফিরিঙ্গী হইলে ইউরোপীয়দিগের গুণও পায় না, ভারতীয়দিগের গুণও পায় না; যেমন ফিরিঙ্গী, মুলেটো প্রভৃতিরা খাটী পিতৃকুল মাতৃকুল, উভয় হইতেই অধঃপতিত হইয়া থাকে; ভাবও তাহাই হয়। ভাবও দেশী বিদেশী, ঐরূপে মিশ্রিত হইলে মন অধঃপতিত হয়, মনের বল খাটী ভাবের মত থাকে না। কোন মানব কিম্বা কোন মানবজাতি যে দিন তাহার নিজের মনটী হারাইল সেই দিন তাহার সব গেল; তাহার ব্যক্তিত্বই গেল। দেশ গেলে দেশ ফিরিয়া পাওয়া যায় কিন্তু মন গেলে তাহার আর কিছুই থাকিল না; সে আত্মবিক্রীত হইয়া গেল। এরূপ হইলে পরিণামে ধ্বংশ অনিবার্য্য। উন্নতি তো বাতুলের প্রলাপ মাত্র। গত বুয়র যুদ্ধের অবসানে যে সন্ধি পত্র হইয়াছিল তাহার একটী বিষয়ে এই ছিল যে, বুয়রদিগের ডচ্‌ভাষা বিদ্যালয়ে, বিচারালয়ে, আফিস্ ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হইবে, অন্য ভাষা ব্যবহৃত হইবে না। অপরের ভাষা গ্রহণ করা এবং নিজের মন ফেলিয়া দিয়া তাহার মন লইয়া জীবিতকাল অতিবাহিত করা, তাহার ছায়ামাত্র হইয়া মনরূপে জীবিত থাকা একই কথা। কিন্তু যে প্রকৃত বেদিয়া, সে সাপ লইয়াও খেলা করিতে পারে; মারা যায় না। যদি মন হারাইয়া না ফেল, নিজের অস্তিত্ব বিকাইয়া না দেও; তবে অপরের ভাষা হইতে নিজের জ্ঞান বৃদ্ধিকরা দুষনীয় নহে। কিন্তু এ কঠিন খেলা যখন নিরাপদ নহে, তখন অপরের ভাষা নিবদ্ধ জ্ঞান যতই নিজ ভাষায় গ্রথিত করা যায়, ততই ভাল। এই নিমিত্তই এ সকল ক্ষেত্রে সাহিত্যালোচনার এক প্রধান অঙ্গ, অনুবাদ।

† প্রতিভা; ১৩২১ জ্যৈষ্ঠ ২—৭৩—৮৪।

প্রাচীন কাল হইতে ভাব ব্যক্তির নিমিত্ত লিখিত ও কথ্য ভাষার যে প্রভেদ চলিয়া আসিতেছে তাহার মূল স্থির রাখিয়া শাখা প্রশাখা পরিবর্ত্তন করা সাংঘাতিক নহে; কিন্তু তাহাও প্রতিভাশালী ব্যক্তি ভিন্ন সাধারণের কর্ম্ম নহে। লিখিত ভাষার বর্ণবিন্যাস, ব্যাকরণ, বাক্য যোজনার পদ্ধতি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন প্রকার। কোন নির্দ্দিষ্ট দেশে কোন নির্দ্দিষ্ট জাতি তদ্দেশীয় লিখিত ভাষাকে বহুকাল হইতে কতকগুলি নিয়মে আবদ্ধ করিয়াছে। সে সকল নিয়ম শিক্ষা করা শ্রমসাধ্য, কিন্তু বঙ্গদেশীয়গণ যেন এখন ক্রমেই শ্রমসাধ্য চেষ্টায় অনুপযোগী হইয়া উঠিতেছে। তাহাতেই কোন নিয়মে আবদ্ধ থাকিতে সমর্থ হয় না। উচ্ছৃঙ্খলতার ইহাই মূল কারণ বলিয়া বোধ হয়। আমরা এখন "নভেল" পড়িতেও ছোট গল্প পাইলেই সুবিধা বোধকরি। শ্রমসাধ্য চেষ্টায় এতই অসমর্থ হইয়া উঠিয়াছি। সাধনা বড়ই কঠিন পদার্থ। সে স্থলে আমরা যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করা ভাল বোধ করিতেছি। ইহা আমাদিগের অবসন্নতাই প্রমাণ করিতেছে। নিয়ম মানিয়া চলা বড়ই কঠিন; কিছুই না মানা অতি সহজ। কিন্তু এইরূপে সহজ খুঁজিতে গিয়া স্বেচ্ছাচারনে প্রশ্রয় দেওয়া ধ্বংশের পূর্ব্ববর্ত্তী লক্ষণ। কোন কোন পরীক্ষার্থী বর্ণ বিন্যাসে যেরূপ স্বেচ্ছাচারের পরিচয় দিয়াছে তাহা দেখিলে ম্রিয়মান হইতে হয়।

শৃবিদ্ধি (১); প্রথিবীতে (২); প্রম (৩); মুনুষ্য (৪); শকুন্তলা গ্রহীজীবনে অভ্যস্ত।

কেহ কি লিখিত ভাষায় এই সকল দেখিতে ইচ্ছা করেন? যে পরিক্ষার্থী একস্থানে মুনুষ্য লিখিয়াছে সেই অন্যত্র মনুষ্য লিখিয়াছে এ সকল হয় ভ্রম,না হয় পরিহাস। যদি ভ্রম হয় তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গলাকে পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট করার যে মহদুদ্দেশ্য তাহা এই পরীক্ষার্থীরা ব্যর্থ করিতেছে। আর যদি পরিহাস হয়, তবে ইহাদিগের মন কিরূপ ভাবে গঠিত হইতেছে, তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক। যাহারা পরীক্ষা মন্দিরে বসিয়াও রহস্য পরিহাস করিতে পারে; বিশেষতঃ পরীক্ষকের সহিত পরিহাস করিতে সমর্থ হয়, তাহারা কতদূর লঘুচিত্ত! এই সকল লঘুচিত্ত ব্যক্তিগণের নিকট এ দেশ কি আশা করিতে পারে? ইহারা ভবিষ্যৎকে অন্ধকার—সমাচ্ছন্ন করিয়া তুলিতেছে, দেখিয়া কোনও হৃদয়বান ব্যক্তি স্থির থাকিতে পারেন না। মনে হয়, যেন আরও পঞ্চাশ বৎসরের মত এই হতভাগ্য দেশের সকল আশাই অতল জলে ডুবিয়া গেল।

সকল বিষয়েই ইংরাজির অনুকরণ চলিতেছে। যাহা যাহা আমার নিজের তাহা সব খোয়াইয়াছি; এখন আমরা অপরের ছায়ামাত্র। অপরে যাহা করে আমরা তাহাই করি। আমাদিগের নিজের কিছুই নাই। মাউরি, হটেন্‌টট্‌ ইত্যাদি খৃষ্টান্‌ হইয়াছে; হ্যাট্‌ কোট্‌ পরিতেছে; ইংরাজি অক্ষর ব্যবহার করিতেছে; ইংরাজি খেলা খেলে। তাহাদিগের নিজের কিছুই নাই বলিয়া। তাহারা বর্ব্বর জাতি, উলঙ্গ হইয়া থাকিত। আমরাও কি তাহাই? আমাদিগেরও কি নিজের কিছু নাই! আমাদিগের বাক্য—ভঙ্গী পৃথক; তাহা অন্যের সহিত মিশিবে কেন? Student Life ইংরাজের বাক্যভঙ্গী; কিন্তু আমাদিগের বাক্যভঙ্গী "পাঠ্যাবস্থা"। উহাকে "ছাত্র-জীবন" বলিলে চলিবে কেন? ঐ শব্দ বাঙ্গলাই নহে। অথচ বহু পরীক্ষার্থী নানা স্থানে লিখিয়াছে,

"পাঠ্য জীবন"; "প্রণয় জীবন"; "রমনী জীবন"; "ছাত্র জীবন"; "গ্রহী জীবন"।

ইহারা সকলই ইংরাজী ছাঁচে ঢালিতে চাহে। যদিও কোনও বিখ্যাত লেখক "সুবর্ণ সুযোগ" কথাটী gold opportunity অর্থে চালাইতে চাহিয়াছিলেন। কোন কোন স্থানে ব্যবহারও করিয়াছেন। তথাপি এ সকল

(১) শ্রীবৃদ্ধি; (২) পৃথিবীতে; (৩) প্রেম (৪) মনুষ্য; (৫) গৃহীর জীবনে।

অনুকরণীয় নহে। ইহা কোনও খাঁটী বাঙ্গলানবিস্ বুঝে না। ইংরাজীর বিজাতীয় গ্রন্থে এ সকল শব্দ সর্ব্বথা পরিহার্য্য। যেরূপ হৃদ্গত ভাব থাকিলে "সুবর্ণ সুযোগ", "প্রণয় জীবন" ইত্যাদি শব্দ কলমে বাহির হয়, সেইরূপ ভাবই মারাত্মক। উহাই আমাদিগকে অবসাদ হ্রদে নামাইয়া দিতেছে। ঐ ভাব সম্পূর্ণরূপে পরিত্যজ্য।

ভাব হইতেই আমাদিগের চেষ্টা ও কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়। সেই ভাব যাহাতে জাতীয় জীবনের কল্যাণকর হয় তাহাই আমাদিগের বিবেচ্য। 'উহা জাতীয় জীবনের কল্যাণকর হওয়া এবং কল্যাণকর থাকা চাই। ভাষার মধ্যদিয়া জাতীয় মনে মারাত্মক বিষ প্রবেশ না করে; ব্যক্তিগত চরিত্র এবং জাতীয় মন কলুষিত না হয়, এ দিকে সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকিতে হইবে, আমরা আমরাই; আমরা অন্য কেহ নহে; এ কথা কখনই বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। আমরা উন্নত হইতে চাই; কিন্তু অপরে পরিণত হইতে চাই না; একথা যেন সকল পরীক্ষার্থীরই স্মরণ থাকে।

এই প্রসঙ্গে একটী কথা না বলিয়া নীরব থাকিতে পারি না। কোনও কোনও পরীক্ষার্থী হিন্দুর সন্তান হইয়াও এমনই আত্মহারা হইয়াছে যে হিন্দুর দেব দেবীর লিঙ্গ ভেদও জানে না। একটী পরীক্ষার্থী লিখিয়াছে,

"কাশীতে বিশ্বনাথ দেবীর মূর্ত্তি..."

কাশীর বিশ্বনাথ কি দেব, না দেবী? প্রাপ্ত বয়স্ক হিন্দু সন্তান এপোলো, ভিনাস্ প্রভৃতি দেব কি দেবী তাহা অক্লেশে বলিয়া দিবে; কিন্তু বিশ্বনাথকে দেবী বলিবে। ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর নাই। এ ক্ষেত্রে কি বলিব, তাহা ভাবিয়াই পাই না! কেবল দীর্ঘ নিশ্বাস হৃদয়ের গুরু ভার লঘু করে; আর গত্যন্তর নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশশধর রায়।

"নবরূপে"

আমার এ [illegible] সন্ধান
তুমি [illegible] মান
কতরূপে;—
কভু তুমি শিশুমূর্ত্তি ধরি
এসেছ আমার কাছে, হে আমার হরি
রমনীর রূপে কভু আমার দুয়ারে
দাঁড়ায়েছ মধু হাসি মাখিয়া অধরে,
জননীর শুভ্র হাসি, স্নেহ অনুরাগে,
জনকের সৌম্য শিষ্ট হৃদয় আড়ালে,
ভ্রাতার গৌরব মাঝে, ভগিনীর স্নেহে,
প্রকৃতি মাতার স্নিগ্ধ কম কান্ত দেহে,
তোমারে পেয়েছি নাথ।
আজি আর বার,
বন্ধুরূপে আসিয়াছ হৃদয়ে আমার,
তবু তব পরীক্ষার হল নাহি শেষ,
আরও কি নূতন খেলা খেলিবে প্রাণেশ!

চৌধুরী শ্রীহরিকৃপা দেববর্ম্মা।

ঢাকায় সঙ্গীত চর্চ্চা। *

(৩)

৵ কাশীনাথ রায়—ঢাকা কেরাণীগঞ্জ থানার আটী নামক গ্রামে ইহার নিবাস ছিল। ইনি কর বংশীয় কায়স্থ সন্তান। অনুমান ৪৩ বৎসর পূর্ব্বে ইনি জীবিত ছিলেন। কাশীরায় "রাবণবধ" ও "হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গা-রোহণ" নামক দুইখানি যাত্রার পালা রচনা করিয়া-

* (ঢাকা সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত)।

ছিলেন। আটীর তদানিন্তন ভূম্যধিকারী স্বর্গীয় ব্রজকিশোর রক্ষিত-রায় মহাশয়ের উদ্যোগে ও অর্থ ব্যয়ে এই দুইটি পালারই অভিনয় হইত। ব্রজকিশোর রায় মহাশয় নিজেও সুকণ্ঠ ছিলেন। তিনি বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখকের পিতামহ। আটী অঞ্চলে "হরিশ্চন্দ্রের পালা" বিশেষ আদৃত হইয়াছিল। ইহার গানগুলির রচনা বড়ই প্রাঞ্জল, একটিও কট মট শব্দ নাই। অন্যান্য সাবেকী যাত্রার মত ইহাতেও কথা বা বক্তৃতা খুবই কম। সংলগ্নতা রক্ষা করিবার জন্য যেখানে কথার প্রয়োজন তাহার অধিকাংশ স্থলেই "অধিকারীর" পয়ার দিয়া সারা হইয়াছে। এই পয়ারগুলিও সুর সংযোগে গীত হইত। এই "হরিশ্চন্দ্র" পালার দুইটি গান নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(রাজা হরিশ্চন্দ্র কাননে যাইয়া লতাপাশ বদ্ধা অপ্সরাদিগকে দেখিতে পাইয়া গাইলেন)—

রাগিনী মিশ্র—তাল একতালা।

"তোরা কে গো সুন্দরী,
করে' ধরাসন, প'ড়ে পঙ্কজম
বন্ধন কেন হেরি।
দেখি ছল ছল সজল নয়ান,
নয়নের জলে ভেসেছে বয়াম,
মানব দুহিতা, কিবা যক্ষসুতা,
রূপেতে বিদ্যাধরী।
হেরি অপরূপ মনোমোহিনী,
বল্ তোরা কার কুলকামিনী,
কি ভাবিয়ে মনে নারী পঞ্জনে
এলে এ কাননে বল গো শুনি।
কোমল করে হেরি বিষম বন্ধন,
ক্ষণে অচৈতন্য, ক্ষণেকে চেতন,
কেন হেন ভাব,—সবার এ কি ভাব,
বুঝিতে নারি।"

দ্বিতীয় গানটি এই; ইহাতে সর্পদষ্ট মৃত রোহিতাকে কোলে করিয়া সাম্রাজ্ঞী শব্যা বিলাপ করিয়া বলিতেছেন:—

"কোথারে মোর বাছু মণি, করে' আমায় অভাগিনী
দুখিনীরে গেলিরে তেজিয়ে।
ত্রিজগতে কে আর আছে দাঁড়াব আর কার কাছে,
কার কাছে গেলি সমর্পিয়ে।
আয়রে বাছা করি কোলে চাঁদ মুখে ডাক মা বলে,
জন্মের মত শুনিয়ে শ্রবণে।
ওঠরে প্রাণের ধন, ওরে আমার বাছাধন,
কি দুখেতে শুয়ে ধরাসনে।
যখনে হইয়ে দাসী, দ্বিজের নিবাসে আসি,
অঞ্চলে ধরিলে দুই করে।
দ্বিজ করিয়ে ভর্জ্জন, ছাড়াতে নারে কখন,
সঙ্গে এলি মরিবার তরে।
এখনে বাপ কোথা রলি, মায়েরে কি বলে গেলি,
ভাসাইলি শোকের সাগরে।
রাজ্য তাপেতে তাপিত, শোকানলেতে আবৃত,
আর কত সহিব অন্তরে।"

এই "হরিশ্চন্দ্রের" অভিনয় আমি দেখিয়াছি। যখনই এ ধরণের গান গাওয়া হইত তখনই সভাশুদ্ধ লোক অশ্রু মোচন করিতে থাকিত। বহু পিতা মাতার হৃদয়ের রুদ্ধ শোকরাশি উথলিয়া উঠিত আর তাঁহারা হাহারবে "ডুকরিয়া" কাঁদিয়া উঠিতেন।

কাশীরায় মহাশয়ের বেশ উপস্থিত বুদ্ধি ছিল। দোলের সময় তিনি প্রতিবারই হলীর গান রচনা করিয়া গাইতেন। একবার দোলের সময় রক্ষিত বাড়ীতে হলি গানের বৈঠক বসিয়াছে। প্রতিপক্ষ দুই দল বৃহৎ আঙ্গিনায় উপবিষ্ট। একদল নিজ আটীর, আর একদল নিকটবর্ত্তী গ্রাম শিকারী টোলার। শিকারীদের গান বাজনায় বড় সখ ছিল। তাহারা নানা জনে নানা রঙের পাগড়ি বাঁধিয়া গানের আসরে বারদিয়া বসিয়াছে।

কাহার পাগড়ি লাল, কাহারও গোলাবী, কাহার কমলা, কাহার সবুজ, কাহারও নীল, কাহারও হলদে, কাহারও বেগুণী, কাহারওবা সাদা, এইরূপ কত ভঙ্গিতে ভঙ্গিতে বর্ণের বাহার! দেখিয়া কাশীরায় তৎক্ষণাৎ গান বাঁধিয়া নিজ দলের লোকদিগের সঙ্গে গাইলেন :—

"দেখো ভবন চিলা সব বয়ঠে গাই।
বিচ্‌বিচমে হ্যায় চন্দনা,
দো একঠো গাথুয়া ময়না,
ক্যা এক চিরিয়াখানা
বাহার বাড়ীমে দেখ্‌নে পাই!
দেখো ভবন চিলা সব বয়ঠে গাই।"

তদ্রচিত আর একটি সঙ্গীতে গ্রাম্য হাসির গানের একটু নমুনা দেখুন। "হরিশ্চন্দ্র" পালায় বিশ্বামিত্র মুনীর ফুল বাগানের মালী তার বন্ধুবর্গের নিকট গাইতেছে :—

"আমি চাকরি করতে যাই,
মুনীর চাকরি করে আমার
পদ হয়েছে ভাই।
দরমাহা পাই পয়সা চারি,
কিন্‌তে গেলাম ঢাকাই সারি,
তাঁতি মারে জোতার বারি
কার দিব দোহাই।"

অবশ্য এ গান রচনার সময়ে গ্রাম্য কবি ইচ্ছাপূর্ব্বকই কালবিপর্য্যয়দোষের (anachronism) দিকে দৃষ্টি করেন নাই।

আটিতে নিতাই দে নামক কাশীরায়ের সমসাময়িক আর একটি লোক ছিল, সে লেখাপড়া বিশেষ জানিত না, কিন্তু বেশ গান রচনা করিত। নিজে গাইতেও পারিত। নিম্নে তার দুইটি গান দেওয়া গেল :—

(১নং)

"ওরে অবোধ সন্তান, আমায় দোষ অকারণ।
যার যে ললাট লিখন, কভু না যায় খণ্ডন॥
ওরে জীবভ্রান্ত মতি, তার সাক্ষী গণপতি,
মম পুত্র হয়ে কেন তার হল গজানন॥"

(২নং)

(এটি হুলির গান)

"খেলে শ্যাম সুন্দর, বৃকভানু দুলারী॥
মানিক কাঞ্চন জড়িদ হওরা,
চমকে হ্যায়সা আশমান তারা,
মণি মুকুতা কি গুড়ে ঝালার॥
ময়ুর মুকুট শিরে, মোহন মুরলী করে,
রাধেজিকি বামে ডারে রতন হওরাপরে।
মোহিনী মোহন দোন, রূপে মোহে জগমন,
করো সখি, দরশন, বিরাজে রাধা কিষণ,
সারি সারি সব সখীগণ ডারি,
আনন্দে খেলে চতুরঙ্গ হোরি,
কোই সখী উড়াওয়ে আবিরি॥"

ঢাকা সহরের উপরে এবং নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে বহু যাত্রার পালা রচিত হইয়া অভিনীত হইয়াছে। সকল গুলির বিবরণ সংগ্রহ করা যায় নাই, সম্ভবও নহে। পূর্ব্বোল্লেখিত পালাগুলি ছাড়া ঢাকায় "কুঞ্জেশ্বরী মিলন," "নারদ সংবাদ," নবাবপুর গোয়াইলাড়াতে "ভ্রমরগীতা," গোয়ালনগরে "বিদেশিনী বিভাবলী" একরামপুরে "রূপ সনাতন," ঢাকা জাফরাবাজে "পাতালখণ্ড", গুভাঢ্যায় "গোপেশ্বর মিলন," বাশতা গ্রামে "কলঙ্কভঞ্জন" শাক্তায় "মুক্তাবন বিলাস" প্রভৃতি যাত্রার অভিনয় হইয়া গিয়াছে। তখনকার দিনে গোলাভরা ধান, বাথান ভরা গাই, আর পুকুর ভরা মাছ ছিল, লোকে পেট ভরিয়া খাইত আর মনের আনন্দে সঙ্গীত চর্চ্চা করিত। আর এখন পেটের দায়ে গানের বদলে কণ্ঠ হইতে "ত্রাহি ত্রাহি" ধ্বনি নির্গত হইতেছে। সে দিন কি আর ফিরিয়া আসিবে না?

রামাভিষেক নাটক :—তদানিন্তন কমিসনার সাহেবের পার্সনাল্ আসিষ্টাণ্ট, স্বর্গীয় রায় অভয়াকুমার

দাস বাহাদুর এবং জমিদার মোহিনী মোহন দাস মহাশয় প্রভৃতির উদ্যোগে সর্ব্বসাধারণের চাঁদায় বর্ত্তমান জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষের বাড়ী যে স্থলে অবস্থিত সেই স্থানে একটি প্রকাণ্ড গৃহ নির্ম্মিত হইয়া অনুমান ১২৭৮ সনের চৈত্র মাসে প্রাচীন সাহিত্যিক ৺মনোমোহন বসু মহোদয় প্রণীত "রামাভিষেক নাটকের" অভিনয় প্রথম আরম্ভ হয়।

ঐ সখের অভিনয় ব্যাপারে তদানিন্তন গভর্ণমেণ্ট প্লিডার উপেন্দ্রনাথ মিত্র ও ঢাকা কলেজের প্রসিদ্ধ শ্রীনাথ পণ্ডিত মহাশয়দ্বয় পুরোহিতের, মুড়াপাড়ার জমিদার ৺রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দশরথের, কলিজিয়েট স্কুলের শিক্ষক ৺সাধুচরণ শীল কৌশল্যার, প্রসিদ্ধ ব্রহ্মসঙ্গীত গায়ক ৺চন্দ্রনাথ রায় মহাশয় রামের, মুড়াপাড়ার অন্যতম জমিদার ৺উমেশচন্দ্র রায় মহাশয় সীতার, এবং মুন্সীগঞ্জের উকিল জয়চন্দ্র রায় মহাশয় লক্ষ্মণের পাঠ গ্রহণ করেন। ইহার মধ্যে সীতা ও লক্ষ্মণের পাঠ অতি দক্ষতার সহিত অভিনীত হইয়াছিল।

উক্ত গৃহনির্ম্মাণের দ্বারা ঢাকায় সর্ব্বসাধারণের একটি গৃহের (Public hall) অভাব পূরণ হয়। জয়দেবপুরের রাজা ৺কালীনারায়ণ রায় মহোদয়ের "রাজা" উপাধি এই স্থানেই দেওয়া হইয়াছিল। পরে বিদেশ হইতে যখনই কোন নাটকের দল ঢাকায় আসিয়াছে, এই স্থানেই তাহার অভিনয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। ঢাকার প্রথম রাজ নৈতিক প্রাদেশিক সম্মিলন ও (Provincial conference) এই স্থানেই হয়।

প্রণয় পরীক্ষা নাটক :—তদনন্তর মনোমোহন বসু মহাশয় প্রণীত "প্রণয় পরীক্ষা" নাটকও এই মঞ্চেই অভিনীত হয়। সূত্রাপুর নিবাসী বিপিনচন্দ্র রায়, ৺চন্দ্রনাথ রায়, কমিসনারির কেরাণী শ্রীযুত শ্যামাচরণ সেন, মহামহোপাধ্যায় প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন, সেনহাটি নিবাসী প্রসন্নকুমার দাস, জগন্নাথ স্কুলের পণ্ডিত বৈকুণ্ঠচন্দ্র সেন মহাশয় প্রভৃতি ভদ্রলোকগণ এই নাটকের অভিনেতা ছিলেন।

মহান্ত নাটক :—অতঃপর ঢাকার স্বনামধন্য দানবীর নবাব সার আবদুলগনি বাহাদুরের বিশেষ উৎসাহে তারকেশ্বরের মহান্তঘটিত নবীন এলোকেশী ব্যাপারে দেশে যে ভয়ানক আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা অবলম্বনে এই মঞ্চেই "মহান্ত নাটকের" অভিনয় হয়। ইহার যাবতীয় ব্যয়ভার সহৃদয় নবাব বাহাদুর বহন করেন। ৺চন্দ্রনাথ রায় নবীনের, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠচন্দ্র নাথ এলোকেশীর, এবং নর্ম্মাল স্কুলের জনৈক পণ্ডিত নবীনের শ্বশুরের পাঠ গ্রহণ করেন।

এই নাটকের অভিনয়ে নবীন কর্ত্তৃক এলোকেশীর হত্যাব্যাপার এমন সুকৌশলে প্রদর্শিত হইয়াছিল যে নবাব বাহাদুর দ্বিখণ্ডিত এলোকেশী এবং রক্তাক্ত অভিনয় মঞ্চ দর্শন মাত্র দাঁড়াইয়া উঠিয়া অভিনয় ক্ষেত্রে উপস্থিত তদানিন্তন পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিষ্টার ওয়েদারল্ (Weatherall) সাহেবকে বলিলেন "নবীন কো পাক্‌ড়ো, উওঃ তো একদম্ কতল্ কিয়া।"

এই ঘটনার অনুরূপ আর একটি ঘটনা মনে পড়িল। একবার লক্ষ্মীবাজার রাজাবাবুর বাড়ীতে মানভঞ্জন যাত্রার অভিনয় হইতেছিল। বহু শ্রোতার আবির্ভাব হইয়াছে। কলধর হইতে অনেক সেপাইও যাত্রা শুনিতে আসিয়াছে। গানও খুব জমিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে কতই স্তুতিমিনতি করিতেছেন, কিন্তু দুর্জ্জয় মান কিছুতেই ভাঙ্গিতেছে না, অবশেষে কৃষ্ণ "দেহি পদপল্লবম্" বলিয়া রাধার পায় ধরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তথাপি রাধিকা যখন অভিমানে মুখ ফিরাইয়া পা সরাইলেন, তখন দর্শকদিগের মধ্যের একজন সিপাহির আর সহিল না, সে পাকা বাঁশের মোটালাঠি উঠাইয়া জনতা ঠেলিয়া আসিয়া বলিতে লাগিল "তেরা গোয়ালিনীকো ক্যা কহে, মেরা কিষণ জি তেরা পায়ের পর গিরারহা, তবভি তেরা মান টুটতা নেহি। এক ডাণ্ডাসে তেরা শের তোড় ডালুঙ্গা।"

শকুন্তলা :—ঢাকা নবাবপুরের একাংশে অর্থাৎ নবাবপুর বংশাল রোডের উত্তর পার্শ্বে যে একটি পুরাতন পুষ্করিণী আছে উহার পূর্ব্বপারে মঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া "শকুন্তলা" নাটকের অভিনয় হয়। দক্ষিণ মৈষণ্ডী নিবাসী পণ্ডিত রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কবিরত্ন মহাশয় কালিদাসের শকুন্তলার বঙ্গানুবাদ করিয়া নাটকাকার দেন। উহার সমস্ত গানগুলিও তাঁহারই রচিত। শ্রীযুত সার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ৺ গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্ত (পানি বাবু) মহাশয় ইহার মোসন মাষ্টার ছিলেন। ইনি পরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ হন। পানিবাবুর উদ্যোগেই এই নাটকের অভিনয় হয়। ইনি নানা দেশীয় ভাষার নকল করিয়া কথা বলিতে দক্ষ ছিলেন। শ্রীযুত যদুনাথ বসাক, প্রিয়নাথ বসাক, ৺ বসন্তকুমার বসাক প্রভৃতি সকলেই পানিবাবুর উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া অকাতরে অর্থব্যয় সহকারে এই কার্য্য সমাধা করেন। ইহার অভিনয়ও উত্তম হইয়াছিল।

একদা হাইকোর্টের উকিল ৺ দুর্গামোহন দাস মহাশয় তদীয় জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সরলা রায় মহাশয়াকে লইয়া "শকুন্তলা" নাটক দেখিতে যান। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই উক্ত কন্যার শুভবিবাহ কার্য্য শুভাঢ্যা নিবাসী ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় (Dr P. K. Ray) মহোদয়ের সঙ্গে কলিকাতায় সম্পন্ন হইয়াছিল। সেই সময়ে জামাতার সঙ্গে কন্যা যখন পিতৃভবন ত্যাগ করিয়া স্বামির আলয়ে যাত্রা করিতেছিলেন তখন দুর্গামোহন বাবু কন্যা বিচ্ছেদে বড়ই অধির হইয়া পড়েন। এই অভিনয় দর্শন কালে ও শকুন্তলা যখন কণ্ব মুনীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া দুষ্যন্তের আলয়ে যাত্রা করিলেন তখন যোগী শ্রেষ্ঠ কুলপতি কণ্ব শকুন্তলার বিচ্ছেদ জনিত হৃদয়াবেগ যে ভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন তৎশ্রবণে দুর্গামোহন বাবু প্রকাশ্য ভাবে কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন। "শকুন্তলা" নাটকের একটি গান নিম্নে দেওয়া গেল :—

"আজ কেন এ ভাব, নৃপতি তব,
বুঝিতে না পারি।
শ্রীমুখ মলিন বল বল কেন,
তাপিত তনুরুচি,
শকুন্তলা মনে পড়ে কি এখনে,
অনুতাপিত পরাণ?
বুঝিব তা আজ ভাল করি।"

মালতি মাধব : —শকুন্তলার সম সময়ে অর্থাৎ বর্ত্তমান সময় হইতে প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁতিবাজার শ্রীযুত কেশবলাল বসাক মহাশয়ের বৈঠক খানার পশ্চাৎ দিকের বাগানে নূতন মঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া "মালতী মাধব" নাটকের অভিনয় হয়। ইহা "শকুন্তলা" নাটকের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীভাবে অভিনীত হইয়াছিল। ঢাকার তদানিন্তন অন্যতম সবজজ ৺ গঙ্গাচরণ সরকার মহাশয় "মালতী মাধবের" অভিনয় করিতে পরামর্শ দেন। গঙ্গাচরণ সরকার মহাশয় পরলোকগত প্রবীন সাহিত্যিক অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের পিতা। ইনিও সাহিত্যরসে রসিক ছিলেন। পিতৃগুণ পুত্রে অধিকতর ভাবে প্রস্ফুটিত হয়। তাঁতিবাজারের ৺ রাধিকামোহন বসাক, শ্রীযুত কেশবলাল বসাক, শ্রীযুত গোবিন্দলাল বসাক, ৺জগৎচন্দ্র বসাক, ও শ্রীযুত মদনমোহন বসাক প্রভৃতি ইহার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। গোবিন্দলাল বাবু ইহার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন। মহামহোপাধ্যায় ৺ প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় অক্লান্ত পরিশ্রম ও সুদৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত এই অভিনয় ব্যাপার সুসম্পন্ন করেন। তিনি ইহার বহু গানও রচনা করিয়া দেন। উকিল শ্রীযুত হৃদয়নাথ মজুমদার, কমিসনার আপিসের শ্রীযুত আদিত্যচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এবং ৺চন্দ্রনাথ রায় মহাশয়গণ এই গানের সুর দেন।

৺চন্দ্রনাথ রায়, অঘোরঘণ্টের, ইঞ্জিনিয়ার আপিসের শ্রীযুত সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মালতীর, কলতাবাজারের শ্রীযুত প্রিয়নাথ বসাক মাধবের, তাঁতিবাজারের শ্রীযুত মদনমোহন বসাক মালতীর সখীর, এবং কালেক্টরীর

ভূতপূর্ব্ব কেরাণী বসন্তকুমার ঘোষ কপালকুণ্ডলার পাঠ অতি দক্ষতার সহিত অভিনয় করেন।

"মালতী মাধবের" দৃশ্যপটগুলি বড়ই মনোজ্ঞ হইয়াছিল। ইহার প্রস্তাবনার দৃশ্যে যবনিকা উত্তোলিত হইলেই একটি বিপুলকায় পদ্মের কলি সশব্দে প্রস্ফুটিত হইয়া পড়িত, এবং ঐ পদ্মের মধ্যে অপূর্ব্ব সরস্বতী মূর্ত্তি দেখা যাইত। তখনই নিম্নলিখিত সঙ্গীত দুইটি গীত হইত—

(১)

মিশ্রভূপালী—ঠুংরি।

"ভগবতী ভারতী মলিন মুখীমতি ভূষণ ভাব বিহীনাং।
চিন্ময় দিদতি দুঃখে নিমজ্জতি ত্বমিহবীক্ষ সুদীনাং॥
চৈতং বদনং সুষমা সদনং মলিনং মলিনং জাতং।
সিত সিত নয়নং প্রীতেরয়নং অসিতং অসিতং ভাতং॥
করধৃত বীণা গীতবিহীনা, বসতি নশ্রুতি মধুধারাং।
ভাষতি দীনাং মনো ক্ষীণাং স্বর্গ পতিত শুকতারাং॥
দুঃখাবলীনাং পুনরিহবীণাং বাদয় বাদয় তূর্ণং।
অপগত হর্ষং ভারতবর্ষং কুরু কুরু সুখ পরিপূর্ণং॥
কাব্য নিকুঞ্জং কবিপিকপুঞ্জং গত্বা গুঞ্জতু নিত্যং।
ভাব পরিতৈঃ দীপক গীতৈরুদ্দীপয় মৃদ্ধ চিত্তং॥"

(২)

লুমঝি ঝিট—একতালা।

"ভারতী জননী মলিন বদনী,
অশ্রু জল মুখে শোক-শেল বুকে,
কাঁদেন ভারত-দুখে দিবস রজনী।
ভারত শ্মশানে সঞ্চারিতে প্রাণে,
সাধেন কি শক্তি ধ্যানে মৃত সঞ্জীবনী।
যদি পুন জাগে, সে দীপক রাগে,
নির্জ্জীব ভারতে পুনঃ হবে জয়ধ্বনি।"

এতদ্ব্যতীত নবাবপুরে "বিল্বমঙ্গল" ও "সীতার বনবাস" নাটকদ্বয় অভিনীত হয়। মৈমণ্ডীর রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কবিরত্ন মহাশয় ইহার গান রচনা করেন। পণ্ডিত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোবিন্দচন্দ্র ভাগবতভূষণ মহাশয় "কুঞ্জেশ্বরী মিলন" ও "কুরুক্ষেত্র মিলন" যাত্রার পালা রচনা করেন। এই দুইটিও নবাবপুরে অভিনীত হয়।

চন্দ্রহাস নাটক—ইহা ঢাকা নবাবগঞ্জে অভিনীত হইয়াছিল। ইহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন ঢাকা কলেজের ভূতপূর্ব্ব লাইব্রেরিয়ান শ্রীযুত রাধাকান্ত দাস ও ডাক্তার ললিত মোহন দাস প্রভৃতি। যোশন মাষ্টার ছিলেন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের অঙ্কন বিদ্যার শিক্ষক শরচ্চন্দ্র দেব মহাশয়। ১২৯৯ সনের পৌষ মাস হইতে আরম্ভ হইয়া ১৩০০ সনের আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত এই নাটকের অভিনয় হয়। ঢাকা বাংলাপুর "আর্য্যনাট্য সমিতি" ইহার অভিনয় করেন।

উক্ত নাট্য সমিতি পরে "দুর্ব্বাসাদমন" বা "অম্বরীষের ব্রহ্মশাপ" নামক নাটকের অভিনয় করিয়াছিলেন। ইহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন শ্রীযুত রাধাবল্লভ দাস, প্রাণবল্লভ সাহা, এবং রামচন্দ্র দত্ত।

উক্ত "চন্দ্রহাস নাটক" অভিনয়ের সময় ঢাকা রায়ের বাজারে শ্রীযুত অভয়কুমার দত্ত এবং গিরিশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি "হরিশ্চন্দ্র" নাটকের, মৈষণ্ডীতে "প্রহ্লাদ চরিত্রের", এবং পরে ডাইল বাজারে "হরিরাজ" এবং রায়ের বাজারে "নরমেধ যজ্ঞের" অভিনয় হয়।

পূর্ব্বোল্লেখিত সমস্ত যাত্রা ও নাটকই সখে (amature ভাবে) অভিনীত হইয়াছে। কতদিন হইতে ঢাকায় "ক্রাউন" ও পরে "ডায়মণ্ড জুবিলি" থিয়েটার নামে দুইটি ব্যবসাদারী অভিনয়মঞ্চে নানা নাটকের অভিনয় হইতে থাকে। বর্ত্তমানে "লায়ন" থিয়েটার চলিতেছে। ক্রাউন থিয়েটারও নানা নামে চলিতেছে বটে।

৺শুকলাল মিস্ত্রী—ইনি সূত্রধর জাতীয় পশ্চিম দেশীয় লোক। ঢাকা তাঁতিবাজার বাগাবাড়ী লেনে ইহার নিবাসবাটী অবস্থিত। যন্ত্রাদি একরূপ বাজাইতে

জানিতেন। কিন্তু সর্ব্বপ্রকারের যন্ত্র উৎকৃষ্টরূপে প্রস্তুত করায় জন্যই ইঁহার দেশ বিখ্যাত অদ্বিতীয় নাম। এখনও শুকলাল মিস্ত্রীর হাতের পুরাতন যন্ত্র পাইলে লোকে চতুর্গুণ মূল্যে খরিদ করে। বীণ, সুরবাহার, সেতার, এস্রাজ, সরদ, তানপুরা প্রভৃতি যাবতীয় যন্ত্র তিনি প্রস্তুত করিতেন। পশ্চিম দেশীয় বড় বড় ওস্তাদেরাও শুকলাল মিস্ত্রীর দ্বারা যন্ত্রের "জোয়ারি" ঠিক করাইয়া লইবার জন্য আগ্রহ সহকারে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন। তাঁহার ছেলে মৃত পুরুষোত্তম মিস্ত্রীও দক্ষ কারুকর ছিলেন। এখন পুরুষোত্তমের পুত্র শ্রীযুত রামলাল মিস্ত্রী এবং তাহার ভ্রাতাগণ উত্তম যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া ঢাকার সুনাম রক্ষা করিতেছেন।

৺ ভুবনমোহন গোস্বামী—ইঁহার নিবাস ঢাকা মালীটোলা। ইঁহার পিতার নাম রাধানাথ গোস্বামী। ইঁহারা অদ্বৈতবংশ সম্ভূত। বহু পুরুষ যাবৎ নবদ্বীপ হইতে ঢাকায় আসিয়া বাস করিতেছেন। ভুবন গোসাই মহাশয় পাখোয়াজি ছিলেন। তিনি পশ্চিম বঙ্গের ৺অটলবিহারী গোস্বামী, নবাবপুরের গৌরমোহন বসাক এবং আনন্দমোহন বসাকের নিকট পাখোয়াজ শিক্ষা করেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺ বনোয়ারিলাল গোস্বামী মহাশয় হরি কর্ম্মকারের নিকট ধ্রুপদ শিখিয়াছিলেন। নবাবপুর লালচাঁদ মকিমের গলির শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ বসাক এবং নবাবগঞ্জের শ্রীযুত অক্ষয়নাথ কর্ম্মকার ভুবন গোস্বামী মহাশয়ের পাখোয়াজী শিষ্য। তাঁতিবাজারের জমিদার শ্রীযুত গোপালচন্দ্র বসাক এবং বিক্রমপুর নগর কসবার শ্রীযুত মথুরানাথ স্বর্ণ বণিক্য এই দুইজনই মহেন্দ্র বসাকের শিষ্য। ইঁহারা উৎকৃষ্ট বাজান।

৺ প্রাণ বল্লভ গোস্বামী:—ঢাকা ঠাঁঠারি বাজারে ইঁহার বাসস্থান। ইঁহার পিতার নাম ৺ গোপী বল্লভ গোস্বামী। ইঁহারা নিত্যানন্দ বংশ সম্ভূত। প্রায় ৭।৮ পুরুষ যাবৎ আদিস্থান খরদহ হইতে ঢাকায় আসিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। প্রাণ বল্লভ গোস্বামী নবাবপুরের ৺ কিশোরী মোহন বসাকের নিকট পাখোয়াজ ও তবলা শিক্ষা করেন। এস্রাজ প্রভৃতি অন্যান্য যন্ত্রেও তাঁহার হাত ছিল। তিনি মনোহরসাহি পদাবলী গানে অভিজ্ঞ ছিলেন। গোস্বামী মহাশয় শাস্ত্রেও দক্ষপ্রবেশ ছিলেন। ৪৯ বৎসর বয়সে ১৩২১ সনের ২১শে অগ্রহায়ণ তিনি পরলোক গমন করেন। তাহার পুত্র শ্রীযুত রাধাবল্লভ গোস্বামী মহাশয় বেশ তবলা বাজান।

৺ রোহিনী কুমার রায় কর্ম্মকার:—ইঁহার নিবাস ঢাকা তাঁতিবাজারে। পিতার নাম ৺ গোবিন্দ চন্দ্র কর্ম্মকার। বড়ই দুঃখের বিষয় অল্পদিন হইল ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে। বয়স অনুমান প্রায় ৫০ বৎসর হইয়াছিল। ইনি অতি সুকণ্ঠ টপ্পা গায়ক ছিলেন। প্রসিদ্ধ গায়ক হস্নু মিঞা, ও রাধিকা বাবু প্রভৃতির নিকট টপ্পা শিক্ষা করেন। আগরতলায় ইঁহার কর্ম্মকার দোকান ছিল। তথায় মহারাজের সরকারে গায়ক ভাবে মাসিক ৫০ টাকা বেতন পাইতেন। মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য ইঁহাকে বড় স্নেহ করিতেন। ত্রিপুরার বর্ত্তমান মহারাজা মহারাজ রোহিণীর বিধবাকে মাসিক ২০ করিয়া বৃত্তি দিতেছেন। গত মাঘ মাসে ইঁহার কন্যার বিবাহ উপলক্ষে নগদ ৩০০ টাকা সাহায্য দিয়া গুণগ্রাহিতা এবং কর্ত্তব্য জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন।

৺চন্দ্রনাথ রায়:—ইনি বৈদ্যকুল সম্ভূত। ফরিদপুর জেলার মুকসুদপুর থানার অন্তর্গতঃ খান্দার পাড়া গ্রামে রায় মহাশয়ের পৈতৃক বাসস্থান। তাঁহার পিতার নাম ৺কৃষ্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী। ১৭৭০ শকাব্দার ভাদ্র মাসে মাতুলালয় কাজুলিয়া গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ও সঙ্গীতে অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার প্রথম বয়সে রাজ নগরের রাজ বাড়ীতে হলি উপলক্ষে তিনি তথায় গান করিতেন এবং গান রচনাও করিতেন। রায় মহাশয় ১২৭৬ সনে ঢাকায় আসেন। একদা ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের অনুরোধে এখানকার

[illegible] ব্রাহ্মসমাজে তিনি প্রথম গান করেন। তাঁহার [illegible] কণ্ঠ শ্রবণে তদানিন্তন কমিসনার সাহেবের [illegible] অ্যাসিষ্টাণ্ট রায় অভয় কুমার দাস বাহাদুর এবং [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট ৺ব্রজ সুন্দর মিত্র মহোদয় অত্যন্ত [illegible] হন এবং তাঁহার সঙ্গীত শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া [illegible]। প্রথমে তিনি হক্কু মিঞার কাছে ৮ মাস শিক্ষা [illegible]। কিন্তু তাঁহার কণ্ঠস্বর টপ্পা গানের উপযোগী না [illegible] এবং হক্কু মিঞা ও তাঁহার কণ্ঠোপযোগী ধ্রুপদ [illegible] না দেওয়ায় তিনি আর তাঁহার নিকট শিখেন না। [illegible] শেষ বয়সে যখন রায় দীননাথ সেন সাহেব [illegible] হরি কর্ম্মকারের সঙ্গে উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত আলোচনা [illegible] তখন তিনি হরির কাছে এক বৎসর ধ্রুপদ অভ্যাস [illegible]। রায় মহাশয়ের কণ্ঠ অতি উচ্চ ও মিষ্ট ছিল, [illegible] সঙ্গীত গাইতে এতদ্দেশে তিনি এক প্রকার অদ্বিতীয় [illegible]। তাঁহার বয়স প্রায় ৭২ বৎসর হইয়াছিল কিন্তু [illegible] তাঁর কণ্ঠস্বর অতি উচ্চ, স্পষ্ট ও মিষ্ট ছিল। [illegible] ঢাকা উয়ারিতে বাস ভবন নির্ম্মাণ করিয়া [illegible]। তাঁহার এক ছেলে মুনসেফ এবং আর [illegible] ছেলে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখকের [illegible] সঙ্গীত চর্চ্চাও সর্ব্বপ্রথম চন্দ্রনাথ বাবুর ব্রহ্মসঙ্গীত [illegible] এবং কখনও কখনও বা তাঁহার নিকট কিছু কিছু [illegible] করিয়া আরম্ভ হয়। অতি দুঃখের বিষয় [illegible] বর্ত্তমান ১৩২৭ সনের ১৭ই আষাঢ় দেহত্যাগ [illegible]।

এখন ঢাকার জীবিত শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ গুণীদের সংক্ষিপ্ত [illegible] দিয়াই আমার বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব।

শ্রীযুক্ত ভগবান দাস সেতারী :—ভগবান সেতারীর [illegible] আবাস বাটী ১১নং সবজিমহাল, ঢাকা। তাঁহার [illegible] নাম ৺ রতন দাস বাবাজি সেতারী। ইনি [illegible] তাঁহার পিতার নিকট সামান্যরূপ সেতার শিক্ষা [illegible]। তৎপরে ৺ রূপবাবু ও কলিকাতার ৺ নবীন [illegible] গোস্বামী, সুলতান বক্স, হোসেন খাঁ এবং আরও বহু ভাল ভাল গুণী ব্যক্তি যাঁহারা ঢাকায় আসিয়াছেন তাঁহাদের নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। সেতারী মহাশয় বলিয়াছেন যে ওস্তাদের সঙ্গে নানা মজলিসে যাইয়া তালিদিয়া তাল অভ্যাস করিতে এবং সা, রে, গা, মা শিখিতেই তাঁহার বহুদিন চলিয়া গিয়াছে। যখন বেশ শিখিলেন তখন এমন রাত্রি অনেক গিয়াছে যখন প্রথম রাত্রে তিনি বাজাইতে বসিয়াছেন, কি ভাবে সময় চলিয়া যাইতেছে তাহার কোনই খ্যাল নাই, খাবার জিনিস ঢাকা পড়িয়া রহিয়াছে তিনি কেবল অনন্য মনে বাজাইতেছেন, পরে যখন প্রভাতের আলো গৃহে প্রবেশ করিয়াছে তখন সেই দিকে দৃষ্টি পড়ায় তিনি হঠাৎ সেতার ছাড়িয়া উঠিয়াছেন। বাজারের পয়সা নিয়া বাজারে যাইতেছেন পথে হয়ত কোন স্থানে কেহ তাঁহাকে ডাকিয়া একটি সেতার হাতে দিয়া বাজাইতে বলিল, তিনিও বাজাইতে আরম্ভ করিয়া তন্ময় হইয়া একেবারে সঙ্গীত রসে ডুবিয়া গেলেন, কার বাজার কে করে? অসময়ে শূন্য ভাণ্ড লইয়া গৃহে ফিরিয়া মাতার নিকট অপ্রস্তুত হইয়াছেন। এইরূপ একাগ্রতা ও সাধনার দ্বারাই তিনি এমন আশ্চর্য্য সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। ভগবান সেতারীর বর্ত্তমান বয়স প্রায় ৬৫।৬৬ বৎসর হইবে। এক সময়ে তিনি ও রায় সাহেব দীন নাথ সেন এবং বানিয়াজুরীর রাম বাবুর সঙ্গে স্বরলিপি দ্বারা সেতার শিক্ষা দিবার কৌশল উদ্ভাবন করেন। ইঁহার লিখিত উত্তম উত্তম গদ সম্বলিত একখানা স্বরলিপি পুস্তক পাণ্ডুলিপি আকারে আছে। ওস্তাদজি ইহা ছাপিতে মনস্থ করিয়াছেন। হরি কর্ম্মকার এবং ভগবান সেতারী এই দুই গুণীব্যক্তিই ঢাকায় স্বরলিপির ব্যবহার প্রচলিত করিয়াছেন।

এক সময়ে ভগবান সেতারী কলিকাতার প্রসিদ্ধ "ভারতসঙ্গীত সমাজের" সেতার শিক্ষক ছিলেন। ইনি মিউজিক্ ডাক্তার মহারাজ শৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর মহোদয়কে সেতার শুনাইয়া প্রশংসাসূচক সার্টিফিকেট

পাইয়াছেন। নিম্নে উহার নকল দেওয়া গেল:—

"Pathuriaghata Rajbati,
Calcutta, 23rd February 1896"

"I have much pleasure in certifying that Babu Bhagaban chandra Das of Dacca is a good player on the setar. He gave me some specimens of his practical skill before me the other day, and I was much pleased with his performance

Sd. Sourindra Mohan Tagore
Musc. Doctor."

ঢাকার ভূতপূর্ব্ব কমিসনার মিষ্টার পিলু ভগবান সেতারীকে পুরস্কার স্বরূপ একবার মোহর দিয়াছিলেন। ঢাকার নবাব বাড়ী হইতে তিনি ৬০৲ এবং পরে ৫০৲ মাসিক বৃত্তি পাইতেন। একদা তিনি তীর্থ ভ্রমণ উপলক্ষে মথুরাধামে গিয়াছিলেন। তথাকার মহাত্মা লছমি প্রসাদ সেঠ তাঁহার সুমধুর সেতার বাদন শুনিয়া এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে ওস্তাদজি যতদিন মথুরায় ছিলেন ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে অতি যত্নের সহিত নিজালয়ে রাখিয়াছিলেন এবং ফিরিয়া আসিবার সময় পুরস্কার স্বরূপ নগদ ৫০৲ টাকা আর একটি উৎকৃষ্ট ও মনোরম মুক্তার অঙ্গুরী দান করেন। অল্পদিন হইল ঢাকার বর্ত্তমান নবাব শ্রীযুত হবিবুল্লা সাহেব বাহাদুর সেতারীকে একটি পদক পুরস্কার দিয়াছেন। পদকটি নবাব বাহাদুরের পক্ষ হইতে বঙ্গের শাসনকর্ত্তা লর্ড রোণাল্ড্‌সে বাহাদুর সেতারীকে স্বহস্তে প্রদান করেন।

ওস্তাদজি ধ্রুপদ, খ্যাল, টপ্পা, ঠুমরি সর্ব্ব প্রকারের কণ্ঠ সঙ্গীতের সঙ্গেই সেতারের অতি উত্তম সঙ্গত করেন। গানের সঙ্গে এরূপ সেতারের সঙ্গত ঢাকার সেতারী-দের বিশেষত্ব। ইনি লয়েও অতি পরিপক্ক। ভগবান ইঁহার হাতে এমনই মধু মাখিয়া দিয়াছেন যে ইনি যাহাই বাজান তাহাই প্রাণ কাড়িয়া নেয়। মনে হয় যেন কোন এক অপ্সরোরাজ্যের নির্ঝর গুচ্ছের কুলুকুলুতান মৃদুল মলয়ানিলে বাহিত হইয়া শ্রবণ স্পর্শ করিতেছে, আর প্রাণ মন মোহিত হইয়া যাইতেছে, দেহগ্রন্থি যেন শিথিল হইয়া পড়িতেছে। ইনি বাজাইবার সময়ে এমনই তন্ময় হইয়া যান যে তাঁহার মুখ দেখিলে মনে হয় যেন তিনি কি এক আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন।

ভগবান সেতারীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্যাম সেতারী ও তাঁহার ভাগিনেয় অন্ধ যদুনাথ দাস ইঁহারই নিকট সেতার শিক্ষা করিয়াছেন। শ্রীযুত ইন্দ্রমোহন সেতারীও প্রথমে ইঁহার নিকট কিছু দিন পাঠ নেন। ইঁহার স্বভাবটি অতি মনোরম।

শ্রীযুত এম্‌দাদ্ খাঁ:— এম্‌দাদ্ খাঁর বর্ত্তমান বাসস্থান ১৫৩নং দক্ষিণ মৈষণ্ডী, ঢাকা। ইঁহার পিতার নাম খয়রু ব্যাপারী। বর্ত্তমান সময়ে ইনিই ঢাকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খেয়াল গায়ক। ধ্রুপদ এবং খ্যাল উত্তম গা'ন, টপ্পা ঠুমরিও বহু জানা আছে। তিনি লয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ, নানা প্রকারে লয়ের বাঁট করিতে অতি দক্ষতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে মুখে মুখে কঠিন কঠিন ধ্রুপদ. খ্যাল. টপ্পা ও ঠুম্‌রির তান উপজ সহ স্বরলিপি করিয়া দিয়া তিনি আশ্চর্য্য সুরবোধের পরিচয় দেন। এম্‌দাদ্ মিঞা অতি খোসমেজাজি লোক। বর্ত্তমান সময়ে ইঁহার বয়স ৬০ বৎসরের কিছু উর্দ্ধে হইবে। শ্রীযুত সমিউল্লা মিঞা, রাধারমণ বসাক, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুত নরেন্দ্র নাথ সেন প্রভৃতি ইঁহার শিষ্য। এম্‌দাদ্ মিঞা বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখকেরও সঙ্গীত গুরু।

বাল্যকাল হইতেই ইনি অতি সুকণ্ঠ ছিলেন। ১২।১৩ বৎসর বয়সের সময় তিনি একদিন ভোরের সময়ে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া নিকটবর্ত্তী একটি পুকুরঘাটে যাইয়া দেখিলেন যে একজন পশ্চিম দেশীয় সুন্দর গঠন শুভ্র বেশ সাধুপুরুষ নাভি পর্য্যন্ত জলে নামিয়া অতি মধুর কণ্ঠে

[illegible] ভোরে গান করিতেছেন। সূর্য্য তখন পূর্ব্বাকাশে [illegible] দেখা দিয়াছেন মাত্র। সুখস্পর্শ উষা সমীরণ ধীরে [illegible] বহিতেছে। এমদাদ খাঁ তখন মুগ্ধ চিত্তে [illegible] পুকুর ঘাটে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সেই সুললিত সঙ্গীত [illegible] পর্য্যন্ত না শেষ হইল ততক্ষণই শুনিলেন। তাঁহার [illegible] যেন কেমন হইয়া গেল, সঙ্গীত শিখিতে ইচ্ছা হইল। [illegible] সে সঙ্গীতের এক বর্ণও বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু [illegible] তাহাকে পাগল করিয়াছে, কথায় কি কাজ? [illegible] ঐ বয়সেই হরি কর্ম্মকারের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া [illegible] শিখিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি নিজে [illegible] যে যখন কিছু অগ্রসর হইলেন তখন ভোরের [illegible] কখনওবা অন্য সময় তানপুরাটি হাতে নিয়া [illegible] উত্তরে কোম্পানীর বাগানে অর্থাৎ বর্ত্তমান [illegible] ঠিক উত্তর দিকের বাগানে অথবা অন্য [illegible] নির্জ্জন স্থানে চলিয়া গিয়াছেন, এবং তথায় [illegible] আনন্দে প্রাণ খুলিয়া স্বর সাধন করিয়াছেন। [illegible] কেহ বাধা দিবার নাই, ঠাট্টা করিবার নাই— [illegible] উন্মুক্ত প্রকৃতি মাত্র শ্রোতা, আর কলকণ্ঠ বিহঙ্গকুল [illegible] সাথী। বনের গাম্ভীর্য্য, বন্য কুসুমের নির্ম্মল সৌন্দর্য্য [illegible] আর ভ্রমরকুলের মধুর গুঞ্জন সব একত্র হইয়া [illegible] মনে এক অপূর্ব্ব ভাব আনিয়া দিত আর তিনি [illegible] খুলিয়া সঙ্গীত সাধনা করিতেন।

একবার কোন এক মজ্‌লিসে তদীয় সঙ্গীত গুরু হরি [illegible] সঙ্গে তিনি গিয়াছিলেন। আরও বহু গায়ক [illegible] উপস্থিত ছিলেন। সেই খানেই সর্ব্বপ্রথম [illegible] সমক্ষে তিনি গুরু কর্ত্তৃক গান করিতে [illegible] হইলেন। তখন তাঁর অতি তরুণ বয়স। [illegible] নির্ভর করিয়া গান ধরিতেই উহা জমিয়া গেল। [illegible] রূপ বাবু উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই অল্প [illegible] ছেলেটির গান শুনিয়া এরূপ খুসি হইলেন যে [illegible] পকেট হইতে ১০৲ টাকার একখানি নোট বাহির [illegible] এমদাদ মিঞাকে পুরস্কার দিলেন।

শ্রীযুত উপেন্দ্র কুমার বসাক :—উপেন্দ্র বাবুর বাসস্থান নবাবপুরে। ইনি সুবিখ্যাত রামকুমার বসাক মহাশয়ের পুত্র। বর্ত্তমান সময়ে ইনিই ঢাকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাখোয়াজি, নিজ পিতার নিকটই ইনি শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। আগরতলা রাজবাটীতে ইনি পাখোয়াজ বাজাইতেন এবং মাসিক ৫০৲ টাকা করিয়া বৃত্তি পাইতেন। উপেন্দ্র বাবু দিল্লি দরবারের সময় তথায় পাখোয়াজ বাজাইয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। পশ্চিম দেশীয় ওস্তাদকুলের মধ্যে এরূপ যশোলাভ করা ঢাকার পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। উপেন্দ্র বাবুর বর্ত্তমান বয়স ৬০ বৎসরের উর্দ্ধে হইবে। ইঁহাদের বাড়ীর পরলোকগত বিরজা বসাক, শ্রীযুত পারীন্দ্র বসাক প্রভৃতি ভাল বাদক। তাঁতিবাজারের জমিদার শ্রীযুত গোপালচন্দ্র বসাক মহাশয় উপেন্দ্র বাবুর পাখোয়াজী শিষ্য; গোপাল বাবু তবলাও উত্তম বাজান।

শ্রীযুত প্রসন্নকুমার সাহা বণিক্য, — ইঁহার নিবাস ২৪নং যুগীনগর ঢাকা। পিতার নাম ৺ মদন মোহন সাহা বণিক্য। ইনি ঢাকায় ৺ গৌর মোহন বসাকের নিকট পাখোয়াজ ও তবলা শিক্ষা করেন। তৎপরে মুরসিদাবাদ যাইয়া তত্রত্য জগদ্বিখ্যাত তবলা বাদক আতা হোষেণ খাঁ সাহেবের নিকট কিছুদিন তবলা শিক্ষা করেন। ইহার নিজ মুখে শুনিয়াছি যে ইনি নাকি একদিন ঢাকার তদানিন্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তবলা বাদক সুপ্পন খাঁকে বলিয়াছিলেন "আপনি ত এত বড় ওস্তাদ, বৃদ্ধও হইয়াছেন, এখন আপনার বিদ্যা যাহাতে ২। ৪ জন শিক্ষার্থীকে সম্পূর্ণ দিয়া যাইতে পারেন তাহাই করুন। তাহা হইলেই আপনার নাম থাকিবে।" ইহাতে ওস্তাদ সুপ্পন খাঁ উত্তর করিলেন "প্রসন্ন বাবু, হামারা বিদ্যা হাম কিসি কো নেহি দেগা, আপনা সাথ লে যায়েগা।" এইরূপ উত্তরে প্রসন্ন বণিক্য মহাশয় অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন, এবং নিজে যাহা কিছু শিক্ষা করিয়াছেন তাহা সমস্ত পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়

দেশে যাহাতে এই বিদ্যা শিক্ষার্থী মাত্রেই শিখিতে পারে তাহা করিতে ইচ্ছুক হইলেন; এবং সেই ইচ্ছার ফলেই ইনি তদীয় প্রসিদ্ধ পুস্তক "তবলা তরঙ্গিণী" ও "মৃদঙ্গ প্রবেশিকা" প্রকাশ করিয়াছেন। "তবলা তরঙ্গিনীর" তৃতীয় সংস্করণ হইয়াছে। "মৃদঙ্গ প্রবেশিকার" মুদ্রন ব্যয় মুড়াপাড়ার অন্যতম জমিদার শ্রীযুত কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বহন করিয়াছেন। এই দুই গ্রন্থে সমস্ত বিষয় এমন পাণ্ডিত্যের সহিত অতি সহজ ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে শিক্ষার্থীগণ মৃদঙ্গ ও তবলা বাদনে ইহা হইতে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন। এই গ্রন্থ কলিকাতার "বেঙ্গল্ মিউজিক্যাল স্কুলের" পাঠ্য।

ইনি বর্ত্তমান ঢাকার অতিশ্রেষ্ঠ তবলা বাদক। একসময়ে ইনি কলিকাতার "ভারত সঙ্গীত সমাজের" সঙ্গত অধ্যাপক ও বাদন শিক্ষক ছিলেন। ১৯০২ সনে কলিকাতা "ভবানীপুর সঙ্গীত সম্মিলনী সভা"তে তবলা বাজাইয়া বণিক্য মহাশয় একটি পদক পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তবলায় পারদর্শিতার জন্য (For proficiency in Tabla) হাই কোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল ৺ জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুত উষাকুমুদ্ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে এই পদক প্রদান করেন।

শ্রীযুত ভগবান দাস সেতারী এবং প্রসন্নকুমার বণিক্য মহাশয় একসঙ্গেই মহারাজ শৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর মিউজিক ডাক্তার মহোদয়ের সমক্ষে পরস্পর সেতার ও তবলা বাজান। মহারাজ উভয়ের বাদন কৌশল দৃষ্টেই অত্যন্ত প্রীত হ'ন। বণিক্য মহাশয়ের "তবলা তরঙ্গিনী" পাঠ করিয়া মহারাজ নিজে এবং "বেঙ্গল মিউজিক্যাল স্কুলের অবৈতনিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ৺ কালী প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করেন, এবং মহারাজ তাঁহাকে নিম্নলিখিত সার্টিফিকেট দেন :—

"পাথুরিয়াঘাটা রাজবাটী, কলিকাতা,
২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৬

"ঢাকা নিবাসী শ্রীযুত বাবু প্রসন্ন কুমার সাহা বণিক্য একদিবস আমার বাটিতে তবলা বাজাইয়া ছিলেন, এবং এই সুযোগে আমিও তাহার বাজনা শ্রবণ করিয়াছিলাম। আমি তাহার বাজাইবার সুকৌশল ও নিপুনতা দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছি ও মোহিত হইয়াছি।"

(স্বাক্ষর) শ্রীশৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর।

প্রসন্ন বণিক্য মহাশয়ের একটি পুত্র অতি সুন্দর তবলা শিক্ষা করিতেছিল। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে মাত্র ২২। ২৩ বৎসর বয়সে সে পরলোকে চলিয়া গিয়াছে। বানকোড়ার জমিদার শ্রীযুত হেমচন্দ্র রায় এবং মুড়াপাড়ার জমিদার শ্রীযুত কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় প্রসন্নকুমার বণিক্য মহাশয়ের নিকট তবলা শিক্ষা করিয়াছেন। ইঁহার বর্ত্তমান বয়স অনুমান ৬০বৎসর হইবে। জমিদার হেমচন্দ্ররায় মহাশয় এখনো বিখ্যাত সুপ্রন খাঁর নিকট তবলা শিক্ষা করেন।

শ্রীযুত শ্যাম দাস সেতারী :—ইনি শ্রীযুত ভগবান দাস সেতারী মহাশয়ের সহোদর কনিষ্ঠ ভাই। জ্যেষ্ঠের নিকটই ইনি সেতার উত্তম শিক্ষা করিয়াছেন। সুরবাহার ও এস্রাজ ইনি বেশ বাজান। বর্ত্তমান বয়স ৫৫ বৎসর হইবে।

শ্রীযুত ইন্দ্রমোহন সেতারী :—ইঁহার নিবাস ঢাকা গোয়াল নগর। ইনি সূত্রধর জাতীয়। ইনি প্রথমে শ্রীযুত ভগবান দাস সেতারীর নিকট অল্প কিছুদিন সেতার শিক্ষা করেন। পরে অন্যান্য বহু লোকের বাদ্য শুনিয়া শিক্ষা করেন। নিজ পিতা ৺ বদন সূত্রধরের নিকট ও প্রথমে বাদ্য অভ্যাস করেন। ইন্দ্রমোহন সেতারীও উত্তম সেতার বাজান। ইনি এস্রাজ, সেতার, তানপুরা প্রভৃতি যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া থাকেন। ইহার বর্ত্তমান বয়স প্রায় ৭০ বৎসর হইবে।

শ্রীযুক্ত কালী কুমার মন্ত্রঃ—ইঁহার নিবাস ঢাকা, ফরিদাবাদ। ইনি বর্ত্তমান সময়ে ঢাকার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সারেঙ্গী। একজন পশ্চিম দেশীয় মুসলমান ওস্তাদের নিকট সারঙ্গ শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইহার বয়সও প্রায় ৬০ বৎসর হইবে।

আজকাল বিক্রমপুর কুকুটিয়া গ্রাম নিবাসী শ্রীযুত চারু চন্দ্র দত্ত মহাশয় কএক বৎসর যাবৎ কলিকাতা হইতে আসিয়া ঢাকায় অবস্থিতি করিতেছেন। ইনি কায়স্থকুল-গৌরব দাতা কালী কুমারের পৌত্র এবং ডাক্তার রেবতী মোহন দত্তের পুত্র। চারু বাবু কলিকাতার বিখ্যাত ওস্তাদ শ্রীযুত প্রমথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছেন। কণ্ঠ উচ্চ ও মধুর।

বর্ত্তমান সময়ে সেতারে ভগবান দাস, কণ্ঠ সঙ্গীতে আমুদাদ্ খাঁ, মৃদঙ্গে উপেন্দ্র বসাক, এবং তবলায় প্রসন্ন বণিকা প্রভৃতি মহাশয়গণ যে পর্য্যন্ত জীবিত আছেন সেই পর্য্যন্তই ঢাকার গৌরব। ইঁহাদের অভাবে ঢাকায় উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত ক্ষেত্র তমসাবৃত বলিয়াই অনুমিত হইতেছে। তবে একে বারে নিরাশইবা হইব কেন? কারণ "কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ"—ভবিষ্যতেও বহু গুণীর আবির্ভাব হইতে পারে। এখন ভগবৎ সমীপে আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা যে ইঁহারা যেন আরও বহু বৎসর পর্য্যন্ত স্বাস্থ্যপূর্ণ শান্তিময় জীবন লাভ করিয়া ঢাকাবাসীর আনন্দ বর্দ্ধন করিতে পারেন। সরস্বতীর সঙ্গীতকুঞ্জ যেন সহসা নীরব হইয়া যায় না।

শ্রীযোগেন্দ্র কিশোর রক্ষিত।

গত শ্রাবণ সংখ্যা প্রতিভার ১৭৮ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভের ৬ষ্ঠ পংক্তিতে "৪০" স্থলে "১০" হইবে।

সাহিত্যিকের নানাকথা (৬)

নমু বক্তৃবিশেষ নিঃস্পৃহা গুণগৃহ্যা বচনে বিপশ্চিতঃ।
(৺শশধর)

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্ক চূড়ামণি সম্বন্ধে প্রসঙ্গতঃ মন্তব্য করিতে গিয়া পূর্ব্ববঙ্গেরই পত্রিকা বিশেষে তদীয় নামের পূর্ব্বে "৺" চিহ্ন একাধিক প্রবন্ধে প্রদত্ত হইয়াছিল। পণ্ডিত শশধর পূর্ব্ববঙ্গেরই লোক—তাঁহার সঙ্গে মতের অমিল থাকিতে পারে কিন্তু তিনি যে একজন দেশবিখ্যাত পণ্ডিত এবং বঙ্গের গৌরবের সামগ্রী, একথা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। অথচ এ লোকটি জীবিত না মৃত এ সংবাদ শিক্ষিত স্বদেশবাসী অবগত নহেন। অথচ আমেরিকা বা ইউরোপের কোনও বিখ্যাত মনস্বী সম্বন্ধে এইরূপ ভুল করিলে লেখক লজ্জায় অভিভূত হইয়া ক্রটী স্বীকার করিতেন। এস্থলে কিন্তু এরূপ কিছুই হয় নাই, কেননা এই ভুল দেখাইবার প্রয়োজনীয়তাই উপলব্ধ হয় নাই। জীবিত ব্যক্তিকে মৃত বলিয়া খ্যাপিত করিলে নাকি তাঁহার আয়ু বৃদ্ধি হয়—আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে পণ্ডিত শশধরের দীর্ঘজীবন কামনা করি। বিশেষতঃ এই শ্রেণীর যেটি যায় তেমনটি যে আর হইতেছে না।

নূতনে গোলযোগ।

"একটা নূতন কিছু কর" বলিয়া যিনি হাসির গানে বিদ্রূপ করিয়া গিয়াছেন তিনিই একটা নূতন করিতে গিয়া গোল করিয়াছেন। পূর্ব্বে নাটকের প্রারম্ভে "নাট্যোল্লেখিত ব্যক্তিগণ" বলিয়া নাটকে বর্ণিত নর নারীর পরিচয় দেওয়া হইত। দ্বিজেন্দ্রলাল তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া তৎস্থলে "কুশীলব" লিখিয়া নূতনত্ব প্রদর্শন করিলেন, কিন্তু "কুশীলব", শব্দে যে কি বুঝায় সে দিকে খেয়াল করেন নাই। 'কুশীলব' অর্থ যাহারা অভিনয় করে—অভিনয়ের বিষয়ীভূত স্ত্রীপুরুষ এতদ্বারা বুঝায় না।

আজকাল খবরের কাগজে নাটকাভিনয়ের বিজ্ঞাপনে মধ্যে মধ্যে কুশীলবদের নামও ঘোষিত হইয়া থাকে *

১৫ বৎসরে বি, এ, পাস।

এই কবিরই নাটক-বিশেষে একটি পঞ্চদশ বর্ষীয়া বালিকাকে 'বি, এ, পাস্' দেখান হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য বা জন্ ষ্টুয়ার্টমিল্ তো সচরাচর দেখা যায় না যে অত্যল্প বয়সেই পণ্ডিত হইয়া উঠিবে। তা শঙ্করাচার্য্যও যদি মেট্রিকুলেশন দিতেন, তবে তাঁহাকে ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইত। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে মধ্যযুগে বয়সের কোনও বাঁধাবাঁধি ছিল না—কিন্তু তখনও ১৩। ১৪ বৎসরের কমে এণ্ট্রেন্স্ পাস্ হইত বলিয়া দেখা যাইত না। যাহা 'সাধারণতঃ' ঘটে, কবি তাহাই দেখাইবেন—তাই পঞ্চদশবর্ষীয়াকে এণ্ট্রেন্স পাস দেখাইলেই যথেষ্ট হইত। অথবা বি.এ, পাস দেখাইতে হইলে বালিকার বয়স অগত্যা 'অষ্টাদশ' করিলেই ত কোনও গোল বাঁধিত না। বরং ইহাতে গ্রন্থের স্থলবিশেষের অর্থ সৌষ্ঠব অধিকতর হইত। যথা "যখন ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত তাহার অবিবাহিতাবস্থায় রেখেই তাকে শিক্ষা দিয়েছ, তখন অন্ততঃ তার ভবিষ্যৎ বিষয়ে তার মতকে অগ্রাহ্য করতে পার না।" পঞ্চদশ বর্ষীয়ার অপেক্ষা অষ্টাদশ বর্ষীয়ার "ভবিষ্যৎ বিষয়ে" মতামত সমধিক গ্রাহ্য।

কালিদাসের 'পুলিশ'।

আমি সর্ব্বদাই শকুন্তলার ষষ্ঠ অঙ্কের প্রবেশকে চিত্রিত "পুলিশ" সিনটাকে নাটকের সর্ব্বাপেক্ষা উপাদেয় বস্তু বলিয়া মনে করি। এমন 'সজীব চিত্র' দ্বিতীয়টি আর দেখি না। দু হাজার বৎসর পরেও যেন ইহা ঠিক 'জীবন্ত ছবি' বলিয়া প্রতীত হয়। আজকাল পুলিশের যেরূপ নির্ম্মম আচরণ উৎকোচ গ্রহণ ও মদ্যপান ইত্যাদি মধ্যে মধ্যে—কালিদাসের সময়েও পুলিশের সেইরূপ অবস্থা লক্ষিত হইত। চোর বলিয়া ধৃত ও তাড়িত মৎস্যজীবী—গোধাদী বিপ্রকী যে জ্ঞানগর্ভ কথা বলিয়াছে, যেরূপ উদারতা দেখাইয়াছে, নীচজাতীয় রক্ষিদ্বয়েতো তাহা নাই-ই, অপিতু রাজশ্যালক—অতএব ভদ্র জাতীয়—নগরপালও তাদৃশ চরিত্রবলসম্পন্ন বলিয়া বোধ হইল না। রাজশ্যালকের বিদ্যার পরিচয় প্রাকৃত ভাষা ব্যবহারেই বুঝা গিয়াছে; ভগিনীর খাতিরে চাকুরি জুটিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এখনও পুলিশ বিভাগের চাকরি এইরূপ খাতির অনুরোধেই জুটে; উচ্চপদস্থ সিভিলিয়ানদের ছেলে-পিলে যারা অন্য বিভাগে চাকরি করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করে নাই, তারাই প্রায়শঃ সুপারিণ্টেণ্ডেট অব্ পুলিস হইয়া থাকে। যেমন এখন, তেমন তখনও যে পুলিশ বিভাগে ঐরূপ ভাব-স্বভাব দেখা যায় তাহার শাশ্বত কারণ এই যে পুলিশের লোককে চোর বদমাইশ প্রভৃতি নিয়া কারবার করিতে হয়। দৃঢ়হস্তে ঐ সকলকে শাসনে রাখিতে হয় অথচ এত ক্ষমতা পাইয়াও আত্মসংযম করিবার নিমিত্তে যতটুকু শিক্ষাদীক্ষার প্রয়োজন অনেক স্থলেই তাহার অভাব থাকে। তাই উৎকোচ গ্রহণ মদ্যপান ইত্যাদিতে অনেকেই আসক্ত হইয়া পরে। রক্ষী অর্থাৎ পাহারাওয়ালার কাজেতো বিদ্যাবুদ্ধি অপেক্ষা গায়ের জোরই অধিকতর প্রয়োজন। এ অবস্থায় এতদপেক্ষা ভাল ফল কিরূপে প্রত্যাশা করা যায়?

ভাগাড়ে নজর।

সেদিন একখানি বাঙ্গলা পুস্তক দেখিলাম—লেখাটি বেশ। বিষয়ও নীতিধর্ম্মমূলক। পাঠ করিলে উপকার হইবারই কথা। তারপর 'ইনার টাইটেল পেজ' খানিতে দেখা গেল দুই দিকে দুটুকরা কাগজের বেষ্টনী

---

* আর একজন বিশিষ্ট লেখকের প্রণীত উপন্যাস বিশেষে দেখিয়াছিলাম "শিংশপা' মা'নে "শিমুল"। একখানি বিশিষ্ট পত্রিকায়ও শ্লীলতা অর্থে "শালীনতা" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছিল। লেখকগণ মধ্যে মধ্যে অভিধান খুলিয়া দেখিলে এ সকল বিড়ম্বনা ঘটে না।

আছে। * উপক্রমণিকাগের খণ্ডে লেখা আছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অমুক পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত, এবং নীচের খানিতে পূর্ব্ব মূল্য ছাপা দিয়া দেড়গুণ মূল্য নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত গ্রন্থ পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, মূল্যটা কম ধরা হইয়াছিল; যখন অধিকতর বিক্রয়ের সম্ভাবনা হইল, তখন দেড়গুণ করা হইল। গ্রন্থকার পুস্তকখানিতে লোকসাধারণকে সংযমের সাধনারও উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু নিজে কিরূপ আচরণ করিলেন, দেখুন। পরমহংস রামকৃষ্ণ বলিতেন—শকুনি যতই কেন উর্দ্ধে বিচরণ করুক না—নজরটা থাকে ভাগাড়ের দিকে। ফলতঃ দেশের অবস্থা দেখিলে বড়ই দুঃখ হয়।

পাঠ্যপুস্তকের মূল্য।

পুস্তক পাঠ্য করিবার সময়ে ছাত্রহিতৈষীরা মূল্যের প্রতিও দৃষ্টি রাখেন, এটা বাঞ্ছনীয় এবং কোনও কোনও স্থলে সুলভতার দিকেও কর্তৃপক্ষীয়ের নজর রাখার কথা শুনিয়াছি। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন পাঠ্য গ্রন্থের মূল্য দেখিলে বোধ হয় কর্ত্তারা ছাত্রদের হিত অপেক্ষা গ্রন্থকর্তৃবিশেষের উপকার সাধনই যেন কর্ত্তব্য মনে করিয়াছেন। সেদিন তাদৃশ একখানি পুস্তকের মূল্য দেখিলাম ৮০। কিন্তু একদিকে ৮০ পয়সা ও অপরদিকে পুস্তকখানি রাখিয়া ওজন করিলে বোধ হয় পুস্তকের ভারেই কম দেখা যাইবে। মলাটের বেশ বাহার আছে বটে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীরা কচি ছেলে নয় যে তাহাদের পাঠ্যে চক্‌চকে মলাটের আবশ্যক হইবে।

মাসিকে শুদ্ধি পত্র।

পুস্তকের ন্যায় মাসিক পত্রগুলিতে প্রবন্ধ সূচি থাকে কিন্তু শুদ্ধি পত্র থাকে না। আমার বোধ হয় মাসিক—দ্বৈমাসিক—ত্রৈমাসিক প্রভৃতি যে সকল পত্রিকা গ্রাহকগণ বাঁধাইয়া রাখেন, সেগুলির শুদ্ধিপত্র থাকা একান্ত আবশ্যক। 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা', 'প্রতিভা' প্রভৃতি কয়েকখানি ভিন্ন আর কোনও পত্রিকার অধ্যক্ষগণ প্রবন্ধ লেখকের নিকটে প্রুফ পাঠান না। অথচ সাহিত্য'ভারতবর্ষ''প্রবাসী' প্রভৃতি দু'চারিখানি উচ্চাঙ্গের পত্রিকা ভিন্ন অপর পত্রিকার পরিচালকগণ ভাল করিয়া প্রুফই দেখেন না। দেখা যায়, পত্রিকার সম্পাদক একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি—ইংরেজী ও বঙ্গভাষায় তথা সংস্কৃতে কৃতী—তথাপি তৎসম্পর্কিত পত্রিকায় বিস্তর ভুল থাকিয়া গেল। কোনও বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত যে পত্রিকার অধ্যক্ষ তাহাতে দেখা গেল সামান্য সংস্কৃত শ্লোকে লজ্জাজনক ভুলসহ প্রবন্ধ ছাপান হইয়াছে। পত্রিকা সম্পাদন কার্য্য সুতরাং সকল স্থলে বিশেষ সাবধানে করা হয় না—তাই ভুল ভ্রান্তি বহু থাকিয়া যায়। এজন্য লেখকগণও যে অনেকটা স্বয়ং দায়ী, অনেকের হাতের লেখাও যে অস্পষ্ট—তাহাও স্বীকার্য্য। তথাপি সম্পাদক মহোদয়গণ যত্ন করিলে ছাপার ভুল অনেকটা সংশোধন করিয়া দিতে পারেন। সে যাহা হউক ভুল ভ্রান্তি থাকিলেই—বিশেষতঃ মফঃস্বলের লেখকদের প্রবন্ধে—কেননা কলিকাতার লেখকগণ স্বয়ং প্রুফ্ দেখার সুবিধা হয়তো অনেক স্থলেই ইচ্ছা করিলে পাইতে পারেন। অতএব শুদ্ধি পত্রের প্রথা থাকিলে প্রবন্ধ লেখকগণ স্বীয় প্রবন্ধের ভুল ভ্রান্তিগুলি পত্রিকাধ্যক্ষগণের নিকটে লিখিয়া পাঠাইতে পারিতেন। পত্রিকা বাঁধাইবার সময়ে সূচিপত্রের সঙ্গে ঐ শুদ্ধিপত্রও সংরক্ষিত হইত। ইহাতে পত্রিকা পরিচালকগণের কিঞ্চিৎ ব্যয়াধিক্য হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু বিষয়টি প্রয়োজনীয় বটে, এবং তদর্থে অর্থব্যয় ও শ্রমস্বীকার কর্ত্তব্য মনে করি।

কস্তচিদ্বিদ্যাবিনোদস্য।

---

* বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ যে কতদূর ছাত্রহিতৈষী, পরীক্ষাগুলির ফিস্ বৃদ্ধিতেই তাহা বুঝা গিয়াছে।

গ্রন্থ সমালোচনা

১। **পরিণাম**। উপন্যাস, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্ প্রকাশিত আটআনা সংস্করণের অষ্টত্রিংশ গ্রন্থ। ডবল ক্রাউন ফুলসকেপ ষোড়শাংসিত, ১৫৯ পৃষ্ঠা, মূল্য ॥০। ছাপা কাগজ, বাঁধাই বেশ। শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম, এ, প্রণীত। মৃত্যুর কথা লইয়া পুস্তক খানির আরম্ভ। রামপ্রসন্ন মিত্র, নেটিভ খৃষ্টান, ছোট আদালতের জজ। দীর্ঘকাল রোগভোগ করিয়া তিনি মারা গিয়াছেন। জজ, মুন্সেফ ও উকীল মহলে তাহা লইয়া আলোচনা হইতেছে, তাঁহার তিরোধানে জজ, মুন্সেফদের কাহার কিরূপ পদোন্নতির সম্ভাবনা,-ইত্যাদি ইত্যাদি। সবজজ মনোহর বাবু রামপ্রসন্ন বাবুর আবাল্য সুহৃদ। দ্বিতীয় মুন্সেফ রমণ বাবুও কার্য্যক্ষেত্রে রামপ্রসন্ন বাবুর সহিত সখ্যতা সূত্রে আবদ্ধ। উভয়ে রামপ্রসন্ন বাবুর শোক সন্তপ্ত পরিবারের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে গেলেন। বন্ধুর এই অকস্মাৎ তিরোধানে তাহাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রা যেন কোনরূপে ব্যাহত না হয়, এমন কি সান্ধ্য তাস খেলাটাও যাহাতে একদিনের জন্যও মাটি না হয় সেই বিষয়ে উভয়ের সতর্কতার বর্ণনা উপভোগ্য। সদ্য বিধবা স্ত্রীর এবং সদ্য পিতৃহীন পুত্র ও কন্যার বাহ্য শোক প্রকাশ ও অন্তরের বিরক্তিও কম উপভোগ্য নহে।

তাহার পরে রামপ্রসন্ন বাবুর কর্ম্ম জীবনের ইতিহাস আরদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার কোর্টশিপমূলক বিবাহ, বিবাহের পর দুইবৎসর যাইতে না যাইতেই দাম্পত্য জীবনের সমস্ত সুখ শান্তির অন্তর্দ্ধান, শান্তির আশায় রামপ্রসন্ন বাবুর সরকারী চাকরীর কর্ত্তব্যাবলীকে দৃঢ়রূপে আকড়িয়া ধরা, ইত্যাদি ইত্যাদি। অনেক দূর পর্য্যন্ত পড়িতে পড়িতে পাঠকের প্রাণ হাঁপাইয়া উঠে। কি উদ্দেশ্যে যে গ্রন্থকার এই সব খাবিশের উপর দিয়া পাঠককে হেঁচড়াইয়া লইয়া চলিয়াছেন তাহা বুঝা দায় হইয়া উঠে। কিন্তু যখন হইতে রামপ্রসন্ন বাবু দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত হন এবং বধ দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত অপরাধীর মত মৃত্যুর অপেক্ষা করিতে থাকেন তখন হইতেই পুস্তক ভয়ঙ্কর চিত্তাকর্ষক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রোগের সহিত তাঁহার যুদ্ধ; কৃত্রিম আচার ব্যবহারের কবলীকৃত সামাজিক জীবের নিজের ও সমাজের ব্যক্তিবর্গের হাতে সহস্র রকমের উৎপীড়ন; পরিজনবর্গের স্বার্থসর্ব্বস্ব হৃদয়হীন ব্যবহার; আত্মীয়দের তথাকথিত কর্ত্তব্যপালনের শান্তিপ্রদানে ঐকান্তিক ব্যর্থতা; সত্যপথের নিষ্ফল অনুসন্ধান; গ্রাম্যভৃত্য হারাধনের সরলতার সহিত সভ্যসমাজের কপট ব্যবহারের মর্ম্মবিদারক পার্থক্য ইত্যাদি অত্যন্ত নিপুণতার সহিত দেখান হইয়াছে। গুরুদাস বাবুর ভাষাটি দুর্ভাগ্যক্রমে তেমন সতেজ, সহজ, অব্যাহিত-প্রবাহ নহে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বর্ণনা কুশলতার মর্য্যাদা বিশেষ ক্ষুন্ন হয় নাই। পুস্তকের শেষাংশ পড়িতে পড়িতে আমাদের কেবলি রুস উপন্যাসিক ভট্‌ভেস্কির অপূর্ব্ব কলাকুশল রচনাগুলি মনে পড়িয়াছে। আর একটি কথা মনে হইয়াছে, গুরুদাস বাবু ক্ষমা করিবেন, না বলিয়া পারিলাম না। কেবলি মনে হইয়াছে, বহিখানি যেন বিদেশী ভাষা হইতে অনুদিত বা বিদেশী পুস্তক অবলম্বনে লেখা *। অবশ্য ভাষার জড়তা কতকটা এই ধারণার জন্য দায়ী। গ্রন্থখানি যদি গুরুদাস বাবুর সম্পূর্ণ নিজস্ব হইয়া থাকে তবে ভবিষ্যতে গুরুদাস বাবুর নিকট হইতে খুব ভাল জিনিস পাইব বলিয়া আশা রহিল।

---

* এই সমালোচনা লেখা হওয়ার পরে প্রতিভা সম্পাদকের নিকট অবগত হইলাম যে গুরুদাস বাবু পত্র-যোগে তাহাকে জানাইয়াছেন যে পুস্তকখানি রুষ উপন্যাসিক টলষ্টয়ের কোন গ্রন্থাবলম্বনে লিখিত। এই

বিলাতী পুস্তকের আর একটি লক্ষণ এই পুস্তকে বিদ্যমান। ইহাতে জীবনের গুরুতর সমস্যার বিচার আছে,—অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবেই আছে,—কিন্তু সমাধানের কোন চেষ্টা নাই। গ্রন্থশেষে সমাধানের যে আভাস আছে তাহা একেবারেই যথেষ্ট নহে।

শ্রীন্যায়পাশিক।

২। **নারীর উক্তি**। শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী প্রণীত। আকার ৫½×৪½ ইঞ্চি,আর্ট পেপারে সুমুদ্রিত, ও উত্তম বাধাই। ১৫৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৲। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী, এম, এ, বার, এট্-ল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সাতটি প্রবন্ধের সমষ্টি। প্রবন্ধগুলি মাসিক পত্রিকাতে বাহির হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়; তখন পড়িয়াছি কিনা মনে পড়িতেছে না। এখন সমালোচনার জন্য একবার এবং প্রবন্ধ গুলির গুণ গৌরবে মুগ্ধ হইয়া একাধিকবার সাগ্রহে পড়িয়া মনে হইতেছে যে পূর্ব্বে না পড়িয়া থাকিলে ভাল করি নাই। আমাদের মাসিক পত্রগুলি এক পাঁচ মিশালি ব্যাপার। তাহাদের পাঁচ রকমের পাঁচটা প্রবন্ধ এক নিশ্বাসে পড়িয়া উঠিয়া, পরে কোনটার কথাই মনে থাকে না,—যদি না তাহাদের মধ্যে বিশেষ কোনটা মনের উপর বেশ একটু গভীর ছাপ রাখিয়া যাইতে সমর্থ হয়। পূর্ব্বে যদি পড়িয়া থাকি তবে এই প্রবন্ধগুলির কথা মনে থাকা উচিত ছিল, কারণ এই রচনা গুলিতে, এক অনুদিত গ্রীস ও রোমছাড়া আর সমস্তগুলির মধ্যেই এমন কিছু আছে যাহা মনের উপর দাগ বসায়।

আজকাল এই শ্রেণীর রচনা একটু দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে। আজকাল কেহ লিখেন ভাষাতত্ত্ব, কেহ বা জাতিতত্ত্ব, কেহ প্রত্নতত্ত্ব, কেহ শুধুই তত্ত্ব;—কিন্তু সত্যের হৃদয়গ্রাহী প্রকাশে বক্তব্য নিজের মনের কথা গুলিকে এই ভাবে আজকাল আর কাহাকেও গুছাইয়া বলিতে দেখি না। রবীন্দ্রনাথের গদ্য প্রবন্ধগুলির মত সমৃদ্ধ না হইলেও তাহাদের উক্তগুণটি এই প্রবন্ধগুলিতে প্রচুর আছে।

মেঘ বর্ষণের সহিত এই শ্রেণীর রচনাগুলি উপমিত হইতে পারে। হৃদয়ে আবেগ সঞ্চিত হইল, মনের আকাশে কতকগুলি সরস কথা ঘনাইয়া আসিল, বর্ষণ আরম্ভ হইল, মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল। এইরূপ বিদ্যুৎ চমকানের ঘন ঘন সম্ভাবী আকস্মিক উজ্জ্বলতা মেঘবর্ষণের, তথা রচনার মনোমদ অলঙ্কার। আধুনিককালের কলে প্রস্তুত সাহিত্যে তাহা দুর্লভ দর্শন হইতেছে।

প্রবন্ধ গুলির মধ্যে মধ্যে বীরবলিয়ানা দেখিয়া হঠাৎ এই গুলি বীরবলের রচনা বলিয়া ভ্রম হয়। কিন্তু পরক্ষণেই স্নেহকোমল মঙ্গলকামনা পূর্ণ কণ্ঠ শুনিতে পাইয়া নিজের ভুল বুঝিতে পারা যায়। বীরবলের কথায় বিদ্রোহ জাগে কিন্তু এই নারীর উক্তিতে মতভেদ সত্ত্বেও বিদ্রোহের অবকাশ নাই। কারণ ইহাঁকে অনাত্মীয়া বলিয়া মনে করিয়া লওয়া কঠিন। আমরা এই নারীর উক্তি মাথা নোয়াইয়া শুনিয়াছি, শুনিয়া আনন্দ পাইয়াছি এত পাইয়াছি যে শীঘ্র এইরূপ পাই নাই।

গুণের আদর থাকিলে এই গ্রন্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বিশেষতঃ ছাত্রীদিগের পাঠ্য রূপে দেখিতে পাইব বলিয়া আশা করিতে পারি। বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষা বিচার, সম্বন্ধ, আদর্শ ও ভদ্রতা,—এই চারিটি এই গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ। পড়িয়া যে কেহ আনন্দ পাইবেন। শিক্ষিতা নারী, বিশেষতঃ কিশোরীগণের অবশ্য পাঠ্য।

শ্রীন্যায়পাশিক।

উহা জানিবার আগেই আমি যে ইহা অনুমান করিতে পারিয়াছিলাম এই জন্য আনন্দ হইতেছে। ন্যায়-পাশিক।

৩। স্বস্তিকা। ছোট কবিতার সমষ্টি। শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। আকার ৫২×৪২ ইঞ্চি। সাধারণ রকমের ছাপা কাগজ ও বাঁধাই। ১১২ পৃষ্ঠা মূল্য ।৶০। মঙ্গলাভিসারী, মৃদু, দুই একস্থানে হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু ভাব, ভাষা ও ছন্দ অধিকাংশ স্থানেই বিশেষত্বহীন।

শ্রীন্যায়পাশিক।

ভারতের আর্য্য ও অনার্য্য।
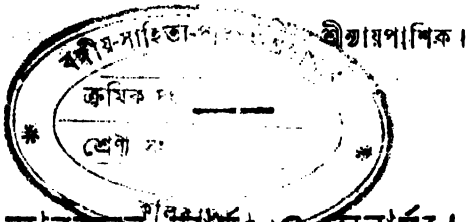
চতুর্থ প্রস্তাব,—ভারতীয় মত, প্রথম অংশ।

চতুর্থ প্রস্তাব আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে তৃতীয় প্রস্তাবের ("প্রতিভার" গত চৈত্রসংখ্যা) অন্তর্গত ৪৮৮ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভের একটী মুদ্রাকর প্রমাদের সংশোধন করিতেছি। ঐ স্তম্ভের উপর হইতে তৃতীয় পংক্তিতে "আর্য" শব্দের অর্থ মহাকুল, কুলীন, সভ্য, সজ্জন ও সাধু বাক্যটি মুদ্রিত হইয়াছে কিন্তু প্রথমেই "আর্য" স্থলে "অর্য" ছাপা হইয়াছে। বিজ্ঞ পাঠকগণ অবশ্য এই ভুল বুঝিয়া তাহার সংশোধন করিয়াছেন; তথাপি, আমার কর্ত্তব্য বোধে ইহার উল্লেখ করিতে হইল। কারণ, ম্যাকসমুলার প্রমুখ পণ্ডিতগণ "আর্য"কে "অর্য" ভাবিয়া, "মহাকুল প্রভৃত সজ্জন"কে "চাষা" করিয়াছেন।

যাহা হউক, গত প্রস্তাবে আমরা দেখিয়াছি যে য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ "আর্য" শব্দের Aryan অনুবাদের দ্বারা "পৃথিবীর এক বিশেষ ভাষাভাষী জাতিব্যূহ" এবং "এক বিশেষ মানব জাতি"—এই উভয়বিধ অর্থই বুঝিয়াছেন। সংস্কৃত, পারসীক, গ্রীক এবং লাতিন এই কয়টি মূল ভাষা এবং উহাদের হইতে উদ্ভূত বহুতর শাখা ভাষায় যে সকল মানব জাতি কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে য়ুরোপীয় পণ্ডিতবর্গের মধ্যে অনেকেই "আর্য" জাতি বলিয়া থাকেন; আবার শ্বেতকায়, দীর্ঘ ঘোণ, দীর্ঘকরোটিক, শ্মশ্রুবহুল, উচ্চদেহ মানবজাতি বিশেষকেও তাঁহাদের অনেকে "আর্যজাতি' বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের আর একটি বিশ্বাস বলবৎ আছে যে, যে দেশে এই জাতির আদিম বাসস্থান ছিল, সেই দেশের সকল অধিবাসীই এই জাতির অন্তর্গত ছিল। আর্যজাতির আদিম বাসস্থানে যে সে কালে কোন আর্যেতর জাতি বাস করিত, একথা তাঁহারা স্বীকার করেন না। এইরূপ ভাবেই তাঁহারা আর্য, সেমিটিক ও তুরাণীয়, ইত্যাদি জাতির বিভাগ স্থির করিয়াছেন।

ভারতীয় মতে "আর্য" শব্দে কাহাদিগকে বুঝাইত, তাহাই আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়। প্রথম প্রস্তাবে "ভারতবর্ষের" এবং দ্বিতীয় প্রস্তাবে "আর্যাবর্ত্তের" ভৌগোলিক পুরাতন সংস্থান আমরা যথাসাধ্য নির্দ্দেশ করিয়াছি। "ভারতবর্ষ" সেকালে যে কতবড় এক মহাদেশকে বুঝাইত, তাহার উল্লেখ করিয়াছি এবং "আর্যাবর্ত্ত" শব্দেও যে অতি বিস্তৃত এক দেশকে বুঝাইত তাহারও আভাস আমরা দিয়াছি। এক্ষণে এই বিস্তৃত "আর্যাবর্ত্ত" এবং বিস্তৃততর "ভারতবর্ষে" সে কালে "আর্য" শব্দে কাহাদিগকে বুঝাইত, এক্ষণে তাহা বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি।

প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রাচীন যুগে যে ভাষা সভ্য সজ্জনগণ ব্যবহার করিতেন, তাহারই আধুনিক নাম বৈদিক ভাষা এবং সে কালে ঐ ভাষার যে সকল অপভ্রংশ ভাষার প্রচলন ছিল, তাহাদের একটিই এক্ষণে "স্লেচ্ছ" ভাষা বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। বৈদিক যুগে স্লেচ্ছ ভাষাকে ম্লেচ্ছ-ভাষা এবং ঐ ভাষা ভাষীকে ম্লেচ্ছ এবং অসুর বলিত এরূপ অনুমান করিবার কারণ আছে। আমরা প্রথমে ইহার একটু প্রমাণ দিবার চেষ্টা করিতেছি।

পাণিনি ব্যাকরণের "মহাভাষ্যের" ভূমিকায় মহর্ষি পতঞ্জলি ব্যাকরণ শাস্ত্রাধ্যয়নের আবশ্যকতা বুঝাইতে গিয়া বলিতেছেন,—

"তে হসুরাঃ। তে হসুরা হেলয়ো হেলয়ো ইতি কুর্বন্তঃ পরাবভুবুঃ।" তস্মাদ্ ব্রাহ্মণেন ন ম্লেচ্ছিত বৈ নাপ ভাষিত বৈ। ম্লেচ্ছো হ বা এষ যদপশব্দঃ। ম্লেচ্ছা মা ভূমেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্ ॥ তে হসুরাঃ ॥" *

ইহার মর্ম্ম:—তাহারা অসুর। সেই অসুরেরা হে অলয় অলয় (অরয়ঃ শত্রু স্থলে) এইরূপ বলিতে বলিতে পরাজয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই জন্য ব্রাহ্মণের পক্ষে ম্লেচ্ছভাষা অথবা অপভাষা প্রয়োগ করা উচিত নহে। যাহা অপশব্দ অথবা অশুদ্ধ শব্দ তাহাকে ম্লেচ্ছ ভাষা এবং যাহারা উক্ত ম্লেচ্ছ ভাষার ব্যবহার করে তাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলে। যাহাতে আমরা ম্লেচ্ছ হইয়া না যাই, সেই জন্যই ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে হয়। যাহারা ম্লেচ্ছভাষী, তাহারা অসুর।

মহাভারতের আদিপর্ব্বে জতুগৃহ পর্ব্বাধ্যায় আরম্ভ হইবার সময়ে যখন যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা মাতা কুন্তীর সহিত দুর্য্যোধনের ছলনায় বারণাবত যাইতেছিলেন, সেই সময়ে মহামতি বিদুর অন্যের অবোধ্য ম্লেচ্ছ ভাষায় যুধিষ্ঠিরাদির প্রাণরক্ষার জন্য কতকগুলি অতি মূল্যবান্ উপদেশ দিয়াছিলেন †। ভগবান্ বেদব্যাস অবশ্য সেই সকল উপদেশ সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করিয়াই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; তথাপি, তাঁহার সেই সংস্কৃত ভাষার শ্লোক হেঁয়ালির মত হইয়াছে। মহাভারতের টীকাকার অসাধারণ পণ্ডিত নীলকণ্ঠ ঐ শ্লোকের টীকামুখে "ম্লেচ্ছ ভাষা"র লক্ষণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা মহাভাষ্যের উদ্ধৃতাংশেরই মত; তবে তিনি আরও দুইটি বৈদিক প্রমাণ অধ্যাহার করিয়াছেন। প্রস্তাবের বাহুল্য ভয়ে ঐ প্রমাণ এই স্থলে উদ্ধার করিলাম না। ফলতঃ তৎকালে প্রচলিত ভাষার অপ প্রয়োগকেই যে "ম্লেচ্ছ ভাষা" বলিত, এবং ম্লেচ্ছভাষা ভাষিগণের সম্প্রদায় বিশেষকে অসুর বলিত তাহা নীলকণ্ঠও বলিয়াছেন। আমাদের তৃতীয় প্রস্তাবের ৪৮৬ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভে আমরা দেখিয়াছি যে সংস্কৃত ভাষার "আর্য" শব্দ জেন্দ ভাষায় "ঐর্য" এবং প্রাচীন পারসীক ভাষায় "আরিয়া" রূপে ব্যবহৃত হইত। "ম্লেচ্ছ" নামক প্রস্তাবে আমরা এই বিষয়ের বিস্তৃততর ভাবে আলোচনা করিয়াছি সুতরাং এখানে আর অধিক লিখিবার আবশ্যকতা নাই।

অগ্নিদেবের উপাসক বর্ত্তমান বোম্বাই ও গুজরাত প্রভৃতি প্রদেশ-প্রবাসী পারসীক জাতির ধর্ম্মগ্রন্থ "আবেস্থার" ভাষা যাঁহারা বৈদিক ভাষার সহিত মিলাইয়া পাঠ করিবার সুবিধা পাইয়াছেন, তাঁহারা উভয় ভাষার মধ্যে ঐক্য দেখিয়া স্থির করিয়াছেন যে অতি পূর্ব্বকালে এই দুইটি ভাষা অতিশয় ঘনিষ্ট সম্বন্ধে সম্বন্ধ ছিল এবং এই উভয় ভাষার ব্যবহারকারী বৈদিক আর্য এবং প্রাচীণ পারসীক জাতিও পরস্পর অতি নিকট জ্ঞাতিত্ব বন্ধনে বদ্ধ ছিলেন। এদেশে বৈদিক সাহিত্যেরই রীতিমত অধ্যাপনা অধ্যয়ন একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে, জেন্দ,পহ্লবী এবং প্রাচীন পারসীক প্রভৃতি ভাষার ত কথাই নাই। বৈদিক সাহিত্যের উত্তমরূপ অনুশীলনের সহিত জেন্দ, পহ্লবী এবং পারসীক ভাষার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার নিমিত্ত দেশে একটি বিশেষসহায় সম্পদশালিনী সমিতির প্রতিষ্ঠা হইলে তবে আমাদের দেশের প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস সঙ্কলন করিবার উপায় হইতে পারে। তদুপরি, মেসোপোটেমিয়া অথবা প্রাচীম কালডিয়া, এসিরিয়া, বাবেলোনিয়া এবং মিসরের মধ্যে যে সকল উপাদান এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, ভারতীয় বিশাল সভ্যতার দিক হইতে ঐ সকল উপাদান ব্যবহার করিতে পারিলে তবেই আমাদের আশা সফল হইতে পারে। আমার ধৃষ্টতা যে, অস্মদেশীয় প্রাচীন অথবা নবীন ভাষার কথা

* "ব্যাকরণ-মহাভাষ্য" বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট সংস্করণ, প্রথম ভাগ দ্বিতীয় পৃষ্ঠা।

† আদিপর্ব্ব, ১১৪ অধ্যায়।

দূরে থাকুক, স্বদেশের বৈদিক সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার যোগ্যতাও আমার নাই,অথচ আমি মহাভারতের মহা সভ্যতার ইতিহাসের প্রথম তত্ব "আর্যত্ব" সম্বন্ধে অনুশীলন করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছি। আমার মত বিচার-বিমূঢ় সাহসিককে লক্ষ্য করিয়াই কবি শিরোমণি কালিদাস বলিয়াছিলেন,—

" বিফল করমে প্রয়াস যাহার—
সে জন নিশ্চয় লভে অপমান।" *

যাউক সে আক্ষেপ। যাহা নাই, হইবার আশাও নাই, তাহার জন্য দুঃখ করিয়া কি হইবে? বৈদিক সাহিত্যে আমাদের মত লোকের প্রবেশ করিতে যাওয়া এক মহা বিড়ম্বনার বিষয়। নিরুক্তকার যাস্কঋষি প্রথমেই বলিতেছেন যে বেদের শব্দরাশির যৌগিক অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে; সুতরাং ভাষ্যকার অথবা টীকাকার-দিগের স্বার্থ উদ্দেশ্য, এবং ব্যাকরণ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের গভীরতার অনুপাতে বেদবাক্যের নানা প্রকার অর্থভেদ হইয়াছে। "ইন্দ্র" শব্দে একজন বলিতেছেন স্বনাম-খ্যাত "দেবরাজ", অন্যে বলিতেছেন "বর্ষণকারী আকাশ" ;—"অশ্ব" শব্দে একজন বলিতেছেন "বিখ্যাত পশুবিশেষ" অন্যে বলিতেছেন –"রাষ্ট্র" সুতরাং প্রত্যেক বেদমন্ত্রের আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ অর্থ ত আছেই, আবার তদুপরি অদ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাদী এমন কি নিরীশ্বর-বাদী পর্য্যন্ত আপন আপন মতের অনুকূল অর্থ করিয়াছেন। পুনরপি যুরোপীয় পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যের প্রবল প্রতাপে বেদ নিতান্ত নিরক্ষর গ্রাম্য চাষার মুখনিঃসৃত জড় বস্তুর স্তুতিবাদে পরিণত হইয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে আমার মত অজ্ঞ লোকের পক্ষে বেদ-বিবাদে অগ্রসর না হওয়াই কর্ত্তব্য; এবং আমি তাহাই করিয়াছি। বর্ত্তমান প্রস্তাবসংকলনে পারতপক্ষে আমি বেদের সংহিতা ভাগের প্রমাণ অধ্যাহার করি নাই।

অথচ আমি "ভারতীয় মতের" 'পরিচয় দিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, "প্রাচীন ভারতীয় মত" বলিতে বৈদিক মতকেই বুঝাইয়া থাকে এবং বেদই প্রাচীন ভারতে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। বেদ অপৌরুষের অর্থাৎ ব্রহ্মের নিকট হইতে প্রাপ্ত সুতরাং স্বতঃপ্রমাণ বলিয়া আর্য্য ঋষিগণের সর্ব্বশাস্ত্রে পূজিত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায়, বেদকে পরিত্যাগ করিলে, আমাদের কথার মূল্য কি? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিব যে ঋষিগণ যে স্মৃতি পুরাণ ও ইতিহাস শাস্ত্রকে বেদের অনুবন্ধ মাত্র বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, আমরা সেই প্রমাণ অবলম্বন করিয়াছি। স্মৃতিশাস্ত্র-সমূহের মধ্যে মনুসংহিতার আসন সর্ব্বোচ্চ এবং মহাভারত "ইতিহাস" পদবাচ্য। মনুসংহিতায় লিখিত হইয়াছে যে মনু মহারাজ সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্ববেদোময় আর মহর্ষি বেদব্যাস মহেতিহাস মহাভারতের আরম্ভ মুখেই বলিয়াছেন,—

"ইতিহাস এবং পুরাণ-শাস্ত্রদ্বারা বেদ-বাক্যের পুষ্টি সাধন করিতে হয় এবং বেদ অল্পবিদ্যজনগণের নিকট ভীত হন যে পাছে উহারা তাঁহাকে প্রহার করে।" *

সুতরাং যে স্মৃতি পুরাণ এবং ইতিহাস গ্রন্থাবলীর উপাদেয়তা আমাদের দেশের সকল পণ্ডিতেরাই স্বীকার

---

* গ্রন্থকার কৃত অনুবাদ। মূলটি এই
"কে বা নস্যুঃ পরিভবপদং নিষ্ফলারম্ভ যত্নাঃ ॥৫৪॥"
পূর্ব্বমেঘ। মেঘদূত।

* "যঃ কশ্চিৎ কস্যচিদ্ধর্ম্মো মনুনা পরিকীর্ত্তিতঃ।
স সর্ব্বোঽভিহিতো বেদে সর্ব্বজ্ঞানময়ো হি সঃ ॥৭॥
মনুসংহিতা দ্বিতীয় অধ্যায়।"

"ইতিহাস পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃং হয়েৎ ॥২৬৭॥
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি ॥২৬৮॥"
প্রথম অধ্যায়, আদিপর্ব্ব, মহাভারত।

করিয়া আসিয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকেই আশ্রয় করিয়াছি।

পাণিনি মুনির মতে "ঋ হলোর্ণ্যৎ ॥ ৩। ১। ১২৪ ॥" সূত্রানুসারে "ঋ" ধাতুর উত্তর "ণ্যৎ" প্রত্যয় করিয়া "আর্য্যঃ" পদ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে; আর "ঋ" ধাতুর অর্থ "গতি"—যথা "ঋ স্থ গতৌ"। এই ঋ ধাতু হ্বাদি গণীয়। ব্যাকরণে ভ্বাদিগণীয়, আর একটি ঋ ধাতু আছে, তাহার "অর্থ প্রাপণে", এবং উহার উত্তর "যৎ" (পাণিনি ৩। ১। ১০৩॥ কিন্তু সংক্ষিপ্ত সারের মতে "যঙ্" কৃদন্তপাদ। ২০৫।) প্রত্যয় করিয়া "অর্য্যঃ" পদ হইয়া থাকে। হেমচন্দ্র কৃত "অভিধান চিন্তামণি"র মতে

"অর্য্যাভূমিস্পৃশো বৈশ্যা ঊরব্যা ঊরুজা বিশঃ।"
"মহাকুল কুলীনার্য্যঃ সভ্যসজ্জনসাধবঃ ॥"

এবং অমরের মতে "অর্য্যঃ স্বামিবৈশ্যয়োঃ" এবং—"মহাকুলকুলীনার্য্যঃ সভ্যসজ্জন সাধবঃ" পাওয়া যায়। সুতরাং লৌকিক সংস্কৃত ভাষায় "আর্য্য" শব্দের দ্বারা "মহাকুলপ্রসূত", "কুলীন", "সভ্য", "সজ্জন", এবং "সাধু" এই সকল অর্থই প্রকাশ করিয়া থাকে। নাটকীয় ভাষায় সম্বোধনে "আর্য্য" শব্দে গুরুজনকে বুঝাইয়া থাকে এবং স্ত্রী পাত্রের মুখে "আর্যপুত্র—অজ্জউত্ত" শব্দে "স্বামী" এই অর্থই প্রকাশিত হইয়া থাকে। "সাহিত্যদর্পণ" নামক অলঙ্কার পুস্তকের ষষ্ঠ অধ্যায়ে "আর্য্য" সম্বোধনের উপযুক্ত পাত্রদিগের একটি তালিকা আছে।

সংস্কৃত সাহিত্যের ব্যাকরণ ও অভিধানে "আর্য্য" শব্দের সাধারণ অর্থমাত্রই প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু বিশেষ বিশেষ শাস্ত্রে উহার বিশেষ বিশেষ অর্থ দ্যোতনাও দেখিতে পাওয়া যায়। "আর্য্য" শব্দ বৈদিক সাহিত্যের ঋগাদি সংহিতায় অনেকবার দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে উদাহরণ স্বরূপ নিম্নের মন্ত্রাংশ দুইটি অধ্যাহার করা যাইতে পারে, যথা,—

"বিজানীহ্যার্যান্যে চ দস্যবো বর্হিষ্মতে
রন্ধয়া শাসদ ব্রতান্"

(ঋগ্বেদ, প্রথম মণ্ডল, ৫১ সূত্র, ৮ম মন্ত্র।)

"উত শূদ্রে উতার্য্যে।"

(অথর্ব, ১৯ কাণ্ড, ২৬ বর্গ।)

উদ্ধৃত বেদমন্ত্রের প্রথমটিতে "আর্য্য" এবং "দস্যু" এবং দ্বিতীয়টিতে "আর্য্য" এবং "শূদ্র" শব্দ পাওয়া গিয়াছে। এই "আর্য্য" "দস্যু", এবং "শূদ্র" শব্দ কি অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা আমরা স্মৃতি ও পুরাণাদি শাস্ত্র হইতে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

মনুসংহিতা গ্রন্থে "আর্য্য", "অনার্য্য" এবং "দস্যু" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। দশম অধ্যায়ে মনুক্ত সমাজের বর্ণভেদ কথিত হইয়াছে। প্রথমেই লিখিত হইয়াছে,—

"ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি, চতুর্থ শূদ্র একজাতি,—পঞ্চম কোন বর্ণ নাই।" * চতুর্থ শ্লোকের অনুবাদ। (দশম অধ্যায়)

"লোক সমূহের বৃদ্ধির নিমিত্ত সৃষ্টিকর্ত্তা নিজ মুখ, বাহু, উরু এবং পদ হইতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রকে উৎপন্ন করিলেন।" প্রথম অধ্যায়, ৩১ শ্লোকের অর্থ।

---

* "ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য স্ত্রয়ো বর্ণাদ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ এক জাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ ॥৪॥"
১০ম অধ্যায়।

"লোকানাং তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রং চ নিরবর্ত্তয়ৎ ॥৩১॥
১ম অধ্যায়।

"মুখবাহূরুপজ্জানাং যা লোকে জাতয়ো বহিঃ।
ম্লেচ্ছবাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্ব্বে তে দস্যবঃ স্মৃতাঃ ॥৪৫॥
১০ম অধ্যায়।

"মুখ, বাহু, উরু এবং পদ হইতে সৃষ্ট ভিন্ন আর যত জাতি আছে, তাহারা আর্যভাষাই বলুক অথবা ম্লেচ্ছ ভাষাই বলুক, সকলকেই "দস্যু" বলিবে ॥" দশম অধ্যায় ৪৫ শ্লোকের অর্থ।

এই তিনটি মনু বাক্য একত্র করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে সেকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র ভিন্ন আর যত জাতি ছিল, সকলকেই "দস্যু" বলা হইত। শূদ্র "দস্যু" শব্দের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল না, কিন্তু তাহাকে "আর্য" শ্রেণীর মধ্যেও ধরা হইত না। মনু মহারাজ বলিতেছেন,—

প্রশ্ন। "যদি কোন কারণবশতঃ ব্রাহ্মণ কোন অনার্যা নারীতে সন্তান উৎপন্ন করেন, অথবা কোন অনার্য্য ব্রাহ্মণ কন্যার গর্ভে পুত্র উৎপাদন করেন, এই উভয় প্রকার সন্তানের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ হইবে?"—৬৬ শ্লোক, দশম অধ্যায়।

উত্তর। "আর্য পুরুষ হইতে অনার্যা নারীতে উৎপন্ন সন্তান আর্যগুণসম্পন্নই হইবে, কিন্তু আর্যনারীর গর্ভে অনার্য পুরুষ দ্বারা উৎপন্ন সন্তান নিশ্চয়ই অনার্য হইবে।" ৬৭ শ্লোক, দশম অধ্যায়।†

উল্লিখিত প্রশ্নোত্তর হইতে বুঝিতে পারা গেল যে মনু মহারাজের মতে দ্বিজ তিন বর্ণই "আর্য্য" শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং শূদ্র "অনার্য্য" শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত; আবার এই চারিবর্ণের বাহিরের জাতিগুলি আর্য্য-ভাষাই বলুক অথবা ম্লেচ্ছ ভাষাই বলুক, তাহারা "দস্যু" নামধেয়। এক্ষণে পূর্ব্বের উদ্ধৃত বেদমন্ত্রের "আর্য্য", "শূদ্র" এবং "দস্যু" এই তিনটি শব্দের মনুস্মৃতিসম্মত অর্থ জানিতে পারা গেল। আর অশুদ্ধ ভাষার ব্যবহারকারীদিগকে যে "ম্লেচ্ছ" বলা হইত, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

† "অনার্যায়াং সমুৎপন্নো ব্রাহ্মণাত্তু যদৃচ্ছয়া।
ব্রাহ্মণ্যামপ্যনার্যাত্তু শ্রেয়স্ত্বং কেতি চেদ্ভবেৎ ॥ ৬৬ ॥
জাতো নার্যামনার্যায়ামার্যাদার্যো ভবেদ্গুণৈঃ
জাতোহপ্যনার্যাদার্যায়ামনার্য ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৬৭ ॥
১০ম অধ্যায়।

মনুসংহিতার মতে শূদ্র জাতি "অনার্য" বলিয়া কথিত হইলেও তাহারা "দস্যু" জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; যেহেতু শূদ্রকে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ভিতর স্থান দেওয়া হইয়াছে। শূদ্র জাতি দ্বিজ বা আর্য ত্রিবর্ণ অপেক্ষা সম্মানে নিকৃষ্ট হইলেও সমাজের ভিতর ছিল, বাহিরে ছিল না; এবং তজ্জন্যই মনুমহারাজ শূদ্রকে সৃষ্টিকর্ত্তার পদ হইতে উৎপন্ন বলিয়াছেন। এ ক্ষেত্রেও মনুমহারাজ স্বকীয় স্বাধীন মতের প্রচার করেন নাই; তিনি কেবল বৈদিক মন্ত্র বিশেষের অনুবাদমাত্র করিয়াছেন। বিখ্যাত বৈদিক পুরুষসূক্তের একাদশ মন্ত্রে লিখিত আছে,—

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥ ১১ ॥"

অর্থাৎ "ব্রাহ্মণ এই পুরুষের মুখ হইলেন, বাহুদ্বয়কে ক্ষত্রিয় করা হইল; তাঁহার উরুদ্বয় যাহা, তাহা বৈশ্য, পদদ্বয় হইতে শূদ্র জাত হইল।"

অনেকে বলেন যে এই পুরুষ এবং তাঁহার মুখ ইত্যাদি রূপকের ভাষায় লিখিত হইয়াছে। একই সমাজরূপী পুরুষের এই চারিবর্ণ চারি অঙ্গবিশেষ; গুণ এবং কর্ম্ম ভেদে তাঁহাদের উচ্চ নীচ [illegible] করা হইয়াছে মাত্র। যাঁহারা এইরূপ বলেন, তাঁহারা মহাভারতীয় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভগবদ্বাক্যের [illegible] উল্লেখ করেন। তথায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"আমি গুণ এবং কর্ম্মের বিচার করিয়া তাহাদের বিভাগানুসারে মনুষ্যের মধ্যে চরি বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি।" *

* "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥
চতুর্থ অধ্যায়।

যাহাই হউক, শূদ্রকে সমাজের যে স্তরেই স্থান দেওয়া হউক না কেন, মনু মহারাজ তাহাকে "আর্য" শ্রেণীতে গণনা করেন নাই বলিয়াই প্রথমে মনে হয়। পরে, এ সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাইবে।

এক্ষণে "আর্য্য" শব্দের ভিতর কে কে থাকিবেন, তাহা দেখা যাউক। শ্রীশ্রীমনু মহারাজের মত সংক্ষেপতঃ উল্লেখ করিয়াছি। অভিধানের অর্থও দেখিয়াছি। বেদের নিরুক্তকারের মতে "আর্য্য" শব্দের অর্থ "ঈশ্বরপুত্র"; ভাষ্যকার সায়নের মতে "বিজ্ঞ" "যজ্ঞানুষ্ঠাতা", "বিজ্ঞস্তোতা", "উত্তমবর্ণ", "ত্রৈবর্ণিক", "বৈদিক কর্ম্মযুক্ত" ইত্যাদি।

মনু মহারাজও "ত্রৈবর্ণিক" এই অর্থই করিয়াছেন। মনুসংহিতার মত এক্ষণ একটু বিস্তৃতরূপে বুঝিয়া দেখিতে চাই।

১। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন বর্ণ, অর্থাৎ দ্বিজাতি। (৪র্থ শ্লোক, ১০ম অধ্যায়)

২। আর্য পুরুষ হইতে অনার্যা নারীতে উৎপন্ন সন্তান আর্যগুণ সম্পন্নই হইবে। (৬৭ শ্লোক দশম অধ্যায়)

৩। আর্য পুরুষ হইতে আর্যা নারীতে উৎপন্ন সন্তান আর্যই হইবে।

এই শেষোক্ত দুইটি সূত্রের মধ্যে প্রথমটি অনুলোম বিবাহমতে জাত সুতরাং শাস্ত্রানুমোদিত এবং দ্বিতীয়টী অনুলোম প্রতিলোম দুই প্রকার মিলন হইতেই উৎপন্ন; তন্মধ্যে প্রতিলোম-মিলনকে শাস্ত্র নিন্দা করিয়াছেন। শাস্ত্রে এইপ্রকার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। যথা:—

	পুরুষ	+	স্ত্রী	=	সন্তান	(সন্তানের জাতি)।	
১।	ব্রাহ্মণ	+	ব্রাহ্মণ কন্যা	=	ব্রাহ্মণ	(সবর্ণা বিবাহ।)	৫ম শ্লোক।
২।	ব্রাহ্মণ	+	ক্ষত্রিয় কন্যা	=	মূর্ধাভিষিক্ত	(অনুলোম বিবাহ)	
৩।	ব্রাহ্মণ	+	বৈশ্য কন্যা	=	অম্বষ্ঠ	(ঐ)	৮ম শ্লোক।
৪।	ব্রাহ্মণ	+	শূদ্র কন্যা	=	নিষাদ বা পারশব	(ঐ)	৮ম শ্লোক।
৫।	ক্ষত্রিয়	+	ক্ষত্রিয় কন্যা	=	ক্ষত্রিয়	(সবর্ণা বিবাহ)	৫ম শ্লোক।
৬।	ক্ষত্রিয়	+	বৈশ্য কন্যা	=	মাহিষ্য	(অনুলোম বিবাহ)	
৭।	ক্ষত্রিয়	+	শূদ্র কন্যা	=	উগ্র বা গোপাল	(ঐ)	৯ম শ্লোক।
৮।	বৈশ্য	+	বৈশ্য কন্যা	—	বৈশ্য	(সবর্ণা বিবাহ)	৫ম শ্লোক।
৯।	বৈশ্য	+	শূদ্র কন্যা	=	করণ	(অনুলোম বিবাহ।)	
১০।	ক্ষত্রিয়	+	ব্রাহ্মণ কন্যা	—	সূত	(প্রতিলোম মিলন)	
১১।	বৈশ্য	+	ব্রাহ্মণ কন্যা	=	বৈদেহ	(ঐ)	১১শ শ্লোক।
১২।	বৈশ্য	+	ক্ষত্রিয় কন্যা	=	মাগধ	(ঐ)	

(মনুসংহিতা, দশম অধ্যায়) *

* "সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষক্ষত যোনিষু।
আনুলোম্যেন সংভূতা জাত্যা জ্ঞেয়াস্ত এব তে ॥৫॥
স্ত্রীষ্বনন্তর জাতাসু দ্বিজৈর-ৎ পাদিতান্ সুতান্।
সদৃশানেব তানাহুমাতৃদোষ বিগর্হিতান্ ॥৬॥
ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়া মম্বষ্ঠো নাম জায়তে।
নিষাদঃ শূদ্র কন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে ॥৮॥
ক্ষত্রিয়া শূদ্র কন্যায়াং ক্রূরাচার বিহারবান্।
ক্ষত্র শূদ্র বপুর্জন্তুরুগ্রোনাম প্রশ্যতে ॥৯॥ ইত্যাদি।
দশম অধ্যায়ে।

"মূর্ধাভিষিক্ত", "মাহিষ্য", এবং "করণ" অনুলোম বিবাহ জাত এই তিন নাম মনুসংহিতায় নাই, যাজ্ঞবল্ক্যাদি স্মৃতি শাস্ত্রে আছে! যাজ্ঞবল্ক্যও পরাশরের মতে "অম্বষ্ঠের" নাম "আম্বর্ক" ও বলা হইয়াছে।

এই বারশ প্রকার সন্তানের মধ্যে চতুর্থ নিষাদ, সপ্তম উগ্র বা গোপাল এবং নবম করণ। এই তিনজন আর্য পুরুষ ও অনার্যা নারীর সহযোগে উৎপন্ন এবং অবশিষ্ট নয়জনই আর্য পুরুষ ও আর্যা নারীর সহযোগে (সবর্ণ অনুলোম অথবা প্রতিলোম মিলন হইতে) উৎপন্ন। মনুসংহিতার মতে ইঁহারা সকলেই "আর্য"।

এইগুলি ভিন্ন আর এক শ্রেণী "ব্রাত্য দ্বিজ" নামে কথিত হইয়াছেন। তাঁহারাও আর্য নারীর গর্ভে আর্য পুরুষের দ্বারা উৎপন্ন, কিন্তু যথাসময়ে দ্বিজোচিত সংস্কারে সংস্কৃত না হওয়ায় "ব্রাত্য" নামে নিন্দিত হইয়াছেন। মনু বলিয়াছেন,—

"ব্রাহ্মণ কুমারের পক্ষে ষোড়শ বৎসর, ক্ষত্রিয় তনয়ের পক্ষে দ্বাবিংশ বৎসর এবং বৈশ্য সন্তানের পক্ষে চতুর্বিংশ বৎসরের মধ্যে উপনয়ন সংস্কার অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি এই নির্দ্ধারিত কাল অতিবাহিত হইয়া যায় অথচ তাঁহাদের উপনয়ন সংস্কার না হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে আর্য বিগর্হিত 'ব্রাত্য' বলে।" (মনুসংহিতা, দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৮।৩৯ শ্লোক।

"দ্বিজাতিগণের সবর্ণা ভার্য্যায় উৎপন্ন সন্তানগণের যদি যথা সময়ে সংস্কার কার্য্য সম্পন্ন না হয়, সেই সাবিত্রী ভ্রষ্ট-দ্বিজগণকে "ব্রাত্য" বলিবে। ব্রাহ্মণ "ব্রাত্য" হইতে পাপাত্মা ভূর্জকণ্টক, আবন্ত্য, বটধান, পুষ্পধ এবং শৈখ এই কয় জাতি, ক্ষত্রিয় "ব্রাত্য" হইতে ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিব, নট, করণ, খস ও দ্রবিড় এই কয় জাতি, এবং বৈশ্য "ব্রাত্য" হইতে সুধন্বা, আশ্চর্য, (অথবা সুধন্বাচার্য) কারুষ, বিজন্মা, মৈত্র ও সাত্বত এই কয় জাতি উৎপন্ন হইয়াছে।" (মনুসংহিতা, দশম অধ্যায়ের ২০।২১।২২।২৩ শ্লোক।)

আরও "ক্রমশঃ ক্রিয়া লোপ হেতু এবং ব্রাহ্মণের অদর্শন জন্য নিম্নলিখিত ক্ষত্রিয় জাতি সমাজে "অধার্ম্মিক" এই খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছে; সেই জাতিগুলি যথা,—(১) পৌণ্ড্রক, (২) ওড্র, (৩) দ্রবিড় (৪) কাম্বোজ (৫) যবন, (৬) শক, (৭) পারদ, (৮) পহ্লব, (৯) চীন, (১০) কিরাত, (১১) দরদ এবং (১২) খশ"। (মনুসংহিতা, দশম অধ্যায়ের ৪৩।৪৪ শ্লোক।) *

উল্লিখিত তালিকা হইতে দেখা গেল যে "খশ", ও "দ্রবিড়" এই দুইজাতি "ব্রাত্য" এবং "অধার্ম্মিক" এই দুই শ্রেণীতেই ধরা পড়িয়াছে।

উল্লিখিত দশম অধ্যায়ের ৪৩ শ্লোকে "বৃষলত্বং গতাঃ" আছে। টীকাকারগণ "বক্ষ্যমান ক্ষত্রিয় জাতির 'শূদ্রত্ব' প্রাপ্তি" অর্থ করিয়াছেন, যেহেতু "বৃষল" শব্দের অর্থ "শূদ্র" ও হয়। আমরা কিন্তু অনুবাদে "অধার্ম্মিক" লিখিয়াছি। শাস্ত্রকার মনু মহারাজ স্বয়ং "বৃষল" শব্দের নিরুক্তি নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,

---

* "আষোড়শাদ্ ব্রাহ্মণস্য সাবিত্রী নাতিবর্ত্ততে।
আদ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রবন্ধোরা চতুর্বিংশতে র্বিশঃ ॥৩৮॥
অত ঊর্দ্ধং ত্রয়োহপ্যেতে যথাকাল মসংস্কৃতাঃ।
সাবিত্রী পতিতা ব্রাত্যা ভবন্ত্যার্য-বিগর্হিতাঃ ॥৩৯॥"
দ্বিতীয় অধ্যায়ে।

"দ্বিজাতয়ঃ সবর্ণাসু জনয়ন্ত্য ব্রতাংস্তু যান্।
তান্ সাবিত্রী পরিভ্রষ্টান্ ব্রাত্যানিতিবিনির্দিশেৎ ॥২০॥

ব্রাত্যাত্তু জায়তে বিপ্রাৎ পাপাত্মা ভূর্জকণ্টকঃ।
আবন্ত্যবাটধানৌ চ পুষ্পধঃ শৈখ এব চ ॥২১॥
ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাদ্ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেবচ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এব চ ॥২২॥
বৈশ্যাত্তু জায়তে ব্রাত্যাৎ সুধন্বাচার্য এব চ।
কারুষশ্চ বিজন্মা চ মৈত্রঃ সাত্বত এব চ ॥২৩॥
শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতালোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ ॥৪৩॥
পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃশকাঃ।
পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ ॥৪৪॥"
দশম অধ্যায়ে ॥

"বৃষ" ভগবান ধর্ম্মের নাম, যে ব্যক্তি সেই "বৃষকে" লুপ্ত করে, দেবগণ (বিদ্বান্‌গণ) তাহাকেই "বৃষল" বলেন, অতএব কাহারই ধর্ম্মকে লঙ্ঘন করা কর্ত্তব্য নহে।" *

(মনুসংহিতা, অষ্টম অধ্যায়ের ১৬ শ্লোক)।

তবে আমরা ঐ ক্ষত্রিয় জাতিগুলিকে "অধার্ম্মিক" অথবা "ধর্ম্মহীন" বলিয়াছি। অশ্বজাতি যতই কেন অবনতি প্রাপ্ত হউক না—সে নিকৃষ্টতর "অশ্বই" থাকিবে, কদাপি গো অথবা মহিষ হইয়া যাইবে না। তদ্রূপ কোন ক্ষত্রিয় বৈদিক ধর্ম্মরূপী বৃষকে তুচ্ছ করায়, সে "বৃষল ক্ষত্রিয়" হইবে,—শূদ্র হইবে না। যেহেতু ঋষিগণ শূদ্রের কোন শ্রুতি সঙ্গত ধর্ম্ম স্বীকার করেন নাই,—তাই তাঁহারা শূদ্রকেও ধর্ম্মহীন অথবা 'বৃষল' বলিয়াছেন। †

একণে এতদূর যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমাদের মনে হয়, যে "আর্য" শব্দের ভিতর আদিম দ্বিজ জাতি, তাঁহাদের পরস্পর এবং শূদ্রের সহিত অনুলোম বিবাহ জাত সন্তান, আর্যগণের মধ্যে পরস্পর প্রতিলোম জাত সন্তান, ব্রাত্য দ্বিজবংশ এবং কোন কারণবশতঃ ধর্ম্মচ্যুত দ্বিজবংশ ইহাঁরা সকলেই পড়িতেছেন। ইঁহাদের মধ্যেও পরস্পর শোণিত মিশ্রণের ফলে যে অসংখ্য অবান্তর উপজাতির উৎপত্তি হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই "আর্য"। অন্ততঃ মনুসংহিতার মতে তাঁহাদিগকে "আর্য" বলিতে হয়। ইহাদের মধ্যে যাঁহারা বৈদিক সংস্কারে সংস্কৃত থাকিয়া আজ পর্য্যন্ত বৈদিক, পৌরাণিক অথবা তান্ত্রিক ধর্ম্ম কর্ম্ম পালন করিতেছেন, তাঁহারা বর্ত্তমান ভারত খণ্ডে "দ্বিজাচারী হিন্দু" নামে পরিচিত হইতেছেন। সেন্সাস অথবা লোকগণনার বিবরণ পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রাচীন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই মূল তিন বর্ণ এখন সহস্র সহস্র শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া দেশ বিশেষে বিভিন্ন বিভিন্ন নামে পরিচিত হইতেছেন। তথাপি, যে নামেই তাঁহারা পরিচিত থাকুন, তাঁহারা আজও তাঁহাদের সেই সুপ্রাচীন "আর্য" নাম গৌরবের সহিত বহন করিতেছেন এবং সেই পরিচয়ে পৃথিবীর মানবের নিকট পরিচিত হইতে চাহিতেছেন। হিন্দু জাতি এবং হিন্দু সমাজতন্ত্রের মূল দেশে বিশেষ সাবধানতার সহিত অনুসন্ধান করিলে এখনও প্রত্যেক জল আচরণীয় হিন্দুর দেহে আর্য শোণিত সম্পর্কের প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

আমরা দেখিয়াছি যে প্রধানতঃ বৈদিক পুরুষ সূক্তকে আশ্রয় করিয়া মনু মহারাজ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই ত্রৈবর্ণিক আর্যের উৎপত্তির সংবাদ দিয়াছেন। রামায়ণ, মহাভারত এবং মহাপুরাণাদি গ্রন্থ হইতে এ সম্বন্ধে কতদূর জানিতে পারা যায়, একণে তাহাই দেখিতে হইবে। সুবিশাল আর্যাবর্ত্ত এবং ভারতবর্ষের ভিতর এই আর্যজাতির প্রসার এবং প্রভাবই বা কতদূর বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, তাহাও অনুসন্ধান করিতে হইবে। প্রথমে রামায়ণের কথাই আরম্ভ করা যাউক,—

"হে মহাবাহো রঘুনন্দন, পূর্ব্বে যাঁহারা প্রজাপতি হইয়াছিলেন, আমি একে একে তাঁহাদের সকলের নাম কীর্ত্তন করিতেছি। প্রথম কর্দম, তৎপরে বিকৃত, শেষ সংশ্রয়, বীর্য্যবান্ বহুপুত্র স্থাণু, মরীচি, অত্রি, ক্রতু, পুলস্ত্য, অঙ্গিরা, প্রচেতা, পুলহ, দক্ষ, বিবস্বান্ অরিষ্টনেমি ও কশ্যপ। দক্ষ প্রজাপতির যশস্বিনী লোক বিখ্যাত ষাটটি কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে অদিতি, দিতি, দনু, কালকা, তাম্রা, ক্রোধবশা, মনু ও অনলা এই আটটি সুমধ্যমা কন্যাকে কশ্যপ প্রজাপতি বিবাহ করেন।......দ্বাদশ সূর্য্য, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র ও স্বর্গ বৈদ্যদ্বয় এই তেত্রিশ দেবতা অদিতির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। বৎস, দিতির গর্ভে অনেক যশস্বী পুত্র হয়, তাহারা দৈত্য নামে বিখ্যাত। দনু অশ্বগ্রীব নামক পুত্র প্রসব করেন। কালকা কালক ও নরক নামে দুই পুত্র প্রসব

---

* "বৃষো হি ভগবান্ ধর্ম্মস্তস্য যঃ কুরুতে হ্যলম্।
বৃষলং তং বিদু র্দেবাস্তস্মাদ্ধর্ম্মং ন লোপয়েৎ॥১৬॥"
মনুসংহিতা, অষ্টম অধ্যায়।

"বিদ্বাংসো হি দেবাঃ" শতপথ ব্রাহ্মণে।

† "ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিন্ন চ সংস্কারমর্হতি।
নাস্যাধিকারো ধর্ম্মেঽস্তি ন ধর্ম্মাৎ প্রতিষেধনম্॥১২৬॥
(মনুসংহিতা, দশম অধ্যায়)।

করেন। তাম্রা ভাসী, শ্যেনী, ক্রৌঞ্চী, ধৃতরাষ্ট্রী ও শুকী এই পাঁচটি লোক বিখ্যাতা কন্যা প্রসব করেন। ক্রোধবশা মৃগী, মৃগমন্দা, হরী, ভদ্রমদা, মাতঙ্গী, শার্দ্দূলী, শ্বেতা সুরভি, সমস্ত শুভলক্ষণ যুক্তা সুরসা ও কদ্রু এই দশটী কন্যা প্রসব করেন। **মনু** মহাত্মা কশ্যপের ঔরসে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণে বিভক্ত মনুষ্যদিগেকে উৎপন্ন করেন। বেদে কথিত আছে যে ব্রাহ্মণেরা মুখ হইতে, ক্ষত্রিয়েরা বক্ষঃস্থল হইতে, বৈশ্যেরা উরুদ্বয় হইতে এবং শূদ্রেরা পাদদ্বয় হইতে জন্মগ্রহণ করেন। সমস্ত শুভ ফলজনক বৃক্ষ অনলা হইতে উৎপন্ন হয়।" রামায়ণ, আরণ্যকাণ্ড, ১৪শ সর্গ। (বঙ্গবাসীর অনুবাদ)।

রামায়ণের মতে আমরা দেখিতেছি যে প্রজাপতি কশ্যপই জীবজগতের জনক। তিনি অনেকগুলি নারীকে বিবাহ করিয়াছেন; এবং তাঁহাদের গর্ভ হইতে দেব, দানব, দৈত্য, অসুর, নাগ, পক্ষী, পশু, বৃক্ষ, লতা এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারিবর্ণে বিভক্ত মনুষ্যের জন্ম হইয়াছে। "মানব" এই শব্দে আমরা "প্রজাপতি মনুর পুত্র"* ইহাই জানিতাম; কিন্তু রামায়ণ বলিতেছেন যে **কশ্যপের অন্যতমা স্ত্রী মনুর** সন্তান বলিয়া আমরা "মানব"। রামায়ণ আরও বলিতেছেন যে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয় একই দম্পতী অর্থাৎ **কশ্যপ ও মনু** হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। তবে অবশেষে, মুখাদি হইতে ব্রাহ্মণাদির উৎপত্তির প্রাচীন উপাখ্যান ও "ইতি শ্রুতিঃ" বলিয়া রামায়ণের ঋষি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

কেবল রামায়ণ বলিয়া নহে, হিন্দুর নানা প্রামাণ্য গ্রন্থে একই মানব সম্প্রদায় পরে গুণ কর্ম্মবলে চারিবর্ণে ক্রমশঃ বিভক্ত হওয়ার ইতিহাস পাওয়া যায়। ক্রমশঃ আমরা সেই সকল অতি সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিতেছি:—

১। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।—"প্রথমে একমাত্র ব্রহ্ম অথবা ব্রাহ্মণ ছিলেন। এক ছিলেন বলিয়া শ্রেষ্ঠরূপ ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি করিলেন; এই সকল দেবগণ ক্ষত্রিয়,—যথা—ইন্দ্র, বরুণ, সোম, রুদ্র, পর্জ্জন্য, যম, মৃত্যু এবং ঈশান। সেই হেতু, ক্ষত্রিয় অপেক্ষা উত্তম কেহ নাই, সেই হেতু ব্রাহ্মণ অধোদেশে থাকিয়া ক্ষত্রিয়ের উপাসনা করেন; রাজসূয়ে ক্ষত্রিয়ই তাঁহার (ব্রহ্মের) যশ ধারণ করেন;—ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি স্থান ব্রহ্ম। ক্ষত্রিয়ের পর তিনি বৈশ্যের সৃষ্টি করিলেন; যে সকল দেব গণদ্বারা আখ্যাত হন, বসু, রুদ্র,

---

* "পূর্ব্বকালে মহাবাহো যে প্রজাপতয়োঽভবন্।
তান মে নিগদতঃ সর্ব্বানাদিতঃ শৃণু রাঘব ॥৬॥
কর্দমঃ প্রথমস্তেষাং বিকৃত স্তদনন্তরঃ।
শেষশ্চ সংশ্রয়শ্চৈব বহু পুত্রশ্চ বীর্য্যবান্ ॥৭॥
স্থাণু র্মরীচিরত্রিশ্চ ক্রতুশ্চৈব মহাবল।
পুলস্ত্যশ্চাঙ্গিরাশ্চৈব প্রচেতাঃ পুলহস্তথা ॥৮॥
দক্ষোবিবস্বান পরো ঽরিষ্টনেমিশ্চ রাঘব।
কশ্যপশ্চ মহাতেজা স্তেষামাসীচ্চ পশ্চিমঃ ॥৯॥
প্রজাপতেস্তু দক্ষস্য বভুবুরিতি বিশ্রুতাঃ।
ষষ্টি দুর্হিতরো রাম যশস্বিন্যো মহাযশাঃ ॥ ১০ ॥
কশ্যপঃ প্রতিজগ্রাহ তাসা মষ্টৌ সুমধ্যমাঃ।
অদিতিঞ্চ দিতিঞ্চৈব দনুমপি চ কালকাম্।
তাম্রাং ক্রোধবশা ঞ্চৈব **মনু**ঞ্চাপ্যনলামপি ॥১১॥
অদিত্যাং জজ্ঞিরে দেবাস্ত্রয়স্ত্রিংশদরিন্দম।
আদিত্যা বসবো রুদ্রা অশ্বিনৌ চ পরন্তপ ॥ ১৪ ॥
মনুর্মনুষ্যাণ জনয়ৎ কাশ্যপস্য মহাত্মনঃ।
ব্রাহ্মণান্ ক্ষত্রিয়ান্ বৈশ্যান্ শূদ্রাংশ্চ মনুজর্ষভ ॥ ২৯॥
মুখতো ব্রাহ্মণা জাতা উরসঃ ক্ষত্রিয়া স্তথা।
উরুভ্যাং জজ্ঞিরে বৈশ্যাঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রা ইতি শ্রুতি ॥৩০॥
রামায়ণ, আরণ্যকাণ্ড, ১৪শ সর্গ।

* "ব্রহ্ম ক্ষত্রাদয়স্তস্মান্ মনোর্জাতাস্তু মানবাঃ ॥"
মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ৭৫ ম অধ্যায়।

আদিত্য, বিশ্বেদেব, মরুৎ ইত্যাদি। পরে তিনি শূদ্র বর্ণ সৃষ্টি করিলেন,—ইত্যাদি।" প্রথম খণ্ড, চতুর্থ ব্রাহ্মণ। †

এই ঔপনিষদিকী শ্রুতিবাণী সেই শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার "গুণকর্ম বিভাগ হইতে আমি চারিবর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি" উক্তিরই আদর্শ বলিয়া বোধহয়।

পুরুষসূক্ত, উপনিষদ, রামায়ণ ও মনুবাক্যের একত্র তুলনা করিয়া অর্থ করিতে গেলে ইহা স্পষ্টই প্রতীত হয় যে আদিম-যুগে একটি সভ্য সম্প্রদায় মাত্র বর্ত্তমান ছিল এবং ক্রমশঃ সভ্যতার উন্নতি সহকারে সমাজে গুণানুসারে কর্ম্মভেদের প্রতিষ্ঠা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বর্ণভেদের ব্যবস্থা হয়। মহাভারত এবং মহাপুরাণ গ্রন্থাবলীও এই ঐতিহ্যই বহন করিয়া আসিতেছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।
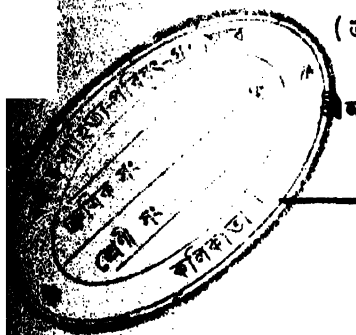
† "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেকমেব তদেক ৺সন্ন ব্যভবত্তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ক্ষত্রং যান্যেতানি দেবত্রা ক্ষত্রাণী ন্দ্রোবরুণঃ সোমো রুদ্রঃ পর্জ্জন্যো যমো মৃত্যুরীশান ইতি তস্মাৎ ক্ষত্রাৎপরং নাস্তি তস্মাদ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়মধস্তাদুপাস্তে রাজসূয়ে ক্ষত্র এব তদ্‌যশো দধাতি সৈষা ক্ষত্রস্য যোনির্যদ্‌ব্রহ্ম ॥১১॥ স নৈব ব্যভবৎ স বিশমসৃজত যান্যেতানি দেবজাতানি গণশ আখ্যায়ন্তে বসবো রুদ্রা আদিত্যা বিশ্বেদেবা মরুত ইতি ॥১২॥ স নৈব ব্যভবৎ স শৌদ্রং বর্ণমসৃজত ইত্যাদি ॥১৩॥" প্রথম খণ্ড, চতুর্থ ব্রাহ্মণ।

মা

জননী আমার! বুঝিবে কি আজ
আঁখি জল অভাগার?
মরমের মাঝে জাগে লুকাইয়া
দিবানিশি হাহাকার।
কত যুগ যুগ কোন দুরাশায়
হ'য়েছি গো গৃহ হারা
আপনার মনে ফিরি দেশে দেশে
বৃথাই পাগল পারা।
জানিনা গো কবে শেষ হবে মোর
পথ-চলা চিরদিন,
আলেয়ার আলো হারালো কোথায়
নিবিড় আঁধারে লীন।
ওগো মা আমার! সন্তান তরে
নীরবে সহিছ কত!
কত লাঞ্ছনা, মর্ম্ম বেদন,
জাগে বুকে অবিরত!
কি লভেছ হায় ওগো স্নেহময়ী
বেদনার প্রতিদান?
শুধু জলে জলে গঞ্জনা শত
অকারণ অভিমান
তাই ভাবি আজ ফুলি ফুলি উঠে
গভীর বেদনা প্রাণে,
এ যাতনা আমি কেমনে বুঝাই
ব্যর্থ ভাষায় গানে?
কিবা দিব আজ চরণে অর্ঘ্য?
কি রচিব উপচার?
লহ দুখ জ্বালা, লহ আঁখি জল,
স্নেহময়ী মা আমার।

শ্রীআশুতোষ রায়
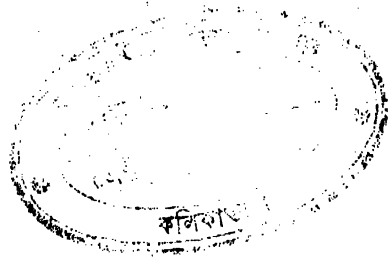
১০ম বর্ষ আশ্বিন ১৩২৭ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

বঙ্গদর্শন।

(প্রথম প্রস্তাব)

কমলাকান্ত শর্ম্মা পণ্ডিত লোক হইলেও গুরুতর আফিমখোর ছিলেন; তিনি যে বাঙ্গালা সাহিত্যের up to date খবর রাখিবেন ইহা আশা করা যায় না। তাঁহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন ছিল বলিয়া এক জোড়া বিনামা ক্রয় করিয়া বঙ্গ দর্শনের সন্ধান পাইয়াছিলেন। কমলাকান্তের বঙ্গদর্শনকে না জানিবার যে কারণ ছিল, আশা করি সাহিত্য-পরিষদের সভ্যগণের তাহা নাই; আর বিশেষ বঙ্গদর্শন এখন up to date সাহিত্যের সীমানা পার হইয়া প্রায় প্রত্নতত্ত্বের সীমানার মধ্যে গিয়া পড়িয়াছে। এখন বঙ্গদর্শনের পাতা দিয়া আর জুতা মোড়ান হয় না, তাহা কাচের বাক্সে থাকে। বঙ্গদর্শনের পরিবর্ত্তে বঙ্গদর্শন সম্বন্ধে আলোচনাকারীর প্রবন্ধ দিয়া যদি কমলাকান্তের মত কোনও সাহিত্যিকের বিনামার মোড়ক তৈয়ারি হয় তবে তাদৃশ প্রবন্ধ লেখকের অদৃষ্ট যে নিতান্ত মন্দ তাহা মনে করি না।

সে যাহা হউক—যে কথা বলিতেছিলাম—সাহিত্যিক সমাজে এখন বঙ্গদর্শনের আড়ম্বরপূর্ণ বা বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া ইদানীং নিতান্তই অনাবশ্যক। তথাপি একটা কথা আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিলে হয়ত আপনারা আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন না। বঙ্গদর্শন মোট চারি পর্য্যায়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং কেবল প্রথম বারের সম্পাদক ছিলেন, দ্বিতীয় বারের—সম্পাদক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সঞ্জীবচন্দ্র; তৃতীয়বারের—সম্পাদক ছিলেন ৺ শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এবং চতুর্থবারের—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অদ্য আমরা কেবল প্রথম পর্য্যায়ের (অর্থাৎ বঙ্কিম সম্পাদিত) বঙ্গদর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন বঙ্গদর্শন প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁহার প্রথম তিনখানি উপন্যাস মাত্র

(দুর্গেশ নন্দিনী, কপাল কুণ্ডলা ও মৃণালিনী) প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার চতুর্থ উপন্যাস বিষবৃক্ষের প্রথম কয়েক পরিচ্ছেদ ক্রোড়ে করিয়াই বঙ্গদর্শন বাঙ্গালা সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হয়। এই সময়ে বঙ্কিম বহরমপুরে ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন যে এই সময়ে বহরমপুরে বাঙ্গালা সাহিত্য চর্চ্চার মাহেন্দ্র ক্ষণ উপস্থিত হইয়াছিল, কেননা তখন ভূদেব মুখোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, রামগতি ন্যায়রত্ন, লোহারাম শিরোরত্ন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এই স্থানে ছিলেন। তাহা ছাড়া ডাক্তার রামদাস সেনের বাড়ী ও সুবিপুল গ্রন্থাগার এই স্থানে ছিল। কবি গঙ্গাচরণ সরকার মধ্যে মধ্যে বহরমপুরে আসিয়া অবস্থিতি করিতেন। অক্ষয়চন্দ্র সরকার ঐ স্থানে এই সময়ে ওকালতি আরম্ভ করিয়াছিলেন।

পাঁচটা উচ্চসংশ্রয় গ্রহের একত্র সমাবেশে দিলীপের কুলদীপক পুত্র অনন্তকীর্ত্তি রঘুর জন্ম হইয়াছিল, একথা কালিদাস বলিয়াছেন।* আর বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজাকাশের ঐ দশটা মহাজ্যোতিষ্কের একত্র সম্মিলনের প্রভাবে বঙ্গবাণীর ক্রোড়ে যে শিশুর আবির্ভাব হইয়াছিল তাহার ভাগ্য সম্পদ কম হইবে কেন? কিন্তু রঘুর কীর্ত্তি কীর্ত্তন করিবার ভার লইয়াছিলেন কালিদাস, বঙ্গদর্শনের কীর্ত্তি কাহিনী বিবৃত করিবার ভার এখনও কোনও শক্তিশালী সাহিত্যিক গ্রহণ করেন নাই।

বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিপুষ্টি বিষয়ে বঙ্গদর্শনের দৃষ্টান্ত ও প্রভাব কিরূপ কার্য্য করিয়াছে তাহা গোড়াতেই স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিব। বঙ্গদর্শন যে সে সময়কার সকল পত্রিকা হইতে সুলিখিত ও সুসম্পাদিত ছিল তাহা বোধ হয় না বলিলেও চলে। বঙ্গদর্শনেরই আদর্শে উত্তরকালে বান্ধব, আর্য্যদর্শন, প্রবাহ, নব্যভারত, ভারতী, সাধনা, সাহিত্য, প্রদীপ, জন্মভূমি, প্রবাসী, মানসী, প্রতিভা. ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন, ভারতবর্ষ, নারায়ণ, মালঞ্চ, এবং আরও কত উৎকৃষ্ট মাসিক পত্র প্রকাশিত হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের অসাধারণ উন্নতি সাধন করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কয়েকখানি ইতিমধ্যে ভৌতিক লীলা সংবরণ করিয়া অক্ষয় সারস্বত স্বর্গে—মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির শ্রেষ্ঠ সেবকগণের লভ্য অমরধামে—বঙ্গদর্শনের সাযুজ্য লাভ করিয়াছে; এবং কয়েকখানি নানা পরিবর্ত্তন, উত্থান, পতনের মধ্য দিয়া ন্যূনাধিক উজ্জ্বল ভাবে বঙ্গ সাহিত্যের ও বঙ্গসমাজের যথেষ্ট সেবা করিয়া আসিতেছে। বস্তুতঃ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাসে বঙ্গদর্শনের স্থান অত্যন্ত উচ্চ, তাহা কে না স্বীকার করিবে? কিন্তু অতীতের প্রতি অন্ধ অনুরাগবশতঃ আমরা যেন এমন সিদ্ধান্ত না করি যে, বঙ্গদর্শনের মত সুলিখিত বা সুসম্পাদিত, বা বিচিত্র ও গভীর চিন্তাপূর্ণ মাসিকপত্র আর হয় নাই। কথাটা বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া দিবার হেতু এই যে, এখনও অনেকের মনে সেইরূপ ধারণাই বদ্ধমূল বলিয়া মনে হয়। অন্যে পরে কা কথা? রায় সাহেব হারাণচন্দ্র রক্ষিত পর্য্যন্ত বলিয়াছেন, "বঙ্গদর্শন জাতীয় সাহিত্যের একমাত্র কোহিনুর"। বঙ্গদর্শন যে বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যের প্রথম পত্র নহে—তাহার পূর্ব্বেও যে তত্ত্ববোধিনী প্রভৃতি বাঙ্গালা সাহিত্যের ও বাঙ্গালা সমাজের নিতান্ত তুচ্ছ সেবা ও নগণ্য উপকার করে নাই—তাহাও যেন রায় সাহেব বিস্মৃত হইয়া লিখিয়াছেন, "বঙ্গদর্শনের সৃষ্টি হইতেই বাঙ্গালী ভাবিতে শিখিল, তাহার চক্ষের ঠুলি খুলিল ইত্যাদি।" অনুরাগ ভাল, অন্ধতা ভাল নহে। আমরা আমাদের দেশ ও সমাজের গৌরবময় অতীতের প্রতি

---

* গ্রহৈ স্ততঃ পঞ্চভিরুচ্চ সংশ্রয়ৈ
রসূর্য্যগৈঃ সূচিতভাগ্য সম্পদম্।
অসূত পুত্রং সময়ে শচী সমা
ত্রিসাধনা শক্তিরিবার্থমক্ষয়ম্।
রঘু, তৃতীয় সর্গ, ১৩শ শ্লোক।

চিরদিনই ভক্তিযুক্ত; আমরা ইহাও বিশ্বাস করি যে, অতীতের প্রতি সমুচিত অনুরাগ না থাকিলে বর্ত্তমানকে ভাল করিয়া জানা যায় না এবং বর্ত্তমানকে যথার্থ ভাবে জানিতে ও বুঝিতে না পারিলে ভবিষ্যৎ বড় অনিশ্চিত, বড় বিপৎসঙ্কুল থাকিয়া যায়। বঙ্গদর্শন বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিপুষ্টি বিষয়ে যে সাহায্য করিয়াছে তাহার তুলনা নাই, ইহা আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, কিন্তু ইহা স্বীকার করি না যে, বঙ্গদর্শন হইতেই বাঙ্গালী ভাবিতে শিখিয়াছে। কেন করি না তাহা পরে সাময়িক পত্রিকার ইতিহাস আলোচনার সময় বুঝা যাইবে। বঙ্গদর্শন বাঙ্গালীকে প্রথম ভাবিতে শিখায় নাই, তবে বঙ্গদর্শন যাহা শিখাইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বতন কোনও পত্রিকা শিখায় নাই। বঙ্গদর্শন দেখাইয়াছিল, কাব্যকথা বল, বিজ্ঞান বল, দর্শন বল, ইতিহাস বল, চটুল রসিকতা বল, গুরু-গম্ভীর প্রত্নতত্ত্ব বল—সকল বিষয়ই বাঙ্গালায় রচনা করা যায়, এবং লেখক ক্ষমতাশালী হইলে তাহা মনোজ্ঞ ও শিক্ষাপ্রদ উভয়ই হইতে পারে। বঙ্গদর্শন বুঝাইয়াছিল, বাঙ্গালা যে তৎকাল পর্য্যন্ত শিক্ষিত বাঙ্গালীর ভাবপ্রকাশের বাহন হয় নাই তাহার প্রকৃত কারণ বাঙ্গালা ভাষার অপ্রতিবিধেয় দারিদ্র্য নহে, শিক্ষিতসমাজের রুচিবিকার এবং লেখকগণের অরসজ্ঞতা ও ক্ষমতাহীনতা। দুর্গেশনন্দিনী ও কপালকুণ্ডলায় আমরা বাঙ্গালা সাহিত্যের নবোদ্ভিন্নযৌবন-প্রতিমা দেখিয়াছি;* বঙ্গদর্শন সেই প্রতিমার সর্ব্বাঙ্গীণ প্রসাধনের সূচনা করিয়াছিল।

বঙ্গদর্শন যে "বাঙ্গালা সাহিত্যের একমাত্র কোহিনুর" নহে, ইহা প্রতিপাদনার্থ প্রমাণ প্রয়োগ নিতান্তই অনাবশ্যক। তবে বঙ্গদর্শন যেরূপ সুবিধা ও অসুবিধা—অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা সাধন করিয়াছিল, যেরূপ ভাবে আপনার গন্তব্য পথের জঙ্গল আপনি কাটিয়া লইয়া সগৌরবে সাহিত্যের নব নব ক্ষেত্রে মাতৃভাষার বিজয়-পতাকা প্রথম প্রোথিত করিয়াছিল, তাহার উদাহরণরূপে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য। একদিন শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের সহিত কথাপ্রসঙ্গে বঙ্কিম বলিয়াছিলেন, "এখন যে সব কাগজ বাহির হইতেছে, বঙ্গদর্শনের যে সুবিধা ছিল, তাহাদের সে সুবিধা নাই। তখন বাঙ্গালায় অনেক জিনিষ লেখা হয় নাই, প্রবন্ধ লেখা সহজ ছিল। যে বিষয়ে লোকে কিছু জানে না, সে বিষয় যৎসামান্য লিখিলেই চলিত, লোকে তাহাই পড়িত, সেই টুকুই শিখিত। এখন আর তাহা চলে না। এই তোমার 'সাহিত্যের' কথাই ধর। উমেশ বটব্যালের মত original research করিয়া 'বঙ্গদর্শনে' কেহ প্রবন্ধ লিখেন নাই। বটব্যালের বৈদিক প্রবন্ধগুলি, নগেন গুপ্তের 'মৃত্যুর পরে'—উচু দরের লেখা। বঙ্গদর্শনে এরকম প্রবন্ধ ছাপা হয় নাই।" † বঙ্কিমচন্দ্র যাহাকে "সুবিধা" বলিয়াছেন, আমরা তাহাকে একটা গুরুতর অসুবিধাও বলি; বঙ্কিম কতকটা আত্মশ্লাঘা পরিহার করিবার জন্যই ঐরূপ বলিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। বঙ্গদর্শনের সম্পাদকরূপে তাঁহাকে যেমন স্বয়ং নানা বিষয়ে লেখা তৈয়ারি করিতে হইয়াছে, তেমনি লেখকও তৈয়ারি করিতে হইয়াছে। ইহা যে বড় সহজ ব্যাপার তাহা নহে। পথ প্রস্তুত হইলে তাহাতে চলা সহজ, পদে পদে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাধা প্রতিহত করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলে বৃহৎ ব্যাপার সাধন করিবার শক্তি কাজেই কম হয়। বঙ্গদর্শনকে অনেক বিষয়েই পথ প্রস্তুত করিয়া লইতে হইয়াছিল—এবং ঐরূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু বাধা প্রতিহত করিয়া অন্যের পক্ষে স্বল্প কিন্তু কঠিনতর

* পত্রিকান্তরে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে এ বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

† নারায়ণ, বৈশাখ ১৩২২

বাধাসমূহ অতিক্রম করিবার সুবিধা করিয়া দিতে হইয়াছিল।

বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের ইতিহাস অতি বিচিত্র। স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব" হইতে জানা যায় ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য নামক কোনও এক ব্যক্তি "বেঙ্গল গেজেট" এই ইংরাজী নাম দিয়া একখানি বাঙ্গালা সাময়িক পত্র প্রকাশ করেন, উহাতে বিদ্যাসুন্দর, বেতালপঁচিশী প্রভৃতি কাব্য প্রতিকৃতি সহ মুদ্রিত হইত। এতদধিক আর কিছুই উক্ত পত্রিকাখানি সম্বন্ধে জানা যায় না। ইহার দুইবৎসর পরে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর হইতে মিশনারিগণের উদ্যোগে "দিগ্‌দর্শন"-নামক মাসিক পত্র বাহির হয়। বেঙ্গল গেজেট মাসিক কি সাপ্তাহিক পত্র ছিল জানা যায় না। সুতরাং দিগ্‌দর্শনকে বাঙ্গালার প্রথম মাসিক পত্র বলিলে বিশেষ কোনও দোষ হইবে না। বাঙ্গালা অভিধানের ন্যায় প্রথম বাঙ্গালা মাসিক পত্রও খৃষ্টান মিশনারীগণের দান। "দিগ্‌দর্শন" নামে সংবাদ পত্র ছিল,কার্য্যতঃ ইহাতে নানাবিষয়ক প্রবন্ধ থাকিত। 'দিগদর্শনের' সময় বাঙ্গালা সাহিত্যের নিতান্ত অপোগণ্ডাবস্থা; তাহাতে আবার অধিকাংশ প্রবন্ধের লেখকগণ বিদেশী মিশনারী ছিলেন; সুতরাং ভাষার হিসাবে উহা যে কি অপূর্ব্ব বস্তু ছিল তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। তথাপি ইহা বলা যাইতে পারে ইহার তিন বৎসর পরে প্রকাশিত রাজা রামমোহনের 'ব্রাহ্মণ-সেবধি' মাসিক পত্র অপেক্ষা ইহার ভাষা মোটের উপর প্রাঞ্জল। রামমোহনও 'দিগ্‌দর্শনে' কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। দিগ্‌দর্শনের ৫৪ বৎসর পরে বঙ্গদর্শনের আবির্ভাব হয়। দুইখানি পত্রিকায় নামের সাদৃশ্য লক্ষ্য করিবার যোগ্য। কিন্তু এই ৫৪ বৎসরে বাঙ্গালা সাহিত্য যেরূপ অভাবনীয় উন্নতিসাধন করিয়াছিল তাহা যথার্থই বিস্ময়কর। দিগ্‌দর্শন তিনবৎসর কাল স্থায়ী হয়। ব্রাহ্মণসেবধির জীবনকাল মাত্র একবৎসর। ইহার পর নানা নামে বহু বাঙ্গালা সাপ্তাহিক, দৈনিক, বার্ষিক ও মাসিক "সংবাদপত্র" বাহির হইয়াছিল। এবং প্রায় সবগুলিতেই যৎসামান্য সংবাদের সঙ্গে নানাবিধ গদ্য পদ্য প্রবন্ধ বাহির হইত। ১৬৯১ খৃষ্টাব্দে প্রচারিত The Gentleman's Journal নামক মাসিক পত্রখানিতেই নাকি বিলাতের আধুনিক মাসিক পত্রসমূহের বীজ উপ্ত হয়। ঐ পত্রিকাখানিতেও আমাদের বাঙ্গালা দেশের পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন পত্রগুলির ন্যায় সংবাদ ও গদ্য পদ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে Black-wood's Edinburgh Magazine প্রকাশিত হয়। উহাই বঙ্গদর্শনের আদর্শ ছিল বলিয়া বোধ হয়। অন্ততঃ উভয় পত্রিকার সাদৃশ্য বড় ঘনিষ্ঠ। Scott, Lockhart, Hogg, Maginn Syme, এবং John Wilson প্রভৃতি তদানীন্তন প্রধান লেখকগণ Blackwood's Edinburgh Magazine পত্রিকায় লিখিতেন। বঙ্গদর্শনের কৃতিত্বও উহাতে সাময়িক কয়েকজন প্রধানতম লেখকের রচনার একত্র সম্মিলন সাধনে। বাঙ্গালা সাময়িকপত্রের সবিস্তর ইতিহাস বর্ণন এস্থলে সম্ভব নহে। কিন্তু এতৎসম্পর্কে কয়েকখানি পত্রিকার নাম না করিলে কর্ত্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। প্রথম গুপ্ত কবির "সংবাদ প্রভাকর"; ইহাতে অক্ষয়কুমার দত্ত, কবি রঙ্গলাল, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, মনোমোহন বসু-প্রভৃতি সাহিত্যমহারথগণের সকলেরই একরূপ হাতে খাড় হয়। প্রভাকর প্রথমে সপ্তাহিক ছিল, পরে দৈনিক হয়, আবার উহার একটা মাসিক সংস্করণও বাহির হইয়াছিল। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে প্রভাকর প্রবর্ত্তিত হয়। ইহার পর অক্ষয় কুমার দত্ত ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে প্রভাকরের অপর একজন লেখক প্রসন্নকুমার ঘোষের সহিত মিলিত হইয়া "বিদ্যাদর্শন" নামে এক মাসিক পত্র বাহির করেন। বিদ্যাদর্শনেও উত্তরকালীন বঙ্গদর্শনের ন্যায় দিগ্‌দর্শনের নামের গন্ধ আছে। বিদ্যাদর্শন মাত্র একবৎসর চলিয়াছিল, ইহার পরে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

ঠাকুরের উদ্যোগে তত্ত্ববোধিনী সভা ও তদানীন্তন ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্ররূপে "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" প্রকাশিত হয়। ঐ পত্রিকাখানি অদ্যাপি জীবিত আছে। বিদ্যাদর্শন ও তত্ত্ববোধিনী বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যে নূতন আদর্শ স্থাপন করিয়াছিল। উভয়ের রচনা গম্ভীর ও তেজঃপূর্ণ ছিল। তত্ত্ববোধিনীর পর পুণ্যস্মৃতি বিদ্যাসাগর মহাশয় ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারের "সর্ব্বশুভকরী"-নাম্নী মহিলামনোরঞ্জিনী মাসিকা পত্রিকা ও রাজেন্দ্রলাল মিত্রের "বিবিধার্থসংগ্রহ" উল্লেখযোগ্য। বিবিধার্থসংগ্রহের বিষয়বৈচিত্র্য তত্ত্ববোধিনী অপেক্ষা অধিক, কিন্তু ভাষা নীরস ও প্রাণহীন ছিল। এই সময়ের কিছু পরেই মফঃস্বলেও সাময়িক পত্রিকা প্রচার আরব্ধ হইয়াছিল। ঢাকা নগরী হইতে ক্রমে ক্রমে তিনখানি পত্রিকা "মনোরঞ্জিকা" (১৮৬০) "কবিতা কুসুমাবলী" (১৮৬১) "চিত্তরঞ্জিকা" (১৮৬২) প্রকাশিত হয়। প্রথমখানির সম্পাদক ছিলেন কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, দ্বিতীয় ও সম্ভবতঃ তৃতীয় খানিরও সম্পাদক ছিলেন কবি হরিশ্চন্দ্র মিত্র। বাঙ্গালা সমাজের ন্যায় বাঙ্গালা সাহিত্যেও শৈশবমৃত্যুর উৎপাত বড় অধিক। উক্ত প্রত্যেকখানি পত্রই বড় স্বল্পজীবী হইয়াছিল। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে "বামাবোধিনী" ও তৎপরবৎসর "ধর্ম্মতত্ত্ব" প্রচারিত হয়। বামাবোধিনী অদ্যাপি জীবিত আছে। ধর্ম্মতত্ত্ব এখন বড় একটা দেখিতে পাই না, শুনিতে পাই উহাও নাকি শকুন্তলার কঞ্চুকীর মত "প্রস্থানবিক্লবগতি" হইলেও আসর ছাড়ে নাই। ধর্ম্মতত্ত্ব কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বাধীন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র ছিল। ইহা প্রথমে মাসিক পত্রিকা ছিল, পরে পাক্ষিক হয়।

দিগ্দর্শন হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্গদর্শনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রকাশিত বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের সংখ্যা বড় কম নহে, কতকগুলি কেবল দলাদলির পুষ্টি ও গালাগালিই জীবনের প্রধান ব্রত করিয়া লইয়াছিল। অনেকগুলি—বিশেষতঃ তত্ত্ববোধিনী—দেশীয় সমাজকে সুনীতি ও সুরুচি শিক্ষাদেওয়া ও মিশনারিগণের আক্রমণ হইতে হিন্দুসমাজকে রক্ষা করা প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছিল। বস্তুতঃ তত্ত্ববোধিনী বঙ্গদর্শনের জন্য কার্য্যক্ষেত্র আংশিকরূপে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। তত্ত্ববোধিনীর তত্ত্বকথা কতকটা এক ঘেঁয়ে ছিল। কিন্তু তাহাতে জানিবার, ভাবিবার ও শিখিবার বিষয় যথেষ্ট থাকিত। ভাবুক পাঠকেরা তত্ত্ববোধিনীকে আদর করিতেন, তত্ত্ববোধিনী দ্বারা সমাজের যে উপকার হইতেছিল তাহা স্মরণ করিয়া তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন। তদানীন্তন বাঙ্গালা পাঠকগণের মনের উপর ইহার প্রভাবও কম বিস্তৃত হয় নাই। কথিত আছে, তত্ত্ববোধিনীতে ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তা-বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে বহু ব্যক্তি নিজ নিজ বাড়ীতে ব্যায়ামশালা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; আমিষ অপেক্ষা নিরামিষভোজনের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে বহু হিন্দু ও ব্রাহ্ম যুবক মৎস্য-মাংস বর্জ্জন করিয়াছিলেন; মদ্যপানের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে কেহ কেহ নাকি মদ্যও ত্যাগ করিয়াছিলেন *। তার পর একদিন যখন তত্ত্ববোধিনীর তৈয়ারি আসরে বঙ্গদর্শন বিচিত্র সুরে ও বিচিত্র তালে বাঁধা সম্পূর্ণ নূতন ধরণের সঙ্গীত কণ্ঠে করিয়া আবির্ভূত হইল, তখন সামাজিকগণ সমস্বরে জয়ধ্বনি করিয়া তাহাকে অভ্যর্থিত করিলেন; তাঁহারা স্পষ্ট উপলব্ধি করিলেন যে, সাময়িক সাহিত্যে এত দিনে অসামান্য প্রতিভার জগন্মোহিনী আলোকচ্ছটা পতিত হইয়াছে। যাঁহারা বিলাতী magazine এর বিষয়বৈচিত্র্য ও রচনাকৌশলের অনুরাগী ছিলেন, তাহারা তদনুরূপ বস্তু বাঙ্গালা ভাষায় পাইয়া

* বাঙ্গালা সাময়িক পত্রিকা সমূহের সবিস্তর বিবরণ জানিতে হইলে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার প্রণীত "বাঙ্গালাসাময়িক সাহিত্য" (প্রথম খণ্ড) দ্রষ্টব্য। উদ্ধৃত বিবরণ সঙ্কলনে ঐ গ্রন্থ হইতে বিপুল সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

তাহার আদর করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথম সংখ্যা হইতেই বঙ্গদর্শনের প্রতিষ্ঠা দেশে বদ্ধমূল হইল—তার পর যে চারিবৎসর বঙ্কিম উহার সম্পাদকতা করেন তত দিন ঐ প্রতিষ্ঠার ক্রমশঃ বৃদ্ধিই হইয়াছে। শচীশবাবুর গ্রন্থে দেখা যায় 'বঙ্গদর্শন' প্রথম সংখ্যা একসহস্র মাত্র মুদ্রিত হইয়াছিল। চারিমাস মধ্যেই উহার গ্রাহকসংখ্যা দেড়গুণ হয়, পরে দ্বিগুণ হইয়াছিল। বঙ্কিম যখন বঙ্গদর্শন উঠাইয়া দেন তখন উহার গ্রাহকসংখ্যা নাকি ষোলশত। সে যাহা হউক, এখন যে বাঙ্গালা দেশে শিক্ষার এত বিস্তার ও বাঙ্গালা সাহিত্যের, বিশেষতঃ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যের প্রতি বাঙ্গালীর এত আদর হইয়াছে শুনিতে পাই, এখনও কয়খানি মাসিকপত্রের সংখ্যা সে কালের বঙ্গদর্শনের গ্রাহকসংখ্যা হইতে অধিক? চারিবৎসর পরে বঙ্কিম যখন ঐ পত্রখানি উঠাইয়া দেন, তখন বাঙ্গালা পাঠকসমাজে যে বিষাদ ও পরিতাপ দৃষ্ট হইয়াছিল তাহার তুলনা কোনও দেশের সাহিত্যের ইতিহাসে মিলে না। কবি নবীনচন্দ্র লিখিয়াছেন, "বঙ্গদর্শনের অদর্শনের সহিত বঙ্গ সাহিত্যে এবং আমাদের হৃদয়ে যেন একটা নিরানন্দ ও নিরুৎসাহ সঞ্চারিত হইয়াছিল।" * প্রতিযোগী মাসিক পত্রগুলি পর্য্যন্ত 'বঙ্গদর্শনের বিদায়ে' আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিল। আর্য্যদর্শন-সম্পাদক লিখিয়াছিলেন "জ্যেষ্ঠ সহোদরের মৃত্যু সংবাদে যে যাতনা, এই সংবাদে আজ আমাদের সেই যাতনা উপস্থিত হইল।.........আজ চারিবৎসর বঙ্গদর্শন বঙ্গীয় সাহিত্যসমাজের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইতেছে.........আজি চারিবৎসর বঙ্গীয় সাহিত্যসমাজে এক নবজীবন সংক্রামিত হইয়াছে.........." ইত্যাদি †। 'বান্ধব' সম্পাদক স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ অন্তর্দৃষ্টিসহকারে লিখিয়াছিলেন, "আমরা আশা করি বঙ্গদর্শন শীঘ্রই আবার অন্য কোনও মূর্ত্তিতে পুনর্জ্জীবিত হইবে।.........বাঙ্গালায় আজিও সাহিত্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, আজিও শিক্ষাভিমানী বাঙ্গালীর সহিত বাঙ্গালার দৃঢ় সম্বন্ধ জন্মে নাই, আজি পর্য্যন্তও বাঙ্গালার অভাব ও প্রভাবের সীমারেখা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। যে পর্য্যন্ত না এ সমস্ত গুরুতর কার্য্য সুসম্পন্ন হয়, সে পর্য্যন্ত আমরা বঙ্গদর্শনের মত প্রতিভান্বিত সহায়কে বিদায় দিতে পারিব না।" †

বাঙ্গালা সাহিত্যের এমন গৌরবের বস্তু, বাঙ্গালীর এমন আদরের ধন বঙ্গদর্শনকে বঙ্কিমচন্দ্র অকালে কেন উঠাইয়া দিলেন তৎসম্বন্ধে অনেক জল্পনা হইয়াছে। চতুর্থ বৎসরের শেষ সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনের বিদায়' নামক প্রবন্ধে লিখেন—

"চারি বৎসর গত হইল বঙ্গদর্শন প্রকাশ আরম্ভ হয়। যখন ইহাতে আমি প্রবৃত্ত হই, তখন আমার কতকগুলি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। পত্রসূচনায় ‡ কতকগুলি ব্যক্ত করিয়াছিলাম; কতকগুলি অব্যক্ত ছিল, এক্ষণে তাহার অধিকাংশই সিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে আর বঙ্গদর্শন রাখিবার প্রয়োজন নাই।

যখন বঙ্গদর্শন প্রকাশারম্ভ হয়, তখন সাধারণের পাঠযোগ্য অথচ উত্তম সাময়িক পত্রের অভাব ছিল। এক্ষণে তাদৃশ সাময়িক পত্রের অভাব নাই। যে আভাব পূর্ণ করিবার ভার বঙ্গদর্শন গ্রহণ করিয়াছিল, এক্ষণে বান্ধব, আর্য্যদর্শন প্রভৃতির দ্বারা তাহা পুরিত হইব। অতএব বঙ্গদর্শন রাখিবার আর প্রয়োজন নাই। যদি কেহ বঙ্গদর্শনের এমত বন্ধু থাকেন যে, বঙ্গদর্শনের লোপ তাঁহার কষ্টদায়ক হইবে, তাঁহার প্রতি আমার এই নিবেদন যে যখন আমি এই বঙ্গদর্শনের ভার গ্রহণ

* "আমার জীবন" ২য় ভাগ।

† আর্য্যদর্শন শ্রাবণ, ১২৮৩

† বান্ধব আষাঢ়, ১২৮৩

‡ 'বঙ্গদর্শনের' সূচনা প্রবন্ধ "বিবিধপ্রবন্ধ" ২য় ভাগে মুদ্রিত হইয়াছে।

করি, তখন এমত সঙ্কল্প করি নাই যে যত দিন বাঁচিব এই বঙ্গদর্শনে আবদ্ধ থাকিব।............ ইহসংসারে এমন অনেক গুরুতর ব্যাপার আছে বটে যে, তাহাতে এই জীবন মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত নিবদ্ধ রাখাই উচিত। কিন্তু এই ক্ষুদ্র বঙ্গদর্শন তাদৃশ গুরুতর ব্যাপার নহে।

বঙ্গদর্শন আপাততঃ রহিত করিলাম বটে, কিন্তু কখনও যে এই পত্র পুনর্জ্জীবিত হইবে না এমত অঙ্গীকার করিতেছি না। প্রয়োজন দেখিলে স্বতঃ বা অন্যতঃ ইহা পুনর্জ্জীবিত করিব ইচ্ছা রহিল।

'বঙ্গদর্শনের বিদায়' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন উঠাইয়া দিবার স্পষ্ট কোনও হেতু দেন নাই। পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এতৎসম্পর্কে বলিয়াছেন, "(বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন) কেন ছাড়িয়া দেন, অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কোন খোলসা জবাব পাই নাই। টাকার অভাবে যে উহা ছাড়েন নাই, তা নিশ্চয় ... ... তিনি ছাপাখানার কাজ বেশ বুঝিতেন। তবে সম্পাদকতা ছাড়িলেন কেন, ঠিক বুঝা যায় না। বোধ হয় তিনি ঝঞ্ঝাট ভাল বাসিতেন না, এবং সঞ্জীব বাবুর একটা উপায় হয়, সেটাও তাঁহার ইচ্ছা ছিল। সঞ্জীববাবু খুব রসিক লোক ছিলেন, একদিন একজন বড় সাহেবের সহিত রসিকতা করিতে গিয়া তাঁহার ডেপুটিগিরিটি যায়। তখন তিনি সব-রেজিষ্ট্রার থাকিলেন, কিন্তু এখানেও তিনি বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। তাই বঙ্গদর্শন একবৎসর বন্ধ থাকার পর ১২৮৪ সনে সঞ্জীববাবুর সম্পাদকতায় আবার বাহির হয়। কিন্তু বঙ্কিমবাবু কার্য্যতঃ বঙ্গদর্শনের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন, তিনি নিজে ত লিখিতেনই, অন্য লোকের লেখা পছন্দ করিয়া দিতেন, অনেককে বঙ্গদর্শনে লিখিবার জন্য লওয়াইতেন, অনেকের লেখা সংশোধন করিয়া দিতেন। পূর্ব্বেও তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে যেমন চলিত বঙ্গদর্শন এখনও তেমনি চলিতে লাগিল।*

শাস্ত্রী মহাশয় যে লিখিয়াছেন, "সঞ্জীববাবুর একটা উপায়" করা বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন উঠাইয়া দিবার অন্যতম উদ্দেশ্য হইতে পারে, তাহা সমীচীন মনে হয় না। তাহা হইলে বঙ্গদর্শন পুনঃ প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে এক বৎসর বন্ধ থাকিত না। এতৎসম্বন্ধে কবি নবীনচন্দ্র প্রভৃতি যাহা বলিয়াছেন সব মিলাইয়া দেখিলে মনে হয় প্রধানতঃ পত্রিকাপরিচালনের ঝঞ্ঝাটের দরুণই বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' উঠাইয়া দেন। চাকরির ঝঞ্ঝাটের উপর 'বঙ্গদর্শনের' ঝঞ্ঝাট তাঁহার নিকট প্রায় আত্মকৃত ব্যাধিতুল্য হইয়া উঠিয়াছিল। হয়ত ধূমায়মান পারিবারিক অশান্তিবহ্নিও তাঁহার ঝঞ্ঝাটের বৃদ্ধি করিয়াছিল। কিন্তু ইহাই সমগ্র কারণ নহে। বঙ্কিমবাবু কবি নবীনচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন শেষ দিনে বঙ্গদর্শনের প্রায় তিন ভাগ লিখিবার ভার তাঁহার উপর পড়িয়াছিল। নিজের ঘাড়ে লিখিবার ভার অধিক পড়ায় অনেক সময়ে তাঁহাকে সত্বরতার সহিত রচিত অপেক্ষাকৃত অসতর্ক যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধদ্বারা * বঙ্গদর্শনের ফর্ম্মা পূরণ করিতে হইয়াছে। বাহিরে প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে যাহাই হউক, চতুর্থবর্ষের 'বঙ্গদর্শন' যে প্রথম তিনবৎসরের 'বঙ্গদর্শন' অপেক্ষা প্রবন্ধাবলীর গুণগরিমায় হীন হইয়া পড়িতেছিল, ইহা বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। এদিকে 'আর্য্যদর্শন', 'বান্ধব' দ্রুতপদে বঙ্গদর্শনের সমকক্ষতা লাভ করিতেছিল। বঙ্গদর্শনের ব্রতোদ্‌যাপনার্থ প্রথম হইতেই বঙ্কিমচন্দ্রকে বাধ্য হইয়া নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে হইত। সাহিত্যসেবার জন্য রবীন্দ্রনাথের ন্যায় বঙ্কিমের অবসর পর্য্যাপ্ত ছিল না। মানুষ সকলকে ফাঁকি দিতে পারে, চাকরিকে ফাঁকি দিতে পারে না। চাকরির দৈনন্দিন দায় ষোল আনা পরিশোধ করিয়া সাহিত্যসেবার জন্য তিনি যে সময়টুকু পাইতেন, 'বিজ্ঞানরহস্য' 'লোকরহস্য' 'গদ্য পদ্য'

* নারায়ণ, বৈশাখ ১৩২২।

* স্বতন্ত্র প্রবন্ধে এতৎসম্বন্ধে সবিস্তর আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

অন্তর্ভূক্তিতে সংগৃহীত প্রবন্ধাবলীর অধিকাংশের ন্যায় বঙ্গদর্শনের বিষয়বৈচিত্র্যসাধনই যাহাদের একমাত্র না হইলে অন্ততঃ প্রধানতম উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়, তাদৃশ প্রবন্ধমালার রচনায় সে সময়টুকুও ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে প্রয়োগ করা বঙ্কিমের পক্ষে মহত্তর কার্য্য সাধন পটীয়সী শক্তির অপপ্রয়োগ নয় কি? তিনি চারিবৎসর যে ভাবে বঙ্গদর্শন চালাইয়াছিলেন, তাহা একমাত্র তাঁহার ন্যায় লোকোত্তরপ্রতিভাশালী লোকের পক্ষেই সম্ভব ছিল। কিন্তু এই চারিবৎসরে তিনি হয়ত মনে করিয়াছিলেন যে, বঙ্গদর্শনের ঐ সকল চুটকি বাঙ্গালীর প্রতি তদীয় প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান নহে; এবং তিনি যথেষ্ট অবসর পাইলে যাহা দিতে পারেন, বঙ্গবাসীদিগকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিতেছিলেন। তাই অন্ততঃ স্বদেশবাসিগণকে স্বীয় প্রতিভার যোগ্য দান হইতে চিরবঞ্চিত না রাখিবার উদ্দেশ্যে, অন্ততঃ নিজের পর্য্যাপ্ত সময়াভাবের ফলে * বঙ্গদর্শন উত্তরোত্তর নিকৃষ্টতর রচনায় পূর্ণ না হয় সেই জন্য বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের বিলোপসাধন করিলেন। কালিদাসের ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের "যশঃশরীরে দয়ালু" হইয়া তাহার "ভৌতিক পিণ্ডে অনাস্থা" প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

অনেক বিজ্ঞ ও কৃতী লেখকই 'বঙ্গদর্শনের' ব্রতোদ্যাপনে সাহায্য করেন। তাঁহাদের প্রধান কয়েকজনের নাম এস্থলে উল্লিখিত হইতে পারে; দীনবন্ধু মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশনাথ রায়, তারাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, রামদাস সেন, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, লালমোহন বিদ্যানিধি, শ্রীকৃষ্ণ দাস, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ইত্যাদি। কিন্তু আধুনিক কালের মাসিক পত্রিকাগুলিতে যেমন প্রায় প্রত্যেক প্রবন্ধেরই নীচে লেখকের নাম দেওয়া হয়, বঙ্গদর্শনে তাহা হইত না। কদাচিৎ দুই একটি নাম দেখা যায় মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্র গল্প ও উপন্যাস ছাড়া স্বয়ং যে সকল প্রবন্ধ ও সমালোচনা রচনা করেন, তাহার প্রায় সকলগুলিই তিনি উত্তরকালে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি তিনি "বিজ্ঞান রহস্য" (১৮৭৫) নামে প্রকাশিত করেন। "লোকরহস্যে" কয়েকটি কৌতুককর চুটকির সহিত সমসাময়িক রুচিবিকার-প্রভৃতির প্রতি তীব্র কটাক্ষপূর্ণ প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 'বিবিধ সমালোচনা' (১৮৭৬) 'উত্তর চরিত' শীর্ষক প্রবন্ধ' 'অবকাশ রঞ্জিনী'র সমালোচনাত্মক 'গীতি কাব্য' প্রবন্ধ, 'প্রকৃত এবং অতি প্রকৃত' 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব', শ্যামাচরণ শ্রীমানি-প্রণীত 'সূক্ষ্ম শিল্পের উৎপত্তি ও আর্য্য জাতির শিল্পচাতুরী'-নামক গ্রন্থের সমালোচনামূলক 'আর্য্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প'-শীর্ষক প্রবন্ধ, ও 'দ্রৌপদী' (প্রথম প্রস্তাব) প্রকাশিত হয়। ঐ প্রবন্ধগুলি পরে 'বিবিধ প্রবন্ধ' ১ম খণ্ডে স্থান পাইয়াছে। 'বিবিধ প্রবন্ধ' দ্বিতীয় খণ্ডেও বঙ্গদর্শনের কয়েকটি প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে। উহার অন্য প্রবন্ধগুলি প্রচারে প্রকাশিত হয়। 'কবিতা পুস্তকে' (১৮৭৮) বঙ্কিমের কয়েকটি স্বরচিত কবিতা ও তিনটি গদ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, দ্বিতীয় সংস্করণে ('গদ্য পদ্যে') বঙ্গদর্শন হইতে আরও একটি গদ্য প্রবন্ধ ('দুর্গোৎসব') এবং প্রচার হইতে 'পুষ্প নাটক' ও 'রাজার উপর রাজা' কবিতা সন্নিবেশিত হয়। 'কমলাকান্তের দপ্তরে' (১৮৭৬) প্রথমে তাঁহার স্বকৃত কয়েকটি প্রবন্ধই প্রকাশিত হয়, পরে ঐ গ্রন্থ সঞ্জীবচন্দ্র-সম্পাদিত বঙ্গদর্শন হইতে বঙ্কিমের রচিত "কমলাকান্তের পত্র"-গুলি ও "কমলা কান্তের জোবানবন্দী" প্রবন্ধ এবং তাঁহার

* দ্বিতীয় পর্য্যায়ের বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যায় "বঙ্গদর্শনের পুনরুত্থান" প্রবন্ধে বঙ্কিম লিখিয়াছিলেন, "ইউরোপীয় সাময়িক পত্র ও এতদ্দেশীয় সাময়িক পত্রের বিশেষ প্রভেদ এই যে, এখানে যিনিই সম্পাদক, তিনিই প্রধান লেখক, ইউরোপীয় সম্পাদক সম্পাদকমাত্র— কদাচিৎ লেখক। পত্র এবং প্রবন্ধের উদ্বাহের তিনি ঘটকমাত্র, স্বয়ং বরকর্ত্তা হইয়া সচরাচর উপস্থিত হন না। এবার বঙ্গদর্শন সেই প্রণালী অবলম্বন করিল।"

সম্পাদিত বঙ্গদর্শন হইতে ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার রচিত "চন্দ্রালোকে" ও ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় রচিত "স্ত্রীলোকের রূপ" এই প্রবন্ধদ্বয় সহ "কমলাকান্ত" এই নবনামে প্রকাশিত হয়। বলাবাহুল্য অক্ষয়বাবু ও রাজকৃষ্ণ বাবুর প্রবন্ধদ্বয় বঙ্গদর্শনে "কমলাকান্তে"র নামেই প্রকাশিত হইয়াছিল। চতুর্থ বর্ষের বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যায় কমলকান্তের নামে প্রকাশিত "মশক"- শীর্ষক প্রবন্ধটি কিন্তু পুণর্মুদ্রিত হয় নাই। বঙ্কিম বলিয়াছেন, উহা তাহার নিজের লেখা নহে, কাহার লেখা তাহা বলেন নাই। প্রবন্ধটি, কি ভাবে, কি রচনাকৌশলে, কমলাকান্তের অন্য সকল প্রবন্ধ হইতে একটু খাটো। "ঢেঁকি"-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ বঙ্কিমের নিজ রচনা হইলেও ভুলক্রমে "কমলাকান্তের" দ্বিতীয় সংস্করণের পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। কি ভাষার মাধুর্য্যে, কি ভাবের মনোহারিত্বে, কি শুভ্র, সংযত, সরস রসিকতায়, কি অকৃত্রিম স্বদেশপ্রেমে কমলাকান্ত বঙ্গদর্শনের গৌরব। কমলাকান্ত একধারে কবি, দার্শনিক, সমাজশিক্ষক, রাজনীতিজ্ঞ, ও স্বদেশপ্রেমিক; অথচ তাহাতে কবির অভিমান, দার্শনিকের আড়ম্বর, সমাজশিক্ষকের অরসজ্ঞতা, রাজনৈতিকের কল্পনাহীনতা, স্বদেশপ্রেমিকের গোঁড়ামি নাই। হাসির সঙ্গে করুণের, অদ্ভুতের সঙ্গে সত্যের, তরলতার সহিত মর্ম্মদাহিনী জ্বালার, নেশার সঙ্গে তত্ত্ববোধের, ভাবুকতার সহিত বস্তুতন্ত্রতার, শ্লেষের সহিত উদারতার এমন মনোমোহন সমন্বয় কে কবে দেখিয়াছে? কেহ কেহ এখনও জিজ্ঞাসা করে কমলাকান্তের দপ্তরের মৌলিকতা কতখানি? হায়রে অদৃষ্ট! "মৌলিকতা মৌলিকতা" করিয়া, অথবা আপনাদের দেশের সৃষ্টিমাত্রেরই মৌলিকতা সন্দেহ করিতে করিতে, দেশটা অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছে। কৈশোরে "কমলাকান্ত" প্রথম পাঠ করিবার পর যখন বিস্ময়ে আত্মহারা হইয়াছিলাম, তখন ইংরাজী সাহিত্যে জ্ঞানাভিমানী এক ব্যক্তি বড় গম্ভীরভাবে বলিয়াছিলেন, "ওটা De Quinceyর Confessions of an English Opium-Eater এর অনুকরণ।" বড় হইয়া বুঝিয়াছি উহা পণ্ডিতের যোগ্য উক্তি নয়। কমলাকান্তের দুই দশটা উক্তির অনুরূপ উক্তি বিশাল ইংরাজী সাহিত্যের কোথাও নাই এমন কথা বলিব না, কমলাকান্তের জোবানবন্দী Pickwick Papers এর Sam এর জোবানবন্দীর আদর্শে রচিত হইয়াছে তাহাও বিশ্বাস করি, তবু বলিব উহাতে কমলাকান্তের মৌলিকতার হানি হয় নাই।

সেকালের কোনও লোককে এখন বঙ্গদর্শনের বিশেষত্বের কথা জিজ্ঞাসা করিলে প্রায়ই শুনা যায়, বঙ্গদর্শন গ্রন্থাদি সমালোচনায় যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল, তেমনটি আর বাঙ্গলা সাহিত্যে হয় নাই। বঙ্গদর্শনের সমালোচনা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, বঙ্কিম এক হস্তে পুষ্পমাল্য, অন্য হস্তে সম্মার্জ্জনী লইয়া পুস্তকসমালোচনায় অগ্রসর হইতেন। যে সকল লেখকের রচনায় প্রতিভার চিহ্ন না পাইতেন, বাঙ্গালা সাহিত্য তাহাদের হস্তকণ্ডুয়নের উৎপাতে উৎপীড়িত ও ভারাক্রান্ত না হইয়া পড়ে তজ্জন্য তিনি এমন তীব্র সমালোচনা করিতেন যে, তাদৃশ লেখক যেন গোড়াতেই সাহিত্যসৃষ্টির দুরাশা পরিত্যাগ করে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থ গুণবান্ লোককে যথোচিত আদর করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না; এমন কি প্রতিযোগী পত্রিকাগুলিরও মুক্তকণ্ঠে গুণগান করিতেন। 'আর্য্যদর্শন' সম্বন্ধে বঙ্গদর্শন বলিয়াছিলেন, "এখানির বিশেষ পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক, আপনার গুণে ইহা সকলের নিকট পরিচিত হইয়াছে।" "বান্ধব" পত্রিকা প্রকাশিত হইলে বঙ্কিম বলিয়াছিলেন—"পশ্চিম বাঙ্গালায় অনেকগুলি উৎকৃষ্ট মাসিকপত্র প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সেরূপ ছিল না। অথচ পূর্ব্ববঙ্গবাসিগণ পশ্চিমবঙ্গবাসিগণ অপেক্ষা বিদ্যাবুদ্ধিতে ন্যূন ইহা আমরা স্বীকার করি না। অতএব ঢাকা হইতে এই উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রের প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে

...য় আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। ......
...ে ক্ষুদ্র হইলেও গুণে অন্য কোন পত্রাপেক্ষা লঘু
...আমাদিগের বোধ হইল না। রচনা অতি সুন্দর
... লেখকদিগের চিন্তাশক্তি অসামান্য। ইহা যে
...ায় একখানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট পত্র মধ্যে গণ্য হইবে
...য়ে আমাদিগের সংশয় নাই।" * সমালোচকের
...সম্বন্ধে বঙ্কিমের এমন উচ্চ ধারণা ছিল যে,
...সাহেব হারাণচন্দ্রকে তিনি বলিয়াছিলেন, "যদি
...হিত্যের যথার্থ উপকার করিতে চাও, তবে প্রকৃত
...লোচনা করিতে সুরু কর।" অবশ্য সমালোচনার
...ব্যায় কখনও কখনও বঙ্কিম যে মাত্রা অতিক্রম
...িয়া না যাইতেন তাহা নহে। কবি আনন্দচন্দ্র
...ের হেলেনা কাব্যের সমালোচনা ইহার দৃষ্টান্তস্থল।
...কাল পরে আর ঐ বিস্মৃতপ্রায় সমালোচনার
...বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া উক্ত কবির প্রতি সাধারণের
...নের সবীকৃত করিতে বাঞ্ছা করি না। বস্তুতঃ কবি
...নন্দচন্দ্র যে শক্তিহীন ছিলেন তাহা নহে; বঙ্গদর্শনের
...লোচনাই তদীয় যথোচিত প্রতিষ্ঠার প্রধানতম
...ন্তরায় হইয়াছিল।

বঙ্গদর্শনের সমালোচনায় শ্রদ্ধাস্পদ অক্ষয়চন্দ্র সরকার ...শয় বঙ্কিমের প্রধান সহযোগী হইয়াছিলেন। অক্ষয় ...র "শিক্ষানবিশের পদ্য" নামক পুস্তিকাখানি উপলক্ষ্য ...রিয়া বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, "অক্ষয় ...বুর ন্যায় প্রতিভাশালী গদ্যলেখক অল্পই বঙ্গদেশে ...গ্রহণ করিয়াছেন।" † সমালোচনায় অক্ষয়বাবুর তথা বঙ্গদর্শনের কৃতিত্বসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় ...যা বলিয়াছেন তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইবার যোগ্য—

এক সময়ে অক্ষয়চন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনের প্রধান ...য়ক হইয়া উঠেন। সেকালের বঙ্গদর্শনে অক্ষয়চন্দ্রের কোন কোন রচনা স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের বলিয়া সন্দেহ হইত। গ্রন্থসমালোচনার ভার অক্ষয়চন্দ্রের উপরই অর্পিত ছিল। সম্ভবতঃ কোন কোন সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'ছাপ'ও থাকিত। সেই সব সাহিত্যসমালোচনার মধ্যে তাঁহাদের মত এমন করিয়া প্রখরে মধুরে মিলাইতে এমন করুণ কঠোর কষাঘাত করিতে আর কেহ পারিতেন কি না সন্দেহ। 'মালঞ্চনিবাসিনঃ মধুসূদন সরকারস্য'কে এই ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসরেও ভুলিতে পারি নাই।......ফলতঃ বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন প্রচার বন্ধ হইয়া অবধি বাঙ্গালা সাহিত্যে সেরূপ সমালোচনার নিপুণতা আর কোথাও দেখিতে পাই না। নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শনে শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয় কিছুদিন সে ধারা রাখিয়াছিলেন, আর মাঝে মাঝে সাহিত্য-সম্পাদক মহাশয় সে পুরাণ স্মৃতিকে জাগাইয়া তুলেন। কিন্তু সচরাচর আর বাঙ্গালা সাহিত্যে সমালোচকের ধর্ম্মাসনে এমন একটিও যোগ্য ব্যক্তিকে দেখিতে পাই না। ইংরাজের আদালতে যেমন মোকদ্দমার সংখ্যা যতই বাড়িতেছে, ততই সরাসরি বিচারের পদ্ধতিটাও অযথা পরিমাণে প্রচলিত হইয়া পড়িতেছে, বাঙ্গালা সাহিত্যেও গ্রন্থকারের সংখ্যা যতই বাড়িয়া যাইতেছে, ততই সরাসরি ভাবে সমালোচনার প্রবৃত্তি ও রীতিও যেন বাড়িয়া চলিয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে এখন অনেক স্থলে সমালোচকের পদে মোসাহেব অধিষ্ঠিত হইয়াছে। এ অবস্থায় সাহিত্যের সম্মানরক্ষা বাস্তবিকই দায় হইয়া পড়িয়াছে। আর চারিদিকে এই অবনতিধারা প্রত্যক্ষ করিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র ও অক্ষয়চন্দ্র যে কাজটা একসময়ে এমন অসাধারণ কৃতিত্ব সহকারে করিতেন, তাহার মূল্য ও মর্য্যাদা যেন আমার চক্ষে ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। *

বিপিনবাবু কয়েকজন দক্ষ সমালোচকের নাম করিয়াছেন বলিয়া সত্যের অনুরোধে বলা আবশ্যক যে,

* বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১২৮১।

† বঙ্গদর্শন, আশ্বিন ১২৮১।

* শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল-প্রণীত "চরিত্রকথা" ২১৮-২১৯ পৃষ্ঠা।

বঙ্কিমের সমসাময়িক সাহিত্যিকগণের মধ্যে আর একজন মহারথী সমালোচনায় যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এক বঙ্কিমচন্দ্র ব্যতীত তাহার অন্য তুলনা নাই। ইনি বান্ধবসম্পাদক পরলোকগত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়। সুনিপুণ গুণগ্রাহিতায় কালীপ্রসন্ন বঙ্কিম অপেক্ষা বড় ন্যূন ছিলেন না। পলাশীর যুদ্ধ, দশমহাবিদ্যা, বৃত্রসংহার প্রভৃতির সমালোচনা ইহার দৃষ্টান্তস্থল। কিন্তু কোনও গ্রন্থের নিন্দা করিবার সময় বঙ্কিমের সমালোচনার ন্যায় তদীয় সমালোচনায় বিদ্রূপের বিষজ্বালা কদাপি উৎকট ভাব ধারণ করিত না। কালীপ্রসন্ন সাধারণ ভাবে দোষ প্রদর্শন করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন, কখনও কখনও বা উদারতাবশে গ্রন্থকারের অজ্ঞতাকে মুদ্রাকরের প্রমাদ বলিয়াও উপেক্ষা করিতেন। অযোগ্যের প্রতি বঙ্কিমের তাদৃশ উদারতা কখনও দেখা যাইত না।

সমালোচনা অর্থে সাধারণতঃ কোনও একখানি গ্রন্থের দোষগুণ প্রদর্শনই বুঝায়। বঙ্কিমের ও কালীপ্রসন্নের সমালোচনার আদর্শ ইহা অপেক্ষা অনেক উচ্চ ছিল। গ্রন্থসমালোচনা উপলক্ষ্য করিয়াও লোকের বুঝিবার, শিখিবার ও ভাবিবার যোগ্য কত কথার অবতারণা করা যাইতে পারে বাঙ্গালায় সেকালের বঙ্গদর্শন ও বান্ধবের সমালোচনা তাহার উদাহরণস্থল ছিল। বঙ্গদর্শন ও বান্ধবের পরে বাণীর বরপুত্র রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ও আধুনিক নানা গ্রন্থ লইয়া ঐরূপ, এমন কি স্থলে স্থলে তদপেক্ষাও উজ্জ্বলতর, সমালোচনা আমাদিগকে শুনাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের "প্রাচীন সাহিত্য" "আধুনিক সাহিত্য" "লোক সাহিত্য" নামক গ্রন্থত্রয়ে ঐরূপ কতকগুলি সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালায় সংস্কৃত গ্রন্থের সমালোচনা বিদ্যাসাগর মহাশয় হইতে আরব্ধ হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় বীটন সোসাইটিতে (Bethune Society) "সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব" নামক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন, উহাতেই বাঙ্গালায় সংস্কৃতসাহিত্যের আলোচনা প্রবর্ত্তিত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আলোচনা অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত; কিন্তু সংক্ষিপ্ত হইলেও, এদেশে কাব্যসমালোচনায় প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের অবলম্বিত পথ পরিহারপূর্ব্বক নূতন রীতি য়ুরোপীয় সমালোচকগণের অবলম্বিত পদ্ধতি সর্ব্বপ্রথম উহাতেই অনুসৃত হয়। আমাদের দেশের আলঙ্কারিকগণের বিবেচনায় রসাত্মক বাক্যমাত্রই কাব্য ছিল। এইরূপে কাব্যকে বড় খুচরা ভাবে দেখিতে দেখিতে তাঁহারা সমালোচনার আদর্শ খুব সূক্ষ্ম করিলেও বড় খর্ব্ব করিয়া ফেলিয়াছিলেন। যে প্রত্যেক লোমকূপ নিপুণভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতে চায়, সে সমস্ত দেহের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিবার যথেষ্ট সুযোগ পায় না; এমন কি, হয়ত ক্রমে ক্রমে তাহার সে ক্ষমতা লুপ্ত হইয়া যায়। প্রাচীন আলঙ্কারিকগণেরও সেই দোষ ঘটিয়াছিল, এবং তাঁহাদের ছন্দোনুবর্ত্তনকারী কবিগণেরও সেই দোষ ক্রমে বড় বিকটাকার ধারণ করিয়াছিল। নৈষধচরিত ঐ বিকট-রুচির উদাহরণ। নল-দময়ন্তীর কথা মহাভারতের অন্তর্গত একটি অতি রমণীয় উপাখ্যান। নল দময়ন্তীর পূর্ব্বরাগ, বিবাহ, বিবাহের পরে উভয়ের রাজ্যচ্যুতি, বনবাস, নল-কর্তৃক দময়ন্তীত্যাগ, পরে পুনর্ম্মিলন—এইরূপ উহার সকল অংশই মনোরম হইলেও বিবাহের পর হইতে পুনর্ম্মিলন পর্য্যন্ত অংশটুকুই অবশ্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু শ্রীহর্ষ নল-দময়ন্তীর কথাবলম্বনে কাব্য লিখিতে বসিয়া কেবল পূর্ব্বরাগ ও বিবাহ অংশটুকু গ্রহণ করিলেন, এবং ঐটুকু লইয়াই 'রসাত্মক বাক্য' যোজনা করিতে করিতে সুদীর্ঘ দ্বাবিংশতি সর্গ লিখিয়া ফেলিলেন। এমন অনুচিত ফেনান ফাঁপান সত্ত্বেও আমাদের দেশীয় পণ্ডিতগণের চক্ষে উহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্য। "তাবদ্ ভা ভারবের্ভাতি যাবন্মাঘস্য নোদয়ঃ। উদিতে নৈষধে কাব্যে ক্ক মাঘঃ ক্ক চ ভারবিঃ॥" ইতালীর রিনাইসেন্সের (নবযুগের) পরবর্ত্তী কালের শিল্প ও সাহিত্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, উহাতে there was an absence of what is big, and in its place there was excess. কালিদাস ভবভূতির পর হইতে সংস্কৃত সাহিত্যেও বৃহৎ কিছু সৃষ্ট হয় নাই; যাহা হইয়াছে তাহাতে আলঙ্কারিকগণ কর্তৃক

প্রশংসিত কতকগুলি ধর্ম্মের অযথা বাড়াবাড়ি দেখিতে পাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বভাবসিদ্ধ সুরুচি ও সহৃদয়তা-বলে, এবং সম্ভবতঃ ইংরাজীশিক্ষার গুণে আলঙ্কারিকগণের অবলম্বিত সমালোচনপদ্ধতির সঙ্কীর্ণতা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। উত্তরচরিত সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র একটু অতিরিক্ত জেদের সহিতই আলঙ্কারিকগণকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। আলঙ্কারিকগণের রীতিতে দুই একটী দোষ থাকিলেও তাহাতে কতকগুলি গুণও আছে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র—জেদ বশতঃ তাহাদের যথার্থ গুণগুলি আদৌ দেখিতে পান নাই। পাশ্চাত্য দেশে কাব্য সমালোচনায় প্লেটো হইতে এডিসন, জনসন পর্য্যন্ত প্রায় একই রীতি প্রচলিত ছিল। অবশ্য প্রত্যেক সমালোচকেরই নিজ নিজ কিছু বিশিষ্টতা আছে। এই রীতিতে প্রাচীন (গ্রীক) আলঙ্কারিকগণের প্রভাব অধিক। জনসনের পর এক নবপদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হয়। এই যুগের সমালোচকগণ গ্রীক আলঙ্কারিকগণের প্রভাব হইতে প্রায় মুক্ত ছিলেন। কোলরিজ, মেকেল প্রভৃতি ইহার উদাহরণ। বঙ্কিমচন্দ্র জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক মেকলের সমালোচন-পদ্ধতিই আদর্শ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তবে মেকলের মত তিনি অনুচিত অত্যুক্তিপ্রিয়তা প্রদর্শন করেন নাই। সে যাহা হউক, উত্তর চরিত বা জয়দেব বা বিদ্যাপতি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা সবই অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস না করিয়াও তাঁহার সুরুচিসম্মত রসজ্ঞতা ও সূক্ষ্মদর্শিতার প্রতি আমরা চিরকাল আদরযুক্ত থাকিতে পারি। * এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত ও ভূদেবলিখিত রত্নাবলীসমলোচনাও অদ্যাপি হৃদয়গ্রাহী। ইহার পর সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে ৺চন্দ্রনাথ বসু শকুন্তলার সমালোচনা করেন। কবি নবীনচন্দ্র নানাকারণে চন্দ্রনাথ বসুর প্রতি রুষ্ট ছিলেন, তাই 'আমার জীবনে' কোথাও তাহাকে "নষ্টচন্দ্র" বলিয়াছেন, কোথাও "নন্দী" বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন, কোথাও বা বলিয়াছেন যে চন্দ্রনাথ বসু "বঙ্কিমসূর্য্যের প্রতিভায় প্রতিভাত চন্দ্রমাত্র, সন্ধ্যার সময়ে বঙ্কিমবাবুর বাড়ী প্রত্যহই জুটিতেন, এবং বঙ্কিমবাবু যে সন্ধ্যায় যে বিষয়ে আলাপ ও ব্যাখ্যা করিতেন, তিনি পরদিন তাহা বিনাইয়া ফেনাইয়া প্রবন্ধ লিখিতেন"। * কিন্তু চন্দ্রনাথ বসুর শকুন্তলাতত্ত্ব এক সময়ে খুব আদরলাভ করিয়াছিল। অবশ্য ইহাও স্বীকার্য্য যে শকুন্তলাতত্ত্ব খুব দীপ্তিমতী প্রতিভা বা সুদূরব্যাপিনী সহৃদয়তার পরিচায়ক নহে, এবং সেই জন্যই রবীন্দ্রনাথের "শকুন্তলা" ও 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা" প্রভৃতি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে উহা ম্লান ও বিস্মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে। চন্দ্রনাথ বসুর পরে প্রাচীন সাহিত্যের বহু সমালোচকের অভ্যুদয় হইয়াছে, সকলের কৃতিত্ব এ প্রবন্ধে আলোচনীয় নহে। রবীন্দ্রনাথের নাম পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে; পণ্ডিতবর রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের 'কালিদাস,' 'শ্রীকণ্ঠ' প্রভৃতি গ্রন্থও অনেকেরই পরিচিত। সর্ব্বশেষে,

* বঙ্কিমচন্দ্র 'জয়দেব ও বিদ্যাপতি' প্রবন্ধে যে সব মত ব্যক্ত করিয়াছেন, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্, এ, মহাশয় স্বসম্পাদিত সানুবাদ গীতগোবিন্দের ভূমিকায় উহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। জয়দেবসম্বন্ধে সতীশবাবুর মতগুলিও সর্ব্বত্র বিনাপত্তিতে গ্রহণযোগ্য হয় নাই। বঙ্কিমের জয়দেবসম্বন্ধিনী উক্তিগুলিতে বিশেষ আপত্তিকর কিছু নাই, কিন্তু বিদ্যাপতিবিষয়ক উক্তিগুলি চণ্ডিদাসকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিলেই বোধ হয় বঙ্কিমের প্রয়োজন অধিক সিদ্ধ হইত।

"বিষবৃক্ষে" হরদেব ঘোষালের পত্রে প্রসঙ্গক্রমে সংক্ষেপে কাব্যে প্রণয়ের আদর্শ আলোচিত হইয়াছে। ঐ স্থানে হরদেব ঘোষাল কালিদাস, বায়রণ ও জয়দেবকে এক শ্রেণীতে ও সেক্ষপীয়র, বাল্মীকি, ও শ্রীমদ্‌ভাগবতকারকে অন্য শ্রেণীতে ফেলিয়াছেন। হরদেব ঘোষালের মতে কালিদাস রূপজ মোহের কবি। এই উক্তি নিতান্তই অসমীচীন ও অযৌক্তিক।

* "আমার জীবন", ৫ম ভাগ ৬০—৬১ পৃষ্ঠা।

কিন্তু কোনও কোনও হিসাবে সর্ব্বোপরি, পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। পাশ্চাত্য দেশে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে সাহিত্য সমালোচনায় 'বৈজ্ঞানিক প্রণালী' নামে যে প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে, তদনুরূপ সমালোচনা বাঙ্গালায় একরূপ মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় হইতেই আরব্ধ হইয়াছে বলা যায়। কিন্তু ইহা আরম্ভমাত্র। বিজ্ঞ ও সহৃদয় ব্যক্তিগণের হস্তে ইহার বহুল প্রসার বাঞ্ছনীয়।

(ঢাকা সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত)

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্ত কবিরত্ন।

অতিথি।

(কবিতা)

(১)

সে-দিন প্রভাতে অজানা অতিথি দাঁড়ালো' দুয়ারে আসি ;
কিছু না বলিয়ে,—চলে' গেল কোথা ; অধরেতে মৃদু হাসি।
ডাকিনু তাহারে ; বলিল সে সুধু,—"আজকে চলিনু ভাই ;
ভুলে' এসেছিনু ; অপরে ডেকেছে ;—তুমি মোরে ডাক নাই।"

(২)

বিংশতি বরষ চলিয়া গিয়াছে ;—তার কথা মনে নাই।
সহসা সে-দিন মনে হ'লো,—'তার কোথা গেলে দেখা পাই'!
তখন,—আকাশে বড় ঘনঘটা,—চপলা চমকি ধায় ;
ভীম প্রভঞ্জন,—প্রবল ঝঞ্ঝা,—মেদিনী কাঁপায়ে যায়।

(৩)

ভাবিনু সে-দিন,—বৃষ্টি-ঝটিকা থামিলে খুঁজিব তারে ;
তখনি দেখিনু,—অতিথি দাঁড়ায়ে আমার কুটীর দ্বারে।
এ-ঘোর দুর্য্যোগে আমার সন্ধানে সহিয়াছে ক্লেশ কত !
—কেন-জানিনা-কো, তাহারি চরণে করিনু মস্তক নত !!

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক।

মুর্শিদাবাদে একদিন।

বাংলা সাহিত্যে ভ্রমণ বৃত্তান্তের অভাব নাই। "ভারত ভ্রমণ" "দক্ষিণাপথ ভ্রমণ" "উত্তর-পশ্চিম ভ্রমণ" "কাশ্মীর ভ্রমণ," "সুন্দরবন ভ্রমণ"—ভ্রমণের একেবারে দিগ্বিজয়। ভ্রমণের ঘূর্ণীবায়ুতে একবার পাইয়া বসিলে চরিয়া বেড়াইবার ইচ্ছাটা যে দেশ চতুঃসীমার মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে, এমন হইতে পারে না। কাজেই "চীন ভ্রমণ" "জাপান ভ্রমণ" ও "ইউরোপ ভ্রমণ" ; "কবরের দেশে" ও দুনিয়ার পশ্চিমপ্রান্তে "গতাগতি ; এবং ভূপ্রদক্ষিণ।

সে দিন আর নাই—যখন আমাদের মহিলারা অন্তঃপুরের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যেই জীবন কাটাইয়া দিতেন এবং অকাল বৈধব্যের আশঙ্কায় লেখাপড়ার চর্চ্চা হইতে যথাসম্ভব দূরে থাকিতেন। ভ্রমণ এখন তাঁহাদের পক্ষে অস্বাভাবিক নহে। পুর-প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিতে পারিলে, সমস্ত পৃথিবী সম্মুখে মুক্ত—প্রসারিত। আর বাংলার কথাসাহিত্যকুঞ্জ ত এখন তাঁহাদের কলরবেই মুখরিত ; কবিতায় তাঁহাদের কৃতিত্ব ইতিপূর্ব্বেই সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ; এবং রাজনৈতিক সাহিত্যগগণেও তাঁহারা উকি ঝুঁকি মারিতেছেন, আভাষ পাওয়া যায়। এমন অবস্থায় আমাদের কোনও ভূতপূর্ব্বা, অসূর্য্যম্পশ্যা "নিশীথ সূর্য্যের দেশ" পর্য্যটন করিয়া "নরওয়ে ভ্রমণ" লিখিলে বিস্মিত হইবার কারণ নাই।

বৎসর কয়েক পূর্ব্বে প্রতাপাদিত্যের লীলাভূমি ঈশ্বরীপুর (প্রাচীন যশোর) এবং দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদনের

[illegible] সাগরদাড়ী দেখিতে গিয়াছিলাম। চারিদিকে ভ্রমণ [illegible] ছড়াছড়ি দেখিয়া মনে হইয়াছিল যে আমিও একটা [illegible] বৃত্তান্ত লিখিয়া ফেলি—"ঈশ্বরীপুরে অর্দ্ধঘণ্টা" কি "সাগরদাড়ীতে সতেরো মিনিট" এমনই একটা কিছু। কিন্তু [illegible] কুলায় নাই। তারপর গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার [illegible] জল সাগরাভিমুখে বহিয়া গিয়াছে। অনুমান [illegible] পারি যে অন্ততঃ অনুবাদের অনুবাদ সাহায্যেও [illegible] অনেকেই "৮০ দিনে ভূপ্রদক্ষিণ" করিয়াছেন, [illegible] "বেলুনে পাঁচসপ্তাহ" উড্ডীয়মান হইয়া "আকাশ [illegible]" করিয়াছেন। "দার্জ্জিলিঙ্গে দুই সপ্তাহ" কি সম্প্রতি [illegible] "শান্তিনিকেতনে একরাত্রি" যে আমার নির্ব্বাপিত-[illegible] উৎসাহকে উদ্দীপিত করে নাই তাহা বলিতে পারিনা। [illegible] আমার "মুর্শিদাবাদে একদিন" সাধারণ্যে প্রকাশ [illegible] সাহসী হইয়াছি। তবু এখনো একটা পূরোপূরি [illegible] আসরে নামিতে ভরসা পাই নাই। চাই কি, [illegible] এমন দিনও আসিতে পারে যখন "সাগরদাড়ীতে [illegible] মিনিট" লইয়া লোকসমক্ষে দাঁড়াইবার দুষ্প্রবৃত্তিও [illegible] লেখককে পাইয়া বসিতে পারে।

[illegible] গোড়াতেই একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল। আমার [illegible] বৃত্তান্তে "ভ্রমণ"ও বিশেষ নাই, এবং 'বৃত্তান্তের'ও [illegible]। 'বৃত্তান্তের' জন্য নিখিলবাবুর "মুর্শিদাবাদ কাহিনীর" [illegible] বরাত দিতেছি ; আর 'ভ্রমণ' টুকুর জন্য E. B. S. [illegible] এর টাইম টেবল (মূল্য মাত্র দুই আনা) দেখিলেই [illegible]। মুর্শিদাবাদ দর্শনে আমার মনে যে ভাব হইয়াছিল, [illegible] তাহা টুকিয়া রাখিবার খেয়াল হইয়াছিল। আজ [illegible] একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধাকারে পাঠকবর্গকে সসঙ্কোচে [illegible] করিতেছি।

'মুর্শিদাবাদ কাহিনী' পড়িয়া অবধি মুসলমান কীর্ত্তির [illegible] মুর্শিদাবাদ দেখিবার জন্য একটা প্রবল আগ্রহ [illegible]। সে বৎসর শিবরাত্রির ছুটী উপলক্ষে এই [illegible] চরিতার্থ করিবার সুযোগ ঘটে। রাত্রির ট্রেণে [illegible] হইতে আমরা তিন জন রওয়ানা হই। ক্রমে আমরা মুর্শিদাবাদ ষ্টেশনের সন্নিহিত হইলাম। ভোরের আলো তখন সবে মাত্র ফুটিয়াছে। ঔৎসুক্যের সহিত বাহিরের দিকে চাহিবামাত্রই অদূরে মতিঝিলের রমণীয় দৃশ্য দৃষ্টিপথে পতিত হইল। কি সুন্দর!—যেন নিপুণ শিল্পীর সযত্ন অঙ্কিত একটি মনোরম আলেখ্য। "The morning shows the day" (প্রভাতেই দিবসের সূচনা হয়)। সুতরাং দিনটা বেশ ভালই কাটিবে মনে করিয়া আমরা উৎফুল্ল হৃদয়ে ষ্টেশনে অবতরণ করিলাম।

প্রাচীন মুর্শিদাবাদ এখন বহরমপুর জেলার লালবাগ সবডিভিসনে পরিণত হইয়াছে। এই খানেই মতিঝিল, এবং মুর্শিদকুলি খাঁর সমাধিমন্দির কাটরার মসজিদ; এইখানেই মবারক মঞ্জিল এবং সুপ্রসিদ্ধ জাহান কোষাতোপ; এই খানেই নবাবের হাজার দুয়ারি প্রাসাদ; অনতিদূরে জাফরাগঞ্জে মিরজাফরের ভবন, সিরাজের বধ্যভূমি, এবং নবাব নাজিমগণের সমাধি স্থান; মহিমাপুরে জগৎ শেঠ-দিগের ভবনের ধ্বংসাবশেষ। ভাগিরথীর অপর তীরে খোসবাগের ছায়া শীতল আম্রকুঞ্জে সিরাজ ও আলীবর্দ্দি চিরনিদ্রিত।

মুর্শিদাবাদের প্রতি ইষ্টক এবং প্রস্তর খণ্ডের এক একটা ইতিহাস রহিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রতিপদে তাহার অতীত গৌরবের জীর্ণ ভগ্নাংশ মাত্র দৃষ্টি পথে পতিত হইয়া হৃদয় মধ্যে কেমন এক করুণ বেদনার সৃষ্টি করে। অশ্বপাদুকাকৃতি মতিঝিলের সুরম্য জলবেণীর মধ্যে পল্লবিত মুকুলিত আম্রকুঞ্জের আড়াল হইতে সুধা-ধবল ইমামবাড়ী ফাল্গুনের স্নিগ্ধমধুর উষালোকে আমার মুগ্ধচক্ষে যে সৌন্দর্য্যের ছবি ফুটাইয়া তুলিয়াছিল, তাহার আভাসমাত্র দেওয়াও আমার পক্ষে অসম্ভব। যদিও মতিঝিলের জলরাশিকে আর "pearly" (মুক্তাসন্নিভ) বলা যায় না; যদিও খাত স্থানে স্থানে শুষ্ক হইয়া পড়িয়াছে; যদিও জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীতে ইতস্ততঃ সঞ্চরমান প্রমোদ তরণীর উপর হইতে কলকণ্ঠ গায়িকাগণের সুমধুর সঙ্গীতলহরী মতিঝিলের সলিলরাশিকে আর উদ্বেল করিয়া তোলেনা;

তবু এখনও তাহা মনোহর। এখনও তাহার নির্ম্মলবক্ষ বিকশিত কমলদলে পূর্ণ; এখনও তাহার তীরস্থ উদ্যান-বাটিকার পথগুলি "শাখা থরথর, পাতা-মরমর, ছায়া সুশীতল"; এখনও তাহার আকাশ "কপোত-কূজনকরুণ", তবে উল্লাসের পরিবর্ত্তে বিষাদের অদৃশ্য অথচ অনুভবনীয় একটা সূক্ষ্ম আবরণে যেন তাহার সর্ব্বাংশ আবৃত।

কাটরার বিরাট মস্‌জিদের প্রবেশ দ্বারের সোপানাবলীর নিম্নে একটী ক্ষুদ্র অন্ধকারময় প্রকোষ্ঠে মুর্শিদাবাদ নগরীর প্রতিষ্ঠাতা মুর্শিদকুলি খাঁ অনন্ত নিদ্রায় শয়নে রহিয়াছেন। মস্‌জিদ-প্রবেশার্থী পুণ্যাত্মাগণের পদধূলি যেন তাহার বক্ষের উপর পতিত হয় এইজন্য সোপান নিম্নে সমাহিত হইবার ইচ্ছা তিনিই প্রকাশ করিয়া গিয়াছিলেন। পুরুষকারের সহিত বিনয়ের অপূর্ব্ব সম্মিলন! প্রবেশদ্বার অতিক্রম করিলে বিশাল চত্বর। চত্বরের পশ্চিম পার্শ্বে সুবৃহৎ মসজিদ। অর্দ্ধভগ্ন গগনস্পর্শী গম্বুজ চূড়া তাহার পূর্ব্বগৌরবের শেষ চিহ্ন। কিন্তু বিশ্বধ্বংসী কাল বুঝি অচিরেই সে শেষ চিহ্ন টুকুও বিলুপ্ত করিয়া ফেলিবে। মস্‌জিদের পশ্চাদ্ভাগে যে শত শত প্রকোষ্ঠ একদিন অসংখ্য কোরাণ পাঠার্থীদিগের আবৃত্তি-সঙ্গীতে মুখরিত হইয়া উঠিত, আজ সেগুলি শিবারবে শব্দায়িত সর্পশ্বাপদ সঙ্কুল। তবু দেখিলেই 'Ruins of great things are great' কথাটার যথার্থ্য উপলব্ধি হয়।

জাফরাগঞ্জের যে ভবনে নবাব হইবার পূর্ব্বে মীরজাফর অবস্থিতি করিতেন, তাহা সাধারণের নিকট "নিমকহারাম দেউড়ী" নামে পরিচিত হইয়াছে। কেননা, মীরজাফর "ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া আজন্ম যাহার অন্নে বর্দ্ধিত শরীর" তাহারই বিপক্ষে "কৃতঘ্নতা অসি" উত্তোলন করিয়াছিল। কেবল তাহাই নহে। সেই বিশ্বাসঘাতক আজন্ম অন্নদাতার রাজ্য লইয়াই সন্তুষ্ট রহে নাই, পশুর ন্যায় তাহার জীবন হননও করিয়াছিল। নিমকহারাম দেউড়ীর উত্তর পূর্ব্বকোণে নিম্ব বৃক্ষতলে বাংলার শেষ স্বাধীনতার বধ্যভূমি। ঐ স্থানেই মীরজাফরের পুত্র মীরণের আদেশে পাপিষ্ঠ মহম্মদী বেগের তরবারীর আঘাতে হতভাগ্য নবাব সিরাজউদ্দৌলার "তপ্তশোণিত তরল" ধরাতল রঞ্জিত করিয়াছিল। যুগ যুগান্তের অশ্রুজলে সে পাপ ধৌত হইবার নহে।

মহিমাপুরে জগৎশেঠদিগের বাসভবনের ভগ্নাবশেষ দেখিলাম। দেখিলাম, যে শেঠবংশের ঐশ্বর্য্যের কথা একসময়ে সমস্ত ভারতে প্রবাদের মত রাষ্ট্র ছিল, যে জগৎশেঠের নাম বাস্তবিক যথাতথা লক্ষমুদ্রা-সমকক্ষ ছিল, যাহাদের অতুল বিভব দেখিয়া বাস্তবিকই মনে হইত—

"সম্ভব হইবে লুপ্ত শারদ চন্দ্রিমা
অসম্ভব হবে লুপ্ত শেঠের গরিমা।"

সার্দ্ধশত বর্ষ অতীত হইতে না হইতেই সেই জগৎ শেঠদিগের সুরম্য হর্ম্ম্য আজ চূর্ণীকৃত—প্রস্তর-খণ্ড মাত্রাবশিষ্ট। "নীরব সেতার বীণা মুরজ মুরলী"। যে স্থানে একদিন রমণীয় উদ্যান শোভা পাইত আজ তাহা আসশ্যাওড়া ও কাল কাসিন্দার জঙ্গলে আচ্ছন্ন। ভাগিরথীর সলিল সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত যে অন্দর পথ একদিন শেঠপুরবধূগণের চরণালক্ত-রাগে রঞ্জিত হইত এবং কঙ্কণ-নিক্কণে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিত, আজ তাহার উপর দিয়া শৃগাল কুক্কুর দৌড়াদৌড় করিতেছে। ভাগ্য বিপর্য্যয়ের কি নিদারুণ ইতিহাস!

আর দেখিলাম ভাগিরথীর অপরতীরে পত্র পল্লব-নিবিড়, নিভৃত, নিস্তব্ধ খোসবাগ; আলীবর্দ্দী ও সিরাজ, দুই প্রকৃত নবাবের অন্তিম বিশ্রাম ভূমি। অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় আমরা নৌকায় চড়িয়া খোসবাগ অভিমুখে চলিলাম। সেই সময় 'সহস্র কিরণ' বারেক আর ফিরিয়া না চাহিয়া অস্তাচলে গমন করিলেন। আমাদের জনৈক সঙ্গী আবেগ পূর্ণ কণ্ঠে গাহিতে ছিলেন—

"আপন মনে উদাস প্রাণে, ধীরে ধীরে কোথা বহিয়া যাও
বল গো তটিনী শুনি কার ধ্বনি কাহার মহিমা জগতে জানাও।"

আমরা যখন খোসবাগের নিকট নৌকা হইতে অবতরণ করিলাম, সন্ধ্যার বিষাদমলিন ধূসর ছায়া তখন চারিদিকে

[illegible] আসিতেছিল। অৰ্দ্ধোন্মুক্ত ফটকের মধ্য দিয়া [illegible] খোসবাগে প্রবেশ করিলাম। ক্রমে দুইটী প্রাঙ্গণ [illegible] করিয়া আমরা সমাধি মন্দিরের বারান্দায় আসিয়া [illegible]। এক কোণে একটী মাটির প্রদীপ মিট মিট [illegible] জ্বলিতেছিল।—সেই স্তিমিতালোকে অন্ধকারটা আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল। জনপ্রাণীশূন্য—[illegible]শূন্য। আমরা মৌণ, মত পূর্ণ হৃদয়ে দাঁড়াইয়া। [illegible] সিরাজ, তাহার প্রিয়তমা পত্নী লুৎফুন্নিসা, আলীবর্দী [illegible] তাহার বেগম চির নিদ্রায় নিদ্রিত। আলীবর্দ্দী ও [illegible] আত্মা ইহজীবনে শান্তি লাভের অবকাশ পায় [illegible] খোসবাগের ছায়াচ্ছন্ন নীরবতার মধ্যে পাইয়াছে কি? [illegible] খোসবাগের সমাধিভূমি হইতে অপর পারের [illegible] দিকে চাহিয়া সিরাজের প্রেতাত্মা আজ ও দীর্ঘ-[illegible] ফেলে কি না? শিবচতুর্দ্দশী রজনীর ঘনান্ধকারে [illegible] মহাশ্মশানের উপর নিস্পন্দ ভাবে দণ্ডায়মান সমাধি [illegible] দিকে চাহিয়া দেবাদিদেব মহাদেবের ধ্যাননিশ্চল [illegible] গম্ভীর মূর্ত্তি আমার মনোমধ্যে জাগিয়া উঠিতেছিল। [illegible] অনির্ব্বচনীয় ভাবে সকলেরই হৃদয় ভরিয়া [illegible]ছিল। কথা কহিবার ইচ্ছা যেন কাহারও ছিল না। [illegible] ক্রমেই বাড়িতেছিল। আমরা ফিরিয়া চলিলাম। [illegible] "ধীরে ধীরে যাই, ফিরে ফিরে চাই।" ফিরিবার [illegible] ইচ্ছা হইতেছিলনা। কি একটা আকর্ষণ যেন [illegible]দিগকে খোসবাগের অভিমুখে টানিতেছিল। মতিঝিল [illegible] প্রাণে কাব্য সৌন্দর্য্য জাগিয়া উঠে, খোসবাগ দেখিয়া [illegible] বৈরাগ্যের ভাবে হৃদয় ভরিয়া যায়।

ফিরিয়া আবার নৌকায় চড়িলাম। অপর পারে [illegible] পার্শ্বস্থ রাজপথে কয়েকটি আলো জ্বলিতেছিল এবং [illegible] হইতে সন্ধ্যা আরতির শঙ্খ ঘণ্টার ধ্বনি মৃদুভাবে [illegible] আসিতেছিল। মনে পড়িল, একদিন "দীপাবলী-[illegible] উজ্জ্বলিত নাট্যশালাসম" বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ [illegible] আলোক মালায় সজ্জিত হইয়া ঝলমল্ করিত; আর [illegible]রথী আপনার প্রশস্ত নির্ম্মল হৃদয়ে সে ছবি প্রতিফলিত করিয়া আহ্লাদে কুলুকুলু রবে বহিয়া যাইত। কিন্তু হায়, সে মুর্শিদাবাদ আর নাই। মুর্শিদাবাদ শ্রীহীন, ভাগীরথীও গৌরববিহীন। এক সময় যে মুর্শিদাবাদ "was just like London, only it was more populous and more wealthy"—সে মুর্শিদাবাদ কবির কল্পনা, স্বপ্নের বিভ্রম বলিয়া এখন মনে হয়। আর মনে হয়

> "যদুপতেঃ ক্বগতা মথুরাপুরী
> রঘুপতেঃ ক্বগতা উত্তর কোশলা।"

একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাসে ভাবনার পরিসমাপ্তি হয়।

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী।

কবিরাজ রহস্য।

প্রতিভায় 'কবিরাজ' উপাধির রহস্য নির্ণয়ের চেষ্টা দেখিলাম। "বৈদ্য" শব্দটি জাতি অর্থে গ্রহণ না করিয়া 'চিকিৎসক' বা 'ভিষক' অর্থে গ্রহণ করিলেই কেহ কেহর মতে সমস্ত লেঠা চুকিয়া যায়। আমাদেরও সেই মত। এবিষয়ের বহু পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত উমেশ পণ্ডিতের ভূতপূর্ব্ব মন্দার মালায় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছিলাম। কথাটা যখন আবার উঠিয়াছে তখন পুনরাবৃত্তিতে দোষ নাই। বৈদ্যেরা কবিরাজ কি ডাক্তার? যাঁহারা তিন ঘণ্টা অন্তর এক এক দাগের ব্যবস্থা করিয়া প্রস্থান করেন, তাঁহারা ডাক্তার; আর্য্যাচার্য্যরা "মধু" ময় কাব্যরস পান বা লেহন করিতে সদুপদেশ দেন, তাঁহারা সুরসিক কবিরাজ। হাঁ, কাব্যরস পান করাই বটে; কারণ কবিরাজী ঔষধে নানা অনুপানের রস আছে; এবং বসন্তকুসুমাকর রস, মদনানন্দ মোদক, চিন্তামণি চতুর্ম্মুখ, ভৃঙ্গরাজ প্রভৃতি ভেষজ (কত নাম বলি?) নিয়তই কবিত্বের ঝঙ্কার করিতেছে। বিদ্যা ও কবিত্বের দাবীতেই বৈদ্যগণ (চিকিৎসকগণ if you please) কবিরাজ। আর কবি হইলে ডাক্তারও হইতে হয়।

দৃষ্টান্ত; রবীন্দ্র নাথ এতকাল ছিলেন কবি—রাজ, এখন হইয়াছেন ডাক্তার। প্রাচীন কবিরাজ ও আধুনিক ডাক্তার উপাধি দুই-ই এক, তা চিকিৎসার ডিপ্লোমাই বল, কিংবা অন্য কোন বিদ্যাবত্তার ডিগ্রিই বল। মোট কথা, সংস্কৃত আমলে বিদ্যা মন্দিরের সা-দরজায় লগুড় হস্ত প্রহরী অষ্টপ্রহর খাড়া থাকিত; কাব্য জ্ঞানের নিদর্শন না থাকিলে ভিতরে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। এখন সে পাহারার কড়াকড়ি নাই। এখন দরজা দিয়া ঢুকিতে না পারিলেও unable to paas the *Entrance* examinar "কবিরাজ কি হোমিওপ্যাথ। অন্য গতি না থাকিলেই কাসী কিংবা--কবিরাজী।

কবিরাজ কথাটির সর্ব্বাদৌ চিকিৎসা শাস্ত্রের সহিত কোন সম্পর্ক ছিল না। বৈদ্য কে? যিনি বিদ্বান্। যথা;

বিপ্রস্য সেবধির্ব্বিদ্যা বিদ্যা তু জ্ঞানরূপিণী।
বেদান্তবেদরূপা সা সর্ব্বশাস্ত্র স্বরূপিণী॥
আরাধিতা সদা যত্নাৎ জ্ঞানেভি ব্রহ্মচারিভিঃ।
ব্রহ্মবিদ্যা সমাখ্যাতা মহাবিদ্যা তথাপি সা॥
"ষ্ণ" প্রত্যয় সমাযোগাৎ বিদ্যয়া চ তথা কিল।
বৈদ্য শব্দঃ সমুৎপন্নঃ বিদ্বদ্বাচকস্ত শচ সঃ॥
অধীত সর্ব্ব শাস্ত্রার্থাঃ চতুর্ব্বেদ-পরায়ণাঃ।
অপ্রমত্তাং সদা শান্তা বৈদ্যা জ্ঞেয়াস্তথা কিল॥

কুলদা-কিঙ্কর।

বৈদ্য ও কবিরাজ শব্দের একটিও পরমার্থতঃ ভিষগ্ বাচী নহে। বেদ+ষ্ণ্য বা বিদ্যা+ষ্ণ=বেদজ্ঞ বা বিদ্বান। তদানীন্তন অম্বষ্ঠাদি চিকিৎসকেরা অশেষ শাস্ত্রে পারদর্শী হইতেন, চারিবেদে কৃতশ্রম থাকিতেন। এজন্যই তাঁহাদিগকে লোকে বৈদ্য বলিত। এবং তজ্জন্য কবিরাজ শব্দের ন্যায় কালে বৈদ্য শব্দও চিকিৎসক অর্থের দ্যোতনা আরম্ভ করে। কবিনু রাজা ইব কবিরাজঃ। তদানীন্তন চিকিৎসকেরা সকলেই সুকবি হইতেন। যেমন মুগ্ধ বোধ ও ভাগবত প্রণেতা বৈদ্যক গ্রন্থকার "ভিষক কেশব নন্দন" বোপদেব গোস্বামী, সাহিত্য দর্পণ প্রণেতা নবহট্ট কাঁচড়াপাড়া নিবাসী বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রভৃতি। ইহারা ও গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেব আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য চক্রপাণি; তৎপুত্র জগদীশ্বর জাতিতে বৈদ্য ছিলেন কি না সে তর্কে প্রয়োজন নাই। একথা সত্য—পূর্ব্বে ব্রাহ্মণদেরও "কবিরাজ" উপাধি ছিল। কর্পূরমঞ্জরী প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণকবি রাজশেখর নিজ বংশের পরিচয় গর্ব্বে বলিতেছেন;—

সমুদ্রো যত্রাসীদ্ গুণগণ ইবাকাল জননিঃ
সুখানন্দঃ সোঽপি শ্রবণপটপেযোন বচসা।
ন চান্যে গণ্যন্তে তরল কবিরাজ প্রভৃতয়ো
মহাভাগ স্তস্মিন্নরজনি যাযাবর কুলে।

অর্থাৎ, যে বংশে * * * "কবিরাজ" প্রভৃতি মহাত্মা আবির্ভূত হইয়াছিলেন সেই প্রসিদ্ধ ধন্যকুলে তাঁহার জন্ম। হাঁ, গৌরবের কথাই বটে, কারণ মহামহিমান্বিত কবিরাজ তাঁহার বংশের অন্যতম পূর্ব্বপুরুষ।

মহাত্মা অমৃতাচার্য্য বৈদ্যজাতির বীজি পুরুষ। তাঁহার দৌহিত্র বংশের দাশ, গুপ্ত, সেন প্রভৃতি মহাপুরুষগণ মহারাজ আদিশূরের সভা পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহাদের উপাধি কবি ছিল। যথা কবি দাশ। এখন যদি দাশ জীবিত থাকিতেন এবং নোবেল প্রাইজে স্পৃহা রাখিতেন তবে ইউনিভার্সিটির কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক নূতন নাম হইত ডাক্তার দাশ।

পূর্ব্বে জ্ঞানী মাত্রেই "কবি" ছিলেন। এমন যে কটমট ব্যাকরণ, তার কর্ত্তারাও কবি! "প্রপরাপ-সমনুব * * * উপসর্গাবিধিঃ কলিতঃ কবিনা।" কাব্য কি? কাব্যং রসাত্মকং বাক্যম্। পূর্ব্বে বিজ্ঞানের গ্রন্থেও কর্কশ ও নীরস বাক্যের ব্যবহার ছিল না। সমস্ত শাস্ত্রের বচন পদ্যময় সরল ভাবে গ্রথিত হইত। বাল্মীকি ব্যাধের কাণ্ড দেখিয়া কোথায় পাষণ্ডের মাতৃ পিতৃ নাম উচ্চারণ করিয়া গদ্যের আদ্যশ্রাদ্ধ করিবেন।

ভাবাক্রা করিয়া নেহাৎ ভাল মানুষের মত বলিয়া ফেলিলেন কি না কোমল মধুর শ্লোক! আমাদের উপনিষৎ "কেন" "কঠ" গুলিও ছন্দোবদ্ধ। জ্ঞানের কঠোর উপদেশময় কথাগুলিও "গীতা" (Song)। Schlegel গীতাকে the most philssophical poem of the world বলিয়াছেন। ভারতের চক্ষুমান দার্শনিকেরা এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সমস্তই ছন্দোবদ্ধ শৃঙ্খলিত পদ্যময় দর্শন করিতেন। কি বিজ্ঞানের রাজ্য, কি কবিতার রাজ্য, সকলই সৌন্দর্য্যময়। আধুনিকেরা বলেন, বিজ্ঞানের লক্ষ্য সত্য এবং কবিতার লক্ষ্য সৌন্দর্য্য। কিন্তু যাহা সত্য তাহাই তো সুন্দর। সুতরাং এতদ্দেশে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদেরও কবিরাজ উপাধি স্বীকার করা স্বাভাবিক।

এদেশে সর্ব্বত্রই কেবল পদ্যের বিকাশ। স্বদেশী আন্দোলনের সমুদ্র-মন্থনে উৎপন্ন হইল শুধু বুলবুল সোপ, আহামরি এসেন্স আর ললিতলবঙ্গ তৈল। গলদ্ঘর্ম্ম কলেবর হইয়া কেহই এ পর্য্যন্ত কল কব্জায় হাতুড়ির গদ্যময় গদাঘাত করিল না। কেবলই পয়ার ও পদ্য কথন। মনে হয় সেই দ্বিতীয় পাণ্ডব গদাধর ভীম, যিনি ভূ-ভারত ও ব্রহ্মপুত্র অতিক্রম পূর্ব্বক ম্লাদের সঙ্গ পাইয়া একবার মাত্র খাঁটি গদ্য উচ্চারণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। ভারতে গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি অপেক্ষাকৃত নূতন। মৌখিক পারিবারিক কথোপকথন কিংবা বাজার হিসাব ও ধোবার হিসাব গদ্যেই ব্যক্ত হইতো, সন্দেহ নাই। কিন্তু শুদ্ধ মনে বসিয়া কালীতে কলম ডুবাইয়া শ্রীদুর্গা বা শ্রীহরি স্মরণ পূর্ব্বক যাহা লিপিবদ্ধ করা হইত তাহা পদ্য না হইয়া যায় না! এখনও বইয়ের নামকরণে পদ্যের ঢেউ খেলে। প্রবন্ধ লহরী, ভক্তি তরঙ্গিনী, শব্দকল্পদ্রুম, পদকল্পতরু, সিদ্ধান্ত কৌমুদী, চমৎকার চন্দ্রিকা, ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা, সাহিত্য দর্পণ, গীতাঞ্জলি ইত্যাদি।

যে অভিরাম গোস্বামীর প্রণামে শালগ্রাম শিলা বিদীর্ণ হইয়া যাইত, যাঁহার প্রণামে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কয়েকটী পুত্র বিনষ্ট হইয়াছিল, সেই স্বনাম ধন্য পুরুষ প্রধান অভিরামের প্রণাম সতেজে গ্রহণ করিয়াছিলেন কে? তিনি শ্রীখণ্ড নিবাসী বৈদ্যকুল চূড়ামণি শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর, যাঁহার শ্রীহস্ত হইতে স্বয়ং শ্রীহরি গোপীনাথ লাড়ু ভক্ষণ করিয়াছিলেন। এ হেন রঘুনন্দনের পিতা মুকুন্দদাস গুপ্ত ও পিতৃব্য নরহরি ঠাকুর উভয়েই **কবিরাজ** উপাধি ভূষণে ভূষিত ছিলেন। শ্রীমন্মুকুন্দ দাশ সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ অপিচ গৌড়াধিপতির সভাসদ ও চিকিৎসক ছিলেন। (বৈষ্ণবগণ বলেন) ইনিই পূর্ব্বে ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণাবতারে শ্রীবৃন্দাদেবী ছিলেন)। শ্রীনরহরি কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত নামক সংস্কৃত অমূল্য গ্রন্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর উৎসাহ বাক্যে রচনা করেন। তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয়তম শিষ্য কোগ্রাম নিবাসী লোচনানন্দ দাশ পাণ্ডিত্য গুণে "কবিরাজ" ছিলেন, চিকিৎসাবিদ্যায় নহে। কবিরাজ না হইলে কি আর শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের ন্যায় অতুল গ্রন্থ রচনা করা যায়? আধুনিক কাল হইলে আমরা লোচনকে কবিরাজ না বলিয়া সাহিত্য-সম্রাট বা অন্ততঃ সাহিত্য-সুলতান বলিয়া ঘোষণা করিতাম। ঝামটপুর নিবাসী চৈতন্য চরিতামৃত প্রণেতা বৈষ্ণ কুল-তিলক কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ের নিকট বঙ্গসাহিত্য বিশেষরূপে ঋণী। আরও বৈদ্য জাতীয় কবিরাজের নাম মনে হইতেছে। সুপ্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা পরম ভাগবত চন্দ্রশেখর কবিরাজ, গোবিন্দদাস, নয়নানন্দ কবি-ডিণ্ডিম, দ্বিতীয় বিদ্যাপতি কবিরঞ্জন রায় ইঁহারা সকলেই চিকিৎসায় নহে পাণ্ডিত্যে কবিরাজ ছিলেন।

পরবর্ত্তী কালে যখন কবিরাজী শব্দ চিকিৎসার্থের দ্যোতক হইতে লাগিল তখন প্রকৃত কবিরাজগণ কবিরত্ন, কবিভূষণ, কবিকঙ্কণ, কবিরঞ্জন প্রভৃতি নব উপাধিতে ভূষিত হইতে লাগিলেন। যথা কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন, অনেকে বিনয় বশতঃ "কবিদের মধ্যে রাজা" খেতাব গ্রহণ না করিয়া শুধু "কবি"ই রহিয়া গেলেন।

যথা কবি ঈশ্বর গুপ্ত। সুখের বিষয় গুণগ্রাহী সদাশয় গবর্ণমেণ্ট বিদ্বান চিকিৎসকদের সম্মানার্থ বৈদ্যরত্ন ভূষণের অর্ডার করিয়াছেন।

এখন ভেজাল পাচন বিক্রয় করিয়া বেণেরাও কবিরাজ হইতেছে। বাথগেট কোম্পানীর শিশি ধোওয়া জল লইয়া গিয়া মপঃস্বলের রাম শ্যাম যদুরাও ডাক্তার বনিয়া যাইতেছে। কবিরাজ ও ডাক্তার শব্দের সে গৌরবান্বিত অর্থ নাই। অনেকেই জানেন না যে এম্-ডি ছাড়া এল-এম-এস্ কিংবা এম-বি হইয়া কেহই প্রকৃত ডাক্তার নহেন। সাহিত্য, সঙ্গীত, বিজ্ঞান, দর্শন, আইন প্রভৃতি সর্ব্ববিদ্যায়ই ইংরাজী মতে ডাক্তার বা পরম পণ্ডিত উপাধি আছে। কবিরাজ শব্দের অর্থ ডাক্তার বা পরম পণ্ডিত। যথা ডাক্তার সেন গুপ্ত, ডাক্তার সরকার, ডাক্তার বন্দ্যোপাধ্যায়; তাঁহারা ওকালতিই করুন, অধ্যাপনাই করুন কিংবা চিকিৎসাই করুন। বৈদ্যদের মধ্যে বহুলোক পূর্ব্বে পাণ্ডিত্য গুণেই কবিরাজ ছিলেন এবং এই কবিরাজদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি চিকিৎসক ছিলেন। তারপর উত্তরাধিকার সূত্রে পাচন, বড়ি হাতে পাইয়া রাম শ্যাম যদু সকলেই "কোব্রেজ"। অত্রেব শিবমস্তু।

শ্রীপরমেশপ্রসন্ন রায়।

চাঁদকেদার ও পর্ত্তুগীজ।

বিক্রমপুরের বারভূঁঞা চাঁদ ও কেদারনাথ রায়ের নাম ঐতিহাসিক মাত্রেই সুপরিচিত। ইতিপূর্ব্বে বহু মাসিক পত্রেই ইহাদের শৌর্য্য বীর্য্য ও কার্য্যাবলী সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা হইয়া গিয়াছে। আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী ঐতিহাসিকগণের কয়েকটি মত নিঃসন্দেহে গ্রহণ করিতে পারি নাই বলিয়াই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারনা করিতে বাধ্য হইলাম। এ স্থলে শুধু পর্ত্তুগীজগণের সহিত উক্ত ভ্রাতৃদ্বয়ের সম্পর্কিত কয়েকটি প্রশ্নই আলোচিত হইল।

শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় এবং বিশ্বকোষকার নিজ নিজ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে চাঁদরায় ও কেদার রায় পর্ত্তুগীজ দিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। স্বমত সমর্থক কোন নজীরই বিশ্বকোষে উদ্ধৃত হয় নাই; বরং চাঁদ কেদারকে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে স্থাপন করিয়া উক্ত গ্রন্থকার ভ্রমেই পতিত হইয়াছেন। সমস্ত ঐতিহাসিক প্রমাণই তাহাদিগকে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগের লোক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছে। আনন্দ বাবু লিখিয়াছেন যে চাঁদরায় পর্ত্তুগীজ দস্যু গঞ্জালীসকে পরাজিত করিয়াছিলেন (১)। কিন্তু স্বমত সমর্থক কোন প্রমান আনন্দ বাবুও উদ্ধৃত করেন নাই। এদিকে ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে গঞ্জালীস ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে আগমন করে এবং তৎকালে সে সামান্য লবণ ব্যবসায়ী মাত্র ছিল (২)। চাঁদ রায়ের পরবর্ত্তী কেদার রায় ইহার বহু পূর্ব্ব হইতেই রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। কাজেই ঐ সময় চাঁদ রায় জীবিত ছিলেন না, যেহেতু সকল ঐতিহাসিকই চাঁদ রায়ের মৃত্যুর পর কেদার রায় সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন বলিয়া স্বীকার করেন। ফলে চাঁদ রায় কর্ত্তৃক দস্যু গঞ্জালীস পরাজিত হইয়াছিল, এই কাহিনী ঐতিহাসিক সত্যরূপে গ্রহীত হইতে পারে না।

কিন্তু পর্ত্তুগীজ গণের পরিত্যক্ত বিবরণী হইতে অবগত হওয়া যায় যে এন্টোনিও ডি সুজা গডীনো (Antonio de Souza Godinho) নামক জনৈক পর্ত্তুগীজ ১৫৯০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি কোনও সময়ে

(১) শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় প্রণীত ফরিদপুরের ইতিহাস

(২) Portuguese in India.

চট্টগ্রামের দুর্গ দখল করিয়া বঙ্গোপসাগরস্থিত সন্দীপ নামক দ্বীপটিকে তাহার অধীনস্থ করিয়া লয় (১)। ডুজারিকের গ্রন্থপাঠে অবগত হওয়া যায় যে সন্দীপের মালিকানা সত্য বস্তুতঃ শ্রীপুরাধিপতি কেদার রায়েরই ছিল কিন্তু মোগলগণ বঙ্গদেশ জয় করিয়া উক্ত দ্বীপ নিজদের রাজ্যভুক্ত করিয়া লয়। এখন দেখা যাউক ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে গডীনো যখন সন্দীপ অধীনস্থ করিয়া লয়, তখন সন্দীপের অধীশ্বর ছিলেন কে? ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দেও যে চাঁদ রায়ই রাজ্য শাসন করিতেছিলেন এবং জেলালুদ্দিন আকবরের সৈন্যগণ কিছুতেই যে তাহার সৈন্যগণকে আটিয়া উঠিতে সক্ষম হয় নাই, ইংরেজ পরিব্রাজক রালফ্‌ফিচের বিবরণ হইতে তাহা অবগত হওয়া যায় (২)। ময়মনসিং সুসঙ্গ রাজ পরিবারে বংশ পরম্পরা ক্রমে প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে উক্ত বংশের স্থাপয়িতা রঘুনাথ মহারাজ মানসিংহের আদেশে বিক্রমপুরের ভুঞা চাঁদ ও কেদার রায়কে পরাজিত করিয়াছিলেন। (৩) মানসিংহ ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে আগমন করেন এবং তাহারও পরে চাঁদ রায় পরাজিত হন। কাজেই ১৫৯০ বা তৎ-কাছাকাছি কোনও সময়েই চাঁদ রায় পরাজিত হইয়া থাকিবেন। এই পরাজয়ের পরে সন্দীপ মোগল করায়ত্ত হইয়া যায়। কাজেই গডীনো যখন সন্দীপ আক্রমণ করে, তখন চাঁদ রায়ই সন্দীপের অধীশ্বর ছিলেন। কাজেই চাঁদ রায়ের সহিত পর্ত্তুগীজগণের যুদ্ধ সম্বন্ধে যে প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহা একেবারে অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

(১) One Antonio de souza godinho about 1590 had captured by force of arms the fort of Chittagong and made the island of Sandwip tributary to it Campos's Portuguese in Bengal Ch VI pp. 67-68.

(২) Harton Ryby's Ralph Fitch pp. 118-119

(৩) শ্রীযোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত প্রণীত কেদার রায়।

কিন্তু উপরোক্ত পর্ত্তুগীজ বিবরণীতে যে দেখিতে পাওয়া যায় যে গডীনো সন্দীপকে তাহার অধীনস্থ করিয়া লইয়া ছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে সত্য কি না তাহাও বিবেচ্য। কারণ পাইমেণ্টা প্রমুখ পর্ত্তুগীজ পাত্রীগণের যেই সমস্ত বিবরণী প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে এই ঘটনার কোনই উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। পাইমেণ্টা ও গডীনো প্রায় একই সময়ে এই দেশে অবস্থান করিতে ছিলেন। ঘটনাটি সম্পূর্ণরূপে সত্য হইলে পাইমেণ্টা এত বড় জাতীয় স্বার্থটির বিষয় উল্লেখ করিতেন না এরূপ বিশ্বাস হয় না। ডুজারিকের বিবরণী হইতে স্পষ্টতঃই বুঝিতে পারা যায় যে মোগলগণ কেদার রায় বা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী চাঁদ রায়ের হস্ত হইতেই সন্দীপ নিজ অধিকারভুক্ত করিয়া লইয়াছিল। গডীনো সংক্রান্ত বিবরণ সত্য হইলে ডুজারিকের এই উক্তিও মিথ্যা হইয়া দাড়ায় (১) পার্কাসও লিখিয়াছেন যে কেদার রায়ের দাবী ধরিয়াই ১৬০২ খৃষ্টাব্দে কার্ভালো ও ম্যাটুস মোগল হস্ত হইতে সন্দীপ পুনরাধিকার করেন (২) যদি সত্যসত্যই মোগল বিজয়ের পূর্ব্বে সন্দীপ গডীনোর হস্তগত থাকিত তাহা হইলে পর্ত্তুগীজগণ কেদার রায়ের দাবী না ধরিয়া নিজদের দাবী ধরিয়াই সন্দীপ আক্রমণ করিতে পারিত। সন্দীপের মত সুরক্ষিত স্থান একবার হস্তগত করিতে পারিলে তৎকালে তাহা পর হস্তে সমর্পণ করা পর্ত্তুগীজদের মত নিরাশ্রয় জাতীর পক্ষে নিতান্তই অস্বাভাবিক ছিল। কাজেই উক্ত কাহিনীর সম্পূর্ণ সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ সন্দেহ বর্ত্তমান রহিয়াছে। গডীনো যখন সন্দীপ আক্রমণ করে, তখন চাঁদ রায় মানসিংহের বিরুদ্ধে ভীষণ যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। কাজেই চাঁদ রায় পর্ত্তুগীজদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন এই উক্তি সত্য হইলেও, উক্ত মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধকালে, পর্ত্তুগীজগণের সহিত সন্ধি স্থাপন না করিয়া তাহার উপায়ান্তর ছিল না। আমাদের

(১) Pierre on Jarric's work Ch XXXII.

(২) Purchas his Pilgrims Book IV Part IV

মনে হয় তৎকালে সন্দীপের জন্ত পর্ত্তুগীজদিগকে কিঞ্চিৎ কর দিতে স্বীকৃত হইয়া চাঁদ রায় তাহাদিগকে শান্ত রাখিয়াছিলেন। কিন্তু সন্দীপের উপর চাঁদ রায়ের সম্পূর্ণ অধিকারই বর্ত্তমান ছিল এবং সেজন্তই ডুজারিক লিখিয়াছেন যে উহার মালিকানা সত্য কেদার রায়েরই ছিল। আনন্দ বাবু হয়তো গডীনোকে গঞ্জালিস মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা উচিত যে কেদার রায়ের পূর্ব্বে সন্দীপ বাকলাধিপতির অধিকারভুক্ত ছিল, বাকলার ইতিহাস প্রণেতার এই উক্তি সমধিক যুক্তিযুক্ত প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত উপরোক্ত কারণে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহীত হইতে পারে না।

চাঁদ রায়ের পরে কেদার রায় শ্রীপুরের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। শীঘ্রই আবার মোগলের বিরুদ্ধে শ্রীপুর রাজের ভীষণ যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া দাড়াইল। তৎকালে আকবর বাদশাহের জগত বিখ্যাত সেনাপতি মানসিংহ ঢাকায় আবস্থান করিতেছিলেন, তিনি সসৈন্যে বিক্রমপুর আক্রমণ করিলেন। কেদার রায় স্বয়ং তাহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়া পর্ত্তুগীজ জাতীয় সেনাপতি কার্ভালোকে সন্দীপ পুনরোদ্ধার কবিবার জন্ত প্রেরণ করিলেন। সুদৃঢ় হইলেও বিক্রমপুর বীরগণের ভীষণ আক্রমণে সন্দীপের দুর্গ হস্তগত হইল। এই ভীষণ যুদ্ধে মোগল পক্ষ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। পুনরায় সন্দীপ মোগলের হস্ত হইতে মুক্ত হইল। ডুজারিক লিখিয়াছেন যে এই যুদ্ধে কয়েকজন পর্ত্তুগীজ সৈন্তও কার্ভালোর পক্ষ হইয়া মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল। সন্দীপ মোগলের হস্ত হইতে মুক্ত হইল বটে কিন্তু শীঘ্রই মুসলমানগণ আবার বিদ্রোহী হইয়া ভীষণ ভাবে কার্ভালোকে আক্রমণ করিল। কোন মতে কার্ভালো আত্ম রক্ষা করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু বুঝিলেন যে বাহিরের সাহায্য ব্যতীত এ যাত্রা তাহার উদ্ধারের আর উপায়ান্তর নাই। বিক্রমপুরাঞ্চলে কেদার রায় স্বয়ং মানসিংহের বিরুদ্ধে ভীষণ যুদ্ধে লিপ্ত। কাজেই রাজধানী হইতে সাহায্যের আশা বৃথা। কার্ভালো পর্ত্তুগীজগণের সাহায্য প্রার্থনা করাই শ্রেয় মনে করিলেন। সাহায্যের বিনিময়ে পর্ত্তুগীজ দিগকে সন্দীপের অর্দ্ধাংশ ছাড়িয়া দেওয়া হইবে বলিয়া স্থিরিকৃত হইল। তাহারা ৪০০ সৈন্য সহ এম্মানুয়েলডি ম্যাটুস নামক একজন সেনানায়ককে সন্দীপে প্রেরণ করিল। যুদ্ধে অনেক বিদ্রোহীই হত হইল। অবশিষ্ট যাহারা ছিল, তাহারাও পলাইয়া আত্মরক্ষা করিল। যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া ম্যাটুস সন্দীপের অর্দ্ধাংশ প্রাপ্ত হইলেন (১)।

কোন কোন ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন যে কার্ভালো ও ম্যাটুস সন্দীপ অধিকার করিলে কেদার রায় সন্তুষ্ট হইয়া নিজ সেনাপতি কার্ভালোর হস্তে সন্দীপের অর্দ্ধাংশের এবং পুরস্কার স্বরূপ ম্যাটুসের হস্তে অপরার্দ্ধের শাসনভার অর্পণ করেন। আমরা কিন্তু এই উক্তির সমর্থক কোন প্রমাণই প্রাপ্ত হই নাই। পক্ষান্তরে আমরা দেখিতে পাই যে সন্দীপের মত সুদৃঢ় দুর্গ হস্তগত করিয়া বিশ্বাস ঘাতক কার্ভালো পর্ত্তুগালের রাজাকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে তাহারা তাঁহারই অধীনে সন্দীপ শাসন করিতেছেন, পর্ত্তুগালাধিপতিও সন্তুষ্ট হইয়া কার্ভালো ও ম্যাটুসকে নানারূপ রাজসম্মানে সম্মানিত করিলেন (২)। এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতায়

১। Pierre Du Jarric's work Ch XXXII.

২। Domingo Carvalho and Manoel de Mattos were jointly governing the island, the former wrote to the Portuguese king that they held authority under the crown of Portugal In recogintion of their brilliant services, the king of Portugal created Carvalho & Mattos "Fidalgos dacas a Real" (ie nobles) & beslowed on then the order of Christ. "Portugese in Bengal."

কেদার রায় যে কতদূর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, পরবর্ত্তী ঘটনা হইতেই তাহার সম্যক উপলব্ধি হইবে।

সন্দীপ পর্ত্তুগীজগণের হস্তগত হইলে আরাকানরাজ প্রমাদ গণিলেন। নানারূপ রাজনৈতিক কারণে তিনি সন্দীপ হইতে পর্ত্তুগীজ দিগকে বিতাড়িত করিতে কৃত সঙ্কল্প হইলেন। বিশ্বাস ঘাতকতার প্রতিদান প্রদান উদ্দেশ্যে শ্রীপুরাধিপতিও আরাকানাধিপতির সহিত সম্মিলিত হইলেন। ১৫০ খানা জাহাজ লইয়া আরাকান রাজ এবং ১০০ জাহাজ লইয়া কেদারনাথ রায় পর্ত্তুগীজ দিগকে আক্রমণ করিলেন। বঙ্গোপসাগরের কূলে কূলে ভীষণ সমরানল প্রজ্জলিত হইল, দুই দিকে আক্রান্ত হইয়া পর্ত্তুগীজগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। ডায়েঙ্গা বন্দরে শত শত পর্ত্তুগীজ ধরাশায়ী হইল। ডায়েঙ্গার দুর্গ ও পর্ত্তুগীজগণের কতকগুলি জাহাজ শত্রুপক্ষের হস্তগত হইল। স্বয়ং ম্যাটুসও আহত হইলেন। এ বার জয়োন্মত্ত সৈন্যগণ ফিরিঙ্গিগণের পণ্যদ্রব্য সমূহ লুণ্ঠন করিয়া লইল। পর্ত্তুগীজগণের আশা প্রায় অস্তমিত হইতে বসিল (১)।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে প্রায় সমুদয় বাঙ্গালী ঐতিহাসিকই এই যুদ্ধ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে কেদার রায় পর্ত্তুগীজগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া আরাকান রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। নজীর স্বরূপ তাহারা নিজ ২ গ্রন্থে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, বস্তুতঃ তাহাও তাহাদের মতের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য প্রদান করে। যাহারা কার্ভালোর অধীনে শ্রীপুর সৈন্যগণকে অসীম সাহসীকতার সহিত আরাকান রাজের ভীষণ নৌবাহিনী ধ্বংশ করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন, তাহারা স্বপ্নই দর্শন করিয়াছেন, প্রকৃত সত্য তাহাদের মানস নেত্রে পতিত হয় নাই।

ডাক্তার ওয়াইজ লিখিয়াছেন যে পর্ত্তুগীজগণ পরে সম্মিলিত মগ ও বাঙ্গালী সৈন্য দিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। মগদিগকে পর্ত্তুগীজগণ পরাজিত করিয়াছিলেন। পার্কাস ডুজারিক প্রভৃতির গ্রন্থে তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে কিন্তু কেদার রায়কে পরাজিত করিয়াছিল, এরূপ কোন প্রমাণই ঐ সমস্ত গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। পক্ষান্তরে কেদার রায় পর্ত্তুগীজ-দিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন, এরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে (২)। ম্যাটুসের দুর্দ্দশা ও ডায়েঙ্গার পরাজয় কাহিনী সন্দীপে পৌছিলে তৎক্ষনাৎ ম্যাটুসের সাহায্যার্থ কার্ভালোকে ডায়েঙ্গায় যাত্রা করিতে হইয়াছিল। তখন যে কেদার রায় ১০০ জাহাজ লইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন, উপরেই তাহা উক্ত হইয়াছে। কাজেই ডায়েঙ্গা যাত্রা কালে বাধ্য হইয়া কার্ভালো তাহার পূর্ব্ব প্রভুর সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ এইরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় যে ইহার পরেও আবার কার্ভালো কেদার রায়ের পক্ষ হইয়া যুদ্ধাদি করিয়াছিলেন। কাজেই কেদার রায়কে কার্ভালো পরাজিত করিয়াছিলেন ডাক্তার ওয়াইজের এই উক্তি নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা চলে না, পক্ষান্তরে কার্ভালোই হীনতা স্বীকার করিয়া কেদার রায়ের সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়। এই যুদ্ধের পরে মগ ও ফিরীঙ্গিগণের মধ্যে যে সমস্ত যুদ্ধাদি সংঘটিত হয় তাহার সহিত কেদার রায়ের কোনই সংশ্রব ছিল না।

সন্দীপের দ্বিতীয় যুদ্ধের পরে আরাকান রাজ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া কার্ভালো শ্রীপুরেই আশ্রয় গ্রহণ করেন। পূর্ব্বেই সন্ধি স্থাপিত না হইয়া থাকিলে কার্ভালো কোন্ সাহসে শত্রুর আতিথ্য গ্রহণ করিতে পারেন। কাজেই এই ঘটনাও আমাদের মতেরই সমর্থন করিতেছে। এই সময় মোগলগণ কেদার রায়ের বিরুদ্ধে সেনাপতি মন্দারায়কে শ্রীপুরে প্রেরণ করিলে কার্ভালো নিজে

(১) Pierre du Jarric's work.

(২) J. A. S. B Wise on Twelve Bhuyas of Bengal.

গুরুতর ভাবে আহত হইয়াও মোগলদিগকে পরাজিত ও মন্দারায়কে নিহত করিয়া কেদার রায়কে বিপদ মুক্ত করেন (১)। কাজেই অনুমিত হয় যে কেদার রায় ও পর্ত্তুগীজদিগের মধ্যে যে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার অন্ততঃ একটি সত্ত্ব এইরূপ ছিল যে কেদার রায় পর্ত্তুগীজদিগকে সন্দীপ ছাড়িয়া দিবেন এবং তৎবিনিময়ে, তৎকালীন অন্যান্য অধীনস্থ জমিদারগণের মত, কার্ভালো যুদ্ধাদির সময় কেদার রায়কে সাহায্য করিবেন। এ স্থলে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে এই যে যদি উপরোক্ত সর্ত্তেই সন্ধি হইয়া থাকিবে, তবে মন্দারায়ের সহিত যুদ্ধ কালে সন্দীপ হারাইয়াও কার্ভালো কেদার রায়কে সাহায্য করিতে যাইবেন কেন? ইহার উত্তরও ডুজারিকের গ্রন্থ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৎকালে কার্ভালো সন্দীপ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেও উহা পুনরুদ্ধার করিবার বাসনা তখনও তাহার হৃদয়ে বিশেষ বলবতী ছিল। তজ্জন্যই তিনি যশোরে প্রতাপাদিত্যের সহিত মিলিত হইয়া মগরাজকে আক্রমণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এই সময়ই কার্ভালো প্রতাপের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন (১)।

"কেদার রায়" প্রণেতা লিখিয়াছেন যে ১৬০৩-৪ খৃষ্টাব্দে কেদার রায় ও মোগলের মধ্যে শেষ যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং এই যুদ্ধেই আহত হইয়া কেদার রায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে প্রতাপাদিত্যই কেদার রায়ের পূর্ব্বে মোগল কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। এ দিকে ডুজারিকের গ্রন্থ স্পষ্টতই সাক্ষ্য প্রদান করে যে কার্ভালো ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে নিহত হন। কাজেই ১৬০৩ খৃষ্টাব্দের পরে অর্থাৎ কার্ভালো নিহত হওয়ার পরে প্রতাপাদিত্য পরাজিত হন এবং তাহারও পরে ১৬০৩-৪ খৃষ্টাব্দে কেদার রায় আহত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। অথচ উক্ত গ্রন্থকারই আবার লিখিয়াছেন "যে দিন কেদার বীর বন্দী ও মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন সে দিবস কার্ভালো পুনঃপুঃন আহত হইয়াও যেরূপ অপূর্ব বীরত্ব, সাহসীকতা ও রণ নিপুনতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্ময় সাগরে পতিত হইতে হয়। ঐতিহাসিককে এইরূপ উক্তি করিতে দেখিয়া আমরা কিন্তু বিস্ময়ের মহাসমুদ্রেই পতিত হইয়াছি।

শ্রীসুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়।

বর্ষা-প্রভাত।

বৃষ্টি নাই, মেঘাচ্ছন্ন গগন-বিতান
বর্ষণের পূর্ব্বাভাস করিছে সূচনা;
নাড়-ভ্রষ্ট বিহঙ্গম ভুলে গেছে গান,
গুমরিছে কবি-বক্ষে করুণ কল্পনা!

আর্দ্র শ্যাম তৃণদল, আর্দ্র তরুলতা,
প্রকৃতির অশ্রুধারে নির্ম্মল কোমল;
শীতল সমীর প্রাণে কয় কার কথা
সকল হৃদয় করে পাগল চঞ্চল!

পরিপূর্ণ যৌবনের কান্তির উচ্ছ্বাস
জাগিছে সরসী-চিত্তে সোহাগে বর্ষার;
কুমুদ-কহ্লার দেয় মধুপে আশ্বাস
নিরখি' বিকচ আস্য নীরে বারংবার!

তরুণ তপন-কর লুপ্ত মেঘদলে
বিশ্বের বিরহ ব্যথা বয় নেত্রজলে!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

---

(১) Pierre du Jarric

গ্রন্থ সমালোচনা

পরিমাণ শিক্ষা। শ্রীযুক্ত রাধারমণ গুহ এল, সি, ই প্রণীত অষ্টম সংস্করণ। ইহা একখানা জরিপ বিষয়ক গ্রন্থ। জরিপ বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষায় বোধ হয় ইহাই একমাত্র গ্রন্থ। ইংরেজীতে জরিপ বিষয়ে অনেক পুস্তক আছে। কিন্তু যাহারা ইংরেজী ভাষায় অনভিজ্ঞ তাহাদের পক্ষে জরিপ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবার সুবিধা অতি অল্প। বর্ত্তমান সার্ভে স্কুলে বাঙ্গালা নবীশ ছাত্রগণেরও প্রবেশাধিকার আছে। আর বেশী দিন যে তাহা থাকিবে এরূপ বোধ হয় না। যাহা হউক সার্ভে শিক্ষার্থী বাঙ্গালা নবীস ছাত্রদিগের জন্যই এই পুস্তক লিখিত হইয়াছিল এবং সেই জন্যই বোধ হয় এই পুস্তকের সপ্তাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। কারণ এ দেশে স্কুলপাঠ্য বহি ও নবেল ব্যতীত অন্য পুস্তক অতি অল্পই বিক্রীত হয়। গুরুগম্ভীর রচনার প্রতি আদরের অভাব এবং ইংরেজীর প্রতি অত্যধিক শ্রদ্ধাই ইহার কারণ। তবে যে হোমিওপ্যাথি জরিপ প্রভৃতি বিষয়ে বাঙ্গালা গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হয় তাহার কারণ এই যে বাঙ্গালা নবীশ ছাত্রেরা ঐ ঐ বিষয় অধ্যয়ন করে। আগেকার নর্ম্মাল স্কুলের দিনে জ্যামিতি, ত্রিকোনমিতি, বীজগণিত, পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্র প্রভৃতি সম্পর্কে বাঙ্গালা ভাষায় অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। কিন্তু এখন সেই সব গ্রন্থ প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইংরেজী স্কুল কলেজে যে পর্য্যন্ত না বিজ্ঞানাদি সমস্ত বিষয়েই বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষপ্রদান করায় পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হয় সেই পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যে এই জাতীয় গ্রন্থের অভাব থাকিয়া যাইবেই যাইবে। হাজার সাহিত্য পরিষৎ ও সাহিত্য সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়াও বাঙ্গালা ভাষায় এই অভাব পুরণ করা সম্ভব হইবে না। বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষাদান প্রথা প্রবর্ত্তিত না করিলে বাঙ্গালা ভাষা চিরকালই কবিতা ও নবেলের ভাষাই থাকিয়া যাইবে। অন্য বিষয়ে ইহার আর কোন উন্নতি হইবে না। ইহার কারণ এই যে কবিতা ও নবেল ব্যতীত অন্য কোন বিষয় অধ্যয়ন করিতে হইলে এক মাত্র বাঙ্গালা নবীশ স্কুলের ছাত্র ব্যবীত আর সকলেই সেই ২ বিষয়ে ইংরেজী গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকেন। ইংরেজী রাজভাষা; ইহা না শিখিলে চলে না। এতভিন্ন মাতৃক্রোড় ত্যাগের পর হইতেই ইংরেজী ভাষা অধ্যয়ন করার এদেশীয় লোকের মনে ইংরেজী ভাষায় ঐৎকর্ষ সম্বন্ধে এক প্রকার কুসংস্কার জমিয়া যায়। ইংরেজী শিক্ষা ইংরেজী জ্ঞানই জীবনের এক ইহার আদর্শ বলিয়া পরিগনিত হয়। যে ভাল ইংরেজী কালে সেই মহা পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান বলিয়া সমাজে খ্যাতি ও মর্য্যাদা লাভ করে। ইহার ফলে যে সব বিষয়ে বাঙ্গালা গ্রন্থ রচিত হইয়াছে সেই সব বিষয়েও লোকে বাঙ্গালা গ্রন্থ ফেলিয়া ইংরেজী গ্রন্থ পাঠ করে। তবে বাঙ্গালা কবিতা ও বাঙ্গালা নবেলের স্বাদ ইংরেজী কবিতা ও ইংরেজী নবেলে পাওয়া যায় না। এই কারনেই বাঙ্গালীরা বাধ্য হইয়া বাঙ্গালা কাব্য ও নবেল পাঠ করিয়া থাকে। অনেকে বলেন বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে বাঙ্গালায় গ্রন্থ রচনা করা অসম্ভব। একথা যে ঠিক নহে আমাদের আলোচ্য গ্রন্থই তাহার প্রমাণ। বৈজ্ঞানিক উপায়ে জরিপ করিবার রীতি এই গ্রন্থে বাঙ্গালা ভাষায় বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার সাহায্যে ইংরেজী অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও অনায়াসে বৈজ্ঞানিক উপায়ে জরিপ করিবার রীতি সম্পর্কে বেশ জ্ঞান লাভ করিতে পারে। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া অনেক বাঙ্গালা নবীশ ছাত্র থিওডোলাইট প্রভৃতি দ্বারাও সুচারু রূপে জরিপ কার্য্য সমাধা করিতেছে। তবে বাঙ্গালায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচিত হইতে পারে না এই আপত্তির ভিত্তি কোথায়?

বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে জরিপ এ দেশে নূতন সন্দেহ নাই। পূর্ব্বেও এ দেশে ভূমি পরিমাপের পদ্ধতি যে ছিলনা তাহা নহে; তবে যতদূর জানা যায় পূর্ব্বে এদেশে নক্সা অঙ্কন করার প্রথা ছিল না। রাজস্ব বন্দোবস্ত এবং জমিদারি সংক্রান্ত কাজ কর্ম্মের জন্য ভূমি জরিপ করা আবশ্যক হইত। সেই জন্য খসড়া জরিপ প্রচলিত ছিল। তবে এখন যেমন শিকল বা টেপের (ফিতা) সাহায্যে পরিমাপ হয় পূর্ব্বে সেরূপ হইত না। পূর্ব্বে নলের দ্বারাই পরিমাপ হইত। সুতরাং পরিমাপ বিশেষ শুদ্ধ হইত না। নলীরা ইচ্ছামত জমির দৈর্ঘ্য প্রস্থ বাড়াইতে কমাইতে পারিত। এতদ্ভিন্ন কোন প্রকার কোন পরিমাপক যন্ত্রের ব্যবহার ছিল না; অথচ ভূমি ত্রিভুজাকারে ভাগ করিয়া লইয়াও জরিপ করা হইত না। আবার পরিশুদ্ধরূপে উত্তর দক্ষিণ দিঙ্‌নির্ণয় করার নিয়মও ছিল না। সুতরাং নক্সা বা ম্যাপ তৈয়ার করা একপ্রকার অসম্ভব ছিল। তবে নক্সার পরিবর্ত্তে খসড়া জরিপে আরেকটী কাগজ তৈয়ারী হইত তাহা অনেক পরিমাণে নক্সার অভাব পূরণ করিত। তাহার নাম চিঠা। ইহা বর্ত্তমান সময়ের ফিল্ড বুকের কতকটা অনুরূপ তবে ফিল্ড বুকে 'ব্যারিং' ও মাপ ও কোন ২ ষ্টেশনের আনামত ভিন্ন আর কিছুই থাকে না; চিঠায় প্রত্যেক ভূমির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও ভূমির পরিমাণ এবং চৌহদ্দি ও দখলকারের নাম ও জমির রকম প্রভৃতিও লিপিবদ্ধ হইত। ফলতঃ চিঠাতে প্রত্যেক ভূমির পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাইত। চিঠায় দোষ এই যে উহার মাপগুলির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যাইতে পারে না; কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে নলের সাহায্যে মাপ গ্রহণ করিলে পরিমাপ পরিশুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা অল্প। কিন্তু তথাপি চিঠার যে কার্য্যকারিতা ছিল না তাহা নহে। চৌহদ্দি পরিশুদ্ধরূপে লিখিত হইলে তৎসাহায্যে ও পরিমাপের দ্বারা জমি চিনিয়া লওয়া যাইতে পারিত। আজকালও দেওয়ানী আদালতে অনেক স্থানে বাঙ্গালা চিঠা ভাওরাইয়াই পক্ষের বিচার নিষ্পত্তি করা হইতেছে। এক্ষণে নক্সা অঙ্কন করার প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় চিঠার প্রয়োজনীয়তা কমিয়া গিয়াছে; কিন্তু একেবারে লুপ্ত হয় নাই। কালেক্টরী ও দেওয়ানী আদালতের বাটোয়ারা মোকদ্দমায় এখনও চিঠা তৈয়ারী হয়। প্রকৃতপক্ষে এই সব কার্য্যে দেশীয় ও বিদেশীয় উভয় প্রথাই অবলম্বিত হয়। ফল একরূপ ভালই হয়। আলোচ্য গ্রন্থে দেশীয় ও বিদেশীয় উভয় প্রথায়ই বিশদ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে চেইন, কম্পাস, প্লেন টেবল, লেভেল ও থিওডোলাইট প্রভৃতি আধুনিক যন্ত্রাদির পরিষ্কার বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং তৎসহ তাহাদের ব্যবহার প্রণালীও বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। চিত্র দ্বারা যন্ত্রাদির গঠন প্রণালী প্রভৃতি সুন্দররূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আবার বাঙ্গালা খসড়া জরিপের প্রণালীও সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষাও যথা সম্ভব সরল। যে সমস্ত বিষয় হাতে কলমে শিখিতে হয় সেই সমস্ত বিষয় কেবল গ্রন্থ লিখিত বিবরণ পাঠ করিয়া সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করা যায় না। এ কথা কি ইংরেজী কি বাঙ্গালা সকল বই সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। শিক্ষার্থীদিগকে অবশ্যই হাতে কলমে বিষয়টী শিখিতে হইবে তবে গ্রন্থ হইতে যে পরিমাণ সাহায্য পাওয়া আবশ্যক এই বই হইতে তাহারা তাহা অনায়াসে পাইতে পারিবে।

গ্রন্থে অনেক ইংরেজী পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে কিন্তু তাহা না করিয়া উপায় নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কোনরূপ কোণ পরিমাপক যন্ত্র এ দেশে প্রচলিত ছিল না। সুতরাং আমাদের ভাষায়ও যন্ত্র সম্পর্কিত ইংরেজী পারিভাষিক শব্দের অনুরূপ শব্দ নাই। কাজেই গ্রন্থকার বাধ্য হইয়াই ইংরেজী নাম ও ইংরেজী পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। নূতন বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তক লিখিতে হইলেই এইরূপ প্রণালীই অবলম্বন করিতে হইবে। ইহা দোষাবহ নহে। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিতে হইলে প্রথম ২

অনেক বিষয়েই আমাদের পরের নিকট ধার করিতে হইবে। সকল দেশেই এইরূপ করা হইয়া থাকে। ইংরেজেরা যখন আমাদের দেশীয় দর্শন শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয় তখন তাহারাও বাধ্য হইয়া সংস্কৃত দার্শনিক পরিভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে। সংস্কৃত হইতে শব্দ গ্রহণ করিতে হয় বলিয়া কি তাহারা ভারতীয় দর্শনালোচনা করিতে পাশ্চাৎপদ হয়? তাহা হয় না। সুরতাং ইংরেজী বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ব্যবহার করিতে হয় বলিয়া আমরাই বা কেন বাঙ্গালা ভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ লিখিতে বিরত হইব? এবং কেহ বাঙ্গালা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে ইংরেজী পরিভাষা ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়াই বা কেন বলিব যে বাঙ্গালা ভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচিত হইতে পারে না? বাঙ্গালা ভাষায় সম্পদ্ বড় কম নহে। ইহাতে সবই হইতে পারে। কিন্তু উপযুক্ত সুযোগ সুবিধার অভাবে কিছুই হইতেছে না। যে পর্য্যন্ত না বাঙ্গালা ভাষায় বিবিধ বিষয় শিক্ষাদান করার রীতি প্রবর্ত্তিত না হইবে সে পর্য্যন্ত কিছুই হইবে না, ইহা আমাদের স্থির বিশ্বাস।

মরণের খেয়াল।

ঢাল হে পিয়ালা ভরি,—
পরীরা ধরুক তান;
ক্ষতি নাই যদি মরি,
সে মরণে পাব প্রাণ।

গাঁথ মালা—আন ফুল
মরিতে হইবে যদি,—
শশধরে বল সখা,
বহাতে কৌমুদী-নদী।

প্রিয়ারে সংবাদ দাও।
নিমন্ত্রহ বন্ধুগণে,—
মরণের ভোজে তুষ্ট
ক'রে যাব জনে জনে।

ডেকে মহাজন দলে
ঋণ পরিশোধ দাও;
খাতকে ডাকিয়া বল,—
'বন্ধু, মুক্ত তুমি—যাও!'

ডাক সখা! সখিদলে,
শত্রু মিত্র, দাস দাসী;
ক্ষমা দিব—ক্ষমা লব
আমি সদা কটুভাষী।

কাগজ কলম লও
মরণের গান গাব;
মরিলে হয় ত' সখা,
বিরহেতে ব্যথা পাব।

হে আকাশ, হে বাতাস,
বিদায় বিদায় তবে!
হে প্রিয় হরিণ শিশু,
আর নাহি দেখা হবে!

বাজাও বাজাও সখা,
দাও প্রিয়া হুলুধ্বনি;—
মরিতে হইবে যদি
ভয় মাত্র নাহি গণি।

শ্রীকাঞ্চনকিশোর ধর।

গোপাল-যশোদা গীতি। *

সঙ্গীত ক্ষেত্রে বাঙ্গলা মায়ের কোমল বক্ষের বিপুল স্নেহরাশি দুইটি ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে। পুত্র স্নেহধারা বহিতেছে গোপাল-যশোদা অবলম্বনে আর কন্যা স্নেহধারা বহিতেছে উমা-মেনকা চরিত্রাবলম্বনে। আজ আমরা প্রথমোক্ত ধারার পরিচয় দিব।

গোকুলে গোপরাজ গৃহে গোপাল অন্যান্য রাখাল বালকদের সঙ্গে সজ্জিত হইতেছেন, আবার সাজিতে সাজিতে বালসুলভ চপলতা বশতঃ থাকিয়া থাকিয়া নৃত্য করিতেছেন,—

"ধাতু প্রবাল দল, নব গুঞ্জা ফল,
ব্রজ বালক সঙ্গে সাজে।
কুটিল কুন্তল বেড়ি, মণি মুকুতা ঝুরি
কটি তটে ঘুঙ্গুর বাজে॥
নাচত মোহন বাল গোপাল।
ঘরজ-বধূ মিলি, দেই করতালি
বোলই ভালিরে ভাল॥
নন্দ সুন্দর, যশোমতি রোহিণী
আনন্দে সুত মুখ চায়।
অরুণ দৃগঞ্চল, কাজরে রঞ্জিত
হাসি হাসি দশন দেখায়॥
বংশী কহই সব, ব্রজ রমণীগণ
আনন্দ সাগরে ভাস।
হেরইতে পরশিতে, লালন করইতে
স্তনক্ষীর ভিগল বাস॥"

"হাসি হাসি দশন দেখায়" এই একটি মাত্র ছত্রে কি মনোরম এবং স্বাভাবিক শিশু-চিত্রই না অঙ্কিত হইয়াছে! ঐ কচি মুখখানি ঐ ফুট্ ফুটে দাঁত কটি দেখিয়া, ঐ নধর দেহটি স্পর্শ করিয়া মাতৃ হৃদয়ের স্নেহ রাশি স্তন্যরূপে প্রবাহিত হইয়া বুকের বসন ভিজাইয়া ফেলিতেছে।

গোপাল একদা ননী খাইয়া ছিলেন, কিন্তু ভাল করিয়া কেহ তাহার মুখখানি ধোয়াইয়া দেয় নাই,—

"অরুণ অধর উরে, নবনী লাগিয়াছেরে,
মরি মরি বাছনি কানাই।
হেরি যশোমতি, প্রেমেতে পূরিত আঁখি,
আয় কোলে বলিহারি যাই॥
কর মোছে অধর মোছাই।
আয় মোর বাছনি কানাই॥"

ছোট্ট ছেলেটির রাঙ্গা টুক্ টুকে ঠোঁটের উপর একটুখানি ননী লাগিয়া রহিয়াছে দেখিয়া মায়ের আঁখি "প্রেমেতে পূরিত" হইয়াছে, মা অমনি ছেলেকে কোলে তুলিয়া নিলেন। কেমন সুন্দর চিত্র!

গোপরাজ-গৃহে গোপাঙ্গনারা দধি মন্থন করিয়া মাখন প্রস্তুত করিতেছেন। প্রভাতে উঠিয়া কৃষ্ণ বলরাম খেলা করিতে করিতে সেই মন্থন ধ্বনি শুনিয়া নাচিতে নাচিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন,—

"দধি মন্থ ধ্বনি, শুনইতে নীলমণি,
আওল সঙ্গে বলরাম।
যশোমতি হেরি মুখ, পাওল পরম সুখ,
চুম্বয়ে চাঁদ বয়ান॥
কহে শুন যাদুমণি, তোরে দিব ক্ষীর ননী—
খাইয়া নাচহ মোর আগে।
নবনী লোভিত হরি, মায়ের বদন হেরি—
করপাতি নবনীত মাগে॥
রাণী দিল পূরি কর, খাইতে রঙ্গিমাধর
অতি সুশোভিত ভেল তায়।
খাইতে খাইতে নাচে, কটিতে কিঙ্কিনী বাজে,
হেরি হরষিত ভেল মায়॥
নন্দ দুলাল নাচে ভালি।

---

* ঢাকা সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

ছাড়িলা মন্থন দণ্ড, উথলিল মহানন্দ
সঘনে দেয় করতালি ॥
দেখ দেখ রোহিণী, গদগদ কহে রাণী,—
যাদুয়া নাচিছে দেখ মোর।
বলরাম দাস কয়, রোহিণী আনন্দময়,
দুহুঁ ভেল প্রেমে বিভোর ॥"

এ অপূর্ব্ব নৃত্য দেখিয়া মায়ের প্রাণ কেমন করিয়া উঠিল। শুধু নিজে দেখিয়াত আর তৃপ্তি হয় না। এ শোভা গোপরাজকে না দেখাইলে সবই যে অপূর্ণ রহিয়া যায়। কত রকমে রকমেই না নৃত্য চলিতে লাগিল,—

"কত ভঙ্গী জান গোপাল নাচিতে নাচিতে।
অরুণ কিরণ দিছে চরণ তুলিতে ॥
ব্যাঘ্র নখ মণি হার হিয়ার মাঝারে দোলে।
চরণে নুপুর কিবা রুণু ঝুনু বোলে ॥
গোপাল নাচিছে তুরি দিয়া।
কোথা গেল নন্দরায়, আনন্দ বহিয়া যায়
দেখসিয়া নয়ন ভরিয়া ॥
চিত্র বিচিত্র নাট, চরণে চাঁদের হাট,
চলয়ে খঞ্জনিয়া পাখী।
সাধ করিয়া মায়, নূপুর দিয়াছে পায়,
পা খানি তুলিয়া নাচ দেখি ॥"

নন্দরাণী যমুনার জলে কলসী ভরিয়া গৃহে আসিতেছেন, পথে গোপাল কোলে উঠিবার জন্য তাঁর অঞ্চল ধরিয়া আখুট্ করিতেছেন। যশোমতি স্নেহ গদগদ-ভাবে তাহাকে বলিলেন,—

"মরি বাছা ছাড় রে বসন।
কলসী উলাইয়া তোমারে লইব এখন ॥
মরি তোমার বালাই লইয়া, আগে আগে চল ধাইয়া,
বাবর নুপুর কেমন বাজে শুনি।
রাঙ্গা লাঠি দিব হাতে, খেলাইও শ্রীদামের সাথে,
ঘরে গেলে দিব ক্ষীর ননী ॥
মুই রইনু তোমা লইয়া, গৃহ কর্ম্ম গেল বইয়া,
তোরে হবে কেমন উপায়।
কলসী লাগিল কাঁখে, ছাড় রে অভাগী মাকে,
হোর মেঘ ধবলী পিয়ায় ॥
"মায়ের করুণা ভাষ, শুনিয়া ছাড়িল বাস,
আগে আগে চলে ব্রজরায়।
কিঙ্কিনী কাছনি ধ্বনি, অতি সুমধুর শুনি
রাণী বলে সোনার বাছা ধায় ॥
ভুবন মোহিয়া উরে, আঙ্গুলের নখ বরে,
সোনায় বান্ধিয়া খোপা তায়।
ধাইয়া যাইতে পিঠে, অধিক আনন্দ উঠে
নরসিংহ দাসে গুণ গায় ॥"

যশোদার প্রাণের গোপাল নয়নের মণি এখন একটু বড় সরটি হয়েছেন। দাদা বলাইর সঙ্গে এখন মাঝে মাঝে গোঠে যাওয়া হয়। তাই বলাই আজ শিঙ্গা ধ্বনি করিয়া গোপালকে গোঠে যাওয়ার জন্য ডাক্‌তে এসেছেন। তার ডাক শুনে মা যশোদা বলিলেন,—

"বলাই ডাকিস্ নেরে, শিঙ্গা বাজাস্ নেরে,
গোপাল গোষ্ঠে যেতে দিব না।
যাবি গোচারণ করিতে, সব রাখাল সঙ্গেতে
গহন বনেতে—আমার নীলমণি আজ বনেতে যাবে না ॥
নিশি শেষে, দেখ্‌লেম্ স্বপ্নাবেশে
শোন বলাই বলি তোরে—দুরাত্মা কংশের চরে,
নিবে মোর কৃষ্ণ ধনকে চুরি করে।
আমি শোন বলাই তাই বলি—যে দুঃখের নীলমণি,
জানে রোহিণী—আমার নীলমণি আজ বনেতে যাবেনা ॥"

কিন্তু বলাইর ডাক শুনিয়া গোপাল ছুটিয়া আসিলেন। রাখাল বালকদের সঙ্গে সেই নীল যমুনার তীরে তীরে বৃন্দাবনের সবুজ ঘাসে ঢাকা দিগন্ত বিস্তৃত মাঠে ধেনু চড়াইতে, ছুটাছুটি করিতে যে কি আনন্দ, তাহার আস্বাদ তিনি পাইয়াছেন। গোপাল কি আর গৃহে আবদ্ধ থাকিতে পারেন ? তিনি মাকে বলিলেন,—

"গোঠে আমি যাব মা গো গোঠে আমি যাব।

শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে বাছুরি চরাব ॥
চূড়া বান্ধি দেগো মা মুরলী দে মোর হাতে।
আমার লাগিয়া শ্রীদাম দাড়াঞা রাজপথে ॥
পীত ধড়া দেগো মা, গলায় দেহ মালা।
মনে পড়ে' গেল মোর কদম্বের তলা ॥
শুনিয়া গোপালের কথা মাতা যশোমতি।
সাজায় বিবিধ বেশ মনের আরতি ॥
অঙ্গে বিভূষিত কৈল রত্নভূষণ।
কটীতে কিঙ্কিনী ধটী পীত বসন ॥
কিবা সাজাইল রূপ ত্রিভুবন জিনি।
পুষ্প গুঞ্জা শিখি-পুচ্ছ চূড়ার টালনি ॥
চরণে নূপুর দিল তিলক কপালে।
চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ রত্নহার গলে ॥
বলরাম দাসে কয় সাজাইয়া রাণী।
নেহারে গোপাল মুখ কাতর পরাণী ॥"

ছেলের চঞ্চল স্বভাবটি মায়ের বিশেষ করিয়া জানা ছিল। হায়! এই চঞ্চলতার জন্য কতদিন মা হইয়াও কঠিন হৃদয়ে ছেলেকে শাস্তি দিতে হয়েছে,—কখনও বা লুকাইয়া ননী খাইতে যাইয়া দধি-ভাণ্ড কাত করিয়া ফেলার জন্য, কখনও বা গোপীদিগের কক্ষস্থ জলভরা কলসী ঢিল ছুড়িয়া ভাঙ্গিয়া দেওয়ার জন্য, কখনও বা এমনই কোনও কিছুর জন্য। তাই আজ মা তাঁর এই ছোট্ট দুষ্ট ছেলেটিকে উপদেশ দিতেছেন,—

"আমার শপতি লাগে, না ধাইও ধেনুর আগে,
পরাণের পরাণ নীলমণি।
নিকটে রাখিহ ধেনু, পূরিহ মোহন বেণু,
ঘরে বসি আমি যেন শুনি ॥
বলাই ধাইবে আগে, আর শিশু বামভাগে,
শ্রীদাম সুদাম সব পাছে।
তুমি তার মাঝে ধাইও, সঙ্গ ছাড়া না হইও
মাঠে বড় রিপুভয় আছে ॥
ক্ষুধা হইলে চাইয়া খাইও, পথ পানে চাইয়া যাইও,
অতিশয় তৃণাঙ্কুর পথে।
কারু বোলে বড় ধেনু ফিরাইতে না যাইও কানু,
হাত তুলি দেহ মোর মাথে ॥
থাকিহ তরুর ছায়, মিনতি করিছে মায়
রবি যেন না লাগয়ে গায়।
যাদবেন্দ্রে সঙ্গে লইও, বাধা পানই হাতে থুইও
বুঝিয়া যোগাবে রাঙ্গা পায় ॥"

গোপালকে উপদেশ দিয়াও মায়ের মনে "সোয়াস্তি" নাই। এ চপল-মতি বালককে বিশ্বাস কি? তাই তিনি বলরামকে বলিলেন,—

"ও বাছা বলরাম রে গোপাল আমার দিলাম তোর হাতে
সঙ্গে সঙ্গে রেখো গোপাল, দিও না দূর বনে যেতে ॥
নিকটে চরাইও ধেনু, দু'ভাইয়ে বাজাইও বেণু,
রোদেতে ঘামিলে তনু, বসো তমালের তলেতে।
গোপাল আমার কেলেসোনা, দুখের বার্ত্তা কি তা জানে না, ক্ষীর সর নবনী ছানা দণ্ডে দণ্ডে দিও খেতে ॥"

এ দিকে অন্যান্য রাখাল বালকেরা গোষ্ঠের সাজে সাজিয়া আসিয়া বলিল,—

ভৈরবী—একতালা।

"হেদে গো নন্দরাণী,
আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও।
আমরা রাখাল বালক দাঁড়িয়ে দ্বারে
আমাদের শ্যামকে দিয়ে যাও।
হের গো, প্রভাত হল, সূর্য্য ওঠে ফুল ফুটেছে বনে,
আমরা শ্যামকে নিয়ে গোষ্ঠে যাব
আজ করেছি মনে ॥
ওগো পীত ধড়া পরিয়ে তারে কোলে নিয়ে আয়,
তার হাতে দিও মোহন বেণু, নূপুর দিও পায়।
রোদের বেলায় গাছের তলায় নাচব সবাই মিলে,
বাজবে নূপুর রুণু ঝুণু বাজবে বাঁশী মধুর বোলে।

বন ফুলের গাঁথ্‌ব মালা
পরিয়ে দিব শ্যামের গলে ॥"

(রবীন্দ্রনাথ।)

তারা আবার গাহিল,—

সুরট্‌—আদ্ধা।

"আজ ফুলের মালায় সাজবে ভাল
রাম কানু দু'ভাই,
সবে তবে আয়না রে ভাই
প্রাণ ভরে' সাজাই।
রূপের ছটায় মাত্‌বে গোকুল,
দেখ্‌বে সবাই পরাণ আকুল,
(প্রাণ ভরে' সাজাইব)
চোখের দেখায় আশ মেটেনা,
প্রাণের দেখা চাই,
প্রাণ দিয়ে প্রাণ নেয় বলে তাই
সদা দেখা পাই ॥"

মা তো গোপালকে প্রস্তুত করিয়াই রাখিয়াছেন। তখন—

"প্রণতি করিয়া মায়, চলিলা যাদব রায়,
আগে পাছে ধায় শিশুগণ।
ঘন বাজে শিঙ্গা বেণু, গগনে গোক্ষুর রেণু,
সুর নর হরষিত মন ॥
আগে আগে বৎসপাল, পাছে ধায় ব্রজ বাল,
হৈ হৈ শব্দ ঘন রোল।
মধ্যে নাচি যায় শ্যাম, দক্ষিণে সে বলরাম,
ব্রজবাসী হেরিয়া বিভোর ॥
নবীন রাখাল সব, আবা আবা কলরব, শিরে চূড়া নটবর বেশ।
আসিয়া যমুনা তীরে, নানা রঙ্গে খেলা করে, কত কত কৌতুক বিশেষ ॥
কেহ যায় বৃষ ছান্দে, কেহ কার চড়ে কান্ধে,
কেহ নাচে কেহ কেহ গায়।
এ দাস মাধব বলে, কি শোভা যমুনা কূলে
রাম কানাই আনন্দে খেলায় ॥"

গৃহ প্রাঙ্গন হইতে রাখাল-জননীগণ গোপরাণীর সঙ্গে শুনিতে পাইলেন তাহাদের বাছারা গাইতেছে,—

"প্রাণের টানে প্রাণ-গোপালে সঙ্গে লয়ে যাই।
আমাদের সেই রাখাল রাজা কানাই বলাই ॥
হেলে দুলে' নেচে চলে গোঠবিহারী,
চঞ্চল দিঠি মিঠি রঙ্গে বিথারি ॥
বঙ্কিম ঠাম শিরে শিখি-পাখা শোভয়ে,
সুন্দর পীত ধটী কটিতট বেড়য়ে,
নূপুর রুণুরুণু, ঘুঙ্গুর ঝুনু ঝুনু,
নাচত বাজত বংশী বোলায়ত;
ধীরে ফিরে চায়, ধায় ধেনু দু'ধারি ॥"

সারাদিন ধেনু চরাইবার পরে যখন বেলা অবসানে সূর্য্যদেব শ্যাম দূর্ব্বাদলে এবং নীল যমুনায় তরল সোনা ঢালিয়া দিলেন তখন রাখালগণ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল যে পশ্চিমাকাশে—যেখানে নীল নভ শ্যামা ধরণীকে বড় ভাইটির মত আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে, সেইখানে কে যেন সিন্দূরের হাঁড়ি ঢালিয়া দিয়াছে! দেখিতে দেখিতে সে শোভা মিলাইয়া গেল। এখন অবিলম্বে সন্ধ্যার শ্যামল ছায়া পথ ঘাট সবই ঢাকিয়া ফেলিবে। এখন ত আর গৃহে না গেলে নয়! মায়ের মুখ যে মনে পড়িয়া গেছে! এ দিকে ধেনু সব দূর বনে প্রবেশ করিয়াছে। কানাই শ্রীদামকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

"পাল জড় কর শ্রীদাম, সান দেও শিঙ্গায়।
সঘনে বিষম থাই, নাম করে মায় ॥
আজি মাঠে আমাদের বিলম্ব দেখিয়া।
হেন বুঝি কাঁদে মা পথ পানে চাঞা ॥
বেলি অবসান হৈল, চল যাই ঘরে।
মায় না দেখিয়া প্রাণ কেমন জানি করে ॥
বলরাম দাসে কহে শুনি কানাইর বোল।

সকল রাখাল মাঝে পড়ে উতরোল ॥"

তখন গোপাল নিজে—

"সব ধেনু নাম কৈয়া, অধরে মুরলী লৈয়া,
ডাকিয়া পূরিল উচ্চ স্বরে।
শুনিয়া বেণুর রব, ধায় ধেনু বৎস সব
পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে ॥
ধেনু সব সারি সারি, হাম্বা হাম্বা রব করি
দাঁড়াইল কৃষ্ণের নিকটে।
দুগ্ধ স্রবি পড়ে বাঁটে, প্রেমের তরঙ্গ ওঠে,—
স্নেহে গাবী শ্যাম-অঙ্গ চাটে ॥"

(প্রেমদাস)

তখন ধেনু বৎস লইয়া শ্যাম সঙ্গে রাখাল দল গৃহাভিমুখে চলিল। তাহাদের আনন্দ কলরবে "ঘাট বাট তট মাঠ" প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। শ্যামাঙ্গী সন্ধ্যাদেবী স্নিগ্ধ নক্ষত্র-নেত্রে ছায়াচ্ছন্না গোধূলীমণ্ডিতা ধরণীর পানে নীরবে চাহিয়া সেই স্নেহ দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন।

কানাই বলাই রাখাল ও গোধন সঙ্গে গৃহে গেলেন। গোবৎসগুলি যথা স্থানে রাখিয়া তাহারা সকলেই মা যশোদার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার স্নেহ-হস্তের দেওয়া নবনীর ভাগ না লইয়া কি কোথাও যাওয়া যায়? নন্দরাণী সকলকে ননী বণ্টন করিয়া দিলে তাহাদের একজন উহা খাইতে খাইতেই গোপাল পথে যাইতে যাইতে কি সব কার্য্য করিয়াছে তাহাই মা যশোদার স্নিগ্ধোজ্জ্বল চক্ষের দিকে চাহিয়া বর্ণন করিয়া বলিতে লাগিল,—

"নিরমল যমুনা— জল যাহা হেরই
আপন আপন তনু ছায়।
দশনহি অধর, নয়ন করি বঙ্কিম,
কোপ করয়ে পুন তায় ॥
খেনে তিরিভঙ্গি রঙ্গি করি করতঁহি,
ক্ষণে ক্ষণে বেণু বাজায়।
ক্ষণে তরুপর হিলন দেই রঙ্গহি
রঙ্গিম চরণ দোলায় ॥
বিহরই নন্দ দুলাল।
শৃঙ্গ মুরলী করে, গলে গুঞ্জাবলী,
চৌদিকে বেড়ি ব্রজবাল ॥"

কানুর কাণ্ডের কথা শুনিয়া সকলেই হাসিতে লাগিলেন। তখন—

"রাণী ভাসে আনন্দ সাগরে।
বামে বসাইয়া শ্যাম, দক্ষিণে বসাই রাম,
চুম্ব দেই মুখ-সুধাকরে ॥
ক্ষীর, ননী, ছেনা, সর, আনিয়াছে থরে থর
আগে দেই রামের বদনে।
পাছে কানাইর মুখে, দেয় রাণী মহাসুখে
নিরখি চাঁদ-মুখ পানে ॥
গোপের রমণী যত, চৌদিকে শত শত
মুখ হেরি লহু লহু বোলে।
মাতা যশোমতি মেলি, মঙ্গল হুলাহুলি
আরতি করয়ে কুতুহলে ॥
জ্বালিয়া রতন বাতি, করে সবে আরতি
হরষিত যশোমতি মাই।
কহে বলরাম দাসে, আনন্দ সাগরে ভাসে,
দুহুঁ রূপের বলিহারি যাই ॥"

ইহার পরে বহু দিন চলিয়া গিয়াছে। বৃন্দাবনের আর সে দিন নাই। আজ গোকুল অন্ধকার। দারুণ অক্রুর আসিয়া গোকুলচন্দ্রকে মথুরায় লইয়া গিয়াছেন। ব্রজে কেবল গগণ ভেদী হাহাকার। গোপীদিগের বিষাদ মাখা ম্লানমুখে আর কেহ হাসির রেখাটি পর্য্যন্ত দেখিতে পায় না, তাহাদের নীল নয়ান অবিরত অশ্রু ভারাক্রান্ত। রাখাল বালকগণ গোপাল-বিরহে আর তেমন করিয়া খেলা করে না, ছুটাছুটি করে না, নাচে না, গায় না—তাহাদের স্বাভাবিক চাঞ্চল্য তাহারা পরিত্যাগ করিয়াছে। কেবল মাঝে মাঝে "প্রাণ গোপাল কোথা

গেলি রে" বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে। গাভীকুল আর তেমন প্রফুল্ল ভাবে তৃণ খায় না। কনও বা খাইতে খাইতে উর্দ্ধমুখ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, কবলিত তৃণগুচ্ছ মুখ হইতে পড়িয়া যায়। দুঃখিনী মা-যশোদার কথা আর কি বলিব? তিনি দিবসের অধিকাংশ সময়ই অচৈতন্য অবস্থায় থাকেন। যখন চৈতন্য লাভ করেন তখনই বুকফাটা হাহাকার! অশ্রু ঝরিতে ঝরিতে আঁখি-কুবলয় জ্যোতিহীন হইয়াছে। রাণী যেন উন্মাদিনী। তাঁহার দুঃখে, শ্যামের বিরহে গোকুলের পশুপক্ষী তরুলতা পর্য্যন্ত নিরানন্দ, প্রভাতে সন্ধ্যায় পাখী আর তেমন করিয়া গায় না। তাঁহার প্রাণ-গোপালের যে মধুর বাঁশীর রবে মৃগকুল থমকিয়া দাঁড়াইত, কদম্ব ফুটিয়া উঠিত, যমুনা উজান বহিত সে পাগল-করা অবস-করা বাঁশী আর বাজে না! হায় গোপাল কোথায় গেল? সে কি আর আসিবে না? কেন তিনি অক্রুরের কথায় বিশ্বাস করিয়া দু'দিন পরেই গোপাল ফিরিয়া আসিবে এই আশ্বাসে তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন? মা যশোদা কপালে করাঘাত করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

ললিত-যোগিয়া—আড়া ঠেকা।

"হায় আমি কি করিলেম, পেয়ে রতন হারাইলেম,
পরের কথায় ঘরে দিলেম অনল গো॥
অক্রুর বা কোথাকার কে, সে আমা সবাকার কে,
তাহাকে বা চিনে কে?
সে কেন নীলমণিকে হরে' নিল॥"

শোক-বিহ্বলা পুনরায় কহিলেন,—

মধুকানের সুর—ঠুংরি।

"নিল মুনি নীলমণি যে দিন,
আমার মনে হইল সে দিন,
ফিরে কি আর হবে এমন দিন॥
যে থাকে না তিলেক ছেড়ে',
জানলে কিরে দিতেম ছেড়ে,
গোকুল ছেড়ে সঙ্গে যেতেম সে দিন॥
'ওমা যাই যাই' বলে' কারে বা সুধায় গো,
'নেরে খারে ক্ষীর ননী' কে তারে বলে গো,
কারে বা বলে জননী,
কেবা দেয় ক্ষীর ননী?
খায় কি রে সে ক্ষীর ননী,
দুখিনীরে মনে হয় কি একদিন॥"

—(মধুসূদন কিন্নর)

যশোমতি একদিন তাঁহার প্রাণ গোপালকে স্বপ্নে দেখিয়াছেন। গোপাল যেন সেই ছোট্টটি, সেই যেন প্রফুল্ল নীল পদ্মটি। তাঁহার সঙ্গে কতই আব্দার করিতেছেন। কতই না মধুর স্বরে মা বলিয়া ডাকিতেছেন, ক্ষণে নবনীত চাহিতেছেন, ক্ষণে বা আকাশের চাঁদ পাড়িয়া দিতে বলিতেছেন, আর না পাইলে কাঁদিতেছেন, স্বপ্ন-ভঙ্গে নিশাবসানে রাণী গোপরাজকে বলিলেন,—

বেহাগ—একতালা।

"শোন ব্রজরাজ, স্বপনেতে আজ,
দেখা দিয়ে গোপাল কোথা লুকালে।
যেন সে চঞ্চল চাঁদে, অঞ্চল ধরে' কাঁদে,
'জননী দে ননী দে ননী বলে'॥

নীল কলেবর, ধূলায় ধূসর,
বিধুমুখে যেন কতই মধুর স্বর
সঞ্চারিয়ে ডাকে 'মা' বলে'।
যত কাঁদে বাছা বলি সর সর,
আমি অভাগিনী বলি সর্ সর্,
বল্লেম নাহি অবসর, কেবা দিবে সর,
অমনি সর্ সর্ বলি ফেলিলেম ঠেলে॥

ধূলা ঝেড়ে কোলে তুলে নিলেম চাঁদ,
অঞ্চলে মুছালেম চাঁদের বদন চাঁদ,
পুনঃ চাঁদ কাঁদে চাঁদ বলে'।
যে চাঁদ নিছনি কোটি চাঁদ চাঁদ,

সে কেন কাঁদিবে বলি 'চাঁদ চাঁদ,'
বল্লেম চাঁদের মাঝে তুই অকলঙ্ক চাঁদ,
ঐ দেখ্ চাঁদ আছে তোর চরণ তলে॥"
—(৺কৃষ্ণকমল গোস্বামী)।

এই ত অবস্থা। ইহারই পরে একদিন প্রভাত সময়ে শুভ্র বেশ, শুভ্র কেশ, শুভ্র গুম্ফ, শুভ্র দেহ, শুভ্র মাল্যধারী নারদ ঋষি বীণাযন্ত্রে মধুর হরিনাম গান করিতে করিতে নন্দরাজপুরে উপস্থিত হইলেন। ঋষিপ্রবর গোপরাণীর অবস্থা দেখিয়া বড়ই দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি মথুরায় যাইবেন শুনিয়া রাণী তাঁহাকে বলিলেন,—

"বলো' বলো' নারদ মুনি
মথুরায় এই দুঃখের সমাচার,
দিবানিশি ব্রজবাসী করে হাহাকার।
কেঁদে কেঁদে ব্রজের রাখাল
ধূলাতে লুটায়,
গোপাল বিনে ব্রজের গো-পাল
উর্দ্ধ মুখে ধায়।
যেন শতবর্ষ কৃষ্ণ হারা, হায়,
এ দুখিনীর বাঁচা ভার॥"
(আনন্দচন্দ্র মিত্র)।

এ দিকে রাখাল বালকগণ আর কিছুতেই গোপাল-হীন নিরানন্দ জীবন সহ্য করিতে না পারিয়া যমুনার উত্তাল-তরঙ্গাকুল নীল জলরাশি পার হইয়া "হা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ" বলিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে সেই "নিঠুর চূড়ামণি"র নিকট উপস্থিত হইতে মনস্থ করিয়াছে। এমন সময়ে তাহারা দেখিল নারদ-মুখে সংবাদ পাইয়াই হউক বা যে কোন কারণেই হউক তাহাদের প্রাণ কানাই আসিয়াছে। তাহারা আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে পুলকাঞ্চিত দেহে তাহাদের প্রাণের গোপালের হাত ধরিয়া বলিতে লাগিল,—

ভূপালী—কাওয়ালি।

"এস এস ভাই কাজ নাই আর বিলম্বে,
এস এস ভাই।
বৃন্দারণ্য করি শূন্য ও কি জন্য
ছিলে অন্য ঠাঁই,
কানাই চল চল অবিলম্বে যাই॥
'শ্যাম তো ব্রজবাসী-হিত-কারী',
বলে' থাকে এ বৃত্তান্ত সবে সুনিতান্ত,
ভেবে আছি শান্ত হয়ে' ভাই,
ভেবে ভেবে মা যশোদা সদা ঝুরে,
কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ফিরে, থেকে থেকে
ডাকেরে কানাই॥
সুখের ব্রজধাম শুধুমাত্র আছে নাম,
অবিরাম হা হা শব্দ ভিন্ন নাই॥"
(৺রামকুমার বসাক)।

মুহূর্ত্ত মধ্যে গোপালের গোকুলে আগমন সংবাদ বৃন্দাবনের পথে ঘাটে, ঘরে ঘরে, বনে প্রান্তরে রাষ্ট্র হইয়া গেল। ব্রজের আবাল বৃদ্ধ বনিতা এই অসম্ভাবনীয় সুখের সংবাদে অধীর হইয়া ছুটিয়া আসিল। আলুলায়িত কুন্তলা, শিথিল বসনা, বিবশা যশোদা অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে, পড়িতে পড়িতে ছুটিয়া আসিলেন। গোপালকে কোলে টানিয়া সে চাঁদমুখ দেখিয়া দেখিয়া, কত কান্নাই না কাঁদিলেন। কথঞ্চিৎ শান্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—

পরজ—মধ্যমান।

"কে এলি আমার রতনমণি, বল শুনি।
ধর্ম্ম-মাতা-পিতা নিয়ে ছিলি মথুরাতে,
পরের মাকে মা বলিলি, মরি সেই দুঃখেতে,
বুঝেছিলি ননী দিবে,
তাই পিতা ডাকলি বসুদেবে,
সে ননী কোথা পাবে—
ঐ দেখ রে রেখেছি ননী॥"
(৺মধুসূদন কিন্নর)।

হিন্দু ভক্ত তাঁহার সন্তানের চল চল কচি মুখখানিতে সেই বিশ্বব্যাপী স্নেহ রাশির প্রোজ্জ্বল প্রতিবিম্ব দেখিয়াই—সেই অনন্ত সুন্দরের স্বরূপ নিরীক্ষণ করিয়াই, বাৎসল্যভাবে তাঁর সেবা করিয়া ধন্য হ'ন।

শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত।

ভারতের আর্য্য ও অনার্য্য

চতুর্থ প্রস্তাব—ভারতীয় মত

প্রথম অংশ (পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বর্ণ ভেদের প্রাক্কালে আর্য্যদিগের কিরূপ গুণ কর্ম্ম স্বভাব ছিল এবং তাঁহাদিগকে কি বলিয়া পরিচিত করা হইত, তৎসম্বন্ধে প্রাচীনতম বায়ু পুরাণ বলিতেছেন,—

"সেই আদিযুগে সত্য, অলোভ, ক্ষমা, তুষ্টি, সুখ ও দম সকলেরই ছিল। রূপ, আয়ু, স্বভাব ও ক্রিয়া দ্বারা সকলেই সমান ছিল, কাহারই কিছুমাত্র বিশেষত্ব লক্ষিত হইত না কেহই ভাল মন্দ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিত না, পরন্তু স্বভাবই কর্ম্ম করিত। সত্যযুগে শুভাশুভ কর্ম্মের প্রবৃত্তি ছিল না, বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থা ছিল না,—পরন্তু বর্ণশঙ্করও হইত না।" বায়ু পুরাণ, প্রথম পাদ, ৮ম অধ্যায়।

"পরে সেই প্রজাবর্গের জীবিকোপায় বিহিত হইলে, ভগবান ব্রহ্মা তাহাদিগের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ নিবারণের জন্য কতকগুলি বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করিলেন। তাহাদিগের মধ্যে যাঁহারা বলবান্ ও ভূপরিগ্রহীতা এবং বিশেষ ধর্ম্ম-পরায়ণ ছিলেন, তাঁহাদিগকে "ক্ষত্রিয়" পদে স্থাপন করিয়া অপর সাধারণের পরিত্রাণের জন্য নিযুক্ত করিলেন। সেই ক্ষত্রিয়গণের নিকট নির্ভয়ে যাঁহারা উপস্থিত হইতেন (উপাসনা করিতেন) এবং সত্যবাদী ও সর্ব্বভূতে ব্রহ্মবাদী ছিলেন, তাঁহাদিগকে, "ব্রাহ্মণ" করিলেন। আর যাঁহারা ইহাদের অপেক্ষা দুর্ব্বল অথচ হিংসাপূর্ণ কর্ম্মে (কৃষি) নিযুক্ত হইলেন, সেই স্বার্থসর্ব্বস্ব ব্যক্তিগণকে "বৈশ্য" করিলেন, আর যাঁহারা শোকগ্রস্ত হইয়া ভয়ে ছুটাছুটি করিত, অথচ অপরের পরিচর্য্যাও করিত, সেই নিস্তেজ এবং অল্পবীর্য্য জনগণকে "শূদ্র" আখ্যা প্রদান করিলেন এবং তাঁহাদের চাতুর্বর্ণ্য রক্ষার নিমিত্ত ধর্ম্ম ও জীবিকার নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।" বায়ুপুরাণ, প্রথম পাদ, ৮ম অধ্যায়। *

---

* "তদাসত্যমলোভশ্চ ক্ষমা তুষ্টিঃ সুখং দমঃ।
নির্ব্বিশেষাস্ত তাঃ সর্ব্বারূপায়ুঃশীল চেষ্টিতৈঃ।
অবুদ্ধি পূর্ব্বকং বৃত্তং প্রজানাং জায়তে স্বয়ম্॥৬০॥
অপ্রবৃত্তিঃ কৃতযুগে কর্ম্মণোঃ শুভ পাপয়োঃ।
বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাশ্চ ন তদাসন্ ন সঙ্করঃ॥৬১॥"
"সংসিদ্ধায়াস্তু বার্ত্তায়াং ততস্তানাং স্বয়ং ভুবা।
মর্য্যাদাঃ স্থাপয়ামাস যথারব্ধাঃ পরস্পরম্॥৬১॥
যে বৈ পরিগ্রহীতার স্তাসামাসন্নাত্মিকাঃ।
ইতরেষাং কৃতত্রাণাঃ স্থাপয়ামাস ক্ষত্রিয়ান্॥৬২॥
উপতিষ্ঠন্তি যে তান্ বৈ যাবন্তো নির্ভয়াস্তথা।
সত্যং ব্রহ্ম যথা ভূতং ব্রুবন্তো ব্রাহ্মণাশ্চ তে ॥৬৩॥
যে চান্যেঽপ্যবলাস্তেষাং বৈশসং কর্ম্মসংস্থিতাঃ।
কীনাশা নাশয়ন্তি স্ম পৃথিব্যাং প্রাগতন্দ্রিতাঃ।
বৈশ্যানেব তানাহুঃ কীনাসান্ বৃত্তি সাধকান্ ॥৬৪॥
শোচন্তশ্চ দ্রবন্তশ্চ পরিচর্য্যাসু যে রতাঃ।
নিস্তেজসোঽল্পবীর্য্যাশ্চ শূদ্রাং স্তান ব্রবীতুসঃ॥৬৫॥
তেষাং কর্ম্মাণি ধর্ম্মাংশ্চ ব্রহ্মা তু ব্যদধাৎ প্রভুঃ।
সংস্থিতৌ প্রাকৃতায়াস্তু চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য সর্ব্বশঃ॥৬৬॥
বায়ুপুরাণ, প্রথমপাদে, অষ্টম অধ্যায়ে।

তথা

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ পূর্ব্বভাগ, অষ্টম অধ্যায়।

মৎস্যপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, ও মার্কণ্ডেয় পুরাণেও এই প্রকার মত প্রকাশিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

উল্লিখিত বায়ু (অথবা ব্রহ্মাণ্ড) পুরাণের শ্লোকাবলী হইতে দেখা গেল যে আদিম যুগে সমাজ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই সমাজ রক্ষক ক্ষত্রিয় বর্ণের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল এবং পরে সভ্যতার উন্নতির সহিত উক্ত ক্ষত্রিয় বর্ণের ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে কর্ম্মফলে কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ বৈশ্য এবং কেহবা শূদ্র হইয়াছিলেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও আমরা এই নীতির আভাস পাইয়াছি আর বৌদ্ধ এবং জৈন সমাজনীতিতেও এইরূপ বর্ণ বিভাগের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। প্রাচীন "বৌদ্ধ ভারতের ইতিহাস" নামক গ্রন্থে ডাক্তার "রিস ডেভিস" বলিতেছেন যে, বৌদ্ধ সমাজে রাজাদিগের সম্মান সর্ব্বোচ্চ ছিল এবং ব্রাহ্মণদিগের সম্মান তাঁহাদের অনেক নিম্নে ছিল *। জৈনদিগের প্রামাণিক গ্রন্থ "জিন সংহিতা" বলিয়াছেন,—

"ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্র এই তিন বর্ণ দুর্ব্বলের রক্ষা ইত্যাদি গুণবশতঃ সৃষ্ট হইয়াছিল। ক্ষত্রিয় কুমারগণের মধ্যে যাঁহারা অণুব্রত পরায়ণ ছিলেন অথবা অধিকতর ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতেন, ভরত তাঁহাদিগকেই ব্রাহ্মণ করিয়াছিলেন ইত্যাদি।" †

মহাভারত শান্তিপর্ব্বে কিন্তু ঠিক বিপরীত মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে। তথায় উক্ত হইয়াছে,—

"প্রশ্ন। চতুর্বিশ বর্ণের প্রত্যেক বর্ণের মধ্যেই যখন সর্ব্বপ্রকার বর্ণ (রঙ্) বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন কেবল বর্ণ (রঙ্) দেখিয়াই মনুষ্যগণের বর্ণ ভেদ (জাতিভেদ) কিরূপে স্থির হইতে পারে? দেখুন, সকল লোকই কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ, শোক, চিন্তা, ক্ষুধা ও পরিশ্রম দ্বারা ব্যাকুল হয়, এবং সকলের দেহ হইতেই স্বেদ, মূত্র, পুরীষ, শ্লেষ্মা, পিত্ত ও শোণিত নির্গত হইয়া থাকে। অতএব কিরূপে বর্ণ বিভাগ করা যাইতে পারে?" ‡

"উত্তর। ইহলোকে বস্তুতঃ বর্ণের ইতর বিশেষ নাই। সমুদয় জগৎই ব্রাহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মময় ছিল। মনুষ্যগণ পূর্ব্বে ব্রহ্মাদ্বারা সৃষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে কার্য্য দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে পরিগণিত হইয়াছে। যে ব্রাহ্মণগণ রজোগুণ প্রভাবে কামভোগপ্রিয়, ক্রোধপরতন্ত্র, সাহসী ও তীক্ষ্ণ হইয়া স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে, তাহারা রক্তবর্ণ এবং ক্ষত্রিয়ত্ব; যাহারা রজঃ ও তমোগুণ প্রভাবে পশুপালন ও কৃষি কার্য্য অবলম্বন করিয়াছে, তাহারা পীতবর্ণ এবং বৈশ্যত্ব এবং যাহারা তমোগুণ প্রভাবে হিংসাপর, লুব্ধ, সর্ব্বকর্ম্মোপযোগী, মিথ্যাবাদী ও শৌচ ভ্রষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, তাহারাই কৃষ্ণবর্ণ ও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য দ্বারাই পৃথক পৃথক বর্ণ লাভ করিয়াছেন।" * মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব।

---

* Dr. Rhys Davis' The Buddhist India, Chapter IV.

† "অসির্মষিঃ কৃষি-বিদ্যাবাণিজ্যশিল্পমিত্যপি।
কর্ম্মানি ষড়্ বিধানি স্যুঃ প্রজাজীবন হেতবঃ॥
ত্রয়ঃ ক্ষত্রিয় বিট্ শূদ্রাঃ ক্ষতত্রাণাদিভিগুণৈঃ॥
ক্ষত্রিয়েষু কুমারেষু যে হণুব্রত পরায়ণাঃ।
স্তুষ্টাস্তে ব্রাহ্মণাঃ পশ্চাদ্ ভরতেনাত্মবেধসা॥" ইত্যাদি
জিন সংহিতা, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, বিশ্বকোষধৃত।

‡ "ভরদ্বাজ উবাচ।
চাতুর্বণ্যস্য বর্ণেন যদি বর্ণো বিভিদ্যতে।
সর্ব্বেষাং খলু বর্ণানাং দৃশ্যন্তে বর্ণসঙ্করঃ॥
কামঃ ক্রোধো ভয়ং লোভো শোকশ্চিন্তা ক্ষুধাশ্রমঃ।
সর্ব্বেষাং ষ প্রভবতি কস্মাদ্ বর্ণো বিভিদ্যতে॥
স্বেদমূত্র পুরীষানি শ্লেষ্মা পিত্তং স শোণিতম্।
তনুঃ ক্ষরতি সর্ব্বেষাং কস্মাদ্ বর্ণো বিভিদ্যতে॥
জঙ্গমানামসং খ্যেয়াং স্থাবরানাঞ্চ জাতয়ঃ।
তেষাং বিবিধ বর্ণানাং কুতোবর্ণ বিনিশ্চিয়ঃ॥"
মহাভারত, শান্তি পর্ব্ব, ১৮৯ অধ্যায়।

* "ন বিশেষোহস্তি বর্ণানাং সর্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রাহ্মণা পূর্ব সৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্॥

পূর্ব্বে বায়ু পুরাণাদির মতানুসারে দেখা গিয়াছে যে সমাজে আদৌ ক্ষত্রিয়বর্ণ প্রকাশিত হইয়াছিল এবং পরে ক্রমশঃ ক্ষত্রিয়বর্ণ ই গুণকর্ম্মাদির ভেদবশতঃ চাতুবর্ণে বিভক্ত হইয়াছে, কিন্তু একণে মহাভারতের বাক্যাবলী হইতে দেখা গেল যে পুরাকালে সমাজে প্রথমে একমাত্র ব্রাহ্মণ বর্ণ ই ছিল এবং ক্রমশঃ তাহাঁরই ক্রমাবনতি হেতু অপর নিকৃষ্টতর বর্ণের উদ্ভব বা বিকাশ হইয়াছে। মহাভারতের পরিশিষ্টভাগ অর্থাৎ "হরিবংশে" আবার এক দক্ষ প্রজাপতি হইতেই ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের উদ্ভব কীর্ত্তিত হইয়াছে, যথা :—

"ইন্দ্রিয়জনিত ভেদজ্ঞান বিরহিত, ব্রহ্মসম্ভব যোগী, বিষ্ণুরূপী-দক্ষ প্রজাপতি হইয়া বহুসংখ্যক প্রজার সৃষ্টি করেন। অক্ষয় অথবা সত্বময় নিষ্কাম শুদ্ধ ধর্ম্ম হইতে শ্বেতবর্ণ ব্রাহ্মণ এবং ক্ষর অর্থাৎ রজঃ সত্বময় কর্ম্ম প্রধান ধর্ম্ম হইতে রক্তবর্ণ ক্ষত্রিয় এবং উক্ত উভয় প্রকার নিষ্কাম ও সকাম ধর্ম্মের বিকার হইতে পীতবর্ণ বৈশ্য এবং ধুম অথবা তমোগুণময় অধর্ম্ম হইতে কৃষ্ণবর্ণ শূদ্রের সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপ শ্বেত রক্ত পীত ও নীল এই চতুর্বিধ বর্ণের চিন্তাদ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুরূপী দক্ষ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রথম তিন বর্ণের লোকের আকৃতি একই প্রকার, তাঁহাদের পৃথক পৃথক ধর্ম্ম হইলেও সকলেরই বেদ বিহিত কর্ম্ম ও সংস্কারে অধিকার আছে, কিন্তু নির্ম্মাণ অথবা শিল্পরূপ জীবিকা হইতে সম্ভূত শূদ্রের বেদ বিহিত সংস্কার ও কর্ম্ম নাই। † হরিবংশ, ভবিষ্যপর্ব্ব।

ব্রহ্মের অঙ্গের মুখ ও বাহু প্রভৃতি চারিস্থান, স্বায়ম্ভুব মনু এবং বৈবস্বতাদি মনুর ঔরস, কশ্যপ ঋষির পত্নী "মনুর" গর্ভ, দক্ষ প্রজাপতির ঔরস অথবা সমাজের কোন এক বিশেষ অবস্থা হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারি বর্ণের উদ্ভবের কাহিনী ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে কথিত হইয়াছে। মনু মহারাজের মতে প্রথম তিন বর্ণকে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণকে, "আর্য্য" এবং শূদ্রকে "অনার্য্য" স্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে। অন্যান্য শাস্ত্রে যেরূপ লিখিত হইয়াছে তাহাতে বোধ হইতেছে যে শূদ্রবর্ণ ও প্রথম তিন বর্ণ হইতে মূলতঃ একেবারে পৃথক ছিল না ; ক্রমশঃ গুণকর্ম্মাদির অপকর্ষ হেতুই উচ্চবর্ণের কতকগুলি ব্যক্তি শূদ্রত্বে অবনমিত হইয়াছে। কেবল "বোধ হইবার" কথা নহে, তাহার প্রমাণ আমরা দিতেছি।

কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্ত্‌ স্বধর্ম্মা রক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥
গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ॥
হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচ পরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥
ইত্যেতৈঃ কর্ম্মভির্ব্যস্তা দ্বিজা বর্ণান্তরংগতাঃ।
ধর্ম্মো যজ্ঞক্রিয়াস্তেষাং নিত্যং ন প্রতিষিধ্যতে॥"

মহাভারত শান্তিপর্ব্ব। ১৮৯ অধ্যায়।

† "ব্যতিরিক্তেন্দ্রিয়ো বিষ্ণুযোগাত্মা ব্রহ্মসম্ভবঃ।
দক্ষঃ প্রজাপতির্ভূত্বা সৃজতে বিপুলাঃ প্রজাঃ॥৮॥
অক্ষরাদ্ ব্রাহ্মণাঃ সৌম্যাঃ ক্ষরাদ্ ক্ষত্রিয়বান্ধবাঃ।
বৈশ্যা বিকারতশ্চৈব শূদ্রা ধুম বিকারতঃ॥৯॥
শ্বেত লোহিতকৈর্ব্বর্ণৈঃ পীতৈর্নীলৈশ্চ ব্রাহ্মণাঃ।
অভিনির্ব্বর্ত্তিতা বর্ণাশ্চিন্তয়ানেন বিষ্ণুনা॥১০॥
ততো বর্ণত্বমাপন্নাঃ প্রজা লোকে চতুর্বিধাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চৈব মহীপতে॥১১॥
একলিঙ্গাঃ পৃথগ্ ধর্ম্মা দ্বিপদাঃ পরমাদ্ভুতাঃ।
যাতনায়াতিসম্পন্না গতিজ্ঞাঃ সর্ব্বকর্ম্মসু॥১২॥
ততো নির্ম্মাণ সম্ভূতাঃ শূদ্রাঃ কর্ম্মবিবর্জ্জিতাঃ।
তস্মান্নার্হন্তি সংস্কারং নহ্যত্র ব্রহ্ম বিদ্যতে॥১৫॥"

হরিবংশ, ভবিষ্যপর্ব্ব, ২১শ অধ্যায়।

প্রথমেই কিন্তু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুই বর্ণের সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। বায়ু প্রভৃতি মহাপুরাণের মতে "ক্ষত্রিয়" বর্ণই প্রথমে ছিল, পরে কোন বিশেষ হেতুতে ক্ষত্রিয়বর্ণের কতকগুলি লোক উন্নত হইয়া "ব্রাহ্মণত্ব" পাইয়াছিলেন এবং অপর কতকগুলি অবনতি মূলে বৈশ্যত্ব এবং শূদ্রত্ব লাভ করিয়াছিলেন। আবার মহাভারতের শান্তি পর্ব্বের উল্লিখিত প্রমাণে দেখিতে পাওয়া যায় যে জগতে আদিমকালে একমাত্র "ব্রাহ্মণ" বর্ণেরই অস্তিত্ব ছিল, পরে সামাজিকবর্গের গুণ কর্ম্মের অপকর্ষ নিবন্ধন কতকগুলি লোক ক্ষত্রিয়ত্বে, বৈশ্যত্বে অথবা শূদ্রত্বে অবনমিত হইয়াছে। ব্রহ্মার মানস পুত্র বা ব্রাহ্মণবংশীয় অত্রি ও মরীচি প্রমুখ পরমর্ষিগণের ঔরস হইতে দেব দানব ও চারিবর্ণের মনুষ্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা আমাদের সর্ব্বশাস্ত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু ক্ষত্রিয় নরপতিগণের বংশ হইতেও যে ক্রমোন্নতির ফলে অনেকগুলি ব্রাহ্মণ শাখার উদ্ভব হইয়াছে সে কথা সেরূপ সুবিদিত নহে এবং সেই জন্যই রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তির সম্বন্ধে এত গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। আমরা এস্থলে বহুতর "ক্ষত্রোপেত" অথবা ক্ষত্রিয়-কুলোদ্ভব ব্রাহ্মণবংশের পরিচয় প্রদান করিতেছি।

প্রথমতঃ সূর্য্যবংশের ক্ষত্রিয়গণের কথাই গ্রহণ করা যাউক। সূর্য্যের পুত্র বৈবস্বত মনুর অন্যতম পুত্রের নাম ধৃষ্ট; সেই ধৃষ্ট হইতে "ধার্ষ্ট" নামক ব্রাহ্মণ বংশের উদ্ভব হইয়াছে। (১) শ্রীমদ্ভাগবত, নবম স্কন্ধ।

মনুপুত্র দিষ্টের পুত্র নাভাগ বৈশ্যতা প্রাপ্ত হইলেও পরে তাঁহার পুত্রদ্বয় ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। (২) হরিবংশ।

সূর্য্যবংশীয় যুবনাশ্ব, রাজার পুত্র হারীতের বংশ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। (৩) লিঙ্গপুরাণ ও বায়ুপুরাণ।

সূর্য্যবংশীয় বিরূপের পুত্র রথীতর হইতে রথীতর গোত্রের ব্রাহ্মণগণ উদ্ভূত হইয়াছিলেন। (৪) ঐ বংশ বিষ্ণুবৃদ্ধ রাজার পুত্রেরাও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। (৫)

চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজবংশে, অসংখ্য ব্রাহ্মণ গোত্রের উৎপত্তি হইয়াছিল; তন্মধ্যে বিশ্বামিত্র, গৃৎসমদ, শুনক, আষ্টিষেণ ও বেণুহোত্র, রাজার বংশে উৎপন্ন ব্রাহ্মণগণ বিশেষ রূপে মাননীয় হইয়াছিলেন (৬)। তপস্যার বলে যে সকল ক্ষত্রিয় নরপতি ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়া সংসারে অমরত্ব লাভ করিয়াগিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বিশ্বামিত্র, মান্ধাতা, সংকৃতি, কবি, কপি, পুরুকুৎস, সত্য, অনুহবান্, ঋথু, আষ্টিষেন, অজমীঢ়, ভর্গ, কক্ষীবান্, শিঞ্জয়, রথীতর, রুন্দ এবং বিষ্ণুবৃদ্ধ প্রভৃতির নাম সমধিক প্রসিদ্ধ (৭)। একমাত্র বিশ্বামিত্র হইতেই কুড়িটি

(১) "ধৃষ্টাদ্ধার্ষ্টমভূৎ ক্ষত্রং ব্রহ্মভূয়ং গতং ক্ষিতৌ।" শ্রীমদ্ভাগবত, নবমস্কন্ধ, দ্বিতীয় অধ্যায়।

(২) "নাভা বারিষ্টৌ পুত্ত্রৌ যৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ।" হরিবংশ, হরিবংশপর্ব্ব, ১১শ অধ্যায়।

(৩) "হারিতো যুবনাশ্বস্য হারিতাযস্ত আত্মজাঃ।
এতে হ্যঙ্গিরসঃ পক্ষে ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ॥"
লিঙ্গপুরাণে, বায়ুপুরাণে, ৮৮ অঃ

(৪) "পৃষদশ্বো বিরূপস্য তস্যপুত্রো রথীতরঃ॥৬॥
রথীতরাণাং অবরাঃ ক্ষাত্রো পেতা দ্বিজাতয়ঃ।"
বায়ুপুরাণ ৮৮ অধ্যায়।

(৫) "বিষ্ণুবৃদ্ধঃ সুতস্তস্য বিষ্ণুবৃদ্ধা যতঃ স্মৃতাঃ।
এতে হ্যঙ্গিরসঃ পুত্রাঃ ক্ষাত্রোপেতাঃ সমাশ্রিতাঃ॥৮২॥
ঐ ৮৮ অধ্যায়।

(৬) বায়ু পুরাণ ৯১।৯২ অধ্যায়।

(৭) "বিশ্বামিত্রো নরপতির্মান্ধাতা সংকৃতিঃ কবিঃ॥১১৫॥
কপিশ্চ পুরু কৎসশ্চ সত্যশ্চানুহবানৃথুঃ।
আষ্টিষেণো হ্যজমীঢ়শ্চ ভর্গো হ্যোজস্তথৈবচ॥১১৬॥
কক্ষীবাংশ্চৈব শিঞ্জয়স্তথান্যে চ মহারথাঃ।
রথীতরশ্চ রুন্দশ্চ বিষ্ণুবৃদ্ধাদয়ো নৃপাঃ॥১১৭॥
ক্ষাত্রো পেতাঃ স্মৃতা হ্যেতে তপসা ঋষিতাং গতাঃ।"
বায়ু পুরাণ ৯১ অধ্যায়॥

কৌশিক গোত্রের সংবাদ পাওয়া যায়। আশ্বলায়নের শ্রৌতসূত্রে এবং মৎস্যপুরাণে ব্রাহ্মণগণের যে গোত্র প্রবরের দীর্ঘ তালিকা আছে, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে সূর্য্য এবং চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় নরপতি হইতে অনেক ব্রাহ্মণ গোত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রসিদ্ধ গোত্রকার ভরদ্বাজ স্বয়ং শকুন্তলাপুত্র ভরতের পৌত্রপুত্র এবং ক্ষত্রিয় রাজা। মৌদ্‌গল্য, শৌনক, রথীতর, হারীত, সাংকৃতি ও বাৎস্য প্রমুখ গোত্রের ঋষি যে ক্ষত্রিয় রাজা তাহা যে কোন মহা পুরাণ পাঠ করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়।

পূর্ব্বকালের সামাজিক নিয়মানুসারে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের সম্বন্ধ খুব নিকট ছিল। যে কোন মহাপুরাণ এবং মহাভারত খুলিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে মনু এবং প্রজাপতিগণের জামাতা ও দৌহিত্রগন ব্রাহ্মণ অথচ পুত্র এবং পৌত্রেরা রাজচক্রবর্ত্তী। সাংসারিক আচারের ঊর্দ্ধে অবস্থিত ঋষিগণ প্রায়ই রাজর্ষিগণের কন্যা বিবাহ করিতেন। কোন কোন রাজা (যেমন যযাতি ও অণুহ) ব্রাহ্মণ ঋষির কন্যাও বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাহাতে কোনরূপ দোষ হয় নাই। * জৈনদিগের সমাজে দ্বিজ ত্রিবর্ণের মধ্যে পরস্পরের বিবাহ বিধি সঙ্গত ছিল। †

সমাজের যে সময়ের কথা এই সব শাস্ত্র বলিতেছেন, তখন ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ হওয়া আদৌ অসম্ভব ঘটনা ছিল না; এমন কি তখন গুণকর্ম্ম দ্বারা উচ্চবর্ণও নিম্নবর্ণে অবনমিত হইত এবং গুণকর্ম্মের প্রভাবে নিম্নবর্ণও উচ্চবর্ণে উন্নীত হইত। এই সময়ের সমাজের বর্ণভেদকে লক্ষ্য করিয়াই মহর্ষি আপস্তম্ব স্বকীয় ধর্ম্মসূত্রে বলিয়াছেন,

"ধর্ম্মাচরণ দ্বারা অধম বর্ণও ক্রমশঃ জাতির উৎকর্ষ ও পরিবর্ত্তন লাভ করিয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর বর্ণ প্রাপ্ত হয় এবং শ্রেষ্ঠতর বর্ণও অধর্ম্মাচরণের ফলে ক্রমশঃ হীন হইতে হীনতর বর্ণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।" *

মনু মহারাজও বলিয়াছেন,—

"(গুণ ও কর্ম্মের প্রভাবে ও জন্মের উৎকর্ষ হেতু) শূদ্রও ব্রাহ্মণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ব্রাহ্মণও শূদ্রতা প্রাপ্ত হন, এইরূপে (শূদ্রার সংসর্গে) ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য হইতে জাত সন্তানও ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য হইয়া থাকে।" †

মহাভারতের ঋষিও ঠিক এই বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন,—

"যে ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য ব্রাহ্মণধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, তিনি ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন; কিন্তু যে ব্রাহ্মণত্ব পরিত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের সেবা করে, সে ব্রাহ্মণত্ব হইতে চ্যুত হইয়া ক্ষত্রিয় যোনিতে জাত হয়। এইরূপ যে নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণ দুর্লভ ব্রাহ্মণ্য পাইয়াও লোভ মোহ বশতঃ বৈশ্যের কর্ম্ম করে সে বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হয়, এবং বৈশ্য আবার শূদ্রত্ব পাইয়া থাকে। ব্রাহ্মণও স্বধর্ম্ম চ্যুত হইয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।

---

* যযাতি রাজা শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীকে এবং অণুহ বেদব্যাসপুত্র শুকের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মহাভারত; আদিপর্ব্ব এবং হরিবংশ, হরিবংশ পর্ব্ব। দেবীভাগবত ইত্যাদি প্রায় সমস্ত পুরাণ দ্রষ্টব্য।

† "ত্রৈবর্ণিকৈস্ম বোঢ়ব্যাঃ স্যাৎ ত্রৈবর্ণিক কন্যকাঃ॥"
জিনসংহিতা। চতুর্থ পরিচ্ছেদ, বিশ্বকোষ ধৃত।

* "ধর্ম্মচর্য্যয়া জঘন্যোবর্ণঃ পূর্ব্বং পূর্ব্বং বর্ণমাপদ্যতে জাতিপরিবৃত্তৌ।
অধর্ম্ম চর্য্যয়া পূর্ব্বো বর্ণো জঘন্যং জঘন্যং বর্ণমাপদ্যতে জাতিপরিবৃত্তৌ॥ আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্র।"

† "শূদ্রো ব্রাহ্মণতা মেতি ব্রাহ্মণ শ্চৈতি শূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্ বৈশ্যাৎ তথৈব চ॥৬৫॥"
মনুসংহিতা, দশম অধ্যায়।

কিন্তু শুভকর্ম্মের আচরণ করিলে শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব এবং বৈশ্যও ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া থাকে।" ‡

এই সকল শাস্ত্র বাক্যের আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে শিক্ষা দীক্ষা এবং আচার ব্যবহারের দ্বারা সে সময়ে সভ্য মানুষের সামাজিক সম্মান নির্দ্ধারিত হইত এবং তখনকার লোককে সেই সম্মান রক্ষা করিবার জন্যও বিশেষ যত্ন করিতে হইত। অপরা এবং পরা বিদ্যায় পরম পাণ্ডিত্য লাভ এবং শম দম তপস্যাদি সম্পত্তি হেতু ব্রাহ্মণের এবং তেজঃ ও বীর্য্যের প্রাচুর্য্যের নিমিত্ত ক্ষত্রিয়ের * প্রাধান্য সভ্য সমাজে সর্ব্বাগ্রেই স্বীকৃত হইয়াছিল এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কে সেই প্রাধান্য রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইত। অতি প্রাচীনকালে অশ্বপতি কেকয়, কাশীরাজ, অজাতশত্রু, গান্ধারনিচিত্র, বৈদেহজনক এবং জৈবলি প্রবাহন প্রভৃতি নরপতিগণ ব্রহ্মবিদ্যায় যেরূপ অনেক ব্রাহ্মণকে ও অতিক্রম করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ভৃগু গোত্রীয় জমদগ্নি এবং তাঁহার পুত্র রাম, গোতম গোত্রীয় কৃপ, ভরদ্বাজ গোত্রীয় দ্রোণ এবং তাঁহার পুত্র অশ্বত্থামা অস্ত্রশস্ত্রের পাণ্ডিত্যে এবং শারীরিক পরাক্রমে বহু ক্ষত্রিয় রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। তথাচ সূর্য্যবংশীয় রামচন্দ্র, পুরুবংশীয় ভীষ্ম এবং যদুবংশীয় শ্রীকৃষ্ণ শাস্ত্রে ও শস্ত্রে সর্ব্বপ্রকারেই আদর্শ মনুষ্যত্বের দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। বৈশ্য ও শূদ্রগণ তাঁহাদের জীবিকার্জ্জনের জন্য ব্যাপৃত থাকায় শিক্ষার দিকে আদৌ মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই বলিয়া মনে হয় এবং তজ্জন্য অতি প্রাচীন যুগের ইতিহাসে দুই চারিজন বৈশ্য ও শূদ্র বংশীয় মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষির নাম পাওয়া গেলেও তাঁহারা ক্রমেই সমাজের নিম্ন হইতে নিম্নতর স্তরে অবনমিত হইয়াছিলেন। বৈশ্যবর্ণের বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডে এবং সামাজিক সংস্কারে নাম মাত্র অধিকার স্বীকৃত হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে সমাজ অথবা সভ্যতার উপর তাঁহাদের আদৌ কোন প্রভাব ছিল বলিয়া বোধ হয় না। ক্রমশঃ বহু অনার্য্য সম্প্রদায় দলে দলে আসিয়া শূদ্রগণের দল পুষ্টি করার ফলে অবশেষে শূদ্রগণ আর্য্য শ্রেণী হইতেই প্রায় পৃথক্ হইয়া পড়িলেন। প্রথম প্রথম "আর্য্য শূদ্র" এবং "অনার্য্য শূদ্রের" ভেদ সমাজ বুঝিতে পারিতেন এবং তদনুসারে প্রথম শ্রেণীর শূদ্রেরা কিয়ৎ পরিমাণে শুদ্ধ বলিয়া পরিগৃহীত হইতেন। পাণিনি সূত্র 'শূদ্রাণামনিরবসিতানাম্" † সমাজের এই অবস্থার প্রমাণ স্বরূপ বিদ্যমান্

‡ "স্থিতো ব্রাহ্মণ ধর্ম্মেণ ব্রাহ্মণ্য মুপজীবতি।
ক্ষত্রিয়ো বাহথ বৈশ্যো বা ব্রহ্মভূয়ং স গচ্ছতি॥
যস্তু ব্রহ্মত্ব মুৎসৃজ্য ক্ষাত্রং ধর্ম্মং নিষেবতে।
ব্রাহ্মণ্যাৎ সঃ পরিভ্রষ্টঃ ক্ষত্রযোনৌ প্রজায়তে॥
বৈশ্যকর্ম্ম চ যো বিপ্রো লোভ মোহ ব্যপাশ্রয়ঃ।
ব্রাহ্মণ্যং দুর্লভং প্রাপ্য করোত্যল্পমতিঃ সদা॥
স দ্বিজো বৈশ্যতামেতি বৈশ্যো বা শূদ্রতামিয়াৎ।
স্বধর্ম্মাৎ প্রচ্যুতো বিপ্রস্ততঃ শূদ্রত্বমাপ্নুতে॥
এভিস্তু কর্ম্মভির্দেবি শুভৈরাচ রিতৈস্তথা।
শূদ্রো ব্রাহ্মণতাং যাতি বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ॥"
মহাভারত, অনুশাসন পর্ব্ব, ১৪৩ অধ্যায়।

* "ত্রৈষ্টুভো বৈ রাজন্য ওজো বীর্য্যং ত্রিষ্টুবোজ সৈবৈনং তদিন্দ্রিয়েণ বীর্য্যেণ সমর্দ্ধয়তি।" ঐতরেয় ব্রাহ্মণে, (১।৫।২)।

"সত্যংদানং ক্ষমা শীল মানৃ শংস্যং তপো ঘৃণা।
দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥"
মহাভারত, বনপর্ব্ব, ১৮০ অধ্যায়।

† পাণিনি ২।৪।১০ সূত্রের মহাভাষ্য দ্রষ্টব্য। উহাতে দুই প্রকার শূদ্রের কথা আছে। এক শ্রেণীর উচ্ছিষ্ট কাংস্য পাত্র ভস্ম দিয়া মার্জ্জন করিলে বিশুদ্ধ হয় এবং তাহা দ্বিজাতির ব্যবহারে আসিতে পারে কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর ঐরূপ পাত্র আর শুদ্ধ করা চলে না, ফেলিয়া দিতে হয়।

থাকিয়া আজও সেই সময়ের ক্ষীণ স্মৃতি মনে আনিয়া দিতেছে। ফলতঃ ক্রমশঃ "চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজে" বর্ণের প্রভেদ দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে লাগিল।

ক্রমশঃ

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

ঠাকুরমা'র কথা।

(৫)

[সোয়াশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার পল্লী সমাজ]

তখন দেশে পল্লীই ছিল দেশের প্রধান জায়গা। দেশে তখনো সহর তৈয়ার হয় নাই। আমরা শুনিতাম দিল্লী, লাহোর, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা ও কলিকাতার কথা। এইত এ দেশের সহর। সহরে বাস করার লোক আমাদের ছিল না। সুতরাং পল্লীতেই দেশের ছোট বড় সকলের বাস ছিল। পল্লী সমাজ সেই ছোট বড় সকলের সমবায়ে গঠিত ছিল। প্রত্যেক জাতির বিভিন্ন সমাজ থাকিলেও অনেক স্থানেই ব্রাহ্মণগণের প্রাধান্য ছিল। প্রাধান্য করার মত যোগ্যতাও তাঁহাদের ছিল। তাঁহাদিগকে প্রায় সকলেই 'কর্ত্তা' ডাকিত। এই কর্ত্তা শব্দটা আধুনিক বাবু, রাজা, মহারাজ প্রভৃতি সারশূন্য উপাধির চেয়ে অনেক গৌরবাত্মক ছিল। প্রত্যেক গ্রামে এক একটী সমাজ ছিল এবং ২।৪।১০ খানা গ্রাম লইয়া একটা 'বাহির সমাজ' ও গঠিত হইত। গ্রাম্য সমাজের ভার এক বা দুইজনের হাতেই সাধারণতঃ ন্যস্ত থাকিত। অন্য সকলে ইহাদের সাহায্য করিয়া গ্রামের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। এখন যে "গণতন্ত্র" বা "জন সাধারণের" কথা শুনা যায়—ইহা এদেশে নূতন নহে বরং ইহাই এ দেশের প্রাচীন রীতি। গণের নিকট জিজ্ঞাসা না করিয়া, 'স্ব-গণ' না লইয়া ছোট বড় কোন কাজেই কেহ করিতে পারিত না। স্বয়ং আগড়তলার মহারাজা বাহাদুর সে দিনের 'গণ' উপেক্ষা করিয়া সমাজের বাহিরে পড়িলেন;—আজিকার গঠিত 'গণ'ও তাঁহাকে তুলিতে পারিল না। 'গণ' শক্তি তখন বড় ভয়ঙ্কর ছিল।

সমাজ ছিল তিন প্রকার। (১) খাওয়া দাওয়ার সমাজ (২) সামাজিক শাসন সংস্কারক সমাজ (৩) কার্য্যনির্ব্বাহক সমাজ।

(১) খাওয়া দাওয়ার সমাজের মধ্যে নানাবিধ কড়াকড়ি ছিল। কেহই কোন নির্দ্দিষ্ট আইন লঙ্ঘন করিলে তাহার বাড়ীতে খাওয়া দাওয়া বন্ধ হইয়া যাইত বা বিশেষ দণ্ড গ্রহণে তাহাকে অব্যাহতি দেওয়া হইত। 'ঘরে খাওয়ার' রীতি অত্যন্ত কঠোর ব্যবহার ব্যবস্থিত ছিল। 'ঘরে খাওয়া' অর্থে বাড়ীর স্ত্রীলোকের রাঁধা এবং পরিবেশন পূর্ব্বক যে খাওয়া। সকল বাড়ীতে সকলের ঘরে খাওয়া উৎরাইত না। এমন কি নিজ জ্ঞাতি গোষ্ঠির মধ্যেও ঘরে খাওয়া কখন কখন নিষিদ্ধ হইয়া পড়িত। ইহার মধ্যে যে একটা দৃঢ় পবিত্রতার ভাব ছিল, আমরা তাহা স্বীকার না করিয়া পারি না। এই 'ঘরে খাওয়া'টা জাতি ভেদের একটা গুরুতর শক্ত সংস্করণ। কতকগুলি বংশ 'সমান বংশ' বলিয়া কথিত হইত। এই পাল্‌টী ঘরে বিবাহ আদান প্রদান করিতে হইত। কোন কারণে কেহ এই পাল্‌টী ঘর পরিত্যাগ করিয়া সম্বন্ধ করিলেই তাহার স্ত্রীর পাকস্পর্শ লইয়া সমাজে কলহ হইত। এমন কি কোন কোন ব্যক্তির পত্নীর পাকস্পর্শ জীবনেই কেহ করিত না। সে ব্যক্তি 'ঘর সমাজের' বাইরে—'বাহির সমাজে' চলিতে পারিত। এইরূপ করার কারণ শুনিয়াছি,—পবিত্রতা ও মর্য্যাদা রক্ষা। যে সকল ঘরের রক্ত আমরা আমাদের সমান বলিয়া জানি, যাহাদের সত্ব, রজঃ প্রভৃতি গুণগুলি আমাদের সমান—আমরা তাহাদের রন্ধিত বা পরিবেশিত অন্ন ভোজন করিতে পারি।

যাহার রক্তের সংবাদ জানি না,—তাহার সংশ্রবে যাইব না, এই ছিল সে কালের ব্যবস্থা। সম্ভবতঃ ভালই ছিল। সেকালে একজনের পরিধেয় ধুতি, গামছা, বালিশ, বিছানা পর্য্যন্ত অন্যে ব্যবহার করিত না। সকলেরই বিশ্বাস ছিল, পরের ব্যবহৃত দ্রব্য ব্যবহারে তাহার দেহের ধর্ম্ম সংক্রামিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। এ সকল কারণে হাতে ধরিয়া পরিবেশন পর্য্যন্ত অনেক স্থলে নিষিদ্ধ ছিল। যে সকল বাড়ীতে 'ঘর খাওয়া' ছিল না,—সেই সকল বাড়ীতে ব্যাপার উৎসব উপলক্ষে ইহারা নিমন্ত্রিত হইলে নিজেরা রান্না করিয়া খাইতেন। ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ব্যতীত কাহারও বাড়ী অতিথি হইলে অতিথির রাঁধিয়া খাওয়ার রীতি ছিল। এই ব্যবস্থায় উভয় পক্ষের কেহই অপমানিত মনে করিত না। এখন সকলেই মনে করে,—"ইস্ উনি ভারী কুলীন—আমার ঘরে খাবেন না কেন? না খান অন্যত্র খান।" এই যে একটা ধারণা, ইহা আমরা পছন্দ করি না। কাহারও পক্ষেই এই কার্য্য মন্দ ছিল না। ইহাতে আভিজাত্যের কোন সম্পর্ক ছিল না। যাহারা আদতে ছোট—তাহারাই সন্দেহ করে—'আমায় বা উনি ছোট মনে করেন?'

পংক্তি ভোজনের মধ্যেও যথেষ্ট কড়াকড়ি ছিল। কে কোথায় বসিবে তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইতে হইত। ইহাতে মর্য্যাদার লক্ষণ ছিল। এ দেশের ব্রাহ্মণ সমাজ মধ্যে কেবল পাকস্পর্শের সময় এই ব্যবস্থা আছে। কিন্তু কায়স্থ সমাজে এই সম্মান রীতি এখনও আছে। আমি এই নীতির প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করি।

সে সময় আহারাদি ব্যাপারে স্বাস্থ্যের চিন্তাই বেশী ছিল। অনেকে স্বপাক খাইতেন। সকলেই সর্ব্বদা শঙ্কিত ভাবে যেন আত্মরক্ষার্থ সতর্ক থাকিতেন। খাওয়ার কথা এখন যাহা শুনি, সে সকল ব্যবস্থা সত্য হইলে ভয়ের কারণ বটে।

অনেকে অপর জাতির স্পৃষ্ট জল পর্য্যন্ত খাইত না। ব্রাহ্মণেরা আচারের একান্ত অধীন ছিলেন। সুধু ব্রাহ্মণ কেন প্রত্যেকেই আবার নিষ্ঠ ছিলেন। অনাচারীর সম্মান নষ্ট হইত। নিরামিষ আহার, মাস ব্রত, বার ব্রত প্রভৃতিও আহারের প্রতিপালিত হইত। আতপ চাউলই উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা ব্যবহার করিতেন। সিদ্ধ চাউলের ভাত নিন্দনীয় ছিল। মাটীর বাসনে বা অগত্যা পিতলের বাসনে পাক হইত। লোহার কড়াই প্রায় কেহই ব্যবহার করিত না। অন্ততঃ সামাজিক নিমন্ত্রণে নিষিদ্ধ দ্রব্য কেহ ব্যবহার করিতে সাহস করিত না। মসুরী ডাইল অনেক ব্রাহ্মণ ও উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা খাইতেন না। দেবতার নামে উৎসর্গ না করিয়া প্রায় কেহই কোন দ্রব্য ভক্ষণ করিত না। হিন্দুর দেবালয় ও মুসলমানের দরগায় বহু মানত সিন্নি যাইত।

সামাজিকগণের নিমন্ত্রণাদিরও বিভিন্ন পদ্ধতি ছিল, ক্রমে সে গুলি উঠিয়া গিয়াছে। আভিজাত্যের সহিত নিমন্ত্রণ প্রণালীর ব্যবস্থা হইত। ততটা আটা আটি প্রশংসনীয় না হইলেও এখনকার মত একেবারে সাম্যবাদ আমরা পছন্দ করি না। পত্র লিখিবার পাঠে যেমন আমরা ব্যক্তিগত সম্মান ও শিষ্টাচার বিস্মৃত হইতে পারি না, তেমনই সামাজিক ব্যাপারে ব্যক্তিগত এবং বংশগত সম্মান ছিল। তাহা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। আমাদের বারেন্দ্র সমাজেই দেখিয়াছি, কোন কোন গ্রামের লোক কোন কোন গ্রামের বা বংশের লোকের সহিত এক সভায় বসিতে বা ভোজন করিতে পারিত না। উহারা সমাজে অনেকখানি হেয় এবং অপরিচিত ছিল। তাহার কারণও ছিল। কার্য্যতায় এবং আচার ব্যবহারে উহারা এত জঘন্য ছিল যে সমাজ তাহাদের সঙ্গে কোন প্রকারে সম্বন্ধ হইতে চাহিত না। সে সকল বিধি ব্যবস্থাও উল্টিয়া গিয়াছে। রাঢ়ীয় সমাজে সেগুলি এখনো কতকটা আছে। আমার মনে হয়, একটু থাকা উচিত। প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটা আইন, একটু শাসনের ব্যবস্থা না থাকিলে উচ্ছৃঙ্খলতা আইসে। আমাদের সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবেশ করিয়াছে। আমরা প্রথম ও মধ্যবয়সে যাহা দেখিয়াছি, এখন তাহার ভয়ঙ্কর পরিবর্ত্তন দেখিতেছি। যে সকল গ্রামের নাম পর্য্যন্ত শুনি নাই, এখন শুনিতেছি ঐ ঐ গ্রামে আত্মীয়তা পর্য্যন্ত হইতেছে। সমাজ বিস্তারে এ

শুদ্ধির যথেষ্ট প্রয়োজন থাকিলেও মুড়ি মুড়কীর পার্থক্য থাকা অনাবশ্যক নহে।

সে কালে কেন, কিছুদিন আগেও পরিচারক 'ঠাকুরের' হাতে প্রায় কেহ খাইত না। গৃহদেবতার পূজার ভার ঠাকুরের উপর দেওয়া হইত না। ঠাকুরেরা কাহারও আশ্রয়ে থাকিয়া দিন কাটাইত। এখন ত ঠাকুরদের প্রভুত্ব গৃহদেবতার অনেক উপরে। আমার ত বিশ্বাস—যেরূপ দেখি শুনি ঠাকুরগুলি ধর্মঘট করিলে অনেক লোক অনাহারে মারা পড়িবে। এখন সামাজিক নিমন্ত্রণে ঠাকুরের রান্নাই প্রশস্ত। আগে ছিল সিলেটী ঠাকুর, এখন ক্রমে কটকা ও পশ্চিমা উপবীতধারীগণের আমদানী দেখিতেছি। ব্যাপার সঙ্গীন বটে। এই বিষয়ে এত সব কথা আমার মনে আসে যে সব বলা অনাবশ্যক। বহু দিন ধরিয়া আমাদের সমাজে আহারাদির কত বিধি ব্যবস্থাই দেখিলাম। কত পরিবর্ত্তনই দেখিলাম। আর একটী কথা বলিয়াই এ বিষয়টা শেষ করিব।

ব্যাপারাদি উপলক্ষে বাড়ীর বা পাড়ার বৌরা রাঁধাবাড়া করিতেন। সকলের বাড়ীর বৌ রাঁধা ঘরে যাইতে পারিতেন না। এমন সব ঘরের মেয়েরা বা বৌরা পাক করিতে যাইতেন,—যাঁহাদের ঘরে আহার করিতে নিমন্ত্রিতগণের মধ্যে কেহ আপত্তি করিতে পারিত না। পরিবেশন কালেও এই ব্যবস্থা ছিল। পাক ও পরিবেশন হইতে সময় সময় কোন কোন বৌকে বাহির করিয়া পর্য্যন্ত দেওয়া হইয়াছে। সে সকল নাম নিশান এখন উল্লেখ করা অনুচিত। কোন কোন বাড়ীর বেয়েরা ডাক সাইটে রাঁধুনী ছিলেন। জমিদার তালুকদারের বাড়ীর বৌরাও পাক করিতে বাধ্য ছিলেন। তাহাতে আনন্দ ও প্রতিষ্ঠা ছিল। ধলার বাবুদের বাড়ী, গাঙ্গাটীয়ার বাবুদের বাড়ীর মেয়েরা নাকি নিজেরাই পাক পরিবেশন করিতেন। সুসঙ্গের মহারাজগণ নিজেরাই নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণকে পরিবেশন করিয়া খাওয়াইতেন। কি সুশৃঙ্খলা পবিত্রতাই ছিল! আজিও তাহার ক্ষীণ রেখা আমাদের কোন কোন গ্রামে এবং বংশে বর্ত্তমান আছে। তোমরা সে গুলি লইয়া গৌরব করিও— উপেক্ষা করিও না। পাক পরিবেশনে বৌ ঝি মরে না— বরং বাড়ে। মরিলে এই সাড়ে চারিকুড়ি বছরের রাঁধাবাড়া পরিবেশনে আমিই বেশীবার মরিতাম। রোজ ৩০।৪০ জনের পাক পরিবেশন—সম্পূর্ণরূপে অন্যের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া আমি একাকী করিয়াছি। ভ্রূক্ষেপও করি নাই। ঘর লেপা, জল আনা, মশলা তৈরি করা, বাসন কোশন ধোয়া সবই ত নিজে করিয়াছি। তখন শূদ্র চাকর এ সকল কাজ করিতে পারিত না। কৈ—মনে ত পড়ে না যে—সে জন্য কখনো কষ্ট বোধ করিয়াছি। পুত্র বধূ, দেবর পুত্র বধূ যখন আসিয়াছে,—তখন জীবনের প্রায় বার আনা শেষ করিয়াছি।

তখন অধ্যাপকের বাড়ীতেও কোন কোন ছাত্র স্বপাক খাইত। ইহাও সামাজিকতার নিয়মে বাধ্য হইয়া। এই ব্যবস্থা শেষে অনেকটা লঘু হইয়াছিল।

(২) সামাজিক শাসন সংস্কার—সমাজ সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণের জন্য সমাজের কঠোর শাসন ছিল। কোন কোন অপরাধের বিচার নিজ গ্রামের মধ্যেই মীমাংসিত হইত। কোন কোন অপরাধে নিজ সমাজভুক্ত ৪।৫ খানা গ্রামের প্রতিনিধি লইয়া বিচার হইত। সমাজ শাসন না মানিলে নাপিত, ধোপা, গুরু, পুরোহিত পর্য্যন্ত বন্ধ করা হইত। ক্রটী স্বীকারে কোন কোন অপরাধ মার্জ্জিত হইত। কোন কোন অপরাধে প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থাও ছিল। অপরাধ বিশেষে কোন কোন ব্যক্তিকে সমাজচ্যুত পর্য্যন্ত করা হইত। কিন্তু এই সকল ব্যাপারে নিজ জ্ঞাতি গোষ্ঠীর বা গ্রামবাসী সম্মানিত ব্যক্তির মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে দেখা যাইত না। এখন ত শোনা যায়, সমাজে প্রাধান্য করার অভিপ্রায় ভিন্ন গ্রামের বা যে কোন সাধারণ ব্যক্তির সহিত স্বার্থ সংশ্রবে পড়িয়া নিজ জ্ঞাতি গোষ্ঠীর সম্মান নষ্ট করিতেও অনেকে দ্বিধা করে না। বরং আমোদ ভোগ করে। যাহাতে নিজ গ্রামের অপমান হয়, জ্ঞাতি গোষ্ঠীর কৃতপূর্ব্ব পুরুষীয় শত্রুতা উদ্ধারের জন্য কোন কোন

নীচমনাঃ সমাজপতি এখন প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহারা "রীতির" দোহাই দিয়া যে সকল অসঙ্গত কার্য্য করেন, তাহা সে কালের সমাজের রীতি ছিল না! সেকালে যে উদারতা ছিল,—এখন তাহা নাই। এখন নীচতা, স্বার্থ এবং নির্য্যাতনের স্পৃহাই দৃষ্ট হয়। এই জন্য সমাজের শাসনও উচিত মত হয় না।

(৩) কার্য্য নির্ব্বাহক সমাজ।—সমাজে কতকগুলি কাজ ছিল, যে গুলি সমাজের পাঁচজনে নির্ব্বাহ করিত। তাহাতে শক্রতা মিত্রতা, বা অন্য কোন বাধা ছিল না। গ্রামের বা বংশের কাহারো মৃত্যু হইলে সকলেই সেখানে গিয়া উপস্থিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। কোন প্রাচীনতম ব্যক্তির মৃত্যুতে কেহই সামাজিক 'আঁখুটী' করিত না। * এখন করে—উদারতার ক্রটী। অধ্যাপকের মৃত্যুতে ছাত্রগণ সমাজ বিচারের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিত না। সমাজের প্রয়োজন স্থলে পুরুষ রাঁধা বাড়ার কার্য্য ভার গ্রহণেও কোনরূপ দ্বেষ কেহ করিত না। তীর্থ যাত্রায়ও এরূপ সহানুভূতি দেখা যাইত। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, শূদ্র প্রভৃতি এ সকল কার্য্যে সমান ভাবে অধিকারী ছিলেন। কোন সময় কেহ সামাজিক ব্যাপারে সহসা বিপন্ন হইয়া পড়িলে, অনেকেই তাহা হইতে বিপন্নকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইতেন। মুহুরদিয়ার রায় ও বনগ্রামের চৌধুরীগণের এ সম্বন্ধে বহু সুখ্যাতি আমি শুনিয়াছি। সে সকল বৃত্তান্ত বিস্তৃত ভাবে বলিলে হয় ত কেহ বিরক্তও হইতে পারেন। আমাদের আটচালাতেই এ সকল কথার আলোচনা অহরহ হইত। নিন্দা ও প্রশংসার সমালোচনা এত বেশী আমরা শুনিতাম যে তাহা মুখস্থ হইয়া গিয়াছে। শ্রীহট্টের ভট্টেরাও যে সকল সুনাম দুর্নামের ছড়া আওড়াইত,—তাহাতেও অনেক ব্যক্তির পরিচয় পাইতাম। সেগুলি উল্লেখ করা অনুচিত।

কোন ব্যক্তি অনাথ পরিবার রাখিয়া মারা গেলে পল্লী সমাজ তাহার শ্রাদ্ধ শান্তি ও পরিবারবর্গের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা পর্য্যন্ত করিত। অনেকের ঋণ সকলে মিলিয়া আদায় করিয়া দিত। দীনহীন ব্যক্তিও উপবাসে মারা পড়িত না। তাহার ব্যবস্থা হইত।

দুশ্চরিত্রের কঠোর শাসনের ব্যবস্থা ছিল। মাথা মুড়াইয়া, পংক্তি ভোজন হইতে উঠাইয়া দিয়া শাসন করা হইত। ভ্রষ্টাচারিণী স্ত্রীলোককে নৈহাটী, কাশী বা কলিকাতায় নিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত। শুধু সমাজের পবিত্রতা রক্ষার জন্য, বাপ দাদার নাম অকলঙ্কিত রাখার উদ্দেশ্যে। শুনিয়াছি,এই শ্রেণীর একটী স্ত্রীলোকের পায়ে ছালা ভরা মাটী বাঁধিয়া ভরা ব্রহ্মপুত্রে ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছিল!

সে কালে কেবল আত্মরক্ষা করিয়া নিজ উন্নতি বিধানই সকলের লক্ষ্য ছিল। যেন পাকা ধান ক্ষেতটিকে সর্ব্ববিধ অনিষ্টের হাত হইতে রক্ষা করার জন্য সজাগ গৃহস্থ সতর্কতার সহিত দিন রাত্রি খাড়া পাহারায় নিযুক্ত। উঠিতে বসিতে চলিতে খাইতে শুইতে কেবলই একটা ব্যবস্থা মানিয়া চলিতে হইত। কেহ কেহ বলেন—এটা বড় অন্যায়! অত কি মানিয়া চলা যায়? কিন্তু স্বেচ্ছা চারিতার স্রোতে গা ঢালিয়া চলিতেও কাহাকেও আপশোষ করিতে শুনি না। একটা কথা বলিলে বোধ হয় কেহ বিরক্ত হইবেন না। কথাটা এই—এই যে সে কালের লোকগুলি ছিল ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি—যাঁহারা অশনে বসনে বিশেষ নিয়ম পালন করিতেন, যাঁহারা ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃস্নান করিতেন, ফুল বেলপাতা, তুলসী, দূর্ব্বা সংগ্রহ করিতেন তাঁহারা সকলেই পাগল ছিলেন না। এবং আমি দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করি কি শারীরিক সামর্থ্য কি মানসিক বলে, কি বিদ্যায়, কি বুদ্ধিতে তাঁহারা এখনকার প্রধানতম ব্যক্তির অপেক্ষা কোন অংশেই হেয় ছিলেন না। বরং সর্ব্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তৌলে ওজন করার স্পৃহা যাঁহার আছে, তিনি নিজের পিতা পিতামহের গুণবত্তা স্মরণ করিবেন। এ সকল প্রমাণের জন্য দূরে যাওয়ার প্রয়োজন নাই।

সে কালের পল্লী সমাজে একদিকে উদারতা প্রচুর ছিল; অপরদিকে সঙ্কীর্ণতারও অবধি ছিল না। কে কাহাকে কোন্

* "মায়ের আঁচল ধরি, কহে কি আঁখুটী করি"।
—প্রঃ সম্পাদক।

কায়দায় চাপা দিয়া রাখিবে, কোন রকমে আপন বাধ্য রাখিবে, তাহার জন্ত মাথা ঘামাইতে ক্রটী করিত না। অন্যের অত্যাবশ্যক জমি গোপনে ক্রয় করিয়া তাহার অসুবিধা ঘটান প্রভৃতি শ্রেণীর কার্য্য করার লোক তখন একেবারে ছিল না, এ কথা বলা যায় না। তবে এ সকল মার পাঁচ খেলিবার কুবুদ্ধি কদাচিৎ দেখা যাইত। যাহারা এ সকল কূটনীতির আশ্রয় লইত তাহাদের উপাধি ছিল "কায়েত"। সে নিন্দনীয় হইত।

সে কালে পল্লীতে অবিশ্বাসের বিষ প্রবেশ করে নাই। টাকা কর্জ্জ দেওয়া নেওয়া অনেক সময় খুব গোপনে হইত। আমার টাকা আছে, একথা গোপন রাখা তখন নানা কারণে আবশ্যক হইত। টাকা কর্জ্জ আনিয়া, শোধ করার জন্য খাতক আপ্রাণ চেষ্টা করিত। কারণ ঋণ শোধ না করিয়া মরিলে সাত পুরুষ নরকে যাওয়ার ভয় ছিল। কদাচিৎ লেখা পড়া হইত। তোমার মামা ১২৮৬ কি ৮৫ সনে কালু ভট্টাচার্য্যের নিকট হইতে একদিন ২৫৲ টাকা কর্জ্জ করে, দলিল লিখিয়া দিয়া। সে দিন আমাদের উপর এক আকস্মিক বিপদ্‌পাত হইয়াছিল। দুর্গার ইচ্ছায় সেই দিনই টাকা আদায় করা হয়। এর পূর্ব্বে দলিলের কড়াকাড়ি প্রতিবেশীর মধ্যে বড় শুনি নাই। জমি জিরাত বেচাকেনা পর্য্যন্ত [illegible] হইত। আমরা প্রথম বয়সে গ্রামের জমির যে মূল্য বা খাজানা দেখিয়াছি, তাহা শুনিলে হয়ত তোমরা বিশ্বাস করিবে না। চাষীরা হালচাষ করিতে নিজ জমিতে যাইতেছে; লাঙ্গল জোয়াল বলদের ঘাড়ে যোতা আছে, যদি দৈবাৎ কোন পতিত ভূমিতে তাহার লাঙ্গলের 'রেখা' পড়ে, তবে ঐ জমি তাহার জোত হইবেই হইবে। কেন সে ঐ জমির উপর দিয়া এমন অসাবধানে গেল। স্বয়ং পৃথিবী তাহার লাঙ্গল টানিতেছেন, অতএব সে বিনা নজরে, দুই চারিআনা খাজানায় জমি চাষ করিবেই। দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, চেরাগী প্রভৃতি দান আমরাই কত দেখিয়াছি। মাতা পিতার শ্রাদ্ধে, আমাদের উৎকৃষ্ট জমিখণ্ড পুরোহিতকে দান করার ব্যবস্থা হইত।

আমরা প্রথম ও মধ্যবয়সে চৌড়া লালপেড়ে মোটা সাড়ী পরিতাম। এখন বৌ ঝিরা যেমন আঁটা সাঁটা করিয়া বাহার দেখাইতে কাপড় পরেন, সে সময় এ রকম ছিল বড় নিন্দার বিষয়। আমরা আড়াই প্যাঁচে কাপড় পরিতাম। কোমরের বাঁ দিকে কতকটা কাপড় ঝুলিয়া রহিত, এখন যাহা নিতম্ব বেষ্টনে ব্যয়িত হয়। ঘোমটা প্রায় বক্ষদেশ স্পর্শ করিত। হাতে ছিল "কলসের কান্দা শাঁখা"। শাঁখা পরিতে প্রাণান্ত, ধরিতে প্রাণান্ত, খুলিতে প্রাণান্ত। সেই শাঁখার নীচে অনেক স্থূলকায়া অভাগীর ঘা হইত, গহনার মধ্যে নথ, বিল্বপত্র বাজু আর বাতেনা, গুজরী যথেষ্ট। সোণার বালা বড় লোকের জন্য।

বৌ ঝিদের লেখা পড়া শিক্ষা দুর্ভাগ্যের কারণ মনে করা হইত। কদাচিৎ কেহ 'পণ্ডিত বৌ' থাকিলে সে চোরের মত থাকিত। শিশু বোধক আর হরিনাথের বিজয় বসন্ত—এই রকম দুই একখানা ছাপার বইর নাম আমরা প্রায় শেষ বয়সে শুনিয়াছি। আগে ত হাতের লেখা রামায়ণ, মহাভারত, পদ্মাপুরাণই পাঠ হইত। হাতের লেখা বই বৌ'রা পড়িতে পারিত না। সে নাকি ভারী শক্ত বিদ্যা। গিন্নিদের নাম ডাক সব ছিল "চুলার ভিতর"। আর কতকটা ছিল আভিজাত্যের উপর। শাণ্ডিল, কাশ্যপ, গণিত, বাগচী এই চারিঘর তখন পূর্ব্ব ময়মনসিংহের শ্রোত্রীয় বারেন্দ্র সমাজের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন। ঐ সকল ঘরের মেয়েরা ক্রমে অন্য বংশে বিবাহিতা হইলে তাঁহাদের সঙ্গে স্বামীকুল উন্নত হইয়া উঠিত। এই মেয়েরা তখন স্বর্গের দেববালার অভিমান লইয়া আসিত। ....যাক্ সে সকল কথা এখন প্রীতিপ্রদ হইবে না।

তখন মেয়ের মূল্য ছিল। এখন যেমন মেয়ে হইলে বাপ মা আত্মীয় স্বগণে দুশ্চিন্তার শেষ থাকে না,—তখন মেয়ে হইলে একদল লোকের আনন্দ আর ধরিত না। এক একটা মেয়ে হাজার হাজার টাকায় বিবাহ হইয়া যাইত। আজকাল যাহারা সমাজে খাড়া হইতে চাহে,—তাহাদের অনেকের মা, পিতামহীকে 'কুকুল' হইতে বহু অর্থের বিনিময়ে আনা হইয়াছিল। এ সকল বিষয় বলা বড় ভাল নয়। সুতরাং চুপ করাই ভাল।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
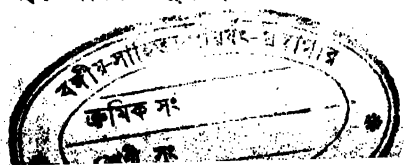
১০ম বর্ষ কার্ত্তিক ১৩২৭ ৭ম সংখ্যা

বঙ্গদর্শন।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

বঙ্গদর্শন বাঙ্গালাসাহিত্যের সেবাব্রত গ্রহণ করিয়া উহার যে পরিপুষ্টি ও প্রসাধন করিয়াছিল পূর্ব্বপ্রবন্ধে আমরা উহা যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট ভাবে নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে উহা বঙ্গীয় সমাজের কিরূপ সেবা করিয়াছিল তাহাই আলোচনা করিব। অবশ্য একটা কথা সহজেই সকলের বোধগম্য হইতে পারে। সৎসাহিত্যের সেবামাত্রই পরোক্ষভাবে সমাজের সেবাও বটে, কেন না সৎসাহিত্যপাঠে যেমন বুদ্ধিবৃত্তির সূক্ষ্মতা ও ব্যাপকতা সাধিত হয়, তেমনই সহৃদয়তারও বৃদ্ধি হয়। বস্তুতঃ সাহিত্যচর্চ্চাদ্বারাই মনুষ্যজীবনের সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি ঘটে। সেই জন্যই কবি ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন, "সাহিত্যসঙ্গীতকলাবিহীনঃ সাক্ষাৎ পশুঃ পুচ্ছবিষাণহীনঃ।" এই পরিচ্ছেদে আমরা ঐরূপ পরোক্ষ সমাজসেবার কথা বলিব না, আবশ্যক হইলে অন্যপ্রসঙ্গে তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইবে। বঙ্গদর্শন বঙ্গীয় সমাজের ক্রমাভিব্যক্তির যে দশায় উহার সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছিল, তখন কেবল পূর্ব্বোক্তরূপ গৌণভাবে সমাজসেবায় সন্তুষ্ট না থাকিয়া তাহাকে বঙ্গীয় সমাজের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ আদর্শ সম্বন্ধে নানা কথাই আলোচনা করিতে হইয়াছে। এই আলোচনাগুলিই অদ্যকার প্রবন্ধে আলোচ্য।

বঙ্গদর্শনের সমাজসেবার প্রকৃতি নির্দ্দেশ করিতে আমরা প্রধানতঃ বঙ্গদর্শন সম্পাদকের তদানীন্তন রচনাগুলিই প্রমাণরূপে উল্লেখ করিব। সাধারণ পাঠকের চক্ষে বঙ্গদর্শন অপেক্ষা বঙ্গদর্শন-সম্পাদকের আদর অধিক—যোগ্যরূপেই অধিক। ইহা ছাড়া প্রথম পর্য্যায়ের বঙ্গদর্শনে সম্পাদকই যে প্রায় সব ছিলেন,

দ্বিতীয় পর্য্যায়ের সূচনায় বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। বস্তুতঃ সম্পাদককে বাদ দিয়া বঙ্গদর্শনের যাহা কিছু থাকে তাহার মূল্য বড় অধিক নয়, তাহা প্রায় সর্ব্বাংশে বঙ্কিমের নিজ ভাবেরই প্রতিধ্বনি।

বঙ্কিমের জন্মকালে বাঙ্গালার সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা কিঞ্চিৎ বিস্তৃত ভাবেই স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি *। তাহাতে আমরা দেখিয়াছি, পাশ্চাত্য শিক্ষা বঙ্গীয় সমাজে একটা ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিল। ঐ বিপ্লবটা প্রধানতঃ তদানীন্তন ইংরাজীশিক্ষিত সমাজে আত্মপ্রকাশ করিলেও উহার প্রভাব সমাজের নিম্নতম স্তর পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। ঝড়ে নদী ও তড়াগের জলের উপরিভাগ যেমন আলোড়িত করে, নীচের জলকে তেমন আলোড়িত করে না; কিন্তু উপরিভাগের জল পুনঃ পুনঃ তটে অভিহত হইয়া কর্দ্দমাক্ত হইলে সে কর্দ্দম নীচের জল পঙ্কিল না করিয়া ছাড়ে না। বাঙ্গালা সমাজেরও সেই দশা ঘটিয়াছিল। তাই তখন সমগ্র বঙ্গসমাজই বিপ্লবগ্রস্ত বলিলে কোনও অত্যুক্তি হয় না। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল ঝড়টা যখন বাঙ্গালার ধীর-নীরব জীবন-প্রবাহকে প্রহত করে তখন ঐ প্রবাহ ভাটার অতি ক্ষীণ অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। সেই জন্য উহা এদেশে বাধাপ্রাপ্ত ত হয়ই নাই, পরন্তু অনেকে কিছুমাত্র বিচার-বিবেচনা না করিয়াই সমাজের নানা অন্তর্নিহিত শক্তির প্রভাবে উহাকে সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছিল। এই দেশ যদি পৃথিবী হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ একটা ভুবনবিশেষ হইত, তাহা হইলে হয়ত উহা পৃথিবীর অন্যান্য খণ্ড হইতে স্বতন্ত্রভাবে নিজের চিন্তা, সভ্যতা, শিক্ষা, সংস্কার লইয়া তৃপ্ত থাকিতে পারিত, হয়ত ঐ ভাবেই নিজের উত্তরোত্তর উন্নতিরও একটা না একটা ব্যবস্থা করিতে পারিত। কিন্তু এই দেশ ত জগৎ ছাড়া নহে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতের বাহিরে অর্থাৎ পাশ্চাত্য দেশসমূহে যে উন্নতির বন্যা বহিতেছিল উহারই কয়েকটি তরঙ্গ ইংরেজের রাজনৈতিক শক্তি-রূপ অনুকূল পবনে উত্তালতর হইয়া এ দেশীয় সমাজের জীর্ণতট পুনঃ পুনঃ প্রহত করিতে আরম্ভ করে। সে অবস্থায় উহা একেবারে উপেক্ষা করিয়া চলা সম্ভব ছিল না। অথচ মনে রাখিতে হইবে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় সভ্যতার আদর্শ এ দেশের চিরপোষিত অনেক সংস্কারের, এমন কি প্রাচ্য সভ্যতার মূলীভূত অনেক ভাবেরই বিরোধী ছিল। শুক্তির ভিতর যখন হঠাৎ দুই চারিটা বালুকণা ঢুকিয়া পড়ে, তখন শুক্তি প্রথমে তাহাকে নিজ দেহ হইতে বাহির করিয়া দিবারই চেষ্টা করে; যখন তাহা অসম্ভব দেখে, তখন তাদৃশ নিষ্ফল প্রয়াস হইতে বিরত হইয়া নিজ দেহনিঃসৃত রস দ্বারা তাহাকে মুক্তায় পরিণত করে। দেশীয় সমাজ যখন দেখিল যে পাশ্চাত্য সভ্যতা বর্জ্জন বা উপেক্ষা করিয়া চলা একবারেই অসম্ভব, তখন সে ধীরে ধীরে স্বীয় আদর্শের সহিত উহার সমন্বয় সাধনের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিল। বলা বাহুল্য ব্যাপারটি বড় সুসাধ্য ছিল না। ক্ষুদ্রতম পুষ্পটি প্রসব করিতেও প্রকৃতি-মাতার প্রসব-যন্ত্রণা কম হয় না। বহু যন্ত্রণাভোগের পর সমাজমাতৃকা একে একে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাবের মধ্যে সমন্বয়সাধনক্ষম কয়েকটি পুত্র প্রসব করিলেন। রামমোহন রায় বল, দেবেন্দ্রনাথ বল, বিদ্যাসাগর বল, ভূদেব বল, কেশব বল, বা বঙ্কিম বল, সমাজের দিক্ হইতে দেখিতে গেলে ইঁহাদের জীবন ও কার্য্যের সফলতা পরিমাপণ করিবার একমাত্র মানদণ্ড এই—ইঁহাদের মধ্যে কে কি পরিমাণে পূর্ব্বোক্তরূপ সামঞ্জস্য বা সমন্বয় সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

* এই প্রবন্ধ গতবৎসরের "প্রতিভা" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

এক হিসাবে তত্ত্ববোধিনী ও বঙ্গদর্শন-প্রভৃতির প্রকাশই—এই সমন্বয় সাধনের একটা বিরাট আয়োজন। যখন বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হয় তখন সামাজিক বিপ্লবের উৎকট ভাবটা কিছু মন্দ হইয়া আসিয়াছে; কিন্তু একেবারে যায় নাই। তৎপূর্ব্বেই ইংরাজী বাঙ্গালা নানাবিধ উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর বিদ্যালয় দেশের বহুস্থানে সংস্থাপিত হওয়ায় জাতিবর্ণ—নির্ব্বিশেষে সমাজের নানাস্তরে কিয়ৎপরিমাণে জ্ঞানের বিস্তার সাধিত হইয়াছিল, এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে গোঁড়া হিন্দু সমাজেও রুচির পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল। অন্যদিকে যদিও ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহী নব্যযুবকদল উপবীত ও উপবীতধারী আচার্য্যগণকে যুগপৎ বর্জ্জন করিবার উৎসাহে ও অন্যান্য কয়েকটি কারণে "আদি সমাজ" হইতে পৃথক্ হইয়া "ভারতবর্ষীয়" সমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং নূতন মুখপাত্র ও মুখপত্র অবলম্বন করিয়া হিন্দুসমাজকে ও হিন্দু সমাজের সহিত অপেক্ষাকৃত অধিক সহানুভূতি সম্পন্ন আদি ব্রাহ্মগণকে বেশ মিঠা কড়া—যত মিঠা নয় তত কড়া—উক্তি শুনাইয়া দিতেছিলেন, এবং যদিও তাঁহাদেরই কেহ কেহ হিন্দুধর্ম্ম অপেক্ষা খৃষ্টীয় ধর্ম্মে উন্নততর আদর্শ এবং অধিকতর সান্ত্বনার স্থল লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তথাপি ইহাও স্মরণ যোগ্য যে, তাঁহারাও খৃষ্ট প্রচারিত নীতির অনুরাগী হইয়াও খৃষ্টানি ষোল আনা গ্রহণ করেন নাই। সমাজের নবজাগরিত আত্মাদরের ফলে তাঁহারা সর্ব্বাংশে অন্ধভাবে পরানুকরণের পক্ষপাতী ছিলেন না। সমাজের আত্মাদর কেমন প্রবলভাবে বাড়িয়া যাইতেছিল তাহার প্রমাণ-স্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, যেমন একদিকে বহু লোক ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিতেছিলেন, কেহ কেহ বা খৃষ্টানও হইতেছিলেন তেমনই অন্যদিকে দেশের সর্ব্বত্র বহু হিন্দুধর্ম্মসংরক্ষিণী সভাও স্থাপিত হইতেছিল। যদিও এই গুলিতে স্বধর্ম্মরক্ষার নামে অনেক কুসংস্কার ও কুআচারের অনুচিত প্রশংসাও চলিতেছিল, তথাপি প্রতিক্রিয়া হিসাবে ইহা দূষণীয় বলিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। তর্কস্থলে এক-পক্ষপাতিতা দোষাবহ নহে—গোঁড়া হিন্দুর পক্ষেও নহে, হিন্দুদ্বেষীর পক্ষেও নহে।* তবে তর্কের জন্য কোনও সমাজের অনুচিতনিন্দা কখনও সমর্থনযোগ্য নহে। এই সময়ে কোনও পক্ষই যে সে দোষ হইতে মুক্ত ছিলেন, তাহা নহে। বস্তুতঃ "সংস্কারক"-গণের অযথা নিন্দা বা অত্যুক্তির ফলেই হিন্দুসমাজের আত্মাদর অধিক জাগিয়াছিল। কিন্তু এই আত্মাদরেরও বিশেষত্ব ছিল। শিক্ষিতসমাজে ইহা ধীর সংস্কারের একেবারে বিরোধী ছিল না। বিদ্যাসাগরের প্রবর্ত্তিত বিধবাবিবাহের আন্দোলন ইহার উদাহরণ। সকল হিন্দুই ইহার বিরোধী ছিল না। অনেকেরই মনোভাব এইরূপ ছিল,—'ইহা যদি শাস্ত্রসম্মত হয়, তবে চলিতে বাধা নাই। আরও একটি উদাহরণ উল্লেখযোগ্য। বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হইবার সমকালে বা অল্পপূর্ব্বে শ্রদ্ধাস্পদ রাজনারায়ণ বসু হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতাবিষয়ক এক বক্তৃতা করেন। রাজনারায়ণ বাবু ব্রাহ্ম হইলেও এক গোঁড়া হিন্দুসভা তাঁহাকে "কলির ব্যাস" আখ্যা দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, আর বহু দিন ধরিয়া নব্য

---

* জন ষ্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন,—No sober judge of human affairs will feel bound to be indignant because those who force on our notice truths which we should other wise have overlooked, overlook some of those which we see. Rather he will think that so long as popular truth is one-sided it is more desirable than otherwise that unpopular truth should have one-sided asserters too. *Liberty*, Chap. II.

ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কটূক্তি বর্ষণ করিয়াছিলেন। রাজনারায়ণ বাবুর বক্তৃতা অবশ্যই কুসংস্কার বা গোঁড়ামির সমর্থক ছিল না; কিন্তু যে ভাবে প্রায় সকল শ্রেণীর হিন্দুগণ এবং অপেক্ষাকৃত ধীরপ্রকৃতি ব্রাহ্মগণ ঐ বক্তৃতার প্রতি আদর প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে বুঝা যায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্যভাবের সমন্বয় জন্য দেশটা বিশেষ ভাবেই আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই আগ্রহকে অবলম্বন করিয়াই বঙ্গদর্শনের সমাজশিক্ষা-প্রয়াস উজ্জ্বল ও সফল হইয়া উঠিয়াছিল।

অবশ্য সামাজিক সমস্যা নানাবিধ; তাহার কতকগুলি কোনও না কোনও আকারে চিরন্তন, আর কতকগুলি দেশীয় সমাজ পাশ্চাত্য সভ্যতার ও চিন্তার সংস্পর্শে আসায় অপেক্ষাকৃত নূতনতর আকারে আবির্ভূত হইয়াছিল। সমস্ত সমাজটা যখন নৈমিত্তিকপ্রলয়গ্রস্ত তখন চিরন্তন সমস্যাগুলিও কিছু উৎকট আকারে আত্মপ্রকাশ করিবে ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। সাধারণশিক্ষা, উচ্চশিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, সমাজে স্ত্রীগণের অধিকার, বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ, জাতিভেদ, ধর্ম্মসংস্কার, শাস্ত্রানুগত্য, স্বাধীনচিন্তা ও স্বাধীন আচরণ, শিল্প, রাজনীতি—সকলই তখন শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রের আলোচ্য হইয়াছিল এবং সকল দিকেই আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক বলিয়া এক শ্রেণীর লোক সময়ে অসময়ে তারস্বরে ঘোষণা করিতেছিল। বঙ্গদর্শন কোনও পক্ষ অবলম্বন না করিয়া শিক্ষিত সমাজের মুখপত্ররূপে উহাদের কতকগুলি সমস্যা সমাধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। "এই পত্র আমরা কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের হস্তে এই কামনায় সমর্পণ করিলাম যে, তাঁহারা ইহাকে আপনাদের বার্ত্তাবহ স্বরূপ ব্যবহার করুন। বাঙ্গালী সমাজে ইহা তাঁহাদিগের বিদ্যা, কল্পনা, লিপি কৌশল, এবং চিত্তোৎকর্ষের পরিচয় দিক্। তাঁহাদিগের উক্তি বহন করিয়া ইহা বঙ্গমধ্যে জ্ঞানের প্রচার করুক। ... এই পত্র কোনও বিশেষ পক্ষের সমর্থন জন্য বা কোন সম্প্রদায়বিশেষের মঙ্গলসাধনার্থ সৃষ্ট হয় নাই। ...যাহাতে এই পত্র সর্ব্বজনপাঠ্য হয় তাহা আমাদিগের বিশেষ উদ্দেশ্য। যাহাতে সাধারণের উন্নতি নাই, তাহাতে কাহারও উন্নতি সিদ্ধ হইতে পারে না।"

রাজনীতি ও ধর্ম্মসম্বন্ধিনী সমস্যাগুলির বিষয় পরে সুবিধা হইলে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিব। ধর্ম্ম ও রাজনীতি ছাড়া বঙ্গদর্শনের যুগে বঙ্গীয় সমাজের ভাবিবার যোগ্য অন্যতর বৃহৎ সমস্যা ছিল—বাঙ্গালী উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া অশনবসনে এবং আদবকায়দায় কি বাঙ্গালীই থাকিবে, না যতদূর সম্ভব সাহেব সাজিবার চেষ্টা করিবে? দুই পক্ষেই গোঁড়ার সংখ্যা প্রচুর ছিল। বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি সেকালের বাঙ্গালীর অবহেলার কথা সর্ব্বজনবিদিত। বাঙ্গালা বহি পড়া দূরে থাকুক, শিক্ষিত ব্যক্তিগণ অনেকে বাঙ্গালায় কথা বলা পর্য্যন্ত নিজের বিদ্যা ও রুচির অবমাননাজনক মনে করিতেন। বঙ্গদর্শনের "পত্র সূচনা" প্রবন্ধেই বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, "এখন নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও কাজই বাঙ্গালায় হয় না। বিদ্যালোচনা ইংরেজিতে, সাধারণের কার্য্য, মিটিং, লেক্চার, এসে, প্রসিডিংস্ সমুদয় কার্য্য ইংরেজিতে। যদি উভয় পক্ষ ইংরেজি জানেন, তবে কথোপকথনও ইংরেজিতেই হয়, কখন ষোল আনা, কখন বার আনা ইংরেজি।......পত্র লেখা কখনই বাঙ্গালায় হয় না। আমরা কখন দেখি নাই যে যেখানে উভয়পক্ষ ইংরেজির কিছু জানেন, সেখানে বাঙ্গালায় পত্র লেখা হইয়াছে। আমাদিগের এমনও ভরসা আছে যে, অগৌণে দুর্গোৎসবের মন্ত্রাদি ইংরেজিতে পঠিত হইবে।" এই দোষ আধুনিক কালে পূর্ব্বাপেক্ষা কম হইলেও, একেবারে যায় নাই। অথচ ইংরেজী ভাষায় যাঁহার কিছু জ্ঞান আছে, তিনিই জানেন, অধিকাংশ বাঙ্গালী ইংরেজী লিখিতে বা বলিতে গিয়া ঐ ভাষার কিরূপ বিড়ম্বনা করে। এদিকে মাতৃভাষার চর্চ্চার অভাবে বা উহার প্রতি অবহেলায়

প্রভাবে, তাহারা ঐ ভাষাও শুদ্ধরূপে লিখিতে ও বলিতে পারে না। এই ভাষাসমস্যা সম্বন্ধে বঙ্কিম কি সমাধান করিয়াছিলেন ?

"আমরা ইংরেজি বা ইংরেজের দ্বেষক নহি। ইহা বলিতে পারি যে, ইংরেজ হইতে এ দেশের লোকের যত উপকার হইয়াছে, ইংরেজিশিক্ষাই তাহার মধ্যে প্রধান। অনন্তরত্নপ্রসূতি ইংরেজি ভাষার যতই অনুশীলন হয়, ততই ভাল। আরও বলি সমাজের মঙ্গলের জন্য কতকগুলি সামাজিক কার্য্য রাজপুরুষদিগের ভাষাতেই সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। আমাদিগের এমন অনেকগুলি কথা আছে, যাহা রাজপুরুষদিগকে বুঝাইতে হইবে। সে সকল কথা ইংরেজিতেই বক্তব্য। এমত অনেক কথা আছে যে তাহা কেবল বাঙ্গালীর জন্য নহে, সমস্ত ভারতবর্ষ তাহার শ্রোতা হওয়া উচিত, সে সকল কথা ইংরেজিতে না বলিলে সমগ্র ভারতবর্ষ বুঝিবে কেন ? ভারতবর্ষীয় নানাজাতি একমত একপরামর্শী একোদ্যোগী, না হইলে ভারতবর্ষের উন্নতি নাই। একমতত্ব, একপরামর্শিত্ব, একোদ্যম, কেবল ইংরেজির দ্বারা সাধনীয় ; কেন না সংস্কৃত এখন লুপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালী, মহারাষ্ট্রী, তৈলঙ্গী, পাঞ্জাবী—ইহাদিগের সাধারণ মিলনভূমি ইংরেজি ভাষা। এই রজ্জুতে ভারতীয় ঐক্যের গ্রন্থি বাঁধাইতে হইবে।* অতএব যতদূর ইংরেজি চলা আবশ্যক, ততদূর চলুক, কিন্তু একেবারে ইংরেজ হইয়া বসিলে চলিবে না। বাঙ্গালী কখনও ইংরেজ হইতে পারিবে না। বাঙ্গালী অপেক্ষা ইংরেজ অনেকগুণে গুণবান্ এবং অনেক সুখে সুখী। যদি এই তিন কোটি বাঙ্গালী হঠাৎ তিন কোটি ইংরেজ হইতে পারিত, তবে সে মন্দ ছিল না। কিন্তু তাহার কোন সম্ভাবনা নাই।† আমরা যত ইংরেজি পড়ি, যত ইংরেজি কহি বা যত ইংরেজি লিখি না কেন, ইংরেজি কেবল আমাদিগের মৃতসিংহের চর্ম্ম-স্বরূপ হইবে মাত্র। ডাক ডাকিবার সময় ধরা পড়িব। পাঁচ সাত হাজার নকল ইংরেজ ভিন্ন তিন কোটি সাহেব কখনই হইয়া উঠিবে না। গিল্টি পিতল অপেক্ষা খাঁটি রূপা ভাল। প্রস্তরময়ী সুন্দরী মূর্ত্তি অপেক্ষা কুৎসিতা বন্যনারী জীবন যাত্রার সুসহায়। নকল ইংরাজ অপেক্ষা খাঁটি বাঙ্গালী স্পৃহণীয়। যতদিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা ভাষায় আপন আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন, ততদিন বাঙ্গালীর উন্নতির কোনও সম্ভাবনা নাই।

হঠাৎ তিন কোটি বাঙ্গালী তিন কোটি ইংরেজে পরিণত হইতে পারিলেই যে বাঙ্গালীর পক্ষে সেটা একটা পরম গতি হইল তাহা বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থই মনে করিতেন কি না বলা যায় না। বিশ্বসভ্যতায়, কেবল ইংরেজেরই

* বঙ্কিমচন্দ্রের এই মতগুলি কংগ্রেস স্থাপিত হওয়ার পূর্ব্বে প্রকাশিত হয়। কংগ্রেস তাহার মতগুলি সফল করিয়াছে। এখন কিন্তু রাজনৈতিক সভা সমিতিতেও প্রত্যেক প্রদেশেই স্থানীয় মাতৃভাষার ক্রমশঃ প্রসার হইতেছে। কেন না এখনকার আন্দোলন আর পূর্ব্বের মত বহির্ম্মুখ নহে—উহা একমাত্র বিদেশীয় রাজপুরুষগণের অবগতির জন্য করা হয় না। এখন উহা অনেকটা অন্তর্ম্মুখ ; স্বদেশীয় জনগণকে শিক্ষাদানই ক্রমশঃ উহার উদ্দেশ্য হইয়া উঠিতেছে।

† তৃতীয়বর্ষের বঙ্গদর্শনে "প্রাচীনা ও নবীনা" প্রবন্ধে বঙ্কিম লিখিয়াছিলেন, "আমাদিগের সমাজসংস্কারকেরা নূতন কীর্ত্তিস্থাপনে যাদৃশ ব্যগ্র, সমাজের গতি পর্য্যবেক্ষণে তাদৃশ মনোযোগী নহেন। 'এই হইলে ভাল হয়, অতএব এই কর' ইহাই তাহাদিগের উক্তি, কি করিতে কি হইতেছে তাহা কেহ দেখেন না।......দিন কত ধুম পড়িল, স্ত্রীলোকদিগের অবস্থার সংস্কার কর......পাঁচী, রামী, মাধীকে বিলাতী মেম করিয়া তুল। ইহা করিতে পারিলে যে ভাল, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই ; কিন্তু পাঁচী যদি কখন বিলাতী মেম হইতে পারে, তবে আমাদিগের শাল তরুও একদিন ওকবৃক্ষে পরিণত হইবে, এমন ভরসা করা যাইতে পারে।

স্থান আছে, বাঙ্গালীর কোনও স্থান নাই ইহা মনে করা অযৌক্তিক। সামাজিক উন্নতিবিধানসম্পর্কেও যে ইংরেজ শেষ কথা বলিয়াছে বা শেষ কার্য্য করিয়া ফেলিয়াছে তাহাও নহে। এ কথাগুলি আধুনিক কালে আমরা ক্রমশঃ অধিক স্পষ্টরূপ বুঝিতে পারিতেছি। বঙ্কিমের সময়ে ঐ সত্য ততদূর স্পষ্ট উপলব্ধ হয় নাই। তাই উপরিলিখিত কথাগুলিতে বাঙ্গালীকে বাঙ্গালা লিখিবার বলিবার আবশ্যকতা বুঝাইতে গিয়া বঙ্কিমকে অন্যরূপ যুক্তির অবতারণা করিতে হইয়াছে। অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, বিশ্বসভ্যতায় যে বাঙ্গালীর স্থান আছে বা করিয়া লইতে হইবে এ ধারণাও বাঙ্গালীর বঙ্কিমযুগেই আরব্ধ ও উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান আত্মাদরের ও তৎসহকৃত আত্মপরিচয়ের ফল। ইদানীং সার জন্ উড্রফ প্রভৃতি মনীষী ব্যক্তিগণ যেরূপ যুক্তি দিয়া ভারতবাসীকে বিলাতী সভ্যতার বিনিময়ে স্বীয় সনাতনী সভ্যতা বিসর্জন দিতে নিষেধ করিতেছেন, তাহা একালেও সকলের পক্ষে সহজবোধ্য নহে; সেরূপ যুক্তি বঙ্কিমের যুগে প্রদত্ত হইলে বাঙ্গালী বুঝিত কি? কেন না তখন শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই পাশ্চাত্য সভ্যতার চাকচিক্য ও পাশ্চাত্য জাতিসমূহের বৈষয়িক উন্নতিদর্শনে একান্ত মুগ্ধ, এবং সর্ব্ববিষয়ে তাহাদের অনুকরণ করিতে উদ্যত। তাহারা আপনাদিগকে ত চিনেই নাই, যাহাদের অনুকরণে ব্যগ্র ছিল তাহাদের সভ্যতারও যথার্থ প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। একের পক্ষে যাহা পথ্য, তাহা যে অন্যের পক্ষে বিষ হইতে পারে, ইহা সামাজিক ব্যাপারে সহজে সকলে উপলব্ধি করে না। তাই সে কালে গরিষ্ঠ কার্য্যকারিতা বা বহুতমলোকের ভূয়িষ্ঠ উপকারিতা প্রভৃতি যুক্তি ছাড়া বহির্ম্মুখ বাঙ্গালীকে অন্তর্ম্মুখ করিবার উৎকৃষ্টতর উপায় ছিল না। বঙ্কিম সেই উপায়ই অবলম্বন করিয়াছেন, তিনি কোনটা সুসাধ্য, কোনটা অসাধ্য, কোনটাতে উপকারিতা বহুজনব্যাপী ও কোনটাতে তাহাই দেখাইয়া দিয়া শিক্ষিত বাঙ্গালীকে আত্মভাষার অনুশীলন করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

আধুনিক কালে বাঙ্গালীর আত্মাদরের প্রাবল্যে আবার অনেক স্থলে ইংরেজবিদ্বেষ বড় অনুচিত মাত্রায় প্রকাশ পাইতেছে। বঙ্কিমের যুগেও ইংরেজবিদ্বেষ ছিল কিন্তু তাহার প্রকৃতি অন্যরূপ ছিল। ইংরেজ ও ইংরাজীর প্রতি ঐকান্তিক বিদ্বেষ যে এদেশবাসিগণের উন্নততম স্বার্থের বিরোধী তাহা বঙ্কিম স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন, এবং তাহা কুত্রাপি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তবে এক্ষেত্রেও অন্ধ অনুরাগের ফল যে বাঙ্গালীর পক্ষে মঙ্গল্য ও শোভন নয় তাহাও তিনি স্পষ্ট ভাবে বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বাঙ্গালীর ইংরাজী পোষাক অবলম্বন ঐরূপ অন্ধ অনুরাগের চিহ্ন। ইহা বঙ্কিম কদাপি প্রীতির চক্ষে দেখেন নাই। বঙ্কিম ইহাকে মার্কটী বৃত্তি মনে করিয়া নিন্দা করিয়াছেন। "একদা প্রাতঃসূর্য্যকিরণোদ্ভাসিত কদলীকুঞ্জে শ্রীমান্ হনুমান্ বায়ুসেবনার্থ পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। ... ... এমত সময়ে দৈবযোগে বুট কোট পেণ্টুলন, চেন, চসমা, চুরুট, চাবুকধারী, টুপ্যাবৃতমস্তক এক নব্য বাবু তথায় উপস্থিত। হনুমান্ চন্দ্র দূর হইতে এই অপূর্ব্বমূর্ত্তি দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন, কে এ? আকার ইঙ্গিতে বোধ হইতেছে নিশ্চয় এ কিষ্কিন্ধ্যা হইতে আসিতেছে। এরূপ পরানুকৃত বেশ, গমন, চাহনি প্রভৃতি অন্য কোন দেশে অসম্ভব। এ আমার স্বদেশী ও স্বজাতি অতএব ইহাকে আমি অবশ্য আদর করিব।"*

বাঙ্গালীর বিদেশী পোসাক ব্যবহার-সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন। বাঙ্গালীর প্রাচীন পোষাক আধুনিক কালের পরিবর্ত্তিত সামাজিক অবস্থার উপযোগী নয় ইহা সত্য—তাই স্ত্রীপুরুষ সকলকেই উহা আংশিক-পরিমাণে সংশোধন করিয়া লইতে হইয়াছে। বাঙ্গালী

* "লোকরহস্য", 'হনুমদ্‌বাবু সংবাদ'।

পুরুষ ধুতি চাদরের সহিত দেশী ধরণের সার্ট কোট * এবং স্ত্রীলোকগণ সাড়ীর সহিত সেমিজ জ্যাকেট পরিতেছেন। ইহার অনেকটাই আবশ্যক সংস্কার, এবং খুব একটা গুরুতর পরিবর্ত্তন নহে। কিন্তু পুরুষের পক্ষে হ্যাট কোট প্যাণ্ট গলাবন্ধ, স্ত্রীলোকের পক্ষে গাউন ব্লাউজ ইত্যাদি সম্বন্ধে সেকথা বলা চলে না। এতটা পরানুকরণ তাহাদের জাতীয় আত্মসম্মানের বিরোধী ত বটেই, এমন কি সুরুচি ও সৌন্দর্য্যবোধেরও পরিচায়ক নহে।

পরানুকরণবৃত্তি দ্বারা বাঙ্গালীর সৌন্দর্য্যবোধের কিরূপ বীভৎস বিপর্য্যয় সাধিত হইয়াছে, তাহা ভাবিলে যেমন বিস্ময় জন্মে তেমনই হৃদয় দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে। আধুনিক কালে ভারতের সর্ব্বত্রই এই অবনতি লক্ষিত হয়। ইহার প্রকৃতি ও হেতু মহামতি হাভেল, শ্রীযুক্ত কুমারস্বামি-প্রভৃতি অতি স্পষ্টভাবেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই যে, এই সকল মহাশয় ব্যক্তির ঐকান্তিক চেষ্টাতেও শিক্ষিতসমাজের রুচি পরিবর্ত্তিত হইতেছে না। এককালে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণের মধ্যেও নিপুণ সৌন্দর্য্যবোধ ও শিল্পজ্ঞান দেখা যাইত; গৃহসজ্জা, তৈজসপত্র, হাঁড়িকুঁড়ির মধ্যেও বিচিত্র শিল্প দেখা যাইত। কিন্তু সমাজের উচ্চ-স্তরের লোকদিগের রুচিবিকারের ফলে নিম্নস্তরের লোকেরাও শিল্পজ্ঞান এবং তৎসঙ্গে সৌন্দর্য্যবোধ হারাইয়া ফেলিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালী জীবনে "সূক্ষ্মশিল্পের" অনাদর লক্ষ্য করিয়াছিলেন, এবং তাহাদের রুচিবিপর্য্যয়ও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন। হাভেল বা কুমারস্বামী বা অবনীন্দ্রনাথ বঙ্কিমযুগের বহু পরে দেশীয় শিল্পকলার আদর্শব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বঙ্কিমের শিল্পবিচারশক্তি ইহাদের তুল্য সমুন্নত না হইলেও ইহাদের বহুপূর্ব্বে যে তিনি দেশীয় সমাজে শিল্পকলার অবনতি ও দেশীয় ব্যক্তিগণের শিল্পসম্বন্ধে অরসজ্ঞতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার পক্ষে কম গৌরবের বিষয় নহে। তিনি আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছিলেন—

"কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য এবং চিত্র এই ছয়টি সৌন্দর্য্যজনিকা বিদ্যা। ... ... এই ছয়টি

---

* আফিস আদালতে প্যাণ্টালুন ও তৎসঙ্গে চাপকান বা কোট পুরুষগণের পক্ষে অবশ্যব্যবহার্য্য বলিয়া বিধি আছে। যেখানে কোনওরূপ বাধ্যতা নাই তথায় ধুতি চাদর ও সার্ট বা কোট না পরিয়া হ্যাট্ কোট পড়িয়া দ্বিজেন্দ্র লালের ভাষায়, "বিদেশী বাঁদর" সাজিবার কি প্রয়োজন? বাঙ্গালী সাহেবী কোটের একটা দেশীয় সংস্করণ করিয়াছে; তাহা মন্দ নয়। ধুতির সঙ্গে ও আফিস আদালতে প্যাণ্টালুনের সঙ্গে উহার অসমন্বয় হয় না। কিন্তু তথাপি দেখা যায় লোকে প্যাণ্টালুনের সঙ্গে দেশী ধরণের কোট না পরিয়া বিলাতী ধরণের গলাকাটা কোট, গলাবন্ধ, হ্যাট ইত্যাদি পরেন। আফিসের বাহিরে কখনও কখনও দেখা যায় ধুতির সঙ্গে গলাকাটা কোট ও গলাবন্ধও (necktie) পরা হয়। মেয়েরা মেমদের সেমিজ, বডিস্ পেটিকোট নিয়াছেন, কেবল ("নেটিভ খৃষ্টান" ছাড়া অন্য মেয়েরা) অদ্যাপি গাউনটা নেন নাই। ইদানীং আবার তাঁহারা জ্যাকেট বা বডিস্ ছাড়িয়া মেম সাহেবদের অনুকরণে ব্লাউজ ধরিয়াছেন। মেমেরা যতদিন পুরাহাতা ব্লাউজ পরিতেন, ইহারাও ততদিন সেইরূপ ব্লাউজ পরিতেন। আবার মেমেরা যেই হাফ হাতা ব্লাউজ ধরিলেন, ইহারাও অমনি সেইরূপ ব্লাউজ পরিয়া বাহুর সৌন্দর্য্যবিকাশে মনোযোগিনী হইলেন! বালকবালিকাদের ত বিদেশী পরিচ্ছদ অবশ্যপরিধেয় বলিয়া গণ্য হইয়া উঠিয়াছে। দাসবৃত্তি আর কাহাকে বলে? অথচ ইহার নাম সুরুচি!

বিত্তার মনুষ্যজীবন ভূষিত ও সুখময় করে। ভাগ্যহীন বাঙ্গালীর কপালে এ সুখ নাই। সূক্ষ্মশিল্পের সঙ্গে তাহার বড় বিরোধ। তাহাতে বাঙ্গালীর বড় অনাদর, বড় ঘৃণা। বাঙ্গালী সুখী হইতে জানে না। স্বীকার করি সকল দোষটুকু বাঙ্গালীর নিজের নহে। কতকটা বাঙ্গালীর সামাজিক রীতির দোষ। ... ... কতকটা বাঙ্গালীর দারিদ্র্য জন্য। ... ... কতকটা হিন্দুধর্ম্মের দোষ। ... ... দুই চারিজন ধনাঢ্য বাবু ইংরেজদিগের অনুকরণ করিয়া ইংরেজের ন্যায় গৃহাদির পারিপাট্য বিধান করিয়া থাকেন। বাঙ্গালী নকলনবিশ ভাল, নকলে শৈথিল্য নাই। কিন্তু তাঁহাদিগের ভাস্কর্য্য এবং চিত্রসংগ্রহ দেখিলেই বোধ হয় যে, অনুকরণস্পৃহাতেই ঐ সকল সংগ্রহ ঘটিয়াছে—নচেৎ সৌন্দর্য্যে তাঁহাদিগের আন্তরিক অনুরাগ নাই। এখানে ভালমন্দের বিচার নাই, মহার্ঘ হইলেই হইল; সন্নিবেশের পারিপাট্য নাই, সংখ্যায় অধিক হইলেই হইল।”

বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র এই বিষয়টি খুব সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, এখন মনে হয় বিষয়ের গুরুত্বহিসাবে তাহা সমীচীন হয় নাই। তবে দেশটা তখনও এশিক্ষার জন্য প্রস্তুত হয় নাই। সুনিপুণ শিক্ষকেরও অভাব ছিল। এখনই কি দেশ সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইয়াছে? এখনই কি দেশীয় চিত্রকলা বা অন্য শিল্প বিলাতী অনুকরণের মোহ হইতে মুক্ত হইয়াছে? বিষয়টা সকলেরই বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বলিয়া এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কথা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে।

“আর্টস্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছি, কিন্তু আমাদের দেশের শিল্পকলার আদর্শ যে কি তাহা আমরা জানিই না। যদি শিক্ষার দ্বারা ইহার পরিচয় পাইতাম, তবে যথার্থ একটা শক্তিলাভ করিবার সুবিধা হইত। কারণ, এ আদর্শ দেশের মধ্যেই আছে—একবার যদি আমাদের দৃষ্টি খুলিয়া যায়, তবে ইহাকে আমাদের সমস্ত দেশের মধ্যে, থালায়, ঘটিতে, বাটিতে, ঝুড়িতে, চুপড়িতে, মন্দিরে, মঠে, বসনে, ভূষণে, পটে, গৃহভিত্তিতে নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গপরিপূর্ণ একটি সমগ্র মূর্ত্তিরূপে দেখিতে পাইতাম, ইহার প্রতি আমাদের সচেষ্ট চিত্তকে প্রয়োগ করিতে পারিতাম...পৈতৃক সম্পত্তি লাভ করিয়া তাহাকে ব্যবসায়ে খাটাইতে পারিতাম।

* * * *

আমরা দেখিয়াছি, জাপানের একজন সুবিখ্যাত চিত্ররসজ্ঞ পণ্ডিত এদেশের কীটদষ্ট কয়েকটি পটের ছবি দেখিয়া বিস্ময়ে পুলকিত হইয়াছেন—তিনি একখানি পট এখান হইতে লইয়া গেছেন, সেখানি কিনিবার জন্য জাপানের অনেক গুণজ্ঞ তাঁহাকে অনেক মূল্য দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু তিনি বিক্রয় করে নাই।

আমরা ইহাও দেখিতেছি, য়ুরোপের বহুতর রসজ্ঞ ব্যক্তি আমাদের অখ্যাত দোকান বাজার ঘাঁটিয়া মলিন ছিন্ন কাগজের চিত্রপট বহুমূল্য সম্পদের ন্যায় সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতেছেন। সে সকল চিত্র দেখিলে আমাদের আর্টস্কুলের ছাত্রগণ ন্যাসাকুঞ্চন করিয়া থাকেন। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই, কলাবিদ্যা যথার্থ ভাবে যিনি শিখিয়াছেন, তিনি বিদেশের অপরিচিত রীতির চিত্রের সৌন্দর্য্যও ঠিকভাবে দেখিতে পান-তাঁহার একটি শিল্পদৃষ্টি জন্মে। আর যাহারা কেবল নকল করিয়া শেখে, তাহারা নকলের বাহিরে কিছুই দেখিতে পায় না।

* * * *

“পিয়ের লোটি” ছদ্মনামধারী বিখ্যাত ফরাসী ভ্রমণকারী ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিতে আসিয়া আমাদের দেশীয় রাজনিকেতনগুলিতে বিলাতী আসবাবের ছড়াছড়ি দেখিয়া হতাশ হইয়া গেছেন। তিনি বুঝিয়াছেন যে, বিলাতী আসবাবখানার নিতান্ত ইতর শ্রেণীর সামগ্রীগুলি ঘরে সাজাইয়া আমাদের দেশের

বড় বড় রাজারা নিতান্তই অশিক্ষা ও অজ্ঞতাবশতই গৌরব করিয়া থাকেন।

* * * *

দুর্ভাগ্যক্রমে সকল দেশেরই ইতর সম্প্রদায় অশিক্ষিত। সাধারণ ইংরেজের শিল্পজ্ঞান নাই—সুতরাং তাহারা স্বদেশী সংস্কারের দ্বারা অন্ধ। তাহারা আমাদের কাছে তাহাদেরই অনুকরণ প্রত্যাশা করে। আমাদের বসিবার ঘরে তাহাদের দোকানের সামগ্রী দেখিলে তবেই আরাম বোধ করে,—তবেই মনে করে, আমরা তাহাদেরই ফরমায়েসে তৈরি সভা পদার্থ হইয়া উঠিয়াছি। তাহাদেরই অশিক্ষিত রুচি অনুসারে আমাদের দেশের প্রাচীন শিল্পসৌন্দর্য্য স্খলন ও ইতর অনুকরণকে পথ ছাড়িয়া দিতেছে। এ দেশের শিল্পীরা বিদেশী টাকার লোভে বিদেশী রীতির অদ্ভুত নকল করিতে প্রবৃত্ত হইয়া চোখের মাথা খাইতে বসিয়াছে।

যেমন শিল্পে তেমনি সকল বিষয়েই। আমরা বিদেশী প্রণালীকেই একমাত্র প্রণালী বলিয়া বুঝিতেছি। কেবল বাহিরের সামগ্রীতে নহে, আমাদের মনে, এমন কি, হৃদয়ে নকলের বিষবীজ প্রবেশ করিতেছে।" *

দেশীয় লোকে উচ্চশ্রেণীর ইংরেজের আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি ইত্যাদি অল্পই দেখে। অপেক্ষাকৃত নিম্ন বা সাধারণ শ্রেণীর সাহেব-মেমেরাই তাহাদের আদর্শ। তাই সমগ্র দেশটা কাপড়চোপর, আসবাব-পত্র, শিল্প, সঙ্গীত, কাব্য, উপন্যাস,—সর্ব্ববিষয়ে বিলাতীর এমন হীন অনুকরণে মত্ত, ও বিপদ্‌গ্রস্ত। যে কথা আজ আমরা হাভেলের মুখে শুনিতেছি, সমাজের প্রাণের যে নিগূঢ় আস্বাদন আমাদের অবনীন্দ্রনাথের তূলিকায় এবং রবীন্দ্রনাথ ও কুমারস্বামীর লেখনীতে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, দেশীয় লোকের দুর্ব্বুদ্ধিতে বা অজ্ঞতায়, বা মোহে তাহা এখনও সকলের প্রাণস্পর্শ করিতে পারিতেছে না।

সঙ্গীতবিদ্যা উপলক্ষ্য করিয়াও বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র অনেক সারকথা বলিয়াছেন। শিক্ষিত বাঙ্গালী দেশীয় সব সংস্কারকে ঘৃণা করিতেছিল—দেশীয় সঙ্গীত তাহার অন্যতম। অশিক্ষিতের মধ্যে সঙ্গীতের চর্চ্চা ছিল, কিন্তু স্বপরিবারের বিশুদ্ধ আবেষ্টনের মধ্যে নয়, ইয়ারের দলে বারাঙ্গনা মহলে। সঙ্গীতসম্বন্ধে প্রাচীনগণের সূক্ষ্মদর্শিতা ও নিপুণ রসজ্ঞতা বঙ্কিমের দৃষ্টি এড়ায় নাই। সেকালে রাগরাগিণীগণের মূর্ত্তিকল্পনা অনেকে রহস্য বা রসিকতামাত্র মনে করিত, এখনও অনেকে করেন। কেহ ভাবিয়া দেখে না ঐরূপ মূর্ত্তিকল্পনায় দেশীয় সঙ্গীতরসজ্ঞ চিত্রশিল্পিগণের কিরূপ নিপুণ রসজ্ঞতা ও বিচারশক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে।

"দুই একটি উদাহরণ দেই। অনেকেই টৌড়ি রাগিণী শুনিয়াছেন। সহৃদয় ব্যক্তিরা তচ্ছ্রবণে যে একটি অনির্ব্বচনীয় ভাবে অভিভূত হয়েন, তাহা সহজে বক্তব্য নহে। সচরাচর কবিরা যাহাকে আবেশ বলিয়া থাকেন, তাহা ঐ ভাবের একাংশ কিন্তু একাংশমাত্র। তাহার সঙ্গে ভোগাভিলাষ মিলিত কর। সে ভোগাভিলাষ নীচ প্রবৃত্তি নহে। যাহা কিছু নির্ম্মল, সুখকর, অন্যজনের অসাপেক্ষ, কেবল আধ্যাত্মিক সেই ভোগেরই অভিলাষ। কিন্তু সে ভোগাভিলাষের সীমা নাই, তৃপ্তি নাই, রোধ নাই, শাসন নাই। ভোগে এবং ভোগসুখে অভিলাষ আপনি উছলিয়া উঠিতেছে। আকাঙ্ক্ষা বাড়িতেছে। প্রাচীনেরা এই টৌড়ি রাগিণীর মূর্ত্তিকল্পনা করিয়াছেন। সে পরমসুন্দরী যুবতী, বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা, কিন্তু বিরহিণী। আকাঙ্ক্ষার অনিবৃত্তি হেতুই তাহাকে বিরহিণী কল্পনা করিতে হইয়াছে। এই বিরহিণী সুন্দরী বনবিহারিণী, বনমধ্যে নির্জ্জনে একাকিনী বসিয়া মধুপানে উন্মাদিনী হইয়াছে, বীণা বাজাইয়া গান করিতেছে, তাহার বনভূষণ সকল স্খলিত হইয়া পড়িতেছে, বনবিহারিণী সকল আসিয়া তাহার সম্মুখে তটস্থ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

এই চিত্র অনির্ব্বচনীয় সুন্দর—কিন্তু সৌন্দর্য্য ভিন্ন ইহার আর এক চমৎকার গুণ আছে। ইহা টৌড়ি রাগিণীর যথার্থ প্রতিমা। টৌড়ি রাগিণী শ্রবণে মনে যে ভাবের উদয় হয়, এই প্রতিমাদর্শনে ঠিক সেই ভাব জন্মিবে।"

* "স্বদেশ"—"দেশীয়-রাজ্য"-শীর্ষক প্রবন্ধ।

উপরিলিখিত উক্তিটি একদিকে যেমন প্রাচীনগণের সঙ্গীতরসজ্ঞতা ও বিচারশক্তির সমর্থক তেমনই আধুনিক কালের সঙ্গীতরসিকমানী বাবুগণেরও ভাবিবার যোগ্য। ইঁহাদের অনেকেই আপনাদিগকে সঙ্গীতপ্রিয় বলিয়া প্রচার করেন, কিন্তু রাগিণী আলাপ শুনিলে সন্ত্রস্ত হইয়া সভাস্থল-ত্যাগের উদ্যোগ করেন। ইঁহাদের ধারণা এই যে, সাদা সিধা একটা সুরসংযোগে গানের পদগুলিকে অধিকতর চিত্তাকর্ষণক্ষম করিয়া তোলাই সঙ্গীতের একমাত্র প্রয়োজন। রাগরাগিণীর যে গানের পদ-নিরপেক্ষ একটা মর্য্যাদা, একটা অর্থ, একটা ভাবোদ্বোধিকা শক্তি আছে, ইহা অনেকে ধারণা করিতে পারে না। এই অরসজ্ঞতার সহিত পরাণুকরণ প্রবৃত্তির মিলনের ফলে বাঙ্গালা গানের সঙ্গে অনেকস্থলে বিলাতী যন্ত্রের অসফল সঙ্গত আরব্ধ হইয়াছে। ইহাতে সাধারণের উপভোগ্য মাঝারি রকমের সঙ্গীতের কাজ একরূপ চলিয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু দেশীয় সঙ্গীতের উচ্চতম আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইতেছে। বিলাতী সঙ্গীতের প্রাণ—সঙ্গতে বা ঐক্যতানে বা harmonyতে; আর দেশীয় সঙ্গীতের প্রাণ—স্বর হইতে স্বরের আরোহাবরোহপ্রক্রিয়াগত বৈচিত্র্যে, বা তাহার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্দ্দার আদায়প্রণালীতে বা melodyতে। বিলাতী হারমোনিয়ম, অর্গান বা পিয়ানো দ্বারা তাহা আদায়যোগ্য নহে। তাই দেশীয় গানের আদর্শ কিয়ৎপরিমাণে ক্ষুণ্ণ না করিয়া উহার সহিত হারমোনিয়ম ইত্যাদি সঙ্গত-যন্ত্ররূপে ব্যবহার্য্য নহে। বঙ্কিম স্বয়ং দেশীয় ও বিলাতী সঙ্গীতের এই আদর্শগত প্রভেদ উপলব্ধি করিয়াছিলেন কিনা বলিতে পারি না, তিনি নিজে হারমোনিয়মসংযোগে সঙ্গীতের পক্ষপাতী ছিলেন, কালোয়াতি গান নাকি বড় একটা পছন্দ করিতেন না। কিন্তু তদানীন্তন শিক্ষিত সমাজেও মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি নিপুণতর সঙ্গীতরসিক বহু ব্যক্তি বরাবর হারমোনিয়মের বিরোধী ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজদ্বারাই বোধ হয় হারমোনিয়মের প্রচলন আরব্ধ হয়। কিন্তু এখন ব্রাহ্মসমাজেরই কতিপয় সুশিক্ষিতা ও যথার্থ সঙ্গীতরসিকা মহিলার চেষ্টায় হারমোনিয়মের স্থানে ধীরে ধীরে এস্রাজ বেহালা ইত্যাদি আসিতেছে। কিন্তু ইতিমধ্যে সঙ্গীতরুচিতে যে বিপ্লব ও অপকার সাধিত হইয়াছে তাহা অল্প নহে।

তবে হারমোনিয়ম এক কাজ করিয়াছে, মাঝারি রকমের সঙ্গীত বাঙ্গালার ভদ্র গৃহে কামিনীকণ্ঠে পর্য্যন্ত চালাইয়া দিয়াছে। * পূর্ব্বে মেয়েরা বিবাহে ও বারব্রতে যে গান গাহিতেন, অনেক স্থলেই উহাকে সঙ্গীত বলা চলিত না, উহা উৎপীড়িতা সঙ্গীতকলার আর্ত্তনাদমাত্র ছিল। এখন হারমোনিয়মের কৃপায় তাল বা লয়ের এবং অনেক সময়ে সুরেরও যথেষ্টরূপ শ্রাদ্ধ হয় বটে, তবু তাহা সঙ্গীতনামবাচ্য। তাল ও লয়ের ভঙ্গ অক্ষমতা বা অশিক্ষাকৃত; সুতরাং সংশোধনযোগ্য। কিন্তু উচ্চ কণ্ঠধ্বনিমাত্রকেই সঙ্গীত মনে করা কুরুচির পরাকাষ্ঠা।

পরিবারমধ্যে সঙ্গীতপ্রচলনের আবশ্যকতাসম্বন্ধে বঙ্কিম বলিয়াছেন—

"যেমন রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি সকল মনুষ্যেরই জানা উচিত তেমনি শরীরার্থ স্বাস্থ্যকর ব্যায়াম

---

* বেহালা এস্রাজ ইত্যাদি মিলাইয়া লওয়া বড় হাঙ্গামা। হারমোনিয়ম ইত্যাদি নিত্যবাঁধা যন্ত্রে সে বালাই নাই। তাই মাঝারি সঙ্গীতের উহা উপযোগী বটে। তবলা মিলাইবার ঝঞ্ঝাট মিটানের জন্যই প্রাচীন কালের মাঝারি সঙ্গীতওয়ালারা খোলের প্রচলন করিয়াছিল।

বেহালার সুরবাঁধার ঝঞ্ঝাট সম্পর্কে চন্দ্রশেখর প্রথমখণ্ড প্রথম পরিচ্ছেদে দলনীর বিড়ম্বনা এবং পরিশেষে "কলিকাতায় ইংরেজেরা যে বাজনা বাজাইয়া গীত গায়" তাহার জন্য আবদার স্মরণযোগ্য। কৃষ্ণকান্তের উইলে দানেশ খাঁর কালোয়াতির প্রতি বঙ্কিম যে কটাক্ষ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার সমসাময়িক শিক্ষিত ব্যক্তিগণের রুচির প্রতিভাস। রেভারেণ্ড লালবিহারী দে কালোয়াতিগান সম্বন্ধে বলিতেন, "It is notoing but cutting geometrical figures in one's mouth." ঢাকা রিভিউ, জুলাই, ১৯১৭।

এবং চিত্তপ্রসাদার্থ মনোমোহিনী সঙ্গীতবিদ্যাও সকল ভদ্র লোকের জানা কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে রাজকুমার রাজকুমারীদিগের অভ্যাসোপযোগী বিদ্যামধ্যে সঙ্গীত প্রধান স্থান পাইয়াছে। বাঙ্গালীর মধ্যে ভদ্র পৌরকন্যাদিগের সঙ্গীতশিক্ষা যে নিষিদ্ধ বা নিন্দনীয় তাহা আমাদিগের অসভ্যতার চিহ্ন। কুল-কামিনীরা সঙ্গীতনিপুণা হইলে গৃহমধ্যে এক অত্যন্ত বিমলানন্দের আকর স্থাপিত হয়। বাবুদের মদ্যাশক্তি এবং অন্য একটি গুরুতর দোষ অনেক অপনীত হইতে পারে।"

আপনারা লক্ষ্য করিবেন পাশ্চাত্য রুচির সহিত দেশীয় রুচির সমন্বয় করিতে গিয়া বঙ্কিম প্রাচীন আচারের উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই। সে যাহা হউক, শাস্ত্রে রাজকুমারীগণের পক্ষে সঙ্গীতশিক্ষার ব্যবস্থাসত্ত্বে, ভদ্র পৌরকন্যাদিগের মধ্যে সঙ্গীত যে অপ্রচলিত ও ক্রমে নিন্দনীয় হইয়াছে তাহার কারণ এই যে, এদেশে বাল্যবিবাহ ও একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা প্রচলিত থাকায়, কন্যাগণ, বিশেষতঃ স্বল্পবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের ভদ্র কন্যাগণকে বাল্যাবধিই গৃহকর্ম্মাদিতে ব্যস্ত থাকিতে হইত। তাঁহারা সঙ্গীতশিক্ষা ও সঙ্গীতচর্চ্চার অবসর অল্পই পাইতেন। যাঁহারা পাইতেন তাঁহারাও অবরোধ প্রথার দরুণ উপযুক্ত শিক্ষক পাইতেন না। এখন সমাজগঠনের পরিবর্ত্তন হইতেছে—যে কারণেই হউক মেয়েদের বিবাহ বিলম্বিত হইয়া পড়িতেছে, একান্নবর্ত্তিতা নামে মাত্র পর্য্যবসিত হইয়াছে, সহরে বাস করার দরুণ গৃহকর্ম্ম সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিয়াছে, রুচিরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাই ধীরে ধীরে ভদ্রকন্যাগণের নানারূপ শিল্প-কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। গৃহে সঙ্গীতচর্চ্চার ব্যবস্থা করিলে "মদ্যাসক্তি ও অন্য একটি গুরুতর দোষ" অপনীত হইবে এমন আশা আমাদের নাই। তবে ইহা মানি শিল্পশিক্ষার প্রয়োজন কেবল utility নহে। সঙ্গীতের বিশেষজ্ঞতা পরিবারস্থা মহিলাগণের পক্ষে সম্ভাব্য নহে। বিলাতেও সেটা ব্যবসায় বিশেষেরই আয়ত্ত। তবে এখনকার মত দেশীয় সঙ্গীতকলার শ্রাদ্ধ না করিয়া যদি পরিবারমধ্যে উহার চর্চ্চার সুবিধা হয়, তবে যে সকল মেয়েদের ক্ষমতা ও অবসর আছে, তাহাদের পক্ষে সঙ্গীতচর্চ্চা কখনই অবাঞ্ছনীয় হইতে পারে না।

বঙ্কিমচন্দ্রের অনুচিত ইংরেজ বিদ্বেষ ছিল না তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। বাঙ্গালী জাতি কর্ত্তৃক ইংরেজের অনুকরণের অনেক স্থলে নিন্দা করিলেও তিনি উহার যে একান্ত বিরোধী ছিলেন তাহা নহে। একান্ত বিরোধীর সমন্বয়চেষ্টা সঙ্গত হয় না। ১২৮১ সালের বঙ্গদর্শনে তিনি রাজনারায়ণ বাবুর "সেকাল আর একালে"র সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন—

"অনুকরণ মাত্র কি দূষ্য? তাহা কদাচ হইতে পারে না।... বাঙ্গালী যে ইংরেজের অনুকরণ করিবে, ইহা সঙ্গত ও যুক্তিসিদ্ধ।... বাঙ্গালী যে ইংরেজের অনুকরণ করিতেছে, ইহাই বাঙ্গালীর ভরসা।... যাঁহারা আমাদের কৃত ইংরাজের আহার ও পরিচ্ছেদের অনুকরণ দেখিয়া রাগ করেন, তাঁহারা ইংরেজকৃত ফরাসীগণের আহার পরিচ্ছদের অনুকরণ দেখিয়া কি বলিবেন? ইহা আমরা অবশ্য স্বীকার করি যে, বাঙ্গালী যে পরিমাণে অনুকরণে প্রবৃত্ত, ততটা বাঞ্ছনীয় না হইতে পারে। বাঙ্গালীর মধ্যে প্রতিভাশূন্য অনুকারীরই বাহুল্য এবং তাহাদিগকে প্রায় গুণভাগের অনুকরণে প্রবৃত্ত না হইয়া দোষভাগের অনুকরণেই প্রবৃত্ত দেখা যায়। এইটি মহাদুঃখ। বাঙ্গালী গুণের অনুকরণে তত পটু নহে, দোষের অনুকরণে ভূমণ্ডলে অদ্বিতীয়।"

প্রকৃত কথা এই যে, যখন ভারতবাসীর ন্যায় ঐহিক ব্যাপারে হীনাবস্থা বিজিত জাতি ইংরেজের ন্যায় সমৃদ্ধতর বিজেতৃগণের সাফল্যদর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাহাদিগের অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহাদের কোন্‌টা যে দোষ কোন্‌টা গুণ তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারে না। পদে পদে মনে হয়, 'ইহারা যে এত উন্নত ইহার হেতু বুঝি এই। আমাদিগকেও ঐরূপ না হইলে চলিবে না।' সমাজসংস্কারকগণও অনেক ক্ষেত্রেই ঐরূপ যুক্তিরই ছড়াছড়ি করেন। সামাজিক ব্যাপারসমূহে কার্য্যকারণসম্বন্ধনির্ণয় এত দুষ্কর যে, সকল যুক্তির অসঙ্গততা সকলে লক্ষ্য করেন না। তাই কেবল

বিলাতীমোহগ্রস্ত ব্যক্তিগণ নহে, অনেক ধীরস্বভাব ব্যক্তিও বিদেশী আচারের অনুকরণপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছেন। সেই-জন্যই শ্রদ্ধাস্পদ রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের "সেকাল আর একাল" নামক গ্রন্থে পরানুকরণস্পৃহা পরিহারপূর্ব্বক দেশীয় ভাবকে সমাজসংস্কারের ভিত্তি করিবার আবশ্যকতা বিশেষ-ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। রাজনারায়ণ বাবু লিখিতেছেন—

"ইংরাজী অনুকরণের দরুণ সমাজসংস্কারের গতি বিপথ-গামী হইতেছে। প্রকৃত গতিতে যদি সমাজসংস্কারের স্রোত প্রবাহিত হইত, তাহা হইলে সমাজসংস্কার কার্য্য এত দিনে যে কত অগ্রসর হইত তাহা বলা যায় না। আমাদের দেশের সমাজ সংস্কারকেরা যদি স্বদেশীয় ভাবকে পত্তনভূমি করিয়া সমাজসংস্কারে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে কৃতকার্য্য হইতে পারেন সন্দেহ নাই। *

ধর্ম্ম বল, আচার বল ও সমাজসেবা বল, বঙ্কিম সর্ব্বক্ষেত্রেই অনান্তরিকতাকে বড় ঘৃণা করিতেন। বাঙ্গালীর ইংরেজানুকরণপ্রিয়তার যে অংশটা আন্তরিকতাহীন তাহার প্রতি তিনি সর্ব্বদা গড়্গাহস্ত ছিলেন। Humbug Sham,—প্রবঞ্চনা, ভাণ, অনান্তরিকতা ইত্যাদি তাঁহার চক্ষুঃশূল ছিল। তিনি "ইংরেজির দ্বেষক" ছিলেন না, কিন্তু ইংরেজকে ভুলাইবার জন্য ইংরেজি বুলির বাড়াবাড়ি করিতে সহ্য করিতে পারেন নাই। তাই বঙ্গদর্শনের সূচনায়ই তিনি লিখিয়াছিলেন,"ইংরেজিতে না বলিলে ইংরেজ বুঝে না, ইংরেজ না বুঝিলে ইংরেজের নিকট মান মর্য্যাদা হয় না; ইংরাজের কাছে মান মর্য্যাদা না থাকিলে কোথাও থাকেনা, বা থাকা না থাকা সমান। ইংরেজ যাহা না শুনিল সে অরণ্যে রোদন, ইংরেজ যাহা না দেখিল তাহা ভস্মে ঘৃত।" ইহা ইংরাজী বা ইংরেজের প্রতি দ্বেষ নহে আন্তরিকতাহীন স্বদেশপ্রীতির প্রতি কটাক্ষ। ঐ কথাই আবার "ইংরাজ-স্তোত্রে" তীব্রতর ভাষায় উক্ত হইয়াছে,—

"হে অন্তর্য্যামিন্! আমি যাহা কিছু করি তোমাকে ভুলাইবার জন্য। তুমি দাতা বলিবে বলিয়া আমি দান করি; তুমি পরোপকারী বলিবে বলিয়া পরোপকার করি; তুমি বিদ্বান্ বলিবে বলিয়া আমি লেখা পড়া করি।...... আমি তোমার ইচ্ছামত ডিস্পেন্সারি করিব, তোমার প্রীত্যর্থ স্কুল করিব, তোমার আজ্ঞামত চাঁদা দিব; তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও......হে সৌম্য! যাহা তোমার অভিমত তাহাই আমি করিব। আমি বুট প্যাণ্টালুন পরিব, নাকে চস্‌মা দিব, কাঁটা চামচে ধরিব, টেবিলে খাইব—তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।......আমি মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া তোমার ভাষা কহিব......বাবু নাম ঘুচাইয়া মিষ্টার লেখাইব......আমি তোমাকে প্রণাম করি।"

উপরে স্থলে স্থলে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতেই বুঝা যাইবে, সামাজিক সমস্যাসমূহসম্বন্ধে বঙ্কিমের সব সমাধান এবং সব যুক্তিই যে অভ্রান্ত ও তত্তদ্বিষয়ে শেষ কথা ইহা মনে করা অন্যায়। বস্তুতঃ বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র সকলবিষয়ে খুব তলাইয়া দেখিবার ও বুঝিবার অবসর পাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কিংবা সকল লোকেরই যেরূপ মানসিক বৃত্তিসমূহের ক্রমপরিণতি হয়, বঙ্কিমেরও তাহাই হইয়াছিল; তাই তিনি শেষে অনেক মত বর্জ্জন ও সংশোধন করিয়াছিলেন। বিরল অবসরে সামাজিক সমস্যাসমূহের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া যুগধর্ম্মের ও শিক্ষার প্রভাবে তিনি অনেক অযৌক্তিক উক্তিও করিয়াছেন। তাঁহার "সাম্য" প্রবন্ধটি ইহার একটি উত্তম উদাহরণ। এই প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শনে তিন প্রস্তাবে প্রকাশিত হয়। * গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিবার সময় 'বঙ্গদেশের কৃষক'-শীর্ষক অপর একটি প্রবন্ধ হইতে দুইটি পরিচ্ছেদ উহাতে যোগ করা হয়। সে যাহা হউক বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত তিনটি প্রস্তাবের প্রথম প্রস্তাবে বঙ্কিম সাধারণভাবে সমাজে ছোট বড়, ধনি দরিদ্র, বিজিত বিজেতা, রাজপুরুষ ও সাধারণ প্রজা, সুন্দর অসুন্দর,

* সেকাল আর একাল ৭০ পৃষ্ঠা।

* শেষ প্রস্তাব চতুর্থবর্ষের বঙ্গদর্শনের কার্ত্তিক-সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। মানসী পত্রিকায় শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিত 'বঙ্কিম জীবনপঞ্জী"তে এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ ভ্রম হইয়াছে।

বুদ্ধিমান্ মূর্থ প্রভৃতি নানাবিধ বৈষম্যের কথা আলোচনা করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে প্রাচীন ভারতে উৎকট বর্ণ-বৈষম্যজনিত সামাজিক মর্য্যাদা ও অধিকারের তারতম্য-লোপের জন্য বুদ্ধদেবকর্ত্তৃক চেষ্টার কথাও আলোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রবন্ধে রুসো ও তৎসমসাময়িক ফরাসী সমাজের অবস্থা এবং তৃতীয় প্রস্তাবে বঙ্গীয় সমাজে স্ত্রীপুরুষে অধিকারবৈষম্যের কথা বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল বৈষম্য প্রদর্শন করিবার সময় বঙ্কিমচন্দ্র অনেক স্থলেই সমুচিত ধীরতা ও নিরপেক্ষতা রক্ষা করিতে পারেন নাই। প্রথম প্রস্তাবে তিনি মেকলের ন্যায় যেন কতকটা ভাষার বৈচিত্র্য-সৃষ্টির লোভেই স্বীয় লেখনীর নিরঙ্কুশ উচ্ছৃঙ্খলতাকে প্রশ্রয় দিয়াছেন।

"অমুক বড় লোক, পৃথিবীর যত ক্ষীর নবনীত সকলই তাহাকে উপহার দাও। ভাষার সাগর হইতে শব্দরত্নগুলি বাছিয়া বাছিয়া তুলিয়া হার গাঁথিয়া তাহাকে পরাও কেন না, তিনি বড় লোক। যেখানে ক্ষুদ্র অদৃশ্যপ্রায় কণ্টকটি পথে পড়িয়া আছে উহা যত্নসহকারে উঠাইয়া সরাইয়া রাখ—ঐ বড় লোক আসিতেছেন, কি জানি যদি তাঁহার পায়ে ফুটে। এই জীবনপথের ছায়াস্নিগ্ধ পার্শ্ব ছাড়িয়া রৌদ্রে দাঁড়াও, বড় লোক যাইতেছেন। সংসারের আনন্দকুসুম সকল সকলে মিলিয়া চয়ন করিয়া শয্যারচনা করিয়া রাখ, বড় লোক উহাতে শয়ন করুন। আর তুমি—তুমি বড় লোক নহ—তুমি সরিয়া দাঁড়াও, এ পৃথিবীর ভাল সামগ্রী কিছুই তোমার জন্য নয়। কেবল তীব্রঘাতী দোলায়মান বেত্র তোমার জন্য—বড় লোকের চিত্তরঞ্জনার্থ তোমার পৃষ্ঠের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে ইহার আলাপ হইবে।

বড় লোক ছোট লোক এ প্রভেদ কিসে? রাম বড় লোক যদু ছোট লোক কিসে? তাহা নিন্দুক লোকে একপ্রকার বুঝাইয়া দেয়। যদু চুরি করিতে জানে না, বঞ্চনা করিতে জানে না, পরের সর্ব্বস্ব শঠতা করিয়া গ্রহণ করিতে জানে না, সুতরাং যদু ছোট লোক। রাম চুরি করিয়া, বঞ্চনা করিয়া, শঠতা করিয়া ধন সঞ্চয় করিয়াছেন, সুতরাং রাম বড় লোক। অথবা রাম নিরীহ ভাল মানুষ, কিন্তু তাহার প্রপিতামহ চৌর্য্যবঞ্চনাদিতে সুদক্ষ ছিলেন, মুনিবের সর্ব্বস্বাপহরণ করিয়া বিষয় করিয়া গিয়াছেন, রাম জুয়াচোরের প্রপৌত্র, সুতরাং সে বড় লোক। যদুর পিতামহ আপনি আনিয়া আপনার খাইয়াছে—সুতরাং সে ছোট লোক।......

অথবা রাম সেলাম করিয়া, গালি খাইয়া, কদাচিৎ পদাঘাত সহ্য করিয়া, অথবা ততোধিক কোনও মহৎকার্য্য করিয়া কোন রাজপুরুষের নিকট প্রসাদপ্রাপ্ত হইয়াছে। রাম চাপরাস গলায় বাঁধিয়াছে—চাপরাসের বলে বড় লোক হইয়াছে।........প্রভুর নিকট কীটানুকীট, কিন্তু অন্যের কাছে ধর্ম্মাবতার!! তুমি যে হও দুই হাতে সেলাম কর, ইনি ধর্ম্মাবতার! ইঁহার ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নাই, অধর্ম্মেই আসক্তি, তাহাতে ক্ষতি কি? রাজকটাক্ষে ইনি ধর্ম্মাবতার। ইনি গণ্ডমূর্খ তুমি সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ—সে কথা এখন মনে করিও না, ইনি বড় লোক ইহাঁকে প্রণাম কর।" *

এইরূপে সাধারণভাবে সমাজগত নানাবৈষম্য প্রদর্শন করিয়া বঙ্কিম হিন্দুসমাজের বর্ণবৈষম্য আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

"আর এক প্রকারের বড়লোক আছে। গোপাল ঠাকুর, "কন্যাভারগ্রস্ত—কন্যাভারগ্রস্ত" বলিয়া দুই চারি পয়সা ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে—এও বড় লোক। কেন না, গোপাল ব্রাহ্মণজাতি। তুমি শূদ্র,—যত বড় লোক হও না কেন, তোমাকে উহার পায়ের ধূলা লইতে হইবে। দুই প্রহর বেলা ঠাকুর রাগ করিয়া না যান—ভাল করিয়া আহার করাও, যাহা চাহেন, দিয়া বিদায় কর। গোপাল দরিদ্র, মূর্খ, নরাধম, পাপিষ্ঠ, কিন্তু সেও বড় লোক।......মনুষ্যে মনুষ্যে যেমন প্রাকৃত বৈষম্য আছে (যথা,—কুমুদিনী অপেক্ষা সৌদামিনী

* সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত' নামক ক্ষুদ্র আখ্যায়িকাখানিও এইরূপ গুণহীনের উন্নতি ও পদমর্য্যাদার প্রতি পরিহাস ও তীব্র কটাক্ষপূর্ণ।

সুধন্বা; সুতরাং সৌদামিনী জমিদারের স্ত্রী, কুমুদিনী পাট কাটে) তেমনি অপ্রাকৃত বৈষম্য আছে। ব্রাহ্মণে শূদ্রে অপ্রাকৃত বৈষম্য। ব্রাহ্মণবধে গুরুপাপ, শূদ্রবধে লঘুপাপ; ইহা প্রাকৃতিক নিয়মানুকৃত নহে। ব্রাহ্মণ অবধ্য, শূদ্র বধ্য কেন? শূদ্রই দাতা, ব্রাহ্মণই কেবল গ্রহীতা কেন?......

পৃথিবীতে যতপ্রকার সামাজিক বৈষম্যের উৎপত্তি হইয়াছে, ভারতবর্ষের পূর্ব্বকালিক বর্ণবৈষম্যের ন্যায় গুরুতর বৈষম্য কখন কোন সমাজে প্রচলিত হয় নাই। অন্যবর্ণ অপরাধানুসারে বধ্য—কিন্তু ব্রাহ্মণ শত অপরাধেও অবধ্য। ব্রাহ্মণ তোমার সর্ব্বপ্রকার অনিষ্ট করুক; তুমি ব্রাহ্মণের কোনও প্রকার অনিষ্ট করিতে পারিবে না। তোমরা ব্রাহ্মণের চরণে লুটাইয়া তাঁহার চরণরেণু শিরোদেশে গ্রহণ কর—কিন্তু শূদ্র অস্পৃশ্য। শূদ্রস্পৃষ্ট জল পর্য্যন্ত অব্যবহার্য্য। পৃথিবীর কোন সুখে শূদ্র অধিকারী নহে, কেবল নীচবৃত্তি তাহার অবলম্বনীয়। জীবনের জীবন যে বিদ্যা তাহাতে তাহার অধিকার নাই। সে শাস্ত্রে বদ্ধ; অথচ শাস্ত্র যে কি, তাহা তাহার স্বচক্ষে দেখিবার অধিকার নাই, তাহার নিজ পরকালও ব্রাহ্মণের হাতে। ব্রাহ্মণ যাহা বলিবেন তাহা করিলেই পরকালের গতি, নহিলে গতি নাই। ব্রাহ্মণকে দান করিলেই পরকালের গতি, কিন্তু শূদ্রের সেই দান গ্রহণ করিলেও ব্রাহ্মণ পতিত। ব্রাহ্মণের সেবা করিলেই শূদ্রের পরকালের গতি। অথচ শূদ্রও মনুষ্য, ব্রাহ্মণও মনুষ্য। প্রাচীন ইউরোপের বন্দী এবং প্রভুমধ্যে যে বৈষম্য, তাহাও এমন ভয়ানক নহে।......

প্রাচীন ভারতের বর্ণ-বৈষম্য সম্বন্ধে বঙ্কিমের উক্তিগুলি সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও বলিতে হইবে বঙ্কিমচন্দ্র যে ভাবে এই সত্যটি উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহাতে উহার মর্য্যাদা রক্ষিত হয় নাই। সদ্‌বুদ্ধি ও নিরপেক্ষবিচারের প্রতিবন্ধক রাগদ্বেষ প্রভৃতি ভাবের মধ্য দিয়া সত্যের দিঙ্‌মাত্র প্রদর্শিত হইলে সে সত্য মিথ্যা হইতে বড় দূরবর্ত্তী হয় না। প্রাচীন ভারতে বর্ণ বৈষম্য ছিল, এবং ইহাও স্বীকার করি উহার উৎকটতায় ব্যথিত হইয়া বুদ্ধদেব উহার বিলোপসাধন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন এবং তাহাতে আংশিকরূপে সফল কামও হইয়াছিলেন। কিন্তু দেখা যাইতেছে তাঁহার প্রয়াসের ফলও চিরস্থায়ী হয় নাই—বরং কয়েকশত বৎসরমধ্যে বর্ণ বৈষম্য আর্য্যসমাজে উৎকটতর আকারেই সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কেন হইয়াছিল? অবশ্যই ঐ "অপ্রাকৃত" বৈষম্যের পশ্চাতেও এমন কোনও প্রাকৃত শক্তি চিরকালই কার্য্য করিতেছিল, যাহার আত্যন্তিক ও ঐকান্তিক নিরাকরণে বুদ্ধদেবের চেষ্টাও সমর্থ হয় নাই। একজন মনস্বী ইংরেজ * বলিয়াছেন,

অর্থাৎ সমাজবিজ্ঞানে দেখা যায় শাসক, যুদ্ধব্যবসায়ী, বাণিজ্যব্যবসায়ী, কৃষক, দাস প্রভৃতিরূপ জাতিভেদ সর্ব্বত্রই আছে। ঐরূপ ভেদ ভদ্রতাভিমান হইতে জন্মে না। কিন্তু সমাজের স্বভাবানুগত অভাবসমূহ এবং উহার গঠন হইতে উৎপন্ন হয়। শ্রেণী ভেদ এবং (কার্য্যতঃ) জাতিভেদ অদ্যও পাশ্চাত্য দেশে আছে। অনেকেরই মত এই যে, যুগে যুগে যেরূপ পরিবর্ত্তিত আকারেই হউক, সমাজে শ্রেণী-

---

* Sir John Woodroffe—*Is India Civilised?*

Sociology shows the existence of caste everywhere as rulers, warriors, merchants, agriculturists, servile population and so forth. These distinctions do not arise from snobbery but from the inherent needs of society and its organisation. Classes and (in a practical sense) castes exist in the west to-day. Many are of opinion that classes will always exist however much they may shift. Thus Professor Giddings the sociologist says, "Classes, do not become blended as societies grow older; they become more sharply defined." He considers that any social reform that hopes for the blending of classes is fore-doomed to failure.

ভেদ থাকিবেই। সমাজতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক গিডিংসও বলিয়াছেন "সমাজ পরিণত অবস্থা পাইলেও শ্রেণীভেদ লুপ্ত হয় না, বরং স্পষ্টতর হয়।" তাঁহার মতে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে মিশ্রণ (শ্রেণীভেদের লোপ) যে সমাজসংস্কার প্রয়াসের উদ্দেশ্য উহার বৈফল্য অনিবার্য্য।

সুতরাং দাঁড়াইয়াছে এই—প্রাচীন ভারতে যে বর্ণ বৈষম্য ছিল উহাকে "অপ্রাকৃত" বৈষম্য বলা যায় না। তদানীন্তন সমাজের অভাব ও গড়নদ্বারাই ঐ বৈষম্য নির্ম্মিত হইতেছিল। বিশেষতঃ শূদ্র বলিতে এখন আমরা যাহা বুঝি খুব প্রাচীন কালে ঠিক তাহাই বুঝাইত না। শূদ্রগণের অধিকারসমূহ বস্তুতঃ তাহাদের অনুন্নত মানসিক ও নৈতিক অবস্থার যোগাই ছিল। ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের যে বিশেষ বিশেষ অধিকার ছিল তাহাও সমাজের তদানীন্তন অবস্থায় একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। অবশ্য কালক্রমে যখন শূদ্রাদির অবস্থার উন্নতি ঘটিতে লাগিল, তখন ধীরে ধীরে সমাজে অসন্তোষেরও সৃষ্টি হইতে লাগিল। বুদ্ধদেবের সমাজ-সংস্কারপ্রয়াস ঐ অসন্তোষেরই চিহ্ন ও ফল। কিন্তু বৌদ্ধগণের সমাজসংস্কার ধর্ম্মসংস্কার-প্রভৃতির চেষ্টায়ও যখন কিঞ্চিৎ বিকটতা আসিয়া পড়িল, তখনই তাহার প্রতিক্রিয়ায় আবার হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দু আচার সমাজে (কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে) পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার ফলে প্রাচীন শূদ্রজাতির অবস্থার কিছু উন্নতি হইল বটে, কিন্তু ক্ষত্রিয়াদি অন্তজাতির প্রাচীন অধিকারসমূহ ধ্বংস হইল। বুদ্ধদেবের পূর্ব্বে যেখানে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি বর্ণ ছিল, বৌদ্ধধর্ম্ম লুপ্ত হইবার পর সেখানে কার্য্যতঃ ব্রাহ্মণ ও শূদ্র দুই বর্ণমাত্র অবশিষ্ট রহিল।

অবশ্য বলা যাইতে পারে সাম্যপ্রবন্ধে বর্ণবৈষম্য সম্বন্ধে সব সত্য প্রকাশ করা হয় নাই তাহাতে কি? বর্ণবৈষম্য সমাজের স্বভাবানুগত অভাব হইতে উৎপন্ন হইলেও উহার উৎপীড়ন ত ছিল? এখনও কি নাই? যদি থাকে তবে আংশিক হইলেও তৎটুকুই সত্য কেন প্রকাশ করা হইবে না? এবং তীব্রভাবেই প্রকাশ করা হইবে না?

বর্ণবৈষম্যসম্বন্ধে কেন, কোনও বিষয়েই বিরুদ্ধ মত প্রকাশের প্রতিরোধী হওয়া কাহারও পক্ষে যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়ানুমোদিত ব্যবহার নহে, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। পরমতের প্রতি অসহিষ্ণুতা কুশিক্ষা, কুসংস্কার, কুরুচির চিহ্ন। কথা এই—বঙ্গদর্শনের যুগে হিন্দুসমাজের প্রতি অযথা আক্রমণকারীর অভাব ছিল না। সামাজিক বৈষম্যের আলোচনায় অযথা তীব্রতা ও অপরিমিত গরল ঢালিয়া দেওয়ার ফলেই ফরাসি রাষ্ট্রবিপ্লবের উৎপত্তি। বঙ্গদেশেও একশ্রেণীর সমালোচক, অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসি লেখকগণের মাত্রায় না হউক, দেশকালপাত্রবিবেচনায় কিঞ্চিৎ অনুচিতমাত্রায়ই গরল উদ্গীর্ণ করিতেছিলেন। তাহাতেও যে কিছু সুফল হয় নাই তাহা বলিব না। হিন্দুসমাজ তাহাতে জাগিয়া উঠিয়াছিল। বঙ্গদর্শনের যুগে আঘাত জনিত ব্যথা অপেক্ষা সমাজের দেহ ও মন উভয়ের পুষ্টিকর ভৈষজ্য-প্রয়োগের প্রয়োজনই অধিক ছিল। হিন্দুসমাজ বলিতেছিল, "হে আমার হিতৈষিগন, আমাকে শুধু গালি দিও না, শুধু আঘাত করিও না। আমাকে এমন সব কথা শুনাও যাহাতে আমার মন ও হৃদয় উভয়ের প্রবোধ জন্মে। আমাকে এমন কিছু উপদেশ দাও যাহাতে আমার ব্যক্তিত্ব রক্ষা করিয়া—আমার সহস্র সহস্র যুগব্যাপী সাধনার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া—যেগুলি সমাজমাত্রেরই যথার্থ গৌরবের বিষয় সেইগুলিতে নূতনযুগের সভ্যজাতিগণের সমকক্ষ হইয়া চলিতে পারি।" বঙ্কিমের মনে প্রথম হইতেই সেই সমাজচৈতন্যের স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল বটে, কিন্তু একেবারে সমগ্রভাবে হয় নাই। তাই 'সাম্যে' তিনি প্রকৃষ্ট সমন্বয়ের পথে যান নাই, পরে 'প্রচারে' ও 'নব জীবনে' প্রকাশিত নানা প্রবন্ধে গিয়াছিলেন। * 'সাম্যে' যিনি প্রাচীন

---

* আধুনিক কালের মাপকাঠী দ্বারা যাহারা প্রাচীন কালের সামাজিক ব্যবস্থাসমূহের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া প্রাচীনগণকে গালাগালি দেন তাঁহাদিগকে মনীষী জন ষ্টুয়ার্ট মিলের ভাষায় সবিনয়ে এইটুকু মাত্র বলিব যে সামাজিক অনেক সমস্যাই no two ages and scarcely

অধ্যায়ে ব্রাহ্মণের সম্মানে অসঙ্কুচতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন; ধর্ম্মতত্ত্বে তিনি লিখিতেছেন—

"গুরু। (ব্রাহ্মণগণ) যে বর্ণশ্রেষ্ঠ ও আপামর সাধারণের বিশেষ ভক্তির পাত্র, তাহার কারণ এই যে ব্রাহ্মণেরাই ভারতবর্ষে সামাজিক শিক্ষক ছিলেন।...... সমাজ ব্রাহ্মণকে এত ভক্তি করিত বলিয়াই ভারতবর্ষ এত অল্পকালে এত উন্নত হইয়াছিল। সমাজ শিক্ষাদাতাদিগের সম্পূর্ণ বশবর্ত্তী হইয়াছিল বলিয়াই সহজে উন্নতি লাভ করিয়াছিল। তাঁহারা যে আপনাদের প্রতি লোকের অচলা ভক্তি আদিষ্ট করিয়া ছিলেন তাহার স্বার্থের জন্য নহে।......পৃথিবীতে যত জাতি উৎপন্ন হইয়াছে, প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণদিগের মত প্রতিভাশালী, ক্ষমতাশালী জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক কোনও জাতিই নহে।

শিষ্য। তা যাক্। এখন দেখি ত ব্রাহ্মণেরা লুচিও ভাজেন, রুটিও বেচেন, কালী খাঁড়া করিয়া কসাইয়ের ব্যবসায়ও চালান। তাঁহাদিগকেও ভক্তি করিতে হইবে?

গুরু। কদাপি না। যে গুণের জন্য ভক্তি করিব, সে গুণ যাহার নাই, তাহাকে ভক্তি করিব কেন? সেখানে ভক্তি অধর্ম্ম। এইটুকু না বুঝাই ভারতবর্ষের অবনতির একটি গুরুতর কারণ।......এখন ফিরিতে হইবে।

শিষ্য। অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে আর ভক্তি করা হইবে না।

গুরু। ঠিক তাহা নহে। যে ব্রাহ্মণের গুণ আছে, অর্থাৎ যিনি ধার্ম্মিক, বিদ্বান্ নিষ্কাম, লোকের শিক্ষক, তাঁহাকে ভক্তি করিব; যিনি তাহা নহেন তাহাকে ভক্তি করিব না। তৎপরিবর্ত্তে যে শূদ্র ব্রাহ্মণের গুণযুক্ত অর্থাৎ যিনি ধার্ম্মিক, বিদ্বান্ নিষ্কাম, লোকের শিক্ষক, তাঁহাকেও ভক্তি করিব।" *

'সাম্যের' তৃতীয় প্রস্তাবে স্ত্রী পুরুষবৈষম্য সম্বন্ধে বঙ্কিম যাহা লিখিয়াছেন তাহার অনেক কথাই জনষ্টুয়ার্ট মিলের—Subjection of Women নামক পুস্তকের প্রতিধ্বনি। আমরা উহা সমগ্রভাবে আলোচনা করিব না। এই প্রবন্ধে তিনি বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ইহার কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে হিন্দুর পক্ষেও (হিন্দু সমাজে প্রচলিত কুমারী বিবাহের মন্ত্রাচারাদিদ্বারা সম্পাদিত) বিধবাবিবাহ আইনসম্মত বলিয়া বিধিবদ্ধ হয়। বঙ্কিমচন্দ্র বিধবাবিবাহের কতদূর পক্ষপাতী ছিলেন বলা যায় না। বিষবৃক্ষে দেখিতে পাই, সূর্য্যমুখী কমলমণির নিকট এক পত্রে লিখিতেছে "আর একটা হাসির কথা ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে না কি বড় পণ্ডিত আছেন, তিনি আবার একখানি বিধবা বিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন। যে বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা দেয়, সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে?" স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ উক্তিটির জন্য বঙ্কিমকে ক্ষমা করেন নাই। ইহা ছাড়া ইংরাজস্তোত্রে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, "আমি বিধবার বিবাহ দিব, কুলীনের জাতি মারিব, জাতি ভেদ উঠাইয়া দিব—কেন না, তাহা হইলে তুমি আমার সুখ্যাতি করিবে।" এইরূপ ভাবের কথা বঙ্কিমের গ্রন্থাবলীর আরও অনেক স্থলে আছে। সে যাহা হউক বালবিধবার বিবাহ শাস্ত্রসম্মত, ইহা বঙ্গদর্শনের যুগে হিন্দুসমাজের বহু লোকেই বেশ বুঝিয়াছিল। বিদ্যাসাগর-

any two countries have decided alike and the decision of one age is a wonder to another. Yet the people of any given age and country no more suspect any difficulty in it than if it were a subject on which mankind had always been agreed. (*Liberty*—Introduction.)

* ধর্ম্মতত্ত্ব—দশম অধ্যায়। মনুষ্যে ভক্তি। সমগ্র অধ্যায়টিই পাঠ করা আবশ্যক। আধুনিক সমাজে ব্রাহ্মণের স্থান নিয়া অনেক আলোচনা হইয়াছে। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের "সনাতনী" গ্রন্থে ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব' শীর্ষক প্রবন্ধ, রবীন্দ্রনাথের "স্বদেশ" নামক গ্রন্থে 'ব্রাহ্মণ'-শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

প্রভৃতিও বালবিধবাগণের বিবাহ হউক ইহাই চাহিতেন। সাতটি সন্তানের পিতা বিপত্নীক হইলে তাহার পুনর্ব্বিবাহে অধিকার আছে বলিয়া সাত সন্তানের মাতাও বিধবা হইলে পুনর্ব্বিবাহের অধিকারিণী হওয়া উচিত, এমন উৎকট সাম্যবোধদ্বারা প্রণোদিত হইয়া বিদ্যাসাগর ও তাঁহার সহোদ্যোগিগণ বিধবাবিবাহ প্রচলন জন্য বদ্ধপরিকর হয়েন নাই। অন্যত্র বঙ্কিম বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে যাহাই বলুন, "সাম্যে" কতকটা সেইরূপ অদ্ভুত যুক্তিই দিয়াছেন। "আমরা বলিব, বিধবাবিবাহ ভালও নহে মন্দও নহে; সকল বিধবার বিবাহ হওয়া কদাচ ভাল নহে, তবে বিধবাগণের ইচ্ছামত বিবাহে অধিকার থাকা ভাল।......বিধবার চিরবৈধব্য যদি সমাজের মঙ্গলকর হয়, তবে মৃতভার্য্য পুরুষের চিরপত্নীহীনতা বিধান কর না কেন?...... তুমি বিধান কর্ত্তা পুরুষ তোমার সুতরাং পোয়াবারো। তোমার বাহুবল আছে, সুতরাং তুমি এ দৌরাত্ম্য করিতে পার। কিন্তু জানিয়া রাখ যে এ অতিশয় অন্যায়, গুরুতর এবং ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ বৈষম্য।" এইখানে বলা আবশ্যক যে, 'সাম্য' গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিবার সময় বঙ্কিমচন্দ্র তৃতীয় প্রস্তাবের অনেক অংশ কাটিয়া ছাটিয়া ফেলিয়াছিলেন, শেষে সমগ্র সাম্য গ্রন্থখানিই বিলুপ্ত করিয়াছিলেন।* বহু বিবাহ আইন দ্বারা নিষিদ্ধ করিবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত আন্দোলনসম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে যে আলোচনা করেন, তাহাতে বহুবিবাহ সমাজের অনিষ্টকারক স্বীকার করিয়াও তিনি বলিয়াছেন:—

"দশ সহস্র হিন্দুর মধ্যে একজনও অধিবেদন পরায়ণ কিনা সন্দেহ! এই অল্পসংখ্যকদিগের সংখ্যাও যে দিন দিন কমিতেছে, স্বতঃই কমিতেছে, তাহাও সকলেই জানেন। কাহারও কোন উদ্যোগ করিতে হইতেছে না—কোন রাজব্যবস্থার আবশ্যক হইতেছে না, আপনা হইতে কমিতেছে। ইহা দেখিয়া অনেকেই ভরসা করেন, এই কুপ্রথার যে কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহা আপনা হইতেই কমিবে। এমত অবস্থায় বহুবিবাহরূপ রাক্ষসবধের জন্য বিদ্যাসাগরের ন্যায় মহারথীকে ধৃতাস্ত্র দেখিয়া অনেকেরই ডন্ কুইক্সোটকে মনে পড়িবে।"

আপনারা লক্ষ্য করিবেন বঙ্কিম বহুবিবাহসম্পর্কে স্ত্রীপুরুষে অধিকারসাম্যের যুক্তি অবতারণা করেন নাই। পরন্তু ইতঃপূর্ব্বে বিষবৃক্ষে শ্রীশচন্দ্রের নিকট নগেন্দ্রের চিঠিতে তিনি তাদৃশ সাম্যনীতির অযৌক্তিকতাই প্রদর্শন করিয়াছিলেন। নগেন্দ্র লিখিতেছেন,—

"তুমি বলিবে যদি এক পুরুষের দুই স্ত্রী হইতে পারে, তবে এক স্ত্রীর দুই স্বামী না হয় কেন?—উত্তর, এক স্ত্রীর দুই স্বামী হইলে অনেক অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা; এক পুরুষের দুই বিবাহে তাহার সম্ভাবনা নাই। এক স্ত্রীর দুই স্বামী হইলে সন্তানের পিতৃ নিরূপণ হয় না; পিতাই সন্তানের পালন কর্ত্তা—তাহার অনিশ্চয়ে সামাজিক বিশৃঙ্খলতা জন্মিতে পারে, কিন্তু পুরুষের দুই বিবাহে সন্তানের অনিশ্চয়তা জন্মে না ইত্যাদি আরও অনেক কথা বলা যাইতে পারে।"

বহুবিবাহ-বিষয়ক প্রবন্ধে দেখা যায়—সুশিক্ষার বিস্তার দ্বারা ধীরে ধীরে সমাজের স্বাভাবিক গতিতে যে পরিবর্ত্তন বা সংস্কার সাধিত হয়, বঙ্কিমচন্দ্র তাহার পক্ষপাতী; আইন প্রণয়নদ্বারা ক্রত সমাজসংস্কারের ঘোরতর বিরোধী। এই মত যে প্রকৃষ্ট মত তাহাতে সন্দেহ নাই। যে সংস্কার ভিতর হইতে সাধন করা সম্ভব, তাঁহার জন্য রাজবিধির বাহ্যশাসন আশ্রয় করা যে অত্যন্ত অযৌক্তিক তাহা বঙ্কিম উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে ঐরূপ রায় দিলে

---

* বিবিধ প্রবন্ধ ২য় খণ্ডে 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

...বোধ হয় গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু বহু বিবাহের নিষেধের জন্য উহা আবশ্যক ছিল না। বহু বিবাহের নিষেধ প্রস্তাবেও ঐরূপ "শ্মশানচিকিৎসার" ব্যবস্থা করাতেই বিদ্যাসাগর বঙ্কিমের পত্রিকায় অমন তীব্রভাবে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন।

শিক্ষিতে অশিক্ষিতে, ভদ্রে ও ইতরে সহানুভূতির অভাব আমাদের একটা গুরুতর অপবাদ। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও ইহার যাথার্থ্য অংশতঃ অঙ্গীকার করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ গৌরবের কথা এই যে, তিনি বঙ্গদর্শনে বঙ্গদেশের কৃষকগণের দুরবস্থা, জমিদারগণ ও তাহাদের কর্ম্মচারিগণের হস্তে কৃষকদিগের নিরন্তর লাঞ্ছনা, তদ্রানীন্তন রাজবিধির, বিশেষতঃ লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে তাহাদের বিড়ম্বনা, ঐ বিড়ম্বনা সংশোধনের প্রতি রাজপুরুষগণের ঔদাসীন্য প্রভৃতি সম্বন্ধে অতি বিস্তৃত আলোচনা করেন। ঐ আলোচনা ফলপ্রদ হইয়াছিল। বঙ্কিম স্বয়ং বলিয়াছেন, কৃষকদিগের অবস্থার "এক্ষণে যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে উহাতে তাহার সূত্রপাত।" কৃষকগণের অবস্থা বর্ণনে বঙ্কিমচন্দ্র বোধ হয় স্থলে স্থলে একটু অত্যুক্তি করিয়াছিলেন। এবং কৃষকগণের দুর্দ্দশার প্রাকৃতিক কারণগুলি নির্দ্দেশের সময় Buckle এর History of Civilisation হইতে কতকগুলি মত কতকটা নির্ব্বিচারেই গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। ঐ মতগুলির প্রতিবাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সামাজিক প্রবন্ধে কৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া "বঙ্গদেশের কৃষক" প্রবন্ধে অর্থশাস্ত্রঘটিত এমন কতকগুলি কথা আছে যাহা বঙ্কিম নিজেই শেষ জীবনে সঙ্গত বিবেচনা করিতেন না। এই সব ত্রুটি সত্ত্বেও মানিতে হইবে ঐ প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শনের অন্যতম গৌরব।

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত কবিরত্ন।

আগমনী

এই তো বুঝি চরণ রেখা
শিউলী-ঝরা দূর্ব্বাদলে!
এই বুঝি মার স্নেহের আঁখি
মেদুর হল গগণতলে!

এই বুঝি গো আঁচল রাজে
ধানের ক্ষেতের শ্যামল সাজে!
দুকূল ছেপে স্তন্যধারা
উথ্‌লে ওঠে নদীর জলে!

আয় মা আবার বরষ-পরে
অশ্রুঝরা আঁধার ঘরে!
কে মিটাবে মায়ের মত
স্নেহের তৃষা হিয়ার তলে?

কোথায় শ্যামা বঙ্গভূমি
'ধন ধান্য পুষ্প ভরা'!
কোথায় নিবিড় শান্তি ওমা,
মোহন হাসি ভুবনহরা!

অন্নহীনের কাঁদন মাঝে
অন্নদা তোর বোধন বাজে!
হাহাকারে বন্দনা মা,
অর্ঘ্য এবার নয়নজলে!

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

অবরোধ।

(Erckmann Chatrian লিখিত 'Le Blocus'
নামক আখ্যায়িকার বঙ্গানুবাদ)

চতুর্থ অধ্যায়।

এ সব আর কি শুনছ ফ্রিজ আমাদের অদৃষ্টে যা কিছু দুঃখ কষ্ট ছিল এত সবে তার আরম্ভ। পরের দিন সহর তদারক করার ধুম পড়ে গেল। বেলা প্রায় এগারটার সময় ইঞ্জিনিয়ার ফৌজের কর্ত্তারা পাচিল টাচিল দেখে বেড়াতে লাগ্‌লেন। তখনি তখনি সহরময় রাষ্ট্র হয়ে গেল যে বুরুজের ভেতর বাহন্তরটা উঁচু চৌতারা করা হবে। আরও শুন্‌লাম আমাদের সহরের জার্ম্মান দরওয়াজার বাঁয়ে ডাইনে—বোমা পড়ে কিছু না কর্ত্তে পারে—এমন জবরদস্ত গোছ খান তিনেক ঘরও তৈয়ী হবে। প্রত্যেক ঘরে জন ত্রিশেক করে লোক ধর্‌বে আর গড়ের মাঝখানে বড় বড় গাছের গুড়ি পুঁতে খুব শক্ত রকম বেড়া দিয়ে উপদুর্গ গোছ একটা বেশ সুরক্ষিত জায়গা করা হবে, আর সেই বেড়ার কাটা ফাঁক গুলো দিয়ে গোলান্দাজেরা গোলাগুলি চালাবে। এই রকম দশটা বেড়া ঘেরা জায়গার ব্যবস্থা হবে তাহাতে চল্লিশ জন করে লোক ধর্‌বে। আর বড় চকে মিউনিসিপাল আফিসের কাছে যাকে আমরা মেরি বলি সেইখানটায় আরও গোটা চারেক বড় বড় বোমা—বাঁচান ঘর বানান হবে। সে ঘরে একশ জন করে লোক থাক্‌তে পার্‌বে। সকলেই ক্রমে জান্‌তে পারলে যে এ সব কিছুই সরকারের খরচে করা হবে না, সহরের লোকদেরই বেগার ধরিয়ে খাটান হবে—তারাই নিজেদের খন্তা, কোদাল, জিনিস পত্র বইবার জন্ত ঠেলা গাড়ী আর যা ২ আবশুক হবে সব আপনারাই নিয়ে আসবে। আর চাষাদের ধরে গাছ টাছ গুলো কাটিয়ে তাদেরি ঘোড়া দিয়ে বইয়ে আনা হবে। শুনেই ত সব চক্ষু স্থির। সর্লে সাফেন আর আমি আমরা এ তিন জনে এসব গাছের গুড়ির বেড়া আর বোমা থেকে রক্ষা পাবার আশ্রয় গুলো কি রকম করে কি হবে তা বুঝতে পারছিলাম না। আমাদের পড়্‌শী বন্দুকওয়ালা বেরী বুড়োকে জিজ্ঞাসা কর্ত্তে সে হেঁসে বল্লে এ সব বুঝ্‌তে গেলে অনেক কথা। এর পর যখন গোলা গুলির শন্‌শনী আর বোমা ফাটার শব্দ শুন্‌বে তখন আপনিই বুঝ্‌তে পারবে। ভাই হে মান্‌সের শিখ্‌বার বয়স যায় না। ভাল কথা বল্লেও এ সব লোকেরা কি রকম ভঙ্গীতে জবাব দেয় একবার বুঝেই দেখ। আমার মনে পড়ে আমাদের মিউনিসিপালিটির বড় কর্ত্তা ব্যারন পার্মেন্তিয়ে একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাই শুন্‌তে সহরের সমস্ত লোক চক্‌বাজারের দিকে ভেঙ্গে ছিল। আর সকলের দেখা দেখি আমরাও সেই দিকে ছুটে গেলাম। সর্লে আমার হাত ধরে চলো আর সাফেন আমার চিপে জামার পেছন দিকটা চেপে ধরে যেতে লাগ্‌ল পাছে ভিড়ে আমরা ছাড়া ছাড়ি হয়ে যাই। মেয়ার অফিসের সম্মুখে মেয়ে পুরুষ, ছেলে পিলে সারা সহরের লোক গোল হয়ে চুপটি করে বসে সব শুনছিল আর মাঝ থেকে এক একবার সম্রাট বাহাদুরের জয় বলে চীৎকার কর্‌ছিল। পার্মান্তিয়ে ফৌজদের গারদ ঘরের সিড়ির উপর দাঁড়িয়ে কোমরে তিন রঙ্গা কোমরবন্দ বেঁধে বক্তৃতা দিচ্ছিল। আর তার পেছনে আর সব মিউনিসিপালিটির কর্ত্তারা দাঁড়িয়েছিল। রোগা লম্বা লোকটি—গায়ে একটা আসমানী রঙয়ের পেছন দিক ঝোলা ল্যাজ ওয়ালা কোট; গলায় সাদা গলা বন্ধ।

পার্মান্তিয়ে বল্‌তে লাগ্‌ল "ফালস্‌বুর্গবাসীগণ" আজ তোমাদের সাম্রাজ্যের উপর অনুরাগ দেখাবার সময় এসেছে, গত বৎসর সমস্ত ইউরোপের লোকেরা আমাদের কথা মতই চলেছিল আজ তারা আমাদের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছে। দেশের লোকের যদি উৎসাহ না থাকে

[illegible]দের যদি বিক্রমের অভাব ঘটে তা হ'লে এদের [illegible]কে ভয় করবার কারণ আছে বটে। আজ যে [illegible] নিজ কর্ত্তব্য থেকে বিরত থাক্‌বে সে মাতৃভূমির [illegible] বিশ্বাস-দ্রোহী হবে। হে ফালস্বুর্গ নিবাসীগণ [illegible]মরা যে কি তা আজ সকলকে দেখাও। তোমাদের [illegible]শের সন্তানেরা মিত্র শক্তিদের বিশ্বাস-ঘাতকাতেই [illegible]লে প্রাণত্যাগ ক'রেছে। তোমরা তার প্রতি-[illegible] নিতে অগ্রসর হও। ফ্রান্সের পরিত্রাণের জন্য [illegible] সকলেরই সামরিক বিভাগের হুকুম মান্য করা [illegible]।"

[illegible] তার কথা শুনেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল। আমি [illegible] বলেই বল্‌তে লাগ্‌লাম "হায় রে অদৃষ্ট! আমার [illegible] সিপাহি কয়টা আর এসে পৌঁছাল না। শত্রুপক্ষ [illegible] দুয়ারের গোড়ায় এসে পড়েছে দেখ্‌ছি।" এলিয়া [illegible] আর ফিতাওয়ালা কাল্‌মে লেভী আমার কাছেই [illegible]ড়িয়ে ছিল। আর সবাইকার মত "সম্রাটের জয় [illegible] বলে" চীৎকার না করে তারা নিজেদের মধ্যে [illegible] করছিল "বেশ কথা আর কি আমরা ত আর [illegible] জমিদার নই। ব্যারন ডিউক কাউণ্টদের [illegible] কি আপন বাঁচালেই হয়ে গেল—ভারি তাদের মাথা [illegible] যে আমাদের দিকে নজর কর্‌বেন।" কিন্তু যত [illegible] পুরাণ যোদ্ধার যারা সাধারণ তন্ত্রের আমল থেকে [illegible]পাইগিরি করে আস্‌ছে তারা সকলেই মেয়ার [illegible]য়ের কথায় সায় দিয়ে "ফ্রাস্‌মায়ী ফ্রান্সের জয়" [illegible] চেঁচাতে লাগ্‌ল। আর বল্‌তে লাগ্‌ল এবার [illegible] দেশ রক্ষা করা চাই ই চাই।" যারা এই [illegible] আস্ফালন কর্‌ছিলেন তাদের সবারই প্রায় শেষ [illegible]লেও হয়। সমস্ত চুল উঠে গিয়ে মাথা গুলি [illegible] সাদা হয়ে গিয়েছে। কোক্‌লা মুখে পাইপ ধরার [illegible] চার হাত আছে কিনা সন্দেহ। [illegible]ড়ো [illegible] গুলদাঁ আর মিশর ফেরতা দৈমারে এই সব [illegible] খুব লাফালাফি [illegible]। তারা জন কয়েক আড়ে আড়ে কাল্‌মে লেভীর দিকে চাইতে লাগ্‌ল। আমি তার কানে কানে বল্‌লাম "সাত দোহাই তোর কালমে তুই চুপ কর—তা নইলে এখনই ওরা তোকে ছিঁড়ে ফেলে দিবে।

আমি কথাটা বড় মিথ্যা বলিনি। বুড়োরা যে রকম করে কট্‌মট করে তাকাচ্ছিল তা দেখ্‌লেই প্রাণ শুকিয়ে যায়, রাগে তাদের মুখগুলো পাঙাশপানা হয়ে গিয়েছিল চোয়ালগুলো ঠক্ ঠক্ করে কাঁপ্‌ছিল।

কালাবে আমার কথা মত আর পাঁচজনার সঙ্গে বেরিয়ে বাড়ী ফিরে গেল কিন্তু এলিয়া বক্তৃতার শেষ না শুনে উঠ্‌ল না। বাইরে যখন লোকেরা ভিড় করে রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে সম্রাটের জয় হোক্ বলে চীৎকার কর্‌ছিল সে তখন আর চেপে থাক্‌তে না পেরে ঘড়ি-ওয়ালা বুড়োকে বল্‌তে লাগ্‌ল "আচ্ছা গুলদাঁ তোমাকে ত ওয়াজিব লোক বলেই জানি, তুমিত কোনও কালেই নেপোলিয়নের দিকে ছিলে না—আজ হঠাৎ একেবারে ভোল বদ্‌লে তাঁর পক্ষ হয়ে প্রাণপণে লড়াই করা চাই বলে যে চেঁচাচ্ছ এটা কেমন ধারা হল বলতো। লড়াই করা কি বাপু আমাদের কাজ! আমরা কি সেই দরের লোক যে বন্দুক ঘাড়ে দিলেই সেপাই বনে যাব! আর গত দশ বৎসর ধরে আমরা যে ক্রমাগত ফৌজের জন্য লোক যুগিয়ে আস্‌ছি সেটা তাহ'লে কি হ'ল? প্রাণ্ডা যে মরে গেল তাতেও কি আশ মিট্‌ছে না? এখন যত সব ব্যারণ ডিউক আর কাউণ্ট (ক্যাৎ) বাহাদুরদের ঠেকো দিতে গিয়ে শেষকালে আমাদেরও কি রক্ত দিতে হবে?" গুলদাঁ বুড়ো কিন্তু তার আর কথা শেষ হতে দিলে না রেগে তার দিকে ফিরে বল্‌তে লাগ্‌ল "শোন বলছি এলিয়া ভাল চাওত মুখ সামাল দিতে শিখো। এখন [illegible] ন্যায় অন্যায় বিচার কর্‌বার সময় নাই এখন যাতে ফ্রান্স রক্ষা পায় তাই কর্‌তে হবে। আমি বাপু তোমাকে আগে থেকেই সাবধান করে দিলাম তুমি যদি কাউকে [illegible] মন্ত্র [illegible] দাও তোমার ভাল হবে না বলে [illegible]

বুঝলে তো। এখন আস্তে আস্তে পথ দেখ।" আরও জন কয়েক পুরানো সেপাই এসে আমাদের ঘিরে ফেললে। এমিয়া কোনও মতে সমুখের একটা গলিতে ঢুকে পড়ে সে যাত্রা বেঁচে গেল। তার পর কদিন ধরে নানা রকম ইস্তাহার জারি হতে লাগল। আর জাপাটি করে বেগার ধর্‌তে লাগল আর বাড়ী বাড়ী সব সরকারের লোক ঘুরে ঘুরে যত সব যন্তরপাতি খন্তা কোদাল ঠেলাগাড়ী বেবাক টেনে নিয়ে যেতে লাগল। সবাই আপন আপন বাড়ীতে চোর হয়ে বসে রইল। সরকারী লোকেরাই সর্ব্বময় কর্ত্তা। যা কিছু সবই যেন তাদেরই নিজস্ব। তবে দয়া করে একটা রসিদ দিতেন এই যা।

আমার লোহার গুদামে যা কিছু কাজের মত হাতিয়ার ছিল সব ক্রমে ক্রমে গড়ের দেওয়ালের উপর গিয়ে পৌঁছল ভাগ্যে আগেই বেশীর ভাগ বিক্রি করে ফেলেছিলাম তা না হলে এই সব কাগজের চিরকুটের বদলে মাল দিতে হলেই আমার সর্ব্বনাশ হতো আর কি!

মাঝে মাঝে মেয়ার মহাশয় এক এক বার বক্তৃতা কর্‌তেন আর সহরের শাসন কর্ত্তা মহাশয় বেশ মোটা সোটা লোকটি—মুখে ব্রনের দাগ—তিনিও যে বাসিন্দা লোকদের উপর খুসি আছেন তাও জানিয়ে দিতেন। এতেই পয়সা কড়ি দিয়ে সকলকার দাম মিটিয়ে দেওয়ার কাজ হয়ে যেত।

আমার যখন গাঁতি ঠেলাগাড়ী নিয়ে কাজ কর্ত্তে যাবার পালা এল আমি কারায়্যা বলে একজন কয়াতির সঙ্গে :বন্দোবস্ত করে ফেল্‌লাম সে আমার বদলে কাজ কর্ত্তে চলে গেল। বলদেখি একি কম আপদ। এমন হাঙ্গামা যেন আর কাকেও কখনও পোয়াতে না হয়।

ওদিকে গবর্ণর বাহাদুর আমাদের উপর যেমন হুকুম চালাতে লাগ্‌লেন ওদিকে তেমনি চাষাভুষাদের ধরে বেগার দেওয়ার জন্য পুলিশের দল অষ্ট প্রহর বাইরে [illegible] ঘুরতে লাগল। [illegible] বুর্গের রাস্তায় অত আর কিছু দেখ্‌বার যোটি ছিল না কেবল লম্বা লম্বা গাড়ীর সারি। সেই সব গাড়ীতে শুদ্ধ পুরানো পুরানো [illegible] গাছের গুড়ি বোঝাই। বোমা আটকাবার ঘর তৈয়ারী হবে বলেই এই সব কাঠের জোগার হতে লাগ্‌ল। আস্ত আস্ত গুড়ি সাজিয়ে বড় বড় বুরুজ বানান হবে আর তার উপরটাও ঐ রকম গুড়ি দিয়ে ছেয়ে ফেলে মাটি চাপিয়ে দেওয়া হবে। খিলান করা ছাদওয়ালা ঘরের থেকে এসব ঘর নাকি ঢের মজবুৎ। উপর থেকে যতই বোমা বৃষ্টি হতে থাকুক্ না কেন এর ভিতরে কোথাও একটু আঁচড় [illegible] চড়বে না। এ আমি পরে স্বচক্ষেই দেখেছি এই সব কাঠ আবার আর এক কাজেও লাগ্‌ত। গুড়ি গুলো কেটে উপর দিকটা ছুঁচলো করে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বেড়া তৈয়ারী হতো। গুলি চালাবার জন্য মধ্যে মধ্যে খুল খুলির [illegible] ফাঁক রাখা হত। লোকে এই গুলোকে বল্‌ত "পীলাক" কাঠগড়া।

এখনও মনে হয় সেই চাষীদের চীৎকার, ঘোড়ার চিঁহি, চাবুকের শব্দ সবই যেন ঠিক কানের গোড়ায় শুন্‌তে পাচ্ছি। রাত্রি দিন গোল মালের আর শেষ ছিল না।

এক এক বার মনে হত যে এ সময়ও যদি মনের [illegible] পিপে কয়টা এসে পড়ে তা হলে আর সে গুলো রক্ষা কর্‌বার জন্য বেশী কষ্ট পেতে হবে না। রাশিয়ান প্রাসয়ান কি অষ্ট্রীয়ানদের দল ঢুকে পড়ে যে আমার মদটি সাবাড় কর্‌বেন তা এখন আর বড় সহজ হয়ে উঠ্‌বে না।

এই ভেবেই যা একটু মনে শান্তি পেতাম। রোজ সকালে সর্ব্বে মনে কর্‌তো যে আজকেই বোধ হয় আমাদের চালান এসে পৌঁছাবে। একদিন শনিবারে আমাদের সকলেরই ইচ্ছা হল যে কেল্লার বুরুজে কি রকম কাজ চল্‌ছে একবার দেখে আসি। [illegible] এই সব কার্য্য নিয়ে গল্পগাছা কর্‌ছিল আর সকলে আমাদের ঘড়ি ঘড়ি এসে বল্‌ছিল [illegible] ওদের কাজ খুব এগিয়ে

চলেছে দেখে এলাম।" শেলা খানার সামনে বোমার ভিতর সব মশলা টশলা বারুদ টারুদ পুরছে কামান গুলো সব বার করেছে, গড়ের পাঁচিলের উপর সে গুলো টেনে টেনে তুলছে।

ছেলেটাকে আটকে রাখা মুস্কিল হয়ে পড়েছিল। এখন আর তার বাজারে গিয়ে বিক্রি কর্‌বার কিছুই ছিল না। আর বাড়ীতে আটক হয়ে চুপটি করে বসে থাকা তার পক্ষে ভারি কষ্টকর হয়ে পড়েছিল। সে সহরময় ছুটে বেড়াত আর বাড়ী এসে আমাদের সব খবর দিত। সেদিন সারি সারি বিয়াল্লিশটা কামান এক সঙ্গে সাজান হয়েছে আর পদাতিকদের বারিকে বুরুজের উপর তখনও কাজ চল্‌ছে শুনে আমি সল্লে‍র্কে বল্লাম "শালটা গায়ে জড়িয়ে নাও একবার গিয়ে কিহচ্ছে দেখে আসা যাক্।" প্রথমে আমরা নীচু রাস্তা ধরে ফরাসী দরওয়াজা পর্য্যন্ত নেমে গেলাম দেখ্‌লাম সেখানে মেৎসের রাস্তা ডাহিন দিকে আর পারীর রাস্তা বাঁ দিকে চলে গেছে সেই তেমাথা থেকে বুরুজের ঢালু পার বয়ে শত শত ঠেলা গাড়ী উপর পানে টেনে নিয়ে চলেছে।

উপরে অনেক জন মজুর সেপাই আর সহরের লোক মিলে প্রকাণ্ড একটা তেকোনা মাটির ঢিপি তৈয়ার করেছিল। লম্বায় চওড়ায় প্রায় দুশো ফিট্ করে আর উঁচুতে প্রায় পঁচিশ ফিট্ আন্দাজ। শুনলাম একজন ফৌজি ইঞ্জিনিয়ার দূরবীন দিয়ে দেখেছে যে সামনের ওই ছোট পাহাড়টা থেকে বুরুজের গোলাগুলি চালান যেতে পারে। সেই জন্য সকলে মিলে ঢিপিটা পাহাড়ের সমান উচুকরে গোটাদুই কামান বসাবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। দেখলাম সকলেই চারধারে এই সব কাজে ব্যস্ত। বুরুজের ভেতরটা মায় চৌতারা সামত ঘরের মত করে ক্রুরে চারিদিকে আটকান। ছাদটা প্রায় সাত ফুট উঁচুতে এমনি করে তৈরী যে একদম আসমান ছাড়া আর কোথাও থেকে তার উপর কিছু পড়বে এমন যোটি নাই। আরও দেখলাম যে ঘাসের চাপরা লাগান মাটির দেওয়াল কেটে কতক গুলা সরু সরু ঘুল ঘুলি তৈয়ার হয়েছে। ঘুল ঘুলির গর্ত্ত বাইরের দিক থেকে ছোট দেখায় বটে কিন্তু ভেতর দিকটা চওড়া দেখতে কতকটা ফনেলের মত। মস্ত মস্ত গাড়ীতে লাগান কামানের নল গুলো এই ছিদ্রের মধ্যেই লম্বা ভাবে লাগান রয়েছে ইচ্ছা করলেই সে গুলো সব দিকে উঠান লাগান ঘুরান ফিরান যায়। কামানের গাড়ীর পেছন দিকে আংটার সঙ্গে সব মোটা হাতল লাগান আছে তাই দিয়েই ইচ্ছা মত সেগুলিকে সড়াতে নড়াতে পারা যায়। এই আট চল্লিশ নম্বর কামান গুলো দাগা হলে কেমনতর শব্দ হয় তা আমি শুনিনি বটে কিন্তু মাচানের উপর যে ভাবে চড়ান রয়েছে তাই দেখেই সে গুলোর যে কি ভয়ানক শক্তি তা আমি কতকটা ধারণা কর্ত্তে পেরেছিলাম।

সল্লে‍র্ চারিধার দেখে বল্‌লে খাসা হয়েছে, খাসা তৈরী করেছে দেখছ। সে ঠিকই বলেছিল বুরুজের ভেতর দিকটা বেশ ভাল করেই সাফ্ করা ছিল। কোথাও একটা ঘাস পাতাও পড়ে ছিল না। আর একটা নুতন জিনিস নজরে পড়ল কামান গুলোর পাশে পাশে খুব উঁচু মাটি বোঝাই বস্তা চাপান, বুঝলাম গোলান্দা-জদের বাঁচাবার জন্যই এই ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু এসব খাটনি শুধু জলে ফেলা। এর কি আর কিছু মূল্য আছে। যখন মনে করি যে এই এক একটি কামান একবারকার দাগ্‌তে হলে এক একটি লুই মোহরের কম খর্চা পড়ে না তখন মানুষ হয়ে মানুষ মারবার জন্য যে কি খরচটা কর্ত্তে হয় তা বুঝতে পারা যায়।

শেষে দেখি সকলেই উঠে পড়ে গড়বন্দীর কাজে লেগে গিয়েছে আপন পাকা ফসল কাটবার সময়ও কর্ত্তাদের এমন করে খাটতে দেখি নাই। আমার অনেক বার মনে হয়েছে যে ফরাসী জাতটা যুদ্ধের পেছনে না লেগে যদি এত বুদ্ধি এত পরিশ্রম কৃষি ব্যবসা কি কল কারখানার উন্নতিতে লাগাতে পার্‌ত তা হলে ধনে অর্থে সুখে সৌভাগ্যে তাদের সঙ্গে আর কোনও দেশের

লোকের তুলনা হত না। কয়েক বছরের মধ্যেই ইংরাজ মার্কিনদের কোথায় ছাড়িয়ে চলে যেত। কিন্তু কাণ্ডটা দেখ কত পরিশ্রম করে কত খরচ বাঁচিয়ে যেই আমরা খাসা খাসা রাস্তা, বড় বড় সাঁকো, সুন্দর সুন্দর বন্দর, তৈরী করলাম খাল টাল সব কাটান হয়ে গেল, ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি হয়ে চারিধারকার ধন দৌলৎ দেশে এসে পড়তে লাগ্‌ল আর কোথা থেকে লড়াইএর ঝোঁক এসে ঘাড়ে চাপ্‌ল তিন চার বছরের মধ্যে বড় বড় ফৌজের কামান, গুলি বারুদ, লোক যোগতেই সর্ব্বনাশটা বেশ ভাল রকমই হয়ে গেল—যেমন দুদিন সুখ হয়েছিল এখন তেম্‌নি দুরবস্থা। কয়েকজন সেনাই মিলে হলেন দেশের কর্ত্তা তাঁরা মানুষকে মানুষ বলে জ্ঞান করেন না এমনি তাঁদের অহঙ্কার। যুদ্ধ হয়ে এই তো লাভ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগুরুদাস সরকার।

চয়ন—বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" নামক একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিয়াছেন। বঙ্গমাতার যে সমুদয় কৃতী সন্তান ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে গৌরব ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণী এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই সমুদয় পাঠ করিলে বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্রের উৎকর্ষ স্বতঃই উপলব্ধি হয় এবং প্রত্যেক বাঙ্গালীই তাহাতে বিশিষ্ট আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র বাবু প্রধানতঃ আধুনিক যুগের বাঙ্গালীর কথাই লিখিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন কালেও যে বাঙ্গালী স্বীয় দেশ হইতে বহুদূরে কীর্ত্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন, প্রাচীন শিলালিপি সম্যক্ আলোচনা করিলে সম্ভবতঃ তাহার প্রমাণ আবিষ্কৃত হইতে পারে। সম্প্রতি তিনখানি শিলালিপিতে আমি এইরূপ বিবরণ পাঠ করিয়াছি। নিম্নে ইহার সংক্ষিপ্ত-সার লিপিবদ্ধ করিলাম। যাঁহারা প্রাচীন লিপির আলোচনায় নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা সকলেই যদি এই বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া এইরূপ বিবরণগুলি প্রকাশিত করেন, তাহা হইলে বাঙ্গালীর একটি লুপ্ত প্রাচীন গৌরবের পুনরুদ্ধার সাধিত হইতে পারে।

১। বিশ্বেশ্বর শিবাচার্য্য।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কাকতীয় বংশের রাজগণ উড়িষ্যার দক্ষিণে বাঙ্গোপসাগরের উপকূলে বিস্তৃত রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। এই বংশের গণপতি-রাজ ৬২ বৎসরের অধিক কাল রাজত্ব করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, রুদ্রদেবী অথবা রুদ্রাম্বা নাম্নী তাঁহার কন্যা, রুদ্রদেব-মহারাজ এই পুরুষ-নাম ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহারই রাজত্বকালে ১২৬১ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজের গন্তুর জিলার অন্তর্গত গন্তুর তালুকের অধীনস্থ মাল্‌কাপুরম্ নামক স্থানে স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ লিপি হইতে বিশ্বেশ্বর শিবাচার্য্যের বিবরণ অবগত হওয়া যায়।(১)

লিপিতে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে যে বিশ্বেশ্বর শিবাচার্য্য গৌড় দেশের অন্তর্গত রাঢ়া প্রদেশের পূর্ব্বগ্রাম নামক স্থানের অধিবাসী, সুতরাং তিনি যে বাঙ্গালী তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইনি ধর্ম্মশম্ভু নামক শৈব গুরুর নিকট দীক্ষা লাভ করিয়া বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কাকতীয়-রাজ, মালব-রাজ, কলচুরি-রাজ,

(১) মূল লিপিখানি এখনও প্রকাশিত হয় নাই। ১৯১৫—১৯১৬ সালের দক্ষিণ বিভাগের আর্কিওলজিক্যাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের বার্ষিক রিপোর্ট (৪৪ পৃঃ) ও ১৯১৭ সালের গভর্ণমেণ্ট এপিগ্রাফিষ্টের রিপোর্টে (১২২ পৃঃ) ইহার মর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছে।

ও চোল-রাজ এবং অন্যান্য রাজগণ ইঁহার মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। কাকতীয়-রাজ গণপতি নিজেকে ইঁহার পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার রাজত্বকালে বিশ্বেশ্বরের বিশেষ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ছিল এবং বাঙ্গালা দেশের বহু শৈবাচার্য্য ও কবি কাকতীয়-রাজ কর্ত্তৃক বিশেষভাবে পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। লিপিখানিতে উক্ত হইয়াছে যে আলম্বিত কর্ণভূষণ, কণ্ঠহার ও হেম-মণ্ডিত জটাধারী, প্রতিভা-দীপ্ত মুখমণ্ডল বিশ্বেশ্বর-শম্ভু যখন গণপতি রাজার প্রাসাদে বিশ্রামগুপে উপবিষ্ট থাকিতেন, তখন তিনি একটি বিশেষ দর্শনীয় বস্তু বলিয়া গণ্য হইতেন। ১১৮৩ শকাব্দে (১২৬১ খৃষ্টাব্দে), রাণী রুদ্রদেবী আচার্য্য বিশ্বেশ্বর-শম্ভুকে কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ তীরস্থ মন্দর ও অন্যান্য কয়েকখানি গ্রাম ও কিঞ্চিৎ ভূমি দান করেন। মন্দর নামক গ্রামে আচার্য্য কর্ত্তৃক একটি শিবমন্দির, মঠ ও অন্নসত্র স্থাপিত হয়। তিনি ঐ গ্রামে বহু ব্রাহ্মণ পরিবার প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া উহাকে "বিশ্বেশ্বর গোলকী" নাম প্রদান করেন। কাকতীয় রাণীর নিকট হইতে তিনি যে ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ ষাটটি দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ পরিবারের মধ্যে বিতরণ করেন। অবশিষ্ট সমান তিন ভাগ করিয়া, প্রথম ভাগ শিব মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ, দ্বিতীয় ভাগ শুদ্ধ শৈবগণের মঠ ও ছাত্রগণের ভরণপোষণের নিমিত্ত এবং তৃতীয় ভাগ একটী মাতৃমন্দির, একটি আরোগ্য চিকিৎসালয় ও একটী অন্নসত্রের ব্যয় বহন করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া যান। ঋক্, যজু ও সাম বেদ পড়াইবার নিমিত্ত তিন জন এবং ন্যায়, সাহিত্য ও আগমের নিমিত্ত পাঁচজন অধ্যাপক ছিলেন। এতদ্ব্যতীত একজন সুদক্ষ চিকিৎসক ও একজন হিসাব রক্ষকও নিযুক্ত হইয়াছিল। ইঁহাদের প্রত্যেকের জন্য দুই পুট্টি ভূমি বরাদ্দ ছিল। মন্দিরে দশজন গায়িকা ও আটজন বাদ্যকর ছিল। মঠ ও অন্নসত্রে একজন কাশ্মীর দেশীয় গায়ক, [illegible]জন গায়িকা, [illegible]জন নর্ত্তকী, দুইজন পাচক ব্রাহ্মণ, চারিজন ভৃত্য, [illegible] [illegible] ভৃত্য ও দশজন বীরভদ্র ছিল। এই বীরভদ্রগণ গ্রামের পাহারায় নিযুক্ত থাকিত এবং গ্রামের রক্ষার নিমিত্ত আবশ্যক হইলে উদর, জিহ্বা ও মস্তক কর্ত্তন করিত। এতদ্ব্যতীত বিশজন বীরমুষ্টি ভৃত্য ছিল। ইহারা শিবপন্থী, এবং স্বর্ণকার, তাম্রকার, কর্ম্মকার, রাজমিস্ত্রী, কুম্ভকার, স্থপতি, সূত্রধর, নাপিত ও শিল্পীর কার্য্য করিত। উল্লিখিত একাশী জন প্রত্যেকে এক পুট্টি করিয়া জমি পাইত। এতদ্ব্যতীত বিশ্বেশ্বর আচার্য্য স্বীয় জন্মভূমি পূর্ব্বগ্রাম নিবাসী ৩০ জন শ্রীবৎস গোত্র ও সামবেদী ব্রাহ্মণকে তৎপ্রতিষ্ঠিত গ্রামের আয়ব্যয়-পরীক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং ইঁহারা প্রত্যেকেই এক পুট্টি জমি দান করিয়াছিলেন। অন্নসত্রে যাহাতে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল নির্ব্বিশেষে সকলেই সকল সময়ে আহারাদি পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা ছিল। মন্দির, অন্নসত্র, মঠ ও গ্রাম—এই সমুদয়ের কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য একশত নিষ্ক বেতনে সর্ব্বোপরি একজন অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই অধ্যক্ষ তাঁহার কার্য্যে অবহেলা করিলে, অথবা অন্য কোনরূপ কুব্যবহার করিলে, স্থানীয় শৈব সম্প্রদায় একযোগে তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া অন্য অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতে পারিবেন এইরূপ নির্দ্দিষ্ট ছিল।

উল্লিখিত মহদনুষ্ঠান ব্যতীত বিশ্বেশ্বর আচার্য্য আরও নানা স্থানে মঠ, শিবলিঙ্গ ও অন্নসত্র প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং তৎসমুদয়ের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ জমি দান করিয়াছিলেন। নিজের নামানুসারে তিনি "বিশ্বেশ্বরনগর" নামক একটি নগর ও "বিশ্বেশ্বরলিঙ্গ" নামক একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রায় সাত শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার এই কর্ম্মবীর, সুদূর দাক্ষিণাত্যে গৌরবময় রাজগুরু পদে অভিষিক্ত থাকিয়া, এই সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পাদন করতঃ বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন।

২। ঈশান শিব।

প্রাচীন পঞ্চাল দেশের অন্তর্গত, যুক্তপ্রদেশস্থ বদাউন নামক স্থানে প্রাপ্ত একখানি শিলালিপিতে (২) আর একজন বাঙ্গালী শৈব সাধকের পরিচয় পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পঞ্চাল দেশে রাষ্ট্রকুট বংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন। ঈশান শিব নামক গৌড়দেশীয় একজন শৈব সাধক এই বংশের দশম রাজা অমৃতপালের গুরু এবং একটি মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি বৎসভার্গব গোত্রীয় এবং ভার্গব, চ্যবন আপ্নুবান, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এই পঞ্চ প্রবরযুক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। সরস কদলীদণ্ডবৎ অসার সংসার ত্যাগ করিয়া তিনি পরমাত্মার ধ্যানে নিযুক্ত হন। কালক্রমে তিনি রাজগুরু ও মঠাধ্যক্ষ পদে অভিষিক্ত হইয়া, একটি শিবমন্দির নির্ম্মাণ করেন। মন্দিরের বর্ণনাচ্ছলে উক্ত হইয়াছে যে, মহাদেব কৈলাসগমনে বিমুখ হইয়া ঐ মন্দিরেই বসতি করিতে এবং সূর্য্যদেব অবিরত আকাশমার্গে পরিভ্রমণে ক্লান্ত হইলে মুহূর্ত্তের জন্য ইহার উচ্চচূড়ায় বিশ্রাম লাভ করিতে পারিতেন।

বিশ্বেশ্বর আচার্য্য ও ঈশান শিবের জীবনী আলোচনা করিলে ইহা সহজেই অনুমিত হয় যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালায় শৈব ধর্ম্মের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল এবং শৈব সম্প্রদায়ভুক্ত বাঙ্গালী ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেন।

৩। গদাধর।

আগ্রা জিলার অন্তর্গত বটেশ্বর নামক স্থানে প্রাপ্ত এবং চান্দেল্লরাজ পরমর্দ্দিদেবের রাজত্বকালে ১২৫২ সংবতে (১১৯৫ খৃঃ অঃ) উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপির (৩) নিম্নলিখিত কয়েকটী শ্লোকে আগ্রা প্রদেশস্থিত একটি বাঙ্গালী পরিবারের পরিচয় পাওয়া যায়।

"গৌড়ান্বয়ৈক তিলকস্য গদাধরাখ্যো
লক্ষ্মীধরস্য তনয়ঃ কবিচক্রবর্ত্তী।
বিদ্যাবতাং স পরমঃ পরমর্দ্দিদেব
সংধানবিগ্রহ মহাসচিবো বভূব॥
তস্যাত্মজো দেবধরঃ কবীন্দ্রঃ
প্রশস্তিমেতামতুলাঞ্চকার।
অস্যানুজো ধর্ম্মধরশ্চ ধীরঃ
কুতুহলাদ্বাসকবিল্লিলেখ॥

এই শ্লোকদ্বয় হইতে জানিতে পারা যায় যে, গৌড়দেশীয় লক্ষ্মীধরের গদাধর নামক এক পুত্র ছিল। ইনি কবি ও বিদ্বান্ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন এবং চান্দেল্লরাজ পরমর্দ্দিদেবের সান্ধি-বিগ্রাহিক এই নামধের সম্মানিত ও ক্ষমতাযুক্ত প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার পুত্র দেবধরও একজন উৎকৃষ্ট কবি ছিলেন এবং পূর্ব্বোল্লিখিত লিপিখানি তাঁহারই রচনা।

যে সময় বাঙ্গালা দেশ উপযুক্ত রাজনীতিজ্ঞের অভাবে ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইয়া যবনগণের পদানত হইতেছিল, ঠিক সেই সময়েই একজন বাঙ্গালী সুদূর আগ্রা প্রদেশে সান্ধিবিগ্রাহিক নামক উচ্চ অমাত্য-পদে অভিষিক্ত ছিলেন।

(মানসী ও মর্ম্মবাণী) শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার।

শরতে।

শরত রাতে কোন অতিথি
এলগো মোর দ্বারে?
পরাণ আমার উতল হল
তারি বীণার তারে।
শিউলী ফুলে পরশ তারি,
নীল আকাশে আঁখি

---

(২) এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, ১ম সংখ্যা, ৬৫ পৃঃ।
(৩) এপিগ্র্যাফিয়া ইণ্ডিকা, ১ম সংখ্যা ২১১ পৃঃ।

কাশের বনে, চামর দোলে,
বন্দনা গায় পাখী !
শিশির ফোটায় অশ্রু কি তার ?
কমল দলে প্রাণ ?
ধানের ক্ষেতে শিউরে উঠে
ঢেউ দোলানো গাণ।
বাজেরে মোর হিয়ায় বাজে
সেই অতিথির বাঁশী,
দ্বারে যে তার পায়ের ধ্বনি,
বাইরে যে তার হাসি !

শ্রীআশুতোষ রায়।

ক্রম বিকাশ।

এই প্রশ্ন অনেকেরই মনে উদয় হয় যে বিভিন্ন জাতীয় প্রাণী এবং বৃক্ষ গুল্ম কিরূপে উদ্ভূত হইল। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী বিভাগ কি জন্ম হইতেই হইয়াছে কিম্বা এক শ্রেণী স্থান কাল ও অবস্থার পরিবর্ত্তনে বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। ইহা বস্তুতঃই একটী জটিল প্রশ্ন এবং ইহার মীমাংসা করাও সুকঠিন। এরিষ্টটেল (Aristotle) বলিয়াছেন যে সামান্য গুল্ম হইতে উচ্চ শ্রেণীর জীবের মধ্যে এরূপ একটী সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় যাহাতে উহাদের মূল উপাদান এক বলিয়া মনে হয়।

বনেট (Bonnet) এই মত পোষণ করেন। বনেটের "প্রাকৃতিক চিন্তা" নামক পুস্তকে (Contemplation of Nature) দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন কিরূপে নিম্ন শ্রেণীর প্রাণী উচ্চ শ্রেণীতে উপনীত হওয়া সম্ভব। লেমার্কও (Lamarck) এই মত সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি মনে করেন যে কয়েকটি মূল জীব হইতে অন্যান্য জীবের উদ্ভব হইয়াছে। লেমার্ক বস্তুতঃপক্ষে উদ্ভিদজগৎ এবং ক্ষুদ্র জীব সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়াছেন। উদ্ভিদজগতে ইহা দেখা যায় যে অনেক উদ্ভিদ মূলতঃ এক উদ্ভিদ হইতে উৎপন্ন হইয়া বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। চেষ্টাদ্বারা উদ্ভিদের আকার ফুল ফল ইত্যাদির পরিবর্ত্তন করা যায়।

জন হান্টারের (John Hunter) সময় হইতে ইহা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে যে জীবজগতে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীর অস্থির গঠন প্রণালী মূলতঃ একই প্রণালীর। বাদুরের পাখা, বেঙ্গের ঠেঙ্গ, অশ্বের পা, মানুষের হাত এবং মৎস্যের ডানার অস্থি অনেকটা এক ছাচের। কেবল উহারা বিভিন্ন কার্য্য সম্পাদন করে বলিয়া উহাদের আকার বিভিন্ন হইয়াছে, আবার কোন কোন প্রাণীর এরূপ অঙ্গও দেখা যায় যাহা তাহাদের কোন কাজেই আসে না কেবল উহার অনুরূপ শ্রেণীর মধ্যে ঐ সব অঙ্গ কার্য্যকরী দেখা যায়। যে অঙ্গের কার্য্য নাই তাহা থাকিবার তাৎপর্য্য কি ? অন্যান্য স্তন্যপায়ী জন্তুর মত তিমি মৎস্যেরও দন্ত দেখা যায় কিন্তু উহা চোয়ালের অস্থিতে সম্বদ্ধ নহে। সেরূপ বৃহৎ বোরা সর্পের (Boa constrictor) চর্ম্মাচ্ছাদিত পেছনের পা বর্ত্তমান আছে কিন্তু তাহা কখন বৃদ্ধি পায় না। যদি ভগবান এ সকল প্রাণীকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভাবে সৃজন করিয়া থাকেন তাহা হইলে ঐ সকল অকর্ম্মণ্য অঙ্গ দেওয়ার প্রয়োজন কি ? কোন কোন বংশে দেখা যায় পিতা পিতামহের অঙ্গে কোন তিল কিম্বা বিশেষ কোন চিহ্ন থাকিলে সন্তান সন্ততিগণও তাহা পাইয়া থাকে। সেইরূপ তিমি ও বোরা সর্প যে তাহাদের আদি পুরুষের কার্য্যকরী অঙ্গের পরিবর্ত্তে বর্ত্তমানে অকর্ম্মণ্য চিহ্ন মাত্র ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করে নাই তাহা কে বলিতে পারে ?

ভন বেয়ার (Von Baeyr) আর একটী বিশেষ বিষয়ের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, অতি ক্ষুদ্র ভ্রূণাবস্থাতে উচ্চ শ্রেণীর প্রাণী ও সরীসৃপের মধ্যে

কোন বৈষম্য লক্ষিত হয় না। যদি প্রাণী ভিন্ন ভিন্ন আকারেই সৃষ্ট হইয়া থাকে তাহা হইলে ভ্রূণাবস্থাতে কুকুর, মৎস্য কিম্বা পাখীতে কোন বৈষম্য নাই কেন?

এ ত গেল জীবিত প্রাণী সম্বন্ধে, এখন পুরাতন যুগের প্রস্তরীভূত অস্থিপুঞ্জে আমরা কি দেখিতে পাই তাহারই আলোচনা করিব। এইস্থলে ইহাও বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন জীবের অবস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। কেবলমাত্র অষ্ট্রেলিয়াতে কেঙ্গেরু এবং থলি বিশিষ্ট জীব দেখিতে পাওয়া যায়। সেইরূপ কেবল মাত্র আমেরিকাতে স্লথ পাওয়া যায়। আবার অষ্ট্রেলিয়াতে যে সকল প্রস্তরময় কঙ্কাল পাওয়া যায় তাহারাও থলিবিশিষ্ট জীব ছিল কিন্তু এখন তাহাদের বংশ বিলোপ হইয়াছে। সেইরূপ ইউরোপেতেও যে সকল কঙ্কাল পাওয়া যায় সেই জাতীয় জীব এখন বর্ত্তমান নাই। এখন প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌গণ জিজ্ঞাসা করেন যে বর্ত্তমানে অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা কিম্বা ইউরোপে যে সকল প্রাণী বর্ত্তমান আছে তাহারা ঐ পুরাকালের প্রস্তরীভূত কঙ্কালাবশিষ্ট জীবগণের বংশধর কি না? কিন্তু বর্ত্তমানে ও অতীতে এই আকার বৈষম্য কিরূপে হইল? সেইরূপ বর্ত্তমানে যে সকল গরু, শূকর কিম্বা নেকড়া বাঘ দেখিতে পাওয়া যায় তাহারা প্রস্তরময় কঙ্কালে পরিণত গরু, শূকর কিম্বা নেকড়ার বংশধর কি না?

প্রাণীতত্ত্ব বিদ্যার যতই আলোচনা করা যায় ততই প্রতীয়মান হয় যে অতীত কাল হইতে বর্ত্তমান কালের জীবগণের আকার বৈষম্যের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমোন্নতি হইতেছে। অতি প্রাচীন স্তরে যে সকল প্রস্তরীভূত কঙ্কাল আছে তাহাতে শম্বুক, মৎস্য ইত্যাদি জলচর ভিন্ন বানর কিম্বা কোনরূপ চতুষ্পদের চিহ্ন পাওয়া যায় না। আবার পূর্ব্বোল্লিখিত মৎস্য কঙ্কালের মৎস্যও বর্ত্তমানে দেখা যায় না। ইহার কিঞ্চিৎ উপরের স্তরে নানাবিধ প্রচুর মৎস্য কঙ্কাল পাওয়া যায়। আরও কিঞ্চিৎ উপরে পদবিশিষ্ট জীবের পদচিহ্ন দেখা গিয়াছে এবং ভেক জাতীয় একরূপ প্রাণীর কঙ্কালও পাওয়া গিয়াছে।

ক্রমান্বয়ে মৎস্যের আধিপত্য ক্রমে কমিয়া গিয়া কুম্ভীর ও সর্প জাতীয় প্রাণীর আবির্ভাব হয়। ইহার পরে বাদুরের মত পক্ষবিশিষ্ট সরীসৃপের উদ্ভব হয়। ইহাদের এক ডানা হইতে অপর ডানা পর্য্যন্ত বিস্তার প্রায় ১৬ ফিট ছিল। ইহারা নির্ব্বিবাদে বিচরণ করিত সন্দেহ নাই, কারণ তখন তাহাদিগকে হনন করিবার কেহ ছিল না। ইহার কিছু উপরের স্তরে দুই শ্রেণীর কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। এক শ্রেণীর প্রাণী প্রায় কবুতরের সমান; উহার অর্দ্ধেক সরীসৃপ ও অর্দ্ধেক পাখীর আকৃতি এবং অপর জাতীয় প্রাণী ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইতে আরম্ভ করিল এবং চতুষ্পদীর প্রভাব বাড়িতে লাগিল।

প্রায় ঐ সকল স্তরে কুভিয়ার (Cuvier) প্যারিসের নিকটে অতিকায় হস্তী জাতীয় প্রাণীর কঙ্কাল প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহার সমসাময়িক স্তরে প্রথম বানর জাতীয় প্রাণী পাওয়া যায়।

ভূগর্ভে কঙ্কাল প্রাপ্তির ইহাই মোটামোটি বর্ণনা। অতি প্রাচীনকালে নিম্নশ্রেণীর এবং ক্রমেই উচ্চশ্রেণীর প্রাণীর কঙ্কাল ভূস্তরে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ইহাও লক্ষ্য করা গিয়াছে যে এক স্তরের প্রাণীসমূহ প্রায় এক আদর্শের এবং উহা হইতে নব্য স্তরের প্রাণীর আকৃতি অন্যরূপ। যে সকল স্তরে কঙ্কাল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যবর্ত্তী স্তরেও প্রাণী বিদ্যমান ছিল তাহার সন্দেহ নাই। কাজেই মধ্যবর্ত্তী স্তরের প্রাণী কঙ্কাল না দেখিলে প্রাচীন ও নূতন স্তরের প্রাণীর সম্বন্ধ স্থির করা দুষ্কর। তথাপি আমেরিকায় সরীসৃপ-পাখীর (Reptile birds) কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। উহাদের অস্থি পাখীর মত কিন্তু চোয়াল এবং দন্ত সরীসৃপের মত। আমেরিকার প্রস্তর স্তূপে এরূপ প্রাণীও দেখা গিয়াছে যে অশ্ব জাতীয় জন্তুর খুর দ্বিখণ্ডিত এবং উহার উপরন্তু

...ঐ দ্বিখণ্ডিত খুর যেন একীভূত হইয়া আমাদের বর্ত্তমান অশ্ব খুরের আকার ধারণ করিতেছে এরূপ অবস্থাও দেখা গিয়াছে।

এই রূপ পরিবর্ত্তন কেন হইয়া থাকে ইহার মীমাংসা করা শক্ত। প্রথিত নামা প্রাণীতত্ত্ববিদ্ ডারুইন (Darwin) এবং ওয়ালেস (Wallace) ইহার উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দিতে পণ্ডিত ডারুইন তাঁহার প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনবাদ প্রচার করেন। ১৮৩১ সনে ডাক্তার ডারুইন তাঁহার ২২ বৎসর বয়সে বিগিল্ নামক জাহাজে দক্ষিণ আমেরিকার তীর দেশ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন। সে সময়ে তিনি নানা দেশের জীবজন্তু সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ ও পর্য্যালোচনা করিবার সুযোগ পান। ১৮৫৯ সনের নবেম্বর মাসে তিনি জীবের বিভিন্ন শ্রেণীর উৎপত্তি (Origin of Species) সম্বন্ধে এক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রনয়ন করেন।

প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন সম্বন্ধে আমরা একটু চিন্তা করিলেই দেখিতে পারি যে জীবগণ এরূপ ভাবে বর্দ্ধিত হয় যে যদি উহাদের ধ্বংস না হইয়া কেবল বৃদ্ধিই হইত তাহা হইলে এক জাতীয় জীবেরই পৃথিবীতে স্থান হইত না। খাদ্যাভাবের ত কথাই নাই। উদাহরণ স্বরূপ দেখিতে গেলে একমাত্র মৎস্যই যদি নির্ব্বিবাদে বর্দ্ধিত হইত তাহা হইলে নদী নালায় মৎস্যের স্থান সঙ্কুলান হওয়া অসম্ভব হইত। কাজেই নানা কারণে শিশু অবস্থাতে বহু মৎস্য মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহারাই বংশ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ দুইটী জীবিত প্রাণী কখনও একরূপ হয় না। অথচ প্রত্যেক প্রাণীই তাহাদের পিতা মাতার দোষ গুণ ও স্বভাব অল্পাধিক পাইয়া থাকে। এখন মনে করুন দুইটী পাখীর শাবক জন্মিয়াছে; উহাদের একটী সবল এবং অপরটী দুর্ব্বল। সবল শাবক উড়িয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিল কিন্তু দুর্ব্বলটী উড়িতে অক্ষম। কিন্তু দুর্ব্বলের পালকের রং ঘাসের মত হওয়াতে উহা কোনপ্রকারে পেচক প্রভৃতি শত্রুর চক্ষের অন্তরালে থাকিয়া জীবন নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। সময়ে দুর্ব্বল ও সবল শাবকদ্বয়ের দুই শাখা হইতে দুই শ্রেণীর পাখীর উৎপত্তি হইতে লাগিল। উহাদের এক শাখা খেচর এবং অপর শাখা ভূচর। সঙ্গে ২ উভয়ের প্রকৃতি ও আকৃতিও বৈষম্য হইতে আরম্ভ হইল। কবুতর ইহার আর একটী উদাহরণ। এক পার্ব্বত্য কবুতর হইতে বর্ত্তমানে এত বিভিন্ন জাতীয় কবুতরের সৃষ্টি হইয়াছে।

জীব জন্তুর বৃদ্ধি সম্বন্ধে ওয়ালেস্ (Mr. Wallace) বলিয়াছেন যদি এক জোড়া পাখীতে বৎসর দুই জোড়া বাচ্চা দেয় তবে নির্ব্বিবাদে বৃদ্ধি পাইতে পারিলে ১৫ বৎসরে ২০ কোটি পাখীর উৎপত্তি হইবে। এবং হাক্স্লি (Mr. Hunby) বলিয়াছেন যে বৃক্ষে বৎসরে ৫০টী বীজ উৎপন্ন হয় যদি উহা নির্ব্বিবাদে বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে ৯ বৎসরে পৃথিবীতে অপর বৃক্ষের স্থান হওয়া দুষ্কর।

এই সকল কারণেই উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতে আত্মরক্ষার্থে নিজেদের মধ্যে ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হয়। সেই সংগ্রামে যে জয়লাভ করে সে অপরকে ধ্বংস করিয়া নিজ প্রাধান্য স্থাপন করে। এই জীবন সংগ্রামে একদল জয়ী হইয়া ক্রমোন্নতি লাভ করে এবং বিজেতাগণের অপকর্ষতা কিম্বা ধ্বংস হইয়া থাকে। এই উৎকর্ষতা ও অপকর্ষতার দরুণ ক্রমে আকৃতি ও প্রকৃতি বৈষম্য হইয়া থাকে। তখন মূলতঃ এক বংশজাত জীব দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া দুই শ্রেণীতে পরিণত হয়। ইহাকেই ক্রমবিকাশ বা অভিব্যক্তিবাদ বলা হইয়া থাকে। এই প্রণালী দ্বারাই প্রটপ্লোজেম (Protoplzem) হইতে উদ্ভিদ, উদ্ভিদ হইতে নিম্ন শ্রেণীর জীব এবং ঐ জীব উন্নতি লাভ করিয়া উচ্চ শ্রেণীতে পরিণত হয়। সে জন্যই পৃথিবীর সর্ব্ব নিম্ন স্তরে যে সকল জীব পাওয়া যায় তদূর্দ্ধে তাহা হইতে উন্নত জীবের কঙ্কাল দৃষ্ট হয় এবং

ক্রমে তাহা হইতেও উন্নত জীবের পঞ্জর সৃষ্ট হইয়া থাকে।

বর্ত্তমানে ডাক্তার জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদের প্রাণের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। সময়ে উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে এরূপ একটী নিকট সম্বন্ধ বাহির হইবে যাহা দ্বারা ক্রম-বিকাশবাদ আরও সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইবে। প্রাণীর প্রথম উদ্ভব হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত কত লক্ষ লক্ষ বৎসর অতীত হইয়াছে তাহা কে বলিতে পারে? কাজেই ক্রমবিকাশের শৃঙ্খল কতবার ছিন্ন হইয়াছে তাহার অবধি নাই। সেই জন্য বর্ত্তমানে যুক্তি ও অনুমানের উপরে অনেক নির্ভর করিতে হয়।

শ্রীহরিচরণ গুপ্ত।

শিক্ষারহস্য।

শিক্ষা মানব জাতির সর্ব্বপ্রকার উন্নতির মূল। কর্ম্মক্ষেত্রে, বাণিজ্য ক্ষেত্রে, রণক্ষেত্রে কি ধর্ম্মক্ষেত্রে সর্ব্বত্র শিক্ষাই মানবকে সফলতার কনক কিরীটে মণ্ডিত করে। জাতিভেদে ধর্ম্মের প্রকার ভেদের ন্যায় দেশ, কাল ও সমাজ ভেদে শিক্ষাপদ্ধতি স্বতন্ত্র হইলেও উহার প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বত্র সমভাবে অনুভূত হয়। শিক্ষা শব্দে নিয়মিত অভ্যাস বুঝায়, বিদ্যাভ্যাসের ন্যায় কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট বিশিষ্ট নিয়মের অধীন থাকিয়া যে কোন বিষয়ের অভ্যাসকে শিক্ষা বলা যাইতে পারে। এই ভাবে যোগাভ্যাস বা যোগ শিক্ষা, যুদ্ধাভ্যাস বা যুদ্ধ শিক্ষা প্রভৃতি কথা চির প্রচলিত রহিয়াছে। জীবনের সকল অংশেই সময় ও সুযোগমত উপস্থিত যে কোন বিভাগের প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহকে আয়ত্ত করিবার প্রকৃত চেষ্টা শিক্ষার নামান্তর। পণ্ডিতবর এমর্সন্ (Emerson) বলেন "Education should be as broad as man" অর্থাৎ, মানব জীবন যতটা প্রশস্ত শিক্ষার তত প্রসার হওয়ার দরকার। সুতরাং বাল্যে বিদ্যারম্ভের দিন হইতে অন্তিমে সংজ্ঞালোপের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত শিক্ষার নিয়মিত কাল। এজন্য শাস্ত্রে দেখা যায় "অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থং চিন্তয়েৎ।" রহস্য প্রিয় সমালোচক ইহার উপর একটু টীকা করিয়া বলিয়াছেন; "আস্থা হাস্যায় বৃদ্ধত্বে" বৃদ্ধ বয়সে শাস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা উপহাসের কারণ। উপহাসের ভাষাটা বোধহয় "নড়্‌তে নারে বন্দুক ঘাড়ে"। যাহ'ক নবম বা দশম দশায় অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষাটা আমাদের দেশে উপহাস্য হইলেও শাস্ত্রশিক্ষা বা যে কোন বিদ্যাভ্যাস চির বরণীয়। প্রাচীন কালের পাঠ্য তালিকার (Syllabus) প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে স্থূলতঃ এ কয়টী বিষয় তৎকালের পাঠ্য রূপে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। আন্বীক্ষিকী (Logic and Metaphysics), ত্রয়ী (the triple Veda), বার্ত্তা (Practical arts such as agriculture; commerce, medicine etc.) দণ্ডনীতি (the science of Government)। কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী কালে এই তালিকা একটু বাড়াইয়া চারিটীর স্থলে ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব্ব এই ৪ বেদ, শিক্ষা (স্বরের উচ্চারণ পদ্ধতি), কল্প (অনুষ্ঠানের নিয়ম), ব্যাকরণ (শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় বিভাগ নির্দ্দেশক), নিরুক্ত (বৈদিক অভিধান), ছন্দঃশাস্ত্র ও জ্যোতিষ এই ৬ ছয় বেদাঙ্গ, পূর্ব্ব বা কর্ম্ম মীমাংসা, উত্তর বা ব্রহ্ম মীমাংসা এই ২ দর্শন, ধর্ম্মশাস্ত্র (স্মৃতি) ও পুরাণ এই দুইটী মিলিত হইয়া চতুর্দ্দশটী হইয়াছে। দেশের প্রজাবৃদ্ধি ও সমাজে প্রয়োজন মত আয়ুর্ব্বেদ (চিকিৎসা শাস্ত্র), ধনুর্ব্বেদ (শাস্ত্রবিদ্যা), গান্ধর্ব্ববেদ (সঙ্গীত বিদ্যা), অর্থশাস্ত্র ও চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যার সুদীর্ঘ কর্ষণাও

...বালিকার পুষ্টি বর্দ্ধন করিয়াছে। এক্ষণে কলির শত ... পরিমিত পরমায়ু বিশিষ্ট অন্নচিন্তা জর্জ্জরিত একজন ... যদি অন্ততঃ উল্লিখিত বিষয় সমূহের স্থূল স্থূল তথ্য ...র যথাযথ অভ্যাস ও আয়ত্ত করিতে হয়, তাহাহইলে ... পরিশ্রম, স্বাস্থ্য, বুদ্ধি, অধ্যবসায়, ও প্রতিভার ...তাহা বুদ্ধিমান মাত্রেই সহজে বুঝিয়া থাকেন। ...কালে আজ কালকার মত দেশে দেশে, নগরে নগরে ...কারী অর্থ সাহায্যে অথবা সাধারণের অর্থে ...চালিত এত বিদ্যালয়ের বাহুল্য না থাকায় ছাত্র ... গুরুগৃহে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে হইত। ...দী ফল মূলাশী তপস্বী গুরু নামে মাত্র উহাদের ...দাতা হইলেও কার্য্যতঃ ছাত্রগণই অরণ্য সুলভ কষ্টে, ... মূল ও শাক নিবারাদি আহরণ করিয়া নিজেদের ... অধ্যাপক বর্গের দৈনিক আহার্য্যের সংস্থান ...তেন। তপো নিরত শাস্ত্রচিন্তা ব্যাপৃত ছাত্র বৎসল ...বাসনা হীন নির্ম্মল চিত্তে প্রতিভাত তত্ত্বনিয়ম ... স্বাবলম্বী জিতেন্দ্রিয় বিনয়ী ছাত্র সংঘকে উপদেশ ... পরমানন্দে কালাতিপাত করিতেন। দৈনন্দিন ...নীয় দ্রব্য সম্ভার সংগ্রহের জন্য দৈহিক পরিশ্রম ...য়া নিয়মিত ব্যায়াম চর্চ্চার ফলভাগী ও স্বাবলম্বী ...তেন, অপর দিকে মহর্ষি আচার্য্যবৃন্দও তেমনি ...দের আহার্য্যাদি আহরণ চিন্তাবিযুক্ত হৃদয়ে সানন্দে ...র্য্যায়, শাস্ত্র চিন্তায়, ও অধ্যাপনায় ব্যাপৃত থাকিয়া ... জ্ঞান ও ধ্যান ধারণার উত্তম সুযোগ পাইতেন। ...মার বিদ্যার্থিদের পক্ষে বিদ্যা শিক্ষার পথ এতাদৃশ ...কার কথা আমরা ভারতেতর দেশেও শুনিতে ...। প্রাচীন গ্রীসের বিখ্যাত দার্শনিক পিথাগোরাসের ... উপদেশার্থীকে সপ্তাহকাল মৃত্তিকার নিম্নে অন্ধকার ... অবরুদ্ধ থাকিতে হইত। এই দুঃখ বহুল অবরোধের ... যে শিক্ষার্থী তাঁহার নিকট বিদ্যা লাভের আকাঙ্ক্ষা ... করিতেন, তিনিই কেবল তাঁহার শিষ্যত্ব লাভের ... ভাজন হইতেন। জ্ঞান বা বিদ্যা অমরত্ব লাভের নিদান। উহা লাভ করিতে হইলে ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্ম দেবের ন্যায় কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করিতে হয়।

সংসারের কোলাহল হইতে দূরে অবস্থিত শান্ত তপোবনের ছায়াস্নিগ্ধ নিভৃত পর্ণ নিকেতনে কৃতনিবাস বল্কলবাস কুলপতি ঋষির পাদমূলে উপবিষ্ট আকুমার ব্রহ্মচারী বনচারী বিদ্যার্থিবৃন্দের বিদ্যাভ্যাস কিরূপ রমনীয় ও মনোমদ ছিল, তাহা অধুনা বিলাস সহচরী বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষার প্রসাদপুষ্ট তথা কথিত শিক্ষিতগণের কল্পনার সীমা বহির্ভূত মনে হয়। এইরূপ কঠোর সংযম, গুরুতর পরিশ্রম, পরিমিত তেজ গ্রহণ, আদর্শ গুরু শিষ্যের মধুময় সংসর্গের মধ্যে থাকিয়াও ছাত্র শিক্ষা সম্পর্কে গুরুর নিকট কতখানি সাহায্য পাইতেন তাহার সন্ধান লইলে দেখিতে পাই ;—

"আচার্য্যাৎ পাদমাদত্তে পাদং শিষ্যঃ স্বমেধয়া।
কালেন পাদ মাদত্তে পাদং স্বব্রহ্মচারিভিঃ॥" মনুঃ।

ছাত্র অধ্যাপকের নিকট হইতে এক পাদ জ্ঞান লাভ করে। স্বীয় বুদ্ধির সাহায্যে ঐ জ্ঞান দ্বিগুণিত হয়। বয়োবৃদ্ধি সহকারে উপার্জ্জিত জ্ঞান ত্রিগুণিত হইয়া থাকে। অনন্তর সহাধ্যায়িগণের সঙ্গে আলোচনা (তর্ক বিতর্ক) করিয়া উহা চতুষ্পাদ বা সম্পূর্ণ হইয়া থাকে। মহর্ষি মনুর সংক্ষিপ্ত শ্লোকটীর মধ্যে আমরা পুরাকালের বিদ্যাভ্যাসের একটী সুন্দর প্রণালী (process) দেখিতে পাই। সেটী এই ;—একবার মাত্র দর্শন শ্রবণ বা পঠনে কোন বিষয়ের ষোল আনা জ্ঞান লাভ সম্ভবপর নহে। দৃষ্ট শ্রুত বা পঠিত বিষয়টী সম্যকরূপ আত্মসাৎ করিতে হইলে উহার পুনঃ পুনঃ দর্শন, শ্রবণ বা অধ্যয়নের একান্ত আবশ্যক। আমাদের বাল্যের পুনঃ পুনঃ পাঠাভ্যাস ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। অতএব ছাত্র যখন গুরুমুখে জ্ঞেয় বিষয়টী প্রথম শ্রবণ করে, তখন উহাতে তাহার কতকটা ধারণা জন্মে সত্য, কিন্তু পূর্ণ জ্ঞান জন্মিতে পারে না। তাহার পর পঠিত বিষয়টীর চিন্তার সাহায্যে মনে পুনঃ পুনঃ আন্দোলন করিলে ঐ

সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অধিক ধারণা জন্মে। তৃতীয় অবস্থায় গুরু মুখে শ্রুত ও স্ব বুদ্ধির সাহায্যে সমালোচিত তত্ত্বটী কাল সহকারে নিরন্তর পর্য্যবেক্ষণের (Experience) ফলে আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বহু বিষয়ের সহিত পরিচয় ঘটে। আমরা যত অধিক বিষয়ের সংস্পর্শে আসি, চিন্তাশক্তির ততই চালনা হওয়ায়, আমাদের বুদ্ধি মার্জ্জিত হইতে থাকে। শৈশবে যে পাঠ অতিদুরূহ বোধ হইত, কালক্রমে উহাই আবার অতি সহজ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ইহার চতুর্থ বা শেষ অবস্থায় ঐশ্রুত, সুচিন্তিত, অভ্যস্ত তত্ত্বটী সহ পাঠি বর্গের সহিত অসঙ্কোচে (যাহা হয়ত গুরুর নিকট অসম্ভব ছিল) তর্ক বিতর্ক দ্বারা হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। এই চতুর্থ অবস্থার কথা আমরা সকলেই বেশ বুঝিতে পারি। পাঠ্যাবস্থায় এক বিদ্যালয়ে বা এক ছাত্র নিবাসে এক সঙ্গে ও একত্র কতিপয় ছাত্র অবস্থিতি করে। তাহাদের সকলেরই বিদ্যা বুদ্ধি, মেধা প্রতিভা, পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সমান থাকে না। সুতরাং পাঠ গ্রহণ কালে একজন ছাত্র যে স্থান ভাল বুঝিতে পারে নাই, অন্যে হয়ত তাহা ভাল বুঝিয়াছে; পক্ষান্তরে সে যেস্থান ভালরূপ বুঝিয়াছে, অন্যের তাহা বোধগম্য হয় নাই, এরূপ ক্ষেত্রে উহাদের পরস্পরের মধ্যে ঐ সকল স্থল আলোচনার ফলে অজ্ঞাত বিষয়ে জ্ঞানলাভ ও জ্ঞাত বিষয়ের অধিকতর ধারণা জন্মিবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি? আমাদের প্রদর্শিত জ্ঞানারোহণের এই প্রণালীটী অধ্যাত্ম শাস্ত্রে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে। যেখানে এ তিনের অভাব, সেখানে যাত্রা দলের গানের শ্রোতার ন্যায় বিদ্যার্থীর অধ্যয়ন কেবল শুকের পাঠ মাত্র। অশেষ শাস্ত্র প্রণেতা ভগবান্ পতঞ্জলি ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া তৎকৃত সুপ্রসিদ্ধ মহাভাষ্যে লিখিয়াছেন; "যাহা কেবল অধ্যয়ন মাত্র হইয়াছে, জ্ঞানের কোটায় পৌঁছে নাই, অভ্যাস বশে উচ্চারিত হয়, ঐরূপ অধ্যয়ন ভস্মস্তূপে নীরস কাষ্ঠ রাশি সংযোগের ন্যায় অন্তঃকরণকে কখনও আলোকিত করিতে পারে না।" ঐরূপ শিষ্যের চিত্ত জ্ঞানালোকে সমুজ্জল না হওয়ায় উহা চিরকাল অজ্ঞান তামস সমাচ্ছন্ন থাকে। এরূপ অর্দ্ধ শিক্ষা বা কুশিক্ষা হইতে অশিক্ষা বা শিক্ষার একান্ত অভাব অনন্ত গুণে শ্রেয়স্কর। জ্ঞানী ব্যক্তির অভিমত; "No education is better than bad education". এজন্যই "অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী" এ দেশের সনাতন জনপ্রবাদ। আলেয়া ও বিদ্যুতের আলোর মত এরূপ বিকৃত শিক্ষা কেবল মানবের বুদ্ধি ভ্রংশের কারণ হইয়া থাকে। এক্ষণে দেখিতে হইবে যে বর্ত্তমান ছাত্র সমাজ সুশিক্ষা লাভের উপযোগী ঐ প্রাচীন পদ্ধতি অবলম্বন করিতে সমর্থ কি না, আর ঐরূপ ভাবে অধ্যয়ন অধ্যাপনার কোনও উপযোগিতা আছে কি না। উত্তরে এই মাত্র বক্তব্য যে, অধ্যয়নের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য জ্ঞান লাভ, দ্বিতীয় বা অবান্তর লক্ষ্য ধনোপার্জ্জন। যাঁহারা দ্বিতীয় পথের পথিক অর্থাৎ অর্থকারী বিদ্যার উপাসক, তাঁহাদের বিদ্যাশিক্ষার ঐরূপ পদ্ধতির সহিত অপরিচয় দোষাবহ নহে। কারণ বিশ্ব বিদ্যালয়ের মহামহিম "চাপরাস" আর মহীয়সী লেখনী কুশলে থাকিলেই তাঁহাদের সর্ব্বমঙ্গল। কিন্তু পড়াশুনা যাঁরা জ্ঞান লাভের জন্যই মনে করেন, এবং লব্ধজ্ঞান জগতের উপকারার্থে নিঃস্বার্থ বিতরণই যাঁরা জীবনের মহাব্রত ও মনুষ্যত্বের নিদান বলিয়া বুঝিয়া থাকেন; তাঁহাদের সকলেই আমাদের আলোচিত পদ্ধতির পক্ষপাতী বলিয়া মনে হয়। আমরা তাঁহাদের সম্বন্ধেই যৎকিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত। দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিদের সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব Chancellor বড় লাট লর্ড কার্জ্জন্ যে প্রশংসাবাদ করিয়াছেন উহাই যথেষ্ট; "They came to the University to earn and not to learn". প্রথম শ্রেণীর বিদ্যার্থীর সংখ্যা একালে একান্ত বিরল হইলেও একেবারে অভাব ঘটিয়াছে একথা বলা যায় না।

[illegible] জগদীশচন্দ্র, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, আদর্শকুমার [illegible]কুমার প্রভৃতির নাম এখনও আমাদের স্মৃতির মন্দিরে সসম্মানে আসন পাইয়া থাকেন। সেই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহাদেরই শিষ্য অনুশিষ্যগণ তাঁহাদের [illegible] আদর্শ একেবারেই গ্রহণ করিতে অক্ষম, ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। স্বার্থরক্ষার্থে অর্থ আবশ্যক হইলেও দেবের সিংহাসনে দানবের মত উহা কখনও জ্ঞানরূপ পরমার্থের প্রাপ্য পূজার দাবী করিতে পারিবে না। এখন সেই জ্ঞানযোগী বিদ্যার্থিদিগের বুদ্ধির স্বচ্ছতা সম্পাদনের জন্য ঐ সকল আর্য্য বংশধরের বুদ্ধিতে কিরূপ মহৎ উপকরণ সঞ্চিত থাকে, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতেছি। ভারতের অমর কবি কালিদাস তৎপ্রণীত মহাকাব্য রঘুবংশের তৃতীয় সর্গের [illegible] সংখ্যক শ্লোকে রাজ কুমার রঘুর বিদ্যাশিক্ষা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন; "উৎকৃষ্ট বুদ্ধি রাজকুমার রঘু তদীয় বুদ্ধির [illegible]প্রকার গুণের প্রভাবে ক্রমশঃ আন্বীক্ষিকী প্রভৃতি [illegible] বিদ্যায় পারদর্শী হইলেন।" রঘুর সুবিখ্যাত টীকাকার পণ্ডিত প্রবর মল্লিনাথ ঐস্থলে বুদ্ধির আট প্রকার গুণের উল্লেখ করিয়াছেন। সে আটটী এই; শুশ্রূষা, শ্রবণের আগ্রহ (Earnestness) ১, শ্রবণ (Hearing) ২, গ্রহণ (acceptance) ৩, ধারণ (Digestion) ৪, উহ (Thoughtful discussion and selection) ৫, অপোহ (Thoughtful rejection) ৬, অর্থবিজ্ঞান (Comprehension) ৭, তত্ত্বজ্ঞান (Knowledge of truth) ৮, অভ্যাস বা অনুশীলন দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তির কিপরিমাণ উৎকর্ষ সাধন হইলে তবে [illegible] শিক্ষিত বা জ্ঞানী হওয়া যায় কবি শেখর কালিদাস তাহা ঐ শ্লোকে স্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন। আমরা আধুনিক ছাত্র সমাজের সহিত প্রাচীন [illegible] সম্প্রদায়ের বুদ্ধি বৃত্তির গুণোৎকর্ষের তুলনা করিয়া [illegible] যে কিকারণে পুরাতন ও নবীন শিক্ষার্থীর শিক্ষায় [illegible] এত তারতম্য ঘটিতেছে। শিক্ষার্থীর প্রথম গুণ অধ্যাপক বা আচার্য্য কি উপদেশ দিতেছেন উহা আগ্রহের সহিত শোনা। বিংশতি বৎসর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার ফলে যাহা দেখিতেছি ও বুঝিতেছি তাহাতে বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয় রূপ কল্পপাদপের যাহাতে ছাত্রগণের পঠিতব্য বিষয় সাগ্রহে শুনিবার বিশেষ দরকার হয় না। অধিকাংশ ছাত্রের পাঠে মনোনিবেশের পরিবর্ত্তে নিদ্রাবেশের সহিত পরিচয়টা ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে। তারপর পাঠ্য বিষয় মনোযোগের সহিত শ্রবণের বেলায় দেখিতে পাই অনেকেরই শ্রবণ অধৈর্য্য প্রবল ও বিষয়ান্তর মগন। মনঃসংযোগের অভাবে যখন অত্যুচ্চ ঢকা-নিনাদও শুনিতে পাওয়া যায় না, তখন শতাধিক ছাত্রের মধ্যে জনৈক অধ্যাপকের অস্ফুট, অর্দ্ধস্ফুট বা পরিস্ফুট বাক্যের মর্ম্ম গ্রহণ করা কত সহজ তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেরই সুবিদিত। যাহা শুনিবার আগ্রহ নাই, যাহাতে মনঃসংযোগ হয় নাই এতাদৃশ বিষয় আয়ত্ত করণের চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। ঐরূপ অশ্রুত, অবুদ্ধ তত্ত্বের বিচার বা ধারণা একান্ত অসম্ভব। অজ্ঞাত বিষয়ে বাদ বিতণ্ডা করা ঘোর সংসারীর ব্রহ্ম উপদেশের ন্যায় শুষ্ক বাচালতা মাত্র। তারপর অপোহ বা বিচার মুখে হেয় বর্জ্জনের শক্তিও পূর্ব্বোক্ত ছাত্রের পক্ষে একান্ত দুর্লভ। ঐরূপ অপরিণত বুদ্ধি ছাত্রের বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি সুদূর পরাহত। এতাদৃশ অমার্জিত বুদ্ধি শিষ্যের তত্ত্ব জ্ঞান লিপ্সা জন্মান্ধের চন্দ্র দর্শন স্পৃহার ন্যায়। যে পবিত্র জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে জীব পরা শান্তির অধিকারী হয়, উহা সামান্য বস্তু নহে। সুদুর্লভ স্বারাজ্য পদ লাভের ন্যায় এই অপার্থিব জ্ঞানরত্ন লাভ করিতে হইলে মানবের আজীবন কঠোর সাধনার আবশ্যক। এই সাধনার জন্য সন্ন্যাসী সাজিয়া বনে যাইতে হইবে না। উহা গৃহে বসিয়াই উপযুক্ত গুরুর সাহায্যে উল্লিখিত পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া বুদ্ধি বৃত্তির ক্রমোৎকর্ষ লাভ করিতে পারিবে। ঘর্ষণে যেমন দর্পণের মালিন্য অপগত

হয়, অভ্যাস বা প্রকৃত শিক্ষার প্রভাবে মনের মালিন্যও তেমনি অচিরে দূরীভূত হইয়া যায়। বিমল মনি ভিত্তিতে সূর্য্যবিম্ব প্রতিফলনের মত নির্ম্মল বুদ্ধি বৃত্তিতে পরতত্ত্ব সকল স্বতঃই প্রতিভাত হইতে থাকে। চিত্তের এই উচ্চতম অবস্থা সম্পাদনের জন্য চাই আদর্শ গুরুকুল, ত্যাগী আচার্য্য পরিষদ, বিধেয় ছাত্র মণ্ডলী। আর চাই উঁহাদের বিহিত সংযম, নিয়মিত পরিশ্রম, নির্দ্দোষ স্বাস্থ্যধারণ ও কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারণ। ব্যক্তি ও জাতির মুক্তির পক্ষে আদর্শ শিক্ষাই নিরাপদ পন্থা। "নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে হয় নায়।"

—

শ্রীনিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ।

আগমনী ও বিজয়া। *

আমি অন্যত্র বলিয়াছি "সঙ্গীত ক্ষেত্রে বাঙ্গলা মায়ের কোমল বক্ষের বিপুল স্নেহ-রাশি দুইটি ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে। পুত্র-স্নেহ-ধারা বহিতেছে গোপাল-যশোদা অবলম্বনে, আর কন্যা-স্নেহ-ধারা বহিছেতে উমা-মেনকা-চরিত্রাবলম্বনে।" আজ আমরা শোষোক্ত ধারা কি ভাবে শত শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালীর প্রাণ স্নিগ্ধতায় ও সরসতায় ভরপূর রাখিয়াছে তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস দিতে চেষ্টা করিব। এ বিষয়ে যে সকল অসংখ্য সঙ্গীত বিরচিত হইয়াছে তাহা সাধারণতঃ "আগমনী" ও "বিজয়া" সঙ্গীত নামে পরিচিত।

"সুজলা-সুফলা শস্যশ্যামলা" নদী মাতৃকা আমাদের সোনার বাঙ্গলার প্রকৃতির গুণেই বাঙ্গালীর ঘরের জননী-হৃদয় বড়ই স্নেহ-কোমল—ফুলেরঘা সয় না। সেই মাতৃ হৃদয়ের নানা ভাবের চিত্র এই সকল গানে এমন সুন্দর ফুটিয়াছে যে তা আর কি বলিব।

উমা-মহেশ্বর-চরিত্রই এ দেশের কন্যা-জামাতার, স্বামী-স্ত্রীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট আদর্শ। বাঙ্গালী জাতি জনক পূর্ণ রাজৈশ্বর্য্য তেমন চায় না। বিলাস বাসনা যাহাতে অব্যাহত ভাবে পূর্ণ হইতে পারে সে দিকে তার তেমন লক্ষ্য নাই। তাই তার কন্যা কুল এখনও ব্রত করিতে বসিয়া গ্রামে গ্রামে "শিবের মত বর চাই" বলিয়া দেবতার নিকটে প্রার্থনা করে। অবশ্য বর্ত্তমান ইংরেজি শিক্ষিতাদের মধ্যে অধিকাংশ মেয়েই এখন আর এরূপ করে না তা স্বীকার করি, কিন্তু সমগ্র বাঙ্গলার লোক সংখ্যার তুলনায় তাহাদের সংখ্যা আর কতই বা হইবে? শিব ভিখারী বলিয়া তাহাদের কোন আপত্তি নাই, তাহারা দেখে শিবের মহত্ব। তেমন ত্যাগী, তেমন প্রেমিক—যিনি সতীর মৃত দেহ পর্য্যন্ত স্কন্ধে নিয়া বিহ্বল হইয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াছিলেন—ঘৃনিত ভূত প্রেত পিশাচে পর্য্যন্ত যাঁহার অপার করুণা, যিনি জগতের মঙ্গলের জন্য অটল ধৈর্য্যে হলাহল পান করিয়া নীলকণ্ঠ হইয়াছেন, যিনি হিমালয় সদৃশ বিশাল-বপু, গৌর-কান্তি, বীরের আদর্শ, গম্ভীর সৌন্দর্য্যের আবাস-ভূমি, তেমন আর দ্বিতীয় কে আছে? তাই বাঙ্গালীর মেয়ে শিবের মত বর কামনা করে।

আর জগন্মাতা যে ভাবে দক্ষ-যজ্ঞে স্বামী-নিন্দা শ্রবণে তনু ত্যাগ করিয়াছেন এবং পর-জন্মে হিমালয়ে সেই জগৎ-পিতা শিবকে স্বামী রূপে পাওয়ার জন্য যেরূপ কঠোর তপস্যা করিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক হিন্দু হৃদয়ে চির-পরিস্ফুট রহিয়াছে। সে তপশ্চর্য্যা সময়েও ছদ্মবেশী মহেশ্বরের মুখে শিব-নিন্দা শ্রবণ-ভয়ে যিনি বলিয়াছিলেন,—

"নিবার্য্যতামালি! কিমপ্যয়ং বটুঃ
পুনর্বিবক্ষুঃ স্ফুরিতোত্তরাধরঃ।

* ঢাকা সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

ন কেবলং যো মহতোঽপভাষতে
শৃণোতি তস্মাদপি যঃ স পাপভাক্ ॥”

...র চরিত্র নারী জীবনের আদর্শ হইবে না ত কাহার ...ম হইবে? মৃত্যু অন্তেওত দম্পতির সম্পর্কের শেষ ...য়া যায় না—এ যে চিরন্তন।

...াই আবার বলি যে উমাই বাঙ্গালীর আদর্শ কন্যা, ...দর্শ বধূ, আর উমানাথ শঙ্করই তাহাদের আদর্শ ...মাতা, আদর্শ স্বামী।

যৌবনের চিত্র দেখাইবার পূর্ব্বে গৌরীর শিশু চিত্র ...ঙ্কিত করিতে গিয়া বঙ্গ-কবি অমর রাম প্রসাদ কি রূপ কোমল রেখাপাত করিয়াছেন তাহাই দেখাইব।

একদিন হিমালয়ের রাজ প্রাসাদে উমা মায়ের কাছে ...ইয়া আছেন; কিন্তু নিশি অবসানের খানিক পূর্ব্বে ...জাগ্রতা হইয়াছেন, গবাক্ষপথে চন্দ্র কিরণ আসিয়া ...াহার চাঁদমুখে পড়িয়াছে; তিনি অমনি বাল-সুলভ-...ভাববশতঃ চাঁদ হাতে পাওয়ার জন্য বায়না ধরিলেন, ...বং না পাইয়া বড়ই কাঁদিতে লাগিলেন। গিরি-রাণী ...াহাকে কিছুতেই শান্ত করিতে না পারিয়া রাজাকে ...লিলেন,—

“গিরিবর, আর আমি পারি নে হে,
প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তন্যপান,
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে ॥
অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদয় শশী,
বলে উমা ধরে’দে উহারে।
কাঁদিয়ে ফুলালে আঁখি, মলিন ও মুখ দেখি,
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে ॥
আয় আয় মা মা বলি, ধরিয়ে কর-অঙ্গুলি,
যেতে চায় না জানি কোথারে।
আমি কহিলাম তায়, চাঁদ কিরে ধরা যায়,
ভূষণ ফেলিয়া মোরে মারে ॥
উঠে বসে গিরিবর, করি বহু সমাদর,
গৌরীরে লইয়া কোলে করে।
সানন্দে কহিছে হাসি, ধর মা এই লও শশী,
মুকুর লইয়া দিল করে ॥
মুকুরে হেরিয়া মুখ, উপজিল মহাসুখ,
বিনিন্দিত কোটি শশধরে।

*　　*　　*　　*

কহিতে কহিতে কথা, সুনিদ্রিতা জগন্মাতা,
শোয়াইল পালঙ্ক উপরে” ॥
(৺রামপ্রসাদ সেন)।

জগত ললামভূতা উমা পলে পলে দিনে দিনে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে ভুবন মনোমোহিনী রূপে বাড়িয়া উঠিতেছেন, দেখিয়া মায়ের কি আনন্দ! তিনি স্বামীকে দেখাইয়া বলিলেন,—

“কাঞ্চন তরুবরে চন্দ্র কি মাল, বিলম্বিত ঝলমল,
কো বিধি দেয়ল আনি ॥
হিমকর বদন, রদন মুকুতা বলি,
করতল কিশলয়, কোমল পাণি।
রাজিত তহি কনক মনিভূষণ,
দিনকর ধাম চরণতল খানি ॥”
(৺রামপ্রসাদ সেন)

তখন রাণীর
“দর দর দর ঝরত লোর, চর চর চর তনু বিভোর,
কবহু কবহু করত কোর, থোর থোর দোলনা।
রাণী বদন হেরি হেরি, হসতি বদন বেরি বেরি,
চোরি চোরি থোরি থোরি মন্দ মন্দ বোল না ॥
ঝুমুর ঝুমুর ঘুঙ্গুর নাদ, কিঙ্কিনী রব উভয় বাদ,
পদতল স্থল-কমল নিন্দি, নখ হিমকর গঞ্জনা।
কলিত ললিতা মুকুতা হার, মেরু বিকচ হিমকরাকার,
বিবুধ তটিনী বিষদনীর, ছলে তনু রঞ্জনা ॥
কষিত কনক বিমল কান্তি, মনহিতাপ করত শান্তি,
তনু-তিরপিত নয়ন-সুখ, কন্দর্প নিকর ভঞ্জনা।”
(৺রামপ্রসাদ সেন)।

তখন

"নিরখি নিরখি বদন ইন্দু। পুলকে উথলে প্রেম সিন্ধু॥
ছল ছল ছল নয়ন। লোল চন্দ্রবদনে চুম্বন।
মধুর মধুর বিনয় বাণী। গদ গদ গদ কহত রাণী॥
কোটি জনম পুণ্য জন্য। কোলে কমল লোচনা॥"

(৺রামপ্রসাদ সেন)।

হিন্দু তাহার স্নেহ মাখা কন্যা-বদনে সেই বিশ্বমাতার মুখের প্রতিবিম্বই দেখিতে পায়।—তাই সে রূপ অফুরন্ত, দেখিয়া দেখিয়া দেখিয়া তার আর আশ মেটে না। অসীম সৌন্দর্য্যের কে কবে অন্ত পেয়েছে?

বিশ্ব সৌন্দর্য্যে-সার-স্বরূপা উমা ক্রমে প্রাপ্ত যৌবনা হইয়াছেন। তাঁহার বিমল রূপ দেখিয়া স্বতঃই বলিতে ইচ্ছা হয়—

"সর্ব্বোপমা দ্রব্য সমুচ্চয়েন
যথা প্রদেশং বিনিবেশিতেন।
সা নির্ম্মিতা বিশ্বসৃজা প্রযত্না
দেকস্থ সৌন্দর্য্য দিদৃক্ষয়েব॥"

গিরিরাজ হিমালয় এবং তদীয় মহিষী মেনা দেবী দেখিলেন যে তাঁহাদের স্নেহের উমার

"উন্মীলিতং তুলিকয়েব চিত্রং
সূর্য্যাংশুভির্ভিন্ন মিবার বিন্দম্।
বভূব তস্যাশ্চতুরস্র শোভি
বপুর্বিভক্তং নবযৌবনেন॥"

তখন তাঁহারা কৈলাস নাথ শিবের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিলেন। উমাত পূর্ব্ব হইতেই শিবসুন্দরের চরণে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছিলেন।

গিরি জায়া বাঙ্গালী মায়েরই মত জামাতাকে বলিলেন—

"হয় তুমি আয় ত আমার পর নয়,
আমি মেয়ে দিয়ে ছেলে পেলেম,
জামাই আমার মৃত্যুঞ্জয়।
প্রাণসমা উমা আমার,
আজি হ'তে হ'ল তোমার,
আদরে রাখিবে জানি,
তবু মাকে বলতে হয়॥"

উমা স্বামী সঙ্গে কৈলাসে চলিয়া গিয়াছেন। কন্যা সমর্পণ করিয়া হিমালয় কতকটা নিশ্চিন্ত, কিন্তু রাণী মেনকার হৃদয়ে স্নেহের কন্যার দারিদ্রের আশঙ্কায় বুঝি বা সময়ে সময়ে ক্ষণিক বিষাদের একটু ছায়া পাত হইত। শত হইলেও মায়ের প্রাণ ত! পরে একদা লোক মুখে—সে লোক আবার যে সে লোক নয়, স্বয়ং ঋষিপ্রবর নারদের মুখে তিনি শুনিতে পাইলেন তাঁহার "প্রাণসম উমা" সেই ভিখারীর ঘরে বড় দুঃখে আছেন। মায়ের প্রাণ অমনি উথলিয়া উঠিল, তিনি রাজাকে যাইয়া বলিলেন,—

পিলু বাহার খৎ।

"গিরি, এবার আমার উমা এলে,
আর উমায় পাঠাব না।
বলে বলবে লোকে মন্দ,
কারো কথা শুনব না॥

যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়,
উমা নেওয়ার কথা কয়।
এবার মায়ে ঝিয়ে করব ঝগড়া,
জামাই বলে, মানব না॥

শুনেছি নারদের মুখে,
উমা আমার থাকে দুঃখে।
শিব শ্মশানে মশানে ফিরে,
ঘরের চিন্তা করে না॥"

(৺রাম প্রসাদ)

কন্যার কথা ভাবিতে ভাবিতে রাণী স্বপ্নে তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া জাগিয়া উঠিলেন, কিন্তু হায়, সে কোথায়? নিদ্রাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

ললিত একতালা।

"ওগো নিদ্রা দেবি, কেন বঞ্চনা করিলে মোরে।
মিলাইয়া উমা ধনে পুন কেন নিলে হরে' ॥
যে অবধি তারে হারা, মুদি না আর আঁখি তারা,
দু'নয়নে শত ধারা, বহিছে সদাই—
আজি নিদ্রে এলে যদি, মিলাইলে হারা নিধি,
মোরে দুখে হয়ে বাদি, কেন লুকাইলে তারে ॥
পুন আমি মুদি আঁখি, শয়ন করিয়া থাকি,
উমা এনে মিলাও দেখি, হেরি সে চাঁদ মুখে—
আমার সে স্বর্ণলতা, না বলিতে দু'টো কথা,
দিয়ে আমার প্রাণে ব্যথা, নিলে তারে কোথা কারে॥"

(দ্বিজেন্দ্র লাল রায়)

নিদ্রোত্থিত গিরিরাজ রাণীর বিষাদ মাখা বদনে অশ্রু জল দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিতেই তিনি বলিলেন,—

খট্‌ভৈরবী একতালা।

"গিরি, কি শুনাও হে সমাচার ?
বলতে সে স্বপন, না স্বরে বচন,
খেদে পোড়ে মন, বহে অশ্রু ধার।
নিশিতে যেমন, ভেবে উমা ধন,
অনেক আয়াসে মুদেছি নয়ন,
অমনি স্বপনে করি দরশন,
শিয়রে বসিয়া যেন মা আমার।
বাছার নাই সে বরণ, নাই আভরণ,
হেমাঙ্গী হইয়াছে কালীর বরণ,
হেরে তার আকার, চিনে উঠা ভার,
সে উমা আমার, উমা নাই হে আর।
উমা বসিয়ে শিয়রে, কহিল কাতরে,
কত আর দয়া থাকিবে পাথরে,
ভিখারীর করে সমর্পণ করে',
কেন তত্ত্ব নিয়ে, লও না মা একবার ॥"

(৺হরিশ্চন্দ্র মিত্র)

দেখিতে দেখিতে সম্বৎসর অতীত হইতে চলিল শ্যামাঙ্গী বর্ষা সুন্দরী ধীরপদে চলিয়া গিয়াছেন। "সদ্যঃ শরণ" কজ্জল-নীল চিক্কণ মেঘমালা "ভ্রূবিলাসানভিজ্ঞ প্রীতি-স্নিগ্ধ-জনপদ-বধূ-লোচন কর্ত্তৃক পীয়মান" হইয়া আর গগন মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া দাঁড়ায় না, "অর্দ্ধরূঢ়-কেশর বিশিষ্ট হরিত কপিশ" কদম্ব বা কেতকী কুসুমের গন্ধে স্নিগ্ধ সমীর আর আমোদিত হয় না, "বন নদী তীর জাত উদ্যান যূথিকাজাল" আর "নব জলকণা" পাতে শিহরিয়া উঠে না, "আকুলাবিল তোয়া বিপুলা উন্মার্গ জল বাহিনী" স্রোতস্বতী সমূহের আর সে তেজ নাই। "পঙ্কজ লক্ষণা" শারদ লক্ষ্মীর সমাগমে তাহারা নির্ম্মল ও স্বল্পতোয়া হইয়া নীল নভের প্রতিচ্ছায়া বক্ষে ধারণ করিয়াছে। "নির্বৃত্তপর্জ্জন্য জলাভিষেকা প্রফুল্লকাশা বসুধা" বিচিত্র শ্রী ধারণ করিয়াছেন। আকাশ নির্ম্মল নীল, উজ্জ্বল সূর্য্য কিরণে উদ্ভাসিত, কখনও বা বিধূনিত তুলা রাশীর ন্যায় শুভ্র মেঘ খণ্ড নিরুদ্দেশে ভাসিয়া যাইতেছে, বলাকা শ্রেণী তাহার তলে বিচিত্র মালা গাঁথিয়া চলিতেছে, দেখিয়া মনে হয় "ধুতুরার মালা যেন ধূর্জ্জটীর গলে।" তীরে নীরে শ্বেত রক্ত কমল রাজি প্রস্ফু-টিত, শেফালিকা কুঞ্জ অজস্র ফুলে ফুলময়, মধুর বাতাস কুসুম গন্ধে আপূরিত। সবুজ ক্ষেত্রে শারদ লক্ষ্মীর সোনার ধান বাল সূর্য্যকিরণে ঝল মল করিতেছে। ফুলে ফুলে, দূর্ব্বাদলে শিশির বিন্দু সকল মুক্তা মালার মত টল টল করিতেছে। আর ত মেনারাণী প্রাণপুত্তলী কন্যার মুখ কমল না দেখিয়া থাকিতে পারেন না। এখনই যে তাঁর আসিবার সময়, এখনও কি মাকে আনা হইবে না? সম্বৎসর যে তার কাছে যুগ যুগান্তর বলিয়া মনে হইতেছে। তিনি গিরিরাজকে বলিলেন,—

দেবগিরি-বিভাস—একতালা।

"বিলম্বে কি কাজ যাও গিরিরাজ,
এনে দাও আমার পরাণ পুতলি।
সম্বৎসর গত, মুখে কব কত,

মরমে গুমুরে যে জ্বালায় জলি ॥
উমা যে আমার সরলা ললনা,
ভাল মন্দ বাছা কিছুই তো জানে না,
ভিখারীর ঘরে দারিদ্র্য যাতনা,
সবে সে কেমনে, বুঝ তো সকলি ॥
সবে মাত্র কন্যা উমা যে আমার,
বুক চেরা ধন, সংসারের সার,
তাই তোমায় যে বলি, বলি বার বার
কোলে এনে দাও সোনার কমল কলি ॥”

হিমালয় পাষাণ হৃদয় হইলেও আর থাকিতে পারিলেন না। গম্ভীর হিমালয়ের ঐ পাষাণ হৃদয় ভেদ করিয়াইত তাঁহার গভীর স্নেহ ধারা কত শত নির্ঝররূপে প্রবাহিত হইতেছে। তিনি কন্যা আনিতে কৈলাসাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পিতাকে নিজালয়ে দেখিয়া কন্যার যে কি আনন্দ তাহা কেমন করিয়া প্রকাশ করিব? বাঙ্গলার গৃহে গৃহে এ মধুর দৃশ্য। উমা পিতার পদতলে বসিয়া ধীরে ধীরে বীজন করিতেছেন, হিমালয় তাহার তরঙ্গায়িত কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ ললাট হইতে কোমল স্পর্শে সরাইয়া দিতেছেন। উমা মায়ের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেই গিরিরাজ বলিলেন,—

ঝিঁঝিট—খয়রা।

“কি সুধাও মা আর, রাণীর সমাচার,
এক মুখে তার দশা বলা ভার।
রাণী তোর অদর্শনে, আছে অনশনে,
দেখ বি গে নয়নে,অস্থি চর্ম্ম সার ॥

সদা সর্ব্বক্ষণ, বলে’ উমাধন,
করিছে রোদন, নাহি নিবারণ,
বলে প্রবোধ বচন, করে না শ্রবণ,
দ্বিগুণ তখন করে হাহাকার ॥

রাণী পাগলিনী প্রায়, পথে গে’ দাঁড়ায়,
যার দেখা পায়, বিনয়ে সুধায়,
‘কৈলাসে কি কেউ গিয়াছিলে হায়,
দেখেছ কি কেউ উমারে আমার ॥’

রাণী গগনে নিরখি শরত-চন্দ্রমা,
ভ্রমে বলে ঐ এল বুঝি উমা,
মেঘে ঢাকিলে শশীরে, কর হানি শিরে,
মূর্চ্ছা হয়ে পড়ে, করিয়া চিৎকার ॥

রাণীর যে রূপ লক্ষণ, করি নিরীক্ষণ,
বাঁচে যে এমন, নাহি লয় মন,
তার দেহে যে জীবন, আছে এতক্ষণ,
সে কেবল তোরে হেরিতে একবার ॥”

(৺ হরিশ্চন্দ্র মিত্র)

পিতার মুখে মায়ের অবস্থা শুনিয়া উমার নলিন-নয়ান অশ্রুজলে ভাসিয়া গেল। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বেপথুমান বক্ষে মহেশের নিকট গেলেন। “রজত গিরিনিভ” মহেশ্বর ধ্যান-স্তিমিত-লোচন। পাণি যুগল অঙ্ক দেশে স্থাপিত—যেন দুইটি রক্ত কমল ফুটিয়া রহিয়াছে। পর্ব্বত শৃঙ্গের উদার উন্মুক্ত বাতাস তাঁহার জটা কলাপে সন্তর্পণে খেলা করিতেছে, আসন-বেদী সংলগ্ন নব দেবদারুর পত্রগুলি সর সর করিয়া কাঁপিতেছে, ঊর্দ্ধে নীলাকাশ, সম্মুখে কলনাদিনী সুরশৈবলিনী চঞ্চল গমনে বহিয়া যাইতেছে। পার্ব্বতী ধ্যান ভঙ্গের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন; ধ্যান ভঙ্গ হইলে কহিলেন,—

“এসেছেন পিতা অচল,
আঁখি দুটি ছল ছল,
কেবল বল্‌ছেন চল চল,
কি আজ্ঞা হয় পশুপতি?

সম্বৎসর হইল গত,
মা আমার কাঁদিছেন কত,
আসিব হে ত্বরান্বিত,
করি আমি এই মিনতি॥"

অনুমতি দিতে আশুতোষ অন্যথা করিলেন না। গৌরী গুহ গজানন সঙ্গে পিতৃভবনে চলিলেন। নিশি শেষে সখী আসিয়া রাণী মেনা দেবীকে ডাকিয়া বলিলেন,—

"রাণী গা তোল গো, উমা এলো হিমালয়,
সরসে কমল হাসে, আকাশে ভানু উদয়।
কোকিল ডাকিছে, মঙ্গল গাইছে,
শীতল সমীর সৌরভ বয়,
দুর্গা দুর্গা রবে ভুবন ভরিল,
অতুল আনন্দ ভারতময়।"

রাণী উঠিলে সখী আবার বলিলেন,—

ঝালাইয়া—কাওয়ালি।

"রাণী কর কর কর মঙ্গল আচরণ, হয়েছে শুভক্ষণ।
লহ গুহ গণপতি পশুপতি হৈমবতী,
গিরিরাজের হইল ঐ আগমন।
বেরো গো বেরো গো, কেন গৃহে আর,
দেখোগে কেমন শোভা তোমার প্রাণ উমার,
গিরিপুরে আজি গো চাঁদের বাজার,
কার শক্তি বর্ণে রূপ অভয়ার;
লহ গো বরণ করি, শঙ্কর আর শুভঙ্করী,
ডাক সব পুরনারী, করুক জয় উচ্চারণ॥

দুঃখের নিশি হল তোমার অবসান,
দ্বারেতে দাঁড়াল এসে ঈশানী ঈশান,
হেরিয়ে জুড়াল তাপিত মন প্রাণ,
আনন্দে উথলে গলিয়ে পাষাণ।
ঐ শুন সব বাদ্য করে, সুমঙ্গল বাদ্যকরে,
মল্লার মঙ্গল গান গাইছে গায়কগণ॥"

(৺হরিশ্চন্দ্র মিত্র)।

তখন পুরনারীগণ আসিয়া বলিলেন,—

মালশ্রী।

"আজ শুভনিশি পোহাইল তোমার।
এই যে নন্দিনী আইল, বরণ করিয়া আন ঘরে।
মুখশশী দেখ আসি, দূরে যাবে দুখ রাশি,
ও চাঁদ মুখের হাসি, সুধারাশি ক্ষরে॥
শুনিয়া এ শুভবাণী, এলোচুলে ধায় রাণী,
বাস না সম্বরে।
গদ গদ ভাবভরে, ঝর ঝর আঁখিঝরে,
পাছে করি গিরিবরে, অমনি কাঁদে গলাধরে॥
পুন কোলে বসাইয়া, চারু মুখ নিরখিয়া,
চুম্বে অরুণ অধরে।
বলে জনক তোমার গিরি, পতি জনম ভিখারী,
তোমা হেন সুকুমারী, দিলাম দিগম্বরে॥

তখন

"যত সহচরীগণ, হয়ে আনন্দিত মন,
হেসে হেসে এসে ধরে করে।
কহে বৎসরেক ছিলে ভুলে,
এত প্রেম কোথা খুলে,
কথা কহ মুখতুলে, প্রাণ মরে মরে॥"

(৺রামপ্রসাদ দাস)

রাণী তখন দু'টি হাত বাড়াইয়া উমাকে কহিলেন,—

কাফি—মধ্যমান।

"আয় মা, আয় মা উমা,
আয় তোরে কোলে করি।
কত দিন নিরাশে অকুল অন্ধকারে পড়ি!
তিন দিনের তরে বছর গেলে, মা আমার আসিবি বলে,
আশা পথে নয়ন ফেলে চিরদিন গেছে;
কোলে দুটী, নব কুমার, এই উমা এসেছিল আমার,
নয়ন ভরে মা তোমার কচি মুখের ভাতি হেরি॥"

ইহার পর উমা গৃহাভ্যন্তরে গিয়া গণেশকে কোলে করিয়া বসিলেন। মায়ের রূপের প্রভায় গৃহ আলোকিত

হইয়া গেল। জগন্মাতার এই শোভা দেখিয়া জনৈক সাধক গাইয়া উঠিলেন,—

মিশ্র—ঝাঁপতাল।

"বসিলেন মা হেম বরণী হেরম্বেরে নিয়ে কোলে।
হেরি গণেশ জননী রূপ রাণী ভাসে নয়ন জলে॥
ব্রহ্মাদি বালক যাঁর, গিরি বালিকা সেই তারা,
পদতলে বালক ভানু, বালক চন্দ্রমা তারা,
বালক-ভানু জিনি তনু বালক কোলে দোলে॥
আমি মনে ভাবি উমারে দেখি, কি উমার কুমারে দেখি
যুগল রূপ পশিয়ে রাখি আঁখি যুগলে;
দাশরথী কহিছে বাণী, দুই তুল্য দরশনে
হেরি ব্রহ্মময়ী রূপ, ব্রহ্ম রূপী গজাননে,
ব্রহ্ম কোলে ব্রহ্ম ছেলে ডাকিছে মা বলে॥"

এদিকে রাণীর আনন্দাশ্রুতে আঁখি ভরিয়া গেছে, স্নেহের পুতলির রূপ দেখিবার বড়ই অসুবিধা হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন,—

মল্লার—মধ্যমান।

"থাক থাক থাক নয়ন ধারা,
নয়ন ভরিয়ে একবার নিরখি নয়ন তারা।
না হেরে যে উমা তারা, বহিতে শ্রাবণের ধারা,
এল সেই নয়ন তারা, এখন ধারা একি ধারা?
নিরখিতে উমা ধনে, বহু দিনের সাধ মনে,
হেরিতে সে চন্দ্রাননে, বাধা দেও এ কেমন ধারা?
একে পলক বাধা চোকে, দেখতে দেয় না অনিমিখে,
তুমি তাহে হলে বাদী, হেরি বল কেমন ধারা?"

(৺ হরিশ্চন্দ্র মিত্র)।

স্নেহ বিগলিতা জননী তখন ঈষদ্ধাস্যময়ী উমাকে বলিতে লাগিলেন,—

ললিত—আড়া ঠেকা।

"কেমনে মা ভুলেছিলি এ দুখিনী মায়।
পাষাণ নন্দিনী তুইও কি পাষাণীর প্রায়॥
সম্বৎসর হ'ল গত, তো বিরহে অবিরত।
কেঁদেছি কহিব কত, আমি মা তোমায়॥
শয়নে ছিল না সুখ, সদাই বিষন্ন মুখ,
পেয়েছি কতই দুখ, দিবা যামিনী;
আকাশে হেরিয়া শশী, ভাবি তব মুখ শশী,
জাগিতাম সারা নিশি, কাঁদিতাম হায়॥
কখন স্বপনে তোমা, হেরিতাম ও মা উমা,
পড়েছে মুখে কালিমা, কাতরা ক্ষুধায়;
অমনি জাগিয়া উঠি' যাইতাম পথে ছুটি,
বলিতাম যারে তারে, এনে দে উমায়॥"

(৺ রামকৃষ্ণ রায়)।

পরে রাণী কন্যাকে নিভৃতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

সাহানা—ঝাঁপতাল।

"কেমন করে হরের ঘরে, থাকিস উমা বল না তাই।
কতলোকে কত বলে, লাজে আমি মরে যাই॥
চিতা ভস্ম মেখে অঙ্গে, জামাই বেড়ায় রঙ্গে ভঙ্গে,
তুই নাকি তার সঙ্গে সঙ্গে, সোনার অঙ্গে মাখিস ছাই॥
ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করে, জামাই নাকি ভিক্ষা করে।
এবার এলে সকল হরে উমা আমার ঘরে নাই॥"

উমা মাত্র তিন দিনের জন্য পিতৃভবনে আসিয়াছেন। দেখিতে দেখিতে সুখের দিন চলিয়া গেল। হায় এমনই করিয়াইত যায়। বাঙ্গালীর ঘরে কন্যা বিদায়ের দৃশ্য বড় করুণ, বড় মর্ম্মস্পর্শী! মা ভগিনীর হৃদয় যে কি ব্যথায়, কেমন বেদনায় উদ্বেল হইয়া ওঠে তাহা বলিবার নয়। কঠিন পুরুষ-হৃদয়ও কন্যার ছল ছল আঁখি দু'টি দেখিয়া কেমন করিয়া ওঠে, আর নীরবে ধারা বহিতে থাকে। তাই শকুন্তলাবিদায়ের সময়ে তত্ত্বদর্শী কুলপতি কণ্বও বলিয়াছেন,—

"যাস্যত্যদ্য শকুন্তলেতি হৃদয়ং সংস্পৃষ্টমুৎকণ্ঠয়া
কণ্ঠঃস্তম্ভিত বাষ্পবৃত্তি কলুষশ্চিন্তাজড়ং দর্শনম্।
বৈক্লব্যং মম তাবদী দৃশমিদং স্নেহাদরণ্যৌকসঃ

পীড্যন্তে গৃহিণঃ কথংনু তনয়া বিশ্লেষদুঃখৈর্ণবৈঃ॥"

কেবল আপনার জনেরই কি? পাড়া প্রতিবেশী সকলেরই চোখের পাতা ভিজিয়া উঠে। এমন কি যে সকল গৃহপালিত পশুপক্ষী প্রতিদিন কন্যা হস্ত প্রদত্ত আহার্য্যে ও আদরে পরিতৃপ্ত হইত, যে সকল তরুলতার মূলে কন্যা প্রভাতে এবং সায়াহ্নে জল সিঞ্চন করিত, তাহারা পর্য্যন্তও যেন তাহার বিরহে ব্যথিত হয়! তাইত ঋষি বাষ্পগদগদ কণ্ঠে বলিয়াছেন,—

"ভো ভোঃ সন্নিহিতা তপোবনতরবঃ
পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মাস্বপীতেষুযা
নাদত্তে প্রিয় মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবং।
আদ্যেবঃ কুসুম প্রসূতি সময়ে যস্যা ভবত্যুৎসবঃ
সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্ব্বৈরনুজ্ঞায়তাম্॥"

রাণী মেনকার হৃদয়ে সেই ভাবী বিচ্ছেদের ছায়া-পাত হইয়াছে। তিনি বলিতেছেন,—

আলাইয়া—আড়খেমটা।

"আমার এই ভয় মনে, বিজয়া দশমী দিনে,
অকূলে ভাসায়ে যাবে শিবে শিব-ভবনে॥
নবমীর নিশি হলে' অবসান, অন্ধকার করে' হ'বে অন্তর্ধান,
করিবেন দুর্গা স্বস্থানে প্রস্থান, নিজ পরিবার সনে॥
তাই করি প্রার্থনা করি যোড় হাত, যেন এ যামিনী আর না হয় প্রভাত,
আর যেন উদয় না হয় দিননাথ এই ভিক্ষা চরণে॥"

(দুর্গাপ্রসন্ন চৌধুরী)।

কিন্তু হায়! তাহা কি হয়? প্রকৃতি কি কাহারও করুণ ক্রন্দনে কর্ণপাত করে? রাত্রি প্রভাত প্রায় হইল। সখী জয়া পার্ব্বতীকে জাগাইতে আসিলেন। স্নেহ বিহ্বলা রাণী তাহাকে বলিলেন,—

ললিত—আড়াঠেকা।

"জাগাইও না হরজায়ায়, জয়া তোমায় বিনয় করি;
মাকে বলে' সারানিশি কাঁদিয়া পোহাল গৌরী॥
নিশিজেগে কাতর হ'য়ে, আছেন উমা ঘুমাইয়ে,
বিষাদেও বিধুবদন মলিন হয়েছে মরি॥
নিদ্রাভঙ্গ হ'লে পরে, হিমালয় আঁধার করে',
উমাশশী কৈলাসপুরে, যাবে পরিহরি।
নিতে এসেছেন হর, তাই বলি বিলম্ব কর,
যতক্ষণ ঘুমায়ে থাকে, ও বিধুবদন হেরি॥"

(৺হরিনাথ মজুমদার)।

রাণী পরে পাগলিনীর মত যাইয়া রাজাকে বলিলেন,—

"ওহে প্রাণনাথ গিরিবরহে, ভয়ে তনু কাঁপিছে আমার।
কি শুনি দারুণ কথা, দিবসে আঁধার॥
বিছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে বসে' মহাকাল,
বেরোও গণেশ-মাতা, ডাকে বার বার।
তব দেহ হে পাষাণ, এ দেহে পাষাণ প্রাণ,
এই হেতু এতক্ষণ না হলো বিদার॥
তনয়া পরের ধন, বুঝিয়া না বুঝে মন,
হায় হায় একি বিড়ম্বনা বিধাতার।
প্রসাদের এই বাণী, হিম গিরি রাজরাণী,
প্রভাতে চকোরী যেমন, নিরাশা সুধার॥"

(৺রামপ্রসাদ সেন)।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। শেষে বিদায়ের সময় আসিয়া পড়িল! বিসর্জ্জনের বাজনা বাজিয়া উঠিল! রোদন করিতে করিতে কুবলয়াক্ষীর লোচন যুগল আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। উমা মাকে প্রণাম করিতে অবনত হইলেন, রোদনপরায়না জননী তাঁহার প্রাণ-উমাকে হাতে ধরিয়া বক্ষে টানিয়া বলিলেন,—

ভৈরবী—মধ্যমান।

"এস কোলে করি উমা, বল মা বিধুবদনে।
তোমার মাকে মা বলে মা, কে আছে তোমাবিনে॥
তুমি আমার নয়ন তারা,
তোমায় বিদায় দিয়ে তারা,
তারা হারা নয়নে
কেমনে রব ভবনে॥

তিন দিনের তরে আসিয়ে,
নির্ব্বান আগুন জ্বেলে দিয়ে,
নিদয় হয়ে বিদায় দিতে
বল গো কি কারণে ;
সাগর-সিঞ্চন-নিধি—
ভাগ্যেতে মিলালেন বিধি,
নিজ দোষে হারাই যদি,
পাব না আর এ জীবনে ॥"

(৺হরিনাথ মজুমদার)

হায়, উমাকে যখন একান্তই ছাড়িতে হইল তখন বিষাদ-করুণ কণ্ঠে বলিলেন,—

ললিত-বিভাস—একতালা।

"আমার উমা যায় কৈলাসে, হিমালয় করি শূন্য।
নয়ন তারা হলেম হারা, নয়ন তারা তারা ভিন্ন ॥
জয়া দে গো মুক্তকেশীর
কেশ করি পরিচ্ছন্ন।
পুরবাসী দে গো আসি,
মায়ের সিঁথায় সিন্দুর চিহ্ন ॥
তিন দিন না গত হ'তে,
হর এসেছেন নিতে।
উমা বনে বিদায় দিতে,
হৃদয় হয় বিদীর্ণ ॥
দিনে আঁধার হ'ল আমার,
স্বর্ণপুরী হেরি শূন্য।
হরি বলে মা আমায়
দে গো বিদায় যাব তূর্ণ ॥"

(৺ হরিনাথ মজুমদার)।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে এই আগমনী বিজয়ার লীলা নিত্য সংঘটিত হইতেছে। গৃহের এই নিত্য লীলাই মহামায়া বিশ্বজননীতে আরোপ করিয়া বাঙ্গালী শরদাগমে কন্যাভাবে তাঁর আরাধনা করে। ভক্তগৃহী চণ্ডীমণ্ডপে সেই জগন্মনোমোহিনীর মুখারবিন্দে নিজ কন্যার মুখচ্ছবি সন্দর্শন করিয়া মা মা বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হয়। আর বিজয়া দশমীর অপরাহ্নে যখন পশ্চিমাকাশে আমার মায়ের গমন-পদবীতে রঞ্জিত মেঘ মালার সুবর্ণ সোপান পংক্তি রচনা করিয়া দিয়া সূর্য্যদেব ধীর পদে অস্তাচলে গমন করিতে থাকেন, তখন মায়ের সোনার প্রতিমা বিসর্জ্জন করিয়া সেই বিসর্জ্জনেরই করুণ শানাইর সঙ্গে ভক্ত গাইয়া উঠেন,—

পূরবী—আড়াঠেকা।

"ঊষার আলোক গড়া মা তোমার প্রতিমায়।
ঢেলে দিলে যে কিরণ, সে কোথা ভাসিয়ে যায় ॥
শেষ তপন আকাশে, শেষ সে কিরণ ভাসে,
শেষ বিজলির হাসে দূরে সলিলে মিলায় ॥
যত দূরে দূরে যাও, ভেবে ভেসে ফিরে চাও,
না জানি কি ব্যথা পাও, সোনার কমল কায় ॥
তবু না ফিরিলে আর, ঐ সে তরঙ্গ বিথার,
নীল অকূল পাথার নিল তুলে মা তোমায় ॥"

যদি একান্তই গেলে মা,—তবে যাও। ভক্তসঙ্গে আমরাও বলি,—

"গচ্ছ গচ্ছ গৃহে গচ্ছ
স্বস্থানং পরমং স্থানং।
সম্বৎসর ব্যতীতে তু
পুনরাগমনায় চ ॥"

মা শক্তিরূপিণী, আবার আসিও। আবার আসিয়া তোমার এই অধম সন্তানকুলের হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করিও।

শিবমস্তু।

শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত।

মুগ্ধ।

তৃণে পুষ্পে কিসলয়ে শ্যামলে কোমলে
হাসি-নৃত্য-গন্ধ-গানে হিলোলে কলোলে,
শত ছন্দে আনন্দের বিচিত্র বিকাশ
ভরিয়াছে দিগন্তের অনন্ত আকাশ।
সুমধুর যেই হেন আকুলি-ব্যাকুলি
এ বিশ্ব-সরসী-বুকে উঠে ফুলি' ফুলি'
প্রাণ মোর তারি মাঝে রহে প্রস্ফুটিয়া
শতদল সম ধীরে দলগুলি বিকশিয়া।
অসীম উদাসে চেয়ে তব মুখ-ছবি
সহস্র দুঃখেরে ঠেলি', হে আরাধ্য রবি।
সাধ হয় বুক ভরা সবখানি চালি'
অনিমিষ থাকি চাহি'—চাহি গো কেবলি।
আঁখি তুলে যদি তুমি নাহি চাহ—তবু
কমল সফল মানি' সুখী রবে, প্রভু।

শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্ত্তী।

পুস্তক পরিচয়।

মহাধর্ম্ম বার্ত্তিক—"কৃতি অস্তিত্ব।" শ্রীযুক্ত কালিমোহন মুখোপাধ্যায়, বি, এ, সম্পাদিত। প্রভু জগবন্ধুর কতকগুলি উপদেশ সাধারণে প্রচার উদ্দেশ্যে এই পুস্তিকার সূচনা। ভূমিকা পড়িয়া বোধ হইল তাঁহার উপদেশগুলি সূক্তাকারে মুদ্রিত করিয়া তৎসম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ও ভাষ্য লেখক ক্রমশঃ সংখ্যাকারে প্রকাশ করিবেন। প্রথম সংখ্যার সূক্ত "কৃতি অস্তিত্ব।" নাম শুনিলেই একটু সমস্যায় পড়িতে হয়। কিন্তু লেখক নিজেই আমাদের জন্য সে সমস্যা ভঞ্জন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। পুস্তিকার ভাব ও যেমন জটিল, ভাষাও তেমনি দুর্বোধ্য। যদি মহাপুরুষের মহাবাক্য সাধারণে প্রচার করাই এই পুস্তিকার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত সহজ বোধ্য ভাষায় তাহা প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। নতুবা সে উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না। লেখকের সমুদয় মতের সহিত কিম্বা এই গ্রন্থের সমুদয় প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত আমরা একমত হইতে না পারিলেও তিনি যে উদ্দেশ্য লইয়া ইহা প্রণয়ণ ও প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা অতি সাধু উদ্দেশ্য। মহাপুরুষের মহাবাণী সাধারণে যতই প্রচার হয়, ততই সমাজের পক্ষে মঙ্গল।

কোজাগরী।

বিশ্বের সকল শোভা মূর্ত্তিমতী হয়ে
আজ পূর্ণিমার নিশি করেছে উজ্জ্বল;
সুধাংশুর সুধা-স্রোতে ধরিত্রী-হৃদয়ে
আনন্দের বন্যা বহে শান্ত সুশীতল।

আকাশ বাতাস আজি কিবা মধুময়,
কিবা মধুময় আজি অন্তর আমার;—
চঞ্চলা রমার হাসি বুঝি ফুটে রয়
শুভ্র শেফালির ক্ষুদ্র বুকের মাঝার।

মরমের রুদ্ধ-দ্বার নিঃশব্দে খুলিয়া
কে জাগিবে সারা নিশি কে জাগিবে আজ,—
শুধু সেই হাসিটুকু লইতে আঁকিয়া
নিভৃত প্রাণের প্রাণে ভুলি' দ্বিধা-লাজ।

আত্মার গোপন কক্ষে কে কহিছে ডাকি'
মেলিবারে বিশ্বপানে আজি অন্ধ আঁখি।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

পাতালভেদী রাজা।

মুসলমান রাজত্বের শেষভাগে বর্ত্তমান যশোহর নড়াইলের প্রসিদ্ধ পল্লী সিঙ্গিয়ার অনতিদূরে এক হিন্দু রাজা ছিলেন; রাজার আসল নাম কি ছিল—তিনি কতদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন—ধন দৌলত, সৈন্ত সামন্ত, ক্ষমতা যোগ্যতা তাঁহার কেমন ছিল,—তাঁহার রাজধানীকেই বা লোকে কি নামে অভিহিত করিত—শতমুখী জনশ্রুতিও সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্ব্বাক।

প্রবাদ আছে—রাজা বহিরাক্রমণ হইতে আপনার ধন সম্পত্তি ও পরিবার বর্গকে সুরক্ষিত ও নিরাপদ রাখিবার অভিপ্রায়ে ভূনিম্ন একটী গুপ্ত পাতাল গৃহ নির্ম্মাণ করেন; এই জন্যই লোকে তাঁহাকে সাধারণতঃ পাতালভেদী রাজা নামে অভিহিত করিত।

ইচ্ছাতেই হউক আর অনিচ্ছাতেই হউক, রাজ্য রক্ষা করিতে হইলে রাজ-রাজড়ার যুদ্ধ অপরিহার্য্য। কালে এই 'পাতালভেদী রাজারও গ্রহবৈগুণ্যে কোন মুসলমান নরপতির সহিত যুদ্ধ বাধিল। যুদ্ধ যাত্রার পুর্ব্বে রাজা নিজের ধনদৌলত ও পরিবারবর্গকে সেই পাতাল গৃহে নিরাপদ রাখিয়া যাইবার সময় বলিয়া গেলেন—"আমি যুদ্ধে চলিলাম। ভগবানের কৃপায় যুদ্ধে শত্রু জয় করিয়া আবার আসিয়া তোমাদিগকে লইয়া সুখ শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করিব। আমি ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত, তোমাদিগকে এখানেই থাকিতে হইবে।" পরিবারবর্গের নিকট বিদায় লইয়া রাজা যুদ্ধে চলিয়া গেলেন। কিন্তু মানুষ যা ভাবে তা হয় কই!—তা যদি হইত তবে কি জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত শোক দুঃখের করুণ ঝঙ্কারে দিক্‌বিদিক আকুলিত হইয়া উঠিত!

রাজা আশা করিয়াছিলেন তিনি যুদ্ধে শত্রু সংহার করিয়া বিজয় গৌরবে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া পরিবারবর্গের সহিত সুখ শান্তি ভোগ করিবেন। রাজ-পরিবারও দিন গণিতেছিলেন—রাজা যুদ্ধান্তে দেশে আসিয়া তাঁহাদিগকে পাতাল গৃহ হইতে উদ্ধার করিবেন—তাঁহারা সূর্য্যের আলোকে, রাজার সোহাগে আবার উৎফুল্ল হইয়া উঠিবেন। কিন্তু ভগবান—কাহারও আশা পূর্ণ করিলেন না। রাজা যুদ্ধে নিহত হইলেন। সেই পাতাল গৃহের সন্ধান কেবল মাত্র রাজাই জানিতেন। তাঁহার মৃত্যুর সহিত তাঁহার পরিবারবর্গের আশার ক্ষীণ সূত্রটুকুও ছিঁড়িয়া গেল। তাঁহারা সেই পাতাল গৃহে চির সমাধি লাভ করিলেন।

বিজয়ী মুসলমান নরপতি সৈন্য সামন্ত লইয়া রাজার রাজধানী বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিলেন। রাজা গেলেন—রাজার পরিবারবর্গ, ধনদৌলত, রাজ্য, রাজধানী সব গেল—রহিল কেবল—জনশ্রুতি কালে বুঝি তাও যায়।

এ প্রদেশের আপামর সাধারণের ধারণা, ভূগর্ভে এখনও রাজার সেই পাতাল পুরী বর্ত্তমান আছে। এই জন শ্রুতিতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াই যশোহরের প্রসিদ্ধ নীলকর মিঃ আর, উইলিয়াম একবার সেই সমস্ত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইষ্টক স্তূপের একটী আমূল খনন করিয়া জন শ্রুতির মূল রহস্যোৎঘাটনের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু এমন সময় যশোহরে ভীষণ নীল বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায় উদ্যোগী উইলিয়াম বিপন্ন হইয়া নিজ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। 'পাতাল ভেদী রাজার' মূল রহস্য ভূগর্ভের যে তিমিরে সে তিমিরেই রহিয়া গেল।

কিন্তু কে বলিতে পারে—এই অগনিত স্তূপনিম্নে এই পাতাল গৃহের গুপ্ত কক্ষে 'পাতাল ভেদী রাজার' কোনও অজানিত পরিচয় পত্রে বাঙ্গলা ইতিহাসের কোনও অজ্ঞাত পৃষ্ঠা লুকায়িত আছে কি না!

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।

মৃত্যু বরণ।

(১)

আর তো ভালো লাগ্‌ছে না গো, বরণ করবো মরণকে!
বিষাদ ভরা জ্যান্তে মরা কাজ কি রেখে জীবনকে!
ওগো বন্ধু ওগো আমার—
সময় বুঝি হোলো যাবার!
প্রেমটি এবার চুকিয়ে দেবার চাইগো শেষের মিলনকে!
আর পলকের তর্ সহেনা—বরণ করবো মরণকে!

(২)

কাঁদার মত কাঁদ্‌তে পেলে হাল্কা হোতো হৃদয়টি!
ছট্‌ফটি আর সয় কি প্রাণে যখন পাবার সময়টি!
চাওয়ার পানে ছুটে ছুটে,
মর্‌ছি বিষম কাঁটা ফুটে,
চোখের জলে চাইতে হোলো চরম পাওয়ার বিষয়টি!
ছট্‌ফটি আর সয় কি প্রাণে যখন পাবার সময়টি!

(৩)

সাদা মেঘের মত আর তো নীল গগনে ঘুরবো না!
জ্যো'স্না রাতে পরীর সাথে হাওয়াতে আর উড়বো না!
কালো মেঘের মত এবার,
উঠ্‌বো জেগে চমৎকার,
বিশ্বলোকের প্রাণের অভাব না পূরিয়ে ছাড়্‌বো না!
সলিল বৃষ্টি কর্‌বো এবার, অনাসৃষ্টি রাখ্‌বো না।

(৪)

মলিনতা দেখ্‌লে আবার গর্জ্জাবো গো গর্জ্জাবো!
না মানে তো বজ্রগুলো মুহুর্মুহু খর্চ্চাবো!
দেখের জ্বালা দূর করিতে,
এবার আমি চাই মরিতে,
বিজ্‌লী-আলো জ্বালিয়ে ধরার পাপকে ভীষণ চম্‌কাবো!
সবকে শেষে জালিজিয়ে সমুদ্দুরে ঘুম যাবো!

(৫)

এস আমার শীতল হাওয়া, পুলক দিতে চিত্তকে;
জান্‌ছো প্রিয়ে হৃদয় দিয়ে চাইছি প্রাণের বিত্তকে!
ফুলের গালে চুমো খেয়ে,
বন্ধু এস গন্ধে ধেয়ে,
কেমন জোরে ফেল্‌বে ছিঁড়ে নিবিড় প্রেমের বাঁধনকে!
মর্‌লে কভু প্রেম মরে না—এম্‌নি জেনো মিলনকে!

(৬)

বিন্দু বিন্দু হোয়ে যখন মিশ্‌বো অসীম সিন্ধুতে,
তখন পাবো বুকটি জোরে, হায় কি মিলন বন্ধুতে!
সদাই তখন মিলন-সুখে,
ঢেউগুলো সব নাচবে বুকে,
গাইবো তখন যে সব গীতি শুন্‌বে জগৎ উল্লাসে!
আর পারিনে এসো প্রিয়ে বুক ফাটে গো উচ্ছ্বাসে!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

—o—
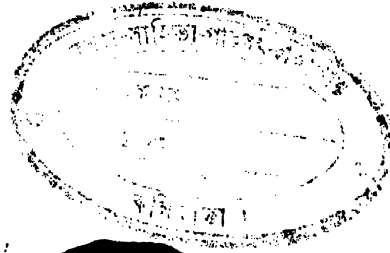
১০ বর্ষ | অগ্রহায়ণ ১৩২৭ | ৭ম সংখ্যা

ভারতের আর্য্য ও অনার্য্য।

চতুর্থ প্রস্তাব—ভারতীয় মত, দ্বিতীয় অংশ।

ক্রমশঃ সমাজে বর্ণভেদ উত্তরোত্তর বদ্ধমূল হইয়া গেল। গুণ এবং কর্ম্মানুসারে বর্ণভেদ হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যেক বর্ণের জন্য পৃথক্ পৃথক কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেল। মূল চারিটী বর্ণের মধ্যে পরস্পর বৈধ এবং অবৈধ যৌন সম্মিলনের ফলে শত শত উপজাতির সৃষ্টি হইল এবং প্রত্যেক জাতির পৃথক পৃথক "জাতীয় ব্যবসা" নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেল। ব্রাহ্মণের যাজন, অধ্যাপনা এবং দান গ্রহণ, ক্ষত্রিয়ের রাজ্যপালন এবং যুদ্ধ, বৈশ্যের কৃষি, বাণিজ্য, পশু পালন ও কুসীদ এবং শূদ্রের পক্ষে দ্বিজ ত্রিবর্ণের সেবা এবং নানাবিধ শিল্প কার্য্যের ব্যবস্থা হইল। আবার অনুলোম বিলোমাদি উপায়ে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের সংমিশ্রণে যে সকল মিশ্র বর্ণের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহাদেরও প্রত্যেকের জন্য বিভিন্ন প্রকার জীবিকার ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইল। মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ে এইরূপ বিভিন্ন বিভিন্ন জাতির দীর্ঘ তালিকা এবং তাহাদের প্রত্যেকের জীবিকার বিস্তৃত ব্যবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। সমাজের এইরূপ অবস্থা হইতেই ক্রমশঃ জগতের অষ্টম আশ্চর্য্যের বিষয় ভারতের "জাতি ভেদ" প্রথার প্রবর্ত্তন হইল।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে শাস্ত্রের ব্যবস্থা এরূপ ছিল না,—অর্থাৎ প্রথমে সমাজে ও জাতির বা জীবিকার এত কড়াকড়ি ছিল না। বৈদিক নিরুক্তকার যাস্ক ঋষি এক ঐতিহ্যের পরিচয় দিয়া বলিয়াছেন যে কুরুবংশীয় শন্তনু মহারাজার জ্যেষ্ঠ সহোদর দেবাপি ঋষি এবং কনিষ্ঠের পুরোহিত ছিলেন *। মহাভারতেও দেখিতে

* "দেবাপিশ্চার্ষ্টিষেণঃ শন্তনুশ্চ কৌরব্যৌ ভ্রাতরৌ বভূবতু......দেবাপিস্তপঃ প্রতিপেদে। তমুবাচ দেবাপিঃ পুরোহিতস্তেঽসানি যাজয়ানি চ ত্বেতি।" (২।১০)

পাওয়া যায় যে দেবাপি ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছিলেন†; এমন কি ঋক্‌ সংহিতায়ও এই ঐতিহ্যের সংবাদ আছে বলিয়া পণ্ডিতেরা মনেকরেন‡। আর সূর্য্যবংশীয় রাজা সুদাসের যজ্ঞে পৌরহিত্য লইয়া বশিষ্ঠ ঋষির সহিত ক্ষত্রিয় বংশীয় রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের ঘোরতর দ্বন্দ্বের কথা বৈদিক এবং পৌরাণিক সাহিত্যে খুবই প্রসিদ্ধ হইয়াছে ¶।

কোন ক্ষত্রিয় প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণের জীবিকা অবলম্বন করিলে তিনি ব্রাহ্মণই হইয়া যাইতেন, অর্থাৎ গুণ ও কর্ম্মের দ্বারা হীন বর্ণের ব্যক্তি উচ্চবর্ণে উন্নীত হইতেন, ইহার ব্যবস্থা এবং দৃষ্টান্তের উল্লেখ আমরা পূর্ব্বেই করিয়াছি। এখন, সমাজে বর্ণ এবং জাতিভেদ দৃঢ় হইলে নূতন নিয়ম এই হইল যে কোন বর্ণই উচ্চবর্ণের বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিবেন না; এবং করিলে দণ্ডিত হইবেন। তবে, আপৎকালে, অর্থাৎ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে অপারগ হইলে উচ্চবর্ণের ব্যক্তি নিম্ন বর্ণের বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিবেন, এরূপ বিধান রহিল বটে, কিন্তু নিম্ন বর্ণেরকেহ উচ্চবর্ণের বৃত্তি অবলম্বন করিলে, রাজা তাঁহাকে গুরুতর দণ্ড, (এমন কি প্রাণ দণ্ড পর্য্যন্ত) দিবেন এইরূপ শাস্ত্রাজ্ঞা প্রচারিত হইল। আর, ব্রাহ্মণ সকল জাতির শ্রেষ্ঠ এবং শূদ্র সকলের হেয়, এই নীতির প্রতিষ্ঠা হইল। শূদ্রের প্রতি সে কালের সভ্য আর্য্যসামাজিকগণ যেরূপ ব্যবহারের প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন, এরূপ কঠোর ব্যবহারের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর অন্যত্র প্রকৃতই খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন। ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব এবং শূদ্রের হেয়ত্ব সম্বন্ধে আমরা সংক্ষেপে কিছু প্রমাণবাক্যের উল্লেখ করিতেছি। অন্য স্মৃতি অথবা পুরাণাদির উল্লেখ না করিয়া সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে হিন্দুজাতির মহামাননীয় এবং অপেক্ষাকৃত উদার মনু মহারাজের আদেশেরই পরিচয় দিতেছি :—

প্রথম, ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে—

"ব্রহ্মার উত্তমাঙ্গ (মুখ) হইতে উদ্ভব, সকল বর্ণের প্রথমে জাত, এবং বেদজ্ঞান নিবন্ধন ব্রাহ্মণ সমুদায় জগতেরই ধর্ম্মতঃ প্রভু।" ৯৩। সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে প্রাণিগণ শ্রেষ্ঠ, প্রাণীদিগের মধ্যে বুদ্ধিযুক্ত প্রাণীরা শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিমান্ প্রাণিগণের মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ এবং মনুষ্যদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। ৯৬। জগতে যাহা কিছু আছে, তাহা সকলই ব্রাহ্মণের, ব্রাহ্মণের মহত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; এইজন্য-সংসারের সকল সামগ্রীতে ব্রাহ্মণেরই অধিকার। ১০০॥ প্রথম অধ্যায়॥" *

"জগতে যতরূপ অপরাধ মানুষের করা সম্ভব, সেই সকল অপরাধও যদি কোন ব্রাহ্মণ করেন, রাজা তথাপি তাঁহার কখনও প্রাণ দণ্ড দিবেন না। কিন্তু তাঁহার

---

† "সিন্ধুদ্বীপশ্চ রাজর্ষির্দেবাপিশ্চ মহাতপা।
ব্রাহ্মণ্যং লব্ধবান্ যত্র বিশ্বামিত্রস্তথামুনিঃ॥"
— মহাভারত, শল্যপর্ব্ব, ৪০ অধ্যায়।

‡ "আর্ষ্টিষেণো হোত্রমৃষির্নিষীদন্ দেবাপির্দেব সুমতিং চিকিত্বান্।" ঋক্‌সংহিতা (১০।৯৮।৫)

¶ ঋক্‌সংহিতার ৩য় মণ্ডলের ৫৩ সূক্তে বশিষ্ঠ ঋষির প্রতি বিশ্বামিত্র ঋষির অভিশাপ বর্ণিত হইয়াছে। এইজন্য এখনও বশিষ্ঠ গোত্রের ব্রাহ্মণেরা ঐ সূক্ত পাঠ করেন না। শৌনকীয় বৃহদ্দেবতায় ঐ নিষেধের পরিচয় আছে, যথা

"দ্বেষ্যা দ্বেষ্যাস্তু তাঃ প্রোক্তা-বিদ্যাচ্চৈবাভিচারিকাঃ।
বশিষ্ঠাস্তু ন শৃণ্বন্তি তদাচার্য্যকসম্মতম্॥
কীর্ত্তনাচ্ছ্রবণাদ্বাপি মহান্ দোষঃ প্রজায়তে॥ ২৪॥"
বিশ্বকোষধৃত।

* "উত্তমাঙ্গোদ্ভবাজ্জৈষ্ঠ্যাদ্ ব্রহ্মণশ্চৈব ধারণাৎ।
সর্ব্বস্যৈবাস্য সর্গস্য ধর্ম্মতো ব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ॥ ৯৩॥
ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠা নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ॥ ৯৬॥
সর্ব্বং স্বং ব্রাহ্মণস্যেদং যৎকিঞ্চিজ্জগতীগতম্।
শ্রৈষ্ঠ্যেনাভিজনেনেদং সর্ব্বং বৈ ব্রাহ্মণোঽর্হতি॥
১০০॥" প্রথম অধ্যায়।

সমুদায় ধনসম্পত্তি সহিত তাঁহাকে রাজ্য হইতে বাহির করিয়া দিবেন। ৩৮০। ব্রাহ্মণ বধের তুল্য অধর্ম্ম পৃথিবীতে আর কিছুই নাই; সেই জন্য রাজা ব্রাহ্মণ বধের কথা মনেও স্থান দিবেন না।

৩৮১। অষ্টম অধ্যায়॥" †

"বরুণদেব দণ্ড প্রদানের কর্ত্তা, কারণ রাজগণেরও দণ্ডবিধান বরুণই করেন; কিন্তু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সম্পূর্ণ জগতের ঈশ্বর। ২৪৫। ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে যতই কেন বিপদ্ প্রাপ্ত হউন না; রাজা ব্রাহ্মণগণকে কখনই কোপিত করিবেন না; কেন না ব্রাহ্মণেরা ক্রোধান্বিত হইলে সৈন্যামাত্য অশ্বগজাদি সহিত রাজাকে সত্তই মারিয়া ফেলিবেন। ৩১৩। যাঁহারা অগ্নিকে সর্ব্বভক্ষ্য, মহাসমুদ্রকে অপেয়, ক্ষয়রোগগ্রস্ত চন্দ্রকে সুস্থ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ক্রোধান্বিত করিলে কে না নাশ প্রাপ্ত হইবেন? ৩১৪। অগ্নিকে সংস্কার করা হউক বা নাই হউক, অগ্নি মহতী দেবতাই বটেন, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ মূর্খই হউন আর বিদ্বান্ই হউন, মহান্ দেবই বটেন। ৩১৭। যদি ব্রাহ্মণ সম্পূর্ণ কুৎসিত কার্য্যেও নিযুক্ত থাকেন, তথাপি তিনি সর্ব্বপ্রকারেই পূজনীয়,—যেহেতু তিনি পরম দেব স্বরূপ। ৩১৯।" নবম অধ্যায়।

"সর্ব্ববর্ণের মধ্যে বিশেষতা, স্বভাবের শ্রেষ্ঠতা, নিয়মের পালন এবং সংস্কারের অধিকার হেতু ব্রাহ্মণ সর্ব্ববর্ণেরই প্রভু॥ ৩। দশম অধ্যায়। *

এখন শূদ্রের হেয়তা সম্বন্ধে—

"শূদ্রের একমাত্র কর্ম্ম ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের প্রীত মনে সেবাই ভগবান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ৯১॥" প্রথম অধ্যায়।

ব্রাহ্মণকে গালি দিলে ক্ষত্রিয়ের দণ্ড একশত পণ, বৈশ্যের দেড়শত অথবা দুইশত পণ আর শূদ্রের প্রাণদণ্ড। ২৬৭। যদি শূদ্র দ্বিজাতিকে খুব কটু কথা বলিয়া মনে কষ্ট দেয়, তবে তাহার জিহ্বা কাটিয়া দিতে হইবে, যেহেতু সে ছোট লোক। ২৭০। যদি শূদ্র শত্রুতা করিয়া দ্বিজের নাম বা জাতি তুলিয়া গালি দেয়, তাহা হইলে সেই শূদ্রের মুখে অগ্নিবর্ণ জলন্ত লৌহময় দশাঙ্গুল শঙ্কু (শিক) প্রবেশ করাইয়া দিবে। ২৭১। যদি শূদ্র দর্প করিয়া ব্রাহ্মণকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিতে আসে, রাজা তাহার মুখে ও কানে ফুটন্ত তৈল ঢালিয়া দিবার আজ্ঞা দিবেন। ১৭২। অন্ত্যজ লোক যে কোন অঙ্গ দিয়া শ্রেষ্ঠবর্ণের লোককে আঘাত করিবে, মনু বলিয়াছেন তাহার সেই অঙ্গ কাটিয়া দিতে হইবে। ২৭৯। উচ্চবর্ণের লোকের সহিত একত্র বসিবার জন্য অভিপ্রায় করিলে নিম্ন বর্ণের লোকের (শূদ্রের) কটিতে লোহা পোড়াইয়া দাগ দিয়া নির্ব্বাসন দণ্ড দিবে অথবা তাহার পশ্চাদ্দেশ

---

† "ন জাতুব্রাহ্মণং হন্যাৎ সর্ব্বপাপেষ্বপি স্থিতম্।
রাষ্ট্রাদেনং বহিঃ কুর্য্যাৎসমগ্রধনমক্ষতম্॥ ৩৮০॥
ন ব্রাহ্মণবধাদ্ ভূয়ানধর্ম্মো বিদ্যতে ভুবি।
তস্মাদস্য বধং রাজা মনসাপি ন চিন্তয়েৎ॥ ৩৮১॥"
অষ্টম অধ্যায়।

* "ঈশো দণ্ডস্য বরুণো রাজ্ঞাং দণ্ডধরো হি সঃ।
ঈশঃ সর্ব্বস্য জগতো ব্রাহ্মণো বেদপারগঃ॥ ২৪৫॥
পরামপ্যাপদং প্রাপ্তো ব্রাহ্মণান্ ন প্রকোপয়েৎ।
তে হ্যেনং কুপিতা হন্যুঃ সদ্যঃ সবলবাহনম্॥ ৩১৩॥
যৈঃ কৃতঃ সর্ব্বভক্ষোঽগ্নিরপেয়শ্চ মহোদধিঃ।
ক্ষয়ী চাপ্যায়িতঃ সোমঃ কো ন নশ্যেৎ প্রকোপ্য তান্॥ ৩১৪॥
অবিদ্বাংশ্চৈব বিদ্বাংশ্চ ব্রাহ্মণো দৈবতং মহৎ।
প্রণীতশ্চাপ্রণীতশ্চ যথাগ্নির্দৈবতং মহৎ॥ ৩১৭॥
এবং যদ্যপ্যনিষ্টেষু বর্ত্তন্তে সর্ব্বকর্ম্মসু।
সর্ব্বথা ব্রাহ্মণাঃ পূজ্যাঃ পরমং দৈবতং হি তৎ॥ ৩১৯॥
নবম অধ্যায়।

"বৈশেষ্যাৎ প্রকৃতিশ্রৈষ্ঠ্যান্নিয়মস্য চ ধারণাৎ।
সংস্কারস্য বিশেষাচ্চ বর্ণানাং ব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ॥ ৩॥
দশম অধ্যায়।

(থাম্বা) একবারে কাটিয়া দিবে। ২৮১।" অষ্টম অধ্যায়।†

"যদি অন্ত্যজ (শূদ্র) নিজের দুই হাত দিয়া শ্রেষ্ঠ বর্ণের (ব্রাহ্মণকে) লোককে মারিবার জন্য তাহার মাথার চুল ধরে, তাহা হইলে রাজা নিশ্চিত মনে উহার হাত দুটা কাটাইয়া দিবেন; এবং যদি সে ঐরূপে দুইহাত দিয়া ব্রাহ্মণের পদদ্বয়, দাড়ি, গ্রীবা অথবা অণ্ডকোষ ধরে, তাহা হইলেও তাহার ঐ দুইহাত কাটাইয়া দিবেন। ২৮৩। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কেহ যদি পরস্ত্রীর (বিবাহিতার) সতীত্ব নষ্ট করে (বল পূর্ব্বক হউক বা না হউক) তাহা হইলে তাহার প্রাণদণ্ড হওয়া কর্ত্তব্য; যেহেতু চারিবর্ণের লোকের পক্ষেই রক্ষণীয় দ্রব্যের মধ্যে পত্নী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ৩৫৯। কোনও হীনবর্ণের কন্যা (অবিবাহিতা) যদি কোন উৎকৃষ্টতর বর্ণের পুরুষের সেবা (ব্যভিচার) করে, তাহা হইলে সেই কন্যার আদৌ কোন শাস্তি হইবে না; কিন্তু যদি কন্যা কোন হীন বর্ণের পুরুষকে ভজনা করে, তাহ হইলে আর সে এরূপ করিতে না পারে এইরূপ ভাবে তাহাকে সংযত করিয়া গৃহে রক্ষা করিবে ৩৬৪। যদি কোন হীন বর্ণের পুরুষ (শূদ্র) কোন উত্তম বর্ণের (দ্বিজের) কন্যাকে ভজনা করে (ব্যভিচার) তাহা হইলে তাহার বধ দণ্ড হইবে কিন্তু সমান বর্ণের পুরুষ হইলে পিতার ইচ্ছানুসারে শুল্ক দিবে। ৩৬৫। যদি শূদ্রবর্ণের পুরুষ দ্বিজাতি কোন স্ত্রীলোকের (সেই স্ত্রীলোক কোন পুরুষের আশ্রয়ে রক্ষিতা এবং অন্তঃপুর নিবাসী হউক বা না হউক) সহিত সহবাস করে, তাহা হইলে "অরক্ষিতা" গমনে শূদ্রের অঙ্গচ্ছেদ এবং সর্ব্বস্ব দণ্ড হইবে এবং "রক্ষিতা" গমনে বধ দণ্ড হইবে। ৩৭৪। অষ্টম অধ্যায়। *

"শূদ্র ক্রীতদাস হউক বা না হউক রাজা তাহাকে দিয়া ব্রাহ্মণের দাসত্বই করাইবেন; কেননা স্বয়ং ভগবান শূদ্রকে ব্রাহ্মণের দাসত্বের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন ৪১৩। শূদ্রের প্রভু তাহাকে দাসত্ব হইতে মুক্তি দিলেও সে দাসত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারে না; কারণ দাসত্ব তাহার স্বাভাবিক, তাহা হইতে কে তাহাকে উদ্ধার করিতে পারে? ৪১৪। ব্রাহ্মণ নিশ্চিন্ত চিত্তে শূদ্রের সম্পত্তি লইয়া আসিবেন, কারণ উহার ধন সম্পত্তি কিছুই নিজের নাই, সকলই স্বামীর (ব্রাহ্মণের)। ৪১৭।" অষ্টম অধ্যায়। *

---

* "একমেবতু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষা মনসূয়য়া॥ ৯১॥
প্রথম অধ্যায়।

"শতং ব্রাহ্মণমাক্রুশ্য ক্ষত্রিয়োদণ্ডমর্হতি।
বৈশ্যাঽপ্যর্দ্ধশতং দ্বেবা শূদ্রস্তু বধ মর্হতি॥ ২৬৭॥
একজাতি র্দ্বিজাতীংস্ত বচাদারুণয়া ক্ষিপণ।
জিহ্বায়াঃ প্রাপ্নুয়াচ্ছেদং জঘন্যপ্রভবো হিসঃ॥ ২৭০॥
নামজাতিগ্রহং ত্বেষা মভিদ্রোহেণ কুর্ব্বতঃ।
নিক্ষেপ্যোঽয়োময়ঃ শঙ্কুর্জ্বলনাস্তে দশাঙ্গুলঃ॥ ২৭১॥
ধর্ম্মোপদেশং দর্পেণ বিপ্রানামস্য কুর্ব্বতঃ।
তপ্তমাসেচকেত্তৈলং বক্ত্রে শ্রোত্রে চ পার্থিবঃ॥ ২৭২॥
যেন কেনচিদঙ্গেন হিংস্যাচ্চে চ্ছেষ্ঠমন্ত্যজঃ।
ছেত্তব্যাং তত্তদেবাস্য তন্মনো রনুশাসনম্॥ ২৩৯॥
সহাসনমভিপ্রেপ্সুরুৎকৃষ্টস্যাপকৃষ্টজঃ।
কট্যাংকৃতাঙ্কোনিবাস্যঃস্ফিচং বাঽস্যাববর্ত্তয়েৎ॥২৮১।
অষ্টম অধ্যায়।

---

* "কেশেষু গৃহ্নতো হস্তৌ ছেদয়েদবিচারয়ন্।
পাদয়ো দাড়িকায়াংচ গ্রীবায়াং বৃষণেষু চ॥২৮৩॥
অব্রাহ্মণঃ সংগ্রহণে প্রাণান্তং দণ্ডমর্হতী।
চতুর্ণামপি বর্ণানাং দারা রক্ষ্যতমাঃ সদা॥৩৫৯॥
কন্যাং ভজন্তীমুৎকৃষ্টং ন কিঞ্চিদপি দাপয়েৎ।
জঘন্যং সেবমানাং তু সংযতাং বাসয়েদ্ গৃহে॥৩৬৪॥
উত্তমাং সেবমানস্তু জঘন্যো বধমর্হতি।
শুল্কং দদ্যাৎ সেবমানঃ সমামিচ্ছেৎ পিতা যদি॥৩৬৫॥
শূদ্রো গুপ্তমগুপ্তং বা দ্বৈজাতং বর্ণমাবসন্।
অগুপ্তমঙ্গসর্ব্বস্বৈ গুপ্তং সর্ব্বেণ হীয়তে॥৩৭৪॥

"যাহারা জড়বস্তু সহায়ে (তাশ পাশা ইত্যাদি দ্বারা) কিংবা প্রাণীদিগের দ্বারা (ঘোড়া বা ষাঁড়ের দৌড়; মোরগ প্রভৃতির যুদ্ধ ইত্যাদি) জুয়া খেলিয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে ; কিংবা অপর কাহারও দ্বারা করাইয়া (অর্থোপার্জ্জন উদ্দেশ্যে) থাকে রাজা তাহাদের সকলকেই দৈহিক দণ্ড বা বধদণ্ড দিবেন, এবং দ্বিজচিহ্নধারী শূদ্রগণকেও ঐরূপ দণ্ড দিবেন ॥২২৪॥ শূদ্রবর্ণের কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন ব্রাহ্মণকে কোনও প্রকার ক্লেশ দেয়, তবে রাজা সেই শূদ্রকে নানাপ্রকার ভয়ঙ্কর শারীরিক পীড়া প্রদান করিতে করিতে বধ করাইবেন ॥ ২৪৮॥" নবম অধ্যায়। *

"অধম জাতির কোন লোক যদি উৎকৃষ্টবর্ণের আচরণীয় কোন জীবিকা অবলম্বন করেন, রাজা তাহাকে নির্ধন করিয়া নির্ব্বাসন দণ্ড দিবেন ॥৯৬॥ শূদ্রের পক্ষে ব্রাহ্মণের সেবাই পরম উপাদেয় কর্ম্ম ; এই কর্ম্ম ভিন্ন সে আর যাহা কিছু করে, তাহা সবই নিষ্ফল।১২৩। উক্ত সেবক কে (ব্রাহ্মণ প্রভু প্রাণধারণার্থ নিজের) উচ্ছিষ্ট অন্ন (পরিধানের জন্য) জীর্ণ বস্ত্র এবং জীর্ণ পরিচ্ছদ এবং (শুইবার জন্য) ধান্যের খড় (পোয়াল) দিবেন।১২৫। শূদ্রের পক্ষে কোন পাপ নাই, তাহার কোন সংস্কার নাই, কোনও ধর্ম্মে তাহার অধিকার নাই, (আর সে কিছু করিলে) তাহার পক্ষে কোন নিষেধ নাই।১২৬। শূদ্রের ক্ষমতা থাকিলেও সে কখনও ধন সঞ্চয় করিবে না। কেননা শূদ্র ধন পাইয়া ব্রাহ্মণগণকে অমান্য করিতে পারে।১২৯।" দশম অধ্যায়। ২

"বিড়াল, নকুল, চাষপক্ষী, ভেক, কুকুর, গোসাপ, পেচক ও কাক এই সকল প্রাণীকে বধ করিলে শূদ্র-হত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।১৩১। একাদশ অধ্যায় ৩।

"শূদ্রকে কোন পরামর্শ, যজ্ঞের হোম শেষ অথবা উচ্ছিষ্ট দিবে না ; উহাকে কোন ধর্ম্মোপদেশ দিবে না কিংবা কোনও ব্রতেরও উপদেশ দিবে না।৮০। যে ব্রাহ্মণ শূদ্রকে কোন ধর্ম্ম অথবা ব্রতের উপদেশ দেন তিনি সেই শূদ্রের সহিত অন্ধকারময় "অসংবৃত" নামক নরকে গমন করেন।" ৮১। চতুর্থ অধ্যায়। ৪

শূদ্রং তু কারয়েদ্দাস্যং ক্রীতমক্রীতমেব বা।
দাস্যায়ৈব হি সৃষ্টোঽসৌ ব্রাহ্মণস্য স্বয়ম্ভুবা ॥৪১৩॥
ন স্বামিনা নিসৃষ্টোঽপি শূদ্রো দাস্যাদ্ বিমুচ্যতে।
নিসর্গজং হি তত্তস্য কস্তস্মাৎ তদপোহতি ॥৪১৪॥
বিস্রব্ধং ব্রাহ্মণঃ শূদ্রাদ দ্রব্যোপাদন মাচরেৎ।
ন হি তস্যাস্তি কিঞ্চিৎ স্বং ভর্ত্তৃহার্য্যধনো হি সঃ ॥৪১৭॥
অষ্টম অধ্যায়।

* "দ্যূতং সমাহ্বয়ং চৈব যঃ কুর্য্যাৎকারয়েত বা।
তান্ সর্ব্বান্ ঘাতয়েদ্ রাজা শূদ্রাংশ্চ দ্বিজলিঙ্গিনঃ ॥
২২৪ ॥
ব্রাহ্মণান্ বাধমানন্তু কামাদবরবর্ণজম্।
হত্বাচিত্রৈর্ব্বধোপায়ৈরুদ্বেজনকরৈর্নৃপঃ ॥ ২৪৮ ॥
নবম অধ্যায়।

যো লোভাদধমো জাত্যা জীবেৎ উৎকৃষ্টকর্ম্মভিঃ।
তং রাজা নির্দ্ধনং কৃত্বা ক্ষিপ্রমেব প্রবাসয়েৎ ॥৯৬॥
বিপ্রসেবৈব শূদ্রস্য বিশিষ্টং কর্ম্ম কীর্ত্ত্যতে।
যদতোঽন্যদ্ধি কুরুতে তদ্ভবত্যস্য নিষ্ফলম্ ॥১২৩॥
উচ্ছিষ্টমন্নং দাতব্যং জীর্ণানি বসনানি চ।
পুলাকাশ্চৈব ধান্যানাং জীর্ণাশ্চৈব পরিচ্ছদাঃ ॥১২৫॥
ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিন্ন চ সংস্কারমর্হতি।
নাস্যাধিকারো ধর্ম্মেঽস্তি ন ধর্ম্মাৎ প্রতিষেধনম্ ॥১২৬॥
শক্তেনাপি হি শূদ্রেণ ন কার্য্যো ধন সঞ্চয়ঃ।
শূদ্রোহি ধনমাসাদ্য ব্রাহ্মণানেব বাধতে ॥১২৯॥
দশম অধ্যায়।

মার্জ্জারনকুলৌ হত্বা চাষং মণ্ডূকমেবচ।
শ্বগোধোলূক কাকাংশ্চ শূদ্রহত্যা ব্রতং চরেৎ ॥১৩১॥
একাদশ অধ্যায়।

নশূদ্রায়মতিং দদ্যান্নোচ্ছিষ্টং ন হবিষ্কৃতম্।
ন চাস্যোপদিশেদ্ ধর্ম্মং ন চাস্যব্রতমাদিশেৎ ॥৮০॥

শূদ্রবর্ণের উপর এইরূপ ব্যবহার কেবল মাত্র মনুমহারাজেরই অনুমোদিত তাহা নহে; স্মৃতি এবং পুরাণ মাত্রেই শূদ্রবর্ণের উপর এইরূপ, অথবা এতদপেক্ষাও অধিকতর নিষ্ঠুর ব্যবহারের আদেশ দিয়াছেন। বাহুল্য বোধে আমরা তাহার উদ্ধার করিলাম না। শূদ্রের সহিত এইরূপ নিদারুণ ব্যবহার করার ব্যবস্থা থাকিলেও কিন্তু ক্ষত্রিয়ের সহিত বিবাদ করিতে বিশেষ বাধা আছে। "ক্ষত্রিয়" রাজা অথবা বীর পুরুষ, সুতরাং তাহার সহিত সত্য সত্য কোমর বাঁধিয়া লড়াই করিতে যাওয়া নিরাপদ নহে; তাই মনুমহারাজ বলিতেছেন,—

"ক্ষত্রিয়, সর্প আর বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ যদি কৃশও হয়, তথাপি যে ব্যক্তি নিজের মঙ্গল কামনা করেন, তাঁহার পক্ষে উঁহাদের অবমাননা করা কদাপি উচিত নহে। ১৩৫। অবমাননা প্রাপ্ত হইলে এই তিন ব্যক্তিই মানুষকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবে, তাই বুদ্ধিমান্ যিনি তিনি ইঁহাদিগকে কখনও অবমানিত করিবেন না। ১৩৬।" চতুর্থ অধ্যায়। * ব্রাহ্মণ রহিত ক্ষত্রিয় কখনও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন না এবং ক্ষত্রিয়ের সাহায্য না পাইলেও ব্রাহ্মণের উন্নতি হয় না; পরন্তু ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় একত্র মিলিত হইলে ইহলোক এবং পরলোক সর্ব্বত্রই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৩২২।" নবম অধ্যায়। †

যো হ্যস্য ধর্ম্মমাচষ্টে যশ্চৈবাদিশতি ব্রতম্।
সোঽসংবৃতং নাম তমঃ সহ তেনৈব মজ্জতি ॥৮॥
চতুর্থ অধ্যায়।

* "ক্ষত্রিয়ং চৈব সর্পং চ ব্রাহ্মণং চ বহুশ্রুতম্।
নাবমন্যেত বৈ ভূষ্ণুঃ কৃশানপি কদাচন ॥ ১৩৫॥
এতত্রয়ং হি পুরুষং নির্দহেদবমানিতম্।
তস্মাদেতত্রয়ং নিত্যং নাবমন্যেত বুদ্ধিমান্ ॥ ১৩৬॥
চতুর্থ অধ্যায়।

† নাব্রহ্ম ক্ষত্রমৃধ্নোতি নাক্ষত্রং ব্রহ্ম বর্দ্ধতে।
ব্রহ্মক্ষত্রং চ সংযুক্তমিহ চামুত্র বর্দ্ধতে ॥ ৩২২ ॥
নবম অধ্যায়।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণের ব্যক্তি বৃত্তি এবং গুণের ফলে ব্রাহ্মণাদি বর্ণে উঠিয়া গিয়াছেন। ক্রমে চারিবর্ণ এবং অন্যান্য জাতি ভেদের কঠিন ব্যূহ প্রস্তুত হইলে নিম্নবর্ণের লোকের আর উচ্চবর্ণের কর্ম্মে অধিকার রহিল না। অধিক কি ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ও ব্রাহ্মণের বৃত্তি একেবারে নিষিদ্ধ হইল, যথাঃ—

"আপৎ কালে ক্ষত্রিয় বৈশ্য বৃত্তি কৃষি বাণিজ্যাদি জীবিকা অবলম্বন করিতে পারেন, কিন্তু ব্রাহ্মণের বৃত্তির কথা কখনও মনেও আনিবেন না।" ৯৫। দশম অধ্যায়। ‡

অথচ, প্রাচীন কালের নিয়ম ছিল যে উৎকৃষ্ট জীবিকার এবং কার্য্যের দ্বারা নিম্ন বর্ণের লোকের যেরূপ উন্নতি হইত, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ হীনবর্ণের বৃত্তি অবলম্বন করিলে সেই হীনবর্ণে অবনমিত হইয়া যাইবে। মনু বলিয়াছেন যে ব্রাহ্মণ মাংস, লবণ ও লাক্ষা বিক্রয় করিলে সদ্যঃ পতিত, এবং দুগ্ধ বিক্রয় করিলে তিন দিনেই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইবে। ৯২। এবং অন্যান্য পণ্য দ্রব্যের বিক্রয় করিলে সপ্তরাত্রের পর বৈশ্য হইয়া যাইবে। ৯৩।" দশম অধ্যায়। §

কিন্তু এখন ব্রাহ্মণ অকার্য্য কুকার্য্য যাহাই করুন না কেন,তাহার সাত খুন মাপ হইবার নিয়ম হইল। যে মনু পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, কাষ্ঠময় হস্তী, এবং চর্ম্মময় মৃগ যেরূপ নাম মাত্র হস্তী ও মৃগ মাত্র, (কিন্তু বস্তুতঃ হস্তী

‡ জীবেদেতেন রাজন্যঃ সর্ব্বেণাপ্যনয়ং গতঃ।
ন ত্বেব জ্যায়সীং বৃত্তিমভিমন্যেত কর্হিচিৎ ॥ ৯৫ ॥
দশম অধ্যায়।

§ সদ্যঃ পততি মাংসেন লাক্ষয়া লবণেন চ।
ত্র্যহেণ শূদ্রীভবতি ব্রাহ্মণঃ ক্ষীর বিক্রয়াৎ ॥ ৯২ ॥
ইতরেষাং তু পণ্যানাং বিক্রয়াদিহ কামতঃ।
ব্রাহ্মণঃ সপ্তরাত্রেণ বৈশ্যভাবং নিযচ্ছতি ॥ ৯৩ ॥
দশম অধ্যায়।

অথবা মৃগ নহে,) তদ্রূপ মূর্খ ব্রাহ্মণও কেবল বৃথা নাম সর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণ মাত্র। ১৫৭। নপুংসকের স্ত্রীসঙ্গ যেরূপ নিষ্ফল, গাভীর সহিত গাভীর সঙ্গম যেমন বৃথা, অজ্ঞ ব্যক্তিকে দান করা যেরূপ, বেদে অনভিজ্ঞ বিপ্রও সেইরূপ নিষ্ফল মাত্র। ১৫৮। যে দ্বিজ বেদ পাঠ না করিয়া অন্য বিষয়ে পরিশ্রম করেন, তিনি জীবিত কালেই সবংশে শীঘ্রই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১৬৮। দ্বিতীয় অধ্যায়"। সেই মনু সংহিতারই আবার পাওয়া যাইতেছে, "ব্রাহ্মণ অধ্যাপনা নাই করুন, তিনি যাজন নাই করুন অথবা নিন্দিত দানই গ্রহণ করুন, কিছুতেই তাঁহার দোষ হয়না, কারণ তিনি অগ্নির দ্বারা উত্তপ্ত জলের ন্যায়?। ১০৩। যে ব্রাহ্মণ প্রাণরক্ষার জন্য বিব্রত হইয়া যে সে হীন জীবিকা গ্রহণ করেন; আকাশ যেমন পঙ্কে দূষিত হয়না,—তদ্রূপ তিনিও পাপে লিপ্ত হন না। ১০৪। দশম অধ্যায়।" * আবার কলির ধর্ম্ম প্রবক্তা পরাশর ঋষি মাত্রা চড়াইয়া বলিতেছেন,—"ব্রাহ্মণ যদি দুঃশীল ও হন, তথাপি তিনিই পূজনীয়; শূদ্র জিতেন্দ্রিয় হইলেও সে পূজ্য হইবে না; কে দুষ্টা গাভীকে পরিত্যাগ করিয়া সুশীলা গর্দ্দভীকে দোহন করিতে যায়?" ৩২। অষ্টম অধ্যায়। †

ব্রাহ্মণ ক্রমশঃ আর্য্যসমাজে আপনার প্রতিপত্তি খুব বাড়াইয়া "বর্ণসকলের ব্রাহ্মণই গুরু" এই আদেশ চালাইয়া নিঃশঙ্ক হইয়াছেন। শূদ্রের বর্ণনা দেখিয়া মনে হয় যে, কালে মূলতঃ আর্য্য অথচ কর্ম্মদোষে অবনত শূদ্রের সংখ্যা অত্যন্ত কম হইয়া গিয়াছিল এবং অনার্য্য মহাসাগর হইতে উদ্ধৃত কতক শূদ্রের দ্বারাই আর্য্যগণের সামাজিক সর্ব্বপ্রকার সেবা চলিতেছিল। সেই সকল শূদ্রের সভ্যতার স্তর আধুনিক কোল, ভূমিজ, মুণ্ডা, সাঁওতাল এবং খন্দ প্রভৃতি বন্য অথবা পর্ব্বতীয় জাতিব্যূহের সভ্যতার স্তর অপেক্ষা অনেক নিম্ন ছিল। শিক্ষা ও ধর্ম্ম যে কি পদার্থ, তাহার কোনই সংকেত তাহাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। শাস্ত্রকারগণ এই সকল সদ্যোধৃত বন্যহস্তীযূথকে যে প্রকারে আর্য্যসভ্যতার শৃঙ্খল পরাইয়াছেন, তাহার বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখিলে ঋষিদিগের কৌশলের চমৎকারিত্ব এবং বুদ্ধির প্রসার দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

বন্য ও পার্ব্বতীয় জাতি সকল এখনও আছে, তখনও ছিল। সভ্যজাতির সহিত তুলনা করিলে তাহাদের শরীরের গঠন, মুখের এবং মস্তকের আকৃতি, চক্ষুর বিশেষ আকার, ও দেহের বর্ণ ইত্যাদি বাহ্য স্বভাব যেমন পৃথক্ ছিল, তাহাদের আন্তর স্বভাব চরিত্রেরও তদ্রূপ বিশিষ্টতা ছিল। কত শত শত যুগ অতীত হইয়াছে, ভারতের রাজনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে কত প্রবল পরিবর্ত্তনের প্রভাব দৃঢ় ভাবে বসিয়া গিয়াছে, তথাচ এখনও সভ্যের সহিত অসভ্যের সমতা সাধিত হয় নাই। সে কালে এই পার্থক্য যে কত অধিক ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। আমরা রাজনৈতিক অথবা

* "যথা কাষ্ঠময়োহস্তী যথা চর্ম্মময়োমৃগঃ।
যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি ॥ ১৫৭ ॥
যথা ষণ্ঢোঽফলঃ স্ত্রীষু যথাগৌর্গবি চাফলা।
যথা চাজ্ঞেঽফলং দানং তথা বিপ্রোঽনৃচোঽফলঃ ॥ ১৫৮ ॥
যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশুগচ্ছতি সান্বয়ঃ ॥ ১৬৮ ॥
দ্বিতীয় অধ্যায়।
নাধ্যাপনাদযাজনাদ্বা গর্হিতাদ্বা প্রতিগ্রহাৎ।
দোষো-ভবতি বিপ্রাণাং জ্বলনাম্বুসমা হিতে ॥ ১০৩ ॥
জীবিতাত্যয়মাপন্নো যোঽন্নমত্তি যতস্ততঃ।
আকাশমিব পঙ্কেন ন স পাপেন লিপ্যতে ॥ ১০৪ ॥"
দশম অধ্যায়।

† "দুঃশীলোঽপি দ্বিজঃ পূজ্যো ন শূদ্রো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
কঃ পরিত্যজ্য দুষ্টাং গাং দুহেচ্ছীলবতীং খরীম্? ॥ ৩২ ॥
পরাশরসংহিতা, অষ্টম অধ্যায়।

সমাজ বৈতিক সংস্কার প্রার্থীর চক্ষুতে এই সকল সমস্যার প্রতি দৃষ্টি করি নাই; আমরা কেবল মাত্র আর্য্যজাতির সভ্যতার বিকাশের,—উন্নতি অথবা অবনতি—প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই সকল তত্ত্বের অনুশীলন করিয়াছি এবং সেই লক্ষ্যকেই মনে রাখিবার জন্য শ্রোতৃবর্গ ও পাঠক মণ্ডলীকে সাগ্রহ অনুরোধ করিতেছি। ব্রাহ্মণের অত্যাচার অথবা শূদ্রের নির্য্যাতনের চিত্র কেন স্মৃতিশাস্ত্রে এরূপ উজ্জলবর্ণে লিখিত হইয়াছে, সমাজ তত্ত্বের ইতিহাস যাঁহারা অধ্যয়ন করিবেন, তাঁহারা উহার কারণ অনুসন্ধান করুন।

প্রাচীন আর্য্যশাস্ত্রসমূহে "বর্ণ" শব্দটি বার বার লিখিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। "বর্ণ" শব্দের অর্থ "রঙ্" এবং এই "রঙ্" কেই কেহ কেহ ব্রাহ্মণাদি বর্ণের দ্যোতক বলিয়া মনে করিয়াছেন। য়ুরোপীয় পণ্ডিতবর্গও এই "রঙ্" বা "colour" এর কথার উপর খুব প্রীতি প্রকাশ করিয়াছেন। "আর্য্য" জাতিরা যে চিরকালই শ্বেতকায়,—এই তত্ত্ব য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা "বড় গলা"র সহিত বলিয়াছেন এবং যেহেতু ভারত খণ্ডে সম্প্রতি বিশুদ্ধ শ্বেতকায় মনুষ্য সম্প্রদায়ের এক প্রকার অভাব ঘটিয়াছে, তাই তাঁহারা ভারতবাসী উচ্চশ্রেণীর "হিন্দু" জাতির ও "বিশুদ্ধ আর্য্যত্ব" স্বীকার করিতে চাহেন না এবং যে প্রদেশের ভদ্রলোকের বর্ণ যত কাল সে দেশের লোককে তাঁহারা তত অধিক পরিমাণে "অনার্য্য দুষ্ট" বলিয়াছেন। কেবল য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা একথা বলিলে আমাদের বিশেষ ক্ষতি ছিল না; কিন্তু তাঁহাদের "পদাঙ্কনুত" বা "মানস পুত্র" স্বদেশী ব্রাহ্মণ সন্তানও যে তাঁহার স্বজাতির নর নারীর মুখে বর্ণ সাঙ্কর্য্যের কালি খুব ঘন করিয়া মাখাইয়া দিয়াছেন,—এমন কি আপনাকেও অব্যাহতি দেন নাই;—তাই আমাদের বড় ক্ষোভ হয়। "দ্রবিড়", "মঙ্গোল" ও "শক" প্রভৃতি শব্দ শুনিয়াই যে য়ুরোপীয় গুরু ও তাঁহাদের দেশীয় শিষ্যদের মনে "অনার্য্যত্বের" ছায়া জাগিয়া উঠে;—কেহই বিচার অথবা বিবেচনা না করিয়াই চির সম্মানিত কোন রাজবংশ অথবা ব্রাহ্মণ বংশে "অনার্য্য শোণিত সংগ্রহ" স্বীকার করিয়া দেশী বিদেশী তাহার প্রচার করিয়া দেন, তাহাতেই আমাদের আপত্তি।

যাহা হউক "বর্ণ" শব্দের "রঙ্" অর্থ লইয়া শাস্ত্রে বিচার বিবেচনা দৃষ্ট হইয়া থাকে। পূর্ব্ব প্রস্তাবে বায়ু এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের উদ্ধৃত প্রমাণে আমরা দেখিয়াছি যে ক্ষত্রিয়ের বর্ণ রক্তবর্ণ, বৈশ্যের পীত বর্ণ এবং শূদ্রের কৃষ্ণ বর্ণের কথায় উল্লেখ আছে এবং মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বের উদ্ধৃত প্রমাণে উক্ত মতের প্রতিবাদ করা হইয়াছে। ফলতঃ শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের বর্ণ শ্বেত, ক্ষত্রিয়ের রক্ত, বৈশ্যের পীত এবং শূদ্রের কৃষ্ণবর্ণের কথা পাঠ করিয়া সে কালে অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তিরই মনে সন্দেহের উদয় হইয়াছিল। আজ কালকার ইংরাজী শিক্ষিত ছাত্র যেমন গুরুর মুখে শুনিতে পায় যে বিশুদ্ধ শ্বেতকায় আর্য্য নরনারীর সহিত কৃষ্ণবর্ণ অনার্য্য নরনারীর যৌন সম্মিশ্রণের ফলে ক্ষত্রিয়াদি নিম্ন বর্ণের লোকের দেহের "রঙ্ খারাপ" হইয়া গিয়াছে,—অর্থাৎ কৃষ্ণকায় অনার্য্য রক্তের পরিমাণের তারতম্যানুসারে ক্ষত্রিয়াদির দৈহিক বর্ণের তারতম্য ঘটিয়াছে;—এবং এইরূপ তত্ত্ব শুনিয়াই তাহারা সন্তুষ্ট হইয়া যায়; সে কালের ছাত্রেরা এত সহজে সন্তুষ্ট হইতে পারিত না। আর্য্য ত্রৈবর্ণিকের মধ্যে অনুলোম বিবাহের প্রথা নাম মাত্র থাকিলেও সেকালে "বর্ণসাঙ্কর্য্য কে" লোকে বড় ভয় করিত,—একথা সকলেই জানিত; অথচ, সমাজে উচ্চবর্ণের মধ্যেও কৃষ্ণ বর্ণের লোকের অভাব ছিলনা; সুতরাং বর্ণ বা "রঙ্" লইয়া জাতিভেদের সিদ্ধান্তে তাহাদের মন উঠিত না। আমরা সকলেই জানি যে রঘুবংশাবতংশ শ্রীরামচন্দ্র, যদুবংশীয় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এবং কুরুবংশীয় অর্জ্জুনের বর্ণ শ্বেত অথবা রক্ত ছিলনা, পরন্তু শ্যামবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ ছিল, এমন কি অসাধারণ সৌন্দর্য্যশালিনী দ্রৌপদী দেবী,—যাঁহাকে তাঁহার রূপের প্রাখর্য্যের জন্য মহাভারতের ঋষি—'নিখিল ক্ষত্রিয়ের

'সংসঙ্গিনী' আখ্যা দিয়াছেন,—এবং যাঁহাকে দেখিবা মাত্র যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতারই মনে যুগপৎ দারুণ লালসার উদয় হইয়াছিল * তিনি নামে ও গুণে" কৃষ্ণা ছিলেন। ঋষিগণের মধ্যেও অনেকেরই "রঙ্" কাল ছিল। এইরূপ নানাবর্ণের লোকই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মধ্যে দেখা যাইত। তাই ভবিষ্যপুরাণের ঋষি বলিয়াছেন,—

"দেখ, ব্রাহ্মণ মাত্রেরই বর্ণ চন্দ্রের জ্যোৎস্নার মত ধবল নহে, অথবা ক্ষত্রিয় মাত্রেই কিংশুক পুষ্পের মত রক্তবর্ণ নহে, অথবা বৈশ্যেরাও হরিতালের মত পীত নহে কিংবা শূদ্রেরাও অঙ্গারের মত কৃষ্ণবর্ণ নহে।৪১। কি চলন, কি দেহের অথবা কেশের রঙ্, কি সুখ দুঃখ বোধ কি মেদমজ্জা অস্থিমাংস রক্ত অথবা ত্বক্, যাহাই দেখ, চারিবর্ণের এ সকলই সমান, তবে চারিবর্ণের প্রভেদ কি প্রকারে হইতে পারে? ৪২। একমাত্র প্রজাপতি হইতেই যখন চারিবর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে, তখন আবার তাহাদের মধ্যে জাতিভেদ কিরূপে হইল? প্রমাণ, দৃষ্টান্ত, প্রবাদ যাহাই হউক না কেন, পরীক্ষা দ্বারা ত কোনই ভেদ পাওয়া যায় না। ৪৪। চারিজন একই পিতার পুত্র, সুতরাং সকলেরই একজাতি, পিতার যখন ভেদ নাই, তখন পুত্রের মধ্যে জাতিভেদ কেমন করিয়া হইবে? ৪৬।" †

এই যে সকল প্রশ্ন, ইহার কোন সঙ্গত উত্তর নাই। আসল কথা এই যে "সত্ব" "রজঃ" এবং "তমঃ" সাংখ্য দর্শনের এই তিনটি গুণের" প্রয়োগ হেতু "শ্বেত রক্তাদি" বর্ণের আরোপ করা হইয়াছে মাত্র। আলঙ্কারিক হিসাবে হাস্যের বর্ণ যেরূপ শ্বেত এবং ক্রোধের বর্ণ লোহিত ধরিয়া লওয়া হয়, সেইরূপ সত্ব গুণের শুদ্ধতার পরিচায়ক শ্বেতবর্ণ, রজোগুণের "রাগ দ্বেষাদির" পরিচায়ক রক্তবর্ণ, এবং তমোগুণের "জড়তার" পরিচায়ক কৃষ্ণবর্ণের আরোপ করা হইয়াছে মাত্র। শাস্ত্রে যে শব্দ যে অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, সেই শব্দকে সেই অর্থে না লইলে, গ্রন্থকর্ত্তার অভিপ্রেত ভাব হৃদগত হইতে পারে না। কাব্যশাস্ত্রের "রস" বৈদ্যশাস্ত্রে অনুসন্ধান করিতে গেলে লাঞ্ছিত হওয়াই স্বাভাবিক। তাই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের যিনি শাদা অথবা লাল রঙ্ দেখিবার আশা করেন, তাঁহাকে য়ুরোপ প্রভৃতি অতি কঠিন শীতের নিবাস স্থলে গিয়া সে দেশী সংস্কৃত ভাষাবিদ্ পণ্ডিতের সাহায্য লইতে হইবে। ভারতে "রঙ্" দেখিয়া জাতি চিনিয়া লওয়ার উপায় কোনও দিন ছিল না এখনও নাই।

মহাভারতের প্রসিদ্ধা সুন্দরী নারীকুল শিরোমণি দ্রৌপদী দেবী যে "কৃষ্ণা" ছিলেন, তাহা বলিয়াছি। একটি কৃষ্ণবর্ণা নারীর জন্য মহাভারতের রাজমণ্ডলী প্রাণপণ করিয়া পঞ্চাল নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে দেখিবামাত্র রাজসমূহ "চন্দ্রোদয়াকৃষ্টইবাম্বু

---

* মহাভারত, আদিপর্ব্ব, স্বয়ংবর পর্ব্বাধ্যায়।
১৯১ অধ্যায়, পরে উদ্ধৃত হইয়াছে।

† "ন ব্রাহ্মণাশ্চন্দ্র মরীচি শুক্লা ন ক্ষত্রিয়াঃ কিংশুক পুষ্পবর্ণাঃ।
ন চাপি বৈশ্যা হরিতাল তুল্যাঃ শূদ্র ন চাঙ্গার সমানবর্ণাঃ ॥৪১॥
পাদ প্রচারৈস্তনুবর্ণ কেশৈঃ সুখেন দুঃখেন চ শোণিতেন।
ত্বঙ্মাংসমেদোঽস্থিরসৈঃ সমানাঃ চতুঃ প্রভেদা হি কথং ভবন্তি ॥৪২॥
স এক এবাত্র পতিঃ প্রজানাং কথং পুনর্জ্জাতিকৃতঃ প্রভেদঃ।
প্রমাণ দৃষ্টান্ত নয় প্রবাদৈঃ পরীক্ষ্যমাণো বিষমত্বমেতি ॥৪৫॥
চত্বার একস্যপিতুঃ সুতাশ্চ তেষাং সুতানাং খলু জাতিরেকা।
এবং প্রজানাং হি পিতৈক এব পিত্রৈক ভাবাৎ ন চ জাতিভেদঃ ॥৪৬" ভবিষ্যপুরাণ, ব্রাহ্মপর্ব্ব, ৪২ অধ্যায়।

রাশিঃ” বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল এবং অধিক কি তাঁহার সৌন্দর্য্যে যুগপৎ যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতার মনেই বিষম বিকার উৎপন্ন হইয়াছিল *, তাহা শুনিলে অধুনা প্রকৃতই বিস্মিত হইতে হয়। এখন আমাদের সমাজে “য়িহুদী” অথবা “আর্ম্মাণী” বিবি এবং তাঁহাদের ধবধবে রঙ্ বিদ্যার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যার্থিগণের আরাধনার বস্তু হইয়াছে এবং কোনও বালিকার রঙ “একটু ময়লা” হইলে শুধু তাঁহাদের নহে, তাঁহাদের প্রৌঢ় পিতার মনেও একটা জুগুপ্সার উদ্রেক এবং তন্নিবন্ধন নাসিকার অস্বাভাবিক আকুঞ্চন ঘটিয়া থাকে ; অথচ, এই দেশে, কবিকুলের উপজীব্য অলঙ্কার শাস্ত্রে সুন্দরী শ্রেষ্ঠ “পদ্মিনী” নারীর পরিভাষা করিতে গিয়া শাস্ত্রকার বলিয়াছেন, যে—

‘কুবলয় দল শ্যামা কাপি চাম্পেয় গৌরী,’

অর্থাৎ “পদ্মিনী” নারীদের কাহারও বা নীলপদ্মের দলের মত, এবং কাহারও বা চাঁপা ফুলের মত রঙ্” হয়। অধিক কি, সে কালে, সেই অতি প্রাচীন “বৈদিক যুগে,” মহাকুল প্রসূত ভদ্র এবং সভ্য সজ্জনেরা “কালো ছেলে” হইবার জন্ত সাধ্য সাধনা করিতেন। আজকাল প্রমাণ না দিলে, কাহারই কোনও কথা কেহ মানিবেন না,—সুতরাং প্রমাণ দিতেছি।

বৈদিক যুগে “গর্ভাধান” সংস্কার যে প্রচলিত ছিল, তাহা অনেকেই শুনিয়াছেন, এখনও এদেশের কোন নিষ্ঠাবান্ হিন্দুপরিবারে উহার ‘‘নাম মাত্র” অনুষ্ঠান আছে। “নাম মাত্র” এই জন্ত বলিতেছি যে এখন বৈদিক ষোড়শ সংস্কারের (দশবিধ নহে,—ষোড়শই বটে,—আমরা ভ্রম করি নাই) কোনটীরই প্রকৃত অনুষ্ঠান নাই। আয়ুর্ব্বেদ এবং বেদে যাঁহাদের দৃষ্টি আছে, তাঁহারা অবশ্যই আমাদের কথার সত্যতা স্বীকার করিবেন। যাহা হউক, আমরা “গর্ভাধান” সংস্কারের সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুইচারি কথা অতি প্রাচীন “বৃহদারণ্যক উপনিষৎ” হইতে উদ্ধার করিতেছি :—

“যদি কেহ ইচ্ছা করেন, আমার পুত্র শুক্লবর্ণ হউক, একটি বেদ পাঠ করুক, পূর্ণআয়ু লাভ করুক, তবে দুগ্ধের সহিত তণ্ডুল পাক করিয়া ঘৃতের সহিত স্ত্রীপুরুষ দুইজনে ভক্ষণ করিবেন। ১৪। অথবা যদি কেহ ইচ্ছা করেন, আমার পুত্র কপিল বা পিঙ্গল বর্ণ হউক, দুইটি বেদ পাঠ করুক, সর্ব্ব আয়ু লাভ করুক, তবে তিনি এবং তাঁহার পত্নী দধিতে তণ্ডুল পাক করিয়া ঘৃতের সহিত ভোজন করিবেন। ১৫। যদি কেহ ইচ্ছা করেন, আমার শ্যামবর্ণ, লোহিত নেত্র পুত্র হউক, তিনটি বেদ পাঠ করুক, পূর্ণ আয়ু লাভ করুক, জলের সহিত তণ্ডুল পাক করিয়া ঘৃতের সহিত দম্পতী ভোজন করিবেন। ১৬। যদি কেহ ইচ্ছা করেন, আমার পণ্ডিতা কন্যা হউক এবং সর্ব্ব আয়ু লাভ করুক, তিলের সহিত তণ্ডুল পাক করিয়া ঘৃতের সহিত দম্পতী ভোজন করিবেন। ১৭। যদি কেহ ইচ্ছাকরেন যে আমার পুত্র পণ্ডিত, সভার মধ্যে গমনশীল, জয়যুক্ত, সকল লোকের প্রশংসাভাজন এবং সুন্দর বাণীর ভাষিতা হউক, সমুদায় বেদের পারগ হউক, পূর্ণ আয়ু লাভ করুক, তাহা হইলে মাষের সহিত তণ্ডুল পাক করিয়া ঋষভ নামক জীবণীয় ওষধিকন্দ এবং ঘৃতের সহিত ভোজন করিবেন ॥ ১৮ ॥” *

---

* “জিষ্ণোর্বর্চনমাজ্ঞায় ভক্তি স্নেহ সমন্বিতম্।
বুদ্ধিঃ নিবেশয়ামাসুঃ পাঞ্চাল্যাং পাণ্ডুনন্দনাঃ ॥১১॥
দৃষ্ট্বা তে তত্র পশ্যন্তীং সর্ব্বে কৃষ্ণাং যশস্বিনীম্।
সংপ্রেক্ষ্যান্যোন্য মাসীনাং হৃদয়ৈস্তামধারয়ন্ ॥১২॥
তেষাং তু দ্রৌপদীং দৃষ্ট্বা সর্ব্বেষামমিতৌজসাম্।
সংপ্রমথ্যেন্দ্রিয়গ্রামং প্রাদুরাসীন্ মনোভবঃ
॥১৩॥
কাম্যং হি রূপং পাঞ্চাল্যা বিধাত্রাবিহিতং স্বয়ম্।
বভূবাধিকমন্যা ভ্যঃ সর্ব্বভূত মনোহরম্ ॥ ১৪ ॥
মহাভারত, আদিপর্ব্ব, স্বয়ংবরপর্ব্ব ১৯১ অধ্যায়।

* “স য ইচ্ছেৎপুত্রো মে শুক্লো জায়েত বেদমনুব্রবীত

উপস্থিত বৃহদারণ্যকীয়া শ্রুতির অষ্টাদশ বাক্যে "মাষৌদনের" স্থলে অনেক মুদ্রিত পুস্তকে "মাংসৌদনং" পাঠ দেখিতে পাওয়া যায় এবং ভাষ্যকার শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য এই পাঠই গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে "ঔক্ষেন আর্ষভেণ বা" বাক্যের অর্থ পুংজাতীয় গোর—অর্থাৎ ষাঁড়ের মাংস এবং সমুদায় পদের মর্ম্মার্থ এই যে উল্লিখিত দম্পতী বৃষের মাংসের সহিত তণ্ডুল পাক করিয়া ঘৃতের সহিত ভোজন করিবেন। ভগবান্ ভাষ্যকারের উপর আমাদের ভক্তি কাহারই অপেক্ষা ন্যূন নহে, কিন্তু এখানে আমরা তাঁহার গৃহীত অর্থ গ্রহণ করিতে পারি নাই। সেই প্রাচীন কালে যজ্ঞাদিতে ও অতিথি সৎকারের জন্য গোবধ করা হইত, তাহা সত্য এবং এখনও বিবাহে জামাতাকে পাদ্যঅর্ঘ দিবার সহিত তাঁহার ভোজনার্থে একটি গোবধ করিবার সংকল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। এমন কি বৈবস্বত মনুপুত্র পৃষধ্র রাজার যজ্ঞে নিত্য নিত্য অপরিমিত গব্যমাংস ভোজনের নিমিত্তই ব্রাহ্মণদের অতিসার রোগ ভারতে প্রথম আবির্ভূত হইয়াছিল, এই রূপ ঐতিহ্য আয়ুর্ব্বেদে পাওয়া যায় *। তথাপি এই গর্ভাধানের প্রসঙ্গে যে দম্পতীকে গোমাংস ভক্ষণের ব্যবস্থা দেওয়া হয় নাই পরন্তু ভেষজ দ্রব্য বিশেষের সহিত মাষকলাই এর সম্ভক্ত খিচুড়ী খাওয়ার ব্যবস্থাই দেওয়া হইয়াছে, ইহাই আমাদের ধারণা। শুধু আমাদের ধারণা নহে, "ঋষভ" নামক ঔষধ বিশেষ গর্ভাধানের যে বিশেষ অনুকূল তাহা আমরা আয়ুর্ব্বেদে দেখিয়াছি। আয়ুর্ব্বেদেও ইচ্ছামত শ্যামবর্ণ এবং কৃষ্ণবর্ণ পুত্র উৎপাদনের প্রক্রিয়া কথিত হইয়াছে, যথা—

"যে নারী বৃহৎকায়, শ্বেতবর্ণ, সিংহের ন্যায় (পীতবর্ণ) চক্ষু, তেজস্বী এবং শুদ্ধসত্ত্বসম্পন্ন পুত্রের কামনা করেন, শুদ্ধ স্নানের পর তাঁহাকে শ্বেতবর্ণের যবের মন্থ, মধু ও ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া শ্বেতবর্ণের বৎস সহিত শ্বেতবর্ণা গাভীর দুগ্ধে প্রক্ষেপ দিয়া এবং আলোড়ন করিয়া রৌপ্য অথবা কাংস্য পাত্রে সপ্তাহকাল সতত পান করিতে দিবে এবং তিনি প্রাতঃকালে শালি তণ্ডুল অথবা যবের অন্ন বিকার (অন্ন, খিচুড়ী, পায়স ইত্যাদি) দধি, মধু, ঘৃত অথবা দুগ্ধের সহিত ভোজন করিবেন। ১৪।" †

সর্ব্বমায়ুরিয়াদিতি ক্ষীরৌদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িত বৈ॥ ১৪॥ অথ য ইচ্ছেৎ পুত্রো মে কপিলঃ পিঙ্গলো জায়েত দ্বৌ বেদাবনুব্রবীত সর্ব্বমায়ুরিয়াদিতি দধ্যোদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িত বৈ॥ ১৫॥ অথ য ইচ্ছেৎ পুত্রো মে শ্যামো লোহিতাক্ষো জায়েত ত্রীন্ বেদাননুব্রবীত সর্ব্বমায়ুরিয়াদিত্যুদৌদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িত বৈ॥ ১৬॥ অথ য ইচ্ছেদ্দুহিতা মে পণ্ডিতা জায়েত সর্ব্বমায়ুরিয়াদিতি তিলৌদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িত বৈ॥ ১৭॥ অথ য ইচ্ছেৎ পুত্রো মে পণ্ডিতো বিজিগীতঃ সমিতিঙ্গমঃ শুশ্রূষিতাং বাচং ভাষিতা জায়েত সর্ব্বান বেদাননুব্রবীত সর্ব্বমায়ুরিয়াদিতি মাষৌদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িত বা ঔক্ষেন বা আর্ষভেণ বা॥১৮॥"

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ, অষ্টম অধ্যায়, চতুর্থ ব্রাহ্মণ।

* "অতশ্চ প্রত্যবরকালং পৃষধ্রেণ দীর্ঘসত্রেণ যজতা পশূনামলাভাদ্গবামালম্ভঃ প্রাবর্ত্তিতঃ।... তেষাং চোপযোগাদুপকৃতানাং গবাং গৌরবাদৌষ্ণ্যাদসাত্ম্যত্বাদশস্তোপযোগাচ্চোপহতাগ্নীনামুপহতমনসাম্ অতীসারঃ পূর্ব্বমুৎপন্নঃ পৃষধ্রযজ্ঞে।৩। চরকসংহিতা, চিকিৎসিতস্থান, ১০ অধ্যায়।

† "সা চেদেব মাশীত বৃহন্তমবদাতং হর্যক্ষমোজস্বিনং শুচিং সত্ত্বসংপন্নং পুত্রমিচ্ছেয়মিতি। শুদ্ধস্নানাৎ প্রভৃত্যস্যৈ মন্থমবদাতং যবানাং মধুসর্পির্ভ্যাং সংসৃজ্য শ্বেতায়াঃ গো সরূপবৎসায়াঃ পয়সালোড্য রাজতে কাংস্যে বা পাত্রে কালে সপ্তাহং সততং প্রযচ্ছেৎ পানায় প্রাতশ্চ শালিযবানু বিকারান্ দধিমধুসর্পির্ভিঃ পয়োভির্বা সংসৃজ্য

যে নারী স্নিগ্ধ শ্যামবর্ণ, লোহিত নেত্র, বিশাল বক্ষ এবং মহা বাহু পুত্র কামনা করেন অথবা যিনি কৃষ্ণবর্ণ, সুদীর্ঘ কেশ,শুক্ল চক্ষু, শুক্ল দন্ত এবং তেজস্বী পুত্র প্রার্থনা করেন, তিনিও উক্তরূপ হোম করিবেন কিন্তু উপকরণ প্রভৃতির শুক্লবর্ণ হইবে না পরন্তু যেরূপ বর্ণের পুত্র কামনা করেন, সেইরূপ বর্ণের উপকরণ সংগ্রহ করিবেন। ২১।" (অর্থাৎ শ্যামবর্ণের সবৎসা গাভীর দুগ্ধ ইত্যাদি)

"যে যে নারী যেরূপ পুত্রের আকাঙ্ক্ষা করিবেন, অথবা যেরূপ যেরূপ দেশের লোকের মত পুত্রের প্রার্থনা করিবেন, তাঁহাকে তাঁহাকে সেইরূপ ক্রিয়ার উপদেশ দিবেন এবং সেই সেই দেশের লোকের মত আহার বিহার পরিচ্ছদ ইত্যাদি উপভোগ করিতে বলিবেন। ২৩।

"এই সকল কর্ম দ্বারাই যে কেবল সন্তানের বর্ণের উৎকর্ষ বিশেষ হয়, তাহা নহে কিন্তু তেজোধাতু, জলধাতু ও অন্তরীক্ষধাতু প্রায়ই শ্বেতবর্ণের উৎপত্তির কারণ হইয়া থাকে; পৃথিবীধাতু এবং বায়ুধাতু কৃষ্ণবর্ণের হেতু এবং সর্বধাতুর সমান সমবায়ে শ্যামবর্ণের উদ্ভব হইয়া থাকে। ২৪।

পুংসবনের জন্য অন্যান্য উপচারের সহিত "'জীবক', 'ঋষভ', 'অপামার্গ', এবং 'সহচর' ভেষজ বাটিয়া সমস্ত একত্র অথবা যথেষ্ট দুগ্ধের সহিত পত্নীকে পান করাইবে। ৩২।" * চরক সংহিতা, শারীর স্থান, অষ্টম অধ্যায়।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্র-বারিধির কৌস্তভরত্ন স্বরূপ "চরক সংহিতা"র উদ্ধৃত উপদেশ হইতে আমরা দেখিলাম যে লোকে কেবল যে শ্বেতকায় (গৌরবর্ণ) পুত্রেরই সাধ করিত তাহা নহে, পরন্তু শ্যামবর্ণ এবং কৃষ্ণবর্ণ পুত্রের আশায়ও কত সাধ্য সাধনা করিত। বরঞ্চ চরক ঋষির মতে সর্ববর্ণের অপেক্ষা শ্যামবর্ণেরই শ্রেষ্ঠত্ব দেখা যাইতেছে; যেহেতু তিনি বলিতেছেন পঞ্চভূত সমুত্থিত পঞ্চধাতুরই একত্র সমসন্নিবেশেই শ্যামবর্ণের পুত্রের জন্ম হইয়া থাকে। পূর্বোক্ত বৃহদারণ্যকীয়া শ্রুতি-বাক্যেও তাহারই সমর্থন দেখিতে পাওয়া যায়।

এইমাত্র আমরা চরক মুনির যে ৩২ সংখ্যক বাক্য উদ্ধৃত করিলাম, উহাতে অন্যান্য ভেষজের সহিত "ঋষভের" উল্লেখ আছে। উহা যে "ষাঁড় গরু" নহে, তাহা বৈদ্যশাস্ত্রের সহিত নাম মাত্র পরিচিত ব্যক্তিও বুঝিবেন। আর বৈদ্যশাস্ত্রের সহিত পরিচয়েরই বা আবশ্যকতা কি? চরকের "পঞ্চাশৎ" গণের উদ্ভিজ্জৌষধের মধ্যে "জীবনীয়" গণের অন্তর্গত "অষ্টবর্গ" শ্রেণীর মধ্যে "ঋষভ" একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ, তাহার প্রমাণ পাদটীকায় উদ্ধৃত করিতেছি। †

অনুবাদ ॥ ১৪ ॥ চরকসংহিতা, শারীরস্থান, ৮ম অধ্যায়।

গাভী এবং বৎস উভয়েরই শ্বেতবর্ণ হওয়া চাই,—এরূপ গাভীর দুগ্ধই এই প্রক্রিয়ার জন্য আদিষ্ট হইয়াছে।

* "যা তু স্ত্রী শ্যামং লোহিতাক্ষং ব্যূঢ়োরস্কং মহাবাহুং পুত্রমাশাসীত যা বা কৃষ্ণং কৃষ্ণমৃদুদীর্ঘকেশং শুক্লাক্ষং শুক্লদন্তং তেজস্বিনমাত্মবন্তম্। এষ এবানয়োরপি হোমবিধিঃ কিন্তু পরিবর্হবর্ণবর্জ্যং স্যাৎ পুত্রবর্ণানুরূপস্তু যথাশীরেবতয়োঃ পরিবর্হোঽন্যঃ কার্য্যঃ স্যাৎ ॥ ২১ ॥

"যা যা চ যথাবিধং পুত্রমাশাসীত তস্যাস্তস্যাস্তাং তাং পুত্রাশিষমনুনিশম্য তাংস্তাঞ্জনপদানাং মনুষ্যানামনুরূপং পুত্রমাশাসীত সা সা তেষাং তেষাং জনপদানামাহার বিহারোপচারপরিচ্ছদাননুবিধীয়স্বেতি বাচ্যা স্যাৎ ॥২৩॥

"ন তু খলু কেবলমেত দেবকর্ম বর্ণানাং বিশেষকরমপি তু তেজোধাতুরপ্যুদকান্তরীক্ষ ধাতু প্রায়োঽবদাতবর্ণ করো ভবতি। পৃথিবী বায়ুধাতু প্রায়ঃ কৃষ্ণবর্ণকরঃ সমসর্বধাতু প্রায়ঃ শ্যামবর্ণকরঃ ॥২৪॥

'তথৈবপরাঞ্জীবকর্ষভকাপামার্গসহচরকল্কাংশ্চ যুগপদে-কৈকশো যথেষ্টং বাপ্যুপসংস্কৃত্য পয়সা ॥ ৩২ ॥'
চরকসংহিতা, শারীর স্থান। অষ্টম অধ্যায়।

† "জীবকর্ষভকৌ মেদা মহামেদা কাকোলী ক্ষীরকাকোলী মুদ্গমাষপর্ণ্যৌ জীবন্তী মধুকমিতি দশেমানি

"জীবনীয়" শব্দের অর্থ "জীবনপ্রদ"—অর্থাৎ ইংরাজীর Life giving। এই দশটি বস্তুর সহিত ভাবমিশ্রের "অষ্টবর্গের" যৎসামান্ত প্রভেদ আছে। ভাবমিশ্রের মতে "জীবক, ঋষভক ; মেদ, মহামেদ ; কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী ; ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি" এই আটটি ভেষজ। চরকাদি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে যতপ্রকার বলবীর্য্যপ্রদ এবং পুষ্টিকর ঔষধ, ঘৃত এবং অবলেহাদি আছে, অর্থাৎ রসায়ন এবং বাজীকরণ অধিকারের যত বড় বড় ঔষধ ও ঘৃতাদির ব্যবস্থা আছে, সকলগুলিতেই এই "অষ্টবর্গের" আবশ্যকতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। "চ্যবনপ্রাশ," "অশ্বগন্ধাঘৃত," "কুমার কল্পক্রমঘৃত" ইত্যাদি বৈদিক কিংবা তান্ত্রিক কোন ঔষধই এই আটি ঔষধ না হইলে হয় না ; অথচ আক্ষেপের বিষয় এই যে গত পঞ্চশত বৎসর হইল, এই ঔষধগুলি আমাদের বৈদ্যরাজবর্গের অপ্রাপ্য হইয়াছে এবং ভাবমিশ্রের উপদেশমত "মধু অভাবে গুড়ের" ন্যায় উহাদের স্থলে অনুকল্প ব্যবস্থা চলিতেছে। যাহা হউক, ধন্বন্তরি নিঘণ্টু প্রভৃতি শাস্ত্রে কথিত হইয়াছিল "ঋষভ" রসুনের ন্যায় কন্দাকৃতি অথচ দেখিতে বৃষশৃঙ্গের মত এবং উহা হিমালয় পর্ব্বতে জন্মে। যে হেতু উহা দেখিতে "বৃষশৃঙ্গের" ন্যায় সেই জন্য সংস্কৃত ভাষায় বৃষের যতগুলি পর্য্যায় আছে, আমাদের দেশের রসিক "কবিরাজগণ" এই ঔষধের প্রতিও সেই গুলি ব্যবহার করিয়াছেন এবং সেই হেতু শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের ন্যায় মহা প্রতিভাশালী পণ্ডিতও "উক্ষ" এবং "ঋষভ" শব্দে উদ্ভিজ্জ বিশেষ না বুঝিয়া "ষাঁড় গরু" বুঝিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রস্তাবে এই বিষয় অবান্তর হইলেও আবশ্যক বোধে এইবিষয়ে এই কথাগুলি লিখিত হইল। সম্প্রতি লেখকের একজন সুহৃদ্ এবং সুবিজ্ঞ বৈদ্য হিমালয় পর্ব্বতে "জীবক", 'ঋষভক' এবং 'মেদ" এই তিনটি ভেষজের সন্ধান পাইয়াছেন এবং তিনি শীঘ্রই এ বিষয় সাধারণের গোচরে আনিবেন বলিয়াছেন। অনুসন্ধানের অভাবে আমরা যে কত মূল্যবান্ পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছি, এবং হইতেছি, তাহা মনে করিলেও ক্লেশ হয়। অষ্টবর্গের ঔষধগুলি আর্য্য আয়ুর্ব্বেদের অতি মূল্যবান্ মহৌষধ, যিনি এই লুপ্ত রত্নগুলির উদ্ধার সাধনের নিমিত্ত পরিশ্রম করিবেন, তিনিই আমাদের নমস্য।

যাহা হউক, আমরা দেখিলাম যে প্রাচীন কালে, সভ্যসমাজের লোকে শ্যামবর্ণ এবং কৃষ্ণবর্ণ পুত্রেরও আদর করিত। যদি আর্য্যগণের মধ্যে আদৌ কৃষ্ণবর্ণের ব্যক্তি না থাকিতেন, অথবা কেবল ঘৃণিত অনার্য্যের বর্ণই কৃষ্ণ হইত, তাহা হইলে এরূপ সাধনার সম্ভাবনা ছিল না। প্রকৃত পক্ষে ঋষিগণের মধ্যেও অনেক কৃষ্ণবর্ণের লোক ছিলেন, এবং সামাজিক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের মধ্যেও কৃষ্ণবর্ণের ব্যক্তির অভাব ছিল না। ফলতঃ গায়ের রঙ্, দেহের গঠন বা উচ্চতা অথবা শ্মশ্রুর প্রাচুর্য্য আর্য্যত্বের কোন চিহ্ন অথবা পরিচায়ক ছিল না। যাহা দেহের গুণের উপর বর্ণভেদ কোনও কালেই নির্ভর করে নাই।

অথচ, আমরা বারবার বলিয়াছি যে গুণ এবং কর্ম্মের উপর নির্ভর করিয়াই আর্য্য সমাজে বর্ণের ভেদ হইয়াছিল। গুণের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সেই গুণ সাংখ্যোক্ত সত্ত্ব রজঃ এবং তমঃ, ইহারই উপর নির্ভর করিয়া দৈব ও আসুর স্বভাব নির্নীত হইয়াছিল। এক্ষণে কর্ম্মের কথা সম্বন্ধে পুনশ্চ কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি :—

মনু মহারাজ বলিয়াছেন,—"সেই মহা তেজস্বী পরমপুরুষ এই সৃষ্টির রক্ষার নিমিত্ত মুখ, বাহু, উরু এবং পদ হইতে জাত ব্যক্তিবৃন্দের নিমিত্ত পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম স্থির করিয়া দিলেন ।৮৭। ব্রাহ্মণগণের জন্য তিনি অধ্যাপনা, অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান এবং প্রতিগ্রহ ; ক্ষত্রিয়গণের জন্য সাধারণতঃ প্রজারক্ষণ, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন এবং সাংসারিক বিষয়ে নিতান্ত মুগ্ধ না হওয়া ; বৈশ্যগণের জন্য পশুপালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাণিজ্য,

---

জীবনীয়ানি ভবন্তি ॥২৪॥" চরকসংহিতা, সূত্রস্থান, চতুর্থ অধ্যায়।

কুসীদ এবং কৃষির ; এবং শূদ্রগণের নিমিত্ত একমাত্র কর্ম অতি মনে এই তিন বর্ণের পরিচর্য্যার ব্যবস্থা করিলেন। ৮৭—৯১॥" প্রথম অধ্যায়।*

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে বলিয়াছেন,—"হে শত্রুতাপন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের স্বভাবজাত গুণানুসারে কর্ম্মসকল বিভক্ত হইয়াছে ॥৪১॥ অন্তঃকরণের নিরোধ, বাহ্যেন্দ্রিয়ের সংযম, শাস্ত্রসিদ্ধ শারীর ক্লেশ, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, শাস্ত্রীয় জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং ব্রহ্মে বিশ্বাস এইগুলি ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্ম্ম ॥৪২॥ শৌর্য্য, তেজঃ, ধৈর্য্য, দক্ষতা, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা, দান এবং প্রভুত্ব এইগুলি ক্ষত্রিয়ের স্বভাবসিদ্ধ কর্ম্ম ॥৪৩॥ কৃষি, গোপালন এবং বাণিজ্য বৈশ্যের স্বাভাবিক কর্ম্ম আর পরিচর্য্যা করাই শূদ্রের স্বভাবজাত কর্ম্ম ॥৪৪॥" অষ্টাদশ অধ্যায়। †

---

* "সর্ব্বস্যাস্য তু সর্গস্য গুপ্ত্যর্থং স মহাদ্যুতিঃ।
মুখবাহূরুপজ্জানাং পৃথক্ কর্ম্মাণ্য কল্পয়ৎ ॥৮৭॥
অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ ॥৮৮॥
প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়ন মেবচ।
বিষয়েষ্বপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ ॥৮৯॥
পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়ন মেবচ।
বণিক্ পথং কুসীদং চ বৈশ্যস্য কৃষি মেবচ ॥৯০॥
এক মেবতু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষা মনসূয়য়া ॥৯১॥
প্রথম অধ্যায়।

† "ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চপরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাব প্রভবৈর্গুণৈঃ ॥৪১॥
শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জব মেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥৪২॥
শৌর্য্যং তেজোধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বর ভাবশ্চ ক্ষত্রকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥৪৩॥
কৃষি গোরক্ষ্য বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥৪৪॥
অষ্টাদশ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণের প্রশংসাত্মক বাক্য অথবা শ্লোক হিন্দুদিগের সকল শাস্ত্রে যেখানে সেখানে এত আছে যে ঐগুলি একত্র করিলে একখানি সুবৃহৎ পুস্তক হইতে পারে। ইতঃপূর্ব্বে ঐরূপ কতকগুলি শ্লোক মনুসংহিতা হইতে উদ্ধার করিয়াছি। মহাভারত গ্রন্থও ব্রাহ্মণের প্রশংসাবাদে ওতপ্রোত ভাবে পূর্ণ। আর কেবল হিন্দুশাস্ত্র কেন, বৌদ্ধগণের নিকটও ব্রাহ্মণগণের আদর কম ছিল না। প্রসিদ্ধ "ধর্ম্মপদ" নামক পালিভাষার পুস্তকের শেষ অধ্যায় "ব্রাহ্মণ বগ্গো" কেবল ব্রাহ্মণস্তুতি দ্বারাই পরিপূরিত। ক্ষত্রিয়ের প্রশংসাও শাস্ত্রে অল্প নাই। উপনিষদের উদ্ধৃত বাক্যে আমরা দেখিয়াছি যে প্রসিদ্ধ লোকপালগণ ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়গণই ব্রহ্মের যশঃ প্রচার করেন, ব্রাহ্মণেরা রাজসূয়ে ক্ষত্রিয়কে উপাসনা করিয়া থাকেন, ক্ষত্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এই সংসারে আর কেহই নাই। এই হেতু জ্ঞানবান ব্রাহ্মণ এবং বীর্য্যবান্ ক্ষত্রিয়ের প্রাচীন আর্য্যসমাজে এত আদর।

প্রাচীন ভারতের সমাজক্ষেত্রে সভ্যতা সূর্য্যরশ্মির প্রথম বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই যে গুণ ও কর্ম্মভেদে প্রজাসমূহের মধ্যে বর্ণভেদের প্রারম্ভ হইয়াছিল, তাহার নিদর্শন শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ এবং ইতিহাস প্রভৃতি শাস্ত্রের সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। একই পিতার চারিপুত্রের মধ্যে গুণ ভেদে মর্য্যাদা ভেদের ন্যায় ভারতবর্ষের সভ্যসমাজে সামাজিক বর্গের মধ্যে গুণ কর্ম্মের উৎকর্ষ এবং অপকর্ষের তারতম্যে বেদাধ্যায়ী, যজ্ঞনিরত ব্রাহ্মণ, প্রজারক্ষণশীল রাজা বা ক্ষত্রিয়, কৃষিবাণিজ্যাদি উপায়ে প্রজা সাধারণের প্রাণরক্ষাকারী বণিক বা বৈশ্য এবং প্রথম তিন বর্ণের সর্ব্ববিধ সুখ সাচ্ছন্দ্যের সহায়ক পরিচারক বা শূদ্র এই মুখ্য চারিবর্ণের উদ্ভব যে প্রথম হইয়াছিল, তাহা স্পষ্টই অনুভূত হয়। উৎকৃষ্টতার স্তর সম্বন্ধে যাহাই হউক, ইঁহাদের আকার প্রকার এবং সভ্যতার ধারা ঠিক একই ধরণের ছিল এবং ইঁহারা সকলেই আর্য্য সমাজ দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বরূপ ছিলেন। এই আদিম সময়ে বর্ণ

কর্ম্মের পার্থক্য নিবন্ধন সামাজিক শ্রেণী গঠিত হইতেছিল, এবং এই প্রভেদ অনেক পরিমাণে তরল স্বভাব ছিল, পার্থক্যের কঠিন প্রাচীর তখনও নির্ম্মিত হয় নাই। বৃত্তিরও তখন যেরূপ তত কড়াকড়ি ছিল না,—সেইরূপ বর্ণ ভেদেরও তত মারামারি ছিল না। সেই কালে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এমন কি শূদ্র শ্রেণীর গুণবান্ ব্যক্তি বিশেষও উচ্চতর বর্ণে প্রবেশ করিয়াছে এবং উচ্চতর বর্ণের লোকও কর্ম্মদোষে অধঃপতিত হইয়াছেন। পৌরাণিক সাহিত্যে এইরূপ বর্ণ পরিবর্ত্তনের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে এবং স্মৃতি শাস্ত্র সমূহে সেইরূপ পরিবর্ত্তনের অনুকূল ব্যবস্থাও প্রদত্ত হইয়াছে।

পরে, সভ্যতার উত্তরোত্তর বিকাশের সহিত প্রবল রাষ্ট্রশক্তির উদ্ভব এবং উন্নতি হইতে লাগিল এবং ক্রমে ক্রমে নূতন নূতন বৃত্তি বা জীবিকার উপায়ের সহিত নূতন নূতন জাতিভেদ বদ্ধমূল হইতে লাগিল। বিভিন্ন প্রকার জীবিকার আশ্রয়ে বিভিন্ন প্রকার জাতির সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে নানা উচ্চাবচ শ্রেণীর নরনারীর যৌন মিলনের ফলে আরও অধিকসংখ্যক উপজাতির উদ্ভব হইল এবং এই সময়ে উচ্চবর্ণের মধ্যে আভিজাত্যের সম্মান বোধ ক্রমশঃ সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। অনুলোম এবং প্রতিলোম মিলন সূত্রে উৎপন্ন জাতি ব্যূহের মধ্যে পুরুষ এবং স্ত্রীর আভিজাত্য ও সামাজিক সম্মানবোধের ধারণা বিশেষকে আশ্রয় করিয়া নূতন জাতি সমূহের সামাজিক সম্মান স্থিরীকৃত হইতে লাগিল। মৌলিক চাতুর্ব্বর্ণ্যের বাহিরের অসভ্য আরণ্য অথবা পার্ব্বতীয় জাতির বহু ব্যক্তিও নানা কারণে আর্য্য সমাজের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় নৈসর্গিক আকর্ষণের বশে আর্য্যদিগের মধ্যে নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকদিগের সহিত সমাজ বাহ্যজাতিরও কিয়ৎ পরিমাণে মিশ্রণ হইয়া গেল। ক্রমে ক্রমে আর্য্য সমাজে এই জটিল হইতে জটিলতর সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় সমাজের ব্যবস্থাপকগণ কতকগুলি নিয়ম সংস্থাপন করিলেন। জাতীয় শুদ্ধতা রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বিবাহের খুব কড়া কড়ি নিয়ম স্থিরীকৃত হইল। দ্বিজ তিন বর্ণের পরস্পর মিশ্রণের ফলে উৎপন্ন জাতি সমূহকে এবং দ্বিজগণের সহিত অনুলোম ক্রমে মিলিত আর্য্যশূদ্র ও অনার্য্য শূদ্রনারীগণের সন্তানগণকে ব্যবস্থাপকগণ "আর্য্য" আখ্যা দিয়া সমাজে গ্রহণ করিলেন এবং শূদ্রদিগের প্রতিলোমজাত সন্তান দিগকে শূদ্রেরও নিম্নে সমাজের বাহিরে নিক্ষেপ করিয়া দিলেন। "মনুসংহিতা" হইতে আরম্ভ করিয়া "বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ" পর্য্যন্ত প্রাচীন অথবা নবীন শাস্ত্র সমূহে আমাদের সমাজে যে সহস্র সহস্র জাতি ভেদের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার ভিতর এই সামাজিক তত্ত্বের মূল গভীর ভাবে নিহিত রহিয়াছে।

এই জাতি ভেদ ক্রমশঃ কঠিন হইতে কঠিনতর প্রাচীর দ্বারা আবদ্ধ হইয়াছে এবং ইহার অনুমোদিত জীবিকা অন্ন জল এবং বিবাহ সমস্যা অনেক বিদেশী পণ্ডিত মহাশয়গণের মাথা ঘুরাইয়া দিয়াছে। দেশ ভেদে, একই জাতির সামাজিক সম্মান কোথায়ও উচ্চ এবং কোথায়ও বা নিম্ন দেখা গিয়াছে। তবে ইহা এক প্রকার নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে যে, আমাদের দেশের যে কোন প্রদেশে যে যে জাতিকে "জল আচরণীয়" অথবা "শুদ্ধ" বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে, অনুসন্ধান করিলে প্রকাশ পাইবে যে ঐ সকল জাতি কোনও না কোন মৌলিক দ্বিজ জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া ধর্ম্মবিপ্লব এবং সামাজিক নির্য্যাতন বশতঃ অনেক উচ্চতর জাতির সম্মান নামিয়া গিয়াছে এবং ক্বচিৎ রাজনৈতিক কারণে অর্থাৎ বাহুবল এবং ধনজন বলের সাহায্যে নিম্ন শ্রেণীর লোকেও উচ্চতর স্থান অধিকার করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বর্ত্তমান কালে, এই রাজনৈতিক ভারতের কোন স্থানেই মৌলিক শূদ্রবর্ণের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না এবং অবিমিশ্রভাবে ও আদিম অবস্থায় অবস্থিত বৈশ্যবর্ণকে পাওয়াও নিতান্ত কঠিন। যাহাই হউক. মনু মহারাজের মতে আকার, গুণ, কর্ম্ম

এবং জীবিকার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অনুসন্ধান করিলে আর্য্য জাতিকে আজিও চিনিয়া লওয়া যাইতে পারে * ; আমরা আগামী বারে সেইরূপ চেষ্টাই করিব।

ক্রমশঃ

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

* "বর্ণা পেতমবিজ্ঞাতং নরং কলুষযোনিজম্।
আর্য্যরূপমিবানার্য্যং কর্ম্মভিঃ স্বৈর্বিভাবয়েৎ ॥ ৫৭ ॥
অনার্য্যতা নিষ্ঠুরতা ক্রুরতা নিষ্ক্রিয়াত্মতা।
পুরুষং ব্যঞ্জয়ন্তীহ লোকে কলুষযোনিজম্ ॥ ৫৮ ॥
দশম অধ্যায়।

প্রার্থনা

(গান)

তোমার মলয় এনেছে বহিয়া
আমারি প্রাণের মধুর গন্ধ।
তোমার বাঁশরী গাহে ঝঙ্কারি
আমারি প্রাণের ললিত ছন্দ।
তোমার সেফালি দিয়াছে গো ঢালি
আমারি প্রাণের বিপুলানন্দ,
তোমার ভুবনে মর্ত্যে গগণে
আমারি হিয়ার ধেয়ান শান্ত !
এ জীবন চর্ণে দিব অঞ্জলি
দাও হে তোমার চরণ-প্রান্ত,
তব পদধূলি নত শিরে তুলি
হইব ধন্য হে প্রাণ-কান্ত !

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত।

বিশ্বের বিশালত্ব।

বস্তুর আকৃতি অনুসারে তাহার মাপ কাঠি হইয়া থাকে। দূরত্বের মাপ অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে লইতে হইলে ফরাসী মাপ মিলিমিটারের (millimetre) সাহায্য লইতে হয় ; কিন্তু বড় হইলে ক্রমে ইঞ্চি, গজ, এবং আরও বড় হইলে মাইলের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। জ্যোতির্ব্বিদদের যখন সৌর জগৎ হইতে নক্ষত্রলোকের দূরত্ব গ্রহণ করিতে হয় তখন তাহাদের মাপ কাঠিটি একটু বড় না করিলে উপায় নাই। সেই মাপ কাঠি পূর্ব্বে ছিল (Light yearবা) আলোকের বৎসর। অর্থাৎ আলোকের গতি এক সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল ইহার এক বৎসর সময় ব্যাপী গতির পরিমাণ একখানা মাপকাঠি। অপর কথায় বলিতে গেলে সূর্য্য হইতে পৃথিবীর দূরত্বের ৬৩ হাজার গুণ অথবা ৬০০০, ০০০, ০০০, ০০০ মাইল। বর্ত্তমানে এই মাপ কাঠিখানা আর একটু বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এই বড় কাঠিখানার নাম Parsee ইহা Light year বা আলোকের বৎসরের ৩·২৬ গুণ। অথবা পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্বের ২ লক্ষ গুণ।

ঘণ্টায় ২০০ মাইল বেগে চলিতে পারে এরূপ একখানা এরোপ্লেন (Areoplane) কল্পনা করিলে, অবিশ্রান্তভাবে চলিয়া উহা ৫ দিনে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করিতে পারে। এবং উহার চন্দ্র লোকে পৌঁছিতে ৬ সপ্তাহ সময়ের প্রয়োজন। ঐ যানখানা ৫৩ বৎসরে সূর্য্য লোকে পৌঁছিতে পারে। ইহাকে শুক্রের (veuus) কক্ষে পৌঁছিতে ১৪ বৎসরের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধ সময়ের প্রয়োজন, এবং তথা হইতে আরও ১৮ বৎসর সূর্য্যের দিক অগ্রসর হইলে বুধের (mercury) কক্ষে উপনীত হওয়া যাইবে। যদি আমরা সূর্য্যের দিকে যাত্রা না করিয়া বহির্দ্দেশে মঙ্গল ও অপরাপর

গ্রহের দিকে যাত্রা করি তাহা হইলে আমাদিগকে মঙ্গলের কক্ষ পার হইতে ২৭ বৎসরের অধিক সময় লাগিবে। যদি ঐ খ যানে বৃহস্পতিতে যাইতে ইচ্ছা করি তবে দুই পুরুষেও পারিব না, কারণ উহা অবিরত চলিয়াও ২০০ শত বৎসরের উর্দ্ধে উক্ত গ্রহের কক্ষে উপনীত হইতে পারিবে। শনি গ্রহে পৌঁছিতে ৪৫০ ইউরেনসে এক সহস্র এবং নেপচুনে ১½ হাজার বৎসরের প্রয়োজন।

মনুষ্যের একজীবনে এরূপ মন্থরগামী যানে সৌর জগতের গ্রহাদি পরিভ্রমণ করাই অসম্ভব আবার নক্ষত্র লোকে যাইবার বাসনা করা বৃথা। কল্পনার যানেই যখন ভ্রমণে বাহির হইয়াছি তখন ইহার গতি আর একটু বৃদ্ধি করিয়া নেওয়া যাক।

আমাদের বিমানখানা আলোকের বেগে চালাইতে পারিলে দেখা যাক কি করা যায়। অর্থাৎ বিমানখানার প্রতি সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল চলা দরকার। এই যানখানা একটু দ্রুতগামী বলিয়া পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতে উহার ⅛ সেকেণ্ড সময় লাগিবে, এবং চন্দ্রলোকে পৌঁছিতে ১¼ সেকেণ্ডের প্রয়োজন হইবে। এবং সূর্য্য একটু দূরে বলিয়া তথায় যাইতে ৮ মিনিট সময়ের দরকার হইবে। ৪ ঘণ্টার কিঞ্চিৎ উর্দ্ধ সময়েই আমরা নেপচুনের কক্ষ পার হইয়া নক্ষত্রলোকের দিকে যাত্রা করিতে পারি। কিন্তু এই পথটীর দূরত্ব নিতান্ত কম নহে, কারণ এই সুদীর্ঘ পথে ১বৎসর অগ্রসর হইয়াও অকূল সমুদ্রের মধ্যেই থাকিতে হইবে। নক্ষত্র লোক তখনও বহু দূরে অবস্থিত। এখন আমরা এতদূরে আসিয়া পড়িয়াছি যে এখানে সূর্য্যের রশ্মি আসিতে ১বৎসর সময়ের প্রয়োজন। ক্রমে ক্রমে ৩¼ বৎসর বা এক পারসেক (Prasec) পথ অতিবাহিত করি, কিন্তু তথাপি কোন পার কূলের সন্ধান মিলিবে না। যদি এই দূর দেশ হইতে সূর্য্যও পৃথিবীকে দেখা সম্ভব হয়, তখন উহাদের মধ্যে কোন ব্যবধান পরিলক্ষিত হওয়া দুষ্কর। প্রবল দূরবীক্ষণ যোগে বহু চেষ্টায় এই ব্যবধান দৃষ্ট হইলেও উহাদের দূরত্ব মাত্র ১ সেকেণ্ড হইবে। এখনও আমরা আর এক বৎসর পথ অগ্রসর হইলে নিকটস্থ উজ্জ্বল নক্ষত্রে (Alpha centauri) উপনীত হইব। তখন ২১১ টী নক্ষত্র আমরা পৃথিবী হইতে যেরূপ দেখি তাহা অপেক্ষা এক আধটুকু উজ্জ্বলতর বোধ হইলেও হইতে পারে, কিন্তু অধিকাংশকেই পূর্ব্বের মত ক্ষুদ্র বোধ হইবে। কারণ তখনও আমরা মাত্র যৎকিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া নক্ষত্র লোকের সীমানায় পৌঁছিয়াছি। এইস্থল হইতে রাশিচক্রের কোনই ব্যাতিক্রম দৃষ্ট হইবে না।

এই উজ্জ্বল নক্ষত্র (Alpha centauri) আমাদের সূর্য্য মণ্ডলের মত নহে। ইহারা দুইটী যুগ্ম সূর্য্য উহাদের সাধারণ ভার কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে। এই যুগল সূর্য্যের পরস্পর ব্যবধান মাত্র ৪⅓ আলোক বৎসর।

যদিও (Alpha centauri) আমাদের সূর্য্য মণ্ডলের নিকটস্থ উজ্জ্বল নক্ষত্র, কিন্তু হয়ত এমন দিন আসিবে যখন অন্য নক্ষত্র এই স্থান অধিকার করিবে। কারণ আমাদের সূর্য্য মণ্ডলও গতিশীল. উহা সেকেণ্ডে ১২ মাইল বেগে চলিতেছে।

আমাদের পূর্ব্বোক্ত ঘণ্টায় ২০০ শত মাইল গামী বিমানে নেপচুনের কক্ষে পৌঁছিতে যদিও ১½ হাজার বৎসর লাগে, কিন্তু উহাতে (Alpha centauri) নক্ষত্রে আসিতে হইলে ১ কোটী ৪৫ লক্ষ বৎসরের প্রয়োজন।

পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া এবং ১৬ আলোক বৎসর দূরত্ব নিয়া একটী বৃত্ত করিলে উহার মধ্যে মাত্র ২০ টী জ্ঞাত নক্ষত্র পড়িবে। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে নক্ষত্র মণ্ডলী কিরূপ বিরলভাবে কি এক বিশাল স্থান অধিকার করিয়া আছে। যদিও রাত্রিতে নক্ষত্র মণ্ডলীর প্রতি দৃষ্টি করিলে মনে হয় যেন উহারা কত ঘনই সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। এখন বুঝা গেল যে উহাদের সহজে পরস্পর সজ্বর্ষ হইবার কোনই ভয় নাই।

আমাদের সূর্য্য মণ্ডল বিপুল বেগে শূণ্য মার্গে কোটী ২ বৎসর চলিয়াও আজ পর্য্যন্ত কাহারও সঙ্ঘর্ষে চূর্ণীকৃত হয় নাই। এবং ভবিষ্যতেও যে হইবে সেরূপ সম্ভাবনা এখনও দেখা যায় না, কাযেই বিশ্বের বিশালত্ব বর্ণনাতীত, এমন কি আমাদের কল্পণারও অতীত বলিতে হইবে।

শ্রীহরিচরণ গুপ্ত।

তফাত।

১

কেবলি স্মৃতিতে ঘেরা আমার জীবনখানি,
সারাটী হৃদয়ে জাগে তোমারি প্রেমের বাণী!
তোমার মধুর হাসি এখনো বাজায় বাঁশী
গোপন মরমে মোর
সেই মত নিশিদিন!
মোর সুখ-সাধ-আশা
তোমাতেই হ'ল লীন!

২

নীরব বীণার সুর আকাশে কি খেলে আজ!
নিদাঘে সুকাল কিবা মাধবীর ফুল-সাজ!
রূপসী মানসী রাণি! কিছুইত নাহি জানি,
মনে হয় মোর বুকে
তোমারি শোনিত বয়!
আমি আজ 'আমি'-হারা
হয়ে গেছি তোমাময়!

৩

শৈশবের খেলা-ঘরে তোমা সখী পেয়েছিনু!
কেমন আপনা-হারা তোমা ভাল বেসেছিনু!
প্রাণে প্রাণে দু'জনার কে বাঁধিল অনিবার
করে দিয়ে একাকার
রোগে শোকে সুখে দুখে!
যুগল তটিনী মিলি'
ছুটিল সাগর-মুখে!

৪

আজ বুঝি মুছে গেছে আমার জীবন-রেখা!
তুমি শুধু মোর মাঝে পলে পলে দাও দেখা!
জীবনের পর পারে আকুল নয়নাসারে
তোমারে লভিয়ে প্রিয়ে,
ভুলেছি বিরহ গান!
বাদল-রজনী যেন
জোছনায় ভাসমান!

শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত।

ঠাকুর মা'র কথা।

(৬)

(পল্লীর অন্যান্য কথা)।

সে কালে আমাদের পাড়াগাঁয়ে যে সব আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা ছিল, সেগুলিতে 'গুণী'র পরীক্ষা ছিল। আর সে সকল আমোদের মধ্যে স্বাস্থ্যের প্রচুর উপকরণ সঞ্চিত ছিল। সে কালটাই অনন্ত স্বাস্থ্য-সম্পদ ও স্বাধীন সরলতার যুগ ছিল। সুখ বলিতে যাহা বুঝি, তাহা আমরা ভোগ করিয়াছি। এখন সুখ অর্থে আমার বিশ্বাস—একটা প্রতারণা মাত্র। সত্যি সত্যি সুখ ভোগ

যে এখন কেউ করেন, আমি বড় একটা বিশ্বাস করি না। তবে এখনকার মত জ্ঞানের আলোক তখন দশদিক উজ্জ্বল করিয়া জ্বলে নাই; ছেলে বুড়া বৌ ঝি সবাই কেতাব পড়িত না, পত্র লিখিতে পারিত না। আট পহর গেঞ্জি, জুতা আঁটিয়া চলিত না। আমি জ্ঞানার্জ্জনের নিন্দা করি না। তবে তখন এগুলি ছিল না, তাই বলিতেছি মাত্র। এখন বিবাহ সভায় মেলাই বই পত্র আর ছাপান কাগজ বিলি হয়, তখন এ সকল ছিল না। সুবিধাও ছিল না। মেয়েরা লেখা পড়াও জানিত না। এখনও আমাদের পাড়া গাঁয়ের মেয়েরা বিবাহের বই লইয়া ছবি দেখে—অক্ষর পরিচয় নাই। এসকল সংবাদও শুনি। থাক্—বলিতেছিলাম স্বাস্থ্যের কথা।

বৌ ঝিদের শরীর খুব মাজাঘসা ছিল—কারণ তাহারা মেহানত করিত। ঘর লেপা, উঠান—ময় পায়খানা ঝাঁট দেওয়া, পরিস্কার করা, ধান সিদ্ধ করা, শুকান, ধান ভানা, ধান ঝাড়া, প্রভৃতি বাহিরের কাজ এবং জল তোলা, মশলা বাটা, রাঁধা বাড়া ও খাওয়ান দাওয়ান প্রভৃতি গৃহকার্য্য মেয়েদের করিতেই হইত। আমিত এখনো (১৩২০।২১ সন পর্য্যন্ত) অক্লেশে ২।৩ মণ ধান কুলায় ঝাড়িতেছি। আমি এখনও স্বপাকেই খাই—তোমাদের পরিবেশন করিয়া খাওয়াই। তবে রাঁধাঘর হইতে দালানের বারান্দায় নিয়া—পরিবেশন করিতে কষ্ট হয়; তাই নাত্ বৌদেরে দিয়া ভাত তরকারী আনাইয়া আমি পরিবেশন করি। সেকালে এ সকল পরিশ্রম প্রাতঃকাল হইতে প্রায় দেড় প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত করিতে হইত। ধান ভানা, চিঁড়া কোটা প্রভৃতি শ্রম ছাড়িয়াই আমাদের বৌরা হিষ্টিরিয়ার আশ্রয় পাইয়াছেন।

ছেলেপিলেরা মাটির সম্বন্ধ কদাচিৎ ত্যাগ করিত। জুতা প্রায় কাহারও ছিল না। খড়ম কেবল শয়ন কালে পা ধুইতে ব্যবহার করা হইত। মাটিতে চাটাইর উপর পাটী ফেলিয়া শয়নের ব্যবস্থা শতকরা ৯৫ জনের ছিল। আবশ্যক হইলে গা ময় মাটী মাখিয়া ছুট্ পাট্ করিয়া দিন কাটনের সুবিধা অনেকেরই ছিল। মোটা ভাত আর মোটা কাপড় ইতর ভদ্র সকলেরই ঘরে ছিল। মিহি চাউলের ভাত রুগ্নের পথ্য ছিল।

মশুরী ডাইল (কাঁচা) স্নানের পর আমরা স্পর্শ করি নাই। ব্যাপার উৎসবে মশুরী ফর্দ্দেই স্থান পাইত না। প্রায় সবাই হো হো করিয়া উচ্চ হাস্য করিত। সেই ঘরফাটা হাসি এখন আর শুনি না। ছেলে, যুবক, বৃদ্ধ সকলে মিলিয়া হরি সঙ্কীর্ত্তন করিত—প্রায় সারারাত। এখন যেমন কয়াসের উপর বেহালা বাঁশী লইয়া সঙ্কীর্ত্তন হয়, তখন তাহা ছিল না। ৫।৭।১০ ঘণ্টা ২।৪ টা দলের কীর্ত্তনের পাল্টি চলিত। উঠানময় উদ্দাম নৃত্য, আর চিতান রাগিণীর গান। সেই সুর সপ্তকে গাহিয়াও কাহারও গলা ধরিত না;—কেহ যেন শ্রান্ত হইত না। যাহারা মৃদঙ্গ বাজাইত, তাহারাও নাচিত,—শরীরে শক্তি ছিল বলিয়া। এখন দেশের ছেলের দল "গোয়ালের বাছুরের মত কেবল শুইয়া লাঙ্গুল নাড়িতে মজবুত।" *

('পল্লীর গান'—সংগৃহীত হইলে—সেই প্রবন্ধে এবিষয় বিস্তৃতরূপে লিখিবার ইচ্ছা রহিল)

বৌ ঝিরাও উচ্চকণ্ঠে গীত গাহিয়া উৎসব বাটী মুখরিত করিয়া তুলিতেন। অন্নপ্রাশন, কর্ণবেধ, উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতি ব্যাপারে গীত একটা মস্ত বড় অঙ্গ। এই সকল উৎসব অন্তে 'কাদা খেলা' বা "পেঁক

---

* গোয়ালরা গাভী দোহন করিয়া সদ্যোজাত বাছুরের জন্য আর দুধ অবশিষ্ট রাখে না এবং দিনমানে আর গাভীর নিকট বাছুরকে যাইতেও দেয় না। তাই গোয়ালের বাছুর অলস হইয়া শুইয়াই দিন কাটায় এবং সত্বরেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। এদেশে দুর্ব্বল ছেলেদের প্রতি এই উপমা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। —লেখক।

খেলা" (প্যাক—ইতি শুভভাবা) হইত। সে এক বিরাট ব্যাপার। উঠানের মধ্যস্থলে কয়েককলসী জল ঢালিয়া, কিছু মাটী ও গোবর তাহাতে ফেলান হইত। তার উপর গড়াগড়ি, হুড়াহুড়ী—ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিত। বৌ, শাশুড়ী, মেয়ে, দিদি মা—অর্থাৎ সম্পর্ক বাছনী এ ক্ষেত্রে ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে গানও চলিত। সে সকল গানের মধ্যে শ্লীলতা বড় রক্ষিত হইত না। যথেষ্ট আদিরস মিশ্রিত গানগুলিও শাশুড়ীর সঙ্গে পুত্রবধূ ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া স্বচ্ছন্দে গায়িয়া যাইত। এই সকল ইদানীং প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। ভালই হইয়াছে। কারণ ঐ সকল সঙ্গীতে সেকালে ধৈর্য্যচ্যুতি হইত না—সকলেই শক্তিশালী ছিল,—একালে ধৈর্য্যচ্যুতি স্বাভাবিক। এমত অবস্থায় এগুলি উঠিয়া যাওয়াই ঠিক। তবে 'কাদাখেলার' মূল্য আছে—এটা থাকা উচিত ছিল। আর থাকা উচিত ছিল—ফাল্গুনের রৌদ্রে আবির খেলা। দুটার সঙ্গেই স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। তবে কোন কোন স্থলে মেয়ে পুরুষে মিলিয়া কাদা বা আবির লইয়া লুটাপুটির কথা শুনিয়াছি,—সেগুলি অত্যন্ত গর্হিত।

কাদা খেলার মধ্যে পুরুষ মহলে নারিকেল খেলাও চলিত। একটা নিটোল নারিকেল—ছোবড়া শুদ্ধ—তৈলাক্ত করিয়া কাদায় ফেলিয়া দেওয়া হইত। একব্যক্তি সেই নারিকেল আকড়াইয়া ধরিয়া উপুর হইয়া পড়িত—একব্যক্তি তাহাকে চিৎ করিতে পারিলে—সে নারিকেল লইয়া যাইত,—আর একজন তাহাকে ধরিয়া ফেলিত। এই "নারিকেল কাড়াকাড়ি" খেলায় যথেষ্ট শক্তির প্রয়োজন ছিল।

এ সকল উৎসবে কেবলই বিশুদ্ধি ছিল, একথা বলিতে পারি না। নেশা করাটা তখন অনেকের নিত্য নৈমিত্তিক কাজের মধ্যে গণ্য ছিল। অন্ততঃ উৎসব উপলক্ষে নেশার শ্রাদ্ধ অনেক গ্রামেই হইত। সিদ্ধি খোচনে নেশায় শেষ হইত না। পাইপ ভরা মদ লইয়া ঢলাঢলি ঢের জায়গায়ই হইত। এমন কি বড় গামলায় মদ ঢালিয়া মধ্যস্থলে একটা গোলাপ ফুল রাখা হইত। দুই ভাই দুই পাশে নল লাগাইয়া মদ্যপান করিতেন;—যাহার টানে গোলাপ ফুল যায়—তাহার জয় হইত। শুনিয়াছি,—জমিদারদের মধ্যে মদ খাওয়াটা না হইলেই চলিত না। শুনিয়াছি, যে সকল ব্যবহারজীবের চরিত্রদোষ না থাকিত, তিনি সমাজে অত্যন্ত নিরীহ গোবেচারীর মত কুণ্ঠিত থাকিতেন। এমন কি নাম স্বাক্ষর জন্য বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র বেশ্যালয়ে গিয়া পিতার পার্শ্বে দাঁড়াইতে বাধ্য হইত। এগুলি সহরের কথা। কিন্তু গ্রামেও তখন হাট বাজার গুলির ভারী বদনাম শুনিতাম। বাজারে বাজারে বেশ্যালয় নাকি অগণিত ছিল। এবং তাহাই মালীকের বড় আয়রূপে গণ্য হইত। শুনিয়াছি, জঙ্গলবাড়ী, হয়বৎনগর ও বৌলাইর মুসলমান জমিদারগণের এলাকায় বারবণিতার আশ্রয় ছিল না। গ্রামে উৎসব উপলক্ষে বাইনাচ হইত। বাইনাচের সভায় পিতা পুত্রে উপস্থিত থাকার সংবাদও শুনিয়াছি এবং চিকের আড়ালে বৌ'রা বসিত। কাদা খেলায় বাই খেমটারা পুরুষদের সাহচর্য্যও কোন কোন গ্রামে করিত। কোন কোন বংশের ছেলেদের অন্ন প্রাশনের সময় মদে আঙ্গুল ডুবাইয়া তাহা ছেলের মুখে দেওয়া হইত। কেহ কেহ মদ খাইয়া ২।১ দিন বেহুস হইয়া পড়িয়া থাকিত। তান্ত্রিকগণের কথা স্বতন্ত্র। তবে সুখের বিষয় এই, সকল গ্রামে ও সকল সমাজে এ সকল ব্যবস্থা ছিল না। একথা নিশ্চয় যে মদ ও মেয়েমানুষ অনেকগুলা বড় বড় বনিয়াদী ঘর উচ্ছন্ন করিয়াছে।

ইদানীং দেশের এ সকল কুৎসিত আমোদ লুপ্ত হইয়াছে। আমি বুড়ার চেয়ে বুড়া—তাই অনেক কথা বলিলাম,—অন্যে বলিলে নিতান্তই অশোভন হইবে।

তবে একটা কথা এই যে তখন দেশে সঙ্গীতের চর্চা খুব ছিল এবং তাহার ফলে সমগ্রদেশ আনন্দময় থাকিত। পেট ভরিয়া খাইলে পিঠ ভরা কীল সহে। তখন কাহারো খাবার চিন্তা ছিল না,—সুতরাং আমোদ উৎসবে সময় কাটাইতে কষ্ট হইত না। বাঁশী বাজাইতে, গান গাহিতে, শীস্ দিতে এক একটা ওস্তাদের বিশেষ বাহাদুরী দেখা যাইত। বিশ্বস্ত লোকের নিকট শুনিয়াছি, বাঁশের বাঁশী বাজাইতে এমন সব দক্ষ লোক এ অঞ্চলে ছিল,—যাহাদের বাঁশীর গানে বিষধর সাপ আসিয়া নাচিত এবং গরু মুখে ঘাস লইয়া চাহিয়া থাকিত,—গাছে পাখী নীরব হইত। যশোদলের মুরারি চৌধুরী নামক একটী যুবক এই সে দিন বাঁশী বাজাইয়া মারা পড়িয়াছেন। তাহার বাঁশী শুনিয়া নাকি এক বিষম বিষধর আসিয়া তাহার মাথার উপর ফণা বিস্তার করিয়া হেলিতে দুলিতে ছিল। হঠাৎ সাপটা দেখিয়া মুরারি বাবু বাড়ীতে ছুটিয়া যান এবং সহসা ভূতলে পড়িয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার হৃৎপিণ্ড ফাটিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়। এ সংবাদটী শুনিয়া আমরা বিস্মিত হইতাম না। তখন বাঁশীর গানে সাপ আসার সংবাদ নূতন ছিল না। এজন্য রাত্রিতে বাঁশী বাজান, শিস দেওয়া নিষিদ্ধ। এক-পুত্রবতী বিধবা জননী রাত্রিতে বাঁশীধ্বনি শুনিলে সে রাত্রিতে জল গ্রহণও করিতে পারেন না।

আমরা খুব ভোরে শয্যাত্যাগ করিয়া বাড়ীময় গোময় ছড়া দিতাম। তুলসীতলা, বিল্বতলা লেপন করিতাম। আঙ্গিনা ঝাট দিতাম। সন্ধ্যাবেলায় ঠাকুর ঘর লেপিতাম, ধূপদীপ দিতে হইত,—এখনও হয়। গোশালায় প্রদীপ দেখাইতাম। উৎসব সময়ে এগুলি গৃহকর্ত্রীর কর্ত্তব্য হইত। কারণ আমরা দেখিয়াছি উৎসব বাড়ীতে, ঠাকুর, ছেলেপিলে আর গোরু বাছুরেরই সর্ব্বাপেক্ষা অযত্ন হয়। জাত কর্ম্ম হইতে প্রত্যেক মাঙ্গলিক উৎসবেই গীতের ব্যবস্থা আছে। * এই গীতের মধ্যে রামচন্দ্রের প্রাধান্য। কানুর পশার প্রায় নাই বলিলেই চলে। অনেক ব্রত পূজায়ও গীতের নিয়ম আছে। যেন কেবল আনন্দ উৎসব করিয়াই বৎসরের দিনগুলি—আমোদগুলি কাটাইয়া দেওয়াই এদেশের প্রথা ছিল। পৃথিবীর অন্যদেশেও এ প্রথা আছে কি না জানি না।

আমাদের রাখালগণ এক অতি আদরের বস্তু ছিল। লেংটী পরা রাখাল বালক আমাদের আদর যত্নে বাড়ী ঘর মা বাপ ভুলিয়া যাইত। "কিনা" চাকর ও "আছি" চাকর আমার ঘরে ৭।৮ বৎসর বয়সে রাখাল নিযুক্ত হয়। কিনা ৩৭ বৎসর ও আছি ৪২ বৎসর চাকরী করিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ 'আছি' আজিও দিনে একবার আমাদের কি অভাব, কি চাই—জানিতে আইসে এবং কোন কাজ পড়িলে "উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসে।" আজ কালের চাকর বাকর গুলা কেবল মাহিয়ানার সম্বন্ধ রাখে। আগের চাকররা নিজ ব্যবহারে মাহিয়ানার বেশী আদায় করিয়া লইত।

রাখাল বালকেরা ভোর বিহানে গরম ভাত মাড়সহ একদলা ননী-নুন মাখিয়া খাইত—তার পর গরু লইয়া মাঠে চলিয়া যাইত। দোয়াল গরু লইয়া দুপুরে বাড়ী আসিত, গরু দোহাইত এবং নিজেরাও খাইয়া মাঠে চলিয়া যাইত। সেখানে অনেক রাখাল মিলিয়া খেলা ধূলা করিত। মাঠ আমাদের বাড়ীর বড় বেশী দূরে নহে—নিঝুম মধ্যাহ্নে আমরা রাখালের মধু মাখা কণ্ঠস্বর শুনিতাম। কিসের বা বেহালা বাঁশী—কোথায় লাগে কোকিল পাপিয়ার গান! সেই রাখাল কণ্ঠ যখন বায়ু সাগর মন্থন করিয়া ঘরে ঘরে অমিয়া বিলাইত, তখন কি আনন্দ হইত, বলিতে পারি না। সেই সরল গানও

* "মায়ের গান" প্রবন্ধে—আমরা কতিপয় সঙ্গীত সমাবেশ করিব।—লেখক।

আর শুনি না, সেই পুলক মাখা কণ্ঠও আর বাংলায় নাই। সোনার বাংলার সোনার ছেলেরা অভাবের তাড়নে পাথর হইয়া গিয়াছে ;—নীরস—ভাবহীন—প্রাণ শূন্য। এখন আর সেই গোচারনের জন্য দিগন্ত বিস্তৃত মাঠও নাই, সেই সুস্থ সবল পরিপুষ্ট দেহ গোধনও নাই, সেই দুধও নাই। সেই নধর কান্তি রাখালও নাই। এখন দুধের সেই শক্তি নাই,—ঘিয়ে সেই স্বর্গীয় গন্ধ নাই। কারণ সেকালে গরু কত জাতীয় লতা পাতা ঘাস খাইত,—তা'র ফলে দুধ যে শক্তি প্রদান করিত, এখন শুক্‌না খড় আর খৈল খাইয়া গরু তেমন উৎকৃষ্ট দুধ দেয় না। আমরা যখন ঘি জাল দিয়াছি, পাড়া ময় সৌরভে ভরিয়া গিয়াছে। আর যেমন তেমন গাই ৩।৪ সের দুধ দিত। এখন ৩।৪ সের দুধওয়ালা গাই গ্রামেও নাই। গরু গুলি জীর্ণ শীর্ণ ক্ষয়। কি ভীষণ দুর্ভিক্ষে ইহাদের বংশ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে, কেহ দেখে না। এই দেশব্যাপী গোহত্যার জন্য কসাইরাও দায়ী নহে, মোসলমানও দায়ী নহে ;— দায়ী দেশের রাজা জমিদারেরা। ইহাদের ভূমির ক্ষুধা রাক্ষসের মত বাড়িয়া চলিয়াছে। কোন জমিদারের জায়গায় দশ পাঁচ বিঘা গোচারণ ভূমি জন সাধারণের জন্য পতিত আছে। তবু যে গ্রামে সরকারী সড়ক আছে, সেখানে গোরু দাঁড় করাইবার একটা খোলা জায়গা আছে। আরত কোথাও তাহা নাই। দেশের গরু গেল, ব্রাহ্মণ গেল, শালগ্রাম গেল ;—আবার যদি এগুলি হয়,—এ দেশের উন্নতি কেহ আটকাইতে পারিবে না। আর যদি এগুলি আর না উঠে, এই গুণিদের বেশ পোলাও কোর্ম্মা ও উচ্ছৃঙ্খল আচারের ভিতর দিয়া উঠিবে না। সেই আতপ তণ্ডুল, কাঁচকলা ও দুধের নাড়ীতে ঐ সকল খাদ্য হজম হইতে পারে না ;— হবেও না। গোচারণ ভূমি নাই ;—ব্রাহ্মণের ব্রহ্মোত্তর নাই ; ব্রাহ্মণত্ব সুতরাং ক্ষুণ্ণ। ঠাকুরের সেবা পূজা নাই। এগুলি তোমরা উপহাসের কথা মনে করিও না। এগুলির মূল্য আছে। দেবতা আছেন,—দেবতার শক্তিও কম নহে। মদগর্ব্বে এগুলি ভুলিও না। কিন্তু কি বলিতেছিলাম,—

আমাদের কাজের অন্ত ছিল না। অথচ এমন কাজ ছিল না,—যাহা লইয়া এখনকার মত "প্রাণপণ" করিতে হইত। চরকায় সুতা কাটা, কাঁথা সেলাই, তুলা পিঁজিয়া পৈতা কাটা, ডালা কুলা বুনা (তখন উল সুতার কাজ আমাদের ছিল না) খুব বড় শিল্প ছিল। আমরা ঘর কন্নার কাজ করিয়াই সুখী ও সন্তুষ্ট ছিলাম। কর্ত্তারাও দেদার বিশ্রাম করিবার সময় পাইতেন। বিশ্রাম অর্থে অলস ভাবে সময় ক্ষেপ নহে ; নিশ্চিন্তে শাস্ত্র আলোচনা করিবার অবসর তাঁহাদের ছিল। রাজা রাজরা ও ছোট বড় সকল তালুকদারই পণ্ডিত গণের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। ব্যাপার উৎসব সারাবছরই দেশে থাকিত, এবং পণ্ডিতগণের নিমন্ত্রণের সংখ্যা ছিল না। বাড়ীর ভাত বছরে এক চৌথও ঘটিত কিনা সন্দেহ। অন্ন প্রাশন, বিদ্যারম্ভ, উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, শান্তি স্বস্ত্যয়ন, গৃহ প্রবেশ, গ্রহযাগ, বিষ্ণুপূজা—কত কি যে কাজ কর্ম্ম দেশে ছিল,—তাহার ইয়ত্তা নাই। চারিদিকে হুলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি শুনা যাইত ; ধুপ ধুনার গন্ধে হিন্দু পল্লী আনন্দ ধামের মত বোধ হইত। সময় সময় দেশে খুব বড় বড় সমারোহের কাজ হইত। তাহার প্রশংসা ধ্বনিতে আমাদের আঙ্গিনা পুলকিত হইয়া উঠিত। মুক্তাগাছার লক্ষ্মী দেব্যার মহাভারত পাঠ, ময়মনসিংহের দশমহাবিদ্যা পূজা, রাজ রাজেশ্বরী পূজা, আঘারিয়ার হেমবাবুর মায়ের তুলা পরশ, রামগোপালপুরের কাশীবাবুর শ্রাদ্ধ, সুসঙ্গের মহারাজের শ্রাদ্ধ, কালীপুরের তারিণী বাবুর শ্রাদ্ধ, ভাওয়ালের রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণের বিবাহ, মুরাপাড়ার ঈশান বাবুর মায়ের শ্রাদ্ধ এক একটা নাকি বিরাট রাজসূয়ের মত কাণ্ড কারখানা হইয়াছিল। সে সকল ব্যাপারের যে প্রশংসা, যে ব্যয় বিধান, যে শৃঙ্খলা, যে আনন্দ উৎসবের

কথা শুনিয়াছি,—এখন তাহা সম্ভব কি না সন্দেহ। সে কালের লাখ টাকার কাজ এখন দশলাখ টাকায়ও হয় কিনা আমার আশঙ্কা হয়। আর সেই উদার দেশের যে দশজনে মিলিয়া আপন কাজের মত সেই কাজ নির্ব্বাহ করিয়াছিল, সেই রকম আর দশজন পাওয়া যায় কি না, ঠিক বুঝিয়া উঠিতেছি না। সেই রামও নাই,—সেই অযোধ্যাও নাই। শেষখানে রামগোপালপুর ভবাণীপুরের দোল উৎসব, ধলার জগদ্ধাত্রী পূজা, ময়মনসিংহের রাসযাত্রা প্রভৃতিও দেশে আনন্দ বিতরন করিত। তাহাও প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন যেন কেবলই 'ত্রাহিমাম্ মধুসূদন'। অন্ন চিন্তা, বস্ত্র চিন্তা, স্বাস্থ্য চিন্তা, মান সম্ভ্রমের চিন্তা। নির্বিষ ভুজঙ্গমের মত দেশের রাজা জমিদারগণ যেন সটান লম্বা পড়িয়া আছেন। কে দেশের এ সকল আমোদ উৎসব করে?

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

সম্বর হ্রদ (ভ্রমণ বৃত্তান্ত)।

একদিন আগরার বন্ধুগৃহে বসিয়া সম্বর হ্রদ দেখিবার আলোচনা করিতেছি, তার পর দিনই আলোচনাটা কার্য্যে পরিণত করিবার আয়োজন করিয়া মধ্যাহ্নে আগ্রার বন্ধুগৃহ হইতে আহার করিয়া যাত্রা করিলাম। ষ্টেসনে গিয়া দেখি একজন ভরতপুর রাজবংশের ভদ্রলোক আগরা হইতে ভরতপুর যাইতেছেন, কথায় কথায় জানিতে পারিলাম, তিনি ভরতপুরীয় দস্যুগণ কর্ত্তৃক আগরার ভীষণ ডাকাতিতে সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছিলেন। সে ভদ্রলোক আমাকে ভরতপুর দেখিয়া যাইবার অনুরোধ করিলে, আমি অল্প কথায়ই রাজী হইলাম। ভরতপুর স্বাধীন রাজ্য তখন মহারাজা নাবালক, তাঁহার অভিভাবক ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট, পূর্ব্বে রাজকর্ম্মচারী অনেকটা বাঙ্গালী ছিলেন কিন্তু এই আমলে বিতাড়িত হইয়াছেন। কেবল একটী ডাক্তার মাত্র বাঙ্গালী আছেন, তিনি কায়স্থ সুতরাং আমি সেই নব পরিচিত বন্ধু গৃহেই অতিথি হইলাম।

তখনও বেলা অনেকটা আছে। পথে পথে ময়ূরের নৃত্য, হরিনীর করুণ কৃপা চাহনী আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। মাঠময় ময়ূর ও হরিনী আনন্দে নাচিয়া বেড়াইতেছে।

বেশ একটু বেলা আছে, রৌদ্রও উত্তাপশালী; ইহারা ভিতর ভরতপুর ষ্টেসনে আসিয়া উভয়ে নামিয়া পড়িলাম। আমার বিছানা, বাক্স, পাটরী, লটবহর কুলী আসিয়া নামাইল। বন্ধু গৃহ হইতে যে অশ্বযান আসিয়াছিল আমরা তাহাতে উঠিবার অগ্রেই আমাদের লটবহর উঠিল। গাড়ী আমাদের বন্ধুগৃহের দ্বারে দাঁড়াইলেই নামিয়া পড়িলাম। বিশ্রামান্তে চা জলযোগ হইল।

পরদিন ভরতপুর রাজদরবার ও পৃথিবী বিখ্যাত সেই মাটীর কঠোর কঠিন প্রাচীর বেষ্টিত সুরক্ষিত দুর্গ দেখিলাম। দুর্গদ্বার বৃহৎ, এই দ্বার দিয়া আরোহীসহ বৃহৎ হস্তী অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারে। পরদিন দিক্‌ভবন্ দর্শন করিয়া আসিলাম। দিকভবন দিক্ নামক স্থানে অবস্থিত। ইহা অত্রত্য মহারাজের গ্রীষ্মাবাস বাটিকা। এখানে এমন একটী যন্ত্র আছে যদ্বারা যখন ইচ্ছা কৃত্রিম বৃষ্টি বর্ষণ করান্ যাইতে পারে। ইহা এখান হইতে মথুরা যাইবার পথে, দিক্ রোড নামক রাস্তার উপরে। এই পথে মথুরার দিক্ দরওয়াজা অতিক্রম করিয়া মথুরায় প্রবেশ করিতে হয়। এখানকার বাঙ্গালী ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হইল, বাঙ্গালী সঙ্গীহীন হইয়া তিনি বড় দুঃখিত। এই নাবালক

মহারাজের আমলে ইংরেজ রাজা অভিভাবক হইয়া অস্ত্র আইন প্রচলন করিবার আয়োজন করিলে রাজপুতগণ ক্ষেপিয়া উঠিয়া কহিয়াছিল "আগে আমাদের অস্ত্রের সঙ্গে আইনকারীর অস্ত্রের সংগ্রাম হইয়া পরাস্ত হইলে অস্ত্র আইন মানিয়া লইব।" ইহার পর অস্ত্র আইন প্রচলনের অভিপ্রায় সমূলে পরিত্যাগ করিয়া সরকার দেশবাসীকে সন্তুষ্ট রাখিয়াছিলেন।

মধ্যাহ্নাহার করিয়া দুপুর রোদে যাত্রা করিলাম। গাড়ীতে উঠিয়াও রোদের ঝাঁজ আমাদের গায় লাগিতেছে কিন্তু মাঠের মাঝে ময়ূর ময়ূরীর ও হরিণ হরিণীর নৃত্য দেখিতে দেখিতে আমরা সব ভুলিয়া গেলাম। ভরতপুরের একটী কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। ভরতপুর রাজ্যে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট তাহাদের বহুতর সৈন্য আনিয়া রক্ষা করিতেছেন। মাঠে উহাদের সৈন্যাবাস বা ক্যাণ্টনমেণ্ট, নূতন নির্ম্মিত হইয়াছে। যে দিক দিয়া রেল লাইন 'গিয়াছে' তাহার দুই দিকেই মাঠের মধ্যে এইরূপ ক্যাণ্টনমেণ্ট, এই সকল স্থানে তাহাদের গৃহে সৈন্যগণকে গাড়ী হইতেই দেখা যায়। অধিকাংশই দেখিলাম দেশী সৈন্য, গোরা সৈন্যও মাঝে মাঝে দেখিলাম।

বেলা যখন প্রায় চারিটা আমি তখন ফুলেরা জংসন ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। নদীয়া জেলাবাসী বাবু দাশরথী রায় এই ষ্টেশনে একটা ভাল কাজ করেন। দাশরথী বাবু আমাকে পাইয়া গাড়ী হইতে নামাইয়া লইলেন, তাঁহার গৃহে নিয়া প্রচুর জলযোগ করাইলেন, তাঁহাকে আর জীবনে ভুলিতে পারিব না। পাঁচালী গায়ক দাশরথী রায়ের নামের সহিত সাদৃশ্য আছে বলিয়াই তাঁহাকে খুব মনে করিয়া রাখিয়াছি। এখান হইতে গাড়ী বদল করিয়া সম্বর যাইতে হয়। দাশরথী বাবু আমাকে এখানে ২।১ দিন থাকিয়া যাইতে কহিলেন কিন্তু আমার সম্বর হ্রদ দেখিবার আগ্রহ বেশী সুতরাং সেই গাড়ীতেই সম্বর যাত্রা করিলাম।

জংসন হইতে গাড়ী ছাড়িল। মাঠ ধূলিময়, ধূলি উড়িয়া আকাশ, বায়ু—শ্বেত শোভা ধারণ করিয়াছে, এখানকার গাড়ীর শক্তি কম, বড় ধীরে চলে, মাঠের মাঝে এক একটা ষ্টেসন, নিকটে বাড়ী বা জনপদ নাই। যতদূর চারিদিকে দৃষ্টি চলে মনে হয় যেন চারিদিকের আকাশ মাটীতে লাগিয়াছে, গাছ পালা নাই, মাঝে মাঝে ছোট ছোট কাটাগাছ। মরুভূমির মধ্য দিয়া রেল গিয়াছে। এই জনহীন প্রান্তরের ষ্টেসন গুলিতেও মানুষ উঠিতে নামিতেছে। উহারা যে যাইতেছে, দেখিলে মনে হয় এক যেন অদ্ভুত জীব, মালকচ্ছ ধুতি, পায় নাগরাই জুতা, মাথায় গন্ধমাদন সদৃশ বিশাল পাগড়ী, পায়ের জুতার শুড়াগী ভাঙ্গিয়া অদ্ভুত চটীর আকার হইয়াছে, ইহাদের চট্‌পটাপট শব্দে চারিদিক মুখরিত হইতেছে, আর তাহাদের আসাতে ধূলি রাশি পথিকের মাথা পর্য্যন্ত উঠিতেছে, মাথার চুল, গোপ, দাড়ী, শ্বেতশুভ্র হইয়া গিয়াছে। আমি ভাবিতেছি ইহারা কোথা হইতে আসিল, কোথায়ইবা যায়, বিশাল বিশ্ব রাজ্যে ইহাদের আশ্রয় স্থান কতদূর। পরে জানিলাম ইহাদের গ্রাম অনেক দূরে, মরুভূমি ছাড়িয়া তাদের আবাস এ হেন মরুরাজ্যে ইহারা বাস করিলেও তাহাদিগকে দেখিলে মনে হয় ইহাদের স্বাস্থ্য বাঙ্গালী অপেক্ষা অনেক ভাল।

যখন সন্ধ্যা সমাগত তখন আমরা সম্বর রেল ষ্টেসনে আসিয়া পড়িয়াছি। গাড়ী থামিলেই দেখি ক্ষুদ্র একদল বাঙ্গালী গাড়ীর এ মাথা ও মাথা করিতেছে। আমার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি আগরা হইতে আসিয়াছেন?" আমার নিকট সদুত্তর পাইয়াই আমার লট বহর নামাইয়া লইলেন। আমি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে তাঁহারা কেমন করিয়া আমার অদ্যকার আগমন বার্ত্তা অবগত হইলেন, তাঁহারা বলিলেন "আগরা হইতে পত্র পাইয়াই আমরা প্রায় প্রত্যহ প্রত্যেক ট্রেনেই কেহ না কেহ আপনার খোঁজ

লইতেছি তার পর আজ স্কুলেরার দাশরথী বাবুর তার পাইয়া জানিতে পারিলাম আপনি এই ট্রেণে আসিতেছেন। তখন বুঝিতে পারিলাম দাশরথী বাবুই আমার আগমন সংবাদ দিয়াছেন। দুই সারি মেহগনি গাছের ভিতর দিয়া চলিলাম। ষ্টেসন হইতে স্কুলের আফিস ও বাঙ্গালী বাবুদের বাসা এক মাইলেরও কম। পথ ঘাট বেস খড়খড়ে, বারমাসই এমন থাকে, বর্ষাকালেও যেন পরিষ্কার। বাঙ্গালার মত এখানেত আর বৃষ্টি হয় না। সুতরাং ভূমি আমাদের মত শস্যশালিনীও নহে। ইংরেজেরা এখানে আসিয়া এ স্থানটাকে আরো পরিষ্কার ও রাস্তা ঘাট উন্নত করিয়াছেন। ইহাদের কৃত বাগান ও রোপিত বৃক্ষাদি আমাদের দেশের ন্যায় সতেজ ও সপুষ্ট নহে, তবে দৈনিক ইহাদিগকে জল সেবা করিয়া কোনপ্রকারে তেজ রক্ষা করিয়া বাঁচাইয়া রাখা যাইতেছে। দল, পুষ্পাদি আমাদের দেশ অপেক্ষা বেশীই হইয়া থাকে। অতি কষ্টে তরি তরকারীর গাছগুলি বাঁচিয়া রহিয়াছে। কূপ হইতে জল তুলিয়া গাছে দিয়া তাহাদের জীবন রক্ষা করা হয়। আমি তারপর তাহার সঙ্গে বাড়ী প্রবেশ করিলাম ও আহারান্তে নিদ্রা গেলাম।

প্রভাতে গাত্রোত্থান করিবার পূর্ব্বেই দেখি বাঙ্গালী বাবুগণ গৃহদ্বারে সমাগত হইয়াছেন, তাহারা প্রাতভ্রমণে বাহির হইবেন ও আমাকে লইয়া যাইবেন। প্রাতকৃত্যাদি সমাপণ করিয়া আমিও তাঁহাদের সহযাত্রী হইলাম। হ্রদের পাশ দিয়া যে রাস্তা গিয়াছে আমরা সেই রাস্তা দিয়া বেড়াইতে চলিলাম। হ্রদটী অপূর্ব্ব জিনিষ, ইহার দৈর্ঘ্য ২০ মাইল, প্রশস্ত ৬।৭ মাইল, জলের গভীরতা তিন হাত, ইহার মধ্যে কোন বন, জঙ্গল নাই—বড় পরিস্কার, দেখিতে সুন্দর। হ্রদের অপর দিকে আকাশের পানে একটা রক্তবর্ণ স্থান দেখিয়া বলিলাম, "প্রাতে ত আকাশ এমন লাল হয় না।" সহযাত্রীরা বলিলেন "ইহা গিরি মাটীর পাহাড়। এই পাহাড়ের মাটীই গেরুয়া মাটী নামে প্রসিদ্ধ, হ্রদের উপরে স্তূপাকার সজ্জিত লবণের ঢিপি বহুসংখ্যক দেখিতে পাইলাম; স্থানে স্থানে বড় বড় পুকুর খনন করা রহিয়াছে, তাহার ভিতর নানা আবর্জ্জনা, ইহার এমন দুর্গন্ধ যে নাক চাপিয়াও চলা কঠিন। হ্রদ হইতে এই পুকুরের ভিতর জল আনা হয় পরে তাহাতে বালুকা ও নানা আবর্জ্জনা ফেলিয়া রাখিলেই নুণ হয়। এ সকল যখন পঁচিতে থাকে তখন বিষম দুর্গন্ধ হয়। সেখানকার লোকদের এই গন্ধ সহ্য হইয়া গিয়াছে। বাবুরা একজন নুণের দারোয়ানকে বলিয়া দিলেন যে আমাকে সঙ্গে লইয়া সমস্ত দেখাইয়া দিবে, ইহার পর হইতেই দারোগা ও একজন দারোয়ান আমার নিকট সর্ব্বদাই থাকিত ও সঙ্গে নিয়া নানা স্থান দেখাইত।

এখানে ইংরেজ—খৃষ্টান মিশনরীদের এক আড্ডা আছে। দেশে তাহারা বেশী সংখ্যক খৃষ্টান করিতে পারেন নাই। মিশনরীদের একটা মধ্য ইংরাজী স্কুল ও আছে। ছাত্র প্রায় একশত, ইংরাজী পড়ান ইংরেজ খৃষ্টান সাহেবেরা, বাঙ্গলা পড়ান হয় না, সে দেশী ভাষা শিক্ষা দেয় সে দেশীয় শিক্ষকেরা, উহারা মিশনরীদের বেতন ভোগী, বাঙ্গালী বাবুদের পুত্রদের বাঙ্গলা শিখিবার উপায় এখানে নাই। আমি একদিন মিশনরীদের স্কুল দেখিতে গিয়াছিলাম, ইংরেজ মিশনরীরা আমাকে খুব খাতির করিয়াছিলেন। তাহারা স্কুলে বাইবেল পড়ান ও তাহাদের স্ত্রীলোকেরা গৃহস্থ বাড়ীতে গিয়া উলের ও সূচের কাজ শিক্ষা দেন এবং কিছু কিছু ভাষা শিক্ষাও মেয়েদের দিয়া থাকেন। মিশনরীরা সে দেশীয়দের সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করেন। বিনা মূল্যে তাহারা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করেন, দরিদ্রদিগকে টাকা ধারও দেন। তাহারাও সাহেবদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার

করিয়া থাকে। মিশনরীদের বাঙ্গলা গুলি ও তৎসহ বাগান পরিষ্কার ও সুন্দর।

নুণের একজন দারোগা ও একজন দ্বারবান বা চাপরাশী আমার সঙ্গে প্রায় সর্ব্বদাই থাকে। সম্বরে পৌঁছিবার পরদিন আহারান্তে আমি নুণের হ্রদ দেখিতে যাত্রা করিলাম। গা টা কেমন কেমন করিতেছিল তথাপি উৎসাহ কম হয় নাই। কতক দূর নুণের আফিসের কাছে যখন গিয়াছি তখন গা বমি বমি করিতে লাগিল। উপরে প্রখর রৌদ্র, নীচে বালুকারাশি উত্তপ্ত। হঠাৎ আমি পড়িয়া গিয়া অচৈতন্য হইলাম, অচৈতন্য হইবার সময় ভগবানের নাম স্মরণ হইল না। দেশের স্ত্রী পুত্রাদির কথাই মনে পড়িল। ভাবিলাম হায় এ হেন দূরবর্ত্তী দেশে আপনার জন ছাড়া হইয়া মারা গেলাম। মানুষ এমনই ভাবে অকৃতজ্ঞ—ভগবানকে পর্য্যন্ত ভুলিয়া যায়। কতক্ষণ পরে চৈতন্য লাভ করিলাম মনে নাই, যখনই জ্ঞান আসিলে চাহিয়া দেখি আমার কাছে আফিসের সবগুলা বাঙ্গালী ও দুইটি ইংরেজ এবং কয়টা অপরিচিত সে দেশী লোক। সাহেবেরা নুণের কর্ত্তা, সকলেই আমার পরিচর্য্যায় ব্যস্ত; মস্ত গোল। চেতনা লাভ করিয়া দেখি আমার গাময় ভাত, বুঝিলাম বমি করিয়াছি। বমি করার দরুণই এতটা শীঘ্র চেতনা লাভ করিতে পারিয়াছি। এ সময় ডাক্তার আসিয়া পঁহুছিয়াছেন। একজন স্ত্রীলোক পথিক কূপ হইতে জল তুলিয়া আমার মাথায় দিতেছিল। আমার জন্য পাল্কী আনিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল কিন্তু আমি কোন অসুস্থতা বোধ করিতেছিলাম না সুতরাং হাটিয়াই বাসায় গেলাম। এই উপদ্রবের পরে আমার আর কোন অসুস্থতা বোধ হয় নাই। গৃহস্বামী বাসায় আসিয়া আমাকে ঔষধ খাওয়াইলেন, ডাক্তারও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমার কাছে ছিলেন। ডাক্তারটী পঞ্জাব প্রদেশবাসী, ইংরেজদের বেতন ভোগী, ইনি নুণের আফিসের ও কুলীদের চিকিৎসা করেন। বাহিরের রোগী পাইলেও নিয়া থাকেন। এ দেশীয়েরা ডাক্তারী ঔষধ বড় বেশী খায় না।

আমার এতটা উৎসাহ যে ঘরে বসিয়া থাকিতে পারিলাম না। কিছুকাল পরে নুণের দারোগাকে ডাকাইয়া হ্রদে নুণের কাজ দেখিতে যাত্রা করিলাম, গৃহস্বামী সে দিন বিশ্রাম করিতে বলিয়া গিয়াছিলেন। আমি আর নুণের আফিসের দিক দিয়া গেলাম না। আশঙ্কা যদি বাবুরা যাইতে নিষেধ করেন,—তাঁহারা মনে করিয়াছেন আমি অসুস্থ। আমি একবারে নুণের হ্রদের কারখানার কাছে গিয়া হাজির হইলাম। কেহ হ্রদ হইতে খাল কাটিয়া পুকুরে জল আনিতেছে, কেহ কোদালী দিয়া নুণ তুলিতেছে, কেহ রেল লাইনের উপর গাড়ীতে নুণ বোঝাই করিতেছে, ষ্টেসন হইতে রেল লাইন নুণের হ্রদ পর্য্যন্ত গিয়াছে। গাড়ী বোঝাই হইলে ইঞ্জিন সহযোগে তা ষ্টেসনে আসিয়া যত্র তত্র চালান হইয়া যায়। এ দেশীয়েরা এই নুণই বেশী খায়। এই হ্রদের জল কোন স্থানে জমা করিলে সেই জলে যতটুক মাটী ধরিতে পারে তা নুণ হইয়া যায়। কেহ নুণ প্রস্তুত করিয়া বা প্রস্তুতি নুণ বিনা অনুমতিতে নিতে পারে না, তাহা হইলে ইংরেজ কর্ত্তৃক তাহাদের অর্থ ও কারাদণ্ড হইতে পারে।

এই হ্রদের মালিক জয়পুর ও যোধপুরের মহারাজদ্বয় তুল্যাংশে। এখানে মহারাজদের এজমালি কাছারী ও জেলখানা প্রভৃতি আছে। ইংরেজেরা (গবর্ণমেণ্ট) এই হ্রদ বহুদিনের জন্য ইজারা লইয়া নুণের কারবার করিতেছেন। মাড়োয়ারী সদাগরেরা ইহাদের সঙ্গে কারবার করিয়া প্রচুর ধনার্জ্জন করিতেছেন কিন্তু বাঙ্গালীরা কেবলই গোলামী করিতে জানে, সেখানেকার বাঙ্গালী বাবুরা নুণের কারবারে থাকিলেও ভ্রমে উহার ব্যবসার কথা মনে ভাবেন না। এখানে রাজাদের বিচারালয়েতেই সব কাজ হয় তবে নুণের ব্যবসা সংক্রান্ত অপরাধের বিচার এখানকার ইংরেজেরা করেন। রাজাদের নিকট হইতে

ইংরেজেরা সে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এখানকার ইংরাজদের জেলখানায় ৫।৭ জন কয়েদী থাকিতে পারে। বেশী কয়েদী হইলে রাজাদের জেলখানায় পাঠাইয়া দেওয়া হয়। রাজ সরকারে ইংরেজদের প্রতিপত্তি বেস আছে। ইংরেজেরা রাজ আদালতে আসামী হইয়া গেলেও আসন পান। এখানে একটী বাজার আছে তাহাতে সাধারণ মত দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় হয়। সপ্তাহে দুইদিন হাট বসে।

সম্বরের নুণের হ্রদ সম্বন্ধে এখানে একটা প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে। আমি তাহা বাবুদের মুখে শুনিয়া দূরস্থিত কালী বাড়ী দেখিতে মনস্থ করিলাম। সে প্রবাদ বাক্যটী এই—একদা যোধপুরের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী মহারাজা এখাকার কালী দেবী সাধনা করিয়া বর প্রাপ্ত হন যে তিনি অশ্বারোহণ করিয়া পশ্চাতে না ফিরিয়া যতদূর যাইবেন ততদূর পর্য্যন্ত সে স্থানে সোণা ফলিবে। কালী দেবীও তাঁহার সঙ্গে অদৃশ্য ভাবে যাইবেন। মহারাজা অশ্বারোহণ করিয়া দ্রুত চলিলেন। বহু দূর পর্য্যন্ত গিয়া কৌতুহলাবিষ্ট হইয়া পশ্চাতে চাহিয়া দেখেন পিছনেরদিকে সবই জল হইয়া গিয়াছে। মহারাজ দেবীকে কহিলেন "মা, একি করিলে সবই যে জল।" দেবী কহিলেন "প্রতিশ্রুতি মত আমি এইখানেই রহিলাম আর যাইব না। এই জলেই তোমার সোণা ফলিবে। ইহাতে প্রচুর লবণ উৎপন্ন হইবে।" মহারাজাও থামিয়া পাড়লেন। এই বিরাট জলাশয়ই [illegible] হ্রদ। এখানে প্রতি বৎসর বহু লক্ষ টাকার নুণ উৎপন্ন হয়। যেখানে দেবী রহিলেন সেখানে মন্দিরাদি করিয়া তাঁহার সেবা পূজার ব্যবস্থা অদ্যাপি তথায় হইতেছে। এই প্রবাদ বাক্য কতদূর সত্য বুঝা না গেলেও কার্য্যতায় কতকটা সত্য বলিয়া অনুমান করা যায়। সেই কালী দেবীর মন্দির নুণের আফিস হইতে চৌদ্দ মাইলদূরে অবস্থিত।

আমি সেই কালী দেবীর মন্দির দেখিবার অভিলা[ষ] প্রকাশ করিলে বাবুরা কহিলেন, "রবিবার আসুক, [সে] দিন আফিস বন্ধ, আমরা গো-গাড়ী করিয়া আপনা[কে] লইয়া যাইব।" আমি তাঁহাদের কথায় রাজী [না] হইয়া পরদিন যাইব ব্যবস্থা করিলাম। একজন যুব[ক] সাহেবের নিকট আলাপ করায় তিনিও আমার সহযা[ত্রী] হইবেন প্রকাশ করিলেন, তিনিও সে স্থান দেখে[ন] নাই। পরদিন যাওয়া সাব্যস্থ হইল—উভয়ে অশ্বারোহ[ণে] যাইব। সাহেবদের কয়টা অশ্ব সেখানে আছে। ঘোড়া গাড়ী সেখানে চলেনা। তাহা এখানে নাই। পরদি[ন] কিছু রাত্র থাকিতেই সাহেবের ভৃত্য আমাকে আসিয়া জানাইল। নিদ্রোত্থিত হইয়া ভৃত্যকে চা প্রস্তুত করিতে কহিয়া প্রাতকৃত্যাদি সারিয়া লইলাম। চা প্রস্তুত হইলে বাড়ীর ভিতর হইতে কিছু জল যোগের আয়োজন করিয়া দিল। তাড়াতাড়ি তাহা গলাধঃকরণ করিয়া সাহেব [ও] আমি অতি প্রত্যুষে যাত্রা করিলাম। গৃহস্বামী উঠিয়া আমাদিগকে যাত্রা করাইয়া দিয়া গেলেন। দ্রুতগামী অশ্বারোহণে আমরা মরুভূমির উপর দিয়া চলিয়া বেলা নয়টার সময় কালী মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। আমা[-] দিগকে দেখিয়া কালীর সেবাইতেরা ও সে গ্রামবাসীরা ভীত হইল। সকলে আমাদিগের উভয়কেই সাহেব বলিয়া সাব্যস্থ করিল। একজন সাদা আর একজন কালো সাহেব। সাহেবেরাও দুই রকম হয় ইহাই তাহাদের ধারণা হইল। যে হেতু আমারও সাহেবী পোষাক ছিল। আমরা যথা সম্ভব বিশ্রাম করিয়া এদিক ওদিক বেড়াইয়া আসিলাম। তৎপরে আমি স্নানাহ্নিক করিলাম, সাহেব আর স্নান করিলেন না। আমাকে তদবস্থায় দেখিয়া পরে তাহাদের ধারণা হইল আমি নুণের আফিসের একজন বাঙ্গালী বাবু। আমাদের আহারের জন্য সেবাইত ব্রাহ্মণেরা লুচি, মিঠাই প্রভৃতি দুগ্ধাদি সংগ্রহ করিল। আমরা তাহা আহার করিয়া বেশ তৃপ্তি লাভ করিলাম। এই কালী দেবীর মেলায়

ও রাজ সরকার হইতে জমি ও মাসিক বৃত্তির বরাদ্দ আছে। আমরা আহারান্তে বিশ্রাম করিয়া বেলা তিনটার সময় তথা হইতে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম। আমাদের আহারের ব্যয় তাহারা লইল না, সেবাইত ব্রাহ্মণদিগকে কিছু দিয়া আসিলাম। তাহাদের ব্যবহার আমাদের নিকট বড় ভাল লাগিল। ভারতের হিন্দুরা অতিথি সৎকারে বেশ মুক্ত হস্ত। ইহারাও তদ্রূপ।

আমরা সন্ধ্যার সময় সহরে আসিয়া পঁহুছিলাম। আমরা কি দেখিয়া আসিলাম উহা কেমন স্থান তাহা জানিবার জন্য সকলে আসিয়া একত্র হইয়াছেন। আমরাও যথা সম্ভব কৈফিয়ৎ দিয়া রেহাই পাইলাম। এখানকার সাহেবেরা বাঙ্গালীদিগকে ঘৃণা করেন না বরং বিলক্ষণ সমাদরই করিয়া থাকেন। তাহারা পরস্পর বিলক্ষণ বন্ধুতা ভাব রক্ষা করিতেছেন, উহাদের মধ্যে মনিব, চাকর সম্বন্ধ ভাব নাই। সন্ধ্যার পর চা ও জলযোগের পর সঙ্গীতালোচনা হইল। কেহ বাদক কেহ গায়ক। আমার এ বিষয়ে মূর্খতা জানিয়া তারা হতাশ হইলেন। এ দিন সাহেবও আসিয়া আমাদের সঙ্গীতালোচনায় যোগ দিলেন। সাহেব গান বুঝিলেন না আমাদের মধ্যে একজন দোভাষী হইয়া সাহেবকে গানের অর্থ বুঝাইয়া দিলেন। রাত্রি ১১টার সময় সঙ্গীত সভা ভঙ্গ হইল। আমরাও আহারান্তে নিদ্রা গেলাম। পরদিন প্রাতে প্রাতভ্রমণান্তে আহার করিয়া সকলে আফিসে গেলেন, আমি সংবাদ পত্র ও পুস্তক লইয়া বিশ্রাম করিতে বসিলাম।

অল্প মাত্র বিশ্রামান্তে নুণের দারোগাকে ডাকাইয়া একখানা গো-গাড়ী আনাইলাম। সাহেবকে পূর্ব্বেই গো-গাড়ীর কথা বলিয়া দিয়াছিলাম। আমি দারোগা ও চাপরাসী সহ গাড়ীতে উঠিয়া গিরি মাটীর পাহাড় দেখিতে যাত্রা করিলাম। হ্রদের পার দিয়া যে রাস্তা গিয়াছে তাহা ধরিয়াই আমাদের গাড়ী চলিল। গিরি মাটীর পাহাড়ের নীচে গাড়ী রাখিয়া পদব্রজে পাহাড়ে উঠিলাম। পাহাড়ের সব মাটীই পদ্ম পলাশ বর্ণের। আমরা দেখিলাম একস্থান হইতে কোদালী দিয়া গিরি মাটী তুলিতেছে ও তাহা গো-গাড়ীতে বোঝাই করিয়া ষ্টেসনে লইয়া যাইতেছে। দুই তিন বৎসর ক্রমাগত একস্থান হইতে গিরি মাটী তুলিলে সেখানে তার অভাব হয় ও পরে অন্য দিকে গিয়া তুলিতে হয়। তার পর কয় বৎসরে আবার এখানে মাটী হইলে তা তুলিবার যোগ্য হয়। সন্ধ্যার সময় আমরা ফিরিয়া আসিলাম। মরুভূমির উপর দিয়া গিয়াছি বলিয়া আমাদের গাড়ীর ঘড় ঘড় শব্দ হয় নাই, বালুকা রাশির উপর দিয়া গাড়ীর চাকার ফন্ ফন্ শব্দ হইয়াছিল। বাতাসে আমাদের গা ময় ধুলি বিস্তার হইয়াছিল।

যাহা এখানকার দ্রষ্টব্য তা দেখিলাম। এখানে বহু কূপ আছে তাহাদের কোন কোনটার লোণা জল আর বাকি সব মিঠা জলের। লোণা কূপের জলে বাসন বসন ধোয়ে ও কাপড় কাচে। মিঠা কুয়ার জল পান করে। লোণা কূপকে খাট্টা কূয়া ও পানীয় জলের কূপকে মিঠা কূয়া কহে। এখানকার মাটীতেও লবণের ভাগ বেশী, তাই বলিয়াও এখানে নারিকেল গাছ দেখিলাম না। আমি বড় আদর আপ্যায়নে এখানে কয়টা দিন কাটাইলাম। কতক বাঙ্গালীহীন বা স্বল্প বাঙ্গালীময় স্থানে প্রবাসী বাঙ্গালীরা দেশের লোক পাইলে এমন করিয়াই আদর করেন। আমি তথা হইতে যাইবার আয়োজন করিলেও তাহারা ছাড়িতে চাহেন না এমনই ভাব।

পরদিন বেলা ৪ টার সময় এখান হইতে অন্যত্র যাত্রা করিলাম। বাঙ্গালী বন্ধুরা ষ্টেসনে আসিয়া আমাকে যথা সম্ভব আদর করিয়া বিদায় করিয়া গেলেন। বেশ কয়দিন আনন্দে কাটাইয়াছি। এমন আনন্দ কি জীবনে আর একবার পাইব না? হুস্ হুস করিয়া ট্রেণ চলিয়া গেল, আমি আমার স্বদেশী বন্ধুদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিলাম তাহাদেরও তদবস্থা। যতদূর পর স্পর

ছুট্টি চলিল ততদূর পর্য্যন্ত একই ভাবে চাহিয়া রহিলাম, তার পর বিরাট মাঠের মাঝে বহু দূরে গিয়া পরস্পর অদৃশ্য হইয়া পড়িলাম। ইহাই আমাদের অকৃত্রিম বন্ধুতা। হায়, কি অকৃত্রিম আনন্দ।

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মজুমদার শাস্ত্রী, বিদ্যাভূষণ।

যৌবনের সমাধি।

আজি তব নাহি রূপ, বর্ণ তব কষিত কাঞ্চন
আজিকে হয়েছে ম্লান, তেজোহীন তোমার নয়ন।
নাহি শোভা চিকুরের, ওষ্ঠাধরে নাহিক রক্তিমা
আজিকে নীরস রূঢ় মধুময়ী তোমার ভঙ্গিমা।
তব রূপ লাবণ্যের জীবনের হয়েছে মরণ
তুমি তার মৃত দেহ, কাল সবি করেছে হরণ।
এবে বক্ষোবাহু রচা সমাধিতে করিয়া নিহিত
নিশি দিন রবো জাগি আগুলিয়া চির সমাহিত।

শ্রীকালিদাস রায়।

অবরোধ।

(Erckmann Chatrian লিখিত—
Le Blocus নামক অখ্যায়িকার বঙ্গানুবাদ)

চতুর্থ অধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এই সব গোল মালের ভিতর ত্রাসবুর্গও পারি সহর থেকে ডজন ডজন লোক খবর নিয়ে আসতে লাগল। পথ দিয়ে যেতে হলেই একজন না একজন সওয়ার চোখের উপর পড়্‌তো। তারা সকলেই জার্ম্মাণ দরওয়াজার কাছেই বকহোনৎসের সম্মুখে গবর্ণর সাহেবের কুঠিতে এসে থামতেই তাদের চার ধারে লোকে গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়াত তার পর হরকরা ঘোড়া থেকে নাম্‌তে না নাম্‌তেই সহরময় গুজব রটে যেত যে ফ্রাকরে এসে শত্রু সেনারা জমায়েৎবন্ত হয়েছে আর আমাদের দলের সেনারা র‍্যা (রাইন) নদীর দ্বীপ গুলো রক্ষা করছে। কখনও বা শুন্‌তাম ১৮০৩ থেকে ১৮১৫ সাল পর্য্যন্ত যে সকল ফৌজে কাজ করেছে তাদের সুদ্ধ-কেইঁ ডাকা হয়েছে। কেবল ১৮১৫ সালে যারা ভর্ত্তী হয়েছিল ভবিষ্যত যুদ্ধ করবে বলে তাদেরই—শুধু আলাহিদা করে রাখা হয়েছে। তারা কতক আছে নেতজে, কতক আছে বোম্দোতে আর কতক আছে তুর‍্যা বন্দরে। তারপর আবার একদিন শুন্‌লাম কানা ঘুঁষা চল্‌ছে যে দেশের প্রতিনিধিরা সবাই এক জোট হয়ে কাজ কর্ত্তে গিয়েছিল বলে তাদের নাকের সাম্‌নে মন্ত্রি সভার দরওয়াজা বন্ধ করিয়ে দিয়েছে। এই রকম কত যে আজগুবি সংবাদ আস্‌তো আর বলবার নয়। প্রোফটাল পিরমাঁজা কাইজার স্লাটতার্‌র্থ আরও সব কাছাকাছি গাঁ থেকে যেসব লোকেরা চোরা গোপ্তা আবগারির জিনিস আমদানি করে সেইদলের হাত কাটা ফ্রন্স স্মেগ্‌ল আরও কত সব লোক লুকিয়ে লুকিয়ে এসে চুপি চুপি বলে বেড়াতে লাগ্‌ল যে রাশিয়ার সম্রাট আলেকজান্দার "অষ্ট্রীয়ার সম্রাট ফাঁসোয়া যোজেব" আর জার্ম্মাণির ফ্রেডারিক উইলিয়ম ঘোষনা করে দিয়েছে যে তারা এই যে যুদ্ধটা কর্‌ছে সে শুধু সম্রাট নেপোলিয়নের সঙ্গে, ফরাসী জাতীর সঙ্গে নয়। নেপোলিয়ন যাতে ইউরোপটা ধ্বংস করে না ফেলে এই তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। তারা নাকি বলেছে যে তারা আবগারি টাবগারি যা কিছু ট্যাক্স আছে সব তুলিয়ে দেবে। সন্ধ্যা বেলা এই সব শুনে লোকেরা যে কি কর্‌বে তা ভেবে পাচ্ছিল না। একদিন সকাল বেলায় সব পরিষ্কার হয়ে গেল। সেটা বোধ হয় আটই কি নয়ই ডিসেম্বর। আমিসবে মাত্র উঠেছি তখনও পোষাক পরি নাই এমন

সহর রাস্তায় ঢ্যাঁটরার শব্দ শুন্‌তে পেলাম। শুন্‌লাম হুকুম হয়েছে যে সকালে আটটা আর সন্ধ্যার ছ'টার সময় যত লোক সব গিয়ে মেয়ার সাহেবের কাছারীতে জমা হবে। কেহ যেন অন্যথা না করে। সকলে আপন আপন কার্তুস আর ওভারকোট নিয়ে আস্‌বে—যারা না আস্‌বে তারা ফৌজী আদালতে তলব হবে। একেই বলে বোম্বার ... শেষ আটি। যারা লড়াইয়ের লায়েক তারা তখন ... কোদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বুড়ো হাবড়া সিপাইরা সব নগর দুর্গ রক্ষা করছিল। যে সব সহরের সুখবাসী তারিক্‌কে লোক চিরকাল বাড়ী বসে ... হয়ে আপন আপন বিষয় কর্ম্ম দেখে আস্‌ছে এখন তাদের সদা সর্ব্বদা গড়ের পাঁচিলের উপর দাঁড়িয়ে জীবনটা হারাতে বস্‌তে হবে। সর্লে কিছু না বলে ... আমার দিকে তাকিয়েছিল আমার মুখ দিয়েও ... কথা বার হচ্ছিল না। প্রায় মিনিট পনর পরে ... ভোগর ছাড়া হলে আমি বল্‌লাম "তুমি সুরুয়াটা ... করে ফেল আমি মেয়ার সাহেবের আপিসে গিয়ে বন্দুক আর কার্তুসের বাক্সটা নিয়ে আসি।" তখন সে আর থাক্‌তে না পেরে বলে উঠ্‌ল "কে কবে ভেবেছে যে এ বয়সে আবার যুদ্ধ কর্‌তে যেতে হবে হা ভগবান! কি বিপদই এনে ফেল্‌লে" আমি আর কি উত্তর দেব কেবল বল্‌লাম সবই প্রভুর ইচ্ছা।"

বাড়ী থেকে বেড়িয়ে পড়্‌লাম। মন যে কি খারাপ হয়ে গেল তা আর বল্‌বার নয়। ছোট ছেলে সাফেন ... সঙ্গেই আস্‌তে লাগল। চাঁদনী বাজারের মোড়ে ... পৌছাতেই দেখি বুর্গে মেয়ার আপিস থেকে নেবে আস্‌ছে। সিঁড়িটায় লোক গিস্‌ গিস্‌ কর্‌ছে। দেখ্‌লাম তার কাঁধেও বন্দুক। আমাকে দেখেই সে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌তে লাগ্‌ল "আর দেখ্‌ছ কি মোঁয়াস আমাদের এখন বুড়া বয়সে "ধাকাবী" বনে যেতে হবে।" তার ... মেজাজ দেখে আমারও একটু ধরে প্রাণ এল। আমি বল্‌লাম "আচ্ছা বুর্গে বল দেখি এ কেমন ধারা রীত ছেলে পিলের বাপদের ধরে মানুষ খুন কর্ত্তে নিয়ে যাওয়া। আমি ত কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পারছি না। এসব কিন্তু আমার বড় ভাল বলে ঠেক্‌ছে না। সে বল্লে "কেন হলো কি? বুল্‌বুল্‌ না মিল্‌লে ফিঙে দিয়েইত কাজ চালাতে হয়" কিন্তু, তার তামাসায় আমি হাস্‌ছিনা দেখে বুর্গে বল্লে "যাও মোয়াস। অমন করে মন খারাপ করো না এ শুধু একটা নিয়ম রক্ষা বইত নয়। যুদ্ধ করবার মত লোকের এখানে বড় অভাব হবেনা, আমরা শুধু পাহারা টাহারাই দেব। যদি বাইরে গিয়ে শত্রু সেনাদের সঙ্গে লড়াই কর্ত্তে হয় কি তারা আগিয়ে এলে তাদের তাড়িয়ে দেওয়ার আবশ্যক হয় তা'হলে কি আর আমাদের পাঠাবে ভেবেছ? আমাদের দৌড়াবার মত কি বয়স আছে না বন্দুক চালাবার ক্ষমতা আছে? তুমিও দাড়ী চুল পাকিয়ে টাক্‌ টাক পাড়িয়ে একদম শাদা হয়ে গিয়েছ তোমার আর ভাবনা কি? মন চাঙ্গা কর।" আমি বল্লাম "হাঁ তা সত্যি বটে কিন্তু বুড়া হলেও তুমি যতটা ভাব্‌ছ দেহটা বোধহয় এখনও তত ভেঙ্গে পড়েনি।" তাআর কথা কি, ভালই তা যাও এখন গিয়ে বন্দুক কার্ত্তুস নিয়ে এস।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম তাহলে আমাদের কি বারিক ঘরে গিয়ে থাকতে হবে নাকি? সে শুনে হো হো করে হেঁসে উঠ্‌ল। বল্লে "না হে না বারিকে কেন আমরা আপন আপন বাড়ীতেই থাক্‌ব।" তারপর সে আমার হাতধরে বিদায় নিলে। আর আমি খিলান করা দরজার ভেতর দিয়ে মেয়ারের কাছারিতে ঢুক্‌লাম। দেখ্‌লাম সিড়ি একদম লোকে ভর্ত্তি, নাম ডাকা হচ্ছে শোনা গেল। ফ্রিজ সেই সময় যদি তুমি থাকতে তাহলে দেখ্‌তে ছোটলোক বেটাদের রকমখানা! রবিনে, গুদিয়ে, সারিনে যতসব টালিওয়ালা শানওয়ালা রংমিস্ত্রি এরসব আর আর সময় কোথাও একটু কাজ আছে শুন্‌লে শাতবার করে সেলাম করে টুপী খুলে দাঁড়াত ... এখন সব বেটারা যেন জমীদাট মাথা উঁচু করে

বুক ফুলিয়ে শীস্ দিতে দিতে দাঁড়িয়ে সকলের দিকে যেন নেহাৎ দয়া করে চেয়ে আছেন। আমাকে দেখে একবেটা বল্লে "আরে মোয়াস দেখ্ছিস্ কি, তুই ভারি মুদ্দোর সেপাই বনে যাবি। হা হা হা এবার তোমার গোফ জোড়াটা আর টিক্‌ছে না ফৌজী দস্তুর মাফিক কেটে ছেঁটে ছোট্ট করে দেবে।" এই রকম আরও কত কি ফাজ্‌লেমী করতে লাগ্‌ল। সত্যি সত্যি সবই যেন বদ্‌লে গিয়েছে বলে বোধ হতে লাগ্‌ল। যত সব পুরান যোদ্ধা তার কেউ হলেন জমাদার কেউ হলেন হাবিলদার আর কেউ হলেন সুবাদার আর আমরা যত সব যেন কেউ কোথাকার নয় ভাস্‌তে ভাস্‌তে এসেছি। যুদ্ধ এসে যেন সবই উল্টে দিলে "নীচ হইল উচ্চ গামী উচ্চ হৈল নত।" কে কেমন বুদ্ধিমান তার আর কেউ খোঁজ করলেন না খোঁজ পড়ল কেবল কুচ কাওয়াজের। কাল যে ব্যক্তি নোংরা ঘরদোর সাফ করে দিয়ে যেত এমন বুদ্ধি ছিল না যে আর কিছু করে পেটের ভাত করে এখন তিনি হলেন আমাদের জমাদার সাহেব। তিনি যদি 'সাদা' কে "কাল" বলেন তার উপর কথা কইবার যোটি নাই যাক্‌গে সে কথা। সেখানে গিয়ে সেদিন ঘণ্টা খানেক দাঁড়িয়ে থাকার পর আমার নাম ডাক হল। মোয়াস বলে হাঁক্‌ছে শুনে আমি উপরে গেলাম। দেখলাম উপরে বড় হল ঘরটায় লোক আটছে না। আমাকে দেখে সবাই বল্‌তে লাগ্‌ল মোয়াস তোর যে বাপু আর-সবর হয়না দেখি। ওধারে একবার চেয়ে দেখ্ ওই খানে যারা দাঁড়িয়ে রয়েছে ওই হচ্ছে পুরান গার্ড পল্টন। দেখ্ছিস্ত কেমন সব জোয়ান! তোকে নিশান ওয়ালা করে দেওয়া যাবে। তুই আগে আগে গিয়ে আমাদের লড়াই কতে করিয়ে নিয়ে আস্‌বি। "এই না বলে উজবুক বেটারা গা টেপা টেপি করে হাঁসা হাঁসি আরম্ভ কর্‌লে। আমি আর তাদের দিকে না চেয়ে কোন জবাব টবাব না দিয়ে সটান চলে গেলাম। ঘরের ভেতর গিয়ে দেখি কার কার ফৌজে যেতে হবে তা যুক্তি করে ঠিক করা হচ্ছে আর বুড়া কর্ত্তারা সব আড্ডা করে বসেছেন। গবর্ণর সাহেব সেনাপতি পেটিজেন আমাদের মেয়ার মশাই, তার পেস্কার ক্রিসার উর্দী বিভাগের কাপ্তেন বঁনেয়া এই রকম ছয় সাত জন বেতো রুগী সহরের পাঁচ পাড়া থেকে একত্র হয়ে ছোট খাট এক বৈঠকে জুটেছেন—কেউ বা বসে আছেন কেউ বা দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে ঢুকতে দেখে বুড়োরা সব হাস্‌তে লাগ্‌লো। তারা নিজেদের মধ্যে যা সব বলাবলি করছিল তা আমার কতকটা কানে গেল শুনলাম একজন বলছেন "ও এখনও খুব শক্ত আছে ও ঠিক পারবে।" আর প্রায় সকলেও সেই ভাবেই কি সব বলতে লাগলো। আমি মনে মনেই বল্‌লাম যে তোমরা যা খুসি বলে যাওনা কেন তোমরা যে সব খোস চেহারা বিশ বছরের ছোকরা তা আর কেউ মনে কর্‌ছে না। মনে যাই ভাবিনা কেন মুখ ফুটে আর কিছু বল্‌লাম না। গবর্ণর সাহেব মেয়ার মহাশয়ের সঙ্গে এক কোণে কি নিয়ে কথা বার্ত্তা কচ্ছিলেন। হঠাৎ ফিরে দাঁড়ালেন। দেখলাম বড় টুপিটা মাথায় কাত হয়ে পড়েছে। আমার দিকে নজর পড়্‌তেই তিনি বলে উঠ্‌লেন তোমাদের আক্কেল খানা কি বলতে। এই একটা আধমরা বুড়ো খোসকারে নিয়ে তোমরা করবে কি? ও যে হাঁটুর উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতেই পারেনা দেখ্‌ছি। শুনে আমার মনে কতকটা স্বস্তি বোধ হতে লাগ্‌ল। আমি আর ওদের কথায় কান না দিয়ে খক্ খক্ করে একটু একটু কাস্‌তে সুরু করে দিলাম। গবর্ণর সাহেব বল্লেন "তুমি বরং বাড়ী ফিরে যাও গিয়ে তোমার সর্দী কাশির একটা ব্যবস্থা কর্‌গে।" আমি দরজার দিকে পা চারেক এগিয়েছি এমন সময় মেয়ারের পেস্কার ক্রিসার বলে উঠ্‌ল "কর্ণেল সাহেব এ যে ইহুদি মোয়াস—এ এর দুই ছেলেকেই মার্কিন মুলুকে পাঠিয়ে দিয়েছে। যড়টা থাক্‌লে এতদিন

কাঁধে ভর্ত্তি হ'ত হতো।" লক্ষীছাড়া ক্রিগার ব্যাটা আমার কিসে সর্ব্বনাশ কর্‌বে তাই খুঁজে বেড়াচ্ছিল অপরাধ ওরও চাঁদনীতে পুরানো জামা কাপড়ের দোকান, আমারও তাই চাষা ভূষারা ওর দোকানে না গিয়ে আমার দোকানেই কেবল ঝোঁকে এই জন্য যে আমার উপর হাড়ে চটে ছিল। আর কিছু না পেরে শেষ কালে এই রকম করে আমার নামে লাগিয়ে দিলে! যেই লাগান অম্‌নি গবর্ণর সাহেবও চেঁচিয়ে বল্লেন ওহে! একটু দাঁড়িয়ে যাওত। বুড়া, ভারি ধূর্ত্ত তুমি না? খুব শেয়ানে বুদ্ধি যাহোক ছেলেদের ফৌজে কাজ কর্ত্তে হবে বলে মার্কিন মুলুকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। মজা তোমার হচ্ছে! ওরে কে আছিস দেতো বুড়োকে বন্দুক তরয়াল আর কার্ত্তুসের পেটিটা দেতো। ক্রিগারের উপর রেগে আমার প্রায় দম বন্ধ হবার উপক্রম হচ্ছিল। ইচ্ছা হল দুকথা শুনিয়ে দিই কিন্তু পারলাম না। দেখি বেটা টেবিলের পাশে বসে হাঁস্‌ছে আর কি লিখ্‌ছে। আমি আর কি করব। ওয়ার্ণার বলে একজন কনেষ্টবলের সঙ্গে সঙ্গে আস্তে আস্তে চলে গেলাম। পাশের একটা হলে বন্দুক কার্ত্তুস তরয়াল সব বোঝাই করে রাখা হয়েছিল সেই খানে আমায় নিয়ে গেল। ওয়ার্ণার নিজ হাতে আমার পিঠে কার্ত্তুসের পেটি আর বন্দুক ঝুলিয়ে দিয়ে বল্‌লে "মোয়াস যাও এখন কিন্তু ডাক পড়্‌লেই আসা চাই।" আমি ত সেই দঙ্গলের ভিতর দিয়ে বেড়িয়ে এলাম এত রাগ হচ্ছিল যে হতভাগা বেটারা হো হো করে হাঁস্‌ছিল তা পর্য্যন্ত ভালকরে কানে যায়নি।

বাড়ী ফিরে ভিতরে ঢুক্‌তেই মর্লের সঙ্গে দেখা হল সেও আমাকে আগিয়ে আনবার জন্য বার হয়ে আস্‌ছিল। সব শুনে তার মুখ খানা পাঙাশ পানা হয়ে গেল। তারপর চোখের পলক পর্‌তে যা দেরী সে টুকুও আর চুপ করে থাকতে পার্‌লে না বল্‌তে লাগ্‌ল ওই যে ক্রিগার দেখ্‌ছো ও আমাদের ইহুদী জাতের শত্রু। ওযে আমাদের কত ঘৃনা করে তা আমার জানা আছে। কিন্তু তোমার হাত ধরে বল্‌ছি তুমি এখন কিছু বলোনা। রাগ করেছ যে তা বুঝ্‌তেও দিওনা ঠাণ্ডা হয়ে চুপটি করে থাক। এর শোধ এরপর নেওয়া যাবে। সে সুবিধা হবেই হবে জেনো যদি তোমা হতে না হয় তা হ'লে তোমার ছেলেরা বা তাদের ছেলেরা একথা ভুলবে না। তোমার নাতিরাও অন্ততঃ মনে করে রাখ্‌বে যে তাদের ঠাকুরদাদাকে অমুক লোক এমনি করে নাকালে ফেলেছিল। এসব কথা তারা টের পাবেই পাবে।

তখন আমাকে বুঝ দেওয়ার জন্য এর থেকে আর বেশী বল্‌বার কিছুই ছিলনা; আমিও মনে মনে এই সব কথা ভাব্‌ছিলাম কিন্তু রাগটা এত বেশী হয়েছিল যে তখন যদি আধেক সম্পত্তি ঘুচিয়েও হতভাগা ব্যাটার সর্ব্বনাশ করা যেত তা হ'লে তাতেও পিছপাও হতাম না। সে তারিখে সারাদিন ধরে এমন কি রাত্রিতেও আপন মনে সেই কথাই ভেবেছি বার বার বিশবার কেবল বলেছি "বেটা খুনে ডাকাত আমিত বেরিয়েই গিয়েছিলাম—তারাতো আমাকে যেতেই বলেছিল—ওই বেটাই তো মাঝে পড়ে আমার সর্ব্বনাশটা ঘটালে।" তার পর থেকে ক্রিগওর উপর আমার এমন রাগ ছিল যে তোমাকে আর কি বল্‌বো। সে যে আমাদের পেছনে লেগে এমনি বিপদে ফেলেছিল তা আমরা স্ত্রী পুরুষে এক দিনের জন্যও ভুল্‌তে পারিনি আমাদের ছেলেপিলেরাও তা ভুল্‌বে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগুরুদাস সরকার।

বিদায় সঙ্গীত।

(পূরবী)

কোথা যাও ভাই রহ ক্ষণকাল
দর দর ঝরে আঁখি জল।
দিতে গো বিদায় হৃদি ফেটে যায়
টুটে যায় প্রাণে সব বল॥
দু'দিনের দেখা এত মাখা মাখি,
কেন এনেছিলে প্রেম ভরা আঁখি,
হৃদয় হরিয়া যদি দিবে ফাঁকি
মধুহারা করি ফুলদল।
ভারতী পূজার বিজয়া দশমী,
বাণী সুতগণ শ্রীচরণে নমি,
দাও কোলা কুলি, আঁখি জল চুমি
সারা বরষেরি সম্বল।
অতিথি সেবায় শত শত ক্রটী,
কুণ্ঠা মলিন অর্ঘ্যের মুঠি,
কণ্ঠে জড়ায়ে তাই বাহু দু'টী
ক্ষমা যাচি পায়ে অবিরল।
যুগ যুগ হ'তে যেন পরিচিত,
জন্মান্তরে হয়েছি মিলিত,,
বাণীর চরণে আছে সঞ্চিত,
শত মিলনের শুভ ফল।
মিলনের স্মৃতি বহিয়া এ মনে,
বিচ্ছেদ ব্যথা সহিব কেমনে
বাহিব দীর্ঘ শ্বাসের পবনে
ভাঙ্গা হৃদিতরী টল মল।

শ্রীকালিদাস রায়।

জীবের সার সম্পত্তি কি?

জীবের সার সম্পত্তি কি, এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা এক কথায়ই বলিব বিশ্বজয়ী মহান প্রেমই জীবের এক মাত্র সার সম্পত্তি। সত্যসত্যই মহান্ প্রেম ব্যতীত জীবের আর কোনও উত্তম সম্পত্তি নাই। থাকিতেও পারেনা। সেই ধন কিন্তু জীবের ঘরেই আছে। জীবের ঘরে থাকা আপন ধনে তাহার দৃষ্টি পতিত হউক, আপন ধন লাভের জন্য তাহার লালসা শতগুণে বৃদ্ধি পাউক, চেষ্টা যত্ন হউক। ধনীর ঘরে ধন থাকিতে দীনহীন কাঙ্গাল হইয়া চিরদিন অন্নবস্ত্রে কষ্ট পাইবে ইহা দেখিলে কাহার না দুখ হয়? কেবা ব্যথিত হৃদয়ে ধনীর সেই ধনের সংবাদ দেয়?

প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ দেব জগতে জীবের সেই মহাধন প্রেমের অপূর্ব্ব সংবাদ লইয়া আসিয়াছিলেন। ধনীর সন্তানকে দীনহীন কাঙ্গাল, অন্নবস্ত্রে ক্লিষ্ট দেখিয়া তিনি ধনের সংবাদ দিয়াছেন, তিনি এই বলিয়া জগতে জীবের ধনের সংবাদ দিয়া গিয়াছেন যে, "হে জীব, তুমিওত মহান্ প্রেমধনে ধনী। তোমার সেই মহান্ প্রেমধন তো তোমার আছেই, তবে তুমি অমন করিয়া ব্যর্থজীবন হইয়া দীনহীন হইয়া জগতে ফিরিতেছ কেন? ঐ দেখ, তোমার ধন যথেষ্ট আছে। তুমি তোমার নিজের ধন লাভ করিয়া ধনী হও, তোমার আর দুঃখ করিতে হইবে না, তোমার আর ভিখারীর ন্যায় ঘুরিতে হইবে না। আমি তোমার ধনের সংবাদ লইয়া আসিয়াছি।"

শ্রীগৌরচন্দ্রের এই সর্ব্বশুভ সংবাদ শুনিয়া যাঁহাদের ভাগ্য ভাল তাহারা, ধনী হইয়াছেন, আর যাহাদের ভাগ্য ভাল নহে তাহারা যেমন ছিল তেমনই রহিয়াছে। তাঁহারা ধন থাকিতেও কাঙ্গাল হইয়া কষ্ট ভোগ করিতেছে।

গৌরচন্দ্র কিনা জীবকে তাহার প্রেমধনের সংবাদ দিয়া গিয়াছেন। জীব যে নির্ধন নহে, জীবের ঘরেই যে অমূল্য ধন আছে সেই সংবাদ দিয়া গিয়াছেন। আমরা এমন মলিন এমন দুর্ভাগ্য যে তুচ্ছ ভোগ সুখে রত হইয়া সংসারে কেবল মারামারি কাটাকাটি করিয়া মরিতেছি; তাই বলিতেই ইচ্ছা হয় আমাদের আবার প্রেমধন কোথায়? আমরা আবার প্রেমধনের অধিকারী হইব কি? আমাদের ঘরে অমূল্য প্রেমধন থাকিলে বাহিরে আমরা এইরূপ পশুবৎ হইয়া ফিরিব কেন? কথা কেবল মিথ্যা নহে।

গৌরহরি অহেতুক কৃপাসিন্ধু, জীবে বড় করুণ তাই তিনি জানাইতেছেন, জীবে জানেনা, বা সংবাদ রাখেনা বলিয়াই অথবা জানিয়া রাখিয়াও আলস্য বশতঃ বুদ্ধির দোষে ঘরের ধন খুঁড়িয়া লয় না। তাই জীবের এত দুর্দ্দশা, এত লাঞ্ছনা। হে জীব, তুমিও প্রেপের অধিকারী, তুমি অপ্রেমিক অরসিক নও; তোমারও প্রেম আছে, তোমারও রসজ্ঞান আছে, তবে জীব তোমার প্রেমধন তুমি এইবার চিনিয়া বুঝিয়া লও, জীবনে ধন্য হইবে। আর তুমি স্বীয় সার সম্পত্তিতে বঞ্চিত রহিও না; ধন পাইলেই ত তোমার দুঃখ দূর হইবে। যদি কেহ একথা বলেন যে, প্রেম দ্বারা জীবের কিরূপ দুঃখ ঘুচিবে? দুর্ভোগ দূর হইবে? প্রেমধর্ম্মে জীবের সার সম্পত্তি বলিবার তাৎপর্য্যই বা কি? আবার বলি, জীব দুঃখ চায় না, চায় কেবল সুখ, কেবল আনন্দ। একমাত্র প্রেমই সেই সুখ, আনন্দের প্রস্রবণ। প্রেম ভিন্ন জীব সুখী হইতে পারে না।

আচ্ছা, প্রেমই যদি জীবের একমাত্র সুখের প্রস্রবণ হইল তাহা হইলে ইহাও জানা আবশ্যক যে, সেই প্রেমের দুঃখ নিবৃত্তির কি শক্তি আছে? আমরা জানি জীবের দুঃখ নিবৃত্তির শক্তির প্রেমব্যতীত আর কোন বস্তুরই নাই; একমাত্র প্রেমের সেই শক্তি আছে। চিরদিনই থাকিবে? প্রেমের সেই মহীয়সী শক্তির বলে জীবের অসাধ্য সাধন হয়; প্রেমের বিচিত্র শক্তিতে শোক যায়, দুঃখ যায়, রোগ যায়, সকল অর্থ নিবৃত্তি হয়। আর কি হয় প্রেমের বলে হৃদয়ের সকল ব্যাধিও যায়। হৃদয়ের ব্যাধি কি? ক্রোধ হিংসা দ্বেষ মদ মাৎসর্য্য এই সকল হৃদয়ের ব্যাধি। এই সমুদয়ও যায়? সকল ব্যাধিরই শান্তি হয়। প্রেমিকের হিংসা নাই দ্বেষ নাই, ক্রোধ নাই অহঙ্কার নাই, গর্ব্ব নাই, আর নাই কি? দুর্লোভ দুশ্চেষ্টা দুর্বুদ্ধি দুরভিসন্ধি প্রেমিকের নাই। কেন নাই? প্রেমে স্বভাব নাই। প্রেমের স্বভাব কি? প্রেমের স্বভাব সব পবিত্র করা। প্রেম অপবিত্রকে পবিত্র করে, অসারকে সুসার করে; মন্দকে ভাল করাই প্রেমের ধর্ম্ম বা প্রকৃতি। প্রেমে পশুর পাশব ভাব দূর হইয়া যায়। মানুষের যে পাশব বৃত্তি আছে সেগুলিও কি প্রেমে উন্নত উজ্জ্বল হয়? হাঁ মানুষের ভিতরে যে পশুভাব আছে, নিষ্ঠুরতা, স্বার্থপরতা, ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা আত্মম্ভরিতা যে কিছু নিকৃষ্ট ভাব আছে, তাহা দূর করিয়া দেয় একমাত্র প্রেমে।

আচ্ছা, পশু ভাব দূর হইলে মানুষের কি ফল? ফল মানুষ শুদ্ধ মানুষ হয়, খাঁটি মানুষ হয়। শুদ্ধ মানুষ খাঁটি মানুষ হইলে কি ফল? ফলের তুলনা নাই। মোট কথা অন্তঃকরণটী নির্ম্মল নিরাময় হয়; অন্তঃকরণ নির্ম্মল নিরাময় হইলে কি হয়? সেই নির্ম্মল নিরাময় অন্তঃকরণে আনন্দ উপস্থিত হয়। যে আনন্দের জন্য জীব এত লালায়িত, যার জন্য জলে আগুনে ঝাপ দিতেছে, সেই আনন্দ লাভ হয়। পূর্ণ আনন্দ পরিপূর্ণ ভাবে লাভ হইলেই জীবের দুঃখ গেল, শোক গেল, তাপ গেল, জ্বালা গেল, বন্ধন গেল, রোদন গেল, সব দুর্গতি গেল।

তবে আর এক কথা জিজ্ঞাসা করি? প্রেম ছাড়া কি জীবের আর কিছুতেই ঘৃণিত পশুভাব দূর হইতে পারে না? বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড উচ্চস্বরে বলিতেছে, শ্রীভগবানের প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু বলিতেছেন, আমরাও

শ্রীচৈতন্য প্রভুর চরণ ধরিয়া বলিতেছি প্রেম ব্যতীত জীবের আর সর্বোত্তম গতি নাই। জীব প্রেমরাজ্য হইতে আসিয়াছে, প্রেম হারাইয়া পথ ভুলিয়াছে, পথে পথে কাঁদিতেছে, পথের কাঁটা পায় ফুটিতেছে—আবার যখন জীবের প্রেম লাভ হইবে তখন সে চিরবাসস্থান প্রেম রাজ্যে চলিয়া যাইবে। কাজেই প্রেমই জীবের সর্বস্ব—ইহা দেখিয়াই শ্রুতি স্মৃতি বলিতেছেন—

"প্রীতি পরম সাধনম্।"

প্রীতি পরম সাধন কেন? না, জীবের চিরবন্ধু চির সুহৃদ্ চির অন্তঃরঙ্গ শ্রীভগবানের সঙ্গে প্রেমেই জীবের মিলন হইবে। কেন, প্রেমে মিলন হইবে কেন? প্রেম বস্তটী আকর্ষণাত্মক—আকর্ষণ করা প্রেমের একটী শ্রেষ্ঠধর্ম বা শক্তি। প্রেম ছাড়া আর কিছুতেই অর্থাৎ কিছু দ্বারাই শ্রীভগবানকে আকর্ষণ করা যায় না। প্রেমের আকর্ষণেই তিনি আকৃষ্ট হন।

মানিলাম প্রেমের অদ্ভুত আকর্ষণ শক্তি আছে; শ্রীভগবান সেই আকর্ষণে আকৃষ্ট হন কেন? না শ্রীভগবান প্রেমময়, সুতরাং তিনি প্রেমের আকর্ষণেই আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। জলে জল মিসে, দুধে দুধ মিসে, সেইরূপ প্রেমে প্রেমই মিসে, প্রেমকে প্রেম দ্বারাই টানিয়া আনা যায়; কাম বা অন্য কিছু দ্বারা আনা বা ধরা যায় না। শ্রীভগবান্ স্বয়ং প্রেম সুতরাং প্রেমেই তিনি ধরা দেন। আর একথাই বা বলি কেন? শ্রীভগবান সকলের গুরু; শ্রীভগবান হইতে গুরু বস্তু আর কিছু নাই; কিন্তু প্রেম বস্তটী শ্রীভগবান হইতেও গুরু। তাহা হইলে প্রেম সকলের গুরু; শ্রীভগবান জীবের পরম গুরু। সেই পরম গুরু বস্তুকে পরম গুরু বস্তু দিয়াই ধরিতে হয়। প্রেম ছাড়া শ্রীভগবান হইতে গুরু বস্তু আর কিছুই নাই; সুতরাং প্রেমই একমাত্র শ্রীভগবানকে ধরিবার বস্তু। কাজেই শাস্ত্র বলেন প্রীতি পরম সাধন; অপরদিকে শ্রীভগবান্‌কে পাইলে জীব সব পাইল। শ্রীভগবানকে না পাইলে জীবের সবই জলে গেল। শ্রীভগবান যাহার প্রাপ্তি হইল, তাহার বিদ্যা বুদ্ধি ধন মান যশ গৌরব সকলই পাওয়া হইল, কিছুই বাকী রহিল না। আমরা কিন্তু মনে মনে রাজা হই। আমরা ভাবি আমার বিদ্যা, আমার বুদ্ধি আমার ধন জন মান মর্য্যাদা সংসারের যা কিছু সবই আমার। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে তোমার আমার কিছুই নাই, সবই ঐ সর্ব্বজগতের কর্ত্তা শ্রীভগবানের। তবে যাঁহার সকল, তাঁহাকেই লাভ করিনা কেন? তাঁহাকে পাইলেইত সব পাইব। একমাত্র প্রেম দ্বারাই তাহাকে পাওয়া যায়—এই খাঁটি সংবাদ যখন পাইয়াছি, আর সেই প্রেম যখন আমাদের সকলেরই আছে তখন সেই প্রেমের উদ্দীপন করিনা কেন? প্রেমই যে আমাদের সার সম্পত্তি।

মহাপ্রভু শ্রীরামানন্দ রায়কে সাধ্যসাধনতত্ত্বের আলোচনায় জিজ্ঞাসা করিলেন—

"সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি।"

প্রভুর প্রশ্নের উদ্দেশ্য এই—জীবের ভোগের জন্য অনেক প্রকারের সম্পত্তি আছে। তন্মধ্যে ঋদ্ধি সিদ্ধি প্রভৃতি বিস্তর সম্পত্তি। এই যে জীবের ঋদ্ধি সিদ্ধি প্রভৃতি অনেক প্রকার সম্পত্তি তাহার মধ্যে কোন্ সম্পত্তি বাস্তব পক্ষে জীবের নিজস্ব।

শ্রীরামানন্দ রায় উত্তর করিলেন,—

"রাধাকৃষ্ণ প্রেম যার সেই বড় ধনী।"

ঋদ্ধি সিদ্ধি প্রভৃতি সম্পত্তি যাহার আছে, সে ধনী নহে, আর সে সমুদয় সম্পত্তি প্রকৃত পক্ষে সম্পত্তিও নহে। তবে জীবের প্রকৃত সম্পত্তি কি? না, রাধাকৃষ্ণে প্রেম। তাই প্রভুর প্রশ্নে রায় উত্তরে কহিলেন—

"রাধাকৃষ্ণে যার প্রেম সেই বড় ধনী।"

কেন, এই দুনিয়াদারীতে রাশি রাশি মণি মাণিক্য সোণা রূপা আর অষ্টসিদ্ধি প্রভৃতি এত এত বড় বড় সম্পত্তি থাকিতে রায় মহাশয় বলিলেন কিনা রাধাকৃষ্ণে প্রেমই জীবের বড় ধন। রাধাকৃষ্ণে প্রেমকে বড় ধন বলিলেন কেন? প্রেম আবার ধন কি? ও ধনে জীবের কি ক্ষুধা

বুঝা রোগ শোক অভাব অভিযোগ দূর হয়? তাহে আবার রাধাকৃষ্ণে প্রেম। রাধাইবা কে কৃষ্ণইবা কে তাঁহাদিগকে প্রেমইবা কি? আমি মলিন জীব, কামের কিঙ্কর, আমি কি প্রেম বুঝি, না রাধাকৃষ্ণ বুঝি? আমি বুঝি ধন দৌলত, আমি বুঝি অণিমা লঘিমা অষ্ট সিদ্ধি; আমি বুঝি রাজত্ব লাভ, আমি বুঝি পাণ্ডিত্য, আমি বুঝি আমি কুলীন আমি মহৎ, আমি বুঝি আমি ধনী, আমি মানী, আমি জ্ঞানী; আমি বুঝি আমি বড়, আর সকলে ছোট, আমি বুঝি আমি প্রভু আর সবেই দাস। রাধা-কৃষ্ণে প্রেম সমাধি বুঝি কি প্রেমই যে বুঝি না। আবার রাধাকৃষ্ণ, আমাদের মত মলিন জীবের সাধারণতঃ এইরূপ ধারণা। কিন্তু এইরূপ ধারণা যে জীবের ইচ্ছাকৃত তাহা বলিতেছি। যদি বলা যায় মলিন জীব ত প্রেম বোঝেনা, বোঝে কাম, আচ্ছা যাহার কামে বোধ আছে, তাহার প্রেমবোধ থাকিবে না কেন? যদি সত্য সত্যই জীবের কাম বোধ থাকিয়া থাকে। তাহাহইলে নিশ্চিতরূপেই বলা যাইতে পারে জীবের যখন কাম বোধটী আছে, তখন তাঁহার প্রেম বোধটীও আছে; প্রেমের মূলভিত্তিও ইচ্ছা, আর কামের মূল ভিত্তিও ইচ্ছা। তবে এক ইচ্ছা নির্ম্মলা আর একইচ্ছা মলিনা। এক ইচ্ছার মধ্যে নিজের ভোগ ব্যাপারটী আছে, আর এক ইচ্ছার মধ্যে পরের ভোগ ব্যাপারটী আছে। ব্যাপার একই কেবল আমার আর তোমার এই যা পার্থক্য। তবেই বলিতে পারি যাহার কাম আছে, তাহার প্রেমও আছে। আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, যাহার ইচ্ছা আছে, তাহারই কামও আছে প্রেমও আছে। ইচ্ছার দুই মূর্ত্তি বা দুই ভাব। এক প্রেম ইচ্ছা আর কাম ইচ্ছা। জীবের যখন ইচ্ছা বলিয়া একটা বস্তু আছে, তখন তাঁহার কামও আছে প্রেমও আছে। ইচ্ছা যখন নির্ম্মল হয় অর্থাৎ স্বসুখ ত্যাগ করে পর সুখ গ্রহণ করে তখনই সেই ইচ্ছা প্রেমরূপে প্রতিভাত হয়? আর ইচ্ছা যখন স্বসুখ ভোগ করে কি ভোগার্থে লালায়িত হয় তখনই কামরূপে পরিণত হয়। এক ইচ্ছাই দুইরূপে প্রকাশ পায়। এখন জিজ্ঞাসা এই মলিন জীবের স্বসুখ ত্যাগ হইবে কেন? মলিন জীবের স্বসুখ ত্যাগ হইবে না সত্য, কিন্তু যখন সে পরকে সুখী করিয়া সুখী হইবার অর্থাৎ দুই প্রকার সুখের সন্ধান পায় তখন সে তাহার একমাত্র স্বসুখ অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই তাহা অনায়াসে ত্যাগ করে। যে দুইটী মানিক্য পাইবার সন্ধান পায় সে কি আর একটী মানিক্য না লইয়া ঘরে আসে? জীবও ইহা স্পষ্ট বুঝে; কিন্তু বুঝিয়াও ইচ্ছা করিয়া এক স্বসুখ লইয়া বসিয়া আছে, পর সুখের জন্য অর্থাৎ প্রেমের জন্য প্রস্তুত হইতে পারিতেছে না। কিন্তু জীব যতই মলিন হউক না কেন সে কামও বোঝে প্রেমও বোঝে।

জীব প্রেম না বুঝিলে আনন্দ চায় কেন? আনন্দ চাহিলেই কি প্রেম বুঝিল? আনন্দ ত কামেও আছে। কামেও আনন্দ আছে সত্য কিন্তু সে আনন্দে মানবাত্মা তৃপ্ত হয় না। কামের আনন্দে কথঞ্চিৎ কাল আত্মরক্ষা হয় বটে, কিন্তু কিছুতেই আত্মবিস্তার হয় না। আত্মবিস্তার করা যে মানুষের প্রকৃতি। প্রেমে আত্মরক্ষাও যেমন হয় আত্মবিস্তারও তেমন হয়। প্রেমের দ্বারাই মানবত্ব গঠিত হয়, কামের দ্বারা হয় না। প্রেম অমৃত, কাম গরল। কামে দেহ নাশ হয়, জীবন নাশ হয় মনুষ্যত্ব নাশ হয়। প্রেমে দেহকে অক্ষয় করে, জীবনকে অক্ষয় করে; মনুষ্যত্বকে সমুজ্জল করে। প্রেমের স্বরূপ যেমন অনির্ব্বচনীয় ও অভাবনীয় প্রেমের শক্তিও তেমনি অনির্ব্বচনীয় ও অচিন্ত্য। প্রেমের স্পর্শ মাত্র হইলে অর্থাৎ রতি মাত্র হইলে মানুষের যে অপূর্ব্ব অবস্থা হয় তাহা একবার বলিয়াছি; এস্থলে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, প্রেমের স্পর্শে মানুষের পাশব বৃত্তি গুলি একেবারে দূর হইয়া যায়; তাহার ফলে অসৎ সৎ হয়, স্বার্থপর পরার্থপর হয়, নির্দ্দয় দয়াবান হয়, অভিমানী দৈন্যভাবাপন্ন হয়, রুক্ষ কোমল হইয়া যায়। কুটিলকে প্রেম সরল করে, জটিলকে সোজা করে। বহির্মুখকে

অন্তর্মুখ করে ; প্রেমের এমনই মহীয়সী শক্তি যে, কোটি জন্মের মলিন জীবাত্মার সকল ময়লা দূর করিয়া দিয়া শুদ্ধ বুদ্ধ করিয়া তোলে। আর কি করে ? আর তাহার যে চির সুন্দর চির মনোহর অপূর্ব্ব স্বরূপটী তাহা ফুটাইয়া তোলে। তখন মানবাত্মা স্বীয় ভুবন মোহিনীর রূপটী প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। তাহার নৃত্য এই জন্য যে, সে তখন স্পষ্ট বুঝিতে পারে আমি যাহা, তাহা হইয়াছি। আমার যাহা ছিল তাহাও এই সঙ্গে পাইয়াছি। হারান ধন পাইলে কার না আনন্দ হয় ? কেইবা না নৃত্য করিয়া থাকে ? কেহ নয় প্রকাশ্যে নাচে, কেহ বা নয় গোপনে নাচে ; নাচে সকলেই।

তাই বলিতেছিলাম প্রেমের এতই মহিমা। প্রেম জীবাত্মার এইরূপই শুভ সম্পদ। আচ্ছা জীবাত্মার প্রেমের উৎপন্ন হইলে আরওকি কিছু হয় ? হয়। কি হয় ? প্রেম জীবাত্মা কে—অনুচৈতন্য জীবাত্মাকে বিভু চৈতন্য শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ করায়। ভগবানের সহিত যে জীবের অনাদি সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা বুঝাইয়া দেয়। অর্থাৎ জীব যে ভগবানের সহিত নিত্যসম্বন্ধে সংবদ্ধ তাহা দেখাইয়া শুনাইয়া বুঝাইয়া দেয়।

আচ্ছা শ্রীভগবানের সহিত জীবের যে সম্বন্ধ চিরদিন ধরিয়া আছে, জীব তাহা সংসারের মোহে পড়িয়া ভুলিয়া গিয়াছিল, সেই সম্বন্ধটী প্রেম, জীবকে বিশদ করিয়া বুঝাইয়া শুনাইয়া দিল ; জীবও বুঝিয়া শুনিয়া শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিল ; যেন বুঝিলাম। তাহাতে জীবের কি লাভ হইল ? লাভ হইল, প্রেমের উদয়ে যে আনন্দ জীব পাইতেছিল, সেই প্রেমানন্দ অনন্ত কালের জন্য স্থায়ী হইল। সে আনন্দ আর ছুটিলনা, সে আনন্দের বাজার আর ভাঙ্গিবে না ; সে আনন্দের দিন আর ফুরাইবে না। সে আনন্দ আর কিছুতেই দূর হইবে না। শ্রীভগবান্ ত শান্ত জীব নহেন—তিনি অনন্ত, তাঁহার সহিত প্রেম হইলে সেই প্রেমানন্দও অনন্ত অপরিসীম হয়। আমি জীবত সসীম। অসীমে প্রেম সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে সসীম জীব আমি অসীম হইয়া যাইব। যেমন স্পর্শ মনি স্পর্শে লৌহ সোণা হইয়া যায়, তেমন অনন্ত শ্রীভগবানের সহিত স্পর্শ হইলে জীবেরও শান্তপদ ঘুচিয়া অনন্ত পদ লাভ হয়। প্রেমের গুণে অনুজীব চৈতন্য বিভু চৈতন্যে পরিণত হয়। প্রেমের এমনই অদ্বিতীয় শক্তি ; ভগবান্ হইতেও প্রেম বড়।

আচ্ছা প্রেমের তত্ত্বত এক প্রকার শুনিলাম ; এখন জানিতে চাই রাধা কৃষ্ণকে প্রেম করিব কেন ? রাধাকৃষ্ণ কি ? তাঁহাদিগকে প্রেম করিলে আমি বড় ধনী কিরূপে হইব ?

প্রেমের তত্ত্ব যদি আংশিক রূপেও বুঝিতে পারা যায় তাহা হইলে রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বও বুঝিতে কঠিন হইবে না। যদি বুঝিবার বাসনা থাকে তাহা হইলে বুঝিতে পারা যায় ; আর ইচ্ছা নাই ; একটা তর্ক উপস্থিত করিলাম, মন অন্য খানে রহিল, শোনা আবশ্যক একটু শুনিলাম, এমন হইলে রাধাকৃষ্ণ কি তাহা শত বলিলেও বুঝা যাইবে না। প্রেমের সহিত বুঝিতে হইবে।

কেন ? প্রেম দিয়া না বুঝিলে কি রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব বুঝা যায় না ; প্রেমের চক্ষু দিয়া রাধাকৃষ্ণ দেখিতে হয়, প্রেমের কাণ দিয়া রাধা কৃষ্ণ কথা শুনিতে হয় ; প্রেমে ভাবিত চিত্ত দিয়া রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব ধারণা করিতে হয়, নচেৎ উহা বুঝিয়া উঠা কঠিন।

একটা কথা এস্থলে বলিয়া যাই। প্রেম দিয়াই সকল তত্ত্ব বুঝিতে হয় ; প্রেম দিয়া না বুঝিলে কোন তত্ত্বই বুঝা যায় না, দেখা যায় না, শুনা যায় না। তোতা পাখীর মত পুথি পড়িয়া পণ্ডিত হওয়া যায় না, যে এক অক্ষর প্রেমের সহিত পড়ে সেই পণ্ডিত হয়। এই জন্য প্রেমের সহিত রাধাকৃষ্ণ কথা শুনিতে বলিতেছি।

"রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী" শ্রীরামানন্দ রায়ের এই যে কথাটি ইহা অমূল্য। শ্রীরাধা শ্রীভগবানের স্বরূপ শক্তি ; আনন্দদায়িনী শক্তি ; শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ জীবকে প্রেম ভক্তি দিতে, অর্থাৎ ভগবানকে জীবের প্রেম

ভালবাসিতে হয়, কামের দাস, বিষয় সুখময় স্থূল বুদ্ধি মূলর্থী জীবকে তাহা শিক্ষা দিবার জন্য আদর্শ নায়ক আদর্শ নায়িকার বেশে আসিয়াছেন। উভয়েই রূপে গুণে অতুলনীয় অনির্বচনীয় অচিন্তনীয় হইয়া আসিয়াছিলেন। তোমার আমার মত ঠিক ঠিক মনুষ্য মূর্ত্তি ধরিয়া মানুষের ভাব ধরিয়া শুধু মানুষ হইয়া আসিয়াছিলেন, যেন তুমি তাহাদিগের রূপেগুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে জীব যথার্থত ভালবাসিতে পার।

আমরা ত কাব্যে রসগ্রন্থে নায়ক নায়িকার প্রেমের কথা, প্রাণের কথা রূপের কথা, বিরহ মিলনের কথা, হাসি রোদনের কথা পড়িয়া রসাস্বাদন করি; আর নায়ক নায়িকার আদর্শ ছবি আমাদের স্বচ্ছ হৃদয় দর্পণে অবিকল প্রতিফলিত হইলে আমাদের আনন্দের সীমা থাকে না। আমাদিগকে সেই রস দিবার জন্যই না ইহারা আদর্শ নায়ক নায়িকা হইয়া ব্রজে আসিয়াছিলেন। প্রাকৃত নায়ক নায়িকার সুখ দুঃখের প্রসঙ্গ শুনিয়াই আমরা যখন প্রভূত রস পাই তখন তাহা হইতেও কোটি কোটি গুণে উত্তম অপ্রাকৃত নায়ক নায়িকা শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা শ্রবণ করিয়া অপার আনন্দ না পাইব কেন?

শ্রীশরৎচন্দ্র ধর।

দ্বিজ।

সামান্য পিপীলিকা হইতে আরম্ভ করিয়া অমিততেজা শার্দ্দুল সিংহ পর্য্যন্ত যত পশুই আমাদের চক্ষে পড়িতেছে সকলেরই দেখিতেছি একই দশা। সকলেই মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইল—মাতৃস্তন্য পানে ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিতকায় হইল, অবশেষে স্বাধীন ভাবে আহার বিহার করিতে লাগিল—পুত্রাদি উৎপাদন করিল, বৃদ্ধ হইল,—অবশেষে মৃত্যুর করাল গ্রাসে তাহাদের জীবন লীলার অবসান। এই জীবনের পঞ্চাঙ্ক নাটকের যবনিকা পতনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দেখিতেছি—উহাদের সারাটা জীবনই অতিবাহিত হইতেছে একই ভাবে। সেই সুখের জন্য আত্যন্তিকী লালসা—দুঃখে প্রগাঢ় বিরক্তি ও দুর্ব্বিসহ হাহাকার! সেই ক্ষুধা তৃষ্ণার পরিতৃপ্তির জন্য দিনের পর রাত, রাতের পর দিন খাটিয়া মরা, সেই পরস্পর কাড়াকাড়ি, মারামারি! সেই ইন্দ্রিয় লালসার চরম চরিতার্থতা! সেই অতি সামান্য দুঃখেই তীব্র যাতনা বোধ—অত্যুগ্র উত্তেজনা!

এক কথায় বলিতে গেলে পশুদের জীবন সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক। প্রকৃতির পরপারে আর যে কিছু থাকিতে পারে সে অনুভূতি ও সে জ্ঞান তাদের নাই। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন অতিক্রম করিয়া আপন স্বাতন্ত্র্য প্রদর্শন করিবার সামর্থ্য উহাদের ঘটে নাই। প্রকৃতিই উহাদিগকে পরিচালিত করিতেছে, প্রবৃত্তিই উহাদিগকে যথেচ্ছ পথে লইয়া যাইতেছে, ক্ষুধা তৃষ্ণা কাম ক্রোধ লোভ মোহেরই দাসখৎ উহারা লিখিয়া দিয়াছে।

এই ভাবেই যদি প্রাণী পর্য্যায়ের গতিবিধি শেষ পর্য্যন্ত চলিত, তাহা হইলে প্রকৃতির উপরে অন্য কিছুর বোধ আমাদের থাকিত না। তাহা হইলে পাপকে পাপ বলিয়াই জানিতাম না সুখে এবং আনন্দে কোনো ভেদ্ বুঝিতাম না।

কিন্তু এ রকমটা শেষ পর্য্যন্ত চলিল না, পশুর পর্য্যায় অতিক্রম করিয়া দেখি মানুষকে। মানুষও ছাগ মেষাদির মতই সমগুণবিশিষ্ট একপ্রকার প্রাণী। মানুষেরও হাত, পা, কান, জিহ্বা, ইন্দ্রিয়, সবই আছে। তাহারও ক্ষুধা তৃষ্ণা লালসার অন্ত নাই। সাময়িক উত্তেজনার ক্ষোভবিক্ষোভে তাহাকেও বিচলিত করে। কিন্তু সে এক অদ্ভুত কথা বলে—সে বলে, যে এইরূপে প্রবৃত্তির অধীনতা স্বীকার করাই তাহার ধর্ম্ম নয়।

সে বলিয়াছে যে এই আত্মাই তার পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, এবং যাহা কিছু আছে সকল হইতেই প্রিয়। সে বলিল যে এই আত্মাকেই সে পুত্রের মধ্যে দেখে, তাই পুত্রও তাহার প্রিয়। এই আত্মা যাহা অখণ্ড, যাহা অনাদি, যাহা অনন্ত। এই আত্মতত্ত্বকে যখন সে অনুভব করে, তখনই সে তার দ্বিতীয় জন্ম লাভ করে, তখনই সে দ্বিজ!

এই দ্বিতীয় জন্ম কিন্তু প্রথম জন্মকে অস্বীকার করে না কিন্তু তাহাকে সুনিয়ন্ত্রিত সুসংযত করে। সে বলেনা, যে সে দেহ মনকে অগ্রাহ্য করিয়া রূপ রস গন্ধ স্পর্শকে মায়া মোহ বলিয়া উড়াইয়া দিয়া বৈরাগ্য ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক নির্ব্বাণ সাধনায় মন দিবে। এমন কি সে বলে, যে দেহের পক্ষে আত্মা যেমন অবশ্য-দরকারী আত্মার পক্ষেও দেহ তার চেয়ে কম দরকারী নয়—সে বলে যে দেহই হচ্ছে আত্মার প্রবেশের সিংহদ্বার! সে বলে যে রূপের মধ্যেই অরূপের আবির্ভাব। তাই সে রূপকে বাদ দেয় না কিন্তু বলে "আনন্দরূপঅমৃত যদ্বিভাতি"। যাহা কিছু দেখিতেছি তার মধ্য দিয়াই আনন্দরূপ, অমৃতরূপ, সেই আত্মার প্রকাশ হইতেছে।

সে এই বলে যে দেহ এবং রূপ ইহাই চরম এবং পরম নহে, সারতম বস্তুই হচ্ছে আত্মা। সেই আত্মাকে প্রকাশ করিবে বলিয়াই দেহের প্রয়োজন! তাই সে বলে, যে দেহ সিংহদুয়ার মাত্র, গম্যস্থল নহে। দেহকেই যদি একান্ত লক্ষ্য বলিয়া বিবেচনা কর, তবেই তাহাকেই বলি "মোহ"। রূপই যদি তোমার চোখে একান্ত ঠেকে, তবেই সেখানেই তোমার লালসা। দেহের মধ্যে অদেহী সেই পরমাত্মাকে যদি উপলব্ধি না করিতে পার, যদি দেহের খোসাটাকে লইয়াই লুব্ধভাবে ভোগ করিতে থাক, তবে তাহাকেই বলিব "কাম"! আর যদি দেহের মধ্যে দেহাতীত আনন্দের অনুভব জন্মে তবে তাহাকেই বলিব "প্রেম"। কাম কেবল দেহকে, কেবল রূপকে লইয়াই কাঁদে আর প্রেম রূপকে দেহকে যে বর্জ্জন করে তা নয়, তবে তাহার সমস্ত মিথ্যা ও তুচ্ছতা অপসারিত করিয়া তাহাকে সত্য করিয়া তোলে। প্রেম রূপের মধ্যেই দেহেরমধ্যেই, সেই অরূপ ব্রহ্মের মূর্ত্তিমান্ প্রকাশকে গভীরতর ভাবে অনুভব করিয়া তৃপ্তি লাভ করে।

ধর্ম্ম মানেই হচ্ছে অন্তরতম স্বভাব। সে বলিল যে তার বাহিরের স্বভাব যাহাই হৌক্ না কেন, তার অন্তরতর একটী স্বভাব আছে যাহা ক্ষুধা তৃষ্ণায় বিচলিত হয় না, যাহা লালসায় বিমুগ্ধ হয় না—সে বলিল, যে দেহ মন লইয়াই সে সম্পূর্ণ নহে—তাহার ভিতরে আর একটী পূর্ণতম সত্তা আছে যাহা অজর, অমর, যাহা শত দুঃখেও টলেনা, শত মৃত্যুতেও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না, শত ক্ষতিতেও যাহা অক্ষয়। যাহার বার্দ্ধক্য নাই—যাহা চির যৌবন—চির নবীন! মানুষেরই সর্ব্বপ্রথম এই বোধ জন্মিল যে সে দ্বিজ! অর্থাৎ তার দুইটী জন্ম হইয়াছে একটা প্রাকৃতিক, অপরটী আধ্যাত্মিক। এই প্রাকৃতিক জন্ম লইয়াই যখন আমরা তৃপ্ত থাকি, তখনই জড় সুখের সন্ধানে আমরা ফিরি—তখনই ক্ষুধা তৃষ্ণা এত প্রবল হইয়া উঠে, যে তাহা আকাশের সূর্য্যতারাকে পরিম্লান করিয়া দিয়া, স্বর্গের দিব্য জ্যোতিকে ভস্মাবলিপ্ত করিয়া দিয়া আপনাকেই অত্যন্ত উগ্র করিয়া তোলে। তখনই বর্ত্তমান আমাদের কাছে এত বাস্তব হইয়া উঠে, যে ভবিষ্যতকে আমরা বর্ত্তমানের ঝোঁকের মাথায় অস্বীকার করিয়া বসি।

এই প্রাকৃতিক জন্মই হচ্ছে মানুষের স্বার্থসাধনের দিক্, মানুষের প্রয়োজনের দিক্। এই জন্মে মানুষ তাহার প্রয়োজনের কাছে আপনাকে বিকাইয়া দেয়—তখনই তার "চাই চাই" এর আর অন্ত নাই—যতই পাওয়া যায় ততই প্রার্থনার খুব উচ্চ হইতে উচ্চতর সপ্তকে চড়িয়া আনন্দের সুরকে নিতান্ত বেসুরো করিয়া দেয়। তখনই সে বলে, আমার ধন চাই, মান চাই, খ্যাতি চাই, প্রতিপত্তি চাই, রূপ চাই, গুণ চাই, বৈভব চাই। তখনই

ধনং দেহি, সুখং দেহি, যশো দেহি।

তখন মানুষ মাত্রই "দেহী" কিনা তাই "দেহি" র অন্ত নাই। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যেখানে যা কিছু আছে সবই সে তার ক্ষুধিত জঠরে পুরিয়া নিঃশেষিত করিতে চাহে। তখনি সে বলে যে অমুকটা আমার নিতান্ত প্রয়োজন; অমুকটা না হইলে আমার চলেই না। কিন্তু মানুষ তৎ-সত্ত্বেও ইহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, যে এই প্রাকৃতিক জন্মই তাহার চরম নহে—তার আপনি বলিয়া একটা জিনিষ আছে, সেটা রূপ রস গন্ধ স্পর্শের চেয়ে কম বাস্তব নহে—সে আপনি বস্তুটাই হচ্চে তার অন্তরতম আত্মা। মানুষ ইহাও বলিয়াছে এই আত্মাই সব চেয়ে তার প্রিয় বস্তু।

মানুষের যখন এইরূপ দ্বিতীয় জন্ম পরিগ্রহণ হয়, তখন তার ইচ্ছাকে সে নির্ম্মূল করেনা, নিয়ন্ত্রিত করে। সে তার সঙ্কীর্ণ স্বতন্ত্র ইচ্ছাকে সংযত করিয়া বিশ্বের পরমা ইচ্ছার সহিত সম্মিলিত করে। কেননা বিশ্ব ইচ্ছার সহিত পূর্ণ সামঞ্জস্যই হচ্ছে কল্যাণের সেতু! মানুষের এই যে ইচ্ছা ইহা যতদিন না বিশ্বের সহিত ঐক্য প্রাপ্ত হইবে, ততদিনই মানুষের প্রাকৃতিক জীবন। ততদিন সে দ্বিজপদবাচ্য নহে। ততদিন অন্তহীন তৃষ্ণার মরীচিকায়, পরিণামহীন চেষ্টার আক্ষেপে, শুষ্কতায়, [illegible] সে পদে পদে মরিতে থাকে। আর যখন সে [illegible] সংবৃত করিয়া পরমইচ্ছার সহিত যুক্ত করে, তখন তাহার জীবন আর প্রাকৃতিক নহে। তখনই সে স্বাধীন। তখনই সে আপন অন্তরতম, মহীয়ান্ [illegible]কে প্রাপ্ত করে। তখন তাহার আত্মার আর গোপন [illegible] থাকেনা। সমস্ত অবসাদের জড়ভার বিদীর্ণ করিয়া তাহার আনন্দউৎস উৎসারিত হইয়া যায়, [illegible] ধারায়। তখন এই যে তাহার জন্ম, তাহা [illegible] লোকের, অধ্যাত্ম লোকের; তখনই সে দ্বিজ।

এইরূপে মানুষের দ্বিতীয় জন্ম, তাহার সমস্ত ক্ষুধা-[illegible] সংযত করিয়া মানুষ পরম প্রাণের ইচ্ছার সহিত যুক্ত করে। তখন তাহার আহার ক্ষুধাতুষ্টির জন্য নহে। ক্ষুধানিবৃত্তির অত্যুগ্র প্রয়োজনকে শান্ত করিয়া সে স্বাস্থ্য লাভের জন্য অন্ন গ্রহণ করিয়া থাকে। তাহার লালসা তখন স্বাস্থ্য-ইচ্ছায় পরিণত হয়। তাই সে তখন স্বাস্থ্যকে খর্ব্ব ও অবসন্ন করিয়া কৃত্রিম উপায়ে ক্ষুধাকে উত্তেজিত করে না। ভোজন সুখের লালসায় তাহার আর উত্তেজক বটীকা সেবন করিতে হয় না। এই যে স্বাস্থ্যের ইচ্ছা, প্রাণের ইচ্ছা—এই ইচ্ছা ক্ষুধাকে যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রিত করে। তেমনি পরম প্রেমের ইচ্ছা কামকে সংযত করে। ক্ষুধার দ্বারা যেরূপ আমাদের শরীর প্রাণ বা স্বাস্থ্য ক্ষুন্ন হইতে থাকে কাম সেরূপ আমাদের মানস—স্বাস্থ্য বা প্রেমকে খর্ব্ব করিয়া দেয়। তখনই মানুষের স্বাতন্ত্র্য উদ্দাম আন্দোলনে বিশ্বের বক্ষ ব্যথিত করিতে থাকে। মানুষের অহঙ্কার অত্যুদ্ধত হইয়া বিশ্বাকাশে অভ্রভেদী হইয়া উঠে। মানুষের কাম ও লোভ এইরূপে যখন একান্ত প্রতাপান্বিত হইয়া উঠে তখনই তাহার অন্তরতম আত্মার নিদারুণ হাহাকার। তখনই তার জন্ম—প্রাকৃতিক—অধ্যাত্মলোকে তাহার বিকাশ শত কৃত্রিমতায় পরিবেষ্টিত, শত শৃঙ্খলে অবরুদ্ধ, শত মোহে আবিষ্ট।

এই প্রাকৃতিক জীবন হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া আধ্যাত্মিকলোকের জন্মগ্রহণ করিবার জন্য মানুষের কতই না কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। পশুরা এই দুঃখদারুণ সাধনাকে এড়াইয়া চলিতে চায় কিন্তু মানুষ নাকি বুঝিয়াছে যে, প্রাকৃতিক জন্মই তাহার চরম নহে। তাহার জীবনের পরম সার্থকতাই দ্বিতীয় জন্মে, কেননা সে স্বভাবতঃই দ্বিজ তাই সে এই অধ্যাত্মজীবন লাভের জন্য স্বীয় প্রবৃত্তিকে পীড়িত করিতে কুণ্ঠিত হয় না।

স্বতন্ত্র ইচ্ছাকে বিশ্ব-ইচ্ছার সহিত সংযুক্ত না করিলে তাহা কিরূপে উদ্ধত স্পর্দ্ধার সহিত দুর্দ্দমণীয় হইয়া উঠে, সে, কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে—বস্তুতঃ তখন প্রকৃতি আমাদিগের অধীনতা পাশ কাটাইয়া উঠিয়া

আমাদিগকেই অধীন ভৃত্যের মত পরিচালিত করে। তখনই আত্মার স্বাধীন স্বভাব দাসত্বের নিবিড় নিগড়ে আবদ্ধ হইয়া পড়ে।

সেইজন্যই প্রকৃতিকে বিশ্বপ্রবৃত্তির সঙ্গে একসূত্রে বাঁধিয়া দিয়া তাহাকে আত্মবশে আনাই হচ্ছে মানুষের গোড়াকার সাধনা। শাস্ত্রে আছে সর্ব্বংপরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং। যতদিন আমরা বাহিরের স্তুতিনিন্দা প্রলোভন এবং আমাদের এই প্রকৃতির অধীনতা স্বীকার করিব ততদিন আমরা পরবশীকৃত তখনই আমরা আমাদের আত্মগত স্বভাব হইতে বিচ্যুত স্খলিত—কিন্তু যখন সমস্তকেই আত্মার বশে আনিতে পারিব, তখনই আমরা স্বাধীন। বস্তুতঃ ইহার স্বাতন্ত্র্যকে অত্যুগ্র করিয়া তোলাকেই যাহারা স্বাধীনতা বলিয়া থাকে, তারাই ভ্রমের অন্ধ মায়াজালে বিজড়িত হয়। সেটাই হচ্ছে আত্মার সবচেয়ে বড় পরাধীনতা। যে ইচ্ছা আত্মার দাসত্ব করিবে বলিয়াই সৃষ্ট হইয়াছে; সেই যদি আত্মার উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে; তবে তারচেয়ে অবমাননাকর পরাধীনতা আর কাহাকে বলিব?

সেইজন্যই ইচ্ছাকে সম্পূর্ণ স্ববশে আনাই মানুষের প্রথম লক্ষ্য; ইচ্ছা যদি আত্মবশীকৃত ও বিশ্বইচ্ছার সহিত সম্মিলিত না হয়, তবে কর্ম্মক্ষেত্রে সেই ইচ্ছায় স্বাতন্ত্র্য সংযমের বাঁধন মানে না—সমস্তকে অতিক্রম করিয়া সে আপন ঔদ্ধত্যকে প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হয় না। সেইজন্যেই ইচ্ছাকে যথাযথ পরিচালিত করিয়া বিচিত্র বিশ্বকর্ম্মে আত্মপ্রকাশ করিবার পূর্ব্বে ইচ্ছাকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করিবার সাধনা করিতে হয়! তাহাই দ্বিজত্ব-লাভের প্রথম সোপান। ইচ্ছাকে ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা স্ববশে আনিতে পারিলে, পরে সংযমের সহিত তাহাকে বিশ্ববৈচিত্র্যের অভিমুখে পরিচালিত করিলে সে স্বাতন্ত্র্য বিশ্ববিদ্রোহের অত্যুদ্ধত ধ্বজা স্বরূপ না হইয়া বিশ্ব ইচ্ছারই অনুকূল হয়। তাহা বিশ্বের সকল অহৈতুক আনন্দলীলারই অন্তর্ভুক্ত হইয়া দাঁড়ায়। সে স্বাতন্ত্র্য বিশ্বের সহিত মিলনে ধ্বংস না করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ-ভাবে প্রকাশ করে! তখনই অন্তর ও বাহির, আত্মা ও প্রকৃতি, উভয় উভয়ের সহিত গভীরতর সামঞ্জস্য দ্বিজত্বের পরিপূর্ণ প্রকাশে লীলায়িত হইয়া উঠে।

কিন্তু অসংযত স্বাতন্ত্র্য প্রকৃতিকেই উৎকট করিয়া তুলিয়া আনন্দলেসহীন একটী কৃত্রিম জগৎ নির্ম্মাণ করিয়া বসে এবং তাহারি ভোগে আপনাকে নিঃশেষিত করিয়া ফুঁকিয়া দিতে চাহে। তখনই অংশ সমগ্রের বিরুদ্ধে, খণ্ড অখণ্ডের বিরুদ্ধে, দেহ আত্মার বিরুদ্ধে দারুণ বিদ্রোহের দামামা ধ্বনিত করিয়া আকাশ, পাতাল, কম্পান্বিত করিতে থাকে।

আত্মার পক্ষে ইহাই একটী অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর morbid অবস্থা। ইহার কবল থেকে পরিত্রান লাভ করিতে হইলে গোড়ায় স্বাতন্ত্র্যলেশহীন সংযম সাধনা প্রয়োজনীয়। সেই সংযম-ব্রত সাধনা-কালে মানুষ যে জীবন যাপন করে, তাহ'কে ব্রহ্মচর্য্য জীবন বলে। এই জীবন বিশ্বমানবের সহিত বিচিত্র সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া বিচিত্র ভাবে আত্মোৎসর্জ্জনের জীবন নহে; এই জীবন নিয়ন্ত্রিত স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা বিচিত্র বিশ্বকর্ম্মে আত্মার নিগূঢ় উপলব্ধির জীবন নহে। ইহা বিশ্ব-মানব সম্বন্ধ হইতে দূরে কেবল বিশ্বপ্রকৃতির উন্মুক্ত উদার ক্রোড়ে জীবনকে গড়িয়া তুলিবার সময়। এই সময় মানব কৌমার্য্য অবলম্বন করিয়া থাকে। প্রবৃত্তি যখন সুসংযত বশে আসে নাই, তখন বিবাহ করিলে সেই দাম্পত্যজীবন অসংযত ইচ্ছারই লীলা ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়ায়—তাহাতে সেই কল্যাণময় শান্তসুন্দর শ্রীটি থাকে না যাহা লোকস্থিতির মূল। তাহা উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির উদাম আন্দোলনে নিজের মধ্যেই ঘুর্ পাক্ খাইয়া মরে। তখন যে প্রেম জন্মে তাহা অতি পঙ্কিল, কলুষিত প্রেম। তাহা সম্মুখের অনন্ত উন্নতির দিকে চলেনা—নিশ্চল অবস্থায় একই স্থানে সারাটা জীবন চঞ্চল তরঙ্গ দোলায় দোলাইতে থাকে। মানুষের ইচ্ছা যখন গতিহীন

স্রোতহীন হইয়া একটা ঘূর্ণ আবর্ত্ত সৃষ্টি করে, তখন মানবাত্মার সমস্ত লাবণ্য সমস্ত নবীনতা, সমস্ত সরস সতেজ যৌবন—অকালবার্দ্ধক্যের আবরণে আবৃত হয়। সমস্ত আনন্দ অবিকশিত অবস্থায় রহিয়া যায়। প্রেমের অন্তরালেই খণ্ড পুষ্প হইয়া উঠে—কাম তাহাকে বাহিরে আসিতে দেয় না। কিছুদিন পর্য্যন্ত এইরূপে কামের আধিপত্য চলে—অবশেষে একদিন দারুণ দুঃখের অন্তরাঘাতে তাহাকে সম্পূর্ণ নিরস্ত হইতেই হয়। যতদিন তাহা না হয়, ততদিন মানুষ সম্পূর্ণ কৃপাপাত্র হইয়া দাঁড়ায়, যে তাহার একটা অত্যন্ত রুগ্ন (morbid) অবস্থা।

ইচ্ছাকে বিশ্ব-ইচ্ছার সহিত এক করিবার পূর্ব্বে যে অকাল বিবাহ হয়, তাহাতে স্ত্রী পুরুষ সকলেরই মৃত্যুর দিক পথকেই প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হয়; এবং তাহাকেই যাহারা ধর্ম্ম বলিয়া মানে—তাহারাই বিশ্বের যথার্থ অরি। কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেরই প্রথমতঃ ইচ্ছার ভারে-সম্পূর্ণ স্বাধীন হইবার জন্যই সাধনা করিতে হয়। নহিলে—তাহাদের যে মিলন, তাহা দানব তাহা বীভৎস তাহা বিশ্বের অমোঘ নিয়মকে মুহূর্ত্তে ছিন্ন করিয়া আপন হিংস্রসত্তাকে নির্ম্মমভাবে জাহির করে। এই স্বেচ্ছাচার আস্ফালনকে যাহারা প্রশ্রয় দিতে পারে, [illegible] দিবার বেলায় তাহাদেরই কণ্ঠস্বর এত [illegible] কেন বলিতে পারি না!

আসল কথাটা এই যে লোকসমাজে আপন মর্য্যাদা বজায় রাখিয়া কপটতার অবগুণ্ঠনে আপন চরিত্রকে আবৃত করাটাকেই সমাজের উন্নতি পথ যাহারা মনে করে, তাহারা সমাজের দিকেই তাকায়, সমাজের অন্তর্বর্ত্তী মানব-ধর্ম্মের বিকাশকে তারা উপেক্ষা করে। ঐই বাহিরের খোলসটাকে চক্ চকে ঝক্ ঝকে করিয়া রাখিয়া ভিতরের কীটটাকে পোষণ করিতে তারা অকুণ্ঠিত। বস্তুতঃ প্রকাশ্য চরিত্র হীনতার চেয়েও গুপ্ত ব্যভিচার এক হিসাবে আরো সর্ব্বনেশে। ইহাতে লোকের কাছে আপন সাধুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার মনোবৃত্তি পাকা করিয়া তলে তলে গভীর পাপের পঙ্কে আপনাকে নিমজ্জিতই করা হয়।

বস্তুতঃ ধর্ম্মের সংরক্ষণই যদি সমাজের উদ্দেশ্য হয়, তবে বাল্যবিবাহ কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলের পক্ষে সমান দূষণীয়। যদি বল স্ত্রীলোকেরা দুর্ব্বল—তাহারা আপন চরিত্র রক্ষা করিতে পারেনা। তার উত্তরে বলি,—যে-সমাজ সর্ব্বদাই তাহাদিগকে জানাইতেছে যে—তাহারা দুর্ব্বল তাহারা ভীরু, স্খলনই তাহাদের স্বভাব, সে সমাজের কর্তৃত্ব হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিবার পূর্ব্বে তাহারা চরিত্র রক্ষা করিতে পারিবেও না। বস্তুতঃ মানুষের যে মহিমা স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে বিরাজমান তাহাকে যারা অস্বীকার করে, সেই সমস্ত নাস্তিক ও আত্ম-অবিশ্বাসী মূঢ়েরা মানুষের মনুষ্যত্বকে চির-নির্ব্বাসিত করিবেই।

কিন্তু তর্ক থাক্; আসল কথাই এই যে দাম্পত্য জীবনের পবিত্রতা, শীলতা, শুচিতা যদি রক্ষা করিতে চাও, যদি একএকটী মানব দম্পতীকে বিশ্ব-কল্যাণের এক একটী স্তম্ভ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাও, যদি স্ত্রী-পুরুষ সকলের দ্বিজত্বকে বিকশিত করিয়া আত্মার গৌরবকে অভ্রভেদী করিয়া তুলিতে চাও, তবে অকাল-বিবাহ তাকে শুধু বাধা দিয়াই নিরস্ত থাকিবে না, তাকে সমূলে ধ্বংস করিয়া একমহালয়ের—আয়োজন করিবেই করিবে।

সেইজন্যেই জীবনের প্রভাতকালে ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা ইচ্ছাকে আত্মবশে আনিবার সাধনা করিতে হয়!

এই ব্রহ্মচর্য্যের সাধনা বিশ্বপ্রকৃতির উদার শ্যামল কোলে সুনীল আকাশতলে অশেষ শ্রীসম্পদে বিভূষিত হইয়া অপরূপ গরিমার দীপ্তি লাভ করে। এই সময় দ্বিজ বালক বালিকাগণ পরস্পর নিরাবিল স্নেহ সূত্রে আবদ্ধ হইয়া গুরুর নিকট হইতে জ্ঞান লাভ করিতে থাকে। সে জ্ঞান উপার্জ্জনের বস্তু নহে উপলব্ধির বস্তু। সে জ্ঞান তৈলাধার কি পাত্র, কিম্বা পাত্রাধার কি তৈল
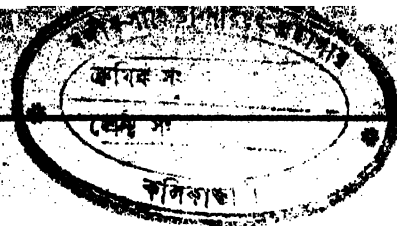
এক লইয়া বৃথা বাগবিতর্ক করে না; সেই জ্ঞান মানব জীবনের অর্ন্তনিহিত তত্ত্বের সম্যক উপলব্ধি। সেই জ্ঞানে মানুষকে চিন্তার একই অচল খোঁটায় আবদ্ধ করিয়ারাখে না—নব নব প্রণালী নব নব নিয়ম নব নব মত আবিষ্কৃত করিতে উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান করা হয়। সেই জ্ঞানের একদিকে শিশুর ন্যায় সরল বিশ্বাস, অপরদিকে অপ্রমত্ত যুক্তিবিচার! একদিকে স্থিতি অপরদিকে গতি। সেই জ্ঞানে মানুষকে অহংকৃত করিয়া তোলে না, তাকে তৃণাদপি সুনীচ করিয়া দেয়; সে বিনয়ী হয়, অবনত হয়।

একদিকে বুদ্ধির দ্বারা জ্ঞান অপরদিকে হৃদয়ের দ্বারা সত্যের বাধাহীন উপলব্ধির জীবন এই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে। সংসারক্ষেত্রে কত দুঃখ, কত বিপদ, কত ঝঞ্ঝা, কিন্তু এই জীবনে সেই আঘাত প্রতিঘাতের ক্ষোভ তাহার জন্য নয়। এখানে সে কেবল উপলব্ধি করে তাঁহাকেই যিনি সত্যং, তাঁহাকেই যিনি শান্তম্। তখন তাহার চিত্ত এত বীর্য্যশালী হয় নাই, যে সে দুঃখের ক্ষোভকে অক্ষুব্ধহৃদয়ে বরণ করিতে পারে, সেজন্যই তার তখনকার প্রধান আশ্রয়, সেই শান্তরসাস্পদ্ আশ্রম যেখানে কোনও প্রকার সাংসারিক ক্লেশ, ক্ষতি, বিপদ্, মৃত্যু সেই বালক হৃদয়কে বিচলিত করিতে পারে না! শুধু তাই নয়, লোক বহুল সহরে, যেখানে সাময়িক ক্ষোভ বিক্ষোভে জনসংঘ উন্মত্তবৎ পাক্ খাইয়া ফিরিতেছে, যেখানে, তুচ্ছ অহংকারের কলকোলাহল আকাশের সুগম্ভীর মৌন ও ধরণীর পরিব্যাপ্ত শান্তি ভঙ্গ করিয়া দিতেছে, সেখানকার উগ্র উত্তেজনা ব্রহ্মচারিদিগের কাছ হইতে যত দূরে থাকে ততই তাহাদের মঙ্গল—কেননা প্রকৃতির ক্রীড়াভূমি সম্মুখে দেখিলেই, অন্যের নকল করিয়া চলিতে যে একটা ইচ্ছার আকর্ষণ জন্মে, তাহাকে কাটাইয়া উঠিবার সামর্থ্য তাদের নাই।

ক্রমশঃ

শ্রী—

শিশু।

ক্ষুদ্র ওরে, অতি ক্ষুদ্র একখানি প্রাণ
কতটুকু প্রেম ধরে তায়,
তবু তুই কি গৌরবে প্রতিদানে তার
বেঁধেছিস্ সমগ্র হিয়ায়।
ওরে শিশু, ওরে মোর দুরন্ত বালক,
এত গর্ব্ব কিসে হল তোর,
ওই টুকু ক্ষুদ্র বুকে কি শকতি লয়ে
প্রাণ মন করিলি বিভোর।
গভীর দর্শনশাস্ত্র, সমস্যা জটীল
সমাধান কিসে হয় তার,
তুই আসি যদি ক্ষুদ্র মুখে হাসি ভরি;
মধুরে ডাকিস্ একবার।
সমগ্র বিপুল বিশ্ব, কর্ত্তব্য সাধন,—
ক্ষণ তরে সব স্তব্ধ করি,
দুইটী বাহুর মাঝে সারা প্রাণ আনি
শুধু তোরে বক্ষে চেপে ধরি।
জগতের যত কিছু সৌন্দর্য্য গরিমা
মুখে তোর বাঁধিয়াছে বাসা,
অনন্ত আকুল বিশ্ব নিরাশা কাতর
ওই চোকে পাইতেছে আশা।
তোদের হাসিতে ফুটে স্বর্গের আভাস,
কণ্ঠে বাজে আশ্বাসের গান
জগতের প্রাণ তোরা দুরন্ত মধুর
"বিধাতার আনন্দ কল্যাণ।"
এসেছিস্ কাছে যদি আয় তবে বুকে
মুখে আঁকি চুম্বন মাধুরী,
আয়রে দুরন্ত মোর অনিন্দ্য সুন্দর,
আয় তোরে বক্ষে চেপে ধরি।

কর্ত্তব্য ভাসিয়া গেছে ক্ষতি তাঁহে নাই,
তুই থাক্ তাই মোর সাধ,
ওরে মোর ক্ষুদ্র শিশু আনন্দ দুলাল
আয় তোরে করি আশীর্ব্বাদ।

চৌধুরী শ্রীহরিকৃপা দেব বর্ম্মা।

সাহিত্য সংবাদ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—

পদক ও পুরস্কার।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সপ্তবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য নিম্নোক্ত পদক ও পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।

পদক — প্রবন্ধের বিষয়

১। হরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী সুবর্ণ পদক—বঙ্গীয় নাট্য-সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান।

২। ঠাকুরদাস দত্ত সুবর্ণ-পদক—বঙ্গের পাঁচালী ও সমসাময়িক কাব্য ও নাট্যসাহিত্যে কবি ঠাকুরদাস দত্তের প্রভাব।

৩। ব্যোমকেশ মুস্তফী সুবর্ণ-পদক (ক)—বৈষ্ণব-সাহিত্যে সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ।

৪। ব্যোমকেশ মুস্তফী সুবর্ণ-পদক (খ)—২৪ পরগণা ও কলিকাতার জলযান ও তৎসংক্রান্ত প্রচলিত শব্দ ও তাহার সুনির্দ্দিষ্ট অর্থ ও প্রয়োগ।

৫। হেমচন্দ্র সুবর্ণ-পদক—মেঘনাদবধ কাব্যের রাবণ ও বৃত্রসংহার কাব্যের বৃত্রাসুরের তুলনায় সমালোচনা।

৬। শশিপদরৌপ্য-পদক—বঙ্গদেশে সামাজিক সংস্কারের প্রয়োজন।

৭। রামগোপালরৌপ্য-পদক—কবি অক্ষয় কুমার বড়াল মহাশয়ের 'এষা' কাব্য সমালোচনা।

৮। অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্য-পদক (ক)—বাঙ্গলার গীতি-কাব্যে কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের স্থান।

৯। অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্য-পদক(খ)—অক্ষয়কুমার বড়ালের কাব্যে নারী-চিত্র।

১০। নবীনচন্দ্র সেন রৌপ্য-পদক—নবীনচন্দ্রের কাব্যে, 'শৈলজা' চরিত্র।

১১। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী-স্মৃতি পুরস্কার (১০০৲)—শতপথ, গোপথ, ঐ তরেয় ও তাণ্ড্য ব্রাহ্মণের আখ্যান ও উপাখ্যানভাগ।

১২। শিশিরকুমার ঘোষ পুরস্কার (২৫৲)—নরোত্তম ঠাকুরের জীবনী।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—

প্রবন্ধগুলিতে গবেষণা ও বিচারশক্তির পরিচয় থাকা আবশ্যক। ৩য় বিষয় পরিষদের সদস্যগণের জন্য, ৪র্থ বিষয় পরিষদের সাধারণ ও ছাত্রসভ্যগণের জন্য, ৫ম বিষয় স্কুলকলেজের ছাত্রগণের জন্য এবং ৯ম ও ১০ম বিষয় মহিলাগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট। অন্যান্য বিষয়ে সর্ব্বসাধারণে প্রবন্ধ লিখিতে পারেন। পুরস্কার প্রবন্ধ ৩১এ চৈত্র মধ্যে পরিষৎ সম্পাদকের নিকট নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। পরিষদের নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষকগণ কর্ত্তৃক পুরস্কারের উপযুক্ত বিবেচিত না হইলে কেহই কোন পদক বা পুরস্কার পাইবেন না।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির
২৪৩।১ আপার সার্কুলার
রোড, কলিকাতা
} শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক
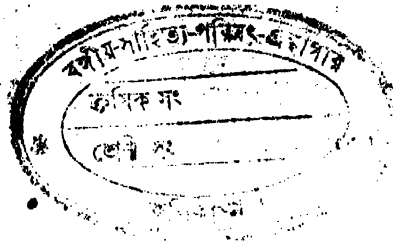
প্রতিভা

১০ম বর্ষ | পৌষ ১৩২৭ | ৯ম সংখ্যা।

"দেবীচৌধুরাণী" ও "সীতারাম"।

আনন্দমঠ * দেবীচৌধুরাণী ও সীতারাম এই তিনখানি গ্রন্থের প্রত্যেকটিই একএকটা অতি সঙ্কীর্ণ ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর রচিত হইয়াছে। আনন্দমঠে বঙ্কিমের বলীয়সী কল্পনা ঐতিহাসিক ভিত্তির দুর্ব্বলতাকে তুচ্ছ করিয়া কতদূর উর্দ্ধে স্বীয় মস্তক উন্নীত করিয়াছে তাহা ঐ গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রদত্ত ইংরাজী অংশটুকু পাঠ করিলে সকলেরই বোধগম্য হইতে পারে। দেবীচৌধুরাণী ও সীতারামে বঙ্কিম ঐরূপ কোনও প্রমাণ উদ্ধৃত করেন নাই, হাণ্টার, ওয়েষ্টম্যাণ্ড ও ষ্টুয়ার্ট ইত্যাদির উপর বরাত দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থগুলি সর্ব্বত্র সুলভ নহে বলিয়া পাঠকের কুতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য ঐ দুই আখ্যায়িকার ঐতিহাসিক ভিত্তিটুকু প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইতেছে।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে রঙ্গপুরের কালেক্টর গ্লেজিয়ার সাহেব (Mr. Glazier) ঐ জিলার যে বিবরণ প্রকাশ করেন তাহাতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে রঙ্গপুরে ডাকাইতের উৎপাতাধিক্য উল্লেখ করিয়া তিনি বলিতেছেন, রঙ্গপুর ও দিনাজপুর সহরের দক্ষিণ ও বর্ত্তমান বগুড়া জেলার পশ্চিম এবং গঙ্গার (পদ্মার) সন্নিহিত অঞ্চলটাতেই ডাকাইতদিগের আড্ডা ছিল। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে লেফ্‌-টেনাণ্ট ব্রেণান এই অঞ্চলের ভবানী পাঠক নামক এক বিখ্যাত দস্যুকে দমন করিবার জন্য প্রেরিত হন। তিনি ২৪ জন সিপাহীসহ একজন দেশীয় কর্ম্মচারীকে ডাকাত অনুসন্ধান করিতে পাঠান। এই লোকটি ভবানী পাঠককে ৬০ জন অনুচর সহ নৌকার মধ্যে হঠাৎ আক্রমণ করেন। এই লড়াইয়ে ভবানী পাঠক স্বয়ং ও তাহার তিনজন সহযোগী নিহত হয়, তদ্ভিন্ন আট জন

* আনন্দ মঠের আলোচনা স্বতন্ত্র ভাবে করা হইয়াছে। প্রবন্ধ লেখক।

ডাকাত আহত ও বিয়াল্লিশ জন বন্দী হয়। ভবানী পাঠকের বাড়ী বাজপুরে ছিল। মজনু শা নামক অন্য একজন বিখ্যাত ডাকাতের সহিত ভবানী পাঠকের যোগ ছিল।* এই লোকটা গঙ্গার দক্ষিণ হইতে আসিয়া বৎসর বৎসর লুটপাট করিত। লেফটেনাণ্ট ব্রেনানের বিবরণী হইতে একজন স্ত্রীলোক ডাকাতের সম্বন্ধেও কিছু খবর পাওয়া যায়। ইহার নাম দেবীচৌধুরাণী। ইহারও ভবানী পাঠকের সহিত যোগ ছিল। দেবীচৌধুরাণী নৌকাতেই থাকিত। তাহার বহু বেতনভোগী বরকন্দাজ ছিল। দেবীচৌধুরাণী নিজে ত ডাকাতী করিতই, ভবানী পাঠকের লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির ভাগও পাইত। 'চৌধুরাণী' উপাধি হইতে মনে হয় দেবীচৌধুরাণী হয়ত জমীদার ছিল; তবে সম্ভবতঃ তাঁহার জমীদারী বৃহৎ ছিল না, কেননা তাহা হইলে ধরা পড়ার ভয়ে সে নৌকাতে নৌকাতে থাকিবে কেন? এই সময়ে প্রধান প্রধান জমীদারেরা সকলেই লুঠতরাজের উদ্দেশ্যে বরকন্দাজ রাখিত। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে কতকগুলি ডাকাত সমবেত হইয়াছিল। এই জঙ্গলের পথ ডাকাতগণ ছাড়া অন্যে জানিত না। কালেক্টর দুইশত বরকন্দাজ নিয়া এই জঙ্গলে প্রবেশের পথ সব আটকাইয়া রাখেন। মাঝে মাঝে দুই একটা ছোট যুদ্ধ হইয়াছিল—কয়েকমাস মধ্যে কতক ডাকাত নেপাল ভুটানের দিকে পলাইয়া যায়। কতক অনাহারে মরে, অধিকাংশ গ্রেপ্তার হয়।*

সীতারাম সম্বন্ধে হাণ্টারের যশোহরের বিবরণীতে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মহম্মদপুর স্থাপিত হয়। ভূষণার জমীদার সীতারাম রায় উহার স্থাপয়িতা বলিয়া বিখ্যাত। এক প্রবাদ অনুসারে মধুমতীর বামতীরে হরিহর নগরে সীতারাম রায়ের এক তালুক ছিল এবং বর্ত্তমান মহম্মদপুরের অতি নিকটে শ্যামনগরেও ভূসম্পত্তি ছিল। একদিন সম্পত্তিপরিদর্শনকালে তাহার ঘোড়ার খুর কর্দ্দমে আটকাইয়া যায়। তিনি কতকগুলি লোক ডাকিয়া তাহাদিগকে মাটি খুড়িয়া ঘোড়ার পা উঠাইবার জন্য নিযুক্ত করেন। এইরূপ করিতে করিতে ভূগর্ভে এক ত্রিশূল দেখা দেয়, আরও গভীর গর্ত্ত করাতে এক মন্দির ও তন্মধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণ শালগ্রাম আবিষ্কৃত হইল। ইহাতে সীতারাম রায় আপনাকে দেবানুগৃহীত বলিয়া প্রচার পূর্ব্বক স্বসমাজের (উত্তররাঢ়ী) কায়স্থগণকে সমবেত করিয়া প্রতিবেশী জমীদারদিগকে আক্রমণ করিলেন, এবং এইরূপে সমগ্র ভূষণা দখল করিয়া তিনি বাঙ্গালার সুবাদারকে রাজস্ব দিতে অস্বীকৃত হইলেন। অপর (এবং সম্ভবতঃ অধিক সত্যমূলক) এক প্রবাদ এই যে সীতারাম সুন্দর বনের ভুঁইয়াদিগকে রাজস্ব দিতে বাধ্য করিবার জন্য দিল্লীর বাদশাহ কর্ত্তৃক প্রেরিত হন। তিনি বারজন ভূম্যধিকারীকে স্বাধিকারচ্যুত করিয়া এবং তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি স্বয়ং দখল করিয়া সম্রাটের আজ্ঞা পালন করিলেন। তিনি বাঙ্গলার নবাবকে রাজস্ব দিতে অস্বীকৃত হইয়া বলিলেন যে, তিনি বাদশাহ হইতে সম্পত্তি লাভ করিয়াছেন সুতরাং বাদসাহকেই কর দিবেন। ইহাতে ভূষণার ফৌজদার সীতারামের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। কিন্তু সীতারামের স্বজাতীয় মেনাহাতী* নামক অসীম পরাক্রমশালী বীরের হস্তে নিহত হন। ইহার পর নবাব এক বৃহৎ সৈন্যদল প্রেরণ করিলেন। এ সৈন্যদলের অধিনায়কের হস্তে মেনাহাতী বন্দী ও নিহত হইলে সীতারাম আত্মসমর্পণ করেন এবং বন্দিভাবে মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হন। এই স্থানে কারাগারে (১৭১২ বা ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে) তিনি বিষভক্ষণদ্বারা আত্মহত্যা করেন। মহম্মদপুরের সন্নিহিত বহু উত্তানবাটী এবং দীর্ঘিকা হইতে সীতারামের বিপুল ঐশ্বর্য্যের কিঞ্চিৎ

* W. W. Hunter প্রণীত A Statistical Account of Bengal Vol VII 158-159

* সীতারাম উপন্যাসে ইহার নাম মৃণ্ময়। বঙ্কিম মৃণ্ময়ের বল ও সাহসের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

পুরিয়া পাওয়া যায়। তাহার মৃত্যুর পর নাটোরের (রাজশাহী) রাজাদিগকে তাঁহার সম্পত্তি দেওয়া হয়। সীতারামের পুত্র প্রেমনারায়ণ রায় দারিদ্র্যদুঃখে জীবন যাপন করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন।*

পাঠক এখন দেখিবেন আনন্দমঠের ন্যায় দেবী চৌধুরাণী ও সীতারামের ঐতিহাসিক ভিত্তিও কত সঙ্কীর্ণ। ঐরূপ সঙ্কীর্ণ ভিত্তির উপরে যে “ঐতিহাসিক উপন্যাস” প্রাসাদ নির্ম্মাণ করা যায় না তাহা নহে, বঙ্কিম ইচ্ছা করিয়াই সে পথে যান নাই। ঐতিহাসিক উপন্যাসে লেখকের দৃষ্টি থাকে অতীতের দিকে, এই তিনখানি আখ্যায়িকায় বঙ্কিমের দৃষ্টি ভবিষ্যতের দিকে। তাই ঐতিহাসিক সকল তথ্যের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলা সম্ভব হয় নাই। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখা যখন বঙ্কিমের উদ্দেশ্য নয়, তখন বিষবৃক্ষ কৃষ্ণকান্তের উইল ইত্যাদির ন্যায় ইতিহাসের সহিত কোনও যোগ না রাখিয়া প্লট কল্পনা করা হইল না কেন? ইতিহাসের সহিত নামতঃ যোগ রাখায় অধিক কি লাভ হইল? লাভ হইয়াছে এই-সন্ন্যাসিবিদ্রোহ ইতিহাসের একটা জ্ঞাত ঘটনা। গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীরাও বিদ্রোহ করিয়াছিল, একথা জানা থাকায় সন্তানগণের সৃষ্টি একেবারে উদ্ভট হয় নাই। সন্ন্যাসীরা পেটের দায়ে কি অন্য কোনও কারণে ডাকাতি বা বিদ্রোহ করিত বলা যায় না. কিন্তু বঙ্কিম তাহাদের কার্য্য অবলম্বন করিয়া স্বদেশভক্তির এমন এক আদর্শ স্থাপন করিলেন, যাহা ইতিহাসের হিসাবে অলীক প্রতিপন্ন হইলেও কাব্যের হিসাবে অলীক অর্থাৎ সম্ভাব্যতার সীমাতিক্রান্ত হইল না। আবার বাঙ্গালী মেয়েরা যে কেবল অন্তঃপুরেই চিররুদ্ধা থাকিত তাহা নহে, তাহাদের কেহ কেহ পৌরুষধর্ম্মেও বিশেষ অগ্রসরতা প্রদর্শন করিয়াছে; গ্লেজিয়ারের উল্লিখিত দেবী চৌধুরাণী-নাম্নী দস্যুরমণী ইহার ঐতিহাসিক প্রমাণ।* বাঙ্গালীর মেয়ে ডাকাতি করিত ইহা বাঙ্গালীর গৌরব নহে; আর সাধারণ ডাকাত হইলে বা তার এত প্রতিপত্তি কেন হইবে? তাই বঙ্কিম তাহার দস্যুতাকে একটা নূতন বর্ণে রঞ্জিত করিয়া ও তাহার অনিন্দনীয় পৌরুষকে অনুশীলনধর্ম্মের উদাহরণরূপে গ্রহণ করিয়া সংসার যাত্রায় নারীজীবনের একটা নূতন আদর্শ স্থাপন করিলেন। এবারেও তাঁহার দৃষ্টি ভবিষ্যতের দিকে। তিনি যেন বলিতেছেন,—“তোমরা রাষ্ট্র গঠন করিবে? জ্ঞানে গুণে বলে ঐশ্বর্য্যে সিদ্ধিতে উন্নত হইবে? কিন্তু রাষ্ট্র যে পরিবারের সমষ্টি তাহা ভুলিও না—আদর্শ রাষ্ট্র গড়িবে, আদর্শ পরিবার আগে গড়িয়াছ কি? আধুনিক বাঙ্গালীর স্ত্রীকন্যারা না বড় সঙ্কীর্ণদৃষ্টি সঙ্কীর্ণমনাঃ সঙ্কীর্ণশক্তি? তাহা কি তাহাদের দোষ না দুর্ভাগ্য? দেখ এক বঙ্গললনা শত বরকন্দাজ পরিচালনা করিয়া ইংরাজের সিপাহীর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিল। সুতরাং অনুশীলন করিলে সাহস লোকনেতৃত্ব ইত্যাদি গুণ যে বঙ্গললনার হইতে পারে না তাহা নহে। পাতিব্রত্য স্নেহ মায়া দয়া দাক্ষিণ্য

---

* W. W. Hunter প্রণীত *A Statistical Acount of Bengal* Vol-II pp 2-3-216.

ষ্টুয়ার্টের ইতিহাসে সীতারামকে অবাধ্য জমিদার ও একদল ডাকাতের অধিনায়ক বলা হইয়াছে। সীতারাম নাকি ঐ সকল ডাকাত দ্বারা রাজপথে ও নদীতে ডাকাতি করিতেন। এই গ্রন্থে আরও কথিত হইয়াছে যে, সীতারামের ডাকাতের দল ভূষণার ফৌজদারকে ভ্রমক্রমে নিহত করায় মুর্শিদকুলি খাঁ অন্য ফৌজদার নিযুক্ত করিয়া ও পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য জমিদারদিগকে ভয়-প্রদর্শনে বাধ্য করিয়া সীতারামকে সপরিবারে বন্দী করেন। সীতারাম ও তাঁহার ডাকাতগণ বধদণ্ডে দণ্ডিত এবং তাহার পুত্রগণ দাসরূপে বিক্রীত হন।

* তবু কোনও কোনও সমালোচক বলেন এদেশে শান্তিচরিত্রের কোনও স্বাভাবিক ভিত্তি নাই, উহা অলীক উদ্ভট অস্বাভাবিক।

বাঙ্গালী নারীরা চিরদিনই মহিমান্বিতা ; বাঙ্গালার ঘরে ঘরে তার প্রমাণ ছিল। এখনই কি নাই? এ ধাতু দিয়া কি না গড়া যায়? তোমরা কেবলই বাঁদরী গড়িবে, দেবী কি গড়া যায় না? দেখ আমি দেবী গড়িয়া দিতেছি—ডাকাত দেবীচৌধুরাণীর দেবীসংজ্ঞা অন্বর্থ করিয়া দিতেছি। কিন্তু সাবধান। সাধ্যসাধনে গোল করিও না। নিষ্কাম কর্ম্ম, ভগবানে আত্মসমর্পণ ইত্যাদি কথাগুলি বড় বেশি জটিল। কোনও ধর্ম্মই সম্যক্ না বুঝিয়া অন্ধভাবে অনুশীলনীয় নয়। ইহারও একটা দৃষ্টান্ত দিব। হয়ত সে বৃত্তান্তটা প্রচলিত ইতিহাস সম্মত নয় কিন্তু কাব্যসম্মত। সীতারামের এত বড় রাজ্যটা তাসের ঘরের মত ফুৎকারে উড়িয়া গেল কেন তাহা কেহ নিশ্চিত জানে না। কিন্তু ঐ ঐতিহাসিক ঘটনাটা অবলম্বন করিয়া তোমার জাতীয় চরিত্রের একটা মজ্জাগত দোষ আর আমার উপদেশেরও একটা সম্ভাব্য কুফল সম্বন্ধে তোমাদিগকে সাবধান করিয়া দিতে পারি। দেখ তোমার বাঙ্গালা দেশটায় পঞ্চশরের প্রভাব বড় বেশি, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব দুই দুইটা মহোজ্জ্বল ধর্ম্ম ঐ এক মধুরের রিপুটার প্রভাবের কাছে নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। তাই ভবানন্দের মত অমন অকৃত্রিম দেশ-ভক্ত বীরেরও পদস্খলন দেখাইতে হইয়াছে। জীবানন্দও টলিতে টলিতে শান্তির পুণ্যে বাঁচিয়া গিয়াছে। সীতারামের পতনও যে ঐ উৎকটতম অন্তঃশত্রুর উৎপাতে প্রথমে অন্তঃসার শূন্য হইয়াছিল বলিয়াই মুসলমান ফৌজদারের সামান্য আঘাতে ধূলিসাৎ হয় নাই তাহা কি নিশ্চয় করিয়া বলা যায়? সীতারাম যে প্রথমেই অগ্নিবর্ণ ছিলেন না তাহা নিশ্চয়। অগ্নিবর্ণ পূর্ব্বপুরুষের তৈয়ারি রাজ্য হাতে পাইয়াছিলেন, সীতারাম তাঁহার রাজ্য নিজ হাতে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। এমন একটা লোক বাহিরের প্রলোভনে প্রথমেই পড়ে না। তার গৃহসুখে বাধা না পড়িলে কখনই হয়ত পড়ে না। তাই শ্রী ও রমার কল্পনা করিতে হইতেছে। কর্ম্মসন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ যে এক নহে, কর্ম্মসন্ন্যাসের শিক্ষা লইয়া গৃহে আসিলে যে গৃহ ও সন্ন্যাস উভয়ই নষ্ট হয়, শ্রী তাহার দৃষ্টান্ত। রমাতেও রাজরাণীর যোগ্য শিক্ষা নাই। রমা বাঙ্গালী কেরাণীর হৃদয়রাণী হইবার যোগ্য। শ্রীতে দেখিতে পাইবে প্রফুল্লের বিপরীত শিক্ষা অর্থাৎ আদর্শের বিপর্য্যয় ; রমাতে দেখিতে পাইবে শান্তির বিপরীত ভাব অর্থাৎ স্বামীর আদর্শের অনুপযুক্ততা।" বস্তুতঃ আনন্দমঠ ও দেবীচৌধুরাণীতে যাহা ভাবরূপে দেখিতে পাই, সীতারামে তাহা অভাবরূপে পরিস্ফুট। আনন্দমঠ ও দেবীচৌধুরাণীতে অন্বয়, সীতারামে ব্যতিরেক। যদিও আনন্দমঠের উপসংহারে বলা হইয়াছে, বিসর্জ্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল," তথাপি বঙ্কিমচন্দ্রের এই শেষ তিনখানি উপন্যাস তুলনা করিলে মনে হয়, আনন্দমঠে ও দেবীচৌধুরাণীতে প্রতিষ্ঠাই আছে, বিসর্জ্জনের চিত্র সীতারামে দেওয়া হইয়াছে। সত্যানন্দ যখন গুরুর সঙ্গে হিমালয়ে গেলেন, তখন তিনি জয়ী। হিন্দুরাজ্য স্থাপিত না হউক, অরাজকতা দূর হইয়াছে। তাহার পরে বন-মধ্যবর্ত্তী আনন্দমঠ আবার বনে পরিণত হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু সমস্ত বাঙ্গালা দেশব্যাপী সুবৃহৎ আনন্দমঠের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। দেবীচৌধুরাণী-তেও মনে হইতে পারে প্রফুল্ল গৃহসুখের মোহে বুঝি একটা মহাধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া গেল—কাপ্তান ব্রেনানের পরাজয়ে যে গৌরবপ্রতিমার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, গৃহিণী-পনার অনতিপ্রশস্ত ও অনতিগভীর সলিলে বুঝি তাহার বিসর্জ্জন হইল। বস্তুতঃ কিন্তু তাহা নহে, এখানেও প্রতিষ্ঠা,—গৃহধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা—নারীর কৃত্রিম রাজত্বের অবসানে যথার্থ রাজত্বের প্রতিষ্ঠা। সীতারামেই কেবল বিসর্জ্জন—বিসর্জ্জন—বিসর্জ্জন।

আনন্দমঠে বঙ্কিম যাহা গড়িতে চাহিয়াছেন তাহা এদেশের পক্ষে একটা নূতন বস্তু ; রাষ্ট্রীয় জীবনের একটা আদর্শ তিনি বিদেশ হইতে আনিয়া তাহাকে ভারতীয় ত্যাগের আদর্শের সহিত যে ভাবে মিলাইয়া

দিয়াছেন, তাহা খুব বিস্ময়কর সন্দেহ নাই, কিন্তু সে মিলনের ক্ষেত্রটা যেন সুজলা সুফলা বঙ্গভূমির কোনও অংশ নয়; যেন কল্পনারাজ্যের অন্তর্গত কোনও একটা তেপান্তর মাঠের মাঝখানে। তথাকার শস্যশ্যামলা শোভা, জ্যোৎস্নাপুলকিতা যামিনী, ফুল্লকুসুমিত দ্রুমদল আমাদের চক্ষে পড়ে না, তাহার নির্ম্মল আকাশের স্নিগ্ধ বায়ু আমাদের গায়ে লাগে না, যদিও অবশ্য উহা আমাদের কল্পনানেত্রের সম্মুখে একটা স্বপ্ন রাজ্যের সৃষ্টি করে, আমাদের নব আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপিত হৃদয়ে নূতন পুলক জাগাইয়া দেয়। ইহার কারণ যাহা তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এদেশে রাষ্ট্র ছিল না। কিন্তু দেবী-চৌধুরাণীতে সত্যে ও কল্পনার কোনরূপ অসামঞ্জস্য নাই, কেননা এদেশে চিরকালই পরিবার ছিল। দেবী-চৌধুরাণীর আখ্যানবস্তুর আশ্রয় সেই পরিবার। আনন্দ-মঠটা বিদেশীয় মালমসলায় নির্ম্মিত হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু হরবল্লভের বাড়ীটা নিতান্তই দেশীয় উপাদানে প্রস্তুত। হরবল্লভের পরিবার যে বস্তুতঃ একটি খাঁটি বাঙ্গালী পরিবার তাহাতে কি কাহারও সন্দেহ হইতে পারে? হরবল্লভ নিজে খাঁটি বাঙ্গালী কর্ত্তা; তাহার কর্ত্তব্যবোধ বাঙ্গালী ধরণের কাঁচা কিন্তু বিষয়বুদ্ধিটি বাঙ্গালী ধরণেরই অতি পাকা। তাই পুত্রবধূকে ত্যাগ করায় বা তাহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়ায় কিংবা উপকারিণী দেবীরাণীকে সিপাহির হাতে ধরাইয়া দিবার চেষ্টায় তাহার উপর ঘৃণা হয় বটে, কিন্তু পর বলিয়া মনে হয় না। হরবল্লভের গৃহিনীটিও খাঁটি বাঙ্গালী গৃহিণী, তাঁর নাকের নথ, হাতের পাখা, আর (ছিন্ন-সম্বন্ধা বৈবাহিকার সঙ্গে আলাপের সময়) রসনাখানিও ঠিক বাঙ্গালী ধরণেরই নড়ে; যে পর্য্যন্ত নিজের চাঁদপানা ছেলেটি দুধে ঘিয়ে, তেলে-ঝোলে শুক্লপক্ষের চাঁদের মত বাড়িতে থাকে সে পর্য্যন্ত একটা বৌ বাড়ীতেই আশ্রয় পা'ক বা মায়ের কাছে থাকিয়া অনাহারে মরুক তাহাতে গৃহীর বড় কিছু একটা আসে যায় না। কিন্তু যখন বুঝিলেন পুত্রটি সেই বধূর জন্য মরিতে বসিয়াছিল তখন গিন্নী সে বৌয়ের জন্য কর্ত্তার কাছে কেবল নথনাড়া দিয়া সন্তুষ্ট নন, গলায় দড়ি দিয়া মরিতে প্রস্তুত। ব্রহ্ম ঠাকুরাণীর মত ঠাকুরমা সেকালে কেন, বোধ হয় পল্লী গ্রামে অনেক সঙ্গতিসম্পন্ন ভদ্রঘরে একালেও আছেন, তবে রান্নাটা বোধ হয় এখন তাঁর হাতে নাই, শ্রীজগন্নাথ-দেবের ছাপান্নভোগরন্ধনকারীদের জাতের অক্ষম হয়ে গিয়াছে। নয়নতারার মত তারা এখনও বাঙ্গালায় গৃহাকাশে ফুটে; এখন সপত্নীর জ্বালা বড় একটা নাই, তবু নয়নতারার দল যে পূর্ব্বাপেক্ষা কম উজ্জ্বল ভাবে ফুটে তাহা নয়—

> Fair as a star, when only one
> Is shining in the sky,—

সাগর বৌ ও নয়ান বৌর পরস্পরের প্রতি ভাবে আর যাহাই থাকুক idealism নিশ্চয়ই নাই। নয়ান অবস্থা-ন্তরে বিষবৃক্ষের দেবেন্দ্রের বধূ হইতে পারিত, সাগরও অবস্থান্তরে কমলমণি হইতে পারিত। ব্রজেশ্বর বড় লোকের ছেলে হইয়াও বাইশ বৎসর পর্য্যন্তও যে কুমার হইতে পারে নাই, তাহা সেকালে অসম্ভব ছিল না। তার পিতৃভক্তিটি "সেকেলে" হইলেও বঙ্কিমের সময়েও বাঙ্গালায় অদৃশ্য হয় নাই। এই বৃহৎ ও অভিজাত বাঙ্গালী পরিবারটাকে একটা মনোমোহন আদর্শের আলোকে সুন্দরতর করিবার জন্যই ঐতিহাসিক দেবীচৌধুরাণীর কলঙ্কময় পৌরুষধর্ম্মকে ত্রিস্রোতার পুণ্যসলিলে ধুইয়া লইয়া, কাব্যের-রত্ন সিংহাসনে স্থাপন করা হইয়াছে। প্রফুল্ল চরিত্রের ভিত্তি অতীত ও বর্ত্তমান উভয়ত্র; উহার অনেকগুলি ধর্ম্ম বাঙ্গালী ললনার চিরন্তন ধর্ম্ম। নিষ্কাম ধর্ম্ম গীতার শিক্ষা; অনুশীলন ধর্ম্মকেও বঙ্কিম হিন্দুর চতুরাশ্রমধর্ম্মের শিক্ষা বলিয়া মনে করি-তেন। কিন্তু প্রফুল্লচরিত্রে একত্র এই সবগুলি ধর্ম্মের যে সমন্বয়সাধন করা হইয়াছে, তাহা অতীতেরও নয়, বর্ত্তমানেরও নয়, ভবিষ্যতের। আনন্দমঠ লিখিবার পর

রাষ্ট্রের সহিত পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্মরণ করিয়া বঙ্কিম বলিলেন, "এবারে খাঁটি বাঙ্গালার মাটি বাঙ্গালার জল দিয়া একটা এমন মূর্ত্তি গড়িব যাহা অতীতে ও বর্ত্তমানে সত্য না হউক, ভবিষ্যতে সত্য হইবে।" আনন্দমঠের অধিষ্ঠাত্রী দেশমাতৃকা মহাবিষ্ণুর ক্রোড়ে বসিয়া বলিলেন "শিবম্"। মহাবিষ্ণু বলিলেন "সুন্দরম্"। এখন বাঙ্গালী তোমরা বল, "সত্যম্" এবং উহাকে গৃহে গৃহে সত্য করিবার জন্য—আদর্শকে বস্তুতন্ত্রতা দান করিবার জন্য—ব্রতী হও।

গৃহধর্ম্মটা আনন্দমঠে নাই, কিন্তু গৃহসুখাকাঙ্ক্ষা সন্তানগণের মধ্যে বেশ প্রবল। তাহাদের সকলেরই আশা ব্রতোদ্‌যাপন করিয়া স্ত্রী লইয়া গৃহী হইবেন। কিন্তু ঐ আখ্যায়িকার প্রধান দুইটি স্ত্রীচরিত্রেই গৃহসুখাকাঙ্ক্ষার প্রভাব যে কারণেই হউক কম। অথচ আমাদিগের সংস্কার এই যে, গৃহসুখের মোহ পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরই অধিক। বঙ্কিম শান্তিতে ঐ আকাঙ্ক্ষাটি ফুটিবার সুযোগই দেন নাই, কেননা সে বাল্যাবধি পুরুষ সাজিয়া পৌরুষধর্ম্মেরই চর্চ্চা করিয়াছে। তার যৌবনে সে কয়েক দিনের জন্য গৃহিণী হইয়া গৃহসুখে অভ্যস্ত হইতে না হইতেই সন্তানধর্ম্ম জীবানন্দকে আহ্বান করিল, আর শান্তিও ঘটনাচক্রে আবার গৃহধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া ব্রতভঙ্গাপরাধী স্বামীর জীবনে মরণে সহধর্ম্মচারিণী হইবার জন্য নবীনানন্দ সাজিয়া গৃহের বাহির হইয়া পড়িল। কল্যাণীতে গৃহসুখাকাঙ্ক্ষা থাকিলেও কৌশলে উহাকে বেশ দমন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রফুল্লে কিন্তু নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও গৃহসুখের স্পৃহাটা বেশ বলবতী করিয়াই রাখা হইয়াছে, নহিলে সন্ন্যাসিনীকে গৃহে ফিরান কঠিন হইত, ফিরাইলেও সে শ্রীর মত ব্রজেশ্বরের গৃহ শ্রীহীন করিত। প্রফুল্লের গৃহে সংসারসুখের মোহ (মোহই বলি; কেননা অনেক বিজ্ঞ সমালোচক তাহাই বলিয়াছেন) ছিল বলিয়াই বঙ্কিম নিজে তাহাকে আদর্শ গৃহিণীতে পরিণত করিয়াছে—তাহার মোহকে মোক্ষসাধনে পরিণত করিয়াছে। প্রফুল্লের কথা শুন—

"প্রফুল্ল সাগরকে সব বুঝাইয়া বলিল। শুনিয়া সাগর জিজ্ঞাসা করিল, "এখন গৃহস্থালীতে কি মন টিকিবে? রূপার সিংহাসনে বসিয়া হীরার মুকুট পরিয়া রাণীগিরির পর কি বাসনমাজা ঘর ঝাঁট দেওয়া ভাল লাগিবে? যোগশাস্ত্রের পর কি ব্রহ্মঠাকুরাণীর রূপকথা ভাল লাগিবে? যার হুকুমে দুই হাজার লোক খাটিত, এখন হারির মা পারির মার হুকুমদারি কি তার ভাল লাগিবে?

প্রফুল্ল। ভাল লাগিবে বলিয়াই আসিয়াছি। এই ধর্ম্মই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম। রাজত্ব স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম নয়। কঠিন ধর্ম্মও এই সংসার ধর্ম্ম, ইহার অপেক্ষায় কোনও যোগই কঠিন নয়। দেখ কতকগুলি নিরর্থক স্বার্থপর অনভিজ্ঞ লোক লইয়া আমাদের নিত্য ব্যবহার করিতে হয়। ইহাদের কাহারও কোনও কষ্ট না হয়, সকলে সুখী হয় সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। এর চেয়ে কোন্ সন্ন্যাস কঠিন? এর চেয়ে কোন্ পুণ্য বড় পুণ্য? আমি এই সন্ন্যাস করিব।"

শ্রীর এ শিক্ষা হয় নাই। না হওয়ারও কারণ আছে, তার মনে মনে ভয়, স্বামীকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিলে তার প্রাণহন্ত্রী হইতে হইবে। সে "ভালবাসার ফাঁদে পড়িতে" অনিচ্ছুক। মূর্খা শ্রী বুঝে নাই, তার প্রাণহন্ত্রী হইবার ভয়ে তার গৃহিণী না হওয়া—তার কাছ হইতে ছুটিয়া দূরে যাওয়াও ভালবাসাই। ভালবাসা কি কেবলই ভোগে—ত্যাগে নয়? উপন্যাসে জ্যোতিষবচনের মর্য্যাদা রক্ষিত হইয়াছে কিনা জানি না। ভ্রাতা ভগিনীর প্রিয়, স্বামী কি শ্রীর প্রিয় ছিল না? স্বামীর সহিত আলাপ পরিচয়ের পূর্ব্বে শ্রী যে মনে মনে স্বামীকে দেবতার মত পূজা করিত তাহা ত বঙ্কিমই বলিয়াছেন। সেই মনোরম শ্রীতিবন্ধনকে শ্রী উচ্ছিন্ন করিতে চাহিয়াছিল। কেন? শ্রীতির এ প্রয়োজন। শ্রী প্রিয় আত্মার প্রাণহন্ত্রী হই-

মাছে, বঙ্কিম বুঝি পাঠককে বুঝাইতে চান, শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা হইয়াছে, জ্যোতিষ বাক্যের অক্ষরার্থ ফলিয়াছে। কিন্তু স্বামীত সতী স্ত্রীর কেবল প্রিয় নহে, প্রিয়তম ; শ্রী প্রিয়তমের প্রাণহন্ত্রী হয় নাই বটে, কিন্তু প্রাণ অপেক্ষাও যাহা বড় তাহা হনন করিয়াছে—তার কীর্ত্তিনাশ করিয়াছে, তার ধর্ম্মনাশের কারণ হইয়াছে ; একটা যথার্থ মনুষ্যত্বশালী পুরুষকে পশুতে পরিণত করিয়াছে। কেন এমন হইল ? দৈব ও দুর্ব্বুদ্ধি উভয়ই বুঝি তার হেতু। দৈব শ্রীতে মূর্খতাকে এবং সীতারামে উৎকট রূপমোহ বা কামবৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া কার্য্য করিয়াছে। সন্ন্যাসিনী শ্রী স্বামীর কাছে আসিয়া বলিতেছে "তুমি স্বামী, আর তুমি রাজা, তা ছাড়া তুমি উপকারী, আমি উপকৃত। অতএব তুমি যাইতে না দিলে আমি যাইতে পারিব না।" সন্ন্যাসিনীর আবার স্বামী কি? রাজা কি? স্বামী, রাজা ও উপকারীর প্রতি কর্ত্তব্যজ্ঞান আছে, কিন্তু স্বামী, রাজা ও উপকারীর যথার্থ উপকারে অর্থাৎ গৃহধর্ম্মচর্চ্চায় সম্মতি নাই। কেন না সে সন্ন্যাসিনী ! স্বামী, রাজা ও উপকারীর গৌরব যশঃ ধর্ম্ম সকল রসাতলে যাইতেছে দেখিয়াও সে সন্ন্যাসের কথা ভুলে না—রাজধানী ছাড়িয়াও পলায় না। তখনও শ্রী নিজ সন্ন্যাসধর্ম্মের কথাই ভাবিতেছে, অথচ যথার্থ সন্ন্যাস কোথায় ? সীতারামের মুখে প্রেমালাপ শুনিতে শুনিতে সে ভাবে "ইনি আমার পতি, আমি ইঁহার গৃহিণী"। তবে সে গৃহধর্ম্মে ফিরিয়া যায় না কেন ? তার উত্তর,—"মহিষীর ধর্ম্ম ত শিখি নাই ; সন্ন্যাসিনীর ধর্ম্ম শিখাইয়াছ। যাহা জানি না, যাহা পারি না, সেই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সব গোল করিব, সন্ন্যাসিনী মহিষী হইলে কি মঙ্গল হইবে ?" প্রফুল্লে কুত্রাপি এরূপ আত্মপ্রতারণা নাই। সে যে ভবানী পাঠকের নিকট সকল রকমের শিক্ষা আগ্রহের সহিত লইয়াছে তাহা স্বামীর বিরহজনিত উৎকট খেদকে ভুলিবার জন্য বটে, কিন্তু সে স্বামিপ্রেমকে কখনও ভয়ের চক্ষে দেখে নাই। স্বামী তাহার কাছে দেবতা। ভবানী পাঠক এতটা বুঝেন নাই—তাঁর "একটা বড় ভুল হইয়াছিল, প্রফুল্ল একাদশীর দিন জোর করিয়া মাছ খাইত, এ কথাটা আর একটু তলাইয়া বুঝিলে ভাল হইত।" সে যাহা হউক প্রফুল্লের সৌভাগ্যক্রমে ভবানী পাঠক তাহাকে কর্ম্ম-সন্ন্যাস শিক্ষা দেন নাই—তাহা দেওয়া তাঁর স্বার্থানুকূলও ছিল না—কর্ম্ম-যোগ শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাই প্রফুল্লের স্বামিপ্রেম নিষ্কাম গৃহধর্ম্মে পরিণত হইতে পারিয়াছিল। কোনও কোনও সমালোচক ইহাকে একটা tragedy মনে করিয়াছেন। এমন একটা গুণবতী রাণী কি না সতীন লইয়া গৃহধর্ম্ম করিতে গেল। প্রফুল্লের জবাব উপরে উল্লিখিত হইয়াছে।

প্রফুল্লের চরিত্রের গাঁথুনি বড় ভাল ছিল, তাই তাহাকে এত বড় করা সম্ভব হইয়াছে। প্রথমাবধি তাহাকে বেশ দৃঢ়চিত্তা দেখিতে পাই—তাহার বুদ্ধিও অসাধারণ। বাঙ্গালীর মেয়েতে কি ইহা নাই ? আছে বই কি ! দুঃখেই মানুষ যথার্থ মনুষ্যত্ব লাভ করে। অবশ্য সুকৃতিও চাই। শ্বশুরালয়ে প্রথম দিনে শাশুড়ীর সহিত, সাগরের সহিত, স্বামীর সহিত কথাবার্ত্তায় ও আচরণে সর্ব্বত্রই প্রফুল্লের নম্রতা বুদ্ধি ও উর্জ্জস্বল সুরুচি (ইহাকেই আমরা সুকৃতির ফল বলি) দেখিতে পাই। যে শ্বশুর তাহার সকল দুঃখের নিদান তাঁহার প্রতিও কোনও অবস্থায়ই তাহার বিদ্বেষ নাই—বরং প্রথম দিনেই সে স্বামীকে বলিয়াছে আমার মত দুঃখিনীর জন্য বাপের সঙ্গে তুমি বিবাদ করিও না, তাতে আমি সুখী হইব না। তার সাহস ও মনোবল কত অধিক, তাহা তাহার হরণবৃত্তান্তে ও ভবানী ঠাকুরের সহিত পরিচয়ে জানিতে পারি।

নন্দা চরিত্রেরও ভিত্তি ভাল। "সীতারাম" আখ্যায়িকায় যদি কোনও নারীচিত্র মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক করে তবে সে নন্দা। নন্দা ও সূর্য্যমুখী এক ছাঁচের মূর্ত্তি। সে প্রাণপাত করিয়া পতিসেবায় নিযুক্তা।

"মাতার মত স্নেহ, কন্যার মত ভক্তি, দাসীর মত সেবা, সীতারাম সকলই নন্দার কাছে পাইতেছিলেন।" তবু যে তিনি ভাবিতেছিলেন, "সহধর্ম্মিণী কই?—বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী ভাল কিন্তু সমরে সিংহবাহিনী কই?" তাহা লক্ষ্মীছাড়ার যোগ্য ভাবনা। নন্দাকে তিনি যেমন ইচ্ছা তেমনই উচ্চভাবের সঙ্গিনী উন্নতজীবনের অধিকারিণী করিয়া লইতে পারিতেন। বস্তুতঃ "সহধর্ম্মিণীর অভাব" সীতারামের আত্মপ্রতারণামাত্র। তাহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে নবপরিচিতা শ্রীর সৌন্দর্য্য মোহাগ্নিশিখা ধীরে ধীরে সর্ব্বকর্ম্মনাশিনী সর্ব্বধর্ম্মসংহারিণী জ্বালা বিস্তার করিতেছিল। ব্রজেশ্বরের প্রফুল্লের রূপগুণের প্রতি মোহসত্ত্বেও ধর্ম্মবোধ এতই প্রবল ছিল যে, পিতাকে তার মৃত্যুর হেতু ভাবিয়াও, এমন কি, উপকারিণী প্রফুল্লকে ধরাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে গোয়েন্দাগিরি করিতে দেখিয়াও তাঁহার প্রতি ক্রোধ বা অশ্রদ্ধা জন্মে নাই। যখনই তাহার মনে ঐ সকল ভাবের ছায়ামাত্রও পতিত হইয়াছে তখনই সে "পিতা স্বর্গঃ" প্রভৃতি শাস্ত্রবাক্য স্মরণ করিয়া তাহা দমন করিয়াছে। আর সীতারাম? সীতারাম শ্রীর মোহে রাজধর্ম্মে বিসর্জ্জন দিয়াছে, গুরু ও পরমশুভানুধ্যায়ী চন্দ্রচূড় ঠাকুরকে অপমানে ব্যথিত করিয়া নির্ব্বাসিত করিয়াছে, তার পর যে জয়ন্তী একদিন তাহার রাজধানী রক্ষা করিয়াছিল, আর একদিন তার নিজ কুলমর্য্যাদা, তার ধর্ম্মপত্নীর মান রক্ষা করিয়াছিল, তাঁহাকে—বলিতে ঘৃণা বোধ হয়—কি অপমানেই বা অপমানিত করিয়াছে? এইখানে আবার নন্দার কার্য্য স্মরণ কর, দেখিবে নন্দার মহারাজাধিরাজের মহিষীর অনুরূপ গুণ, তাহার সহধর্ম্মিণী হইবার যোগ্যতা আছে কি না। বুঝিবে যথার্থই সীতারাম লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিয়া সিংহবাহিনীর নামে মোহময়ী রতির জন্য উদ্ভ্রান্ত হইয়া ছুটিয়াছিল কি না! সিংহবাহিনী তাহার ঘরেই নন্দারূপে বিরাজ করিতেছিল। মহম্মদপুরে মুসলমান ফৌজদারের শেষ আক্রমণের দিন মনে কর আর শুন নন্দা কি বলিতেছে,—

নন্দা। মহারাজ! শরীরধারণে মৃত্যু আছেই। সে জন্য দুঃখ করিও না। তবে তুমি লক্ষযোদ্ধার নায়ক হইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে মরিবে, আমি তোমার অনুগামিনী হইব তাহা অদৃষ্টে ঘটিল না কেন?

* * * *

রাজা। নন্দা! এত লোক পলাইল, তুমি পলাইলে না কেন? তাহা হইলে ইহারা রক্ষা পাইত।

নন্দা। তোমার মহিষী হইয়া আমি কার সঙ্গে পলাইব মহারাজ? তোমার পুত্র কন্যা আমি তোমাকে না বলিয়া কাহার হাতে দিব? পুত্র বল, কন্যা বল, সকলই ধর্ম্মের জন্য; আমার ধর্ম্ম তুমি। আমি তোমাকে ফেলিয়া পুত্রকন্যা লইয়া কোথায় যাইব?

রাজা। কিন্তু এখন উপায়?

নন্দা। এখন আর উপায় নাই। রাজার ঔরষে ইহাদের জন্ম। রাজকুলের সম্পদ্ বিপদ্ উভয় আছে, তজ্জন্য আমার তেমন চিন্তা নাই। পাছে তোমায় কেহ কাপুরুষ বলে আমার সেই ভাবনা।"

হতভাগ্য কামমোহোদ্ভ্রান্ত সীতারাম এমন পত্নীকে শেষে চিনিতে পারিয়াও শ্রীর মোহ কাটাইতে পারে নাই।

"শ্রী। এই তোমার পায়ে হাত দিয়া বলিতেছি আমি আর সন্ন্যাসিনী নই। আমার অপরাধ ক্ষমা করিবে? আমায় আবারও গ্রহণ করিবে?

সীতারাম। তোমায় ত বড় আদরেই গ্রহণ করিয়াছিলাম; এখন ত আর গ্রহণের সময় নাই।

শ্রী। সময় আছে; আমার মরিবার সময় যথেষ্ট আছে।

সী। তুমিই আমার মহিষী।"

সীতারাম রাগিতেও পারিল না, একবার একটু অভিমান করিয়া বলিয়াছিল "আমার সঙ্গে নন্দা যাইবে,

প্রস্তুত হইয়াছে ; তুমি সন্ন্যাস ধর্ম্ম পালন কর।" এই পর্য্যন্ত। অভিমান না করিয়া সীতারাম যদি ধীর ভাবে বলিতে পারিত, "আমার ধর্ম্ম আমি অবশেষে পালন করিতে চলিলাম, তোমার ধর্ম্ম তুমি দেখ" তবু বুঝিতাম, অগ্নিবর্ণলীলার পরও তাহার মধ্যে একটু পদার্থ আছে।

সীতারামের চরিত্র নীতির দিক দিয়াই আমরা এ পর্য্যন্ত বিচার করিয়াছি এবং ঐ হিসাবেই তাহা ব্রজেশ্বরের চরিত্র অপেক্ষা হীন বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। শিল্পের দিক হইতে দেখিতে গেলে বঙ্কিমচন্দ্র সীতারামকে প্রথমে যেরূপ অসাধারণ নৈতিক মাহাত্ম্যে গৌরবান্বিত এবং বৈষয়িক উন্নতির সপ্তম স্বর্গে উন্নীত করিয়া ধীরে ধীরে, কিন্তু দৃঢ় নির্দ্দয় হস্তে, তাহার নৈতিকবল অপহরণ ও ঐশ্বর্য্য বিলোপ করিয়া নরকের দিকে ঠেলিয়া লইয়া গিয়াছেন তাহা প্রাচীন রোমাণ্টিক রীতির অনুযায়ী একটু sensational একটু melodramatic হইলেও তাহাতে ব্রজেশ্বরের চরিত্রচিত্রের তুলনায় অধিকতর বৈচিত্র্য প্রদর্শিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। অবশ্য সীতারামের চরিত্রটাকে আরও একটু জটিল করিবার এবং তার পতনের মধ্যে আরও একটু মানুষধর্ম্ম সংযোগ করিবার যথেষ্ট অবকাশ ছিল। সীতারাম মানুষের মত পতিত হয় নাই, একটা দৈত্য দানবের মত পতিত হইয়াছে। সীতারামের পতনে মহচ্চরিত্রের যোগ্য struggle—মহামোহের সঙ্গে মহাপ্রাণতার লড়াই—নাই। একটা প্রাচীন প্রসাদ যেমন জীর্ণ হইতে২ শেষে একদিন শ্রাবণের ধারাপাতে হঠাৎ ধসিয়া পড়ে, সীতারামের পতন কতকটা সেইরূপ। শ্রীর জন্য মোহ ঐ চরিত্রের মহত্ব জীর্ণ করিয়া দিয়াছিল, তার পর জয়ন্তীর বেত্রদণ্ডাজ্ঞার পরই তাহা নিকৃষ্টতম কামপ্রবৃত্তির উৎকট ধারাসম্পাতে ভূমিসাৎ হইল। সীতারামের পূর্ব্বজীবনে দিলীপের আত্ম-বিসর্জ্জন মহত্ব,আর পরজীবনে অগ্নিবর্ণের আত্মরতা-কলঙ্ক দুইই মিলিয়া গিয়াছে।

শ্রীতে আদর্শের বিপর্য্যয়জনিত একটা স্বাভাবিক "অস্বাভাবিকতা" ছাড়া আর কিছু লক্ষ্য করিবার নাই। তাহাতে শিল্পকৌশলও বিশেষ নাই। শ্রী জয়ন্তীর একটা ছায়ামাত্র, ছায়ায় মূলের সজীবতা নাই। জয়ন্তীর বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা,উদ্যমের প্রখরতা, ধর্ম্মবোধের ঐকান্তিকতা কিছুই শ্রীতে ফুটে নাই। শ্রীর চরিত্র প্রফুল্লের তুলনায় জটিল বটে, কিন্তু সেরূপ জটিলতার শিল্পগত মর্য্যাদা অধিক নহে। প্রফুল্লচরিত্র শিল্পগৌরবে গৌরবান্বিত না হইলেও মনোহর ; শ্রীতে শিল্পও তেমন নাই, চরিত্রের স্বাভাবিক ঔন্নত্যজনিত মাধুর্য্যও নাই।

শ্রীর সহিত প্রফুল্লের দুই স্থলে সাদৃশ্য আছে। প্রথমতঃ উভয়েই নবযৌবনে স্বামিসুখে বঞ্চিতা। দ্বিতীয়তঃ তথাপি উভয়েই স্বামীকে দেবতার অধিক ভক্তি করে ও ভালবাসে। প্রফুল্লের ভক্তি ও ভালবাসায় কোনও বাধা আসে নাই ; কিন্তু শ্রী যখন বুঝিল স্বামীকে ভালবাসিলেই তাঁহার অনিষ্ট হইবে, তখন হইতে সে ভালবাসা দমন করিবার জন্য সন্ন্যাস অভ্যাস করিতে প্রবৃত্ত হইল।

জয়ন্তীর আদর্শ ও নিশির আদর্শ ঠিক এক নহে। জয়ন্তী কেবল সন্ন্যাসিনী, নিশি বৈষ্ণবী। নিশির রূপ, যৌবন, প্রাণ সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত ;

"প্রফুল্ল।—তিনি তোমার স্বামী ?

নিশি।—হাঁ কেননা যিনি সম্পূর্ণরূপে আমাকে অধিকারী, তিনিই আমার স্বামী।

* * *

নিশি। শ্রীকৃষ্ণে সকল মেয়েরই মন উঠিতে পারে, কেন না তাঁর রূপ অনন্ত, যৌবন অনন্ত, ঐশ্বর্য্য অনন্ত, গুণ অনন্ত।"

নিশি বৈষ্ণবী, তাই সে সর্ব্বদা প্রফুল্লা, তাহার রসিকতা তাহার সন্ন্যাসকে—শ্রীকৃষ্ণার্পিতসর্ব্বস্ব জীবনকে বড় মধুময়ী আভায় মণ্ডিত করিয়াছে। তাহার চতুরতা ও রসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় হরবল্লভের সহিত তাহার "ভগিনীর" বিবাহ প্রস্তাবে। দেবী বলিয়াছিলেন

"নিশি ঠাকুরাণি! তোমার মন প্রাণ জীবন যৌবন সবই শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিয়াছ—কেবল জুয়াচুরিটুকু নয়। সেটুকু নিজের ব্যবহারের জন্য রহিয়াছে।" এই যে "জুয়াচুরিটুকু" ইহা দ্বারাই তাহার আমাদের পূর্ব্বপরিচিতা বিমলার সহিত বংশগত সাদৃশ্য ধরা পড়ে।

জয়ন্তীতে রসিকতা নাই, সে সন্ন্যাসিনী, ও সন্ন্যাসিনীর যোগ্য গম্ভীরতাশালিনী—কিন্তু তাহার উদ্যম উৎসাহের তুলনা নাই। সে নিশির ন্যায় সুখ দুঃখ শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করে নাই; সে সুখ দুঃখে জলাঞ্জলি দিয়াছে।* তাহার মনের ভাব—"যখন আমার সুখও নাই দুঃখও নাই, তখন আবার লজ্জা কি? ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের যখন কোনও সম্বন্ধ নাই তখন আমার আর বিবস্ত্র সবস্ত্র কি? প্রাণই লজ্জা আবার কি সে লজ্জা করিবে?"...ইত্যাদি। এই সকল কথায় বুঝা যায় সন্ন্যাস করিয়াও তাহার আত্মবোধ (self-consciousness) টুকু বেশ আছে। ভগবান্ তাই তাহাকে বিষম পরীক্ষায় ফেলিয়া তাহার ঐ বোধটুকু ঐ দর্পটুকু চূর্ণ করিয়াছেন, দর্প চূর্ণ করিয়া তাহার সন্ন্যাসমাহাত্ম্যকে উজ্জ্বলতর করিয়াছেন। মনে পড়ে সীতারামের ব্যূহ রচনাকালে শ্রী যখন বলিয়াছিল—"মহারাজ! রাজাদিগের অপেক্ষা কি সন্ন্যাসীদিগের মরণে ভয় বেশী?" তখন জয়ন্তী কিছু বলে নাই? কেন না "জয়ন্তী আর সন্ন্যাসের দর্প করে না"।

ব্রজেশ্বরের তিনপত্নীর ন্যায় সীতারামেরও তিনপত্নী। ভবানী পাঠকের হাতে না পড়িয়া ব্রজেশ্বরের গৃহে আশ্রয় পাইলে প্রফুল্ল যাহা হইতে পারিত, নন্দা তাহাই। • ভবানী পাঠকের শিক্ষার আদর্শে বিপর্য্যয় ঘটিলে—রাণীর (অর্থাৎ রাজ্যরূপ বৃহৎ পরিবারের গৃহিণীর) যোগ্য শিক্ষা না পাইয়া সন্ন্যাসিনীর যোগ্য শিক্ষা পাইলে প্রফুল্ল যাহা হইতে পারিত শ্রী তাহাই। সুতরাং সীতারামের দুই পত্নী, ব্রজেশ্বরের এক পত্নীরই উল্টা পিঠের মত। সাগর আর নয়নতারা সীতারামকে কোনও আকারে আসিয়া অনুগ্রহ করেন নাই। তাহারা যেমন ব্রজেশ্বরের নিজস্ব, রমা তেমনি সীতারামের নিজস্ব। শিল্পের হিসাবে রমা ও ভ্রমর † এক শ্রেণীর সৃষ্টি। অর্থাৎ ভ্রমরে যেমন বঙ্গললনার কয়েকটি ধর্ম্ম উগ্রতর করিয়া দেখান হইয়াছে, রমাতেও সেইরূপ। ভ্রমরে পাই বিশ্ববঙ্গবধূর পতিপ্রেম ও অভিমান; রমাতে পতিপ্রেমের সঙ্গে পাই তাহাদের অপত্যস্নেহ ও ভীরুতা। ভ্রমরের ন্যায় রমাও বঙ্গবধূ intensified. যে ধাতুকে পুড়িয়া পিটিয়া প্রফুল্লের ন্যায় দেবীপ্রতিমা গড়িয়া ভবিষ্যতের বঙ্গসংসারে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে রমা (ও ভ্রমর উভয়েই) তাহাই।

রমা পতিপ্রাণা, পুত্রবৎসলা, সে যে মুসলমানকে ভয় করে তাহা নিজের জীবনের জন্য যতটা না হউক, পতিপুত্রের জীবনের জন্যই অধিক। যখন পতি দিল্লী গেলেন, তখন পুত্রস্নেহেই সে নিজের সর্ব্বনাশ করিল, সীতারামের সর্ব্বনাশ করিল, যে মহম্মদপুর ছারখারে যাওয়ার জন্য সে নিত্য ঠাকুর-দেবতার কাছে প্রার্থনা করিত সেই মহম্মদপুরকে সত্যসত্যই ছারখারে দিল। রমা স্বভাবভীরু। রবীন্দ্রনাথের "কাবুলিওয়ালা" গল্পের মিনির মার মত সে "অত্যন্ত শঙ্কিত স্বভাবের লোক"।

* জয়ন্তীর মুখে একবার "অনন্ত সুন্দর কৃষ্ণপাদপদ্মে মন স্থির" করার কথা আছে বটে; শ্রীকৃষ্ণকে আত্মদানের কথা তার বা তার শিষ্যার মুখে শুনি নাই।

• প্রফুল্লের গৃহধর্ম্মের প্রধান গুণ যে সপত্নীর প্রতি নিরপেক্ষতা, তাহার বীজও নন্দায় আছে। মুসলমানে মহম্মদপুর আক্রমণ করিতে আসিতেছে শুনিয়া রমা যখন বার বার মূর্চ্ছা যাইতেছে, তখন নন্দা যদিও একবার ভাবিল, "সতীনটা মরিলেই বাঁচি", তখনই আবার ভাবিল, "প্রভু যখন আমাকে অন্তঃপুরের ভার দিয়া গিয়াছেন", তখন আমাকে আপনার প্রাণ দিয়াও সতীনকে বাঁচাইতে হইবে। তার পর রমার কলঙ্ক শুনিয়া সে যে ভাবে তাহার সহিত সহানুভূতি দেখাইয়াছে তাহা বাস্তবিকই অত্যন্ত উন্নতহৃদয়ের পরিচায়ক।

† ভ্রমর চরিত্র স্বতন্ত্র ভাবে আলোচিত হইয়াছে

রাস্তায় একটা শব্দ শুনিলেই মিনির মার মনে হইত, "পৃথিবীর সমস্ত মাতাল আমাদের বাড়ীটাই বিশেষ লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। এই পৃথিবীটা যে সর্ব্বত্রই চোর ডাকাত মাতাল সাপ বাঘ ম্যালেরিয়া শুঁয়াপোকা আরসোলা এবং গোরার দ্বারা পূর্ণ, এতদিন (খুব বেশী দিন নহে) পৃথিবীতে বাস করিয়াও সে বিভীষিকা তাঁহার মনে হইতে যায় নাই।" রমার কল্পনায় গোরার পরিবর্ত্তে "অসংখ্য মুসলমানের দন্তশ্রেণী--প্রভাসিত বিশাল শ্মশ্রুল বদনমণ্ডল রাত্রিদিন" বিরাজ করিত। এই যে "চোর ডাকাত মাতাল সাপ বাঘ ম্যালেরিয়া শুঁয়াপোকা আরসোলা গোরা" ইত্যাদির ভয় ইহা অধিকাংশ বঙ্গনারীর মজ্জাগত। বঙ্কিমের উপন্যাসে আমরা এ শ্রেণীর রমণীর সাক্ষাৎ এক রমা ভিন্ন পাই না। বঙ্কিম রমাকে বড় দুঃখের, বড় কলঙ্কের দাগা দিয়া সোজা করিয়া লইয়াছিলেন। যে বাঁশ কিছু বাঁকা হইয়া জন্মে, আগুনের তাপে তাহাকে সোজা করা যায় বটে, কিন্তু যেটা বড় বেশি বাঁকা, তাহাকে সোজা ক'রতে গেলে সেটা ভাঙ্গিয়াই যায়। রমাও তাহাই সোজা হইতে গিয়া ভাঙ্গিয়া গেল।

"রমা বড় ছোট মেয়েটি, জলে ধোঁয়া যুঁই ফুলের মত বড় কোমল-প্রকৃতি" গ্রন্থকার-প্রদত্ত এই বিবরণে তিলোত্তমা ও (বিশেষতঃ) কুন্দকে মনে পড়ে। কিন্তু তিলোত্তমা বা কুন্দ এমন "ঘ্যান্ ঘ্যান্ প্যান্ প্যান্" করে না। কুন্দ একবার সাহস করিয়া ঘরের বাহির হইয়াছিল, রমার সে রকম সাহস নাই; কিন্তু সে গঙ্গারামকে রাত্রিযোগে গৃহে আনিবার জন্য যেরূপ অবিমৃষ্যকারিতাপ্রদর্শন করিয়াছিল তাহা বোধ হয় কুন্দ করিতে পারিত না; কেননা কুন্দ ত মা নহে। মাতৃত্ব ভীরুকে সাহস দেয়, দুর্ব্বলাকে বলযুক্তা করে, বোবাকে বাগ্মিনী সাজায়, পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘন করায়—কেবল নির্ব্বুদ্ধিকে বুদ্ধিমতী করিতেপারে না। তাই রমার কপালে রাজদ্রোহিতা কলঙ্কের নিশান উড়িয়াছিল। অবশ্য আবার উহাই তাহার কলঙ্কক্ষালনেরও হেতু ও উপায় হইয়াছিল।

রামায়ণের উত্তরকাণ্ড বাল্মীকির রচিত কি কার রচিত জানি না, কিন্তু সে কবি সতীকুলশিরোমণি সীতার দ্বিতীয়বার সতীত্বপরীক্ষার যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় তিনি একজন যে-সে ক্ষুদে কবি নহেন। অগ্নিপরীক্ষোত্তীর্ণা সীতা যে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দিতে স্বীকৃতা হইয়াছিলেন, তাহা কি নিজের কলঙ্কক্ষালন জন্য না পুত্রদ্বয়ের মুখ চা'হয়া? সীতার কলঙ্কিনী অপবাদ যতদিন ক্ষালিত না হইত, ততদিন রামরাজ্যের প্রজাগণের চক্ষে লবকুশ অসতীপুত্র থাকিয়া যাইতেন। তাই সীতা সভাসমক্ষে সতীত্বসম্বন্ধে শপথ করিতে সম্মতা হইয়াছেন। কিন্তু সতীর পক্ষে ঐ কার্য্য যে কিরূপ বেদনাজনক, কতদূর অপমানকর তাহা উত্তরকাণ্ডের কবি জানিতেন, তাই সীতাকে শপথ করাইতে করাইতে পাতালে প্রবেশ করাইয়াছেন—বসুধার দুহিতাকে বসুধায় লয় করিয়া দিয়াছেন। সে যাহা হউক, উত্তরকাণ্ডের কবি মাতৃহৃদয়ের ব্যথা বুঝিয়াও সে ব্যপাটুকু স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করেন নাই। কালিদাস উহা বুঝিয়াছিলেন, তাই উত্তরকাণ্ডে যেখানে দেখিতে পাই সীতা একাকিনী মহর্ষি বাল্মীকির পশ্চাৎ পশ্চাৎ সভায় আসিতেছেন,* তৎস্থলে রঘুবংশে দেখিতে পাই তিনি বাল্মীকির সঙ্গে সভায় আসিবার সময় পুত্রদ্বয়কেও সাথে করিয়া আনিয়াছেন।* কালিদাস বিশেষভাবে বুঝিয়াছিলেন কেবল পুত্রগণের সান্নিধ্যই, সীতার ন্যায় সতীতে তাদৃশ অপমান ও বেদনাজনক কার্য্যে চিত্তে বল দিতে সমর্থ। বঙ্কিম রমাকে কোন উদ্দেশ্যে—আত্মদোষক্ষালন বা

* তমৃষিং পৃষ্ঠতঃ সীতা অন্বগচ্ছদবাঙ্মুখী।
কৃতাঞ্জলির্বাষ্পকলা কৃত্বা রামং মনোগতম্॥
রামায়ণ উত্তর কাণ্ড, ১০৯ সর্গ ১০ শ্লোক।

* স্বরসংস্কারবত্যাসৌ পুত্রাভ্যামথ সীতয়া।
ঋচেবোদর্চ্চিষং সূর্য্যং রামং মুনি রুপস্থিতঃ॥
রঘুবংশ ১৫ সর্গ ৭৬ শ্লোক

পুত্রের অসতীপুত্রাপবাদ দূরীকর গোদ্দেশ্যে—সর্ব্বসমক্ষে সাক্ষ্য দিতে প্রবৃত্ত করাইয়াছেন তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না। কিন্তু ইহা স্পষ্টই দেখা যায় যে, তিনি কালিদাসের যৌবনের মর্ম্মটুকু বুঝিয়াছিলেন। রমার সাক্ষ্য দিবার পূর্ব্বে বাতায়ন হইতে সভার সমারোহ দেখাইয়া নন্দা তখন রমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কেমন এই সমারোহের মধ্যস্থানে দাঁড়াইয়া বলিতে পারিবে? সাহস হইতেছে?"

তখন রমা কি বলিতেছে শুন—

"রমা। যদি আমার স্বামীর পদে ভক্তি থাকে তবে নিশ্চয় পারিব।

নন্দা। আমরা কেহ সঙ্গে যাইব? বল ত আমি যাই।

রমা। তুমি কেন আমার সঙ্গে এ অপমানের সমুদ্রে ঝাঁপ দিবে? কাহাকে যাইতে হইবে না; কেবল একটা কাজ করিও। যখন আমার কথা কহিবার সময় হইবে, তখন যেন আমার ছেলেকে কেহ লইয়া গিয়া আমার নিকট দাঁড়ায়। তাহার মুখ দেখিলে আমার সাহস হইবে।"

ইহারই নাম মাতৃত্বগৌরব। মাতৃত্ব নারীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, মাতৃত্ব নারীর শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য, মাতৃত্ব নারীর শ্রেষ্ঠ গৌরব। বঙ্কিম মাতৃত্বমহিমা তাহার উপন্যাসগুলিতে বড় বেশি দেখান নাই; দেখাইলে সমাজের কল্যাণ হইত সন্দেহ নাই।

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্ত কবিরত্ন।

প্রেমের তরে।

যাচোনা আমারে কেহ যশ মান কান্তির কাহিনী,
যৌবনের মধুমাস—জীবনের কোহিনুর মণি;
ষোড়শীর প্রেমসুধা, মিলনের কি তৃপ্তি বিপুল—
এর কাছে অতি তুচ্ছ জগতের জয়মাল্য ফুল।

শোভে কি হে ফুলহার লোলচর্ম্ম কুঞ্চিত ললাটে?
বিশুষ্ক কুসুম রাশি সরসে কি বসন্ত সমীরে?
কিফল সাজায়ে তবে শুভ্রশির তরুণের ঠাটে?
যৌবনের অবসানে কি হইবে গৌরব জাহিরে।

চাহি নাকো যশ কভু অর্থহীন খেতাবের তরে।
প্রশংসার ধ্বনি মোর পশে যদি প্রেয়সীর কাণে,
সমুজ্জ্বল আঁখি দু'টি স্মিত হাস্যে মৌন গর্ব্বভরে
হয় যে উজ্জ্বলতর,—তাই ফিরি যশের সন্ধানে।

সেথায় খুঁজেছি যশ, পেয়েছি সে নীলিম নয়নে,
সব চেয়ে শোভে যশ সে দৃষ্টির সুস্নিগ্ধ কিরণে।
আমার গৌরব বার্ত্তা শুনি' যবে ভাতে সে নয়ন,
বুঝি সে গভীর প্রেম, ধন্য মানি জীবন স্বপন।

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী।

আয়োন্ (Ion)

[এই প্রশ্নোত্তরে প্ল্যাটো প্রমাণ করিতে চান যে, কাব্য এবং কাব্য গীতি একটা শিখিবার এবং শিখাবার মত শিল্প নহে; ইহা একটা দৈবী প্রেরণা। অবশ্যই এই প্রেরণা সম্বন্ধে গ্রীকদের এবং প্ল্যাটোর নিজের মত যে খুব উচ্চ ছিল, এমন মনে হয় না; কেননা ইহা জ্ঞানের পরিপন্থী।]

(সোক্রেটিস্ ও আয়ন)

সো ঃ—আয়ন্ যে; ভাল আছ তো? তুমি এখন কোথা থেকে আমাদের এখানে এলে? তোমার আপন দেশ 'ইফেসস্' থেকে নাকি?

আ ঃ—না, সক্রেটিস! আমি আসছি 'এপিডরস্' নগরে 'এসক্লিপিয়সে'র উৎসব থেকে।

সো :—'এপিডরসের' লোকেরা দেবতাকে চারণ-কবিদের * দ্বন্দ্ব দেখায় নাকি ?

আ :—নিশ্চয়ই ; এবং অন্যান্য সঙ্গীতও থাকে।

সো :—তবে কি তুমিও সে লড়াইয়ে আমাদের হ'য়ে যোগ দিয়েছিলে নাকি ? তা—আমাদের কেমন হ'লো ?

আ :—পুরস্কারের প্রথম ক'টি যে নিয়ে এসেছি, সোক্রেটিস।

সো :—বেশ কথা ; দেখো যেন পোন্—এথিনিয়ার (২) উৎসবেও আমরা জয়লাভ করতে পারি।

আ :—দেবতার ইচ্ছা হলে, তা বোধ হয় হবে।

সো :—তোমাদের চারণদের এই বিদ্যার জন্যে আমি তোমাদিগকে কতবার হিংসা করেছি, আয়ন। তোমাদের এই বিদ্যার জন্য তোমাদের দেহটীকে সর্ব্বদাই সুন্দর করে সাজিয়ে রাখতে হয়, আর সকলের চেয়ে সুন্দর যারা তাদের মত তোমাদিগকে দেখাতে হয়, আর সর্ব্বদাই বাধ্য হয়ে তোমাদিগকে অন্যান্য বহু সৎকবিদের সঙ্গে মিশতে হয়—বিশেষ ক'রে কবিদের মধ্যে সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং সকলের চেয়ে ঐশী-শক্তি সম্পন্ন 'হোমরের' সঙ্গে ; আর তোমাদিগকে যে খুব যত্ন ক'রে শিখতে হয়—শুধু ইহার বাক্যগুলি নহে, ইহার অন্তর্নিহিত ভাবটী, এইটী বাস্তবিকই ঈর্ষ্যার বিষয়। কেননা কবির উক্তিগুলি ভাল করে না বুঝিলে কেউ কখনও ভাল চারণ হতে পারে না। চারণ হলেন শ্রোতাদের কাছে কবির মনের কথার ব্যাখ্যাতা। এইটী ভাল ক'রে করতে হলে কবি কি বলেন তা না জানিলে চলে না। এই সকল বাস্তবিকই ঈর্ষ্যা করার মত জিনিষ।

আ :—ঠিক্ বলেছ, সোক্রেটিস ; আমাদের কলাবিদ্যার মধ্যে এই ভাব প্রকাশটি যে সকলের চেয়ে কঠিন কাজ, তা আমারও মনে হয় ; আমার মনে হয়, আমি হোমরের সম্বন্ধে সকলের চেয়ে ভাল করে বলতে পারি ; 'ল্যাম্পসাকুসে'র মেট্রোডরস্ (৩) কিংবা 'থেসসের' 'ষ্টেসিমব্রটস্' (৪) কিংবা 'গ্লকন' (৫) অথবা অন্য যে সব চারণ জন্ম গ্রহণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ এত করে এবং এত সুন্দর করে 'হোমরের' ব্যাখ্যা করতে পারেন নি, যেমনটী আমি পারি।

সো :—শুনে সুখী হ'লুম, আয়ন ; তাহলে, আমার বিশ্বাস, তোমার ব্যাখ্যা আমাকে শোনাতে তোমার আপত্তি হবে না।

আ :—নিশ্চয়ই নয় ; আর হোমারকে আমি কেমন করে সাজিয়েছি, তা একবার শোনে তোমার পক্ষে বোঝা উচিতও বটে। আর—আমার মনে হয় হোমারের ভক্তদের (৬) দ্বারা আমি সোণার মুকুটে মণ্ডিত হ'বার যোগ্য।

সো :—আচ্ছা, আমি অন্য এক সময়ে অবসর ক'রে তোমার আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা শোনব। সম্প্রতি আমার এই কথাটীর উত্তর দেও ;—তুমি কি কেবল হোমর সম্বন্ধে পটু, না, হেসিয়ডস্ এবং

---

* মূলে র‍্যাপ্সোডস্ (Rhapsodos) আছে। ইঁহারা উৎসবাদিতে হোমারের কবিতা আওড়াইতেন। যাঁহার আবৃত্তি ভাল হইত, তিনি পুরস্কৃত হইতেন।

(২) এথেন্সের একটী প্রসিদ্ধ উৎসব।

(৩) একজন প্রসিদ্ধ চারণ, যিনি হোমরের কাব্যকে রূপক হিসাবে ব্যাখ্যা করিতেন।

(৪) প্রসিদ্ধ চারণ।

(৫) ঐ

(৬) মূলে (Homerides) হোমারিডিস্ আছে। হোমারের তথাকথিত বংশধর (Chios) কীয়স দ্বীপের এক কবিসম্প্রদায়কেও এই নামে অভিহিত করা হয়।

আর্কিলখস্ (৭) সম্বন্ধেও তোমার যোগ্যতা আছে?

আ:—না, কেবল হোমার সম্বন্ধেই আমি পটু; আমার ত মনে হয়, ইহাই যথেষ্ট।

সো:—এমন কি কিছু আছে, যার সম্বন্ধে হোমার এবং হিসিয়ড একই কথা বলেন?

আ:—আছে বৈ কি, অনেক বিষয়ে।

সো:—সে সকল বিষয়ে কোনটি তুমি ভাল করে ব্যাখ্যা কর্‌তে পার—যা হোমার বলেছেন, না, যা হিসিয়ড বলেছেন?

আ:—যেখানে উভয়ে একই কথা বলেছেন, সেখানে ত উভয়কেই সমান ভাবে ব্যাখ্যা কর্‌তে পারি, সোক্রেটিস।

সো:—যেখানে উভয়ে এক কথা বলেন নি, সেখানে কি? যেমন, নিমিত্তজ্ঞান সম্বন্ধে হোমারও কিছু বলেছেন এবং হিসিয়ডও।

আ:—তা'ত বটেই।

সো:—তা হ'লে? নিমিত্ত বিদ্যা সম্বন্ধে এই দুই জন কবি, যে সকল বিষয়ে একই কথা বলেছেন এবং যে সকল বিষয়ে ভিন্ন কথা বলেছেন, সে সকলের ব্যাখ্যা তুমিই কি ভাল করবে, না, নিমিত্তদর্শীদের মধ্যে বিশিষ্ট কেহ ভাল করবে?

আ—নিমিত্তদর্শীদের মধ্যে কেহ।

সো—আচ্ছা, তুমি যদি একজন নিমিত্তদর্শী হ'তে, তা হ'লে, যে সকল বিষয়ে হোমার এবং হিসিয়ড একই কথা বলেছেন, সে গুলি যে ব্যাখ্যা কর্‌তে পার্‌তে, শুধু তা নয়; যে সকল বিষয়ে উভয়ে ভিন্ন মত, সে সকলও ব্যাখ্যা কর্‌তে সমর্থ হ'তে—নয় কি?

আ—অবশ্যই।

সো—তা হ'লে, তুমি যে কেবল হোমার সম্বন্ধেই পটু, হিসিয়ড্ সম্বন্ধে নও—অন্যান্য কবিদের সম্বন্ধেও নও—সে কিরূপ? অন্য সকল কবিরা যে সকল বিষয় বলেছেন, হোমার কি তাহা হইতে ভিন্ন বিষয়ে বলেছেন? তিনি কি যুদ্ধ সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন নাই? এবং সমাজে সৎ ও অসৎ লোকদের পরস্পর মেলামেশা সম্বন্ধে এবং অশিল্পী ও শিল্পীদের মেলামেশা এবং দেবতাদের পরস্পর এবং মানুষের সঙ্গে মেলামেশা—যেমনটী তাঁরা করে থাকেন—এবং স্বর্গের ও নরকের সুখ দুঃখের কথা—এবং দেবতাদের ও মহাপুরুষদের (৮) উৎপত্তির কথা? হোমার যে কাব্য রচনা করেছেন, এ সকলই কি তার উপাদান নয়?

আ—ঠিক বলেছ, সোক্রেটিস্।

সো—অন্য কবিরা কি বলেছেন? ঠিক এই সকল বিষয়ই নয় কি?

আ—হাঁ; কিন্তু, সোক্রেটিস্, ঠিক হোমারের মত নয়।

সো—কেমন তবে? হোমারের চেয়ে মন্দ?

আ—অনেক নিকৃষ্ট।

সো—আর, হোমার অবশ্যই উৎকৃষ্ট।

আ—তার কি আর কথা আছে?

সো—আচ্ছা, হে আমার প্রিয়বন্ধু (৯) গণিত সম্বন্ধে যদি কখনও আলোচনা হয়, আর, একজন যদি সকলের চেয়ে ভাল বল্‌তে পারেন, তা হ'লে, তাঁকে যে কেহ চিনে নিতে পারে না কি?

আ—স্বীকার করি।

সো—নিকৃষ্ট বক্তাদের যিনি চিনিবেন, তিনি কি সেই একই ব্যক্তি হবেন, না, আর একজন?

---

(৭) দুইজন কবি।

(৮) মূলে হিরোস্ (Heros) আছে, যাহা হইতে ইংরেজী *hero* কথাটী আসিয়াছে। ইহার অর্থ অনেকটা আমাদের পৌরাণিক বীরদের অনুরূপ।

(৯) মূলে *Kephale* আছে—তার অর্থ 'মস্তক'।

আ—একই ব্যক্তি।

সো—তিনি কি স্বয়ং গণিতজ্ঞ হইবেন না?

আ—হবেন বই কি?

সো—তা হ'লে? যদি কখনও ভাল খাদ্য কোন্‌গুলি সে সম্বন্ধে বিচার হয়, আর কোনও একজন যদি সকলের চেয়ে ভাল বলেন, তা হ'লে, ভাল যে বলিল, তাকে কি একজন বুঝিবে, আর মন্দ যে বলিল, তাকে বুঝিবে আর একজন—না, একই ব্যক্তি উভয়কেই চিনিতে পারিবে?

আ—এত স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে, একই ব্যক্তি উভয়কেই বুঝিতে পারিবে।

সো—কে সে? কি তার নাম?

আ—বৈদ্য।

সো—সাধারণ ভাবে, তা হ'লে, আমরা কি একথা বল্‌তে পারি না যে, যখন কোন বিষয়ে আলোচনা হয়, এবং বহু লোকে মন্তব্য প্রকাশ করে, তখন কে ভাল বল্‌ছে, আর কে মন্দ বল্‌ছে, তাহা সর্ব্বদাই একই ব্যক্তি বুঝ্‌তে পারবে? কারণ, স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে, যে মন্দ বক্তাকে চিন্‌তে পারে না, সেই একই বিষয়ে ভাল বক্তাকেও সে চিন্‌তে পার্‌বে না—নয় কি?

আ—তা ত বটেই।

সো—একই জন উভয় বিচারেই সমর্থ, নয় কি?

আ—হাঁ।

সো—আচ্ছা, তুমি কি বল্‌ছ না, যে হোমার এবং অন্যান্য কবিরা—যাঁদের মধ্যে হিসিয়ড্‌ ও আর্খিলখস্‌ও রহিয়াছেন—একই বিষয়ে লিখেছেন, অথচ একই রকম যে লিখেছেন, তা নয়,—হোমার লিখেছেন উৎকৃষ্ট আ . অন্যেরা নিকৃষ্ট?

আ—ঠিকই তো বলেছি।

সো—তা হ'লে, যদি তুমি উৎকৃষ্ট কবিকে বুঝিতে পার, তবে নিকৃষ্ট কবিদিগকেও তোমার বুঝা উচিত—অন্ততঃ তারা যে নিকৃষ্ট, এইটুকু।

আ—সে রকমই ত মনে হয়।

সো—তা হ'লে, ভাই, যদি আমরা বলি যে, আয়োন্ হোমার এবং অন্যান্য কবিদের সম্বন্ধেও একজন সুপটু চারণ, তবে নিশ্চয় আমরা ভুল করব না, কেন না, আয়োন নিজেই স্বীকার করছেন যে, যাঁরা সকলেই এক বিষয়ে কাব্য লিখেছেন, তাঁদের সম্বন্ধে তিনি একজন সুযোগ্য সমালোচক; আর, কবিরা ত প্রায় সকলেই একই বিষয়ে কাব্য লিখে থাকেন।

আ—কিন্তু এর কারণ কি, সোক্রেটিস্; যখন কেউ অন্য কোন কবির কথা তোলে, তখন তাতে আমার মন বসে না এবং উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু বল্‌তে পারি না এবং বেকুবের মত ঝিমুতে থাকি,—আর, যেই কেহ হোমারের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, অম্‌নি যেন আমার ঘুম ভেঙে যায়, মন স্থির হয় এবং কি বল্‌তে হবে, সবই ঠিক বুঝ্‌তে পারি?

সো—এটা বুঝানো কিছুই শক্ত নয়, ভাই; এটা সকলের কাছেই স্পষ্ট যে, হোমার সম্বন্ধে কলাশিল্প এবং জ্ঞানের দিক্ হইতে তুমি কিছু বলিতে অসমর্থ। যদি শিল্পে তুমি পটু হইতে, তা হইলে সকল কবিদের সম্বন্ধেই তুমি পটু হইতে; কাব্যকলা একটী অখণ্ড জিনিস; নয় কি?

আ—হাঁ।

সো—অন্য কোন বিদ্যা যদি কেহ সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে থাকেন, তবে সমস্ত বিদ্যা সম্বন্ধেই কি একই বিচার পদ্ধতি দাঁড়াবে না? কেমন বল্‌ছি এ কথা, কেউ আমার কথা শুন্‌তে চাবে কি? আয়োন?

আ—দোহাই দেবতার, আমি ত নিশ্চয়ই; তোমাদের পণ্ডিতদের কথা শোন্‌তে আমার বড়ই ভাল লাগে।

সো—আমার ইচ্ছা হয়, আয়োন, তুমি সত্য কথা কইতে (সত্য সত্যই আমাকে পণ্ডিত বল্‌তে পার্‌তে); কিন্তু পণ্ডিত তো তোমরা, চারণ এবং নটেরা, এবং যাঁদের কাব্য তোমরা গান কর সেই কবিরা; আমি সত্য ভিন্ন আর কিছু বলি না,—সাধারণ লোকের পক্ষে যেমন উচিত। তার পর, যে কথা তোমায় এখন জিজ্ঞাসা করছিলাম, দেখ দেখি, যা আমি বলেছি সেটা কত ক্ষুদ্র এবং সামান্য বিষয় এবং যাহা যে কোন ব্যক্তির জানা উচিত; অর্থাৎ যখন কেহ কোন বিদ্যার সমস্তটা আয়ত্ত করে; তখন সে বিদ্যার (ভাল মন্দের) বিচার একই। এই সম্বন্ধে আর একটু চিন্তা করা যাক্। চিত্রবিদ্যা একটী অখণ্ড শিল্প ?

আ—হাঁ।

সো—আচ্ছা, (বর্ত্তমানে এবং অতীতে) বহু চিত্রকর আছেন এবং ছিলেন, ভাল এবং মন্দ ?

আ—অবশ্যই।

সো—এ পর্য্যন্ত এমন কাউকে তুমি দেখেছ কি, যে আগ্লাওফন্ (Aglaophon) এর পুত্র পলিউগ্নটস্ (Polygnotus) সম্বন্ধে বিচারপটু—সে কোন্ ছবিটী ভাল এঁকেছে, কোন্‌টী মন্দ এঁকেছে, তা দেখাতে পারে—অথচ অন্য চিত্রকরদের সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারে না ? এবং যখন কেহ অন্য চিত্রকরদের চিত্রসমূহ তাকে দেখায়, তখন তার চক্ষু মুদ্রিত হ'য়ে আসে, মাথা ঘুরে যায়; এবং কি বলিবে, কিছুই ঠিক পায় না; অথচ, যখন পলিউগ্নটসের—কিংবা চিত্রকরদের মধ্যে অন্য যাহার সম্বন্ধে সে নিজেকে সুবিজ্ঞ মনে করে, তাহার—চিত্রসম্বন্ধে তাহাকে কোন মত প্রকাশ করিতে হয়, তখন অমনি তাহার তন্দ্রা দূরে যায়, এবং হঠাৎ সে একেবারে বিজ্ঞ হ'য়ে উঠে ?

আ—না, ভাই, দেবতার নামে বল্‌ছি, এমনটী কখনও দেখি নাই।

সো—তবে ? ভাস্কর বিদ্যায় এমন কাউকে জান, যে মেটিয়নের পুত্র ডেইডিলস্ কিংবা পেনোপিউসের পুত্র এপাইউস্ কিংবা সেমস্‌বাসী থিওডোরস্ অথবা অন্য কোন একজন ভাস্কর সম্বন্ধে বিচারপটু এবং তার কোন্ মূর্ত্তিগুলি ভাল হ'য়েছে তাহা বুঝাতে পারে, কিন্তু অন্যান্য ভাস্করদের শিল্প সম্বন্ধে একেবারে হতবুদ্ধি—সে সকলের নামে তাহার চক্ষু বুঁজে আসে এবং কি বল্‌বে, খুঁজে পায় না ?

আ—না, দেবতার নামে শপথ করে বল্‌ছি, এমনটী কখনও খুঁজে পাই নি।

সো—বেশ; তা হ'লে আমার মনে হ'চ্ছে, বাঁশীতে নয়, কিংবা বীণাতে নয়, কিংবা বীণাসঙ্গীতেও নয়, কিংবা চারণ-গীতিতেও নয়—কুত্রাপি তুমি এমন কাউকে দেখনি যে শুধুই অলিউম্পসের * (Olympus) দোষ গুণই বিচার করিতে পারে, কিংবা থেমুরস্ * (Thamyrus) এর কিংবা অরফিউস্ (Orpheus) * কিংবা ইথাকার চারণ কবি ফিমিউস্-এর দোষ গুণ বুঝে, অথচ এফেসস্ এর চারণ আয়োন সম্বন্ধে বিচারে একেবারে অপটু—সে ভাল গায় কি মন্দ গায়, কিছুই ঠিক করতে পারে না ?

আ—দেখ সোক্রেটিস্ তোমার এই কথার বিরুদ্ধে আমি কিছু বল্‌তে পারছি না। কিন্তু আমার নিজের ভিতরে এটা আমি স্পষ্টই বুঝ্‌ছি যে, হোমার আমি সকলের চেয়ে ভাল গাই, এবং কিছুতেই আমার আট্‌কায় না, এবং অন্যেও সকলেই স্বীকার করে যে আমি গাই ভাল; অথচ অন্য কবিদের বেলায় আমি মোটেই পটু নই। এখন বিচার করে দেখ, এর মানে কি ?

---

* গ্রীকদের পুরাণ প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। কবি ও গায়ক এবং বাদক।

সো—আচ্ছা, দেখছি, আয়োন; এবং আমার কাছে এর মানে যা মনে হয়, তাই তোমাকে দেখাতে অগ্রসর হচ্ছি। এই যে হোমার সম্বন্ধে ভাল গাইবার তোমার শক্তি, এটা একটা শিল্প নয়—একটা শিখবার মত বিদ্যা নয়; যা বলতে চাচ্ছিলুম, এটা একটা দৈবী শক্তি যা তোমাকে প্রেরিত করে—যেমনটা সেই পাথরে রয়েছে যাকে ইউরিপিডিস্ চুম্বক (Magnet's) নামে অভিহিত করেছেন, এবং যাকে বেশীর ভাগ লোকেই হিরাক্লিয়ার পাথর ব'লে থাকে। সেই পাথর কেবল যে লোহার আংটী গুলি আকর্ষণ করিতে পারে এমন নয়, সেগুলিতে এমনই শক্তি সঞ্চারিত করিয়া দেয় যাতে তারা পাথরটীর মতন কাজ করতে পারে এবং অন্য আংটী আকর্ষণ করতে পারে—যাতে কখনও কখনও পরস্পর হইতে লম্বমান লোহা এবং আংটীর একটা দীর্ঘ শিকল ঝুলান গিয়া থাকে। সে সকলেরই ভিতরে (আকর্ষণের) শক্তিটী ঐ এক পাথর হইতেই সঞ্চারিত হইয়া থাকে। সেইরূপ সঙ্গীত সরস্বতীও (মূলে Mousa = Muse) নিজে কোন কোন ব্যক্তিকে দেবাবেশে আবিষ্ট * করিয়া থাকে, এবং তাদের দ্বারা আবিষ্ট আরও অন্যান্য ব্যক্তি দ্বারা একটা শিকলি নির্ম্মিত হ'য়ে থাকে। মহাকাব্যের সমস্ত সৎকবিরাই শিল্প-শিক্ষা দ্বারা নয়, পরন্তু দেবাবিষ্ট এবং দেবপ্রেরিত (মূল, Katechomenoi = Engl. *possessed*) হ'য়েই সেই সকল ভাল ভাল কাব্য রচনা করে গিয়েছেন, গীতি কাব্যের সৎকবিরাও তেমনই;—যেমন কুবেলী দেবীর (Kybele) নৃত্যপরায়ণ পুরোহিতেরা (মূল—Korybantes) প্রকৃতিস্থ থেকে নৃত্য করে না—সেইরূপ গীতিকাব্যের ভাল কবিরাও প্রকৃতিস্থ থেকে সেই সকল সুন্দর গীতি রচনা করেন না, পরন্তু যখন কোন সঙ্গীত এবং ছন্দে তাঁরা প্রবেশ করেন, তখন তাঁরা নেশায় বিভোর এবং আবিষ্ট থাকেন; যেমন আবিষ্ট হ'য়ে ডিয়োন্যুসের উপাসিকারা নদী হইতে মধু ও দুগ্ধ টেনে তোলে, পরে সুস্থ হ'য়ে তা পারে না, তেমনই গীতিকাব্যদের চিত্তটী ও এই প্রকার করে থাকে;—এমনটী ওঁরা নিজেরাই বলে থাকেন। কবিরা বোধ হয় আমাদের কাছে বলে থাকেন যে, সঙ্গীত সরস্বতীর উদ্যানবিশেষ এবং উপত্যকা হইতে মধুবাহী উৎস সমূহ হইতে মক্ষিকার মত—এবং তাদেরই মত উড্ডীয়মান হয়ে—তাঁরা সঙ্গীতসমূহ সংগ্রহ করে আমাদের জন্য আনয়ন করেন। এবং (একথা ইহাঁরা) ঠিকই বলে থাকেন। কারণ, কবি একটী হাল্কা এবং পক্ষযুক্ত এবং পবিত্র জিনিস এবং দেবাবিষ্ট হওয়ার আগে এবং অপ্রকৃতিস্থ না হইয়া—এবং মনটী তার আত্মহারা না হইলে—কাব্য রচনা সে করিতে পারে না। এ অবস্থা প্রাপ্ত না হইলে প্রত্যেকেই শক্তিহীন এবং দৈববাণী আর তাহার মুখ থেকে বেরোয় না। বিবিধ বিষয়ে যে নানা কথা বলে থাকেন—নানা সুন্দর কাব্য রচনা করে থাকেন—তুমি যেমন হোমার সম্বন্ধে ক'রে থাক—সেটা শিল্পের সাহায্যে নয়, পরন্তু একটা দৈব শক্তির সাহায্যে, কেবল সেই টুকুই প্রত্যেকে ভাল করে করতে পারেন, যার দিকে সঙ্গীত সরস্বতী তাঁকে প্রেরিত করেন;—কেউ বা ডিথুরাম্ব (Dithyramb) ছন্দে, কেউবা প্রশস্তি গীতির (Encomia) ছন্দে, কেউ বা নট গীতির (Hyporchema) ছন্দে,

* মূলে আছে entheous = en (in) + Theos (god). ইহা হইতে আর একটী শব্দ হয় enthousia = en + Theos + ousia (= English, enthusiasm). বাংলা অর্থ 'দেবাবেশ।'

কেউবা মহা কাব্যের ছন্দে, আর কেউ বা আয়াম্বস্ ছন্দে। যে যেটা পারেন, সেইটাই শুধু ভাল পারেন--বাকী গুলিতে একেবারে অপটু। কেননা এও তাঁরা শিল্পের সাহায্যে করেন না, একটা দৈব শক্তির সাহায্যে করেন, যেহেতু, যদি ইহা শিল্প জ্ঞানের মত হইত, তবে কোনও একটী বিষয় সম্বন্ধে ভাল কাব্য রচনা করিতে জানিলে সকল গুলি সম্বন্ধেই ওঁরা ভাল পারতেন। এই জন্যই বল্ছি, দেবতা ওঁদের মনটীকে বাহির করে নেন এবং ওঁদিগকে তাঁর হাতের পুতুল (মূল, Hyperetes=সেবক) রূপে ব্যবহৃত করেন—শুধু এঁদিগকে নয়, ভবিষ্যদ্বক্তা এবং দৈববাণীর প্রবক্তাদিগকেও তিনি তেমনই করে থাকেন; যাতে করে, আমরা, যারা এঁদের কথা শুনি তারা, যেন বুঝ্তে পারি যে, যাঁরা এত মূল্যবান্ এত সব কথা বলেন তাঁরা এ সকল ব্যক্তিরা নিজেরা না——কেন না এঁদের চিত্ত স্বস্থ নয়—কিন্তু দেবতা স্বয়ং এ সকলের বক্তা এবং তিনি ইহাদের ভিতর দিয়া আমাদের সঙ্গে কথা বলে থাকেন। এ বিষয়ে খালকিডিয়ার্ (Chalcideus) টুনিখস্ (Tynnichas) * একটী প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইনি কখনও আর এমন কিছুই লেখেন নি'যার দরুণ লোকে তাঁকে মনে রাখত—কিন্তু সেই গানটী যেটী সকলেই গেয়ে থাকে বোধ হয় সকল গানের সেরা সেটী—সত্য সত্যই সেটী, তার নিজের কথায়, সঙ্গীত সরস্বতীর একটী আবিষ্কার। আমার মনে হয় এই প্রকারে দেবতা স্পষ্টতঃই আমাদিগকে বুঝাচ্ছেন যেন আমরা সন্দেহ না করি, যে, ঐ সকল সুন্দর কাব্য মানুষকৃত নহে এবং মানুষেরও নহে, কিন্তু দৈব এবং দেবতাদের—আর, কবিরা দেবতাদের ব্যাখ্যাকার ভিন্ন আর কিছু নহেন, যাঁদের কোন একটী কর্ত্তৃক কবিদের প্রত্যেকই আবিষ্ট হয়ে থাকেন। এইটুকু স্পষ্ট দেখাবার জন্যেই দেবতা নিকৃষ্টতম কবিটী দ্বারা উৎকৃষ্টতম গানটী গাইয়েছিলেন। না, তোমার কাছে সত্য বল্‌ছি বলে মনে হয় না, আয়োন?

আ—হাঁ, শপথ করে বল্‌ছি, আমার কাছে সত্যই বোধ হচ্ছে। তোমার কথাগুলি, সোক্রেটিস্, আমার চিত্তকে স্পর্শ করছে এবং আমার মনে হচ্ছে ভাল কবিরা একটা দৈব শক্তির সাহায্যেই দেবতাদের মনোভাব প্রকাশ ক'রে থাকেন।

সো—আর, তোমরা চারণেরাও কি কবিদের ব্যাখ্যাতা নও?

আ—এটাও সত্যই বলছ।

সো—তা হ'লে তোমরা ব্যাখ্যাতার ব্যাখ্যাতা হ'লে?

আ—অবশ্যই।

সো—সত্য ক'রে ব'লো—কিছুই গোপন ক'রো না—আয়োন, তোমায় একটী কথা জিজ্ঞাসা করছি;—যখন তুমি বেশ ভাল করে কাব্য গান কর এবং যাতে দর্শকদের * মন অভিভূত করে তোল,—যেমন, ওডিউস্যসের কথা যখন তিনি দরজার ধারে লাফিয়ে পড়লেন এবং তাঁর পত্নীর প্রেমাকাঙ্ক্ষীরা তাঁকে চিনে ফেল্‌ল এবং যখন তিনি তাঁর বাণগুলি পায়ের কাছে ছুঁড়ে ফেল্‌লেন—কিংবা এখিলিস যখন হেক্‌টরকে তাড়া করছেন, সে বিষয়—কিংবা এণ্ড্রোমাখির করুণ কথা কিংবা হেকাবির সম্বন্ধে কিংবা প্রায়ামের কথা—এই সকল বিষয়ে যখন গাও, তখন কি প্রকৃতিস্থ থাক, না, আত্মহারা হ'য়ে যাও;—আর তোমার মনটীও কি আবিষ্ট হ'য়ে যাদের সম্বন্ধে যখন তুমি গাও সেই সেই বস্তু বা ব্যক্তির সন্নিহিত

* ইহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা নাই।

* চারণদের গানের সঙ্গে নৃত্যাদিও থাকিত।

হয়ে পড়ে না—কখনও বা ইথাকায়, কখনও বা ট্রয়ে, অথবা যেমন যেমন কাব্যে থাকে?

আ—সোক্রেটিস্, তোমার এই কথাটী আমার খুব মনে লাগছে। তোমায় কিছুই গোপন না করে বলছি। যখন আমি কোন দুঃখের কাহিনী গাই, তখন আমার চোখ দুটী জলে ভরে আসে; আর যখন ভয়ঙ্কর কিংবা সাহসিক কিছু গাই, তখন ভয়ে আমার রোমগুলি শিহরিয়া উঠে এবং হৃদয় কাঁপিয়া উঠে।

সো—এখন তবে? আয়োন, যে ব্যক্তি নানাবর্ণের পোষাকে এবং সোণার মুকুটে মণ্ডিত হ'য়েও, বলি এবং উৎসবের মধ্যেও—এ সকলের কিছুতেই বঞ্চিত না হ'য়েও—বিশ হাজার মিত্রভাবাপন্ন লোকের মাঝ খানে—কেউ তার কোন কিছু কেড়ে না নিলেও কিংবা কোনরূপে তার প্রতি অন্যায় না কর্‌লেও—কেঁদে আকুল হয় কিংবা ভয়ে বিহ্বল হয়, সেই প্রকার ব্যক্তিকে কি আমরা প্রকৃতিস্থ বল্‌ব?

আ—না, সোক্রেটিস্, সত্য বলিতে গেলে নিশ্চয়ই নয়।

সো—তুমি জান কি, যে, দর্শকদের মধ্যে অনেককেও তোমরা এই প্রকারই করে তোল?

আ—অবশ্যই জানি। মঞ্চের উপর থেকে আমি সর্ব্বদাই, লক্ষ্য করে দেখি, যখন যখন যেমন আমি বলি, তেমনই সঙ্গে সঙ্গে কখনও বা ইহঁারা কাঁদছে, কখনও বা দৃঢ় চিত্ত দেখাচ্ছে, কখনও বা আশ্চর্য্যান্বিত হচ্ছে। আমাকে বিশেষ করে এদের প্রতি দৃষ্টি রাখ্‌তে হয়। কেননা, যদি আমি ইহাদিগকে কাঁদাতে পারি, তবে পুরস্কার লাভ করে স্বয়ং হাসিতে পাইব; আর যদি এদিগকে হাসাইয়া তুলি, তবে পুরস্কারটী হারাইয়া নিজে কাঁদিব।

সো—এখন বুঝ্‌তে পাচ্ছ, আমি যে সকল আংটার কথা বলেছিলাম—যারা হেরাক্লিয়ার পাথর (চুম্বক) হ'তে পরস্পর (আকর্ষণী) শক্তি গ্রহণ করে থাকে,—তাদের সর্ব্বশেষটী হচ্ছেন এই দর্শক? আর, মধ্যবর্ত্তী আংটাটী চারণ এবং নট তুমি; আর প্রথমটী কবি স্বয়ং। আর দেবতা ইহাদের ভিতর দিয়া মানুষের মনকে যখন যেদিকে খুসী টানিয়া লন, এবং এক হইতে অন্যেতে শক্তিটী সঞ্চারিত করে দেন। আর যেমন চুম্বক পাথরের বেলায়, তেমনই এখানেও, সঙ্গীত সরস্বতীর পার্শ্বদেশ হইতে দোলায়মান অঙ্গুরী স্বরূপ নর্ত্তক, নৃত্য শিক্ষক, নৃত্যশিক্ষকের সহায়ক প্রভৃতি সকলকে লইয়া চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত এক দীর্ঘ শৃঙ্খল তৈরি হয়। কবিদের এক এক জন আবার সঙ্গীতের এক এক মূর্ত্তি হইতে লম্বমান থাকেন—তার মানে, এক এক মূর্ত্তি দ্বারা আবিষ্ট হয়েন। আর এটাও সত্য যে, শৃঙ্খলের সেই প্রথম অঙ্গুরীয়ক এই কবিদিগেরও আবার এক এক জন হইতে অন্যে লম্বমান থাকে—ইঁহাদের এক এক জন দ্বারা এক একজন আবিষ্ট থাকে—কেউ বা অরফিউস্ (Orpheus) হইতে, কেউ বা মৌসায়স্ (Mousaios) হইতে লম্বমান—আর বেশীর ভাগই হোমার কর্ত্তৃক আবিষ্ট এবং অভিভূত। ইহাদের মধ্যে তুমিও একজন, আয়োন্, এবং তুমি হোমারের ভাবে আবিষ্ট; এবং যখন কেহ অন্য কোন কবির গান গায়, তখন তোমার ঘুম আসে এবং কি বল্‌বে কিছুই খোঁজ পাও না; আর যখন কেহ ইহার গান গায়, তখন অমনি তোমার জাগরণ আসে এবং চিত্ত তোমার নেচে উঠে এবং কি গাইতে হবে সবই ঠিক পাও। হোমার সম্বন্ধে তুমি যা বল, তাহা শিল্পের সাহায্যে বলনা, জ্ঞানের সাহায্যেও নয়, কিন্তু দৈবী শক্তিতে এবং দেবাবেশে; যেমন কুবেলী দেবীর উপাসকেরা যে দেবতা দ্বারা আবিষ্ট—সেই দেবতার সম্পর্কীয়

সীসক খণ্ডের মত সে সমুদ্রের অতল তলে তলাইয়া গেল।"

—এই সকল যা হোমার বলছেন, তা ঠিক বলছেন কিনা, তা (কোন) বিদ্যার বিচার্য্য বলব—ধীবর বিদ্যার না চারণ বিদ্যার?

আ—এত, সোক্রেটিস, স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, যে—ধীবর বিদ্যা।

সো—ধর এখন, তুমিই যেন প্রশ্ন করছ আর আমায় জিজ্ঞাসা করছ;—"এ পর্য্যন্ত, সোক্রেটিস্, হোমারেতে এই সকল শিল্পের প্রত্যেকটীতে যা যা জানা প্রয়োজন, তাই তুমি দেখে আস্‌ছ; এখন এস, একবার আমায় বার ক'রে দেখাও দেখি, ভবিষ্যবক্তা এবং তার শিল্পের বিষয় হোমার যা বলেছেন—সেই সকল বিষয়—যে সকল বিষয় বিচার কর্‌তে ভবিষ্যবক্তাকে যোগ্য হ'তে হয় এবং জান্‌তে হয়, সে গুলি ভাল হ'ল কি মন্দ হ'ল।" (এই যদি তুমি জিজ্ঞাসা কর, তা হ'লে) দেখ, কত সহজে এবং অব্যর্থভাবে আমি তোমায় জবাব দিচ্ছি। (এ বিষয়ে হোমার) অনেক বারই ওড্যাসিয়াতে বলেছেন—যেমন সেই সকল কথা যা, মেলাম্পাস্ (Melampus) এর বংশধর ভবিষ্যবক্তা থিওক্লুমেনস্ (Theoclymenus) পারিণয়ার্থীদিগকে লক্ষ্য ক'রে বল্‌ছেন—

"হে হতভাগাগণ! তোমাদের কি হইয়াছে? নিশার অন্ধকার যেন তোমাদের মস্তক, তোমাদের মুখ এবং সমস্ত নিম্নাঙ্গ ঢাকিয়া রাখিয়াছে; তোমাদের আর্ত্তনাদ চারিদিক বিদীর্ণ করিতেছে; গণ্ডদেশ অশ্রুজলে ভাসিয়া যাইতেছে। নরকের (Erebus) অন্ধকারের নীচে ধাবমান প্রেতমূর্ত্তিতে (গৃহের) দ্বারদেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে; প্রাঙ্গণও তেমনই পূর্ণ; আকাশের সূর্য্য লোপ পাইয়াছে এবং এক অমঙ্গল্য কুহেলিকা চারিদিকে ছুটিয়া চলিয়াছে।"

ইলিয়ডেও এই প্রকার অনেক পঙ্‌ক্তি আছে,—যথা, প্রাচীরের নিম্নে যুদ্ধের বর্ণনায়। সেখানে তিনি বল্‌ছেন;—

"যখন তারা পরিখা পার হইতে অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল, তখন তাহাদের নিকট একটী শাকুনিক লক্ষণ উপস্থিত হইল; ঊর্দ্ধে উড্ডীয়মান একটী ঈগল পাখী লোকগুলিকে বামদিকে সরাইয়া স্থির রাখিয়া এবং নখে করিয়া একটী ভীষণ রক্তবর্ণ নাগ (Drakon=dragon) বহন করিয়া (দেখা দিল); (সেই সর্পটী) তখনও জীবিত,—তখনও হাঁপাইতেছিল; এবং তখনও যুদ্ধ হইতে বিরত হয় নাই। এবং পশ্চাদ্দিকে বাঁকিয়া যে তাহাকে গলায় ধরিয়া বুকের নীচে করিয়া নিয়া যাইতেছিল, তাহাকে (সেই ঈগল পাখীকে) আঘাত করিতেছিল; যন্ত্রণায় অভিভূত হইয়া পাখীও তাহাকে মাটীর দিকে ছাড়িয়া দিল এবং সেই জনতার মাঝখানে ছুড়িয়া ফেলিল; আর স্বয়ং শব্দ করিতে করিতে হাওয়ার নিঃশ্বাসে উড়িয়া গেল।" আমি বলব, এইগুলি এবং এই প্রকারের উক্তিগুলিই নিমিত্তজ্ঞদের চিন্তা করা উচিত এবং বিচার করা উচিত।

আ—এটা তুমি ঠিক বলেছ, সোক্রেটিস্।

সো—তুমিও, আয়োন, এ সব ঠিকই বলেছ। এখন একবার আমার দিকে মন দেও দেখি; আমি যেমন তোমার জন্যে ওড্যাসিয়া হইতে এবং ইলিয়ড হইতে খুঁজে খুঁজে সেই সব পঙ্‌ক্তি বের করেছি, যে গুলি নিমিত্তজ্ঞের, যে গুলি চিকিৎসকের, এবং যে গুলি ধীবরের বিদ্যাবিষয়ক; তুমিও তেমনই, হে আয়োন, যেহেতু তুমি আমার চেয়ে হোমারের উক্তি সমূহে বেশী অভিজ্ঞ—আমাকে সেই সব পঙ্‌ক্তিগুলি বেছে দাও দেখি যে গুলি চারণদের সম্বন্ধে এবং চারণবিদ্যা সম্বন্ধে—এবং যে গুলি অন্যের চেয়ে চারণদেরই বিশেষ করে জানবার এবং বুঝ্‌বার কথা।

আ—আমি এই বলব, সোক্রেটিস্, সমস্ত উক্তিগুলিই এই প্রকারের।

সো—না, আয়োন, সকল গুলিকেই তুমি এরূপ বল্‌তে পার না; কিংবা তুমি কি এমনই সব ভুলে গেলে? বাস্তবিকই, এমন করে যে সব কথা ভুলে যায়, তার পক্ষে চারণ হওয়া উচিত নয়।

আ—কি এমন ভুলে গেলাম আমি?

সো—তোমার কি মনে নাই যে চারণ বিদ্যাকে তুমি রথচালন বিদ্যা হ'তে পৃথক্ বলেছ?

আ—মনে আছে।

সো—পৃথক্ বলে তাদের জ্ঞাতব্য বিষয়ও পৃথক্—একথা কি তুমি স্বীকার কর নাই?

আ—হাঁ।

সো—তা হ'লে তোমার কথা মতই চারণ এবং চারণ-বিদ্যা সকল বিষয়ই জান্‌বে না।

আ—কিন্তু, সোক্রেটিস, বোধ হয় এই রকম বিষয় ছাড়া।

সো—'এই রকম বিষয়' বল্‌তে তুমি বোধ হয় বুঝাচ্ছ, অন্যান্য বিদ্যার জ্ঞাতব্য বিষয় ছাড়া; (চারণ বিদ্যা) যদি সকল বিষয় না জানবে তবে উহা কি জান্‌বে?

আ—আমার মনে হয়, উহা জানবে, পুরুষের কি বলা উচিত, আর স্ত্রীলোকেরই বা কি বলা উচিত—কি রকম কথা ক্রীতদাসের বলা উচিত আর কি রকম বলা উচিত স্বাধীন লোকের—কি রকম কথা বা শাসিতের উপযুক্ত আর কি রকম বা শাসকের যোগ্য।

সো—তবে কি তুমি বল্‌তে চাও যে,সমুদ্রে তুফানে আকুল নৌকার চালকের কি বলা উচিত, তা চারণ-কবি নাবিকের চেয়ে ভাল জান্‌বে?

আ—না, এটা নাবিকই ভাল জান্‌বে।

সো—কিন্তু পীড়িত ব্যক্তির চালকের কি বলা উচিত, তা চিকিৎসকের চেয়ে চারণকবিই ভাল জান্‌বে?

আ—না, তা নয়।

সো—আর, তুমি বল্‌ছ না, ক্রীতদাসের কি বলা উচিত, তা, চারণ কবি জান্‌বে?

আ—হাঁ।

সো—ক্রীতদাস যদি গরুর রাখাল হয়, তা হ'লে ক্ষিপ্ত গরুকে ঠাণ্ডা করবার জন্যে তার কি বলা উচিত—তা চারণ কবি জান্‌বে, কিন্তু রাখাল জান্‌বে না?

আ—না, তা নয়।

সো—আর, সূতা কাটে যে স্ত্রীলোক, পশম নিয়া কাজ করা সম্বন্ধে তার কি বলা উচিত, তা?

আ—না, তাও নয়।

সো—সৈন্যদিগকে উপদেশ দিবার সময় সেনাপতিকে কি বল্‌তে হয়, সেটা অবশ্যই চারণ কবি জান্‌বে?

আ—হাঁ, এ গুলি চারণ কবি জান্‌বে বই কি?

সো—তার অর্থ? চারণ বিদ্যা তবে সেনাপতি বিদ্যা?

আ—সেনাপতির কি বলা উচিত, তা আমি নিশ্চয়ই জান্‌ব।

সো—তবে হয় ত সেনাপতির সম্বন্ধে তোমার কিছু কিছু জানা আছে। আর, যদি তোমার অশ্বারোহণ সম্বন্ধেও জ্ঞান থাকিয়া থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে বীণাবাদন সম্বন্ধেও কিছু জ্ঞান—তবে, ঘোড়াকে কখন ভাল চালানো হইল এবং কখন মন্দ, তাও তুমি বুঝ্‌বে। কিন্তু যদি আমি জিজ্ঞাসা করি;—"আয়োন,তুমি কোন্ বিদ্যা বলে বুঝ্‌ছ, ঘোড়াকে ভাল চালানো হ'ল কি মন্দ চালানো হ'ল,—যে বিদ্যার বলে তুমি অশ্বচালক হইতে না, যে বিদ্যার বলে তুমি বীণাবাদক, তাইতে?"—তা হ'লে তুমি আমার কি উত্তর দিবে?

আ—'যে বিদ্যার বলে অশ্বচালক'—এই আমি বল্‌ব।

সো—আর, যদি তুমি উত্তম বীণাবাদকদের সম্বন্ধে বিচার কর্‌তে, তা হ'লে এটা কি তুমি স্বীকার কর্‌বে না

যে, সে বিচার তুমি সেই বিদ্যার বলে করছ, যাতে করে তুমি বীণাবাদক— কিন্তু যে বিদ্যার বলে তুমি অশ্বচালক, তার গুণে নয় ?

আ—হাঁ।

সো—সৈন্য পরিচালন সম্বন্ধে যে তুমি কিছু কিছু জান, সেটা কি যে বিদ্যার বলে তুমি সেনাপতিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেছ তার ফলে, না যাতে তুমি ভাল চারণ হ'য়েছ তার ফলে ?

আ—আমার ত এ দুয়ের মধ্যে কোন তাফাৎ বোধ হচ্ছে না।

সো—সে কি ? কোন তাফাৎ নাই বলছ ? চারণ বিদ্যা আর সৈন্য চালন বিদ্যাকে একই মনে করছ, না দুই ?

আ—আমার কাছে ত একই বোধ হয়।

সো—তবে, যে ভাল চারণ, সে ভাল সেনাপতিও হবে ?

আ—নিশ্চয়ই, সোক্রেটিস্।

সো—আর, যে ভাল সৈন্য পরিচালক, সে ভাল চারণও হবে ?

আ—না, এইটা আমি স্বীকার করি না।

সো—কিন্তু এটা তোমার মনে হয় যে, যে ভাল চারণ, সে ভাল সেনাপতিও বটে ?

আ—নিশ্চয়ই।

সো—তুমি কি গ্রীক্‌দের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চারণ নও ?

আ—এক শ' বার, সোক্রেটিস্।

সো—তবে, আয়োন, তুমি গ্রীক্‌দের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতিও বট ?

আ—ঠিক জেনো, সোক্রেটিস্, আমি তাই ; এবং এ বিদ্যা আমি তোমার থেকে শিখেছি।

সো—দোহাই দেবতাদের, সে কেমন তবে, আয়োন ? তুমি সেনাপতি হিসাবে এবং চারণ কবি হিসাবে দু রকমেই গ্রীক্‌দের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হ'য়েও তাদের কাছে কেবল গান করে করেই বেড়াও— কখনও সেনাপতিত্ব কর না ? অথবা, তোমার কি মনে হয়, সোণার মুকুটে মণ্ডিত চারণ কবির প্রয়োজন গ্রীক্‌দের বেশী, সেনাপতির কোন প্রয়োজন নাই ?

আ—আমাদের দেশ (Ephesus) তোমাদের দেশ দ্বারা শাসিত এবং সৈন্যের কর্ত্তাও তোমরাই, কাজেই আমার দেশে সেনাপতির কোন প্রয়োজন নাই ; আর, তোমাদের দেশ অথবা স্পার্টা ত আর আমাকে সেনাপতি মনোনীত করবে না, তোমরা মনে কর, তোমাদের নিজেদেরই যথেষ্ট সেনাপতি রয়েছে।

সো—আচ্ছা, ভাই আয়োন, তুমি ক্যাজিকস (Kyzikos) এর এপোলোডরস্ (Apollodorus) কে জান ?

আ—সে আবার কে ?

সো—যাঁকে বিদেশী হ'লেও এথেন্সবাসীরা অনেকবার সেনাপতি নির্ব্বাচন করেছিল। আর, এণ্ড্রস (Andros) বাসী ফানোস্থেনিস (Phanosthenes) এবং ক্লাজোমেনাই (Klazomenae) বাসী হেরাক্লিডিস্ (Heraklides) কে চেন ? বিদেশী হ'য়েও যখন এঁরা দেখাতে পারলেন যে তাঁরা সম্মানের যোগ্য, তখন এই আমার নগর সেনাপতিত্বে এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান কাজে এঁদিগকে বরণ করেছিল ; আর যোগ্য বলে প্রতিপন্ন হ'লেও ইফেসসের আয়োনকে কখনও সেনাপতি করবে না এবং সম্মান দেখাবে না, সে কেমন ? আর তোমরা ইফেসসবাসীরা কি গোড়ায় এথেন্স বাসীই ছিলে না ? আর ইফেসস ত অন্য কোন সহর হ'তে হীনও নহে ? আসল কথা কি, জান, যদি তুমি সত্যসত্যই বল যে, শিল্প এবং বিজ্ঞান বলেই তুমি হোমারের স্তুতি করতে সমর্থ, তা হ'লে তুমি
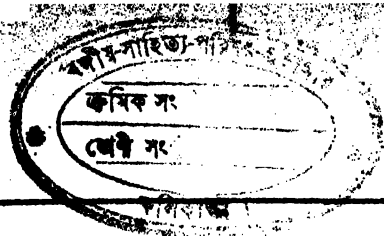
অবিচার কর্‌ছ; হোমার সম্বন্ধে তুমি অনেক ভাল ভাল কথা জান এবং যে গুলি আমায় শোনাবে, এরূপ প্রতিজ্ঞা করে অবশেষে তুমি আমায় ফাঁকি দিলে এবং অনেক তোমার বলবার বাকী রইল; কেন না,কি যে সেই সব বিষয় যাতে তুমি এত পটু, পূর্ব্ব হ'তেই আমার শত অনুরোধ সত্ত্বেও সেগুলি ত তুমি আমায় বলতে চাচ্ছই না,—বরং, সত্য সত্যই প্রটিউস (Proteus) এর মত তুমি উপরে নীচে হাজার রকমে রূপ পরিবর্ত্তন কর্‌ছ, এবং অবশেষে সেনাপতি-রূপে দেখা দিয়ে আমার হাত ছাড়া হ'লে; যেন, হোমার সম্বন্ধে পণ্ডিত্যে যে তুমি কত পটু, সেইটীই তুমি দেখাতে চাও না। এখন যেমন তুমি বল্‌ছিলে, যদি সত্য সত্যই হোমার সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান একটা শিল্প হয় এবং আমাকে সে শিল্প দেখাতে প্রতিশ্রুত হ'য়েও যদি তুমি আমায় ফাঁকি দেও, তা হ'লে তুমি অন্যায় কচ্ছ;—আর, যদি তুমি কোন শিল্পজ্ঞ না হও, বরং—যেমন আমি তোমার সম্বন্ধে বলছি—যদি কিছুই না জেনে হোমার কর্ত্তৃক একটা দৈব আবেশে আবিষ্ট হ'য়ে সেই কবি সম্বন্ধে এত সব সুন্দর গাথা বলে থাক,—তা হ'লে আর তুমি কোন অন্যায় করছ না। এখন বেছে নাও কোন্‌টী তুমি চাও—আমাদের দ্বারা অপরাধী সাব্যস্ত হ'তে না দেবাবিষ্ট বলে কথিত হ'তে।

আ—তফাৎটা যে অনেক, সোক্রেটিস; দেবাবিষ্ট মনে হওয়া যে ঢের বেশী ভাল।

সো—তা হ'লে, আয়োন, আমাদের কাছ থেকে তোমার ভাগ্যে সেই ভালটাই জুটবে—হোমারের গীতিকার রূপে তোমাকে দেবাবিষ্টই আমরা মনে করব, শিল্পী নহে।

—•—

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

অবরোধ।

(Erckmann Chatrian লিখিত—

'Le Blocus' নামক আখ্যায়িকার বঙ্গানুবাদ)

পঞ্চম অধ্যায়।

পরদিন তলব মত মেয়ার সাহেবের আপিসে হাজির হতে হল। সহরের যত সব ছোঁড়ারা আমাদের ঘিরে শিস দিতে আরম্ভ করলে। ভাগ্যিস শেলাখানার কাছে মজবুত ঘরটা তখনও তৈয়ার হয়নি তাই আমরা রোঁদ দেওয়ার রাস্তা দিয়ে বারুদ ঘরের কোণের কাছে কলেজের বড় আঙ্গিনায় কুচ কাওয়াজ কর্ত্তে গেলাম। ছেলেদের আগেই ছুটি দেওয়া হয়েছিল তাই জায়গাটা খালি পাওয়া গেল। একবার মনে করে দেখ অতবড় উঠানটা শুধু সহরের লোকে ভর্ত্তি, সকলেরই শাদা পোষাক—পরনে পাজামা, কোট, ফতুয়া আর মাথায় টুপি। উর্দ্দি টুর্দ্দি কাহারও নাই। সকলেই ভাল মানুষের মত যত সব টিনওয়ালা, ঝাড়ুদার আর সইসদের হুকুম তামিল কর্‌ছেন। এরা হয়েছেন এখন তাঁবেদার আর তারা হয়েছে সব উপর ওয়ালা। এখন আর তারা বড় কেও কেটা নয়, সকলেই হোমড়া চোমড়া লোক—কেউ হয়েছে সার্জ্জেন, কেউ জমাদার, কেউ হাবিলদার, কেউবা সুবাদার। একবার বুঝে দেখ যত সব নিরীহ ভালমানুষ লোক কোথাও চারজন, কোথাও ছয়জন, কোথাও বা দশজন "একদুই" "একদুই" করে তালে তালে পা ফেলে চলেছে। এক একবার হুকুম হচ্ছে "ঠহরো হঁয়া" "আঁখ নিকালকে দেখ সামনে" আর কর্ত্তারা পেছনে পেছনে ভ্রূকুটি করে চোখ রাঙিয়ে আস্‌ছেন। মাঝে মাঝে এক একবার নাম ধরে হেঁকে নেহাৎ তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের ভাবে বলা হচ্ছে

"আরে মোয়াস। ঘাড়টা সোজা করে থাক্ শুনছিস্।" নাকটা বাহির না করে দাঁড়াতে পারনা? দাঁড়াও আইন বুদ্দি হয়ে। "হুসিয়ার মোয়াস্। তোল্ বন্দুক ঘাড়ে" ঘাড় বানাতে বুড়ো কোনও কাজের লায়েক নয়। এ বয়সে এমনতর জানোয়ারের মত বুদ্ধি দেখেছো তোমরা" আরে বুড়ো কি কর্‌তে হবে একবার তাকিয়ে দেখ্—শুনেছিস্—আরে গেলো! এটাও পারছ না—মরন আর কি!" বল্‌বো কি ক্রিঞ্জ আমাদের জুতা সেলাই ব্রাস ওয়ালা এম্‌নি করে আমাকে খুব ৼ কথা শুনিয়ে দিলে। কাপ্তান ভিয়ের যদি না থাক্‌ত তাহলে হয়তো দুঘা মেরেই বসেছিল আর কি? আর, আর সব ব্যাটারাও তাদের পুরানো মুরুব্বি আর খরিদদারদের সঙ্গে এই রকম ব্যবহার আরম্ভ করে দিল। যেন এই ব্যবস্থাই চিরকাল থাকবে তাঁরা চিরকাল ধরে সার্জ্জেন গিরি করবেন আর আমরা তাঁদের কারবার দাজি করতে থাকবো। বেটাদের পেকোমি দেখে এমন রাগ হয়েছিল যে তা পঞ্চাশেও ভুলে যাবার নয়। সে যাই হোক্, তখনকার মত কর্ত্তা তো তারাই হলো!

আমরা রাগ করি আর নাই করি তাদের তো তাতে ভারি লোকসান। আমি ছেলেদের গায়ে কখনো হাত দিই না। মনে পড়ে কেবল একবার সাফেলের কান মলে দিয়াছিলাম তাও ওই ব্যাটা, মনুবর্গের জন্য। পাড়ার এক পাল ছেলেরা রোঁদের রাস্তার ধারে দেওয়ালের উপর উঠে আমাদের দেখ্‌ছিল আর হাঁসি তামাসা করে ভেংচি কাটছিল। দেখি সাফেল ব্যাটাও তাদের মধ্যে বসে রয়েছে হাতছানি দিয়ে ডাক্‌তেই সে তখনি নেমে এলো। কুচ কাওয়াজ হয়ে গেলে পর মিউনিসি-পাল আপিসের সামনে যখন আমাদের দল ভেঙ্গে বাড়ী যাওয়ার হুকুম হল তখন ছেলেটা কাছে আস্‌তেই আমার ভয়ানক রাগ হয়ে উঠ্‌লো আমি তার কান দুটো আচ্ছা করে মলেদিয়ে বল্‌লাম "বেটা কুপুত্তুর কোথাকার বাপকে দেখে শিস্ চুমকুড়ি দিয়ে ঠাট্টা! কোথায় বাপের লজ্জা ঢেকে নেবে না তার উল্টা।" মার খেয়ে ত সে খুব কাঁদ্‌তে আরম্ভ করলে চোখদিয়ে টশ্ টশ্ করে জল পড়তে লাগ্‌লো। বাড়ী পর্য্যন্ত সমস্ত রাস্তা কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে চল্‌লো। আমি মুখ খানা রাঙা করে আস্‌ছি আর ছেলেটা পেছনে পেছনে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে আস্‌ছে দেখে সর্লে তখনি দরজার গোড়ায় নেমে এল, আমাকে জিজ্ঞাসা করলে হয়েছে কি? আমি রাগের কারণটা ভেঙ্গে বলে উপরে উঠে গেলাম। শুনে সর্লে সাফেনকে আরও গালাগালি মন্দ করতে লাগ্‌লো। আর তাকে আমার কাছে ক্ষমা চাইবার জন্য পাঠিয়ে দিলে। আমি যে খুসি হয়ে তখন তখনই তাকে মাফ্ করলাম তা আর বল্‌তে হবে না। রোজ রোজ এই রকম করে কুচ কাওয়াজ কর্ত্তে যেতে হবে মনে করে ভাব্‌তে লাগ্‌লাম। যদি মাল টাল সমেত বাড়ীখানা আর কোথাও উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া যেত তা হলে সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে সেখান থেকে সড়ে পড়বার ব্যবস্থা করতাম। এই পাজী বেটাদের হুকুম মেনে চল্‌তে হবে—এর চেয়ে আর বেশী দুর্দ্দশা কি হতে পারে? যারা সামান্য ক্ষণের জন্য হাতে ক্ষমতা পেয়ে নিজেদের ওজন বুঝে চল্‌তে জানে না সকলেরই এক এক বার সুযোগ আস্‌বে একথা-টাও যাদের বুদ্ধিতে আসে না সেই রকম ছোটলোক বেটাদের তাঁবেদারী করা কি কম পাপের কাজ! এ সম্বন্ধে বল্‌তে গেলে আমার কথার আর শেষ হবে না—বরং যা বল্‌ছিলাম তাই বলে যাই। সেদিন ভগবান কিন্তু আমাকে সান্ত্বনা দেবার বেশ ব্যবস্থাটাও করে রেখেছিলেন। আমি টেবিলে বস্‌বো বলে ঘরের কোণে বন্দুক টোটাগুলো নামিয়ে রাখ্‌তে না রাখ্‌তেই সর্লে হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে আমারি হাতে একখানা চিঠি দিয়ে বল্‌লে এইটে একবার পড়ে দেখ। রাগ এখ্‌খুনি পড়ে যাবে।" আমি চিঠিখান খুলেই দেখ্‌লাম "পেজোনা" থেকে আসছে। মহাজন খবর পাঠিয়েছে যে আমার জন্য বার

পিপে মদ সে রওনা করিয়ে দিয়েছে। এতক্ষণে আমার ভাল করে নিশ্বাস পড়তে লাগ্‌ল। আমি বল্‌লাম বাঁচা গেল আর ভাবনার কারণ নাই; চালানে গাড়োয়ানদের গাড়ীতেই মদটা রওনা করিয়ে দিয়েছে। আর হপ্তা তিনেকের মধেই এসে পৌঁছবে, এখন ত্রাসবুর্গ আর সার ক্রুকএর দিককার আর কোনও নূতন খবর নাই। শত্রুপক্ষেরা দুই দলে মিশ্‌ছে বটে কিন্তু তারা আর বড় নড়া চড়া করুছে না দেখ্‌ছি। পিপে কয়টা এ যাত্রা ভালয় ভালয় বেঁচে গেল। দেখো আমাদের বিক্রী সিক্রী সুবিধা রকমই হবে এখন। এমন দাঁও আর সহজে পাওয়া যাবে না। বলে হাঁস্‌তে লাগলাম। আমি প্রকৃতিস্থ হয়েছি দেখে সর্লে আমার আরাম চেয়ারের কাছে সরে এল আর আমার হাতে বড় বড় দুইখান টিকিট লাগান একখান চিঠি দিয়ে বল্‌লে এটা কি একবার দেখে বলতো। আমি দেখবা মাত্রই বুঝতে পারলাম আমারই দুই ছেলের হাতের লেখা। মার্কিন দেশথেকে ক্রোসেল ইৎজিগ দুই ভায়ে মিলে লিখেছে দেখেই আমার মন আনন্দে ভরে উঠ্‌ল আর আমি কথা বার্ত্তা না কয়ে মনে মনে কেবল ভগবানের গুণ গান কর্ত্তে লাগ্‌লাম। এই সুসংবাদের আনন্দে এতই অধির হয়ে পড়েছিলাম যে মুখদিয়ে কথা বার হচ্ছিল না। দেখ ভগবানের কি অপার মহিমা! তাঁর জ্ঞান বুদ্ধির কি অন্ত আছে। ঘোড়া ছুটালেও তাঁর কাছে খাতির নাই বেগে দৌড়ালেও তাঁর কাছে খাতির নাই। যে শুধু তাঁরই উপর নির্ভর করে তাঁকেই তিনি দয়া দেখান।" ছেলেরা চিঠিতে মার্কিন দেশের খুব প্রশংসা করে লিখেছে। পড়্‌তে পড়্‌তে আমার মনে হতে লাগ্‌ল ব্যবসায়ী লোকের পক্ষে এমন জায়গা আর নাই, এ দেশের সকলেই স্বাধিন সকলেই উদ্যোগী। এখানে না আছে সরকারের একচেটিয়া বন্দোবস্ত না আছে ট্যাক্স শুল্কের জুলুম। এখানকার লোকেদের লড়াই করুবে বলে গড়ে তোলা হয় না। তারা শান্তির পথে চল্‌বার মতই শিক্ষা পেয়ে থাকে। এদেশে যার যেমন বুদ্ধি খাটিবার শক্তি যার যেমন মনের জোর আর খরচ বাঁচানর চেষ্টা সে তেমনি উন্নতি কর্ত্তে পারে। যার যেমন যোগ্যতা সে তেমনি হয়ে থাকে কারও কোনও অসুবিধা নাই কোনও উল্টা পাল্টা নাই সকলেই আপন আপন স্থান অধিকার করে রয়েছে। যদি কোনও গুরুতর বিষয়ের মিমাংসা কর্ত্তে হয়, সকলে জুটে পাঁচ জনের সহজ বুদ্ধিতে যা ভাল বলে স্থির হয় তাহাই ন্যায় বলে মেনে নেয়। যখন সকলেই খাজনা ট্যাক্স দিতে হয় তখন সকলেই আপন আপন মতামত জানাতে পারবেনা এই বা কেমন কথা। প্রথম যে সব চিঠি এসেছিল এ তারই মধ্যে একখানা। ইৎজিগ, আর ক্রোসেল তার পরে আমাকে জানিয়েছিল যে তারা এক বছরের মধ্যে যা কিছু সঞ্চয় করুতে পেরেছে তাহাতে আর তাদের মাথায় মোট করে ঘুরতে হয় না। গোটা তিনেক খচ্চর কিনেছে সেই গুলোর পিঠে মাল বোঝাই দিয়ে নিয়ে যায়। লিখেছে যে তারা শীঘ্রই নিউইয়র্ক জেলার অ্যালবানির কাছে স্কটস্কিন পাহাড়ের উপর বিলাতি মালের আড়ত খুলুবে। সে দেশে গরুর চামড়া খুব মেলে তাই তারা সেখানে ইউরোপের তৈরী সব মাল যোগান দিয়ে তার বদলে চামড়া নেওয়ার বন্দোবস্ত করুবে। তাদের ব্যবসা পত্তর বেশ ভালই চল্‌ছে। সেখানকার লোকেরাও তাদের বেশ খাতির করে। ক্রোসেল যখন খচ্চর তিনটা নিয়ে গস্তে বার হয় তখন ইৎজিগ দোকানে থাকে। আবার ইৎজিগকে যখন পালামত বাইরে বেরুতে হয় তখন তার ভাই বাড়ীতে থেকে দোকান পাট চালায়। আমরা যে কি বিপদে পড়েছি তা তারা জানে। আর আমাদের মত বাপ মা পেয়েছিল বলে ভগবানকে ধন্যবাদ দেয়। তাদের ইচ্ছা যে আমরা তাদের কাছেই যাই। সম্প্রতি যে রকম হয়ে দাঁড়িয়েছে বিশেষ করে মলবর্ণ বেটার সেই ইত্‌রোমির কথা মনে পড়্‌লে ভাবি ও পাড়ে গিয়ে পৌঁছাবার উপায় থাকলে আমিও নিশ্বাস ফেলে বাঁচতাম। তা এরকম

সুখবর পেলেও মনটা বড় কম ঠাণ্ডা হয় না। তাই তখন এত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও, ফিসারের শত্রুতার কথা স্মরণ হয়ে আমি তাকে উদ্দেশ করে মনে মনেই বল্‌তে লাগলাম "আমার হককে তুই বেটা গাধা বইত নয়। আমারই না হয় ক্ষতি কর্‌লি আমার ছেলেদের আর কি কর্‌বি? বেটার ত ভারি মুরদ বেটা মেয়ার আপিসের কেরাণী। আমার আর কি? আমি একবার মদটা বিক্রি আরম্ভ কর্‌তে পার্‌লে হয়। একবারে দুগুণ তিন গুণ লাভ করে বস্‌বো। চাঁদনীতে তোর দোকানের পাশেই সাফেনকে বসিয়ে দেব আর তোর দোকানে যত খদ্দের ঢুক্‌তে যাবে সে তাদের ইসারা করে ডেকে নেবে। তাদের ছেড়ে না দিয়ে সে বরং কেনা দামেই জিনিস বেচ্‌বে আর তুই বেটা দেখে জলে পুড়ে মরবি। বেশী দুঃখ হলে যেমন চোখে জল আসে বেশী আনন্দেও তেমনি এসে থাকে। এই সব কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে আমারও চোখে জল আসবার উপক্রম হয়েছিল। সর্লেও তার আহ্লাদ চেপে রাখ্‌তে পারছিল না তার মনের হাসি মুখে ফুটে উঠ্‌ছিল। আমি আর থাক্‌তে না পেরে সর্লেকে বুকে ধরে সেদিনকার মত আমাদের আনন্দের পর্ব্ব শেষ কর্‌লাম। আমরা সাফেনকে ফের আবার নূতন করে ক্ষমা কর্‌লাম। সে বল্‌লে আর কখনও বজ্জাত ছোড়াদের সঙ্গে মিশবে না। তার পর খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়ে মাটির নীচে যে গুদামের দরুন পাতাল ঘরটা ছিল সেইটা একবার তদারক করে দেখ্‌তে গেলাম। এত ভাল পাতাল ঘর সহরের ভিতর আর কারও ছিল না। লম্বায় পঁয়ত্রিশ ফুট উঁচুতে প্রায় এগার ফুট আগাগোড়া সমান পাথরে গাঁথা কোথাও একটুখানি স্যাঁতার নাম গন্ধ নাই। উনানের ধারের মত খট্‌ খটে। মদ যেমন পুরানো হলে ভাল হয় যত দিন যাচ্ছিল এ মাটির নীচের গুদামটাও যেন আরো ভাল হয়ে উঠ্‌ছিল।

মাস শেষ হবার আগেই মদের পিপেগুলো এসে পড়বার কথা ছিল তাই সে গুলো রাখ্‌বার জন্ম আমি গোটা চার গুড়ি চেরা কাঠের ব্যবস্থা কর্‌লাম। তারপর পাথর কেটে তৈরী করা যে কুয়াটা আছে দেখলাম তাতে যে জল রয়েছে সেই জলেই আমাদের আরক মদ ইচ্ছা মত "নরম" করে লওয়া চল্‌বে। বেলা প্রায় চারটের সময় পাতাল ঘরের সিড়ি বেয়ে উপরে উঠ্‌তেই দেখ্‌লাম ক্রোমার মিস্ত্রি তার ফুট কাট বগলে করে চাঁদনীর ধার দিয়ে হেঁটে চলেছে। তাকে দেখেই আমি ডেকে বল্‌লাম "ওহে মিস্ত্রি—কর্ত্তা" আমার পাতাল ঘরটা একবার দেখে যাও দিখিন্‌। বোমা টোমা পড়্‌লে কোনও লোকসান হবেনাত। সে ফুট কাটি দিয়ে ভিতরটা মেপে নিয়ে বল্‌লে এর খিলানের উপর পুরা দস্তুর ছ ফুট মাটি রয়েছে। বোমা টোমা যখন এধারে পড়্‌তে আরম্ভ হবে তখন তোমার এঘর আমাদের সকলেরই কাজে আস্‌বে। এর জন্ম আর তোমাকে ভাবতে হবেনা তুমি নাকে সরসের তেল দিয়ে ঘুমোওগে যাও। আমরা নীচে থেকে ফুট পাথের উপর উঠে আস্‌তেই পথের ধারের একটা দরজা ঝনাৎ করে খুলে গেল। আর সার্সীগুলোও ঝন ঝন্‌ করে নড়তে লাগ্‌ল। ক্রোমার মুখতুলে আমাকে বল্‌লে মোরাগ ওদিকে একবার তাকিয়ে দেখ, কামুর সিঁড়ির উপর কি একটা হাঙ্গাম বেধেছে না? আমরা দুজনেই সেখানে একটু দাঁড়ালাম। চেয়ে দেখি দুধারে রেলিং দেওয়া সিড়ির উপরে পুরান দলের একজন সার্জেন। গায়ে একটা তেলচিটে ওভারকোট, ঘাড়ে বন্দুক, পেটিতে টোটার থলে। কামুর জামার কলার ধরে হিড় হিড় করে তাকে টেনে নীচে নামিয়ে নিয়ে আস্‌ছে। বেচারা বুড়ো কোনও মতে নীচে নামতে চায়না, দুহাত দিয়ে দুয়ারটা প্রাণ পন শক্তিতে চেপে ধরেছে। শেষে অনেক ধস্তা ধস্তির পর বেচারা তার জামার মায়া ত্যাগ করে কোনও রকমে সে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলে।

কলারটা সার্জ্জেনেরই হাতে থেকে গেল। যেই ছাড়ান পাওয়া আর অমনি বুড়ো ভিতরে ঢুকে দুয়ারটা বন্ধ করে দিলে। দূর থেকে হঠাৎ শুন্‌লে মনে হত বুঝিবা বাজই পড়্‌ল। ক্রোসার বললে এখন যদি সহরবাসীদের সঙ্গে ফৌজের লড়াই বেধে যায় তা হলে জার্ম্মান আর রাসিয়ান সেনারা বড়ই মজা পেয়ে যাবে তাদের যা খুসি তাই করে বস্‌বে। সার্জ্জেন দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ দেখে বন্দুকের হাতলের ঘা দিয়ে ভেঙ্গে ফেলবার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু তাতে ভয়ানক শব্দ হতে লাগ্‌ল আশের পাশের বাড়ী থেকে লোকেরা সব বেড়িয়ে এল। সেই সময় রাস্তার কুকুর গুলোও এক সঙ্গে মহা চীৎকার জুড়ে দিলে আমরা বেশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই সব দেখ্‌ছি এমন সময় বুর্গে সাম্‌নের গলি থেকে বেরিয়ে সার্জ্জেনকে বেশ জোর্‌ করেই দুকথা বল্‌তে লাগ্‌ল। প্রথম প্রথমটা কথা গুলো সার্জ্জেন সাহেবের কানে যাচ্ছে বলে ত বোধ হচ্ছিল না কিন্তু মিনিট খানেকের মধ্যেই সে তার বন্দুক ঘাড়ে তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি যেন রেগে মেগে বেরিয়ে এল তার পর মুখখান আঁধার করে রাগে গর গর কর্ত্তে কর্ত্তে ঘাড় গুঁজে,- বুনো শুয়োরের মত রাস্তায় নেমে পড়্‌ল। সে আমাদের কাছ দিয়েই চলে গেল। লোকটার কাঁদে তিনটে দাগওয়ালা কাজ—রংটা রোদ পোড়া, গোপে কতক কতক পাক ধরেছে, চোয়ালের ডান দিকে চামড়া কুঁচকে গিয়েছে থুতনিটা অনেকটা চৌকনা ধরণের। সে বিড় বিড় করে কি বল্‌তে বল্‌তে গিয়ে তিনটে পায়রা আঁকা সাইনবোর্ড ঝোলান একটা ছোট হোটেলখানার ভিতর ঢুকে পড়্‌ল। বুর্গে একটু দূরে তার পেছনে পেছনে আস্‌ছিল—গায়ে প্রকাণ্ড একটা গরম কাপড়ের ওভার কোট, কলারটা খাড়া করে দেওয়া—টুপিটা ভুরুর উপরে টানা হাত দুটো আস্তিনের ভেতর লুকান—দেখ্‌লাম সে হাঁসছে—আমি বল্‌লাম ওহে ব্যাপারখানা কি একবার বল তো। কামুর বাড়ীতে কিসের এত গোলমাল হচ্ছিল? সে বল্‌লে ও আর কি শুনবে পাঁচ নম্বর পুরান সেপাইএর দলের ক্রব্যার ফের আবার আগেকার মত গোলমাল আরম্ভ করেছে—হতভাগা চায় সে যেমনটি বল্‌বে [illegible] হওয়া চাই। পনর দিনের মধ্যে সে পাঁচবার বাসা [illegible] করেছে একজন বাড়ী ওয়ালার সঙ্গেও তার বনেনি সকলেই ওর বিরুদ্ধে নালিশ করেছে। কিন্তু ও এমনি সব কৈফিয়ৎ দিয়ে কাটিয়ে দেয় যে তার উপর গভর্ণর সাহেবের আর কিছুই বলবার থাকে না। আমি বল্‌লাম "তাত বটে কিন্তু কামুর বাড়ীতে হএছিল কি?" বুর্গে বল্‌লে কামুর বাড়ীতে এমন জায়গা নাই যে কাউকে সে থাক্‌তে দিতে পারে। তার মতলব ছিল যে সার্জ্জেনকে কোনও গতিকে হোটেলে পাঠিয়ে দেয় কিন্তু সার্জ্জেন মশায়ও তেমনি—তিনি আগে থাক্‌তেই ঠিক করে রেখেছেন যে কামুর বিছানাতেই রাত্রিবাস কর্‌বেন। তিনি আর কথাবার্ত্তা না করে গায়ের ওভার কোটটা বিছিয়ে বল্লেন আমার জন্য এই কামরাই না বন্দোবস্ত হয়েছে! বাসাটি বেশ আমার পছন্দ মত আমি আর এখান থেকে কোথাও নড়চিনা। তাই না শুনে কামু ত রেগেই অস্থির শেষে যা দাঁড়াল তা তুমি ত নিজে এসেই দেখেছ। সার্জ্জেনটা বুড়োকে ঘা কতক দেবার জন্য তাকে টেনে হেঁচড়ে বাইরে নিয়ে যাচ্ছিল বলে বুর্গে হাঁস্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু ক্রমার বল্‌লে এখন এসবেতে হাঁসি পায়ই বটে কিন্তু যখন মনে হয় যে এই সব মহাত্মারাই র‍্যা নদীর অপর পারে গিয়ে কি কাণ্ডটাই না করে এসেছেন। বুর্গে বড় গলায় বল্‌লে জার্ম্মানদের সেবার যে বড় সুখে যায়নি তা আমি ভালই জানি, তা যাক্‌গে এদিকে আবার খবরের কাগজ পড়বার সময় হয়ে এল, ভগবান করুণ আমাদের পুরান দাদন এত শীগ্‌গির যেন শোধ না হয়? নমস্কার ভাই এখন তা হলে আমি চল্লাম—এই বলে সে চকবাজারের পাশের রাস্তা ধরে চলে গেল; ক্রমার তার বাড়ী ফিরে গেল

আর আমি গিয়ে আমার পাতাল ঘরের দোর দুটো ভালকরে বন্ধ করেদিলাম তারপর উঠে বাড়ী চলে এলাম। এ হচ্ছে দশই ডিসেম্বরের কথা এর মধ্যেই [illegible] পড়েছিল। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় পাঁচটা [illegible] বাজিতেই পথ, ঘরের ছাদ সব বরফে ঢাকা পড়ে যেত। বাইরে আর কোনও সাড়া শব্দ পাওয়া যেত না। সকলেই আপন আপন ঘরের ভিতর উননের কাছে বসে থাকতো। আমি গিয়ে দেখলাম সর্ব্বে রান্নাঘরে রাত্রিবেলাকার খাবার তৈরী করছে, উনান থেকে লাল আঁচ উঠে হাঁড়িটার চার ধারে লহর খেলিয়ে যাচ্ছে। ফ্রিজ। এসব যেন এখনও চোখের সামনে ভাসছে। গিন্নি ধোঁয়ায় কাল জানলাটার কাছে পাথর বাঁধান চৌবাচ্চার ধারে থালা বাসন গুলো ধুচ্ছে। সাফেল ছেলেটা লোহার চোঙা—বেরনো নলে ফুঁ পাড়ছে, ফুঁ দিতে গিয়ে তার গাল দুটো ফুলে আপেল ফলের মত হয়ে যাচ্ছে মাথার চুলগুলো এদিক ওদিক সড়ে গিয়েছে আর আমি টুলের উপর স্থির হয়ে বসে আছি আর পাইপ ধরাতে হবে বলে হাতে করে জলন্ত কয়লা তুলছি। এ যেন সব কালকের কথা—আমাদের তখন ত আর কথাবার্ত্তা কিছু হচ্ছিল না। মরশুমটা যে আসছে ছেলেরা লায়েক হয়ে যে নিজে নিজেরাই ব্যবসা চালাচ্ছে আর সেদিন যে ভাল রকম খাবার দাবার তৈরী হচ্ছে এই সব ভেবেই আমাদের মন ভারি খুসি ছিল। কে তখন ভেবেছিল যে দিন পাঁচিশেক পরে এই সহরটা শক্রসেনা এসে ঘিরে ফেলবে আর চারধার থেকে কেবল শন্‌সনিয়ে বোমা আসতে থাকবে।

শ্রীগুরুদাস সরকার।

বিগত শ্রী।

আজি তব নাহি রূপ, বর্ণ তব কষিত কাঞ্চন
আজিকে হয়েছে ম্লান, তেজোহীন তোমার নয়ন।
নাহি শোভা চিকুরের, ওষ্ঠাধরে নাহিক রক্তিমা
আজিকে নীরস রূঢ় মধুময় তোমার ভঙ্গিমা
তবরূপ লাবণ্যের জীবনের হয়েছে মরণ
তুমি তার মৃতদেহ, কাল সবি করেছে হরণ
এবে সঙ্কোবাহু রচা সমাধিতে করিয়া নিহিত
নিশিদিন রবো জাগি আগুলিয়া চির অবহিত।

শ্রীকালিদাস রায়।

মেহেদি।

সকলেই বোধ হয় এই ছোট গাছটীর সহিত পরিচিত। আমাদেয় দেশে সাধারণতঃ মুসলমানেরা বিবাহের সময় ইহার পত্র দ্বারা হস্ত ও পদ রঞ্জিত করে। কিন্তু বঙ্গদেশের কোনও কোনও শ্রেণীর হিন্দুরা ইহা স্পর্শ করিতেও ভয় পায়। তাহাদের বিশ্বাস এই যে যদি শরীরের কোনও স্থান মেহেদি পত্র দ্বারা রঞ্জিত থাকা অবস্থায় তাহাদের মৃত্যু হয় তবে পর জন্মে সে মুসলমান হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবে। এই সামান্ত বৃক্ষটীর যে কত গুণ বিরাজিত তাহা শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। হিন্দুগণ ইহার গুণাবলী সম্যক অবগত ছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যে ইহা "রক্তগর্ভ" নামে পরিচিত। দক্ষিণ ভারতের তামিল বৈদ্যগণ ইহাকে নানা প্রকার ঔষধি

রূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। পত্র ও পুষ্প একত্র করিয়া জল দ্বারা সিদ্ধ করিয়া সেই নির্য্যাস প্রত্যহ অর্দ্ধ চামচ হিসাবে দিনে ২ বার করিয়া বাতগ্রস্ত রোগীকে খাইতে দেওয়া হয়। কঙ্কন দেশীয় বৈদ্যগণ পূর্ব্বোক্ত নির্য্যাস দুগ্ধ ও চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া রোগীর রক্ত-হীনতাবস্থায় ও সর্দ্দি গর্ম্মি—রোগে প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মদেশীয়গণ হাত পা জ্বালার জন্য ঐ পত্রের মণ্ড ব্যবহার করিয়া থাকেন। স্বনামখ্যাত চিকিৎসক ডেমক সাহেব (William Dymock) স্বরচিত গ্রন্থের (Pharmacopia Indica) একস্থানে লিখিয়াছেন যে হাত পা জ্বালা হইতে তিনি নিজে বহুকাল যাবত ভুগিতে ছিলেন। অনেক ঔষধেও যখন উপকার হইল না তখন ব্রহ্মদেশীয় জনৈক ভৃত্যের বাচনিক ঐ ঔষধের বিষয় জ্ঞাত হইয়া উহা ব্যবহার করেন এবং অতি আশ্চর্য্য ফল প্রাপ্ত হন। অত্যল্প সময় মধ্যেই তিনি সম্পূর্ণরূপে ও স্থায়ীভাবে নিরাময় হইয়া উঠেন।

হিন্দু বৈদ্যগণ ইহার যথেষ্ট ব্যবহার জানিলেও মুসলমানগণ ইহার সহিত যতদূর পরিচিত হইয়াছিলেন হিন্দুগণ ততদূর পারেন নাই। স্বয়ং মহম্মদ ইহাকে শ্রেষ্ঠ ছোট গাছ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। মুসলমান-গণ ইহাকে নিম্নলিখিতরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে।

(১) পত্র দ্বারা তাহারা, হস্ত, পদ, শ্মশ্রু, রঞ্জিত করে। বিবাহাদি উৎসবের সময়ই ইহার ব্যবহার অধিক দৃষ্ট হয়। বঙ্গদেশীয় অপেক্ষা উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয়েরা উহা অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকে।

(২) আরব, পারস্য ও গ্রীশ দেশীয় মুসলমানেরা ইহা প্রধানতঃ মাথা ধরা রোগেই ব্যবহার করিয়া থাকে।

(৩) পায়ের গোড়ালীর তলায় ইহা মালিশ করিলে উহাতে ভীষণ বসন্ত রোগ পর্য্যন্ত উপশম হয়। বিশেষতঃ উহা করিলে বসন্ত কিছুতেই চক্ষু আক্রমণ করিতে পারে না।

(৪) পত্রের জল বা কাথ কখনও কখনও মুখ ধৌত করার জন্য কুলিরূপে ব্যবহৃত হয়।

(৫) বৃক্ষের ছাল কামলা ও যকৃত রোগের ঔষধ।

(৬) বীজ দ্বারা বালিস তৈয়ারী করিয়া তাহাতে শয়ন করিলে নিদ্রা বৃদ্ধি হয়। অর্থাৎ উহাতে অতি শীঘ্র ঘুম আনয়ন করে।

(৭) মিশরের মুসলমানগণ মেহেদির শিকর দ্বারা দগ্ধজনিত ক্ষতের উৎকৃষ্ট মলম প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

সামান্য একটী গাছের এত গুণ বলিয়াই বোধহয় মহম্মদ ইহাকে শ্রেষ্ঠ বৃক্ষ নামে আখ্যাত করিয়াছেন। ঔষধিরূপে ব্যবহার ছাড়া রঞ্জন কার্য্যের জন্য মেহেদি পাতার ব্যবহারের বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু মেহেদির রঞ্জন ক্ষমতা বা উহাদ্বারা রঞ্জন প্রণালী সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে কোনও পরীক্ষা হয় নাই। তুরস্ক দেশীয় রাসায়নিক আবদুল আজিজ ১৮৬৩ সালে প্রথমতঃ এই পত্র হইতে রং বাহির করিয়া নানারূপ পরীক্ষা করেন। কিন্তু তাহার ফলে বিশেষ কিছুই জানা যায় নাই।

সম্প্রতি ঢাকা কলেজ সংশ্লিষ্ট রসায়নাগারে মেহেদি পাতার রঞ্জন উপযোগিতা ও রঞ্জন প্রণালী সম্বন্ধে বিস্তৃত পরীক্ষা হইয়াছে, এবং তাহার ফলে নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে প্রতি ১০০ ভাগ ওজনের পত্রের মধ্যে মাত্র ৫ ভাগ রংগীন পদার্থ বর্ত্তমান আছে। এবং ফিটকারি প্রমুখ রং বন্ধকারি সংযোগে ঐ রঙ্গীন পদার্থ সাহায্যে পশমকে দ্বাদশ প্রকার বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জন করা যায়।

মেহেদি দ্বারা কার্পাস বস্ত্র রঞ্জিত করা সম্ভবপর হইলেও অত্যন্ত অস্থায়ী বিধায়ে উহার কোনও মূল্য নাই। ঢাকার পূর্ব্বাংশে অবস্থিত দোলাইগঞ্জ নামক স্থানে পূর্ব্বে মেহেদি পত্র দ্বারা কার্পাস সূত্র রং করা হইত এবং ঐ রঞ্জিত বস্ত্রের নাম ছিল দোলাই। দোলাই

...ল হইতেই দোলাইগঞ্জ নামের উৎপত্তি। বৃদ্ধদের মুখে ...না যায় যে ঐ রং নাকি খুব স্থায়ী ছিল। কিন্তু ...র্ত্তমানে কেহও জানে না যে উহা কিরূপে করা হইত। ...নেক অনুসন্ধানের পর এই মাত্র জানা গিয়াছে যে ...হারা আরও নানাপ্রকার পত্রের রস সহযোগে মেহেদি ...য়া বস্ত্রাদি রং করিত। *

শ্রীসতীশচন্দ্র গাঙ্গুলি।

---

* শ্রদ্ধেয় লেখক মহাশয় মেহেদি সম্বন্ধে অনেক ...থাই বলিয়াছেন। কিন্তু কাজের কথা গুলা যেন সবই ...পিয়া নিয়াছেন। আশা করি (ক) মেহেদি পাতা ...তে কি উপায়ে রং প্রস্তুত করিতে হয়, (খ) ঐ রং ... কি প্রণালীতে কার্পাস বা পশম বিভিন্ন বর্ণে ...ন করা যায় এবং (গ) বর্ণের উজ্জ্বলতা ও স্থায়ীত্ব ...সাবে মেহেদি রঞ্জন-শিল্পে স্থান পাইতে পারে কিনা ...ৎসম্বন্ধে বারান্তরে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া আমাদের ...কৌতুহল চরিতার্থ করিবেন। বৈজ্ঞানিক দিক হইতে ...লোচনা করিতে গেলে লেখক মহাশয়কে আরও ২।১টি ...থা জিজ্ঞাসা করিতে হয়; মেহেদি পত্রমধ্যস্থ রঞ্জন উপকরণটির রাসায়নিক স্বরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে কিনা? (২) যদি হইয়া থাকে তাহা হইলে উহা কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত? (৩) ১০০ ভাগ পত্রে যে ৫ ভাগ রঙ্গিন পদার্থের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা যেন একটু অস্বাভাবিক মনে হয়। যে সকল প্রাকৃতিক উপাদান রঞ্জন কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হয় তাহাদের কোনওটির মধ্যেই প্রকৃত রঞ্জন—উপকরণ অত অধিক মাত্রায় থাকে না। প্রকৃত পক্ষে উহার পঞ্চমাংশের একাংশও থাকে না। এমতাবস্থায় লেখকের কথা গ্রহণ করিতে একটু দ্বিধা ভাব আপনা হইতেই আসিয়া পরে।

প্রতিভা সম্পাদক।

আলোর আঁধার

পুত্র তাহার সমর জিনে
ত্যাগ করেছে প্রাণ,
শোক প্রকাশের পত্র পেলেন
মাতা দু দশখান।

রাজা জানান সান্ত্বনা তায়
মন্ত্রী জানান দুখ,
বালির বাঁধে থাম্‌বে কেন
ভাঙন ধরা বুক।

মৃতের মুখে যশের রেখা
মায়ের প্রাণে হায়,
সর্ব্বনেশে বন্যা জলে
চন্দ্র কিরণ প্রায়।

বজ্রে ভাঙ্গা দেউল শিরে
'তরু লতা'র বন,
তপ্ত ধূ ধূ গঙ্গা বেলায়
বিরল বরিষণ।

দেয় না আশা দেয় না আলো
লাগায় থরতর,
অমার নিবিড় অন্ধকারে
আগুণ ধরা ঘর।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

ভারতের আর্য্য ও অনার্য্য।

পঞ্চম প্রস্তাব,—আর্য্য কে ?

(ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য)

সমাজে বর্ণভেদের পর জাতিভেদের অলঙ্ঘ্য প্রভাব ক্রমশঃ সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। গুণ, কর্ম্ম, স্বভাব এবং জীবিকার পরিচয় হইতে জাতির পরিচয় হইবার প্রথা ক্রমশঃ লোপ পাইল। অন্য জাতির কথা দূরে থাকুক, বর্ণগুরু ব্রাহ্মণও ক্রমশঃ "সর্ব্বকর্ম্মোপজীবী" হইয়া উঠিলেন। তথাচ, কি আর্য্যাবর্ত্তে এবং কি দক্ষিণাপথে, ব্রাহ্মণকে চিনিয়া লওয়ার কোন অসুবিধা রহিল না। "আর্য্য" শব্দের প্রতিশব্দ "দ্বিজ" কালক্রমে ব্রাহ্মণেরই একাধিকারে আসিল। সমাজের অনেক লোকেই ভুলিয়া গেলেন যে দ্বিজত্ব, উপনয়ন সংস্কার এবং বেদাধ্যয়নের অধিকার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের তুল্যরূপে পৈত্রিক সম্পত্তি। যদিও ব্রাহ্মণ বর্ণ ক্রমশঃ অষ্টাদশ শত উপশ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া গেলেন, যদিও ব্রাহ্মণ অত্যুচ্চ এবং বিশুদ্ধ কার্য্য হইতে অতি হীন ও নিন্দিত কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন, তথাপি, তাঁহার জাতির গৌরব হিন্দু-সমাজের সর্ব্বত্র সর্ব্ববাদিসম্মতানুসারে স্বীকৃত হইল। ব্রাহ্মণের এরূপ অহৈতুক গৌরব বাস্তবিকই বিদেশী ব্যক্তিবৃন্দের মনে বিস্ময়ের উৎপাদন করিতে লাগিল।

মনু মহারাজ যে বলিয়াছিলেন, 'আচার ব্যবহার এবং কার্য্য দেখিয়া কোনও ব্যক্তির অথবা শ্রেণীর বর্ণ বিনির্ণয় করা যাইবে,' তাহা আর টিকল না। প্রাচীন কাল হইতে আগত প্রবাদই বর্ণের বা জাতির পরিচায়ক হইল। প্রসিদ্ধ বংশে জাত এবং বিহিত বিবাহের ফলে উৎপন্ন ব্যক্তির আভিজাত্য সমাজ স্বীকার করিয়া লইলেন। ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহ না করিলে এবং খাদ্য পানীয় এবং পত্নীগ্রহণ সম্বন্ধে একান্ত প্রকাশ্যভাবে সমাজের মর্য্যাদায় আঘাত না করিলে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্য ক্ষুণ্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা রহিল না। "আর্য্য" অথবা দ্বিজগণের ব্রাহ্মণ্য ক্ষুণ্ণ মর্য্যাদাই বহুকাল হইতে সর্ব্বোপরি গণ্য হওয়ায় ব্রাহ্মণের কথাই প্রথমে গণনা করা যাইতেছে।

ভারতখণ্ডের যেখানে ইচ্ছা গিয়া দেখুন, ব্রাহ্মণ নিঃসংশয়ে সর্ব্বত্র "আর্য্য" বলিয়া গৃহীত হইতেছেন। বিদেশী শিক্ষার প্রভাবে যাঁহাদের পুরাতন ধারণা ভাঙ্গিয়া চুর হয় নাই,—তাঁহারা প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে বিশুদ্ধ আর্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে দ্বিধা করিবেন না। আর যদি কোন প্রদেশের কোন ব্রাহ্মণের দেহের বর্ণ গৌর, শরীর সুগঠিত এবং উচ্চ, মস্তক দীর্ঘছন্দের, চক্ষু বিশাল এবং উজ্জ্বল নাসাবংশ সরল এবং সুদীর্ঘ, কেশ ও শ্মশ্রু প্রচুর এবং রেশমের ন্যায় কোমল, চিক্কণ ও লঘুভাবে তরঙ্গায়িত দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ যদি সেই ব্রাহ্মণের মূর্ত্তি কোন সুশ্রী গ্রীক অথবা টিউটন পুরুষের ন্যায় থাকে তবে তাঁহার "আর্য্যত্ব"—অর্থাৎ ষোলআনা বিশুদ্ধ আর্য্যত্ব—সম্বন্ধে কোন য়ুরোপীয় গুরুর এবং তাঁহার ভারতীয় শিষ্যের কোনই সন্দেহ থাকিবে না। য়ুরোপীয় সভ্যতা যেরূপ কোন মানুষের বাহিরের অঙ্গসৌষ্ঠব, বেশভূষা ও প্রসাধনের পারিপাট্য এবং চালচলনের সুসঙ্গতি দেখিয়া তাঁহার "জেণ্টলম্যান"ত্ব স্থির করেন, তদ্রূপ বাহ্য শরীর-সৌষ্ঠব এবং বর্ণ বৈভবের উপর নির্ভর করিয়াই য়ুরোপীয় পাণ্ডত মানুষের জাতিবিভাগ স্থির করিয়া থাকেন। তাঁহার নিকট চরিত্রের বিশেষত্ব অথবা জীবিকার ব্যাপার গণনীয় নহে।

আজ ঘোর কলিকাল বলিয়াই যে ব্রাহ্মণ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবী হইয়াছেন, তাহা নহে। তাঁহার স্মৃতিবিহিত জীবিকা অর্থাৎ যাজন, অধ্যাপনা এবং [illegible] প্রতিগ্রহ দ্বারা যে কেবল অধুনাই অগাধ ঐ[illegible] সম্ভাবনা নাই, তাহা নহে, পরন্তু চিরকালই ঐ [illegible]

দরিদ্রের জীবিকা ছিল। যে সময় সামাজিক সভ্যতা একেবারে বল্কলবাসিনী তপস্বিনী ছিলেন, তখন ঐরূপ জীবিকায় সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণের সন্তোষ জন্মিত বটে, কিন্তু আর্য্যসভ্যতা যে দিন তপোবনের বাস পরিত্যাগ করিয়া বিবিধ বিলাস পরিপূরিত নগরনিবাসিনী হইলেন, সে দিন হইতেই ব্রাহ্মণ পরমার্থ চিন্তার পরিবর্ত্তে না হউক, অন্ততঃ তাহার সহিত, অর্থ-চিন্তা আরম্ভ করিলেন। অতি প্রাচীন বৃহদারণ্যক উপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির সাংসারিক ঐশ্বর্য্যের পরিমাণ মনে রাখিলে অথবা অতি সহজেই সূর্য্য এবং চন্দ্রবংশীয় সম্রাড়্‌গণের, সভাসদ, অমাত্য এবং পুরোহিত ব্রাহ্মণগণের ধনাগমের মাত্রা বুঝিতে পারি। একের দৃষ্টান্তে অন্যে এবং তাঁহার দৃষ্টান্তে অপরে, এইরূপে ব্রাহ্মণগণের মনে অর্থো-পার্জ্জনের লালসা জাগরিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং তাঁহারা যাজন ও প্রতিগ্রহের সহিত কৃষি, বাণিজ্য এবং রাজসেবাদি ধনার্জ্জনের সমুদায় উপায়ই অবলম্বন করিয়াছিলেন। ক্রমশঃ সাত্ত্বিক শৌচ এবং সন্তোষের অনুকূল ভক্রাবৃত্তির আদর্শ অত্যল্প সংখ্যক ব্রাহ্মণের মধ্যেই নিবদ্ধ রহিল এবং অধিকাংশ ব্যক্তিই অন্যান্য সাধারণ লোকের ন্যায় ঘোর সাংসারিক হইয়া অর্থকেই পরমার্থ মনে করিয়া লইলেন। অন্যান্য সভ্যদেশে ও সমাজের শিরোমণি সদৃশ ধর্ম্মাচার্য্যগণের যেরূপ ঘোর সাংসারিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, আমাদের দেশেও ঠিক সেইরূপই ঘটিয়াছিল।

এই রূপ বৃত্তিসাঙ্কর্য্যের বর্ণনা আমাদের অনুমান-প্রসূত নহে; প্রাচীন ও নবীন সংস্কৃত সাহিত্য ভাণ্ডার হইতে ব্রাহ্মণের অর্থলালসার অনেক বিখ্যাত দৃষ্টান্ত আমরা দিতে পারি, কিন্তু তাহার আবশ্যকতা নাই। বর্ত্তমান প্রস্তাবে মনুসংহিতাকেই আমরা প্রধান উপজীব্য করিয়াছি, এ ক্ষেত্রেও মনুসংহিতাকেই প্রমাণ স্বরূপে উপস্থিত করিতেছি। এই সংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ে নিন্দিত ব্রাহ্মণের এক তালিকা আছে; যথা :—

(১) জটাধারী পরন্তু মূর্খ, (২) জুয়ারী (৩) বহুযাজক (৪) চিকিৎসক (৫) দেবল (পূজারী), (৬) মাংস-বিক্রয়ী (কসাই) (৭) পণ্যজীবী (দোকানদার) (৮) গ্রামভৃত্য (চৌকিদার প্রভৃতি), (৯) রাজার সেবক (১০) সুদখোর (১১) পশুপালক, (১২) নটবৃত্তিক, (গান বাজনা ও অভিনয় করিয়া জীবিকার্জ্জন করে), (১৩) বেতন লইয়া অধ্যাপনাকারী (১৪) বেতন দিয়া অধ্যয়নকারী (১৫) শূদ্রের গুরু (১৬) শূদ্রের শিষ্য (১৭) জীবিকার জন্য লোকের গৃহে অগ্নি প্রদানকারী (১৮) জীবিকার জন্য মনুষ্য অথবা পশুকে বিষ দিয়া বধকারী (১৯) সোম-বিক্রয়ী (২০) সমুদ্র পারে বাণিজ্যকারী (২১) তৈলকার (২২) জাল দলিলকারী (২৩) মদ্যপায়ী (২৪) মিষ্টান্ন অথবা বিষ কিংবা পারদ বিক্রেতা (২৫) ধনুঃ শর নির্ম্মাণকারী (জীবিকার জন্য) (২৬) পাশা প্রভৃতি নির্জীব বস্তুর সহায়ে জুয়া খেলিয়া অর্থোপার্জ্জনকারী (২৭) হস্তিশিক্ষক (২৮) গো শিক্ষক (২৯) উষ্ট্রশিক্ষক (৩০) নক্ষত্রজীবী (ফলিত জ্যোতিষী) (৩১) পক্ষীর ব্যবসায়কারী (৩২) যুদ্ধ শিক্ষক (৩৩) গৃহ-নির্ম্মাতা (৩৪) দূতবৃত্তিক (৩৫) বৃক্ষরোপণ দ্বারা জীবিকার্জ্জনকারী (৩৬) কুকুরের ক্রীড়া দেখাইয়া অর্থোপার্জ্জক (৩৭) শিকারী পক্ষী দ্বারা জীবিকার্জ্জন-কারী (৩৮) হিংসাবৃত্তি (৩৯) অধার্ম্মিকের বা শূদ্রের বৃত্তি গ্রহণকারী (৪০) বহুলোকের যাজক (৪১) ভিক্ষুক (৪২) কৃষিজীবী (৪৩) মেষ পালক (৪৪) মহিষ পালক এবং (৪৫) মৃতদেহ বহন দ্বারা অর্থোপার্জ্জক ইত্যাদি। তৃতীয় অধ্যায়ের ১৫১ হইতে ১৬৬ শ্লোক। অনাবশ্যক বোধে পাদটীকায় মূল-শ্লোকাবলী উদ্ধৃত করিয়া প্রস্তাব বাহুল্য করিলাম না।

ব্রাহ্মণের এইরূপ বৃত্তি সাঙ্কর্য্য দেখিয়া মহর্ষি অত্রি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন,—

"ব্রাহ্মণ প্রকৃতপক্ষে দশবিধ, যথা:—দেব, মুনি, দ্বিজ (ব্রাহ্মণ), রাজা (ক্ষত্রিয়) বৈশ্য, শূদ্র, নিষাদ, পশু, ম্লেচ্ছ ও চণ্ডাল। সন্ধ্যা, স্নান, জপ, হোম, নিত্য দেবপূজা

অতিথি ও বৈশ্বদেব পূজা "দেব-ব্রাহ্মণে"র লক্ষণ। যিনি শাক, পত্র, ফল ও মূল ভক্ষণ করিয়া বনে বাস করেন এবং নিত্য শ্রাদ্ধ করেন, তিনি "মুনি-ব্রাহ্মণ"। যিনি নিত্য বেদান্ত পাঠ করেন, সর্ব্ব সঙ্গ পরিত্যাগ করেন এবং সাংখ্য-যোগ-বিচারপটু, তাঁহাকে "দ্বিজব্রাহ্মণ" বলে। সর্ব্বসম্মুখে সংগ্রামে যাঁহার দ্বারা ধনুর্দ্ধর বীরপুরুষগণ অস্ত্রাহত ও পরাজিত হন, তাঁহাকে "ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ" বলে। যিনি কৃষিকর্ম্মে রত, গোপালনকারী এবং বাণিজ্য ব্যবসায় করেন, তিনি "বৈশ্য ব্রাহ্মণ"। যিনি লাক্ষা, লবণ, কুসুম্ভ, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু এবং মাংস বিক্রয় করেন, তাঁহাকে "শূদ্র ব্রাহ্মণ" বলে। যিনি চোর, তস্কর (বলপূর্ব্বক ধনাপহারী), সূচক (কুপরামর্শ দাতা), দংশক (কটুভাষী) এবং মৎস্যমাংসে সর্ব্বদাই লোলুপ, তাঁহাকে "নিষাদ ব্রাহ্মণ" বলে। ব্রহ্মের (বেদ এবং পরমাত্মা) তত্ত্ব কিছুই জানেন না, অথচ পৈতা গাছটির গর্ব্ব করিয়া থাকেন, সেরূপ পাপী ব্রাহ্মণকে "পশু" বলে। যে নিঃশঙ্ক চিত্তে কূপ, তড়াগ, সরোবর ও সাধারণের উপভোগ্য উদ্যানকে নষ্ট করে বা ব্যবহার বন্ধ করে, সেরূপ ব্রাহ্মণকে "ম্লেচ্ছ" বলে। বৈদিক ও স্মার্ত্তকর্ম্মহীন, মূর্খ, সর্ব্বধর্ম্ম রহিত, সকল জীবের প্রতি নির্দ্দয় এরূপ ব্রাহ্মণকে "চণ্ডাল" বলিয়া থাকে। অত্রিসংহিতা —৩৬৪—৩৭৪ শ্লোক।*"

বৃত্তি, চরিত্র এবং কর্ম্ম এরূপ ঘোরতর নিন্দনীয় হইলেও সেকালে তিনি সর্ব্ব বর্ণের পূজনীয় বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইতেন; আজও সেই আচার ঠিক সেই রূপই চলিতেছে। হাইকোর্টের প্রধান বিচারকই হউন, মহামহোপাধ্যায় নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতই হউন অথবা দারোয়ান, মুটে, কসাই, হোটেল-ওয়ালা, রুটিওয়ালাই হউন, ব্রাহ্মণ হইলেই তিনি "আর্য্য" বলিয়া পরিগৃহীত হইতেছেন।†

ব্রাহ্মণের পরই ক্ষত্রিয়ের সম্মান এখনও আমাদের সমাজের সর্ব্বত্র অব্যাহত রহিয়াছে; তাই ব্রাহ্মণের পর ক্ষত্রিয়ের সম্বন্ধে কিছু বলিব। অভিধানে "ক্ষত্রিয়" শব্দের পর্য্যায়ে "ক্ষত্র", "রাজা", "রাজন্য" এবং "বাহুজ" শব্দগুলি দেখিতে পাওয়া যায়*। ইতঃপূর্ব্বে, চতুর্থ প্রস্তাবে, ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তির ইতিহাস

---

* দেবো মুনি দ্বিজো রাজা বৈশ্য শূদ্রো নিষাদকঃ।
পশু ম্লেচ্ছোঽপি চাণ্ডালো বিপ্রা দশবিধাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৬৪ ॥
সন্ধ্যাং স্নানং জপং হোমং দেবতা নিত্যপূজনম্।
অতিথিং বৈশ্বদেবং চ দেবব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥ ৩৬৫ ॥
শাকে পত্রে ফলে মূলে বনবাসে সদা রতঃ।
নিরতোঽহরহঃ শ্রাদ্ধে স বিপ্রো মুনিরুচ্যতে ॥ ৩৬৬ ॥
বেদান্তং পঠতে নিত্যং সর্ব্বসঙ্গং পরিত্যজেৎ।
সাংখ্য যোগ বিচারস্থঃ স বিপ্রো দ্বিজ উচ্যতে ॥৩৬৭ ॥
অস্ত্রহিতাশ্চ ধন্বানঃ সংগ্রামে সর্ব্বসম্মুখে।
আরম্ভে নির্জ্জিতা যেন স বিপ্রঃ ক্ষত্র উচ্যতে ॥ ৩৬৮ ॥
কৃষিকর্ম্ম রতো যশ্চ গবাং চ পরিপালকঃ।
বাণিজ্য ব্যবসায়শ্চ স বিপ্রো বৈশ্য উচ্যতে ॥৩৬৯ ॥
লাক্ষা লবণ সম্মিশ্র-কুসুম্ভক্ষীরসর্পিষাম্।
বিক্রেতা মধুমাংসানাং স বিপ্রঃ শূদ্র উচ্যতে ॥৩৭০ ॥
চৌরশ্চ তস্করশ্চৈব সূচকো দংশকস্তথা।
মৎস্যমাংসে সদা লুব্ধো বিপ্রো নিষাদ উচ্যতে ॥ ৩৭১ ॥
ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্বিতঃ।
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরু-দাহৃতঃ ॥ ৩৭২ ॥
বাপী কূপ তড়াগানামারামস্য সরঃ সুচ।
নিশঙ্কং রোধকশ্চৈব স বিপ্রো ম্লেচ্ছ উচ্যতে ॥ ৩৭৩ ॥
ক্রিয়াহীনশ্চ মূর্খশ্চ সর্ব্বধর্ম্ম বিবর্জ্জিতঃ।
নির্দ্দয়ঃ সর্ব্বভূতেষু বিপ্রশ্চাণ্ডাল উচ্যতে ॥ ৩৭৪ ॥

অত্রিসংহিতা (বঙ্গবাসী)।

† ব্রাহ্মণগণের কোনরূপ গ্লানি বা নিন্দা করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। ব্রাহ্মণ "অর্থ সভ্যতার" মস্তক, সেই মস্তকের অবমাননা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। পাঠকগণ একটু ধৈর্য্যধারণ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন, ইহাই প্রার্থনা।

* "ক্ষত্রং তু ক্ষত্রিয়ো রাজা রাজন্যো বাহুসম্ভবঃ। হেমচন্দ্র।

অথবা শাস্ত্র-সম্মত-প্রবাদ আমরা দিয়াছি। সেই মতগুলি সংক্ষেপে পুনরুক্ত করিতেছি :—

(১) "পুরুষের বাহুদ্বয়কে রাজন্য করা হইল।" পুরুষ সূক্ত, ১১ শ মন্ত্র। মনুসংহিতা প্রথম অধ্যায়।

(২) "ব্রহ্ম শ্রেয়োরূপ ক্ষত্রের সৃষ্টি করিলেন।" বৃহদারণ্যক উপনিষদ্।

(৩) "স্বায়ম্ভুব মনু এবং বৈবস্বত মনুর ঔরসে ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি"। মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ৭৫ অধ্যায়।

(৪) "কশ্যপ ঋষির ঔরসে তাঁহার 'মনু' নাম্নী পত্নীর গর্ভে জাত।" রামায়ণ।

(৫) "প্রথমে কোন বর্ণ ছিলনা, ভগবান্ লোক রক্ষার জন্য ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি করিলেন।" বায়ু এবং ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ।

(৬) "প্রথমে সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন, তন্মধ্যে রজোগুণ সম্পন্ন ব্রাহ্মণেরা পরে ক্ষত্রিয় হইলেন।" মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব।

(৭) "গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ হইতে ভগবান্ (ক্ষত্রিয়) বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছেন। মহাভারত, ভগবদ্-গীতা।

(৮) "রাজা না থাকিলে যে হেতু পৃথিবীতে নানারূপ ভয়ের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে সেই জন্য পরমেশ্বর সকলের রক্ষার জন্য রাজাকে সৃষ্টি করিলেন ॥৩॥" মনুসংহিতা, সপ্তম অধ্যায়। †

"ক্ষত্রিয়" এবং "রাজা" একার্থবাচী হইলেও দুইটি শব্দের দুইটি পৃথক্ নিরুক্তি আছে। "ক্ষত হইতে রক্ষা কর্ত্তা"কে ক্ষত্রিয় এবং "প্রজাদিগের মনোরঞ্জন-কারী"কে রাজা বলিয়া থাকে *।

পৃথিবীতে মানুষের রক্ষক রাজা যেমন ক্ষত্রিয়, স্বর্গাদি লোকের লোকপালগণও ক্ষত্রিয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে লিখিত হইয়াছে যে দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র বরুণ, সোম, রুদ্র, পর্জ্জন্য, যম, মৃত্যু এবং ঈশান ইঁহারা ক্ষত্রিয়। মনু মহারাজও রাজার সৃষ্টির সম্বন্ধে; বলিয়াছেন :—

"পরমেশ্বর ইন্দ্র, বায়ু, যম, সূর্য্য, অগ্নি, বরুণ, কুবের এবং চন্দ্র এই দিক্পালদিগের সারাংশ হইতে রাজার সৃষ্টি করিয়াছেন। যেহেতু এই সকল দেবরাজগণের অংশ লইয়া নৃপতি নির্ম্মিত হইয়াছেন, সেই জন্য রাজার তেজে সকল মনুষ্যই (অথবা প্রাণীই) অভিভূত হইয়া পড়ে। রাজা দর্শকদিগের চক্ষু এবং মনকে সূর্য্যের ন্যায় অভিতপ্ত করিয়া থাকেন এবং তজ্জনাই পৃথিবীতে কেহই তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিতে সমর্থ হয় না। রাজা স্বকীয় প্রভাবের বলে অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ এবং ইন্দ্র হইয়া থাকেন। বয়সে বালক হইলেও রাজাকে 'ইনি মানুষ' এইরূপ মনে করিয়া অবমাননা কর্ত্তব্য নহে; কারণ ইনি মহান্ দেব মানুষের বেশে বাস করিতেছেন। ৪—৮ শ্লোক, সপ্তম অধ্যায়।" †

---

† "অরাজকে হি লোকেঽস্মিন্ সর্ব্বতো বিদ্রুতে ভয়াৎ।

রক্ষার্থমস্য সর্ব্বস্য রাজানমসৃজৎ প্রভুঃ ॥৩॥ মনুসংহিতা সপ্তম অধ্যায়।

অন্যান্য প্রমাণ বাক্য গুলির মূল যথাসম্ভব পূর্ণরূপেই পূর্ব্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে বলিয়া আর এখানে তুলিলাম না, ভবিষ্যতেও এইরূপ প্রমাণের মূল (যাহা একবার পূর্ব্বে অধ্যাহার করা হইয়াছে) উদ্ধার করিব না।

* "ক্ষতাৎ কিল ত্রায়ত ইত্যুদগ্রঃ ক্ষত্রস্য শব্দো ভুবনেষুরূঢ়ঃ ॥৫৩॥ (রঘুবংশ, দ্বিতীয়সর্গ।)

"রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ" ॥১২॥ (রঘুবংশ, চতুর্থসর্গ)

† "ইন্দ্রানিলযমার্কানামগ্নেশ্চবরুণস্যচ।

চন্দ্রবিত্তেশয়োশ্চৈব মাত্রানির্হৃত্য শাশ্বতীঃ ॥৪॥

যস্মাদেষাং সুরেন্দ্রাণাং মাত্রাভ্যোনির্ম্মিতো নৃপঃ।

তস্মাদভিভবত্যেষ সর্ব্বভূতানি তেজসা ॥৫॥

তপত্যাদিত্যবচ্চৈষাং চক্ষুংষি চ মনাংসি চ।

ন চৈনং ভুবি শক্নোতি কশ্চিদপ্যভিবীক্ষিতুম্ ॥৬॥

বৃহদারণ্যক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে যেহেতু উক্ত ইন্দ্রাদি লোকপালগণ ক্ষত্রিয়, সেই জন্য ক্ষত্রিয়ের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই; সেই জন্য ব্রাহ্মণ নিম্নস্থান হইতে ক্ষত্রিয়কে উপাসনা করেন, রাজসূয়ে ক্ষত্রিয়ই পরমাত্মার যশকে ধারণ করেন। মনুসংহিতা সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে, মহাভারতের অনুশাসন এবং শান্তিপর্ব্বে, (সভা,বন ইত্যাদি পর্ব্বেও) এবং বায়ু, মৎস্য, বিষ্ণু, ভাগবত ও মার্কণ্ডেয়াদি মহাপুরাণে রাজার কার্য্য ও ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য খুব বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। রাজনীতির বিষয় স্মৃতি এবং পুরাণাদি শাস্ত্র ভিন্ন কামন্দকীয়, শুক্রাচার্য্যের এবং কৌটিল্যের গ্রন্থে বর্ণিত আছে। বর্ত্তমান প্রস্তাবে তৎসমস্ত সবিস্তারে বলিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। সংক্ষেপে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম ঠিক ব্রাহ্মণের মতই অর্থাৎ যজন, অধ্যয়ন এবং দান; কেবল জীবিকা মাত্র পৃথক্। পূর্ব্বেই পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে যে প্রজার রক্ষণ, পালন এবং যুদ্ধ এই তিনটীই ক্ষত্রিয়ের জীবিকা। রাজার কর্ত্তব্য সংক্ষেপে এই মাত্র বলা হইয়াছে, যে "আপন আপন ধর্ম্মে অবস্থিত সর্ব্ব বর্ণ এবং সর্ব্ব আশ্রমকে রক্ষা করার জন্যই ভগবান্ রাজার সৃষ্টি করিয়াছেন।" †

পুরাতন ভারতবর্ষের "আর্য্যসভ্যতা" বলিতে গেলে ক্ষত্রিয় বর্ণের উন্নতির ইতিহাসকেই বুঝাইয়া থাকে। সৃষ্টির প্রথম সম্রাট্ স্বায়ম্ভুব মনু হইতে আরম্ভ করিয়া যত রাজা এই ভারতবর্ষে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেই "ক্ষত্রিয়"; কেবল মৌর্য্য যুগের পরবর্ত্তী শুঙ্গবংশীয় নৃপতিগণের বিনাশসাধক রাজহন্তা অমাত্য কণ্বগোত্রীয় ব্রাহ্মণ বসুদেব এবং তাঁহার তিন জন বংশধরকে (মগধনাথ, মোট ৪ জন রাজা, রাজত্বকাল ৪৫ বৎসর ‡) পরিত্যাগ করিতে হইবে। স্বায়ম্ভুব মনুর বংশধর মহারাজ চক্রবর্ত্তী পৃথুর নামানুসারে এই ভূতধাত্রী ধরণী "পৃথিবী" নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। স্বায়ম্ভুব মনুর বংশধর গণের নামানুসারেই যে পৃথিবীর জম্বুদ্বীপাদি যাবতীয় মহাদ্বীপ এবং "ভারতা"দি যাবতীয় বর্ষের" নাম করণ হইয়াছে, তাহা প্রথম প্রস্তাবেই উক্ত হইয়াছে। সূর্য্যবংশীয় সম্রাট্ সগরের নামানুসারে অপার মহার্ণব "সাগর" নামে এবং তদ্বংশীয় মহারাজ ভগীরথের নামানুসারে পাপনাশিনী সুরতরঙ্গিণী গঙ্গা "ভাগীরথী" নামে পরিচিত হইয়াছেন। আমাদের "অঙ্গ", "বঙ্গ", "কলিঙ্গ", "পুণ্ড্র", "সুহ্ম" ও "ওড্র" প্রভৃতি প্রদেশের নাম রাজ পুত্রগণের নামানুসারেই চিহ্নিত হইয়াছে। অধিক কি স্মৃতি, পুরাণ ইতিহাস ও কাব্যাদি প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য ক্ষত্রিয় নরপতিগণের কীর্ত্তি কাহিনী দ্বারাই পরিপূর্ণ রহিয়াছে।

বেদের ভাষ্যকার সুপ্রসিদ্ধ সায়নাচার্য্য "ক্ষত্র" শব্দের অর্থ "বল" করিয়াছেন এবং ক্ষত্রিয় জাতি শৌর্য্যবীর্য্যের জন্যই সংসারে এত বিখ্যাত হইয়াছিলেন, তাহা সত্য বটে; তথাপি শুদ্ধ বাহুবলের দ্বারাই কোন জাতি জগতে সভ্যতার সৃষ্টি করিতে পারেনা। জ্ঞান-বিদ্যা-বিরহিত বাহুবল সভ্যসমাজে "পাশববল" নামেই পরিচিত হইতেছে। প্রাচীন ভারতের যে বর্ণ সভ্যতা সূর্য্যালোকের প্রথম রশ্মিপাতে জগতের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া যুগযুগান্তর ধরিয়া এই অমৃতরূপা আর্য্যসভ্যতার বিস্তৃতি সাধন করিয়াছিলেন, জ্ঞান বিজ্ঞানেও সেই বর্ণ অতি শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। জগতের সর্ব্বপ্রাচীন

সোঽগ্নির্ভবতি বায়ুশ্চ সোঽর্কঃ সোমঃ স ধর্ম্মরাট্।
স কুবেরঃ স বরুণঃ স মহেন্দ্রঃ প্রভাবতঃ ॥৭॥
বালোঽপি নাবমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ।
মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি ॥৮॥"

† "স্বে স্বে বর্ণে নিবিষ্টানাং সর্ব্বেষামনুপূর্ব্বশঃ।
বর্ণানা মাশ্রমাণাং চ রাজা সৃষ্টোঽভিরক্ষিতা ॥৩৫॥"
মনুসংহিতা, সপ্তম অধ্যায়।

‡ বায়ুপুরাণ, অধ্যায়, বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ অংশ অধ্যায়, মৎস্যপুরাণ অধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত

সাহিত্য ঋগ্বেদও এই সাক্ষ্য দিতেছে। সেই অতি পুরাতন যুগে পৃথু, বিশ্বামিত্র, দিবোদাস, গৃৎসমদ, নভঃ, আর্ষ্টিষেণ, গার্গ, শিনি, পুরুকুৎস, মান্ধাতা, অম্বরীষ, যুবনাশ্ব, ত্রসদস্যু, আজমীঢ়, ঋষভ, বলি, পৃষদশ্ব, কণ্ব ও মুদ্গল প্রমুখ নরপতি বেদের মন্ত্রদ্রষ্টৃ ঋষিরূপে পূজিত হইয়াছিলেন *। উপনিষদিক যুগেও দেখিতে পাওয়া যায় যে গাঙ্গ্যায়নি চিত্র, দৈবোদাসি প্রতর্দ্দন, কাশিরাজ অজাতশত্রু, বৈদেহ জনক, জৈবলি প্রবাহণ এবং অশ্বপতি কৈকেয় † প্রমুখ রাজর্ষিগণ ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেষ্টারূপে অমর খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক এবং কৌষীতকী উপনিষদ পাঠ করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে বেদের রহস্য অথবা জ্ঞানকাণ্ড এই সকল রাজ সন্ন্যাসিগণের দ্বারাই পৃথিবীতে প্রচারিত হইয়াছিল এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও সেই কাহিনীই স্পষ্টস্বরে বলিয়াছেন ‡। কাশিরাজ ধন্বন্তরিকে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া পৌরাণিক সাহিত্য স্বীকার করিয়াছেন ¶ এবং তাঁহার শিষ্য রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের পুত্র সুশ্রুতের প্রণীত শল্যতন্ত্র প্রধান সংহিতা আজও বিদ্যমান থাকিয়া সেই পৌরাণিক ঐতিহ্যকে সত্য বলিয়া প্রমাণিত করিতেছে। ক্ষত্রিয় বংশাবতংশ শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আজও দেশের সর্ব্বত্র ভগবানের অবতার বলিয়া পূজিত হইতেছেন।

রঘুবংশাবতংশ শ্রীরামচন্দ্র এবং যদুকুলশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র 'আসমুদ্র হিমাচল' ভারত খণ্ডে শ্রীভগবানের অবতার বলিয়া দেশে দেশে গৃহে গৃহে পূজিত হইতেছেন এবং কুরুবংশ ভূষণ ভীষ্মদেব স্বকীয় শৌর্য্যবীর্য্য এবং জ্ঞানের মহাত্ম্যে আজিও আব্রাহ্মণ সকল হিন্দুজাতির পিতৃ-পুরুষ স্বরূপ প্রত্যহ তর্পণ বারি দ্বারা অভিনন্দিত হইতেছেন। উপনিষদুক্ত রাজর্ষিগণ সকলেই ব্রহ্মজ্ঞানে ব্রহ্মর্ষিগণেরও শিক্ষক হইয়াছিলেন এবং পৌরাণিক সাহিত্যে বৈদেহ জনক ব্রহ্মজ্ঞানের আদর্শ শুকদেবেরও গুরু বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ঋগ্‌বেদের মন্ত্রদ্রষ্টৃ ঋষির সম্মান প্রাচীন ভারতে যে কত অধিক ছিল, তাহার ধারণা করাও এখন আমাদের পক্ষে কঠিন হইয়াছে; যেহেতু "বেদ" ও "ঋষি" আমাদের নিকট প্রাণহীন "শব্দ" মাত্রে পরিণত হইয়াছে এবং য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যার ফলে বেদের গাম্ভীর্য্য এবং মাহাত্ম্য শিক্ষিত সমাজে একরূপ "অচল মুদ্রা"র ন্যায় অনাদৃত হইয়াছে। তাই আমরা বুঝিতে পারিনা যে কোন ক্ষত্রিয় রাজাকে বৈদিক মন্ত্রের ঋষি বলিয়া পরিচয় দিয়া শাস্ত্র তাঁহাদের প্রতি কিরূপ অসাধারণ শ্রদ্ধা এবং সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। যে গায়ত্রী (সাবিত্রী গায়ত্রী) মন্ত্রকে সর্ব্ববেদের জননী স্বরূপিণী বলিয়া পূজা করা হইয়া থাকে, কন্যাকুব্জপতি মহাবীর কৌশিক বিশ্বামিত্র সেই মহামন্ত্রের ঋষি। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের নিষ্ঠাবান্ যজমান এবং জ্ঞানকাণ্ডের প্রচারকরূপে প্রাচীন ভারতের ক্ষত্রিয় রাজগণ সত্যই ধরাতলে ধর্ম্মের রক্ষক ছিলেন। ক্ষত্রিয় রাজর্ষিগণের কুল হইতে অনেকগুলি বিখ্যাত ব্রাহ্মণ বংশের উদ্ভব হওয়ার ইতিহাস মহাপুরাণ গুলিতে পাওয়া যায়।

আবার, আমাদের এই দেশে প্রাচীন অথবা নূতন যুগে, জৈন, বৌদ্ধ, এবং শিক্‌খ প্রভৃতি যে সকল জ্ঞান যোগ প্রধান অতি প্রবল অবৈদিক মতের অভ্যুদয় হইয়াছে, সেই সেই ধর্ম্মের নেতা এবং প্রচারকও

* বায়ুপুরাণ, ৫৯ অধ্যায়।

† গাঙ্গ্যায়নিচিত্র (কৌষীতকী), দৈবোদাসি প্রতর্দ্দন (কৌষীতকী) কাশিরাজ অজাতশত্রু (কৌষীতকী ও বৃহদারণ্যক) বৈদেহ জনক (বৃহদারণ্যক) জৈবলি-প্রবাহন (ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক) অশ্বপতি কৈকেয় (ছান্দোগ্য)

‡ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—চতুর্থ অধ্যায় প্রথম হইতে তৃতীয় শ্লোক।

¶ বিষ্ণুপুরাণ।

ক্ষত্রিয়ই ছিলেন। সত্যযুগে স্বায়ম্ভূব মনু বংশীয় ঋষভদেবই জৈনধর্ম্মের প্রথম আবিষ্কর্ত্তা এবং তিনিই "আদিনাথ" নামে জৈন জনসমাজে পরিচিত। জৈন ধর্ম্মের চতুর্বিংশতি তীর্থঙ্করের মধ্যে শেষ তিন জন অর্থাৎ নেমিনাথ, পার্শ্বনাথ এবং মহাবীর স্বামী,—এবং বৌদ্ধ-ধর্ম্মের শেষ বুদ্ধ গৌতম, 'শিক্‌খসংঘের আদিগুরু বাবা নানক, ধর্ম্মের জন্য স্বেচ্ছায় ও সানন্দে আত্মবলি দাতা গুরু মহাতেজস্বী তেগ বাহাদুর শিক্‌খসংঘের ভিতর বীর্য্যবহ্নির উৎপাদক অমানুষ চরিত গুরু গোবিন্দ সিংহ, ইঁহারা সকলেই ক্ষত্রিয় ছিলেন।

শৌর্য্যেবীর্য্যে যাঁহারা পৃথিবীতে অজেয়, চারিত্রের গাম্ভীর্য্যে ও মাধুর্য্যে যাঁহারা সুসভ্য মানবের আদর্শ, ধর্ম্মে যাঁহারা কোটি কোটি মানবের গুরু, রাজনীতির প্রকৃত পরিচালনেও তাঁহারা অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা লাভ করিবেন, তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? রামায়ণ বর্ণিত "রাম রাজ্যের" অথবা কবি কালিদাস বর্ণিত "রঘুবংশ" কাব্যে সূর্য্যবংশীয় রাজগণের যে বিস্তৃত বর্ণনা আছে, তাহা পাঠ করিলে প্রকৃতই বিস্মিত হইতে হয়। মনুসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রে "রাজধর্ম্মের" যে উপদেশ আছে, তাহা যিনি পাঠ করিয়াছেন, তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন। তবে, আমাদের অদৃষ্টদোষে দেশের প্রাচীন ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান এবং শিক্ষা দেওয়ার ভার বিদেশী পণ্ডিতের হস্তে ন্যস্ত হওয়ায় আমাদের সমাজের শিক্ষিত সজ্জনেরাও দেশের সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা করিতে পারেন নাই। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের বিদ্যা ও বুদ্ধির পরিমাণ, তাঁহাদের চরিত্রের ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্য, অনুসন্ধানের নিষ্ঠা এবং কর্ম্মে অনুরাগ ও অধ্যবসায় প্রকৃতই অসাধারণ; কিন্তু তাঁহারা,—অন্ততঃ তাঁহাদের অনেকেই,—আমাদের দেশের ও প্রাচীন সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি সম্পন্ন নহেন এবং আমাদের উপর তাঁহাদের সমবেদনাও তদ্রূপ প্রবল নহে। যে কারণেই হউক, য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের মনে আমাদের সম্বন্ধে একটা নিতান্ত হীন ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে *। এই জন্য, আমাদের প্রতি স্বাভাবিক সরল সমবেদনার অভাবে, তাঁহাদের অনুসন্ধানের নিষ্ঠা এবং অধ্যবসায় তাঁহাদিগকে বিপথেই লইয়া যায় এবং ফলে তাঁহাদের লিখিত ঐতিহাসিক চিত্র নিতান্তই বিশ্রী ও বিকট হইয়া যায়। তাঁহারা আমাদের সভ্যতার প্রাচীনত্ব, বৈদিক ধর্ম্ম অথবা দর্শনের সারবত্ত, প্রাচীন ভারতবাসীর জ্ঞানের গাম্ভীর্য্য, এবং এ দেশের সে কালের শিল্প-বিজ্ঞান-কলা-কৌশলের সৌন্দর্য্য অথবা শ্রেষ্ঠত্ব, অর্থাৎ সকল বিষয়েই সন্দেহ ও অবিশ্বাস লইয়া গবেষণা আরম্ভ করেন। তাই, আমাদের ঋষি মুনিদিগের বর্ণনাকে তাঁহারা অতিরঞ্জিত, কাল্পনিক এমন কি মিথ্যা বলিতেও কিছুমাত্র পশ্চাৎপদ হন না, অথবা মনে একটুও সঙ্কোচ অনুভব করেন না। তাই তাঁহারা ধরিয়া লইয়াছেন যে রামায়ণের বর্ণিত অযোধ্যা, কিষ্কিন্ধ্যা এবং লঙ্কার সভ্যতা সৌন্দর্য্য এবং সমৃদ্ধির বর্ণনা অথবা মহাভারতের হস্তিনা ও ইন্দ্রপ্রস্থের ঐশ্বর্য্য সকলই কল্পিত কাব্য কথা মাত্র। অধিক কি মহাসাগরের সদৃশ বহু বিস্তৃত সাহিত্যের ভিতর তাঁহারা ইতিহাসের উপাদান আদৌ খুঁজিয়া পান নাই। ইহা তাঁহাদেরও দুর্ভাগ্য, আমাদেরও দুর্ভাগ্য।

রাম এবং যুধিষ্ঠিরের রাজত্বের বর্ণনাকে আমরা কাল্পনিক অথবা মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে কখনই পারিব না। "ঋষয়ঃ সত্যবাদিনঃ"—ঋষিরা অসত্য

* "That Europeans should believe, as a matter of course, in the vast superiority of Europeans, not only now, but always, is psychologically interesting."

P. 43, Dr. Rhys. Davis "Buddhist India."

অথচ ডাক্তার রিস ডেভিসের নিজের মনস্তত্ত্ব এই বিশেষত্বের প্রভাবে যে নিতান্ত প্রভাবান্বিত তাহা আমাদের "বৌদ্ধধর্ম্ম" শীর্ষক (প্রথম প্রস্তাব) প্রবন্ধে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি।

বলেন না, —বলিতে পারেন না। আর যাঁহারা রামায়ণ মহাভারতের বর্ণনাকে কাব্য-কথা বলিয়া উপেক্ষা করিতে সাহস করিবেন,—সামবেদীয়া। "ছান্দোগ্য উপনিষদের" বাণীকে তাঁহারা কি বলিয়া উপেক্ষা করিবেন? "বেদ-বাক্য"ও কি নূতন শিক্ষিত ঋষি-বংশধরগণের নিকট উপেক্ষিত হইবে? কে জানে? আমাদের নব্যশিক্ষায় মনকে এরূপ এক অদ্ভুত ব্যাধিতে ধরিয়াছে যে আমরা বেদব্যাস অথবা বাল্মীকি ঋষির কথা বিনা বিচারে, অসঙ্কোচে, তুচ্ছ করিয়া উড়াইয়া দিতে পারি;—অথচ য়ুরোপের যে কোন অধ্যাপকের কথাকে মাথা পাতিয়া মানিয়া লই! এ রোগ কি প্রকৃতই বিস্ময়কর নহে? আমাদের শাস্ত্র বলিয়াছেন, "বিনা প্রমাণে কাহারও কথা লইবে না।"

তবে, আপ্তবাক্য আমাদের মতে প্রমাণ। বৈদিকী শ্রুতি সেই আপ্তবাক্য। সেই আপ্তবাক্য ছান্দোগ্যশ্রুতি প্রকাশ করিয়াছেন যে অতি প্রাচীন কালে কেকয় দেশে এক ব্রহ্মজ্ঞ রাজর্ষি রাজত্ব করিতেন। তিনি সেই প্রসিদ্ধ অশ্বপতি কৈকেয়। তাঁহার রাজত্ব কালে কেকয় দেশের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার পরিচয় তিনি নিজেই দিয়াছেন। তিনি প্রসন্ন চিত্তে বলিতেছেন,—

"আমার রাজ্যে, পরদ্রব্যাপহারী নাই, সৎকার্য্যে অর্থব্যয় করিতে পরাঙ্মুখ কেহ নাই, মদ্যপায়ী কেহ নাই, প্রত্যহ অগ্নিহোত্র করে না, বেদজ্ঞ নহে, এমন ব্যক্তি কেহই নাই; ব্যভিচার করিতে পারে এরূপ পুরুষ কেহ নাই,—ব্যভিচারিণী নারী কোথা হইতে আসিবে? ৫।১১শ খণ্ড, ৬ষ্ঠপ্রপাঠক। *

আদিকবি বাল্মীকি, সূর্য্যবংশীয় মহারাজ দশরথের রাজ্যশাসন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা যেন এই শ্রুতিবাণীর অনুবাদ। আমাদের অবশ্য প্রাণের ইচ্ছা যে হিন্দু হউন অথবা নাই হউন, প্রত্যেক ভারতবাসী বাল্মীকির রামায়ণ এবং বেদব্যাসের মহাভারত সমগ্র পাঠ করুন। আমরা নিঃশঙ্কচিত্তে বলিতে পারি, যিনি এই মহাগ্রন্থ দুইখানি পড়িবেন, তিনিই পরম উপকৃত এবং পরিতুষ্ট হইবেন। এখানে স্থানাভাবে, রাজা দশরথের রাজ্যের অবস্থার বর্ণনার দুই চারিটি কথা মাত্র আমরা বলিতেছিঃ—

"সেই রাজ্যে কেহ অগ্নিহোত্র-পরাঙ্মুখ, যজ্ঞবিরত, "ছোটলোক, তস্কর, অসভ্য কিংবা সাঙ্কর্য্যদুষ্ট ছিলনা। কামী, কৃপণ, নিষ্ঠুর, মূর্খ অথবা নাস্তিক (বেদ-নিন্দক) কোন পুরুষ অযোধ্যায় দৃষ্ট হইবার উপায় ছিলনা। সমুদায় নরনারীই সুসংযত, ধর্ম্মশীল ছিলেন এবং চরিত্র ও আচরণের প্রভাবে সকলেই নির্মল মহর্ষি কুলের মত সন্তুষ্ট ছিলেন।" রামায়ণ, আদিকাণ্ড, ষষ্ঠসর্গ †।

অশ্বপতি কৈকেয় রাজার মত কয়জন রাজা এই কালে বুকে হাত দিয়া বলিতে পারেন যে তাঁহার রাজ্যে চোর, মূর্খ, কৃপণ, মাতাল, কুচরিত্র অথবা অধার্ম্মিক লোক কেহই নাই?

আমরা যতদূর দেখিলাম, তাহাতে আমাদের প্রাচীন সমগ্র শাস্ত্রগ্রন্থই ক্ষত্রিয় বর্ণের জন্ম, কর্ম্ম, চরিত্র, জীবিকা এবং মাহাত্ম্যের বর্ণনায় পরিপূরিত;—সুতরাং ক্ষত্রিয়ের আর্য্যত্ব সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ ছিলনা। বর্ত্তমান কালে ক্ষত্রিয় জাতির অবস্থা ও নিবাসস্থানের সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব। তবে, এখানে এই মাত্র বলিয়া রাখিতে চাই যে পৌরাণিক সাহিত্যে এবং তাহার পরে "নিবন্ধ"

* "ন মে স্তেনো জনপদে ন কদর্য্যো ন মদ্যপঃ। নানাহিতাগ্নির্নাবিদ্বান্ ন স্বৈরী স্বৈরিণী কুতঃ ॥৫॥ ১১শ খণ্ড, ৬ষ্ঠ প্রপাঠক।

† "নানাহিতাগ্নির্নাযজ্বা ন ক্ষুদ্রো বা ন তস্করঃ।
কশ্চিদাসীদযোধ্যায়াং ন চাবৃত্তো ন সংকরঃ ॥
কামী বা ন কদর্য্যো বা নৃশংসঃ পুরুষঃ ক্বচিৎ।
দ্রষ্টুং শক্যমযোধ্যায়াং নাবিদ্বান্ ন চ নাস্তিকঃ ॥
সর্ব্বে নরাশ্চ নার্য্যশ্চ ধর্ম্মশীলাঃ সুসংযতাঃ।
মুদিতাঃ শীলবৃত্তাভ্যাং মহর্ষয় ইবামলাঃ॥"
রামায়ণ, আদিকাণ্ড, ষষ্ঠসর্গ।

ব্রহ্মবর্ণীতে কলিযুগে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য বর্ণের অভাব ঘোষণা করা হইয়াছে এবং এ সম্বন্ধে আমাদের বাঙ্গালী স্মার্ত্ত স্বনামধন্য (স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য) রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যই বোধ হয় সকলের অগ্রে গমন করিয়াছেন। তিনি স্মৃতি বিশেষের দোহাই দিয়া বলিয়াছেন,—

"কলিযুগে মাত্র দুইটি জাতি আছে, যথা ব্রাহ্মণ আর শূদ্র।" *

এই স্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে "দুইটি জাতি"র কথা বলা হইয়াছে, "বর্ণ" বলা হয় নাই। কলিতে "ক্ষত্রিয়" বর্ণের লোকের দুই একটি উপাখ্যান কোন কোন পুরাণে আছে বটে কিন্তু বৈশ্যবর্ণের অন্তর্ধানের কোন কথা কোথাও পাওয়া যায় না। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে আমরা স্বতন্ত্র ভাবে পরে আলোচনা করিব।

আর্য্য শ্রেণীর গণনায় ক্ষত্রিয়ের পরই বৈশ্যের স্থান হিন্দুশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বৈশ্যও দ্বিজ সুতরাং তাহারও ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে সমান, অর্থাৎ অধ্যয়ন, যজন এবং দান; তবে বৈশ্যের জীবিকা অবশ্যই পৃথক,—অর্থাৎ কৃষি, পশুপালন, বাণিজ্য এবং সুদ গ্রহণ। প্রাচীন কালে দুই চারি জন বৈশ্য-কুলোদ্ভব ব্যক্তির ব্রাহ্মণত্ব লাভের এবং বৈদিক মন্ত্র দর্শনের কথা শাস্ত্রে থাকিলেও বৈশ্যের পক্ষে ধর্ম্মোপদেশকের পদলাভের অথবা কোন সম্প্রদায় প্রবর্ত্তনের বড় একটা নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না। দেশের ধনাগমের যাবতীয় উপায় বৈশ্যবর্ণের হস্তে একান্ত অর্পিত থাকায় তাঁহাদের পক্ষে অপরা অথবা পরা বিদ্যালাভের সেরূপ সুবিধা ছিল না এবং তজ্জন্যই সাহিত্যের উপর তাঁহাদের বড় একটা প্রভাব পড়ে নাই। তবে বাণিজ্যব্যপদেশে দেশে এবং বিদেশে গতায়াত নিবন্ধন বৈশ্য বর্ণের দ্বারা আর্য্য সভ্যতার প্রচার পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র হইয়াছিল এবং তাঁহাদিগের দ্বারা বিদেশী মহার্ঘ পণ্যের সহিত বিদেশীয় সভ্যতানুমোদিত বেশ ভূষা বিলাসাদির ও এ দেশে প্রচলন হইবার সুবিধা ঘটিয়াছিল। ধার্ম্মিক এবং ধনী বৈশ্যগণের দ্বারা জনপদ এবং নগর সমূহের বিবিধ সমৃদ্ধি এবং শ্রীবৃদ্ধি সাধিত এবং কূপ, তড়াগ, আরাম, পান্থ নিবাস ও আতুর-নিবাসাদি (Hospital) জনহিতকর নানা কার্য্য অনুষ্ঠিত হইত। বৈশ্যগণ বৈদিক কাম্য কর্ম্মাদির অনুষ্ঠানে এবং ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞাদিতে প্রচুর ধন ব্যয় করিতেন। প্রকৃত পক্ষে ধনের দ্বারা তৎকালের সভ্যতা, ধর্ম্ম এবং লোকাচারের অনুমোদিত যে সকল সৎকর্ম্ম করা লোকের পক্ষে সম্ভব ছিল, কমলার প্রসাদ-ভাজন শ্রেষ্ঠিগণ তাহার সকলগুলিই করিতেন। তাই ব্রাহ্মণের বিদ্যা, ক্ষত্রিয়ের প্রতাপ এবং বৈশ্যের ধনসম্পত্তি, ত্রিবর্ণের এই তিন শক্তির সহায়তায় জগতের অত্যাশ্চর্য্য আর্য্য সভ্যতার এরূপ পৃথিবীব্যাপিনী প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

মনুসংহিতার মত প্রাচীন গ্রন্থেও সে কালের ব্রাহ্মণ বর্ণের লোকদিগের যেরূপ নানা প্রকার হীন জীবিকার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য বর্ণের ব্যক্তিগণের তাদৃশ অনাচারের কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। আজও এই ভারত খণ্ডের সর্ব্বত্রই বর্ণ গুরু ব্রাহ্মণ অত্যুচ্চ হইতে হীনাদপি হীন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করিতেছেন কিন্তু যাঁহারা ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন,তাঁহাদের মধ্যে অশুচি ও নিকৃষ্ট জীবিকা অবলম্বনকারীর সংখ্যা অধিক দেখা যায়না। অথচ, কালের বিড়ম্বনা বশতঃ পাতিত্যজনক ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া এবং বেদ অথবা পরব্রহ্মের সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র জ্ঞান না রাখিয়াও ব্রাহ্মণ সদর্পে "বর্ণগুরু" বলিয়া সর্ব্বত্র সম্মান আদায় করিতেছেন আর জাতীয় জীবিকা এবং শাস্ত্রানুমোদিত সদাচার অব্যাহত রাখিয়াও ক্ষত্রিয় বৈশ্য নিজ নিজ বর্ণের উপযুক্ত স্থান ও মান পাইতেছেন না; বরং অনেক স্থলে "শূদ্র" বলিয়াই গৃহীত এবং অবমানিত হইতেছেন। কেহ কেহ রসিকতা করিয়া বলেন যে তথাকথিত শাস্ত্রীয় শ্লোকে যেরূপ অহল্যা দ্রৌপদী প্রভৃতি সতীর তালিকায় গণিত হইয়াছেন কিন্তু সীতা ও সাবিত্রী

* "যুগে জঘন্যে দ্বে জাতী ব্রাহ্মণঃ শূদ্র এবচ।"

তাহাতে স্থান পান নাই,—ইহাও তদ্রূপ কোন "নির্বিবেক বিধাতার" কার্য্য। এরূপ আক্ষেপ করিয়া ছাড়িয়া দিলে আমাদের চলিবে না,—সুতরাং আমরা অতঃপর ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বর্ত্তমান অবস্থা ও অবস্থান সম্বন্ধে বিবেচনা করিব। আশা করি, অনুসন্ধান ভাল করিয়া করিতে পারিলে "আর্য্য কে ?" এই প্রশ্নের সদুত্তর মিলিবে।

ক্রমশঃ

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

বিবাহ ও দীর্ঘ জীবন।

বিবাহের দোষ গুণ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া বৈজ্ঞানিক-গণ দেখাইতেছেন যে উপযুক্ত অল্প বয়সে বিবাহ দ্বারা ব্যক্তিগত, সমাজিক ও জাতীয় উপকার সাধিত হয়। যদি আমরা দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে বা নানা প্রকার রোগের হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে চাই অথবা উন্মত্তের সংখ্যা হ্রাস, আত্মহত্যা ও পাপানুষ্ঠানের প্রবৃত্তি খর্ব্ব করিতে চাই তবে কি স্ত্রী কি পুরুষ উভয়ের মধ্যেই অবিবাহিতের সংখ্যা যথা সম্ভব কমাইবার উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। ইহা দ্বারা এমন কথা বলা হইতেছে না যে উদ্বাহ মানবের অধিকাংশ দুঃখ বিপত্তির অব্যর্থ প্রতিষেধক বা একমাত্র মহৌষধি কিন্তু এটুকু নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য অটুট রাখিবার কি দীর্ঘজীবন লাভ করিবার পক্ষে কৌমার্য্যের অপেক্ষা উদ্বাহবন্ধন অধিকতর অনুকূল।

বিবাহিত ব্যক্তি চিরকুমার অপেক্ষা দীর্ঘজীবি হয়েন। স্কটল্যাণ্ডের একলক্ষ লোকের মৃত্যু তালিকা পর্য্যালোচনায় দেখা গিয়াছে যে ২৫—৩০ বয়স্ক মৃতের মধ্যে ৮৬৫ জন বিবাহিত এবং ১৩৬৯ জন অবিবাহিত। ৬৫ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্কদিগের মধ্যে মৃত্যুর হার বেশী হইবে বলিয়া আমাদের মনে হয় কিন্তু পরিণত বয়স্কদিগের মধ্যে চির কুমারদিগের অপেক্ষা বিবাহিত ব্যক্তিগণের বাঁচিবার সম্ভাবনা অধিক। ৬৫—৭০ বৎসর বয়সের মধ্যে অবিবাহিত ১০১৪৩ জন এবং বিবাহিত ৮০৫৫ জনের মৃত্যু হইয়াছে। ৮০—৮৫ বয়স্ক মৃতদিগের মধ্যে অবিবাহিতের অপেক্ষা বিবাহিতের সংখ্যা ২০০০ কম।

যদিও প্রসবকালে বিবাহিত স্ত্রীলোকদিগের জীবনের আশঙ্কা আছে, তথাপি চিরকুমারীদিগের অপেক্ষা পরিণীতা দীর্ঘায়ু হয়েন। ফ্রান্স দেশে অনুসন্ধানে দেখা গিয়াছে যে পঞ্চাশের উর্দ্ধকালে কুমারীদিগের মধ্যে বিবাহিতের অপেক্ষা মৃত্যুর হার অনেক অধিক।

বারটীলন (Bertillon) সাহেব যিনি এই সকল তত্ত্বানুসন্ধানে অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন তিনি প্রমাণিত করিয়াছেন যে ১০০০ জন লোকের মধ্যে ৩৫—৪০ বৎসর বয়সে মৃত্যুর সংখ্যা চিরকুমার, বিপত্নীক এবং বিবাহিতের মধ্যে যথা ক্রমে ১৩, ১৭ এবং ৭।

পরিণয় যে রোগ প্রতিরোধ করিতে অধিকতর সক্ষম তাহা অনুসন্ধান দ্বারা নিঃসন্দেহ ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। ষ্ট্রাসবার্গ নগরে meningitis রোগের প্রাদুর্ভাব সময়ে বিবাহিত ব্যক্তির অপেক্ষাকৃত অব্যাহতির একটী প্রণিধান যোগ্য দৃষ্টান্ত ; তখন ৯০ জন মৃতের মধ্যে পরিনীত স্বামী স্ত্রীদিগের মৃত্যু সংখ্যা মাত্র ১৯ হইয়াছিল।

কতিপয় খ্যাতনামা বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বলিয়া আসিতেছেন যে উদ্বাহ কতকগুলি বিশেষ রোগ হইতে স্ত্রী জাতিকে রক্ষা করে। স্নায়বিক এবং মানসিক স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের মধ্যে বিবাহিতের অপেক্ষা কৌমার্য্য ব্রতাবলম্বীদিগকে অধিকতর পরিমাণে কষ্ট দিয়া থাকে। ৭৬৪ জন উন্মাদ পুরুষের ৪৯২ জন চিরকুমার, ৫০ জন বিপত্নীক এবং ২০১ জন পরিণীত। স্ত্রী জাতীর মধ্যে কুমারী উন্মাদের সংখ্যা বিবাহিতার তিন গুণ।

আত্মহত্যাকারীদিগের সংখ্যা পর্য্যালোচনা করিয়া De Beromont সাহেব দেখিতে পান যে অবিবাহিতের সংখ্যা বিবাহিতের দ্বিগুণ। স্ত্রী পুরুষ উভয় শ্রেণীর বিশেষতঃ স্ত্রী জাতির মধ্যে যাহারা ভগ্ন স্বাস্থ্য বা চিররুগ্ন

বলিয়া বিবেচিত হইতেন তাহারা প্রায়ই বিবাহের পর পূর্ণ স্বাস্থ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন। পাপানুষ্ঠানের প্রবৃত্তির উপর বিবাহের প্রভাব পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগের শতকরা ৬০ জন অবিবাহিত।

বিবাহের উপযুক্ত বয়স ২৫ অপেক্ষা কম হওয়া উচিত; ইহাই বৈজ্ঞানিকগণের মত কিন্তু উহা নিরূপিত হয় নাই।

এতৎ সম্পর্কে কেহ অনুগ্রহ করিয়া লিখিলে বাধিত হইব।

মিলন

তোমার সনে আমার মিলন
চিরদিন এ হৃদয় মাঝে।
তোমার সুরে হৃদয় ভরা
তোমারি গান্ প্রাণে বাজে।
নিত্যি সকাল সন্ধ্যা বেলা,
তোমার সনে আমার খেলা,
নিখিল শোভা গন্ধ গানে
তুমি আমার কাছে কাছে।
স্নেহের চোখে চেয়ে থাক,
পরশ দিয়ে দাড়িয়ে রাখ।
নীল আকাশে নয়ন তোমার
হাওয়ায় তোমার পরশ রাজে।
তোমার সনে আমার মিলন
চিরদিন এ হৃদয় মাঝে।

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত

রাজা হরিনাথের চন্দন।

খুলনা জেলার অন্তর্গত সুলতানপুর খড়রিয়ার ভূতপূর্ব্ব জমিদার বৈদ্য রায় চৌধুরী বংশের প্রতিষ্ঠাতা জানকী বল্লভ বিশ্বাস বঙ্গের শেষ বীর মহারাজ প্রতাপাদিত্যের দরবারে কার্য্য করিয়া পুরস্কার স্বরূপ সুলতানপুর খড়রিয়া ও বেলফুলিয়া নামক পরগণাদ্বয়ের জমিদারী স্বত্ব লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে মানসিংহের সহিত সংঘর্ষে প্রতাপাদিত্যের পতন হইলে যখন সমগ্র যশোহর রাজ্য মোগল বাদশাহের করতল গত হইল, তখন সঙ্গে সঙ্গে জানকীবল্লভও বিত্তচ্যুত হইলেন। পরে এই জানকী বল্লভের পৌত্র হরিনাথ দিল্লীর তদানীন্তন সম্রাট্ জাহাঙ্গীর শাহের নিকট দরবার করিয়া তাঁহার নিকট হইতে 'রাজা' উপাধিসহ পরগণাদ্বয়ের উপর এক ফরমান লাভ করিয়া আবার জমিদারী দখল করিয়া বসিলেন।

রাজা হরিনাথ বৈদ্য কুলীন সম্প্রদায়ের অন্যতম শাখা বিষ্ণুদাশ বংশোদ্ভব ছিলেন; কিন্তু রাজার বৃদ্ধ প্রপিতামহ নিমদাশ 'দেব' আখ্যাধারী নিম্ন শ্রেণীস্থ বৈদ্য বংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া, অন্যান্য কুলীনবর্গ বিষ্ণুদাশ বংশকে যেন একটু হেয় চক্ষেই দেখিতেন।

এখনকার দিনে জমিদার ও ধনি সম্প্রদায় যেমন বহু অর্থ ব্যয়ে 'রাজা' ও 'রায় বাহাদুর' উপাধি ক্রয় করিতে পারিলেই পরমার্থ লাভ হইল মনে করিয়া কৃতার্থ হয়েন, তখনকার দিনে এমন ছিল না। তখন লোকে অর্থ অপেক্ষা চরিত্র ও আত্ম সম্মান এবং 'রাজছত্র' অপেক্ষা 'কুল ছত্রকে'ই সমধিক মূল্যবান ও সম্মান জনক মনে করিতেন। তাই জমিদারী হাতে পাইয়া রাজা হরিনাথ সর্ব্ব প্রথমে সমগ্র বৈদ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিবার অভিপ্রায়ে 'চন্দন' নামক সামাজিক ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের উদ্যোগ করিলেন। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে কুলীন অকুলীন সমস্ত বৈদ্য সন্তানকে নিমন্ত্রণ করিতে হয়। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সমবেত হইলে নির্দ্দিষ্ট দিবসে এক সভার অধিবেশন হয়। এই সভার সর্ব্বপ্রধান স্থানে সমাজপতি এবং তাঁহার উভয় পার্শ্বে সমস্ত বৈদ্যগণ নিজ নিজ কুল গৌরব অনুসারে যথা ক্রমে আসন পরিগ্রহ করেন। পরে কর্ম্মকর্ত্তা সভায় আগমন করিয়া তাঁহার নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলে প্রধান কুলাচার্য্য সর্ব্ব প্রথম কর্ম্ম কর্ত্তার ললাটে চন্দন দ্বারা তিলক প্রদান

করিয়া ক্রমে সমাজপতি ও উপস্থিত বৈদ্য সন্তানগণের ললাটে তিলক প্রদান পূর্ব্বক, কার্য্য শেষ করেন। এ উপলক্ষে আহূত ব্যক্তিবর্গ বংশ মর্য্যাদানুসারে কর্ম্মকর্ত্তার নিকট বিদায় পাইয়া থাকেন। এই অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করিতে পারিলেই কর্ম্মকর্ত্তা স্বসম্প্রদায়ের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া গণনীয় হন।

রাজার আহ্বানে সমগ্র বৈদ্য-সম্প্রদায় মূলঘর গ্রামে সমবেত হইলেন; কিন্তু রাজা হরিনাথকে চন্দন অনুষ্ঠানের দ্বারা বৈদ্য সম্প্রদায় মধ্যে শীর্ষ স্থান অধিকার করিবার আয়োজনে ব্যাপৃত দেখিয়া কুলীনবর্গের সকলেরই গাত্র দাহ উপস্থিত হইল—তবে হরিনাথ তখন প্রবল পরাক্রান্ত জমিদার। কে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহসী হইবেন? কিন্তু রাজার সফলতা ভগবানেরও বুঝি অভিপ্রেত ছিল না। তাই যশোহর বেন্দা নিবাসী কায় দাস বংশীয় রামকান্ত ঘটক বিশারদ নামক জনৈক যুবক কুলাচার্য্য সমগ্র কুলীন সম্প্রদায়ের মান রক্ষার নিমিত্ত রাজার অনুষ্ঠানে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। রামকান্ত নির্ভীক, সুকবি ও স্পষ্টবাদী ছিলেন। রাজদ্বেষী কুলীন বর্গ তাঁহার কৃতকার্য্যতার উপর নির্ভর করিয়া সময়ের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে রাজবাটীর প্রশস্ত প্রাঙ্গনে এক মহতী সভার অধিবেশন হইল। সমগ্র বৈদ্য সন্তান সহ সমাজপতি এবং স্বয়ং কর্ম্ম কর্ত্তা রাজা হরিনাথ স্ব স্ব আসনে উপবেশন করিলে কুলাচার্য্য রামকান্ত নিম্নলিখিত শ্লোকে সভাবর্ণন করিলেন:—

সভা বিরিঞ্চে র্মধুসূদনস্য,
সেয়ং তৃতীয়া শশি শেখরস্য।
শক্রস্য তুর্য্যাতব পঞ্চমীয়ং,
ষষ্ঠীন গোষ্ঠী নরনাথ আস্তে॥

সভা বর্ণন শেষ করিয়া রামকান্ত আসন পরিগ্রহ করিলে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—'সভায় সমস্ত বৈদ্য সন্তান উপস্থিত হইয়াছেন কিনা'? রাজার প্রশ্ন শুনিয়া সকলেই মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিলেন—সকলের ব্যগ্র দৃষ্টি রামকান্তের উপর নিপতিত হইল। সকলেই রুদ্ধ নিশ্বাসে উত্তরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন নির্ভীক যুবক রামকান্ত সতেজে সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিলেন:—

'সমাগতা ন দেবা নরদেব সংসদি'

রামকান্তের উত্তর দ্ব্যর্থবোধক। সরল অর্থে "হে নরদেব! আপনার সভায় দেবতারা ব্যতীত আর সকলেই উপস্থিত হইয়াছেন।" আর ব্যঙ্গ অর্থে—'হে নরদেব আপনার সভায় আপনার পিতামহের মাতুল বংশীয় দেব উপাধিধারী বৈদ্যগণ ব্যতীত আর সকলেই উপস্থিত হইয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি চন্দন কার্য্যে সফলতা লাভ করিয়া রাজা হরিনাথ বৈদ্য সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করেন কোন কুলীনেরই এ সাধ্য ছিল না; সুতরাং রামকান্তের উত্তর ব্যঙ্গার্থে গ্রহণ করিয়া হরিনাথের কুল যজ্ঞ বিনষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে সকলেই করতালি দিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। সেই করতালি ও হাস্য ক্রমে কারণানভিজ্ঞ জন সঙ্ঘের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করিয়া সভাস্থলে ভীষণ কোলাহল উত্থিত হওয়ায় সভা ভঙ্গ হইয়া গেল।

রাজা ও রাজ শুভানুধ্যায়িগণ সে বিশৃঙ্খলতা নিবারণ কল্পে বিস্তর চেষ্টা পাইয়াছিলেন—কিন্তু বৃথা সে চেষ্টা। কোলাহল মত্ত জনস্রোত বাঁধ ভাঙ্গা জল স্রোতের ন্যায় সবেগে সভাস্থল হইতে বহির্গত হইয়া রাজার সে চেষ্টা সামান্য তৃণ খণ্ডের ন্যায় ভাসাইয়া লইয়া চলিয়া গেল কুলীন বর্গের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল। রাজা হরিনাথ বড় আশা করিয়াছিলেন, কুলযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া তিনি সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিবেন—কিন্তু ভগবান বাদী; তাঁহার সে আশা পূরিতে পূরিতেও পূরিল না—ইহাকেই বলে অদৃষ্ট।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।
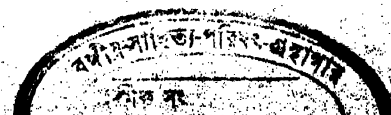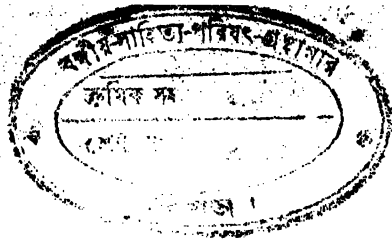
প্রতিভা

১০ বর্ষ　　মাঘ ১৩২৭　　১০ম সংখ্যা

দেহ।

আদিতে জীবের দেহ অতি ক্ষুদ্র একটী মাত্র কোষ ছিল, এখনও বহু সংখ্যক এক-কোষ জীব † আছে। এক-কোষ জীব কাল ক্রমে বহু-কোষ জীবে ¶ বিবর্ত্তিত হইল; এবং নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া এক সময়ে অত্যন্ত বৃহদাকার প্রাপ্ত হইয়াছিল। আবার জীব দেহ ক্ষুদ্র হইতেছে এবং ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে হইতে ধ্বংসের দিকে চলিয়াছে। এই ভাবে ক্ষুদ্র বৃহৎ, ক্ষুদ্র বৃহৎ হইতে হইতে জীব দেহের পরিণাম কিরূপ হওয়া সম্ভব তাহাই কিঞ্চিৎ বুঝিবার চেষ্টা করিব।

প্রথমতঃ এই পৃথিবীতে জীব ছিলনা। ইহার অত্যুষ্ণ তাপ, বায়ু মণ্ডলের অত্যধিক অঙ্গারাম্ল, জলের অতিরিক্ত চূণের ভাগ ক্রমে কমিয়া গেলে সময়ের অবস্থানুরূপ ভিন্ন ভিন্ন জীব-দেহ জাত হইয়াছে। না কমিলে মানব থাকিতেই পারিত না।

প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ধরাপৃষ্ঠে যে সকল স্তর ক্রমে গঠিত হইয়া বর্ত্তমান ধরা রচনা করিয়াছে। তাহাদিগকে সচরাচর তিনটী ভাগে বিভক্ত করা যায়। জীব চিহ্ন বিরহিত স্তর ধরাপৃষ্ঠ হইতে ৬০।৭০ হাজার ফিট নীচে। তাহার উপর হইতে বর্ত্তমান ধরাপৃষ্ঠ পর্য্যন্ত স্তরগুলিকে আদি জৈবিক †, মধ্য জৈবিক * ও নব জৈবিক ‡ নাম দেওয়া যাইতে পারে।

আদি জৈবিক স্তর সকলও পরীক্ষা করা যায়। ভূকম্পাদি কারণবশতঃ এবং পৃথিবীর তাপ ক্ষয় জনিত সঙ্কোচন হেতু, ধরাপৃষ্ঠের কোন স্থান ভাঙ্গিয়া নীচে ধরাগর্ভে প্রবেশ করিতেছে। এবং ধরাগর্ভের কোন স্থান উর্দ্ধে উঠিতেছে। ইহাতেই ধরাগর্ভের কতিপয় স্তর আমরা ধরাপৃষ্ঠে বসিয়াই পরীক্ষা করিতে পারি। গভীর খনি ও কূপাদি খনন উপলক্ষেও আমরা ভূগর্ভে কতিপয় স্তর পরীক্ষা করিতে সমর্থ হই। এইরূপে জানা

† Unicellular.
¶ Multicellular.

† Palæzoic.
* Mesozoic.
‡ Cainzoic.

গিয়াছে যে অতি নিম্নে সম্ভবতঃ পাঁচ ছয় মাইলের নীচে ধরাগর্ভে জীবাবশেষ † অথবা কোন প্রকার জীব চিহ্ন নাই। তাহার ঊর্দ্ধে ক্রমেই নানাবিধ জীবাবশেষ ও জীব চিহ্ন * পাওয়া যায়। কিন্তু অত প্রাচীন যুগে আমাদিগের পরিচিত জীবের দেহাবশেষ কিম্বা চিহ্ন প্রায়শঃ পাওয়া যায় না। অল্প যাহা পাওয়া যায় তাহার গঠন ভঙ্গী ঠিক বর্ত্তমান কালের ন্যায় নহে। ক্রমে যতই ধরাগর্ভ হইতে উপরের স্তর পরীক্ষা করা যায়, ততই বর্ত্তমান শ্রেণীর জীব দেহ পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাদিগেরও গঠন-প্রণালী এবং আয়তন বর্ত্তমান যুগের ন্যায় নহে। তদূর্দ্ধে আরও নিকটবর্ত্তী স্তরে বর্ত্তমান সময়ের পরিচিত জীবদেহ পাওয়া যায়। কিন্তু অত্যল্প কালের ¶ পূর্ব্বে মানব দেহের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না।

প্রাথমিক জীব এক-কোষ ছিল। ইহারা ক্রমে খণ্ডিত হইয়া বংশ বৃদ্ধি করিত। একটী কোষ ফাটিয়া দুইটী, দুইটীর প্রত্যেকটী ফাটিয়া দুই-দুইটী, এইরূপে ফাটিয়া ফাটিয়া অসংখ্য জীব দেহ গঠিত হইত। এই সকল এক-কোষ জীব এত ক্ষুদ্র যে ইহাদিগকে প্রবল অণুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতীত দেখা যায় না। ইহারা চব্বিশ ঘণ্টাতে একটী হইতে গড়ে এক কোটী জাত হয়। দৃষ্টান্ত স্থলে ম্যালেরিয়ার কীট, যক্ষ্মা রোগের কীট ইত্যাদির উল্লেখ করা যাইতে পারে। এক-কোষ জীবের দেহ অতিশয় ক্ষুদ্র, তাহাতে কোন রূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাই। কেবল একটী ক্ষুদ্র আবরণের মধ্যে ক্ষুদ্র এক বিন্দু তরল শ্লেষ্মাবৎ পদার্থ মাত্র। কালক্রমে জীব-বিবর্ত্তনের নিয়মানুসারে ঈদৃশ বহু কোষ একত্র যুক্ত ও পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে বহু-কোষ জীবের দেহ রচিত হইল; এবং তাহাতে ক্রমে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বাহুল্য হইয়া উঠিল। দেহের মধ্যে এবং বাহিরে, উভয় দিকেই বিবিধ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বাহুল্য হইল। দেহও ক্রমেই অতি বৃহদাকার ধারণ করিল।

মোটমোটি বলিতে, ধরা গর্ভের ত্রিশ হাজার ফিট নীচে হইতে ষাট হাজার ফিট নীচে পর্য্যন্ত যে সকল মেরুদণ্ডহীন জীবের দেহাবশেষ পাওয়া যায় তাহারা বিবিধ শ্রেণীর ট্রাইলোবাইট্(১), শম্বুক, মোলাস্কা, ক্রাষ্টেসিয়ান্ এবং বহু শ্রেণীর কীট। এইসকল নিম্ন প্রদেশে মেরুদণ্ডযুক্ত জীবদেহ পাওয়া যায় না। "ত্রিশ হাজার ফিটের" উপর হইতে প্রথমে মেরুদণ্ডযুক্ত জীবদেহ পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর প্রথম জীব মৎস্য। এ যুগে সামুদ্রিক এবং ভৌম বৃশ্চিক দেহও পাওয়া যায়। কিন্তু তাহারা বর্ত্তমান মৎস্য ও বৃশ্চিক শ্রেণীভুক্ত হইলেও ঠিক ইহাদিগের মত নহে। তাহাদিগের মধ্যে অতি বৃহৎ কায় কঠিন বহিরাবরণযুক্ত মৎস্য অনেক ছিল; বৃশ্চিকও অত্যন্ত বৃহৎ ছিল। পনের হাজার ফিট নীচে হইতে পঁচিশ হাজার ফিট নীচের স্তরকে অঙ্গারিক স্তর বলা হয়। এই স্তরে এবং ইহার কিছু ঊর্দ্ধে অত্যন্ত বৃহদাকার উভচর জীবদেহ পাওয়া যায়। উহাদিগের অনেকের দেহ অতি কঠিন আবরণে আচ্ছাদিত ছিল; উহাদিগের মস্তকে ও নাসিকায় শৃঙ্গবৎ অস্ত্র ছিল; মুখ হইতে

† Fossil.

* Impressions.

¶ "অত্যল্প" বলিতে লক্ষ লক্ষ বৎসর বুঝিতে হইবে। ধরাগর্ভের স্তর সকল, গঠনের কাল বিবেচনা করিলে লক্ষ বৎসরকে অত্যল্প কাল বলা যাইতে পারে। ভূতত্ববিদ্‌গণ ৫।৭ মাইল ধরাপৃষ্ঠ রচনার কাল এত দীর্ঘ বিবেচনা করেন যে তাহা মনে ধারণা করাই যায় না। মানবের অস্থি ২।৩ শত ফিটের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। ইহাতেই তাহার আবির্ভাব কাল এক লক্ষ হইতে ১০ লক্ষ বৎসর বিবেচিত হইয়াছে।

(১) শ্রীযুক্ত জে, এন, ঘোষ মহাশয় এই শব্দের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন, "ত্রিখণ্ডিত দেহ"।

বাহিরের দিকে বৃহৎ দণ্ড দেখা যাইত। উহারা উভচর হইলেও বর্ত্তমান ভেকাদি উভচর হইতে অত্যন্ত বিভিন্ন আকারের। বর্ত্তমান গণ্ডার ও মহিষের ন্যায় ঐ সকল উভচর জীবের দেহায়তন ছিল। অনেকের দেহ উহাদিগের অপেক্ষাও বৃহৎ ও ভয়ঙ্কর ছিল।

ইহার উর্দ্ধ স্তর পাঁচ হাজার হইতে দশ হাজার ফিট নীচে। এ স্তরে অতি বৃহদাকার সরীসৃপ সকলের দেহাবশেষ পাওয়াযায়। বর্ত্তমান সরীসৃপ (সর্পাদির) দেহ হইতে উহাদিগের দেহ গঠন অতিশয় বিভিন্ন। উহারা এক একটী, বর্ত্তমান যুগের হস্তী অথবা উষ্ট্রের মত বৃহৎ ছিল। বিখ্যাত ডাইনোসর, ষ্টেগোসরাস, পেরিয়েসরাস প্রভৃতি অতিশয় ভীষণ সরীসৃপ এই যুগের। উহারা চতুষ্পদ, বর্ত্তমান গো-সাপদিগের ন্যায়। উহাদিগের দেহ নানাবিধ কঠিন বর্ম্মবৎ আবরণযুক্ত ছিল, পৃষ্ঠে, মস্তকে ও নাসিকার উপরে নানাপ্রকার অস্ত্র ছিল।

এই সকল স্তরের উর্দ্ধে পক্ষী শ্রেণীর জীবাবশেষ প্রথম পাওয়া যায়। কিন্তু সে সকল পক্ষীও বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় নহে। তাহারা বৃহৎ-কায় এবং দন্তবিশিষ্ট ছিল। দন্ত দুই ঠোঁটের অস্থিতেই সংলগ্ন ছিল। এই স্তরের উপরে ধরাপৃষ্ঠের প্রায় তিন হাজার ফুট নীচে অশ্ব, হস্তী ইত্যাদি স্তন্যপায়ী জীবের আবির্ভাব দেখা যায়। কিন্তু সে কালের অশ্ব বর্ত্তমান সময়ের অশ্বের ন্যায় নহে; হস্তীও এখনকার মত নহে। বিখ্যাত ম্যাষ্টোডন্ সে কালের হস্তী এবং বিখ্যাত ফেনাকোডাস্ প্রভৃতি সে কালের অশ্ব। ঐ অশ্বের পায়ে পাঁচটী অঙ্গুলি ছিল। হাইরাথেরিয়স্ নামক সে কালের একপ্রকার অশ্বের সম্মুখের পায়ে চারিটী এবং পশ্চাতের পায়ে তিনটী অঙ্গুলি ছিল। উভয়েরই অঙ্গুলিতে খণ্ডাস্থিও ছিল। সে কালের হস্তীর শুঁড় কাহারও ছোট ছিল; কাহারও দুই পাটী চোয়াল হইতেই বৃহৎ দন্ত বাহির হইত। কাহারওবা উপরের ও নীচের ওষ্ঠদ্বয় অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়া সম্মুখ দিকে আসিত, তন্মধ্য দেশে নীচের চোয়াল হইতে বৃহৎ দন্ত বাহির হইত। নীচের ওষ্ঠ (অর্থাৎ অধর) সঙ্কুচিত হইয়া, নীচের দন্ত লুপ্ত হইয়া এবং নাসিকাগ্র ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া বর্ত্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। এক হাজার দেড় হাজার ফুট নীচেও তিন অঙ্গুলিযুক্ত অশ্বের পদ পাওয়া গিয়াছে। এই স্তরের উর্দ্ধ হইতেই বৃহৎ কায় জীব প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। প্লিওসিন্ স্তর পর্য্যন্ত বৃহৎকায় জীবদেহের চিহ্ন পাওয়া যায়। তাহার উর্দ্ধেই পুনরায় খর্ব্বকায় জীবের আবির্ভাব হইল। বর্ত্তমান আকারের খর্ব্বদেহীগণের চিহ্ন ধরাপৃষ্ঠ হইতে চারিশত পাঁচশত ফুট নীচে পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। ইহারা অনেকেই পরিচিত জীব।

মানবদেহ নবজৈবিক যুগের শেষভাগে পোষ্ট টার্সিয়ারি স্তরে প্রথম পাওয়া যায়। কিন্তু সে মানবদেহও ঠিক বর্ত্তমান মানবের ন্যায় নহে। বানর ও নরগণের মস্তক তুলনা করিলে দেখা যায় যে নাসিকা-মূলের উপর হইতে মস্তকের পিছনের টিপি পর্য্যন্ত করোটীভাগ বানরের ক্ষুদ্র, অনুচ্চ ও প্রায় চ্যাপ্টা; কিন্তু নরগণের মস্তকের ঐ ভাগ অপেক্ষাকৃত অনেক বড়, উচ্চ এবং প্রায় গোলাকার। এতদুভয়ের পার্থক্য অত্যন্ত অধিক। কিন্তু মধ্যবর্ত্তী অবস্থাপন্ন কয়েকটী মস্তক অল্পকাল হইল ভূগর্ভের নানা স্থানে পাওয়া গিয়াছে। যবদ্বীপে, নিয়ান্ডার্থালে এবং আরও কয়েকটী স্থানে ঐ মধ্যবর্ত্তীগণের মাথার খুলি পাওয়া গিয়াছে। সে সকলের উপরি উক্ত করোটীভাগ বানরের ন্যায়ও নহে, মানুষের ন্যায়ও নহে; মাঝামাঝি। সুতরাং সে সকল মস্তক যে জীবের ছিল, তাহাদিগকে বানরও বলা যায় না, মানবও বলা যায় না। তাহারা বানর অপেক্ষা উন্নত, কিন্তু নর অপেক্ষা অবনত। উহাদিগকে (১) জনৈক বৈজ্ঞানিক অর্দ্ধ নর অর্দ্ধ বানর বলিয়াছেন। যাহা হউক, উহারা বর্ত্তমান নরগণের পূর্ব্ববর্ত্তী।

(1) Pithecanthropus erectus Protoman etc.

অতি প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত নানাবিধ জন্তুর একটা সংক্ষিপ্ত অসম্পূর্ণ ইতিহাসের আভাস দিলাম। জানা গেল যে এক সময় এই ধরাতলে কোন জীব ছিলনা; পরে এক-কোষ জীব জাত হয়। ইহারা প্রটোজোয়া † শ্রেণীর অতিশয় ক্ষুদ্র জীব। তৎপরে ক্রমে জীবদেহ বহু-কোষ যুক্ত হইয়া গঠিত হইতে লাগিল; সুতরাং দেহায়তন ও ক্রমে বাড়ীতে লাগিল। কীট, পতঙ্গ, সম্বুক, ক্রাষ্টেসিয়া, মৎস্য উভচর, সরিসৃপ, পক্ষী, স্তন্যপায়ী শ্রেণী, অবশেষে নর শ্রেণী—মোটামুটি এই পর্য্যায়ে জীব দেহ বিবর্ত্ত * বশে ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। জীব দেহ ক্ষুদ্র ছিল, বাড়িতে বাড়িতে প্লিস্তসিন যুগে (স্তরে) অত্যন্ত বৃহদাকার হইয়া গেল। ঐ স্তরেই বৃদ্ধির শেষ সীমা। তৎপর হইতেই সর্ব্বশ্রেণীর জীবদেহ কমিয়া যাইতেছে; এবং নুতন নুতন জীব যাহা জাত হইতেছে তাহারা ও অপেক্ষাকৃত অনেক ক্ষুদ্রাবয়ব হইতেছে। ক্ষুদ্রের কতকাংশ বিবর্ত্তিত হইয়া উচ্চ উচ্চ পদবীতে উন্নত হইয়াছে এবং হইতেছে; তথাপি সেই প্রাচীনকালের বহু ক্ষুদ্র জীব এখন ও প্রায় তদাকারেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। আর, সেই বৃহৎকায় ট্রাইলোবাইট, বৃশ্চিক মৎস্য, উভচর, সরিসৃপগণ এখন কোথায়? তাহারা স্ব স্ব শ্রেণীর অনুপাতে যেমন প্রকাণ্ড তেমনই তাহাদিগের দেহ ও নানাবিধ কঠিন আবরণে এবং তীক্ষ্ণ অস্ত্রাদিতে সুরক্ষিত ছিল। মনে হয় যেন, দৈহিক বিক্রম এবং অস্ত্রবল বিধাতার ধরায় যদি জয়যুক্ত হইবার বিধান থাকিত তবে ইহারা কখনই চির তরে বিনষ্ট হইত না জীবন সংগ্রাম যদি সংগ্রামই হইত তবে ইহারা সে সংগ্রামে নিশ্চয়ই জয়ী হইত। কিন্তু তাহা হয় নাই। তাহারা কালক্রমে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কেবল জলে তিমি, স্থলে হস্তী, উট পক্ষী ইত্যাদি দুই চারিটী বৃহৎকার জীবকে প্রতিনিধি রাখিয়া তাহারা নিঃশেষ হইয়াছে। আজিকার দিনেও দেহের বল অথবা অস্ত্রবলই যদি বিধাতার জগতে জয়ী হইবার বিধান থাকিত। তাহা হইলে সিংহ ব্যাঘ্র মরণোন্মুখ হইত না; প্রায় নিরস্ত্র দুর্ব্বল পিপীলিকা হংস ইত্যাদি জীব ধরাতল ছাইয়া ফেলিত না; অসহায় অরক্ষিত দেহ মানবও জীবরাজ্যের প্রভু হইত না। এখানে মনের জয় ধর্ম্ম-ধৃত মনের জয়। অন্য সমস্তই মুহূর্ত্তমাত্র † মস্তক উত্তোলন করিয়া পরক্ষণেই বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং যাইবে ও।

যাহা হউক এ চিন্তা এ স্থলে সর্ব্বথা প্রাসঙ্গিক হইবে না। আমরা বলিয়াছি, প্লিস্তসিন্‌যুগে জীবদেহ বৃদ্ধির শেষ সীমা প্রাপ্ত হইয়া তৎপর হইতে ক্রমশঃ খর্ব্ব হইতেছে। এই হ্রস্বতা উত্তরোত্তর বাড়িতে বাড়িতে পরিণাম ফল কি হইতে পারে? এই প্রশ্ন অত্যন্ত দুরূহ হইলেও এক কথা অতি পরিষ্কার—তাহা এই যে, যে বিবর্ত্তন-বিধানানুসারে* জীব প্রথমজ শ্রেণী হইতে ক্রমে কালসহকারে নর শ্রেণীতে উপনীত হইয়াছে, সেবিধান এতযুগ কর্ম্ম করিয়া আজি অকস্মাৎ কর্ম্মহীন হইবার কোনই কারণ নাই। নর

---

† Pro tozoa—আমি এই শব্দের বঙ্গানুবাদ করিয়াছি, প্রথমজ।

* জীব বলিতে উদ্ভিদ ও বুঝা যায়। কিন্তু তাহাদিগের কথা এ প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম না। এই মাত্র বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে প্রথমজ শ্রেণী হইতে কতকদুর উন্নত হওয়ার পর এমন এক সময় আসিয়াছিল যে তখনকার জীবদেহ দেখিয়া হঠাৎ বলা যায় না, উহারা উদ্ভিদ কি জন্তু। তৎপর হইতে দুই শাখা বিভক্ত হইয়া এক শাখায় উদ্ভিদ এবং অপর শাখায় জন্তুগণ কাল সহকাল আপন আপন পথে বিবর্ত্তিত হইতেছে।

† Ostrich "দুইচারিশত অথবা হাজার বৎসরকে এই হিসাবে মুহূর্ত্ত বলায় অত্যুক্তি হইতে পারেনা।"

* Law of Evolation.

শ্রেণীতে আসিয়াই বিবর্ত্তন বিধি নিষ্কর্ম্ম হইবে কেন? ইহা অবিশ্বাস্য কথা। সেই প্রাকৃতিক বিধান নিশ্চয়ই আজিও পূর্ব্ববৎ ক্রিয়া করিতেছে। বস্তুতঃ ইহা কোন অনুমান নহে, প্রত্যক্ষ দেখাও যাইতেছে। নরদেহ ও বিবর্ত্তন বিধিবশে আমাদিগের চক্ষুর সমক্ষেই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কিন্তু সে পরিবর্ত্তনের গতি কোন্ দিকে চলিয়াছে?

এই প্রশ্ন বিবেচনা করিবার পূর্ব্বে একটী কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক। ক্রমোন্নতি বাদ নিরবচ্ছিন্ন উন্নতির ইতিহাস নহে। আজি উন্নতি, কালি অবনতি, আজি উঠা, কালি পড়া; এইভাবে উঠিতে নামিতে উঠিতে নামিতে অবশেষে উঠাই থাকিয়া যায়। জীব এই ভাবেই বিবর্ত্তন পথে অগ্রসর হইয়াছে। দার্জ্জিলিং হিমালয়ান্ রেল পথে সিলিগুড়ি হইতে দার্জ্জিলিং যাইবার সময় ঐ পথ যেমন একবার উঠে আবার নামে; রেলগাড়ীও যেমন একবার উঠে আবার নামে; কিন্তু শেষে সাত হাজার ফুট উপরে উঠাই পরিণামে সত্য হয়; সেইরূপ জীবদেহ ও উন্নতি অবনতির পথে উঠা নামা করিতে করিতে পরিণামে কোথায় যাইয়া উপস্থিত হইবে? এ প্রশ্ন দুরূহ কিন্তু অসাধ্য নহে।

আর একটী কথাও এস্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক হইতেছে। আমি বারম্বার উন্নতি অবনতি কথা দুইটী ব্যবহার করিতেছি; কিন্তু ইহাদিগের অর্থ কি? জীব বিবর্ত্তনের দিক হইতে উন্নতি অর্থে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির বাহুল্য এবং ঐ সকলের ক্রিয়ার জটিলতা বুঝায়। প্রটোজোয়ার দেহে অঙ্গ বাহুল্য ও নাই, দৈহিক ক্রিয়ার জটিলতাও নাই; সুতরাং উহাদিগকে অনুন্নত বলি। আর, স্তন্যপায়ীর দেহে অঙ্গ প্রত্যঙ্গও অধিক, সে সকলের ক্রিয়াও জটিল; সুতরাং উহাদিগকে উন্নত বলি। উপরে এই অর্থেই ঐ দুই শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। মানসিক অবস্থার বিকাশ দেহ-যন্ত্রস্থ স্নায়ু ও মস্তিষ্কের উপর প্রধানতঃ নির্ভর করে।

এই কথা স্মরণ রাখিয়া দেখিতে হইবে যে দেহায়তনের বৃদ্ধির ও খর্ব্বতার সহিত, মনের † অবস্থা কিরূপ হইতেছে। মন ও বুদ্ধি প্রকৃতপক্ষে যাহাই হউক মস্তিষ্ক পদার্থই যে উহাদিগের ক্রিয়ার প্রকাশ-যন্ত্র, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। স্নায়ু মণ্ডল এবং তাহার উচ্চতম বিকাশ মস্তিষ্ক, ইহারাই মন ও বুদ্ধির অবলম্বন যন্ত্র (organ) যদি তাহাই হইল, তবে দেখিতে হইবে যে দেহায়তনের হ্রাস বৃদ্ধির সহিত মস্তিষ্কের কিরূপ অনুপাতে পরিবর্ত্তন হইতেছে। তাহা হইলেই মনের অবস্থা বুঝা যাইবে। কীটপতঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চ-শ্রেণীর বানর পর্য্যন্ত যে যুগে যেরূপ আয়তনের জীবই জাত হইয়া থাকুক, সর্ব্ব সময়েই দেখা গিয়াছে যে তাহাদিগের দেহ ক্ষুদ্র হইলে মস্তিষ্কও ক্ষুদ্রই ছিল; দেহ অতি বৃহৎ থাকিলেও মস্তিষ্ক ক্ষুদ্রই ছিল * উহার বহিরাবরণও ক্ষুদ্রই ছিল। সে কালের ডাইনোসর, ষ্টেগোসরাস, ফেনা কোডাস্ ম্যাষ্টোডন, এবং একালের তিমি অষ্ট্রীচ উষ্ট্র গণ্ডার হস্তী—অতি বড় প্রকাণ্ড দেহী হইলেও ইহাদিগের মস্তিষ্ক পদার্থ কত অল্প! মাথার খুলির উপরিভাগও দেহের অনুপাতে কত ক্ষুদ্র! যে সকল মেরুদণ্ড হীন জীব সেকালে ছিল অথবা একালে ও আছে। তাহাদিগের অনেকের স্নায়ু মণ্ডল এবং মস্তিষ্ক নাই অথবা অতি ক্ষুদ্র ও অনুন্নত † অতি নিম্নশ্রেণীর

† আমাদিগের শাস্ত্র মতে মন একটী ইন্দ্রিয় মাত্র, আমি সে অর্থে এ শব্দ ব্যবহার করিতেছি না; ইংরাজি mind শব্দের প্রাচীন অর্থে ব্যবহার করিতেছি। প্রকৃত প্রস্তাবে এই শব্দ দ্বারা আমি জীবাত্মাকে লক্ষ্য করিতেছি। যে সকল স্থলে মন শব্দ থাকিবে, তথায় অন্যরূপ বুঝা না তাহলে দেহাতিরিক্ত আত্মা পদার্থকে বুঝিতে হইবে।

* Chimpanhe, orang Otung'

† অর্থাৎ গঠন জটিল নহে, ক্রিয়াও জটিল নহে।

বৃহৎ জন্তুদিগেরও কাহারও মস্তিষ্ক নাই, কাহারও প্রায় নাই। প্রটোঝোয়া, ছিলেণ্টেরেটা শ্রেণীর জীব মধ্যে মস্তিষ্ক অথবা স্নায়ুমণ্ডল অনেকেরই নাই। হস্তীর সহিত সিম্পাঞ্জি অথবা ওরাং ওটাং দিগের তুলনা করিলে দেখা যায় যে এই উচ্চ শ্রেণীর ক্ষুদ্র দেহী বানরদিগেরই মস্তিষ্ক দেহের অনুপাতে অধিক এবং তাহার আবরণাস্থিও তুলনায় বড়। প্লিওসিন্ যুগের শেষ ভাগ পর্য্যন্তও মস্তিষ্ক যুক্ত সর্ব্বপ্রকার জীবেরই দেহের তুলনায় মস্তিষ্ক অতি অল্প ছিল। কিন্তু ইদানিন্তন কালে অর্থাৎ পোষ্ট টার্সিয়ারি যুগে মানবের আবির্ভাব সময়ে এবং কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে দেখা যায় যে দেহের ক্ষুদ্রত্ব সত্ত্বেও মস্তিষ্ক ও তদাবরণাস্থি অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে প্রাচীন ম্যাষ্টোডন্ অপেক্ষা বর্ত্তমান হস্তীর মস্তিষ্ক অধিক ; প্রাচীন ফেনা কোডাস্ অপেক্ষা বর্ত্তমান অশ্বের মস্তিষ্ক অধিক ; প্রাচীন ডাইনোসর অপেক্ষা বর্ত্তমান গো সর্পের এমন কি ভেকের ও মস্তিষ্ক অধিক। কাহারও বা প্রকৃত প্রস্তাবেই অধিক, কাহার ও দেহের অনুপাতে অধিক। অধ্যাপক রে ল্যাংকেষ্টার দেখাইয়াছেন যে প্রকৃত পক্ষে পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগ হইতে প্লিওসিন্ যুগের পর জন্তুগণের দেহও যেমন আয়তনে কমিতে লাগিল, মস্তিষ্ক পদার্থও তেমনই বাড়িতে লাগিল, এবং জটিলতর হইয়া উঠিল। মানবের আবির্ভাবের কিয়ৎ পূর্ব্ব হইতেই পক্ষী শ্রেণীতে এবং স্তন্যপায়ীগণমধ্যে এই অবস্থা বিশেষ ভাবে উৎপন্ন হইল। তাহার ফলে উহাদিগের শিক্ষনীয়তা † বাড়িয়া গেল, এবং মানব উহাদিগকে গৃহপালিত অবস্থায় আনিতে সমর্থ হইল। নচেৎ পারিতই না। ডাইনোসরকে মানব কখনই শিক্ষা দিতে পারে না, কিন্তু সে বর্ত্তমান সর্পকেও শিক্ষা দিতেছে। মানবের নিমিত্তই যেন কিছু পূর্ব্ব হইতেই প্রকৃতি প্রস্তুত হইতেছিল।

† Educability.

সে যাহাই হউক, দেহের খর্ব্বতার সহিত মস্তিষ্ক পদার্থের বৃদ্ধি ও উন্নতি প্রাচীন যুগ হইতেই লক্ষিত হইতেছে। * নর বানর শ্রেণীতে এই অবস্থা যেরূপ পরিস্ফুট হইয়াছে, এমন আর কোন শ্রেণীতেই নহে। এই অবস্থাকে বিপরীত অনুপাত বলা যাইতে পারে। দেহ বড়, মস্তিষ্ক ছোট; দেহ ছোট, মস্তিষ্ক বড়; ইহাকেই বিপরীত অনুপাত বলা যায়।

এক্ষণে স্মরণ করিতে হইবে যে মস্তিষ্কই মনের যন্ত্র। সুতরাং মস্তিষ্কের অনুপাত প্রকৃত পক্ষে মনের অনুপাত। সে অনুপাতকে এ ভাবে ও প্রকাশ করা যায় যে, দেহ বড়, মন অনুন্নত ; দেহ ছোট, মন উন্নত। কারণ মস্তিষ্ক বড় এবং জটিল হওযাকেই উন্নতি বলে। জীবাত্মা এই যন্ত্র সাহায্যেই আত্মবিকাশ করেন। যেমন বাদ্য যন্ত্রের অপকৃষ্টতা হেতু উৎকৃষ্ট সঙ্গীতজ্ঞও স্বীয় গুণপনা দেখাইতে পারেন না ; তেমনই মস্তিষ্ক যন্ত্রের অনুন্নত অবস্থায় আত্মাও সম্যক ভাবে আত্ম-প্রকাশ করিতে সমর্থ হন না। ইতর জীবে আত্মার বিকাশ কম, উন্নত জীবে বিকাশ অধিক। এই নিমিত্তই বলা হইয়া থাকে যে আধার ভেদে আত্মার বিকাশ বিভিন্ন প্রকার।

দেহের খর্ব্বতার সহিত যখন প্লিওসিন্ যুগের পর হইতেই মস্তিষ্কের বৃদ্ধি লক্ষিত হইতেছে, তখন বলিতে হয় যে বিবর্ত্তন বশতঃ দেহের সহিত মনের অনুপাতঃ বিপরীত হইয়াছে। এইরূপ হইতে হইতে এমন এক সময় আসিবে, (বোধ হয় এখনই আসিয়াছে) যখন মনের উন্নতি † দেহের শক্তিকে অতিক্রম করিবে। এখনই মন ¶ যাহা আকাঙ্ক্ষা করে অথবা প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ

* প্রাচীনতম কীটাণুদিগের কথা পৃথক। কারণ তাহাদিগের মস্তিষ্ক নাই।

† অর্থাৎ আত্মার বিকাশ শক্তি।

¶ এস্থলে মন শব্দ সংকল্প বিকল্পাত্মক ইন্দ্রিয় অর্থে ব্যবহৃত হইল। পরিভাষার অভাব বশতঃ এই সকল দুরবস্থা উপস্থিত হয়।

হয়, দেহ তাহার সহায়তা করিতে একবারেই অসমর্থ। মন চন্দ্র লোকে অথবা পিতৃলোকে যাইয়া নানা তথ্য জ্ঞাত হইতে বাসনা করে; বুদ্ধি যদিও বা তাহার উপায় উদ্ভাবন করিল; কিন্তু দেহ ঐ সকল লোকে যাইতেই ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়। যোগ অভ্যাস দ্বারা আত্মার বিকাশ শক্তি বাড়াইতে গেলে অনেকের দেহ নষ্ট হইয়া যায়। এ কথা বোধহয় সত্যই বলা যাইতে পার যে বর্ত্তমান সময়েই দেহের শক্তি ছাড়াইয়া মনের শক্তি অগ্রসর হইয়াছে। মন এবং বুদ্ধিকে একত্র করিয়া আত্মা শব্দ ব্যবহার করিলে একথা সত্যই বলা যায় যে দেহের শক্তি অতিক্রম করিয়া আত্মার শক্তি বর্ত্তমান কালেই ঈষৎ অগ্রসর হইতেছে। ভবিষ্যতে দেহ আরও ক্ষুদ্রতা প্রাপ্ত হইলে অথবা দেহ প্রায় লোপ হইলে, বিপরীত অনুপাতের নিয়মানুসারে, মন † অতিমাত্র বিকাশ লাভ-করিবে।

কিন্তু মানব দেহ কি আরও ক্ষুদ্রতার দিকে যাইতেছে? উহা কি লোপের পথে অগ্রসর? যদি এই (স্থূল) দেহ (বিবর্ত্তনের নিয়মানুসারে) লুপ্ত হয়, তবে নিসন্দেহে বলা যায় যে তখন আত্মার শক্তি অত্যন্ত অধিক মাত্রায় বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ক্রম-বিবর্ত্তন মানবে আসিয়া হঠাৎ বন্ধ হইবার কোন কারণ নাই। বিবর্ত্তন বিধি মানবেও অবশ্যই ক্রিয়াশীল। এই বিধি বশেই মানব-দেহ (অপর জীবের তুলনায়) ধ্বংশের পথে চলিয়াছে, ইহা কথঞ্চিৎ প্রমাণ করা যায়। বিবর্ত্তনের একটী প্রধান বিধি এই যে, যে অঙ্গ জীবন ব্যাপারের অনুপযোগী হয় তাহা ক্রমে পরিত্যক্ত হয়; এবং যে অঙ্গ অনাবশ্যক হইয়া পড়ে তাহাও ক্রমে পরিত্যক্ত হয়। আর একটী গুরুতর বিধান এই যে, যে অঙ্গের আয়তন, গঠন, সংস্থান এবং ক্রিয়া অস্থায়ী হইয়া উঠিয়াছে এবং সময় সময় নানা ক্ষেত্রে নানারূপ পরিবর্ত্তনের অধীন হইতেছে, সে অঙ্গ পরিত্যক্ত হইবার দিকে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্থলে ইতর জীবের লেজ এবং মানব হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর বানর (ওরাং ওটাং অথবা সিপাঞ্জি) যখন চতুষ্পদ অবস্থায় গতায়াত করা ত্যাগ করিল, তখন বিবর্ত্তনের বিধান অনুসারেই তাহার লেজ লুপ্ত অথবা প্রায় লুপ্ত হইয়া গেল। মানব শ্রেণীতে শিশু ব্যতীত অন্যে চতুষ্পদভাবে গতায়াত করে না। মানবেরও পৃষ্ঠ-বংশের লেজের ভাগ গিয়াছে অথবা প্রায় গিয়াছে। এ সকল জীবের দেহের বাহিরের লেজাংশ (অর্থাৎ অস্থিখণ্ডগুলি) সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়াছে।......মানব হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের পর্ব্বসংখ্যা অন্য অঙ্গুলির পর্ব্বসংখ্যা অপেক্ষা একটী কমিয়া গিয়াছে। অন্য অঙ্গুলির খণ্ডাস্থি সংখ্যায় তিনখানি, বৃদ্ধাঙ্গুলির দুইখানি মাত্র। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সময় সময়ে দ্বিখণ্ডিত হইতেছে, অথবা সরু এবং দুর্ব্বল হইতেছে। কখন কখন উহার পার্শ্বে আর একটী ছোট "বৃদ্ধ" উৎপন্ন হইতেছে। সুতরাং পূর্ব্বোল্লিখিত নিয়মানুসারে ইহা সাহস করিয়া বলা যায় যে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আর অধিক কাল থাকিবে না। ডাঃ ওয়েডার্সেম দেখাইয়াছেন যে পায়ের অবস্থা আরও শঙ্কটাপন্ন হইয়াছে; বোধহয় অনতিবিলম্বে পায়ের মধ্যম অঙ্গুলি ব্যতীত অন্য সকলগুলিই লোপ পাইবে; পায়ের কনিষ্ঠাঙ্গুলি এখনই প্রায় নিষ্ক্রিয়। যাহা হউক, উপরের বর্ণিত দুইটী বিবর্ত্তন বিধির দৃষ্টান্তস্বরূপ লেজের ও বৃদ্ধাঙ্গুলির উল্লেখ করিলাম।

কিন্তু ইহাতে আর একটী উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইল। মানব দেহ লোপ হইবার দিকে যাইতেছে কি না, এ প্রশ্নের উত্তরও যৎকিঞ্চিৎ পাওয়া গেল। যাহা হউক, এক্ষণে এই প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে দিবার চেষ্টা করিব। ইতর জন্তুর তুলনায় মানবের দেহ ক্ষয়ের দিকে যাইতেছে কি না? প্রথমতঃ উত্তমাঙ্গের কথা বিবেচনা করি। সকলেই জানেন মানবের চক্ষুর গঠন এবং তাহার ক্রিয়া ইতর জন্তুর তুলনায় নিতান্তই হীন। মক্ষিকার চক্ষুতেও

† আত্মা।

বহুসংখ্যক অক্ষিমুকুর * আছে, কিন্তু মানবের মাত্র একটী। বাজের চক্ষু কতদূর দৃষ্টি করিতে পারে! কিন্তু মানুষ তাহার দশমাংশও পারে না। আমার বয়সের মধ্যেই এই ইন্দ্রিয় ধ্বংশের পথে অনেক দূর গিয়াছে। এখন আমাদিগের বালকগণের ৬।৭ বৎসর বয়সেই অনেকের চসমা না দিলে চলে না। এইরূপ পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র দেখা যাইতেছে। ইতর জন্তুগণের প্রায় সকলের চক্ষু অপেক্ষাই মানবচক্ষু ক্রিয়াহীন হইয়াছে এবং ক্রমে আরও হইতেছে।

কর্ণ ত মানবের নাই বলিলেই হয়। ইতর স্তন্যপায়ী-গণের কর্ণপত্র বৃহৎ এবং এদিক ওদিক ঘুরিতে পারে; মানবের কর্ণ পত্র ক্ষুদ্র এবং ঘুরিবার শক্তি প্রায় সকলেরই নাই। আমি দুইজন মাত্র ব্যক্তিকে দেখিয়াছি যাঁহারা কর্ণপত্র উর্দ্ধাদ্ধঃ নামাইতে উঠাইতে পারিতেন; একজন আমার বন্ধু, এখনও জীবিত আছেন। মৃগ, অশ্ব প্রভৃতি স্তন্যপায়ী এবং কতিপয় পক্ষী বহুদূরের শব্দ শুনিতে পায়; মানব তাহা পায় না।

নাসিকার শক্তিইবা মানবের কি আছে? এণ্ডি (endi) রেশমের প্রজাপতি (১) ঐ শ্রেণীর স্ত্রীজাতীয়-দিগের দেহগন্ধ দেশান্তর হইতে প্রাপ্ত হয়। রাজসাহিতে এণ্ডি রেশমের পোকা কোথাও নাই বলিয়াই জানি। কিন্তু আমি রাজসাহী থাকা কালে একদিন একটী স্ত্রী-জাতীয় পোকাকে বাহিরে একটী খাচার মধ্যে সমস্ত রাত্রি রাখিয়া পরদিন প্রাতে খাচার উপর পুংজাতীয় একটী প্রজাপতিকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি! এইটী কোথা হইতে আসিল কিছুই বুঝিতে না পারিয়া হতবুদ্ধি হইয়াছিলাম। বোধহয় ইহাদিগের ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রবল। কুকুরের এবং পিপীলিকার ঘ্রাণশক্তির আধিক্য সর্ব্বজন-বিদিত। এ সকলের তুলনায় মানুষের ঘ্রাণশক্তি অতি অল্প।

মানব-মুখের চোয়াল দুইটীর অস্থি ছোট হইয়া দেহের দিকে সরিয়া আসিয়াছে। অশ্ব, হরিণ ইত্যাদির ঐ দুই অস্থি সম্মুখদিকে অনেক দূর বর্দ্ধিত। মৎস্য হইতে আরম্ভ করিয়া সিংহ, ব্যাঘ্র এবং কোন কোন বানরের চোয়ালে যে শক্তি আছে, মানুষের তাহা নাই।

দন্তের সংখ্যা এবং আকৃতি মানুষের কম এবং ছোট। ইতর জীবগণের অনেকের দন্ত সংখ্যাতেও অধিক, আকৃতিতেও বড়। মানুষের উপর পাটি দন্তের পশ্চাতে তালুর কঠিন অংশে যে সকল ঈষদুচ্চ আইলের মত লাইন্ দেখা যায় উহারা লুপ্ত দন্ত পংক্তির শেষ চিহ্ন স্বরূপ আজিও বিদ্যমান আছে।

উত্তমাঙ্গের এই দশা। ইহাতে কেবল দেখা যায় মস্তিষ্কের আবরণাস্থি অতি মাত্র বর্দ্ধিত, এবং মস্তিষ্কও অধিক হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আর সকলেই ক্ষয় পাইতেছে।

এক্ষণে বক্ষের এবং উদরের কথা বিবেচনা করিতে প্রথমেই দেখিতেছি, মানবের পঞ্জরাস্থির সংখ্যা ইতর স্তন্যপায়ী গণের অপেক্ষা কমিয়া গিয়াছে। অস্থিতত্ত্ব বিদ্গণ বিবেচনা করেন যে, যে অস্থি এক্ষণে মানবের প্রথম পঞ্জর তাহার উর্দ্ধে বর্ত্তমান গলদেশে আরও পঞ্জর ছিল; তখন গলা ছোট ছিল। পঞ্জরগুলি মেরুদণ্ড হইতে আসিয়া বক্ষাস্থির † সহিত সংলগ্ন হওয়াই নিয়ম। কিন্তু মানবের নীচের দুইটী পঞ্জর বিশেষতঃ সর্ব্ব নিম্নটী এত ছোট হইয়াছে যে আর বক্ষাস্থির সহিত সংলগ্ন হয় না। বক্ষাস্থি ও পক্ষী শ্রেণীতে একটী গোটা অস্থি। কিন্তু মানবের উহা খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে।

---

* Lens.

(১) ইহারা কীট শ্রেণী; তাহাকেই লোকে এণ্ডির পোকা বলে। কিন্তু উহাদিগের যখন পাখা হয় সে অবস্থায় প্রজাপতি বলা যায়।

† Sternum.

চতুষ্পদ স্তন্যপায়ীগণের শ্বাসযন্ত্র পৃষ্ঠ বংশের সহিত সংলগ্ন হইলেও পঞ্জরাস্থির উপর স্বীয় ভার রক্ষা করে। কিন্তু মানুষ উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং তাহার শ্বাসযন্ত্র পীঠের দিকে কিঞ্চিৎ হেলিয়া গিয়াছে এবং সেই হেতু পঞ্জরাস্থির উপর সম্পূর্ণরূপে ভার রক্ষা করিতেছে না। এই হেতু এবং শ্বাসযন্ত্র পশ্চাৎদিকে সরিয়া যাওয়ায় উহা যে পেশীদ্বারা পৃষ্ঠবংশের সহিত সংযুক্ত তাহার উপর অপেক্ষাকৃত অধিক টান পড়িতেছে। ইহাতে ঐ সংযোগপেশীর অপেক্ষাকৃত অধিক বলক্ষয় হইতেছে। সুতরাং কালক্রমে এই সংযোগ দুর্ব্বল ও অবসন্ন হওয়া সম্ভব। উপরন্তু ইতর স্তন্যপায়ীগণের শ্বাসযন্ত্র মস্তকের নিকটবর্ত্তী ছিল; মানবের ঐ যন্ত্র তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ দূরে সরিয়া গিয়াছে।

মানবের হৃৎপিণ্ডও ইতর স্তন্যপায়ীদিগের ঐ যন্ত্র অপেক্ষা মস্তক হইতে কিঞ্চিৎ দূরে সরিয়াছে। হৃৎপিণ্ড কতিপয় বৃহৎ শিরা অবলম্বনে আবরণ পর্দ্দার মধ্যে বক্ষঃ গহ্বরে ঝুলিতেছে। সুতরাং ঐ শিরাগুলির কার্য্যাধিক্য বশতঃ কাল ক্রমে হৃৎপিণ্ডের আরও স্থানচ্যুতি অসম্ভব নহে।

শ্বাসযন্ত্র এবং হৃৎপিণ্ড—উভয় যন্ত্রেরই স্থানচ্যুতি হেতু মানব দেহে উহারা কতিপয় অভিনব পীড়ার অধীন হইয়াছে।

সুতরাং স্থানচ্যুত হওয়ায়, ঝুলিতে থাকায়, সংযোগ-পেশী অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইবার সম্ভাবনা থাকায় নবাগত পীড়ার অধীন হওয়ায়, হৃৎপিণ্ডের ও শ্বাসযন্ত্রের অবস্থা শোচনীয় হইতেছে, ইহা বলা যাইতে পারে।

মানবের পাকস্থলীও দুর্দ্দশাগ্রস্ত। গবাদি জন্তুর চারি কামরায় বিভক্ত পাকস্থলীতে অনেক কর্ম্ম হয়। উষ্ট্রের পাকস্থলী সকলেরই আশ্চর্য্যের বিষয়। কিন্তু মানবের পাকস্থলীর একটী মাত্র কামরা। তাহাও স্থানে স্থানে সঙ্কুচিত(১) হইয়া ক্ষুদ্রতর এবং একাধিক ভাগে বিভক্ত হইবার পথে দাঁড়াইয়াছে। উহার পরিপাক শক্তি নরশ্রেণীতে অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে।

অন্ত্র (২) দুইটী ইতর স্তন্যপায়ীদিগের অপেক্ষা দৈর্ঘ্যে অনেক পরিমাণে ছোট হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আর একটী অন্ধ-অন্ত্র(৩) জুটিয়াছে, তাহা ক্ষুদ্র এবং একদিকে বন্ধ। এটী ভাল কর্ম্ম কিছু করে বলিয়া জানা যায় না। কিন্তু মন্দ কর্ম্ম যাহা করে তাহা প্রাণ-নাশক। এপেণ্ডিসাইটিস্ পীড়া এই যন্ত্রেই হয়।

হস্ত ও পদের অবস্থা বিবেচনা করিলে প্রথমেই মনে পড়ে, বানর অবস্থার সেই দীর্ঘবাহু, মানবের স্থলে হস্ত ছোট হইয়াছে। এই অঙ্গ যেরূপ বিবিধ পরিবর্ত্তনের অধীন হইয়াছে, তাহাতে ইহার স্থায়িত্বে সন্দেহ উপস্থিত হইবার কারণ হইয়াছে। কাহারও অগ্রহস্ত কাহারও বাহু, ছোট অথবা বড় হইতেছে; কাহারও এগুলুভয়ের তিনখানি অস্থিই ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইতেছে। তারপর, বিশেষ গুরুতর কথা এই যে, হস্ত ক্রমে নীচের দিকে নামিতেছে (৪)। উপরে বলিয়াছি, গলদেশে আরও পঞ্জর ছিল। অবশ্য, উহা গলদেশের কিয়দংশ বেষ্টিয়া ছিল। তখন হস্ত (যাহা পঞ্জরাস্থিগুলির ঊর্দ্ধভাগ হইতে বাহির হওয়াই নিয়ম তাহা) বর্ত্তমান বাহুমূলের অথবা স্কন্ধের কিছু উপর হইতে বাহির হইত। এক্ষণে কিছু নিম্ন হইতে হস্ত বাহির হইতেছে। কালে আরও নিম্নগামী হইবার সম্ভাবনা আছে। উরু এবং পদযষ্টির অবস্থা ইহার বিপরীত। ডাঃ ওয়েডাসের্ম দেখাইয়াছেন

(১) Constriction.

(2) Intestine.

(3) Appendix.

(4) Whereas the shifting of the fore limbs takes place from before backwards, that undergone by the hind limb is from behind forwards, i. e, towards the head.

Vide "Weidersheim's structure of Man" paper 94-95.

হস্ত এবং পদযষ্টি (সংক্ষেপে পদ বলিব) এক্ষণে অপেক্ষা উপরে উঠিতেছে। সুতরাং হস্তের নিম্ন-গতির এবং পদের উর্দ্ধগতির সহিত পঞ্জরের সংখ্যা হ্রাস ধরিয়া একত্র বিবেচনা করিলে মানবদেহ(১) কোন্ পথে চলিয়াছে তাহা বুঝিতে বাকী থাকে না। চক্ষু গেল, কর্ণও গেল; দন্তও চোয়াল ক্ষয় পাইয়াছে ও পাইতেছে; হৃৎপিণ্ড এবং শ্বাসযন্ত্রের অবস্থা শঙ্কটাপন্ন; পাকস্থলীর এবং অন্ত্রদ্বয়ের, বিশেষতঃ অন্ধান্ত্রের অবস্থা বিপদজনক; মস্তিষ্ক কমিতেছে; হস্ত পদ ছোট ও স্থানচ্যুত হইয়া ধড়টাকে(২) দুইদিক হইতে চিপিয়া মারিবার উপক্রম করিয়াছে; অঙ্গুলিগুলি (৩) যা-দশাপন্ন;—এ অবস্থায় যদি স্থূলদেহের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হই, তবে অসঙ্গত হইতে পারে না। এই অস্থি মজ্জা পেশীর যন্ত্রবহুল মানব দেহ বোধহয় আর দীর্ঘকাল থাকে না। ইহার আয়ুষ্কাল শেষ হইয়া আসিয়াছে।

এই পৃথিবীতে এককালে জীব ছিল না। পরে অতি ক্ষুদ্র এক কোষ জীবের আবির্ভাব হইল। তাহারা ক্রমোন্নত হইয়া বহু-কোষজীব জাত হইল। ইহাদিগের দেহ এক সময়ে অতি মাত্র বৃহৎ হইয়া পরে ক্ষুদ্র হইতে লাগিল। ক্রমে কালসহকারে বিবর্ত্তনবশে মানব উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু এই কি শেষ অভিনয়? না, তাহা হইতেই পারে না। বিবর্ত্তন বিধি মানব পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়াই নিবৃত্ত হইবার কোন কারণ নাই। এ বিধির প্রকার এবং প্রয়োগ অথবা কার্য্যপ্রণালী অন্যপ্রকার হওয়া সম্ভাবনাতীত নহে; কিন্তু ইহার ক্রিয়া সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হইতে পারে না। সুতরাং মানব দেহ কখনই বিবর্ত্তনের শেষ অভিনয় নহে; সুতরাং ক্রমোন্নতিরও শেষ সীমা গণ্য হইতে পারে না। মানব অপেক্ষা উন্নত জীব হইবেই, এবং সম্ভবতঃ হইয়াছেও।

যে সকল জীব প্রাচীন কাল হইতে এ পর্য্যন্ত উন্নত হইয়াছে, তাহারা সকলে উন্নত হয় নাই। মৎস্য উভচর হইয়াছে, উভচরেরা সরীসৃপ হইয়াছে, সরীসৃপ পক্ষী হইয়াছে। কিন্তু সকল মৎস্য উভচর হয় নাই, সকল উভচরও সরীসৃপ হয় নাই, সকল সরীসৃপও পক্ষী শ্রেণীতে উন্নত হয় নাই। সিম্পাঞ্জী, ওরাং ওটাং এখনও আছে। মানবজাত হইয়াছে বলিয়াই উহারা বিনষ্ট হয়নাই। অনুন্নত এবং উন্নত জীব একত্র বাস করিতেছে। জলে, স্থলে বা বায়ুমণ্ডলে যাহার যে স্থান উপযোগী সে সেই স্থানেই বাস করিতেছে। বিবর্ত্তন বিধান মতে অন্যত্র বাস করিয়া জীবিত থাকিতে পারেই না। যদি ইতর জীব অপেক্ষা উন্নত মানব উহাদিগের সহিত একত্র এক সময়ে বাস করা সম্ভব হইয়াছে, তবে মানব অপেক্ষা উন্নত জীব মানবের সহিত বাস করা কখনই অসম্ভব হইতে পারে না। সম্ভবতঃ তাহারা (বিবর্ত্তন বিধান মতেই) মানব অপেক্ষা আরও উন্নত হইয়া মানব গণের সহিত একত্র এক সময়েই বাস করিতেছে। যদি এই সিদ্ধান্তই সঙ্গত হইল তবে বেস্থান (অথবা যে লোক) তাহাদিগের উপযোগী সেই স্থানেই তাহারা বাস করিতেছে ইহা অঙ্গীকার করিতে হয়।

কিন্তু কীদৃশ স্থান তাহাদিগের উপযোগী? যতদূর বুঝিলাম তাহাতে মানবের স্থূল দেহ স্থায়ী হইবে না; বিবিধ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেরূপ ক্ষীণ, দুর্ব্বল, স্থানচ্যুত, ভগ্ন এবং নানারূপ পরিবর্ত্তনের অধীন হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাতে এই দেহ স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা বিরল; বোধ হয়, নাই ই। তাহা হইলে স্থূলদেহ বুঝি এইখানেই শেষ হয়। যেমন প্লিওসিনযুগ জন্তু দেহের বৃদ্ধির চরম সীমা হইয়াছিল, তেমনই সম্ভবতঃ এই পোষ্ট-টার্সিয়ারি যুগই বর্ত্তমান মানব দেহের শেষ সীমা হইতে পারে। মানব অপেক্ষা উন্নত জীব যখন এ যুগের পূর্ব্বেই জাত হওয়া সম্ভব হইতেছে, তখন তাহাদিগের দেহ কি প্রকার হওয়া সম্ভব? এই ধ্বংসশীল মানব দেহ পোড়া, অর্থাৎ

---

(১) স্থূল দেহের কথাই বলিতেছি।
(২) ধড় = Trunk.
(৩) পায়ের কনিষ্ঠাঙ্গুলি প্রায় লুপ্তই হইয়াছে।

স্থূলদেহ বিনষ্ট হইলে, জীবাত্মা সূক্ষ্ম-দেহ আশ্রয় করিয়া উপযুক্ত লোকে অন্য আকারে অবস্থিতি করিবেন—এইরূপ সিদ্ধান্তই সমীচীন হইতেছে। মানবের পরে আরও বিবর্ত্তন হইবে-ই; হওয়াছেও বা; সম্ভবতঃ হইয়াছে ই। সে বিবর্ত্তন স্থূলদেহে নহে। সেই উন্নতি আমাদিগের পূর্ব্ব পরিচিত উন্নতি নহে। এ ক্ষেত্রে উন্নতি অর্থে অঙ্গ বাহুল্য এবং ক্রিয়ার জটিলতা বুঝাইবে না। এ ক্ষেত্রে স্থূলদেহ নাই, ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। আর, সেই ক্ষয়ের সহিত "বিপরীত অনুপাতে" মনের ক্রিয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তাহাতে বুঝা যাইতেছে যে, দেহ-ক্ষয়ের বিপরীত অনুপাতে আত্মার শক্তি অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই স্থূল দেহ ঈদৃশ অতি মাত্র শক্তিশালী জীবাত্মার উপযুক্ত আধার হইতেই পারেনা। বলিয়াছি, এখনই দেহের উপযোগীতা ছাড়াইয়া জীবাত্মা অনেক দুর অগ্রসর হইয়াছে। এ দেহ পশ্চাৎ পড়িয়া রহিল; জীবাত্মা এ দেহের ধ্বংশের সহিত অন্য উপযুক্ত আধার গ্রহণ করিলেন। এইরূপ বিবেচনা সঙ্গত প্রতিপন্ন হইয়া আসিতেছে। প্রটোজোয়া হইতে ওরাং ওটাং পর্য্যন্ত বহু জন্তুর দেহ বিনষ্ট হইল, আবার বহুবিধ দেহ উৎপন্ন হইল। ইহা দেহের শক্তি নহে। ইহা পারিপার্শ্বিক অবস্থার শক্তি নহে। জীব-বিবর্ত্তন লক্ষ্য-যুক্ত। মানবদেহ এবং প্রাকৃতিক বেষ্টনী ইহাই বুঝাইতেছে। আদি হইতে যে আত্মা এক দেহ ভাঙ্গিতেছে অন্য দেহ গড়িতেছে, সেই আত্মাই অবশেষে স্থূল-দেহ ভাঙ্গিয়া মানবের একাংশকে উন্নত (এ স্থলে সূক্ষ্ম দেহী) জীবে বিবর্ত্তিত করিতেছে। ঈদৃশ দেহীগণ দেব, যক্ষ যাহাই হউন, ইহাদিগের যে নামই দেওয়া যাউক, মানবাপেক্ষা উন্নত, স্থূল-দেহ-হীন, সূক্ষ্মদেহী জীব যথাযোগ্য লোকে বিবর্ত্তিত হইয়া বিদ্যমান আছেন এবং সেই দেহের উপযুক্ত জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন, একথা সহজে অস্বীকার করা যায় না। যদি ইহা সত্য হয়, তবে তাঁহারা স্থূল দেহের সীমাবদ্ধ শক্তি হইতে মুক্ত হইয়া সূক্ষ্মদেহের অপেক্ষাকৃত অধিকতর শক্তিযুক্ত আধারে, মানবাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হইয়াছেন; ইহা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে। আত্মা অল্প শক্তিযুক্ত আধার ত্যাগ করিয়া অধিক শক্তিযুক্ত আধারের আশ্রয় লইলে তদীয় স্ব-ভাব প্রকাশের অধিকতর সুযোগ পাইবেন তাহাতে সন্দেহ কি? এইরূপ বিবেচনা করাই সঙ্গত।

এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, (মানব) দেহ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে এবং বিবর্ত্তন ক্রিয়া মানবে আসিয়াই নিবৃত্ত হইবার কারন নাই, এসকল কথা স্বীকার করিলেও মানব অপেক্ষা উন্নত বিবর্ত্তন যে সূক্ষ্মাবস্থা তাহার প্রমাণ কি? প্রমাণ আছে। প্রথমতঃ বিশুদ্ধ বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ সূক্ষ্ম শরীরীগণকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, এবং তাহা পুরানাদি শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ মানব অপেক্ষা উন্নত বিবর্ত্তন স্থূল দেহে হইলে তাদৃশ স্থূল দেহীগণকে ধরা পৃষ্ঠে দেখিতে পাইতাম। স্থূলদেহী অন্যলোকে থাকার প্রমানাভাব, সুতরাং পৃথিবী হইতে ভূলোকেই থাকিত। কিন্তু নাই। তৃতীয়তঃ বংশানুক্রম তত্ত্বের আলোচনায় সূক্ষ্ম দেহ স্বীকার করিতে হয়। তন্নিমিত্ত সূক্ষ্ম দৈহিক বিবর্ত্তনকে অন্যত্র ও স্বীকার করা অসঙ্গত হইতে পারেনা।

ইহা সকলেই জানেন যে মানব বংশানুক্রমের নিয়মাধীন। বংশানুক্রমের আলোচনায় সূক্ষ্মদেহ স্বীকার করিতে হয় কেন? কথাটি একটু বিশদ ভাবে বলা আবশ্যক। শুক্র শোনিত সংযোগে (প্রায় সকল) দেহ গঠিত হয়*। এ স্থলে, শুক্র অর্থে পুংকীট†। ইহারা বেঙ্গাচির মত, কিন্তু অত্যন্ত ক্ষুদ্র, অনুবীক্ষণ যোগে দেখিতে হয়। শোনিত অর্থে স্ত্রীডিম্ব; ইহাদিগের আকৃতি প্রায় গোলাকার। ইহারাও অত্যন্ত ক্ষুদ্র, অনুবীক্ষণ দ্বারা দেখিতে হয়।

---

* অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর কতিপয় জীব দেহ ব্যতীত।

† Spermatozoon.

পুংকীট ও স্ত্রীডিম্ব ‡ জরায়ু মধ্যে মিলিত হয়, তখন পুংকীটের লেজ খসিয়া যায়; সুতরাং উভয় গোলকের পদার্থ মিলিত হইয়া একটি ক্ষুদ্র ডিম্ববৎ যুক্ত-কোষ ¶ গঠিত হয়। এই যুক্ত কোষটি জরায়ু মধ্যে বাড়িতে বাড়িতে নবম মাস পরে ভূমিষ্ঠ হয়; এবং জীবিতকাল পর্য্যন্ত নানাবিধ কর্ম্ম করিয়া অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইনিই একজন ব্যক্তি। ইঁহার দেহ গঠন পিতৃ মাতৃ কুলের ন্যায় হইয়া থাকে; ইহার মনও তাহাদিগের ন্যায় হইয়া থাকে। পিয়ার্সন্ দেখাইয়াছেন যে দেহ ও মন সম অনুপাতে বংশানুগত হয়।

এক্ষণে বুঝিতে হইবে যে মাতার ন্যায়, মাতামহের ন্যায়, অথবা প্রমাতামহের ন্যায়; কিম্বা পিতার ন্যায় পিতামহের ন্যায় অথবা প্রপিতামহের কিম্বা অন্য কোন পূর্ব্ব পুরুষের ন্যায় জাতকের আকৃতি কেন হয়? মোটের উপর গঠন ভঙ্গিও তাঁহাদিগের ন্যায় হইতে পারে, অথবা কেবল মাত্র চক্ষু কর্ণ নাসিকা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ অঙ্গও তদ্রূপ হইতে পারে। এরূপ হয় কেন?

পুংকীট এবং স্ত্রীডিম্বের প্রত্যেক অংশই বংশানুক্রমের নিয়ামক নহে। ইহাদিগের প্রত্যেকের মধ্যেই এক একটী ক্ষুদ্র বিন্দুবৎ স্থান আছে; ঐ স্থান অন্য স্থান অপেক্ষা পৃথক ভাবাপন্ন। ঐ স্থানটীকে কেন্দ্র বিন্দু § বলিব; উহা কেন্দ্র স্থানে স্থিত নহে, উহার নাম মাত্র কেন্দ্রবিন্দু রাখিলাম। এ বিষয়ে পুংকীট ও স্ত্রীডিম্বের অবস্থা একই প্রকার। এই হেতু আমি অতঃপর যাহা বলিব তাহা পুংকীট অবলম্বনেই বলিব।

পুংকীটের আকৃতি বেঙ্গাচির ন্যায়, তাহা বলিয়াছি। উহার মাথার গোলাকার অংশ মধ্যে পিচ্ছিল (প্রায়) তরল জীববস্তু * আছে। তাহারই একস্থানে কেন্দ্র বিন্দু আছে। এই কেন্দ্র বিন্দু মধ্যে বিভিন্ন জীবের বিভিন্ন সংখ্যক সূক্ষ্ম আঁইস্-বৎ তন্তু † আছে। সেই তন্তুগুলি, কতিপয় বিন্দু বিন্দু জীব বস্তুর দানা ‡ একত্র সজ্জিত হইয়া গঠিত হয়। বিন্দুগুলি বংশানুক্রমিক লক্ষণ সকলের বাহক। ইহারাই পিতা মাতার এবং পিতৃ মাতৃ কুলের পূর্ব্ব পুরুষগণের দৈহিক ও মানসিক লক্ষণ অপত্যের দেহে উৎপন্ন করে।

এক্ষণে বিবেচনা করিতে হইবে যে ইহারা কত ক্ষুদ্র। পুংকীট অতি ক্ষুদ্র এক-কোষ জীব। তাহার মধ্যস্থ কেন্দ্র বিন্দু আরও কত ক্ষুদ্র; তন্মধ্যস্থ আঁইস্-গুলির দানা আরও কত ক্ষুদ্র!!! অনুবীক্ষণ সাহায্যে কোন মতে দেখা যায়। এই দানাগুলির মধ্যে বংশানুক্রমের লক্ষণ সকল প্রচ্ছন্ন আছে; অপত্য দেহে তাহা যথাস্থানে এবং যথা সময়ে প্রকাশ পাইবে। * পিতার নাসিকার ন্যায় জাতকের নাসিকা হইল; মাতার পদের ন্যায় পদ হইল; পিতামহের চক্ষুর ন্যায় চক্ষু এবং মাতামহের কটি দেশের ন্যায় কটি হইল। ঐ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র দানার মধ্যে এতগুলি ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের উপাদান [স্থানাভাবে মিশিয়া না গিয়া] পৃথক পৃথক ভাবে প্রচ্ছন্ন ছিল। পিতামহের চক্ষুর উপাদান জাতকের কর্ণ স্থানে প্রকাশিত হয় না; মাতার পদও জাতকের কটিতে প্রকাশিত হয় না। যেরূপ ভাবে আমাদের যে অঙ্গ ভ্রূণাবস্থায় যে যে স্থানে যথাক্রমে উৎপন্ন হয় তাহা একপ্রকার মোটামোটি জানা আছে।

‡ Ovum.

¶ Zygote.

§ Nucleus.

* Proto plasm.

† Chromosome. মানবের ১৬টি তন্তু

‡ Id. ...

তাহাতে স্থানচ্যুতি হইতে প্রায়* দেখা যায় না। সুতরাং বহু পূর্ব্বপুরুষের বিভিন্ন অঙ্গের উপাদান সকল অত্যন্ত সূক্ষ্মাবস্থা প্রাপ্ত না হইলে কি প্রকারে পৃথক ভাবে ঐ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আঁইসের দানার মধ্যে থাকিতে পারে; এবং যথা সময়ে যথা স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া জাতকের দেহে পূর্ব্ব পুরুষগণের বিভিন্ন লক্ষণ প্রায় তুল্য আকৃতিতে উৎপন্ন করিতে পারে? ঈদৃশ চিন্তাকে এই পথে আরও প্রসারিত করিলে প্রতীয়মান হইবে যে পূর্ব্ব পুরুষগণের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যাহা প্রায় তুল্য আকৃতিতে জাতকে সংক্রমিত হয় তাহা অবশ্যই সূক্ষ্মভাবে ব্যতীত স্থূলাকারে হইতেই পারেনা। পিতার স্থূল ন্যাসিকা, মাতার স্থূলপদ কখনই স্থূল আকারে জাতকে নীত হয় নাই। তাঁহাদিগের নাসিকার অথবা পদের কোন উপাদান দ্বারা জাতক গঠিত হয় নাই। সে গঠিত হইয়াছে শুক্র শোণিত দ্বারা; এতদুভয় পিতৃমাতৃ দেহের স্থান বিশেষ হইতে জাত হয়; তাঁহাদিগের নাসিকা অথবা পদ হইতে নহে। সুতরাং তাঁহাদিগের এবং আরও উর্দ্ধতন পুরুষগণের আকৃতি (মোটের উপর অথবা আংশিক রূপে) জাতকে সংক্রমিত হইতে সূক্ষ্মাবস্থায় ভিন্ন অন্যাবস্থায় হইতে পারেনা। স্থূল বস্তু যত ক্ষুদ্রই হউক, বহু পুরুষের অঙ্গের উপাদান স্থূল অবস্থায় ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র দানার মধ্যে কোন মতেই স্ব স্ব স্থানে পৃথক ভাবে থাকিতে পারে না। এইরূপে আমরা সূক্ষ্মদেহ অনুমান করিতে বাধ্য। বংশানুক্রম শাস্ত্রের এবং ভ্রূণতত্ত্বের কয়েকটি কথা যদিও অতি সংক্ষেপে বলা হইল, তথাপি একথা সম্ভবতঃ প্রতীয়মান হইয়াছে যে ঐ উভয় তত্ত্বের জ্ঞাত বিষয় সকল সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সূক্ষ্ম দেহ স্বীকার করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। অন্ততঃ সূক্ষ্ম দেহকে এই প্রসঙ্গে কাজ চলারমত একটি অনুমান* বলিয়া অঙ্গীকার করিতে কোন আপত্তি হইতে পারে না। বিশেষতঃ যখন পূর্ব্ব পুরুষগণের মানসিক অবস্থার বংশানুক্রম চিন্তা করা যায় তখন সূক্ষ্মদেহের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করা, কেবল মাত্র কাজ চলা অনুমান নহে,তদপেক্ষা বলবৎ স্বীকার্য্য ‡ মধ্যে গণ্য হইবার যোগ্য হয়। অন্ততঃ একথা নিশ্চয়ই বলা যাইতে পারে যে, সূক্ষ্মদেহের অস্তিত্ব ইউরোপীয় বিজ্ঞান শাস্ত্রে পূর্ব্বে যতদূর অসম্ভব বলিয়া বোধ হইত, এক্ষণে ততদূর বোধ হইতে পারে না।

একথা সত্য হইলে, মানব দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির ক্ষয় সম্বন্ধে আলোচনা কালে আমরা যে স্থূল দেহের নাশ ও সূক্ষ্মদেহের উৎপত্তি হইয়া আরও 'উন্নত' বিবর্ত্তন হইবে অথবা হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম তাহা অযৌক্তিক কিম্বা অসম্ভব বলা যায় না। ক্রম-বিবর্ত্তন যখন মানবেই শেষ হইবার কিছু মাত্র কারণ নাই, এবং মানবের স্থূল দেহ যখন ক্রমশঃ ক্ষয় পাইবার পথে অগ্রসর হইয়াছে, তখন মানবের পরবর্ত্তী বিবর্ত্তনে সূক্ষ্ম দেহের উৎপত্তিই যুক্তি সঙ্গত বিবেচনা হয়।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই এতদ্দেশীয় দর্শন শাস্ত্র স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ, এই ত্রিবিধ দেহ স্বীকার করিয়া আসিতেছে। স্থূলদেহ প্রত্যক্ষ সিদ্ধ; সূক্ষ্ম দেহও সঙ্গত অনুমান দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু কারণ দেহ কি? এ প্রশ্নের উত্তরে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে ভ্রূণ তত্ত্ব ইহার উত্তর দেওয়া দুঃসাধ্য বিবেচনা করিলেও সম্পূর্ণরূপে অসাধ্য বিবেচনা করেনা।

শ্রীশশধর রায়।

---

* Monstrositees ব্যতীত।

* Working hypothesis

‡ Theory.

[illegible]র্য্য সমাজ বন্ধনের কয়েকটি স্তর।

আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধে যে বিষয় আলোচনা করিতে [illegible]য়াছি, সে সম্বন্ধে আমার অনুসন্ধান এখনও এত [illegible] দূর অগ্রসর হয় নাই, যাহাতে সাহস করিয়া কোনও [illegible] প্রকাশ করি। আমার অনুসন্ধান চেষ্টায় আপাততঃ আমার যাহা মনে হইয়াছে তাহারই কয়েকটি কথা এই [illegible] লিপিবদ্ধ করিতেছি। ভরসা করি অভিজ্ঞ [illegible]বর্গের আলোচনা দ্বারা এ বিষয়ে আমার শেষ সিদ্ধান্ত [illegible] সহায়তা পাইব।

ব্যবহার শাস্ত্রের ইতিহাস আলোচনা করিয়া Sir Henry Maine যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন তাহা সুপরিচিত। তাহার সংক্ষিপ্ত পুনরুক্তির দ্বারা আমার [illegible] বিষয়টি উপস্থিত করিব। তাঁহার মতে সমাজের [illegible] পরিবার। যখন রাষ্ট্র গঠিত হয় নাই তখন পরিবারই (Family, mund) সমাজ বন্ধনের শেষ কথা। সেই পরিবারে পিতার অব্যাহত অধিকার ছিল এবং সেই পরিবার ভুক্ত নারী সন্তান বা দাস দাসীর উপর [illegible]বাদির তুল্য আধিপত্য তাঁহার ছিল। তার পর পরিবার বাড়িয়া কুল (clan, gens, hans) গড়িয়া উঠে, কুল বাড়িয়া গোত্র (Tribe) হয়, Tribe হইতে state বা রাষ্ট্র হয়।

[illegible] অবস্থায় গৃহপতির অধিকার যেমন অব্যাহত [illegible], দ্বিতীয় অবস্থায় কুলপতির গৃহপতির উপর তেমন [illegible] অধিকার ছিল। তেমনি গোত্রপতি ও রাষ্ট্রপতির অধিকার গৃহপতির অধিকারের ছায়াবলম্বনে গঠিত হইয়াছিল।

রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইতে আইনের উৎপত্তি। কিন্তু [illegible] মূল ব্যবহার (litigation)আদি ব্যবহার রাজার [illegible] হইত, আর কোনও আইন কানুন ছিল না, [illegible] রাজার প্রত্যাদেশমূলক নিষ্পত্তি(Themis,doom) [illegible] আদেশের ন্যায় বিনা বিচারে স্বীকৃত হইত। তার পর এই সমুদয় Themis হইতে ক্রমে আচার ধর্ম্মের customary law সৃষ্টি হয় এবং তাহাই ক্রমে বিধিবদ্ধ হইয়া সংহিতা code এর আকার ধারণ করে।

Maine এর এই অভিমত লইয়া অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা পাশ্চাত্য জগতে হইয়াছে এবং এ সম্বন্ধে নানারূপ আধুনিক মত প্রস্তাবিত হইয়াছে যাহা Maine এর অনেকগুলি কথাই অস্বীকার করে। সে সকল বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা আমার অভিপ্রায় নয়। ভারতীয় আর্য্যগণের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে এই মতবাদে কয়েকটি গুরুতর আপত্তির হেতু দেখা যায় তাহাই আমি এ প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

রাষ্ট্রের পূর্ব্বে ব্যবহার ছিল কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত একটা কথার মার পেচের উপর নির্ভর করে। যদি ব্যবহার অর্থে ধর,

> স্মৃত্যাচার ব্যাপেতেন মার্গেনাধর্ষিতঃ পরৈঃ।
> আবেদয়তি চেদ্রাজ্ঞি ব্যবহারপদং হি তৎ॥

তবে রাজা না থাকিলে অবশ্য ব্যবহারই হইতে পারে না, আইনও হইতে পারে না। বেন্থাম, অষ্টিন প্রমুখ ব্যবহার তত্ত্বেত্তার মতেও রাজা যে বিধান করিবেন তাই আইন। এ কথা বলিলে কাজে কাজেই বলিতে হয় যে রাষ্ট্র গঠনের পূর্ব্বে আইন থাকিতেই পারে না। কিন্তু আইন বা law বলিতে যদি আমরা বুঝি সেই সব সমাজ নির্দ্দিষ্ট নিয়ম, যার দ্বারা সমাজভুক্ত ব্যক্তিদের অধিকারের ক্ষেত্র নির্ণীত হয় এবং যাহা লোকে কর্ত্তব্য বোধে অনুসরণ করে, তবে একথা না বলিয়া উপায় নাই যে সে law বা আইন রাষ্ট্র গঠনের পূর্ব্ব হইতেই সমাজে বর্ত্তমান ছিল। রাজার বিচার ও সিদ্ধান্ত (Themis) হইতে আইনের উৎপত্তি হওয়া দূরে থাকুক, আইন বা ধর্ম্মব্যবস্থা রাজা সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ছিল।

আমাদের প্রাচীন ব্যবহার শাস্ত্রে যে ব্যবহারের কথা আছে তাহা রাজার অপেক্ষা করে সন্দেহ নাই। কিন্তু

রাজা ছাড়াও যে অন্য বিচারক ছিল তাহার নিশ্চয় প্রমাণ আছে। কুল, শ্রেণী, পুগ, গণ, ব্রাত, প্রভৃতি নানা নাম দিয়া কুল ও নানা এক ব্যবসায়ী বা একধর্ম্মী বা এক দেশবাসী ব্যক্তির সমবায় (guild) যে ব্যবহারের নিরূপক এ কথা বহু স্থানে আছে। তাহা ছাড়া পরিষদ্ যে ধর্ম্মনির্দ্দেশক—যং সা ব্রূতে স ধর্ম্মঃ স্যাৎ—এ কথাও স্পষ্ট ভাবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। রাজাও প্রাচীনতম ব্যবহার শাস্ত্রেও ধর্ম্ম নিরূপণে স্বাধীন বা স্বেচ্ছাচারী বলিয়া কল্পিত হন নাই। প্রত্যুত তিনি পরিষদ্ বা সভাস্থ বিদ্বা বয়োবৃদ্ধগণের, স্থান বিশেষে কৃষি-বণিক-কুশীদ কারুগণের নির্দ্দেশ অনুসারে ধর্ম্ম নিরূপণ করিবেন তাহা বার বার নানা ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা আমি প্রবন্ধান্তরে দেখাইয়াছি।

ধর্ম্মশাস্ত্রের এই সকল বিধান আলোচনা করিলে এই সিদ্ধান্ত সমীচিন বলিয়া বোধহয় যে সমাজের আদিম স্তরে বিচার কার্য্য এবং ধর্ম্ম নিরূপণ রাজা করিতেন না। শাস্ত্রীয় ধর্ম্ম নিরূপণের কর্ত্তা ছিলেন পরিষদ্ অর্থাৎ কুলের মান্য পণ্ডিত গোষ্ঠী। পরবর্ত্তী কালে স্মৃতি শাস্ত্রে পরিষদের অর্থ অন্যরূপ হইলেও প্রথমতঃ পরিষদ্ বলিতে কি বুঝাইত বৃহদারণ্যকের "পাঞ্চালানাং পরিষদ মাজ-গাম" এই বাক্যে আমরা তাহার ইঙ্গিত পাই। প্রত্যেক কুল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পরিষদ দ্বারা অধিষ্ঠিত ছিল। এই পরিষদ সেই কুলের মান্য পণ্ডিত গোষ্ঠীর নাম। পণ্ডিত-গণ নানা শাস্ত্রের আলোচনায় জীবন অতিবাহিত করিতেন। কোনও সন্দেহ স্থলে তাঁহারাই ধর্ম্ম ব্যবস্থা দিতেন এবং সকলে অবনত মস্তকে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করিত। তাহা ছাড়া কৌলিক ধর্ম্ম বা শ্রেণীগত ধর্ম্ম বিষয়ে কুলের এবং শ্রেণীর অধিষ্ঠাতৃগণ ধর্ম্ম ব্যবস্থা করিতেন। রাজশক্তি ব্যবহার নির্ণয় কার্য্যে হস্তার্পণ করিবার পূর্ব্বেই সমাজের এইরূপ নিয়ম ছিল। রাজা যখন বিচার কার্য্য হাতে লইলেন তখন সেই ব্যবস্থাই চলিল, তবে এই সব বিচার রাজার সভায় বসিয়া হইতে আরম্ভ হইল।

ঋগ্বেদে রাজা একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যাপার। মনুষ্য রাজা ও দেবতার রাজা সম্বন্ধে আমরা ঋগ্বেদে ভূরি ভূরি বাক্য পাই। তাহা হইতে দেখিতে পাই যে রাজা জাতির সামরিক নায়ক, রাজা সমাজের প্রধান, রাজা পূজনীয় ও দেবতুল্য, তিনি শক্তিমান ও ঋদ্ধিমান, তিনি প্রজাদিগের হিতার্থে নানা অনুষ্ঠান করেন, প্রজাদিগকে শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করেন। কিন্তু ঋগ্বেদের কোনও স্থানে এমন উল্লেখ পাই না যে রাজা ধর্ম্ম ব্যবস্থাপক বা ব্যবহার দ্রষ্টা। অথর্ব্ববেদে রাজার ব্যবহার দর্শনের কথা দেখিতে পাই, কিন্তু ঋগ্বেদে কোথাও তাহা পাই না।

কেবল মাত্র এই কথা হইতেই এ সিদ্ধান্ত করা সমীচিন হয় না যে ঋগ্বেদ যে সময়ে রচিত হইয়াছিল সে সময়ে রাজা ব্যবহার দর্শন করিতেন না। কিন্তু ব্যবহারের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিয়া যখন আমরা দেখিতে পাই যে অতি প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্যবহার দর্শনে রাজার স্থান কতটা গৌণ এবং প্রকৃত ক্ষমতা কিরূপে পরিষদাদি নানা অরাষ্ট্রিক (non-political) সভা ও "বিদথের" হস্তে ন্যস্ত, তখন ইহা হইতেই এ অনুমান করা যাইতে পারে যে আদৌ রাজা বিচার কার্য্য করিতেন না এবং ধর্ম্ম বা ব্যবহারে তাঁহার কোনও হাত ছিল না, সে কার্য্য ছিল পরিষৎ ও কুল শ্রেণী জাতিগণাদির হাতে; তখন এই ব্যাপারটিকে এই অনুমানের পোষক বলিয়া ধরিলে যুক্তির কোনও [illegible] ভুল হয় না। এই প্রমাণের সঙ্গে মিলাইয়া [illegible] কাজেই এ কথা বলা যায় যে, যে সময়ে ঋগ্বেদের সূক্ত সমূহ রচিত হইয়াছিল তখন পর্য্যন্ত রাজার ধর্ম্ম বা ব্যবহারে কোনও হাত ছিল না। কিন্তু অথর্ব্ববেদের কোনও কোনও সূক্ত রচনার সময় রাজার ব্যবহারে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে এই অধিকারের পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু ঋগ্বেদে যে সমাজের পরিচয় আমরা পাই তাহা Maineএর বর্ণিত প্রাগ্‌ব্যবহারিক অবস্থার সঙ্গে মোটেই মিলে না। সে সময়ে ধর্ম্মশাস্ত্র ছিল না কিন্তু ধর্ম্ম ছিল, "ঋত" ছিল। সেই "ঋত" সমাজের ব্যক্তিগণের পরস্পরের সম্বন্ধের নিয়ামক বলিয়া স্বীকৃত ছিল। তাহা ছাড়া কুল ধর্ম্ম যে কৌলিক বিদথের দ্বারা নিরূপিত হইত তাহারও পরিচয় পাওয়া যায়। এক এক শ্রেণীর লোক যে ধর্ম্ম ও শাস্ত্রের চর্চ্চায় জীবন

[illegible] করিতেন এবং তাঁহারা যে রাজা রাজড়ারও [illegible] বিষয় ছিলেন, তাহারও প্রমাণের অভাব [illegible]। এই সম্বন্ধে ঋগ্বেদের নানা বাক্য একত্র করিয়া [illegible] মনে হয় যে পরিষদ নামটা থাকুক বা না থাকুক, [illegible] ছিল। সমাজ ধর্ম্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। সে [illegible] প্রজা নির্ব্বিশেষে সকলেই মানিতেন। ধর্ম্মের [illegible] ও ব্যবস্থাপক ছিলেন ঋষিগণ—যাঁহারা জীবন [illegible] নিবেদন করিয়াছিলেন। রাজা ছিলেন [illegible] সমাজের প্রধান পুরুষ, প্রজার রক্ষা কর্ত্তা, কিন্তু [illegible] ঋষিগণ তাঁহার পূজনীয় ছিলেন।

এই অবস্থায় যে আইন বা ধর্ম্ম সমাজে প্রচলিত ছিল, [illegible] ধর্ম্ম হইতে তাহার কোনও প্রকৃতিগত [illegible] ছিল না তাহা বলাই বাহুল্য। প্রভেদের মধ্যে [illegible] যে যেখানে বেদের যুগে ধর্ম্ম নিরূপণ করিতেন [illegible] বা কুলের বিদথ, সেখানে ধর্ম্মশাস্ত্রের যুগে রাজা [illegible] উপস্থিত হইলে ইহাদেরই অভিমত অনুসারে [illegible] নিরূপণ করিতেন। ইহাতে রাজ শক্তির প্রভাবযুক্ত [illegible] এই সিদ্ধান্তে কিছু বেশী জোর হইত, এই পর্য্যন্ত। [illegible] যে ধর্ম্ম নির্নীত হইত তাহা সনাতন, প্রাচীন ধর্ম্মও [illegible] উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাহার প্রমাণ সেই পরিষদ ও [illegible]ণ্যাদি।

রাজার ব্যবহার দর্শনের পূর্ব্ব হইতেই যখন ধর্ম্ম [illegible]w) সুপ্রতিষ্ঠিত এবং রাজা যখন সেই ধর্ম্ম মানিয়া [illegible] ব্যবস্থা অভিজ্ঞগণের অভিমত অনুসারে নির্ণয় [illegible] তখন ধর্ম্ম বা আইন যে রাজার (Themis) হইতে [illegible] এ মত বিচার সহ বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

[illegible] আর্য্য সমাজের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা [illegible] আমরা হয় তো ইহা অপেক্ষাও একটা প্রাচীন [illegible] উপস্থিত হইতে পারি। ঋগ্বেদে সর্ব্বত্র [illegible]—অন্ততঃ গ্রাম সমাজের মাথার উপর গ্রামনী ও [illegible] রাজাকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই। তাহারও [illegible] আর্য্য জাতির সমাজ গঠন কি প্রকার ছিল তাহার [illegible] কতকটা পাইলেও তাহার স্বরূপ আমরা বেদে [illegible] না। কিন্তু ব্যাবিলনের প্রাচীন ইতিহাসে ক্যাসাইট [illegible] যে বিবরণ Berosius লিপিবদ্ধ করিয়া [illegible] তাহা হইতে আমরা সেই অতীত যুগের [illegible] করিতে পারি। এই ক্যাসাইট জাতি [illegible] একটি শাখা তাহা এখন প্রায় সর্ব্বজন [illegible]। Berosius এর মতে আদিম Kassite গণের মধ্যে রাজা ছিল না। তাহাদের নেতা ছিল কতকগুলি অরণ্যবাসী ব্যক্তি যাহারা নক্ষত্রের গতি বিধি পর্য্যবেক্ষণ করিত ও সংসার ত্যাগী ছিল। Berosius এর বর্ণনার সঙ্গে প্রাচীন আর্য্য সমাজের চিত্র আমি বেদ ও ধর্ম্ম শাস্ত্র হইতে গঠন করিতে চেষ্টা করিয়াছি তাহা সম্পূর্ণরূপে মিলিয়া যায়। কেবল প্রভেদের মধ্যে বেদের আর্য্যগণের রাজা ছিল, বেরোসিয়স বর্ণিত দ্বীপবাসী ক্যাসাইটগণের রাজা ছিল না, ঋষি গোষ্ঠীই তাহাদের সর্ব্বকার্য্যের নায়ক ছিল। আমার মনে হয় যে আর্য্যগণের আদিম প্রাগ্‌রাষ্ট্রিক সমাজ ব্যবস্থা সর্ব্বত্রই এই প্রকার ছিল। পরে কালক্রমে অবস্থা গতিকে যোদ্ধৃজাতি সমগ্র জাতি হইতে স্বতন্ত্র হইয়া ক্রমে দৈবশক্তি হইতে পৃথক্ ভাবে একটা রাজশক্তি গড়িয়া উঠিল এবং তাহা সমাজে প্রধান হইয়া উঠিল। ইহা হইতেই রাষ্ট্রীয় সমাজের অভ্যুদয়। ইহা পার্শ্ববর্ত্তী জাতিগণের দৃষ্টান্তের অনুকরণের ফল হওয়াই স্বাভাবিক। অনুকরণ যে প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন সকল সমাজেই সমাজের বৃদ্ধি ও পরিণতি এবং সামাজিক অনুষ্ঠান সৃষ্টির একটা প্রধান শক্তির কাজ করে। নৃতত্ত্ব-বিদগণ তাহা প্রমাণ করিয়াছেন, এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে Tarde, Post প্রভৃতি তাহার প্রয়োগ দেখাইয়াছেন। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও যে অনুকরণই রাষ্ট্রীয় সমাজ গঠনের মূল এ কথা অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। কারণ, বহু পূর্ব্বকাল হইতেই সেমিটিক ও দ্রাবিড় জাতির মধ্যে রাষ্ট্রীয় সমাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং এই সমুদয় জাতির সঙ্গেই প্রাচীন আর্য্য সমাজের সর্ব্বপ্রথম পরিচয় ও সংঘর্ষ হয়।

আমার এ অনুমান যদি সঙ্গত হয় তবে অন্ততঃ ভারতীয় আর্য্য জাতির প্রাচীন ইতিহাসে প্রাগ্‌রাষ্ট্রী সমাজ Maine এর বর্ণিত প্রাগ্‌রাষ্ট্রীয় সমাজের চিত্রের সঙ্গে মোটেই মিলে না। এখানে যাহাদের আধিপত্য দেখিতে পাই তাহারা কুল জ্যেষ্ঠ নহেন তাঁহারা ঋষি। শারীরিক শক্তি বা গৃহপতির অধিকার তাঁহাদের অধিকারের মূল নহে। তাঁহারা অতি প্রাকৃত জ্ঞানের অধিকারী বলিয়া পূজনীয় ছিলেন এবং অতি প্রাকৃতের প্রতি প্রাচীন মানবের যে স্বাভাবিক শ্রদ্ধা ও ভয় তাহাই তাঁহাদের এবং তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত ও স্মৃত বিধি ব্যবস্থার প্রভাবের মূল।

শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত।

ক্রিটোন (Crito)

[এই প্রশ্নোত্তরে প্ল্যাটো দেখাইতে চান যে, সোক্রেটিস্ যে শুধু দার্শনিক ছিলেন, তা নয়; রাষ্ট্রের বিহিত আইন কানুনও তিনি যথারীতি মানিয়া চলিতেন। তা হইতেই, প্ল্যাটো বলিতে চান, যে কোনও বিহিত আইন পরিবর্ত্তিত কিংবা রহিত না হওয়া পর্য্যন্ত রাষ্ট্রের সকলেরই তাহা মান্য করা উচিত; আইনটী মন্দ বলিয়া যে কেহ যদি তাহা অমান্য করিতে অধিকারী হয়, তবে রাষ্ট্র রক্ষা হয় না।]

স্থান—কারাগৃহ, সময় সোক্রোটিসের বিষপানের নির্দ্দিষ্ট দিন, ভোর বেলা।

(সোক্রেটিস্ ও ক্রিটোন)

সোক্রেটিস্—এত সকালে কেন এসেছ, ক্রিটোন? এখনও ত ভোর হয় নাই, নয় কি?

ক্রিটোন—তা ঠিকই।

সো—এখন ঠিক সময় কত?

ক্রি—এই ভোর হচ্ছে।

সো—আমি ভাব্‌ছি কি, এই জেলখানার দারোয়ান তোমায় ছেড়ে দিতে চাইলে কি ক'রে।

ক্রি—আমি কিনা অনেকবার এখানে এসেছি, তাইতে আগে থেকেই আমার সঙ্গে জানা ছিল, সোক্রেটিস্; আর, আমার দ্বারা সে কিছু উপকৃতও হ'য়েছে।

সো—এই মাত্র এ'লে, না, অনেকক্ষণ হ'য়েছে।

ক্রি—কিছুক্ষণ হ'য়েছে বই কি।

সো—তা হ'লে তখনই আমাকে জাগালে না কেন, কিন্তু চুপটী করে বসে রইলে?

ক্রি—না, সোক্রেটিস্, দেবতার দোহাই, আমি হ'লে এমন ভাবে জেগে থাকৃতে এবং দুঃখ পাইতে চাইতাম না। কিন্তু তুমি কেমন আনন্দে ঘুমাইতেছ, তাই দেখে দেখে আমি কেবলই আশ্চর্য্য হ'য়ে যাচ্ছি। আর, ইচ্ছা করেই আমি তোমায় জাগাই নি, যাতে তুমি এমনি সুখে সময়টা কাটাতে পার। এর পূর্ব্বে সমস্ত জীবন ভরে অনেকবার তোমাকে স্বভাবতঃই খোসমেজাজী আমি মনে করেছি, কিন্তু এখনকার উপস্থিত অবস্থায় বিশেষ করে তাই মনে হ'চ্ছে,—এমনই সহজ এবং ধীর ভাবে তুমি এই দুর্দ্দশা বহন কর্‌ছ।

সো—কিন্তু, ক্রিটোন, যদি এরই মধ্যেই মরতে হয়, তা হ'লেও এ বয়সে আর দুঃখ করা সাজে না।

ক্রি—কিন্তু, সোক্রেটিস্, এমনই বয়সে এমনি অবস্থায় আরও ত লোক পড়ে, কিন্তু বয়স ত তা'দিগকে কোনও ক্রমেই উপস্থিত দুর্দ্দশায় দুঃখ করতে বারণ করে না।

সো—তাত বটেই; কিন্তু এত ভোরে তুমি এসেছ কেন?

ক্রি—দুঃখের সংবাদ নিয়ে, সোক্রেটিস্;—আমার যেমন মনে হচ্ছে, তোমার পক্ষে নয়, কিন্তু আমার এবং তোমার বন্ধুদের সকলের পক্ষে নিদারুণ এবং গভীর দুঃখের সংবাদ—এবং এদের সকলের মধ্যে আবার আমার পক্ষে বিশেষ দুঃসহ (সংবাদ)।

সো—কি সে? না, ডিলস্ (Delos) থেকে সে জাহাজটা এসেছে, যেটা এলে পরে আমাকে মরতে হ'বে?

ক্রি—এসে এখনও পৌঁছেনি বটে, কিন্তু বোধ হয় আজই এসে পৌঁছবে;—সোনিয়স্ অন্তরীপে যারা জাহাজ ছেড়ে এসেছে, তাদের নিকট হইতে এরূপই শুন্‌ছি—এদের কথায় স্পষ্টই বোধ হচ্ছে, যে (জাহাজ) আজই আস্‌বে; তা'হ'লে, সোক্রেটিস্, এ তো নিশ্চিত যে, কালই তোমাকে তোমার জীবন শেষ কর্‌তে হ'বে!

সো—কিন্তু, ক্রিটোন, এ তো সৌভাগ্য! এতেই যদি দেবতাদের প্রীতি হ'য়ে থাকে, তবে, তেমনি

হউক। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু আমার মনে হয়, জাহাজটী আজ আস্‌ছে না।

ক্রি—কিসে তা বুঝলে?

সো—তোমায় আমি বল্‌ছি; যেদিন জাহাজটী আস্‌বে, তার পরের দিন তো আমাকে মর্‌তে হবে?

ক্রি—এ সব বিষয়ের মালীকেরা তো তাই বলেন।

সো—কিন্তু আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি, উপস্থিত দিনে জাহাজটী আস্‌বে না, কিন্তু আস্‌বে পরের দিন। এটা আমি একটী স্বপ্ন হ'তে স্পষ্ট জান্‌তে পেরেছি—যা আজকে রাত্রেই এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে আমি দেখেছি; ভাগ্যে ঠিক সময় মতই তুমি আমাকে জাগাও নি।

ক্রি—এই স্বপ্নটী কি ছিল?

সো—দেখ্‌লাম যেন, সাদা পোষাক পরিধানে, সুন্দরী এবং চারুদর্শনা একটী স্ত্রীলোক আমার নিকটে এসে আমায় ডাক্‌লে এবং বল্‌লে,—"সোক্রেটিস্‌, তৃতীয় দিনে তুমি ফি্‌থ্য়ার (১) উর্ব্বর ক্ষেত্রে আসিবে।"

ক্রি—কি অদ্ভুত স্বপ্ন, সোক্রেটিস্‌।

সো—অর্থটী কিন্তু স্পষ্ট—আমার কাছে ত অন্ততঃ তাই মনে হয়, ক্রিটোন্‌।

ক্রিটোন্‌—অবশ্যই খুব,—যেমন মনে হ'চ্ছে। কিন্তু, ভাই সোক্রেটিস, এখনও একটীবার আমার কথা শোন এবং বেঁচে যাও! যদি তুমি মর, তবে আমার যে কেবল এক দিকেই দুর্ভাগ্য,এমন নহে;—পরন্তু, এমন একটী বন্ধু—যার মত আর একটী আমি আর কখনও পাইব না—তেমনটীকে যেমন হারাইব, তেমনই, বাইরের লোকদের—যারা তোমাকে এবং আমাকে ভাল করে চিনে না, তাদের—প্রতীতি হইবে যে, যেস্থলে, যদি আমি পয়সা খরচ করতে যাইতাম তাহ'লে তোমাকে রক্ষা করতে পারতাম,—সে স্থলে, আমার সে প্রবৃত্তিই হইল না! লোকে মনে কর্‌বে, আমি টাকাকে বন্ধুর চেয়ে বড় মনে করি—এর চেয়ে অধিক লজ্জাজনক আর কি হ'তে পারে? বাইরের লোকে তো আর এটা বিশ্বাস করবে না, যে, আমরা চাইলেও তুমি নিজেই এখান হইতে পালাতে ইচ্ছা কর নি!

সো—কিন্তু, প্রিয় ক্রিটোন্‌, বাইরের লোকের (২) এই ধারণায় আমাদের কি আসে যায়? শিষ্ট এবং সদ্বিবেচক ব্যক্তিরা—যাঁদের কথা বরং প্রণিধানের যোগ্য, তাঁরা—বুঝে নিবেন যে, এই সব ব্যাপার যেমনটী হওয়া উচিত, তেমনই ঘটেছে।

ক্রি—কিন্তু, দেখ্‌তে পাচ্ছ ত, সোক্রেটিস্‌, সর্ব্বসাধারণের মতটাও গ্রাহ্য করতে হয়—বর্ত্তমানে যা ঘটেছে তা হ'তে স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে যে, সর্ব্বসাধারণ যে শুধু ক্ষুদ্রতম অনিষ্ট ঘটাতে পারে তা নয়,—যদি কেহ তাদের বিরাগভাজন হয়, তবে, তারা আর সবচেয়ে বড় অনিষ্টও করতে পারে (৩)।

(১) ফি্‌থ্য়া—Phthia—Thessaly'র অন্তর্গত একটী স্থান Achilles (এখিলিস্‌) এর জন্মভূমি। স্বপ্নের এই উক্তিটী আংশিক পরিবর্ত্তিত হইয়া হোমার হইতে গৃহীত। হোমারে এখিলিসের গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের কথা রহিয়াছে। সোক্রেটিসের কাছে মৃত্যুও স্বদেশ প্রত্যা-বর্ত্তনেরই মত।

(২) মূলে আছে—Hoi polloi = the many, the multitude, বাংলায় 'বাইরের লোক', 'বাজে লোক', 'সাধারণ লোক' ইত্যাদি।

(৩) এইখানে সর্ব্বসাধারণের বিচারে সোক্রেটিসের মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞার প্রতি কটাক্ষ করা হইতেছে।

সো—আমার ইচ্ছা হয়, ক্রিটোন, সত্য সত্যই সাধারণ লোকেরা ঘোরতম অনিষ্ট যদি করতে পারত!—কেননা, তা হ'লে তারা সব চেয়ে ভাল কাজও করতে সমর্থ হ'ত—এবং সেটা অবশ্যই খুব ভাল হইত! কিন্তু বর্ত্তমানে তারা দুটীর একটীও করতে সমর্থ নয়; (কাহাকেও) তারা প্রাজ্ঞ করতেও পারে না—অবিবেচকও করতে পারে না; যা তারা করে, সেটা দৈবাৎ হ'য়ে যায়।

ক্রি—সে সব বিষয় তেমনি হ'তে দাও। উপস্থিত কথা, সোক্রেটিস্, আমায় তুমি বল দেখি—তুমি কি আমার এবং তোমার অন্যান্য বন্ধুদের কথাই ভাবছ না—নয় কি?—যে, যদি তুমি এখান হইতে বাহির হইয়া যাও, তবে তোমাকে এখান থেকে চুরি করেছি ব'লে চরদের (৪) সঙ্গে আমাদের গোলযোগ ঘট্‌বে, এবং আমাদিগকে বাধ্য হ'য়ে চাই কি সমস্ত ধনসম্পত্তি, অন্ততঃ প্রচুর টাকা কড়ি হারাতে হ'বে—অথবা এদের হাতে এর চেয়েও বড় ক্ষতি সইতে হ'বে? যদি এমনি কিছু তুমি ভয় করে থাক, তবে সে বিষয় নিশ্চিন্ত থাক। কারণ, তোমাকে রক্ষা করতে গিয়ে এতটুকু বিপদ্ কিংবা দরকার হ'লে ইহার চেয়েও বড় বিপদ্—আমাদিগের কোন ক্রমে স্বীকার করে নেওয়াই উচিত। সুতরাং আমার কথা শোন, অন্যথা করো না।

সো—এটাও ভয় করছি বটে, ক্রিটোন, কিন্তু আরও অনেক বিষয়।

ক্রি—সে সব ভয় আর করো না। সে টাকাটা খুব বেশী নয় যার জন্যে তোমাকে রক্ষা করতে এবং এখান হ'তে নিয়ে যেতে কেহ কেহ ইচ্ছুক হ'য়েছে! দেখ্‌তে পাচ্ছ না গুপ্ত চরেরা কত সস্তা?—তাদের জন্যে আর কিছু বেশী টাকার দরকার হ'বে না; আমার সমস্ত সম্পত্তি তোমার—এবং আমার মনে হয়, ইহাই যথেষ্ট। আর, আমার ভাবনা ভেবে যদি তুমি আমার টাকা খরচ করে ফেলতে না দাও, তা হইলেও এখানে (তোমার) আরও এই প্রকার বিদেশী বন্ধু (তোমার জন্যে) খরচ করতে প্রস্তুত হ'য়ে রয়েছে। একজন—থিবিস্ বাসী সিমিয়াস্ (Simmias)—তো এই উদ্দেশ্যেই উপযুক্ত টাকা নিয়ে প্রস্তুত হ'য়ে এসেছে। কেবিস্ (Kebes) ও প্রস্তুত হ'য়ে আছে এবং আরও অনেকে। কাজেই, আমি তোমায় বলছি, সে সব কিছু ভয় করে নিজেকে রক্ষা করতে ইতস্ততঃ ক'রো না; কিংবা, যেমন তুমি আদালতে বলেছিলে, তেমন বলা তোমার পক্ষে দুষ্কর হ'য়ে উঠুক, 'যে, এখানে হ'তে পালিয়ে গেলে কি যে তুমি করবে তা কিছুই ঠিক পাবে না। কারণ, অন্যত্রও অনেক জায়গায়ই যেখানেই তুমি যাও না কেন—লোকে তোমায় ভাল বাসবেই। যদি থেসালীতে (Thessaly) যেতে চাও, তবে সেখানেও আমার বন্ধুরা আছেন, যাঁরা তোমাকে মাথায় করে নিবেন (৫) এবং তোমাকে নিরাপদে রাখ্‌বেন—যাতে করে, থেসালীর কোন লোক হইতে তোমার কোন কষ্ট হ'বে না।

আর এক কথা, সোক্রেটিস, তুমি যা করতে যাচ্ছ—যে স্থলে তোমার বেঁচে যাওয়া উচিত ছিল, সেখানে যে তুমি নিজেকে বিনাশ করছ, সেটা আমার কাছে সঙ্গত মনে হচ্ছে না। এবং তোমার শত্রুরা হয়ত যার জন্যে চেষ্টা করত, এবং তোমাকে হত্যা করতে ইচ্ছা

(৪) মূলে Sycophantes আছে যা হইতে ইংরেজী sycophant কথাটি আসিয়াছে। ইহারা অনেকটা গুপ্ত পুলিশের কাজ করিত।

(৫) মূলে আছে (Peri polloy poeesontai)—অনেকটা সংস্কৃত, 'বহু মন্ততে'র অনুরূপ।

করে যা চেষ্টা করেছিল, তুমি নিজের সম্বন্ধে সেইটা ঘটতে পারে তারই জন্যে ত্বরা করছ। আর, আমার মনে হচ্ছে, এই শত্রুদের হাতেই তুমি তোমার নিজের ছেলেদিগকেও দিয়ে যাচ্ছ—যাদের লালন পালন করা এবং শিক্ষা দেওয়া তোমার কর্ত্তব্য ছিল, তাদিগকে ফেলে যাচ্ছ—আর তোমার কাজের মধ্যে (৬), যেমন তাদের অদৃষ্টে থাকে তেমনই তারা করবে। আর পিতৃমাতৃবিয়োগে পিতৃমাতৃহীন বালকদের যা ঘটে থাকে, সম্ভবতঃ, এদেরও তাই ঘটবে। হয় ছেলের জন্ম দেওয়া উচিত নয় নতুবা লালন পালন করা এবং শিক্ষা দেওয়ার সমুদয় কষ্ট বহন করা উচিত। আমি দেখছি তুমি সব চেয়ে সহজ পথটী অবলম্বন করছ। সারা জীবন ভরে যে ব্যক্তিকে ধর্ম্মের চিন্তা করতেই লোকে দেখলো, এমন ব্যক্তির পক্ষে সৎ এবং সাহসী পুরুষ যে পথ মনোনীত করত সেইরূপই করা উচিত ছিল। আর আমি তোমার জন্যে এবং আমাদের—তোমার বন্ধুদের জন্যে লজ্জা বোধ কচ্ছি; এই যে তোমাকে নিয়ে ব্যাপারটা ঘট্‌ল, সেটা আমাদের একটু সাহসের অভাব থেকেই ঘটেছে, এমনই কি দেখাবে না? আর আদালতের সেই মোকদ্দমাটা, যেমন ভাবে সেটাতে তুমি প্রতিবাদী হ'য়েছিলে, আর মোকদ্দমার এই বাদ প্রতিবাদটা (৭) যে ভাবে হ'য়েছিল, তেমনটী না হওয়াই উচিত ছিল;—আর সকলের উপরে লজ্জাজনক এই যে ব্যাপার; লোকে মনে করবে, তাহা আমাদেরই দুর্ব্বলতা এবং কাপুরুষতার জন্যে ঘটেছে—আমরা সরে দাঁড়ায়েছি বলেই ঘটেছে;—কারণ, আমরা তোমাকে রক্ষা করি নি তুমিও নিজেকে রক্ষা করনি; অথচ, যদি আমাদের কিছু মাত্র মূল্য থাকে, তবে একাজ আমাদের পক্ষে সম্ভব এবং শক্য। দেখিও সোক্রেটিস্, তোমার পক্ষে এবং আমাদের পক্ষে একসঙ্গে অনিষ্টজনক এবং লজ্জাস্পদ এই সকল ব্যাপার যেন না ঘটে। কিন্তু ভেবে দেখ, অথবা ভাববার সময় আর নাই—বরং ইতিমধ্যেই ভাবা হয়ে যাওয়া উচিত;—এক মাত্র কর্ত্তব্য রয়েছে; এই আজকের রাত্রের মধ্যেই যা কিছু করবার করে ফেলতে হবে। যদি আমরা দেরী করি, তবে অসম্ভব হয়ে পড়বে এবং আর কখনও সম্ভব হবে না। কিন্তু সোক্রেটিস সব রকমেই আমার কথাটী শোন, কিছুতেই অন্যথা করো না।

সো—ভাই ক্রিটোন, তোমার এই উৎসাহ প্রশংসনীয় (৮) বটে, অবশ্যই যদি একটু সাধুতার সঙ্গে বর্ত্তমান থাকে; তা যদি না হয়, তবে এই উৎসাহ যতই প্রবল হইবে, ততই অনিষ্টজনক হইবে। এখন আমাদের দেখ্‌তে হবে, তুমি যা করতে বলছ তা করা উচিত কি না; কেন না, শুধু এখন নয়, বরাবরই আমি এমনই ধরণের লোক, যে বিতর্কিত হয়ে যে যুক্তিটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রতীয়মান হয়, সেটী ভিন্ন আর কোন বস্তুর কথা আমি শুনি না। বর্ত্তমানে আমার এই দশা উপস্থিত হ'য়েছে বলেই, যে সমস্ত মীমাংসায় আমি পূর্ব্বে উপস্থিত হয়েছিলাম, সেগুলি এখন ফেলে দিতে পারি না; বরং সে গুলি এখনও আমার কাছে আগেরই মত বলবৎ এবং যে সব (নীতি) পূর্ব্বে অনুসরণ করে এসেছি, এখনও সেগুলি অনুসরণ করি এবং মান্য করি। বর্ত্তমানে ইহাদের চেয়ে উচ্চতর কিছু যদি আমরা না পাই তবে, নিশ্চয় জানিও, আমি তোমার সঙ্গে এক মত হইব না— সর্ব্বসাধারণের শক্তি বর্ত্তমানে যা শাস্তি দিয়েছে তার চেয়ে ঘোরতর শাস্তি দিলেও না—জেলখানা, মৃত্যু, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত প্রেরণ করিয়া শিশুদের মত জুজুর ভয় দেখাইলেও না।

(৬) মূল, To son meros = for your part.
(৭) মূলে আছে (Agon) = মল্ল যুদ্ধ।
(৮) মূল, Polloy axia = worthy of much.

এখন এই সকল প্রশ্নের—সবচেয়ে ভালরূপ বিচার আমরা কি প্রকারে করতে পারি? তুমি লোকমত সম্বন্ধে যা বলেছিলে যদি সেই কথাই আমরা আগে ধরি, (তা হইলে) এটা কি ঠিক বলা হয় নাই, যে, লোকমতের কতকগুলিতে সায় দেওয়া উচিত আর কতকগুলিতে নয়? আর এটা কি শুধু আমার মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞার আগেই ঠিক বলা হয়েছিল, এখন অবশ্যই এটা স্পষ্ট হয়ে দাড়ায়েছে যে, সে শুধু ফাঁকা কথার কথা বলা হয়েছিল—শুধু ছেলেভুলানো, নিরেট বাজে কথা? ক্রিটোন, এই কথাটাই আমি তোমার সঙ্গে একযোগে বিচার করতে চাই, যে, আমি বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছি বলে সেই (পূর্ব্বেকার) সিদ্ধান্ত আমার কাছে অন্যথা হয়ে গেছে না পূর্ব্ববৎই রয়েছে--আর, সেই সিদ্ধান্তটা আমার ছেড়ে দেওয়া উচিত, না অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। আমি যতটুকু বুঝেছি, (আমাদের) সিদ্ধান্ত হ'য়েছিল—এবং যাঁরা নিজেদিগকে এ বিষয়ে কিছু বলতে সমর্থ বলে মনে করেন তাঁরা এটা স্বীকার করেন—যে,—যা নাকি এখন আমি বলছিলুম,—লোকে যে সব মত (৯) প্রকাশ করে থাকে, সেই সব মতের মধ্যে কতকগুলি অবশ্যই বিশেষ করে মান্য করা উচিত, আর কতকগুলি নয়। দেবতা সাক্ষী করে বল দেখি ক্রিটোন, এটা সত্য বলা হচ্ছে বলে তোমার মনে হয় কি না? মানুষী সম্ভাবনায় যতটুকু দেখা যায়, (তাতে) তোমার কাল মরবার মত গতিক নয়—আর, তোমার বর্ত্তমান অবস্থায় তোমার বুদ্ধিভ্রংশ ঘট্‌বারও কোন কারণ নাই। সুতরাং বিচার করে দেখ দেখি; এটা কি তোমার কাছে সত্যবলে প্রতীয়মান হয় না যে, মানুষের সকল মতই গ্রাহ্য করা উচিত নয়—কতকগুলির সম্মান করা উচিত, আর কতকগুলির নয়? আর সকলের মতও গ্রাহ্য করা উচিত নয়,—কারও কারও মত গ্রাহ্য করা উচিত, আর, কারও কারও নয়? কি বল্‌ছ? এটা কি সুষ্ঠু উক্ত হয় নাই।

ক্রি—সুষ্ঠুই ত বটে।

সো—এটাও কি ঠিক নয়, যে, যে গুলি ভাল, সে গুলিই গ্রহণ করা উচিত, মন্দগুলি নয়?

ক্রি—হাঁ।

সো—ভাল মত অর্থ শিষ্টদের মত, আর মন্দ অর্থ অশিষ্টদের মত, নয় কি?

ক্রি—নয় ত কি?

সো—আচ্ছা, এখন এসো দেখি; আমরা এ সব কি বলেছি? ব্যায়াম শিখ্‌ছে যে ব্যক্তি, ব্যায়াম শিখ্‌তে গিয়ে সে কি প্রত্যেক লোকেরই প্রশংসা এবং নিন্দা এবং মতের দিকে লক্ষ্য রাখ্‌বে—না শুধু, এক জনের, যে তাহার চিকিৎসক কিংবা ব্যায়ামশিক্ষক, তার (মতের দিকে লক্ষ্য রাখ্‌বে)?

ক্রি—শুধু একজনের।

সো—(তার পক্ষে) সেই একজনের নিন্দার ভয় করা উচিত এবং প্রশংসার আদর করা উচিত এবং অন্য সকলের নয়—নয় কি?

ক্রি—তা ত বটেই।

সো—তাকে অবশ্যই বরং সেই প্রকারেই চল্‌তে হবে, এবং ব্যায়াম করতে হবে, এবং খেতে হ'বে এবং পান করতে হ'বে, যেমনটি তার শিক্ষক এবং বিজ্ঞ সেই এক ব্যক্তির নিকট ভাল মনে হয়—অবশ্যই অন্য সমস্তের মত অনুসারে নয়?

ক্রি—এত বটেই।

সো—আচ্ছা। সেই এক জনকে বিশ্বাস না করে, তার মত এবং প্রশংসা অগ্রাহ্য করে, কিছুই জানে না যে সর্ব্বসাধারণ তাদের কথা মাথায় করে নেয় যে

(৯) মূল=doxa, প্ল্যাটোর একটী অতি প্রসিদ্ধ শব্দ; অর্থ—সাধারণ, প্রচলিত মত, বিশিষ্ট এবং দার্শনিকদের মতের বিপরীত।

ব্যক্তি, কোন অনিষ্ট ফল কি সে ভোগ কর্‌বে না?

ক্রি—কর্‌বে না তো কি?

সো—কি সে অনিষ্ট, কতদূর তার বিস্তৃতি এবং সেই অবিশ্বাসীর কোন্ বস্তুতে সেটা প্রকাশ পাবে?

ক্রি—স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে, তার দেহেতে? এইটাই তার নষ্ট হবে।

সো—বেশ বলেছ। আচ্ছা, ক্রিটোন, অন্যান্য বিষয়ও কি ঠিক এমনই নয়?—সমস্ত গুলির নাম আমরা করতে চাইনা—যথা, ন্যায্য ও অন্যায্য, অধন্য ও সুন্দর, এবং ভাল ও মন্দ, প্রভৃতি—যে সব নিয়া এতক্ষণ আমাদের তর্ক চল্‌ছে—এসব বিষয়ে কি সর্ব্বসাধারণের মতটাই আমাদের অনুসরণ করা উচিত এবং ভয় করা উচিত, না, ব্যক্তিবিশেষের যদি বিজ্ঞ কেহ থাকেন, (তেমন ব্যক্তি বিশেষের), যাঁকে, অন্য সবকে বাদ দিয়া আমাদের লজ্জা এবং ভয় করা উচিত? এবং যাঁকে যদি আমরা অনুসরণ না করি, তবে সেই জিনিসটী-ই আমরা লোপ করে এবং নষ্ট করে দিব, যাহা ন্যায়ের অনুসরণে ভাল হয় এবং অন্যায়ের অনুসরণে লোপ পায়?—না, সেটা কিছু নয়?

ক্রি—আমিত ভাব্‌ছি, সোক্রেটিস্।

সো—আচ্ছা, এখন দেখ দেখি; যে জিনিষটী স্বাস্থ্যকর অবস্থায় উৎকৃষ্টতর থাকে, অসুস্থ হলে নষ্ট হ'য়ে যায়, —যদি বিজ্ঞের মতে আস্থা স্থাপন না করে সেই জিনিষটী আমরা নষ্ট করে ফেলি, তবে, সেই জিনিষটী নষ্ট হ'য়ে গেলেও—আমাদের জীবন ধারণ কি সুখের হইবে? সেই জিনিষটী অবশ্যই দেহ? নয় কি?

ক্রি—হাঁ।

সো—আর, রুগ্ন এবং বিকল একটী দেহ নিয়ে জীবনধারণ আমাদের পক্ষে খুব সুখের নয় কি?

ক্রি—নিশ্চয়ই না।

সো—কিন্তু সেই জিনিষটী নষ্ট হলেও জীবন আমাদের সুখের হইবে, যেটী অন্যায় হইতে নষ্ট হয় এবং ন্যায় দ্বারা পুষ্টি লাভ করে, কেমন? আর যার সম্বন্ধে ন্যায় এবং অন্যায়ের বিচার—সেটী আমাদের যাই হউক না কেন—সেটাকে আমরা দেহ হইতে নিকৃষ্ট মনে করি, কেমন?

ক্রি—নিশ্চয়ই না।

সো—তবে, অধিক সম্মানের যোগ্য?

ক্রি—এক শ' বার।

সো—তা হ'লে, ভাই, সর্ব্বসাধারণে কি বলে, সেটা কখনও আমাদের তেমন বিবেচ্য নহে—কিন্তু সেই একজন, যিনি ন্যায় এবং অন্যায়ের বিচারে পটু, তিনি কি বলেন, সত্য কি বলে—(তাই আমাদের বিবেচ্য)। সুতরাং ন্যায় এবং সুন্দর এবং সৎ এবং তদ্বিপরীত বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের মত আমাদের অনুধাবন করা কর্ত্তব্য—এই যে তুমি বল্‌ছ,—সেটা গোড়াতেই ঠিক বল্‌ছ না।

কিন্তু, অবশ্যই, কেউ হয় ত বল্‌বেন, সর্ব্বসাধারণ যে আমাদের প্রাণ দণ্ড দিতে সমর্থ?

ক্রি—এত স্পষ্টই; বলবেই ত, সোক্রেটিস্।

সো—সত্য বল্‌ছ। কিন্তু, হে আমার আশ্চর্য্য বন্ধু, আমরা যে সিদ্ধান্ত করেছি সেটী যে এখনও আমার কাছে পূর্ব্বেরই মত বলবৎ দেখাচ্ছে। আর সেইটাই ভাল করে বিচার করে দেখ দেখি যে, এটা আমাদের এখনও ঠিক আছে কিনা যে, শুধু বেঁচে থাকাটাকে সবচেয়ে বড় মনে করতে হবে না কিন্তু ভাল করে বেঁচে থাকাটাকে।

ক্রি—হাঁ, এটা ঠিক আছে।

সো—সৎ জীবন যাপন করা, আর সুন্দর রূপে এবং ন্যায় পথে জীবন যাপন করা একই—এটাও আমরা স্বীকার করি কি না?

ক্রি—স্বীকার করি।

সো—তা হ'লে, আমরা যা যা স্বীকার করেছি, তার থেকে এইটি দেখতে হবে, যে, এথিনীয়েরা আমাকে যেতে না-দিলেও আমার পক্ষে এখান হইতে পলাইয়া যাইতে চেষ্টা করা উচিত, কি, উচিত নয়; যদি উচিত প্রতিপন্ন হয়, তবে চেষ্টা করব, আর যদি তা না হয়, তবে ছেড়ে দিব। আর যে সব বিচার্য্য বিষয়ের কথা তুমি বলছ,—টাকা পয়সার খরচ সম্বন্ধে, লোক মত সম্বন্ধে এবং ছেলে পিলের লালন পালন সম্বন্ধে—সেগুলি, ক্রিটোন, সত্য বলে মনে হয় না;—সেগুলি, যারা সহজেই লোককে নিহত করে থাকে এবং—যদি শক্তি থাকত তবে—তেমনি সহজ ভাবেই লোককে পুনর্জ্জীবিত করত—অথচ একটীতেও বুদ্ধির পরিচয় দিত না—সেগুলি, সেই সাধারণ লোকদের মত। যা এ পর্য্যন্ত প্রমাণিত হ'য়েছে তাতে, আমাদের পক্ষে, এই মাত্র আমরা যা বলছিলাম তা ছাড়া আর কিছুই দেখবার প্রয়োজন নাই—(অর্থাৎ, আমাদের দেখতে হবে) যে,—এখান হইতে যারা আমাকে বাহির করে নিয়ে যাবে তাদের বাবত টাকা পয়সা খরচ করে এবং তাদিগকে ধন্যবাদ দিয়ে এবং নিজেরা এখান হইতে বাহির হ'য়ে গিয়ে কিংবা অন্যে যাতে (আমাকে) বাহির করে নিতে পারে তার সুবিধা করে দিয়ে—আমরা ভাল কাজ করব, না, সত্য সত্যই এসব করলে আমাদের অন্যায় করা হবে! যদি প্রতিপন্ন হয় যে এসব করলে অন্যায় করা হবে, তবে এখানে চুপ করে বসে থাকলে যদি মরতেও হয়—কিংবা অন্যায় করার পরিবর্ত্তে যদি অন্য কোন কষ্টও ভোগ করতে হয়,—তবুও সেটা গণনার মধ্যে আসা উচিত নয়।

ক্রি—কথাটা ত ঠিকই বলছ, সোক্রেটিস্, তবে, দেখ ত আমরা করব কি?

সো—হে আমার সুবন্ধু, চল সেটা আমরা একযোগে বিচার করে দেখি; আর, আমি যা বলব, যদি তার বিরুদ্ধে তোমার কিছু বলবার থাকে ত বলিও, তোমার কথা মেনে নিব; যদি বিরুদ্ধে কিছু বলবার না থাকে, তবে, হে ভাগ্যবান্, বার বার ঐ একই কথা আমার কাছে আওড়ান ছেড়ে দেও, যে, এথিনীয়েরা আমার যেতে দিতে না চাইলেও আমাকে এখান থেকে পালিয়ে যেতেই হবে। এইটী করতে যাতে তুমি আমার মতি লওয়াতে পার, তার জন্যে আমি খুব চেষ্টা করব, কিন্তু প্রবৃত্তিটি না হইলে কাজটী করতে পারব না।

এখন আমাদের বিচার্য্য বিষয়ে গোড়ার দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর দেখি;—ঠিক বলা হচ্ছে কিনা তাই দেখিও—এবং যা জিজ্ঞাসিত হবে তাতে যত ভাল করে পার উত্তর দিতে চেষ্টা করিও।

ক্রি—আচ্ছা করব।

সো—আমরা কি স্বীকার করি যে, ইচ্ছা পূর্ব্বক কোন প্রকারেই আমাদের অন্যায় করা উচিত নয়—না, এই বলব যে, কোন কোন স্থলে অন্যায় করা উচিত, আর কোন কোন স্থলে করা উচিত নয়? অথবা যা, পূর্ব্বে বহুবার আমরা স্বীকার করেছি এবং এই মাত্রও যা বলেছি, তাই বলব যে, অন্যায় করাটা কোন প্রকারেই সৎও নয়, সুন্দরও নয়? অথবা, এতদিন ধরে আমরা যা কিছু স্বীকার করে এসেছি সে সব এই কয়েক দিনের মধ্যেই ভেসে গিয়েছে কি? এবং, হে ক্রিটোন, এত কাল এই বৃদ্ধ আমরা যে পরস্পরের সঙ্গে এত তীব্র আলোচনা করলাম তাতে কি আমরা নিজেরাই বুঝতেও পারি নাই যে আমরা শিশুদের চেয়ে মোটেই পৃথক্ নই? কিংবা তখন আমাদের কাছে যা বলা হ'য়েছে, সে সমস্তই তেমনই আছে—সর্ব্বসাধারণে তা বলুক আর নাই বলুক; এবং উপস্থিত দুঃখের চেয়ে অধিকই হউক কিংবা অল্পই হউক—যাই ভুগতে হউক না কেন, অন্যায় যে করে, অন্যায় করাটা তার পক্ষে অনিষ্টজনক এবং নিন্দনীয়। এ আমরা স্বীকার করি, কি, না?

ক্রি—স্বীকার করি।

সো—কোন প্রকারেই অন্যায় করা উচিত নয়?

ক্রি—কোন প্রকারেই নয়।

সো—কোন প্রকারেই যখন অন্যায় করা উচিত নয়, তখন, সাধারণ লোকে যা মনে করে তা নয়—আমাদের প্রতি কেহ অন্যায় আচরণ করলেও উল্টাইয়া অন্যায় করা আমাদের উচিত নয়?

ক্রি—মনে ত হয় না।

সো—তবে কি, ক্রিটোন, কাহারও অনিষ্ট করা আমাদের উচিত, না, উচিত নয়?

ক্রি—কিছুতেই নয়, সোক্রেটিস।

সো—তা হলে কি? অন্যে যদি আমাদের অনিষ্ট করে, তবে তার বদলে তার অনিষ্ট করা—সাধারণ লোকে যা বলে থাকে—সেটা কি ন্যায়সঙ্গত, না ন্যায়সঙ্গত নয়?

ক্রি—কিছুতেই নয়।

সো—লোকের অনিষ্ট করা অবৈধ আচরণ হইতে কোনরূপেই পৃথক্ নয়।

ক্রি—ঠিক বলেছ।

সো—তা হলে অন্যের প্রতি অবৈধ আচরণ করাও উচিত নয়, তাহার অনিষ্ট করাও উচিত নয়—তাহার হাতে আমাদের নিজের যে কোন অনিষ্ট ঘটলেও না। ভেবে দেখ, ক্রিটোন, এ সমস্ত স্বীকার করতে গিয়ে তুমি তোমার গৃহীত মতের বিরুদ্ধে কিছু স্বীকার করছ না ত? কেন না, আমি জানি অল্প লোকের নিকটই এ সকল সত্য বলে প্রতীয়মান হয় এবং হবে। যারা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং যারা করে নাই, এ উভয়ের মধ্যে ঐকমত্য নাই, বরং তারা পরস্পরের মতটা যখন জানবে তখন একপক্ষ নিশ্চয়ই আর এক পক্ষকে ঘৃণার চক্ষে দেখবে। এখনও একবার তুমি ভাল করে ভেবে দেখ, এখনো তুমি আমার সঙ্গে একমত কি না এবং এটা তুমি স্বীকার কর কিনা এবং আমার এই মূল সিদ্ধান্ত হতে আমরা আমাদের বিচার আরম্ভ করব কি না—যে, আমাদের কখনও অন্যায় করা উচিত নয়, অন্যের অন্যায়ের বদলেও নয়—এবং অন্যের হাতে আমাদের অনিষ্ট ঘট্‌লেও প্রতিহিংসা-স্বরূপ তাহার অনিষ্ট করা উচিত নয়। না, এই মূল কথা তুমি অস্বীকার কর এবং এতে তুমি এক মত নও? আমার কাছে কিন্তু চিরকালই এবং এখনও ইহা সত্যবলে প্রতীয়মান হয়; তুমি যদি অন্যথা মনে করে থাক, তবে বল এবং (আমাকে) শিখাও। আর যদি তুমি (এখনও) পূর্ব্বের সিদ্ধান্তেই স্থির থেকে থাক, তবে এর পরের কথাটী শোন।

ক্রি—আমি স্থিরই আছি এবং তোমার মতও আমার সঙ্গে মিল্‌ছে; এখন বলে যাও।

সো—তার পরের কথাটী বল্‌ছি—সেটা বরং একটা প্রশ্নের আকারেই বলছি। একজন যা ন্যায্য বলে স্বীকার করে, সেটা কি তার কাজে দেখান উচিত, না, ফাঁকি দেওয়া উচিত?

ক্রি—কাজে দেখান উচিত।

সো—এসব থেকেই এখন একটু ভাল করে বিচার করে দেখ দেখি—দেশকে (১০) রাজী না করিয়ে যদি আমরা এখান হ'তে পলাই,—তবে তাতে কি কাহারও অনিষ্ট করা হবে—সকলের চেয়ে যাদের অনিষ্ট না করা উচিত তাদেরই কি অনিষ্ট করা হবে—না, হবে না? আর, যে সব কথা ন্যায্য বলে আমরা স্বীকার করে এসেছি সেগুলি কি আমাদের রক্ষা করা হবে, না, হবে না?

ক্রি—তুমি যা জিজ্ঞাসা করছ, সোক্রেটিস্, তার উত্তরে আমার কিছু বলবার নাই;—কেন না, আমি জানি না।

(১০) মূল (Polis) দেশ বা রাষ্ট্র এবং নগর। গ্রীক্‌দের নগরই ছিল রাষ্ট্র।

সো—তবে বিষয়টাকে এই ভাবে দেখ। আমি যেন এখান থেকে পলাইয়া যাচ্ছি—অথবা এর তুমি যাই নাম দেও না কেন—আর তখন যদি রাষ্ট্রের আইনগুলি এবং রাষ্ট্র (১১) জান্‌তে পেরে আমায় এসে জিজ্ঞাসা করে—"আমায় বল ত, সোক্রেটিস্‌, তোমার মনে কি করবার মতলব রয়েছে? তুমি জান, যা তুমি করতে যাচ্ছ তাতে আমাদের অর্থাৎ আইন সকলের—এবং তোমার একা দ্বারা যতটুকু সম্ভব, (ততটুকু) সমস্ত রাষ্ট্রের ধ্বংস ঘটবে—এ ছাড়া আর কি? অথবা তোমার কি মনে হয়, যে রাষ্ট্রে আইনের স্থিরীকৃত সিদ্ধান্তগুলির কোন ক্ষমতা নাই, বরং ব্যক্তিসকলের (১২) কার্য্যে সেগুলি শক্তিহীন এবং বিনষ্ট হয়ে যায়, সে রাষ্ট্র বিধ্বস্ত না হয়ে টিকে থাক্‌তে পারে?" ক্রিটোন্‌, এই কথার এবং ইত্যাকার কথার উত্তরে আমরা কি বলব? আইনের মীমাংসিত সিদ্ধান্তগুলির শক্তিমত্তা যে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, আইনটী ভগ্ন হবার পথে গেলে তার পক্ষে তার অনেক বলবার আছে—বিশেষতঃ যে সুবক্তা (১৩) তার। সে সকলের উত্তরে কি আমরা বলব—"রাষ্ট্র আমাদের প্রতি অবিচার করেছে—এবং বিচারে ঠিকমত রায় দেয় নি?" এই,—না, কি বল্‌ব?

ক্রি—ধর্ম্মের নামে—এই ত বলব, সোক্রেটিস্‌।

সো—আর আইনগুলি যদি বলে, "সোক্রেটিস্‌, আমাদের সঙ্গে তোমার কি এটা একরার হয় নি যে, রাষ্ট্র বিচার করে যা যা রায় দিবে, সে সকলই তুমি মেনে নিবে?"—তা হ'লে? তাদের একথা শুনে যদি আমি বিস্ময় প্রকাশ করি, তা হ'লে—হয় ত তারা আবার বল্‌বে সোক্রেটিস্‌, যা বল্‌ছি তাতে বিস্মিত হয়ো না, কিন্তু উত্তর দাও; কেন না, প্রশ্ন করে এবং উত্তর দিয়ে আনন্দ পেতে তুমি অভ্যস্ত। বল দেখি, কি অভিযোগে অভিযুক্ত করে তুমি আমাদিগকে এবং রাষ্ট্রকে বিনষ্ট করতে উদ্যত হ'য়েছ? আমরা কি প্রথমে তোমাকে জন্ম দেই নি? আমাদিগের আশ্রয়েই কি তোমার পিতা তোমার মাতাকে গ্রহণ করেন নি এবং তোমায় জন্ম দেন নি? আমাদের (আইন সকলের) মধ্যে যেগুলি বিবাহবিষয়ক সে গুলিতে কোন দোষ দেখ্‌তে পাচ্ছ কি, যাতে সেগুলি ভাল নয় এরূপ বলা চলে?" আমাকে অবশ্যই বল্‌তে হবে, "না, কোন দোষ দেখ্‌তে পাই না।" "তবে জন্মের পরে শিশুর লালনপালন এবং শিক্ষার নিয়ামক যে সকল বিধি—যাতে তুমি লালিত এবং শিক্ষিত হয়েছ,—সে গুলির বেলায়? আমাদের মধ্যে যারা তোমার পিতাকে, তোমাকে সঙ্গীতে এবং ব্যায়াম ক্রীড়ায় (১৪) শিক্ষিত করতে অনুজ্ঞা করেছিল, তারা কি ভাল করে নাই?" আমি অবশ্যই বলব, "ভালই"। "বেশ; যখন তুমি আমাদের হাতেই জন্ম নিয়েছ, লালিত হয়েছ এবং শিক্ষিত হয়েছ, তখন প্রথমতঃ তোমাকে বল্‌তে হবে, তুমি নিজে এবং তোমার পূর্ব্বপুরুষেরা আমাদেরই আত্মজ এবং দাস বট কি না? এ যদি তাই হয়, তাহলেও ন্যায্যতা জিনিসটী আমাদের বেলায় এবং তোমার বেলায় একই সমান মনে করছ? এবং আমরা তোমার প্রতি যা করতে চাই, তোমার পক্ষেও তা উল্টাইয়া করা সঙ্গত

(১১) মূল—To koinon tes poleos = commune of the state (or city) = commonwealth. Jowett লিখিয়াছেন, Government.

(১২) মূল—idiotes = private individuals.

(১৩) মূল—Rhetor = orator, বা বাগ্মী।

(১৪) মূল mousike kai gymnastike = Music এবং gymnastic.

মনে করছ? তোমার পিতার প্রতি কিংবা—যদি তোমার কোন প্রভু থাকেন, তবে তাঁর প্রতি—একই প্রকার প্রত্যাচরণ করা সঙ্গত নয়—যেমন, তাঁদের হাতে তুমি যা ভোগ কর, উল্টাইয়া আবার তাই তুমি করতে পার না—মন্দ কথা শুনলে উল্টাইয়া আবার মন্দ কথা বলতে পার না—প্রহৃত হয়ে উল্টাইয়া আবার প্রহার করতে পার না—এই প্রকার অন্যান্য বিষয়েও। দেশের বেলায় এবং দেশের আইনগুলির বেলায় কি তবে—যদিই আমরা তোমাকে নিহত করা সঙ্গত মনে করি—তবে, তুমিও কি পরিবর্ত্তে তোমার যথাসাধ্য আমাদিগকে—তোমার দেশ এবং দেশের আইন সকলকে বিনাশ করতে উদ্যত হবে—এবং ধর্ম্মের যথার্থ উপাসক হয়েও এসব কাজ করে ন্যায্য কাজ করছ বলে ভাণ করবে? অথবা তুমি কি এমনই পণ্ডিত যে ভুলে যাচ্ছ, যে দেশ, মাতার চেয়ে, এবং পিতার চেয়ে এবং অন্যান্য সমস্ত পূর্ব্বপুরুষদের চেয়েও অধিক পূজ্য, অধিক উচ্চ এবং অধিক পবিত্র, এবং দেবতাদের চক্ষে এবং বুদ্ধিমান্ মানুষদের চক্ষে অধিকতর মান্য;—এবং পিতার চেয়েও অধিক দেশকে সেবা করতে হয়, এবং ক্রুদ্ধ হইলে তাহার নিকট নত হইতে হয় এবং তাহাকে শান্ত করতে হয়, এবং হয় তাহার ইচ্ছা নিজের অনুকূল করে নেওয়া উচিত, না হয়, সে যাহা আদেশ করে তাহা পালন করা উচিত;—এবং প্রহৃত হয়ে কিংবা কারারুদ্ধ হয়ে শাস্তি ভোগ করতে যদি সে আদেশ করে, তবে তাহাও বিনা বাক্যব্যয়ে ভোগ করা উচিত;—এবং যদি সে যুদ্ধে আহত কিংবা নিহত হইতে প্রেরণ করে, তবে তাহাও কর্ত্তব্য,—এবং ইহাই ধর্ম্ম;—হার মানা, হটে যাওয়া—কিংবা স্থান পরিত্যাগ করা উচিত নহে;—বরং, যুদ্ধেই হউক কিংবা বিচারালয়েই হউক কিংবা অন্যত্র সর্ব্বত্রই রাষ্ট্র এবং দেশ যাহা আদেশ করে তাহা পালন করা উচিত, অথবা যাহা স্বভাবতঃ ন্যায্য তাহা তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত; যিনি পূজ্য তাঁহার প্রতি বল প্রয়োগ কখনও উচিত নহে—মাতার প্রতিও নহে, পিতার প্রতিও নহে, এবং এ উভয়ের চেয়ে দেশের প্রতি আরও নহে।"

ক্রিটোন, এ সকল কথার উত্তরে আমি কি বলব? আইনগুলি যা বলছে তা কি সত্য, না সত্য নহে?

ক্রি—সত্যই-ত মনে হয়।

সো—আইনগুলি হয়-ত আবার বলবে, "আরও ভেবে দেখ, সোক্রেটিস্, আমরা যে বলছি যে, তুমি এক্ষণে যা করতে উদ্যত হয়েছ সেটা আমাদের প্রতি সুবিচার করা হচ্ছে না, তা সত্য বলছি কি না। আমরা তোমাকে জন্ম দিয়ে, লালিত করে, শিক্ষিত করে এবং আমরা যা কিছু ভাল দান করতে সমর্থ সে সমস্তের অংশ তোমাকে এবং রাষ্ট্রের অন্যান্য সমস্ত ব্যক্তিকে (১৫) দান করে, পরেও ঘোষণা করে থাকি যে,—যখন কেহ রাষ্ট্রের ব্যাপারসমূহ এবং আমাদিগকে আইন সকলকে বুঝেছে এবং দেখেছে, তখন যদি কাহারও নিকট আমরা সুখের কারণ না হই, তবে এথেন্সবাসীদের যে কেহ তাহার আপন ধন সম্পত্তি লইয়া যথায় ইচ্ছা বহির্গত হইয়া যাইতে পারে—এবং এরূপ ইচ্ছা করিলে সে তাহার অধিকার অনুসারেই কাজ করবে। এবং যদি তোমাদের কেহ বাহিরের উপনিবেশে চলে যেতে চায়—কিংবা আমরা আইন সকল এবং রাষ্ট্র তাহার মনোমত নই বলে, যদি অন্যত্র কুত্রাপি গিয়ে বাসস্থাপন করতে চায়,—তবে, যেখানে তাহার মন যায় সেখানে, তাহার নিজস্ব জিনিস পত্র নিয়ে, চলে যেতে আমাদের কেহ

(১৫) মূল Polites=citizen.

তাহাকে নিষেধ করে না—এবং আমাদের কেহ তাহার পথের কণ্টক হয় না। কিন্তু আমরা কি প্রকারে বিচার্য্য বিষয় বিচার করে থাকি এবং কি প্রকারে অন্যবিধ উপায়ে রাষ্ট্র পর্য্যবেক্ষণ করে থাকি, তা দেখেও তোমাদের মধ্যে যে আমাদের সঙ্গে থেকে যায়, সে—এটা আমরা বলবই যে, সে—কার্য্যতঃ আমাদের সঙ্গে চুক্তিতে বদ্ধ হয় যে, যা আমরা আদেশ করব তা সে করবে; এবং যে তা না করে, তাকে বলব, সে তিন প্রকারে অন্যায় আচরণ করে;—কারণ, জন্মদাতা আমাদের সে বশ্যতা স্বীকার করে না, পালনকর্ত্তা এবং শিক্ষাদাতা আমাদের প্রতিও তদ্রূপ ব্যবহার করে এবং সর্ব্বোপরি আমাদের আদেশ পালন কর্ত্তে আমাদের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েও, তাহা করে না এবং আমরা যদি অসঙ্গত কিছু করে থাকি (তবে সেটা) আমাদিগকে বুঝাইয়াও দেয় না;—অথচ আমরা যা করতে আদেশ করে থাকি তা স্পষ্ট বুঝাইয়া দেই, রুক্ষভাবে নির্দ্দেশ করি না;—এবং (যদিও আমরা) দুইটীর একটী করতে বলি—হয় আমাদের মত পরিবর্ত্তন করাতে, না হয় আমাদের আদেশ পালন করতে—(তথাপি) তার একটীও সে করে না। আর তুমি যা মনে করেছ, সোক্রেটিস্, তা যদি কর, তা হ'লে, বলে রাখছি, তুমিও এথেন্স-বাসীদের মধ্যে সকলের চেয়ে কম নয়, বরং সকলের চেয়ে বেশী—এই সকল অভিযোগে অভিযোগ্য হবে।" আমি যদি বা বলি, 'কিসের জন্য?' তা হলে হয় ত তারা সত্য সত্যই আমায় এই বলে চেপে ধরবে যে, আমিই এথেন্সবাসীদের মধ্যে সকলের চেয়ে বেশী এই একরারনামা স্বীকার করে এসেছি। হয় ত তারা বলবে, "সোক্রেটিস্, এসব বিষয়ে আমাদের প্রকৃষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে, আমরা এবং রাষ্ট্র তোমার মনোরঞ্জন করে এসেছি; আর, তুমি ত এই নগরে (১৬) অন্য সকল এথেন্সবাসীদের চেয়ে স্থায়ী-ভাবে বাস করতে না—যদি সেটা বিশেষভাবে তোমার রুচিজনক না হত—এবং খেলা (১৭) দেখবার জন্যেও কখনও তুমি বাহিরে যাও নি—কেবল একবার যোজকে (১৮) যাওয়া ছাড়া—এবং অন্য কুত্রাপিও কখনও যাওনি, অবশ্যই কোথাও যুদ্ধার্থে প্রেরিত না হ'লে—এবং বাইরে কোথাও কখনও গিয়ে তুমি থাকনি—এবং অন্য নগরের এবং অন্যান্য আইনের বিষয় জানবার ইচ্ছাও তোমাকে কখনও পেয়ে বসেনি—এবং আমরা এবং আমাদের এই নগরটীই, তোমার পক্ষে যথেষ্ট হয়েছি। এতই অধিক তুমি আমা-দিগকে ভালবেসেছ এবং আমাদের সঙ্গে (নাগরিক রূপে) বাস করতে এমনই অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছ যে, বিশেষ করে এই নগরেই তোমার ছেলেদের তুমি জন্ম দিয়েছ—এই নগরটী এতই তোমার কাছে প্রিয়। অধিকন্তু, এই মোকদ্দমার বিচারের সময়, যদি তুমি ইচ্ছা করতে তবে নির্ব্বাসন দণ্ড চেয়ে নেওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব ছিল—এবং যা এখন তুমি রাষ্ট্রের অনভিপ্রায়ে করতে চাচ্ছ, তাই তখন (রাষ্ট্রের) অভিপ্রায় মতে করতে পারতে। তখন তুমি দম্ভ দেখালে যেন, তোমাকে মরতে হলেও তুমি গ্রাহ্যই কর না,—এবং তুমিই বলেছিলে—নির্ব্বাসনের বদলে মৃত্যুই তুমি পছন্দ কর। এখন তুমি সে সকল উক্তিতে লজ্জিতও হচ্ছ না—এবং বিনাশ করতে উদ্যত হয়ে আর আমাদের প্রতিও শ্রদ্ধা দেখাচ্ছ না;—বরং যে

(১৬) = রাষ্ট্র।

(১৭) গ্রীসের প্রসিদ্ধ জাতীয় খেলা সকল।

(১৮) [illegible] of Corinth (কোরিন্থ যোজক)।

সকল শপথ এবং অঙ্গীকার দ্বারা আমাদের সঙ্গে একত্র বাস্তব্য করতে অভ্যস্ত ছিলে, সেই সকল অতিক্রম করে পলাইয়া যাইতে উদ্যত হয়ে,—একটা জঘন্য ক্রীতদাস হয়ত যা করত তাই তুমি এখন করতে যাচ্ছ।

প্রথম তাবৎ আমাদের এই কথার জবাব দেও দেখি—আমরা যে বলছি যে তুমি কার্য্যতঃ, শুধু কথায় নয়—আমাদের (মত) অনুসারে (নাগরিক) জীবন যাপন করতে রাজী হ'য়েছিলে—সেটা সত্য বলছি কি না?" এর উত্তরে ক্রিটোন, আমরা কি বলব? সায় দেওয়া ছাড়া আর কি?

ক্রি—কাজেই, সোক্রেটিস্।

সো—আবার কি তারা বলবে না—"আমাদের সঙ্গে কৃত যে শপথ এবং যে অঙ্গীকার তুমি অতিক্রম করছ—(সে সকল) তুমি বাধ্য হয়ে কর নি, প্রতারিত হয়েও না—কিংবা অতি অল্প সময়ের মধ্যে পরামর্শ শেষ করতে বাধ্য হ'য়েও না—পরন্তু সত্তর বৎসর জুড়ে দেখে শুনে; যার মধ্যে,—যদিই আমরা তোমার পসন্দ মত না হয়ে ছিলাম কিংবা যদিই সে সকল অঙ্গীকার তোমার নিকট ন্যায়সঙ্গত প্রতীয়মান না হ'য়েছিল—তা হ'লে, তোমার পক্ষে অন্যত্র চলে যাওয়া সম্ভব ছিল। তুমি কিন্তু লেকিডাইমন্ (১৯) কিংবা ক্রিট্ দেশ—যাদিগকে সর্ব্বদাই তুমি সুশাসিত বলে এসেছ—(তা দিগকেও) পসন্দ কর নি—অথবা গ্রীক্ রাজ্য সমূহের কিংবা বর্ব্বর (২০) রাষ্ট্র সমূহের অন্য কোনটীও না—পরন্তু খঞ্জ কিংবা অন্ধ কিংবা অন্য প্রকার পঙ্গুদের চেয়েও এ সহর থেকে তুমি কম বাইরে গিয়াছ; স্পষ্টই প্রমাণিত হচ্ছে, অন্য সকল এথেন্সবাসীদের চেয়ে বিশিষ্টরূপে তোমার নিকট এই রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের আইন আমরা কৃত প্রিয় ছিলাম! আইন ছাড়া রাষ্ট্র কার নিকট লোভনীয় হবে? আর এখন তোমার অঙ্গীকার রক্ষা করছ না? আমাদের কথা যদি শোন, সোক্রেটিস্, এ নগর থেকে পলাইয়া গিয়া আর হাস্যাস্পদ হইও না।

একবার ভাব দেখি, এই সকল অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এবং পাপাচরণ করে এ সকলের ফলে—তোমার নিজের এবং তোমার বন্ধুদের কি উপকার তুমি করবে। তোমার এই বন্ধুরা যে নির্ব্বাসিত এবং রাষ্ট্র হতে বঞ্চিত হয়ে কিংবা সম্পত্তি হারাইয়া বিপন্ন হ'তে পারে,—সেটা একরূপ নিশ্চিত; আর তুমি নিজে—প্রথমতঃ যদি তুমি নিকটস্থ কোন নগরে যাও—থিবিসে কিংবা মিগারাতে—এবং এই দুইটী সহরই সুশাসিত—তবে সেখানে, সোক্রেটিস্, তুমি তাদের রাষ্ট্রের শত্রুভাবে যাইবে—এবং যারা সেই সব রাষ্ট্রের জন্য চিন্তা করে তারা তোমাকে, আইন ভঙ্গকারী মনে করিয়া, সন্দেহের চক্ষে দেখ্‌বে—এবং বিচারকদের মনে তুমি এই মতটা বদ্ধমূল করে দিবে, যাতে তারা মনে করবে যে তারা মোকদ্দমার ঠিক রায়ই দিয়াছে। আইন যে ভাঙ্‌তে পারে—এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে, সে যুবক এবং নির্ব্বোধ লোকদিগকেও বিধ্বস্ত করতে পারে। তবে কি তুমি সুশাসিত নগর এবং মানুষের মধ্যে সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগ হইতে দূরে পলাইবে? আর তাই করে বেঁচে থাকা কি তোমার পক্ষে শোভন হবে? অথবা তুমি কি ইহাদের নিকটেই থাক্‌বে এবং নির্লজ্জের মত এদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলবে—কিন্তু কি কথা বল্‌বে, সোক্রেটিস্? এই খানে যা বলতে—যে, ধর্ম্ম এবং ন্যায়, আচার এবং আইন, মানুষের নিকট সকলের চেয়ে বেশী আদরণীয়—(তাই কি)? আর, তুমি কি মনে কর না, সোক্রেটিসের এই ব্যাপারটা জঘন্য দেখাইবে? মনে কিন্তু করা উচিত। অথবা হয়ত তুমি এই সব জায়গা

(১৯) স্পার্টার আর এক নাম।

(২০) মূল Barbarike=barbaric

ছেড়ে থেসালীতে ক্রিটোনের বন্ধুদের কাছে যাইবে; সেখানে কিন্তু যথেষ্ট বিশৃঙ্খলা এবং দুর্নীতি রহিয়াছে। এবং হয়ত লোকে শুনে আমোদ করবে, কেমন হাস্যাস্পদরূপে তুমি জেল খানা হতে পলাইয়া গেছ—হয়ত কোন ছদ্মবেশ ধরে—হয়ত চাষাদের চামড়ার পোষাক কিংবা পলাতকেরা অন্য যে সব ছদ্ম বেশ পরে থাকে, তারই একটা—ধরে, তোমার নিজের আকৃতি গোপন করে। বৃদ্ধ লোক—স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে, জীবনের আর অল্প সময় অবশিষ্ট রয়েছে—(এই অবস্থায়ও) তুমি বাঁচবার জন্যে উৎকট লালসা করতে সাহস করেছ—এবং প্রবীণ বিধান সকল লঙ্ঘন করেছ—এমন কি কেহ নাই, যে এই কথা বল্‌বে? কাহারও মনে যদি আঘাত না কর, তাহ'লে হয়ত নাই; কিন্তু তা যদি না হয়, তবে, সোক্রেটিস্, নিজের সম্বন্ধে অনেক অপ্রিয় কথা শুনবে। বেঁচে থাক্‌বে বটে, কিন্তু সকলের অনুগত হয়ে এবং সকলের দাসত্ব করে; থেসালীতে আচ্ছা রকম খানা খিনা করা ছাড়া আর করবে কি—কেননা থেসালীতে ত তুমি ভোগের জন্যই গমন করবে? ন্যায় এবং অন্যান্য ধর্ম্মের সম্বন্ধে সেই সকল উপদেশাবলীর তবে আমাদের কি হবে?

অথবা, সন্তানদের জন্য কি বাঁচতে চাচ্ছ?—যাতে তাদিগকে তুমি লালন করতে এবং শিক্ষা দিতে পার? তবে কি, তাদিগকে থেসালীতে নিয়ে গিয়ে—বিদেশী বানিয়ে—পালন করবে এবং লেখাপড়া শিখাবে—এবং তোমা হতে তাদের এই কি লাভ হবে? আর তা যদি না হয়, এখানে লালিত হলেও, তুমি বেঁচে থাক্‌লে—তুমি তাদের কাছে না থাক্‌লেও—কি তারা ভালরূপে লালিত এবং শিক্ষিত হবে? তোমার সেই বন্ধুরা তাদের দেখা শোনা করবে? তবে কি তুমি থেসালীতে চলে গেলেই তারা তোমার ছেলেদের তত্ত্বাবধান কর্‌বে—পরলোকে (২১) চলে গেলে আর তা করবে না? কিন্তু যারা তোমার বন্ধু বলে পরিচয় দেয়, তারা যদি কোন কাজের হয়, তাহ'লে করবে—এটা তোমার মনে করা উচিত।

তা নয়, সোক্রেটিস্, আমরা যারা তোমাকে পালন করেছি, আমাদের কথা শোন—ছেলেদিগকে বড় মনে করো না, বেঁচে থাকাটাকেও নয়, কিংবা, আর কিছুকেই ধর্ম্মের চেয়ে বড় মনে করো না;—তা হ'লে পরত্র গিয়ে সেখানে যাঁরা প্রভু তাঁদের কাছে—এখানে যা যা করেছ সে সকলের ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করতে পারবে। আর এ (ক্রিটোন যা বল্‌ছে তা) যদি কর, তা হলে সেটা এখানে অধিক ভাল, ন্যায্যতর, পবিত্রতর হবে না—তোমার পক্ষেও না কিংবা তোমার কোন আত্মীয়ের পক্ষেও না—এখানেও না কিংবা অন্যত্র গমন করিলেও না। এখন যদি তুমি পরত্র গমন কর, তবে,—আমরা আইন সকলের দ্বারা নয়—মানুষের দ্বারা অত্যাচারিত হ'য়ে গমন করবে; আর যদি এমনই জুগুপ্সিত ভাবে—অবিচারের বদলে অবিচার করে এবং অনিষ্টের বদলে অনিষ্ট করে—আমাদের সহিত তোমার সমস্ত চুক্তি এবং অঙ্গীকার অতিক্রম করে—এবং যাদের অনিষ্ট সকলের চেয়ে কম করা উচিত, তাদেরই অনিষ্ট করে—তোমার নিজের, তোমার বন্ধুদের, তোমার দেশের এবং আমাদের (অনিষ্ট করে)—যদি তুমি পলাইয়া যাও, তবে, যতদিন বেঁচে থাকবে, আমরা তোমার উপর ক্রুদ্ধ হয়ে থাকবো—এবং সেখানেও আমাদের ভাইয়েরা পরলোকের আইনেরা, তুমি যথাসাধ্য আমাদিগকে বিনাশ করতে চেষ্টা করেছ জেনে, তোমাকে আদরের সহিত গ্রহণ করবে না। সুতরাং ক্রিটোন যা বলছে তা করতে যেন তোমাকে মত লওয়াতে না পারে—কিন্তু আমরা যেন (তোমার মত লওয়াতে) পারি।"

প্রিয় বন্ধু ক্রিটোন, সত্য জেনো, কুবেলী (২২) দেবীর উপাসকেরা যেমন বাঁশীর স্বর শুনে, আমিও যেন তেমনই এই সব কথা শুন্‌ছি—এবং এই নিঃস্বনই যেন আমার ভিতরে গুঞ্জিত হচ্ছে এবং আমাকে আর কিছু শুনতে অসমর্থ করে তুল্‌ছে। আর জেনো, যা এখন আমার প্রতীতি হচ্ছে তার বিরুদ্ধে যদি কিছু বল্‌তে চাও, তবে বৃথাই বল্‌বে। তথাপি যদি মনে কর, এর চেয়ে বড় কিছু দেখাতে পার, তবে বলে যাও।

ক্রি—কিন্তু, সোক্রেটিস্, আমার যে কিছু বলবার নাই।

সো—যাক্ তবে, ক্রিটোন্; আমরা তবে এইরূপই করব, কেননা, ভগবান্ এই পথেই প্রেরণ করছেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

(২১) বুল—Haedes.

(২২) Cybele.

অবরোধ।

(Erckmann Chatrian লিখিত—
Le Blocus নামক আখ্যায়িকার বঙ্গানুবাদ)

ষষ্ঠ অধ্যায়।

দেখ ফ্রিজ এবার তোমাকে আর একটা ঘটনার কথা বল্‌বো। এই থেকে আমার অনেক বারই মনে হয়েছে যে ভগবান্ আমাদের খুটি নাটি ব্যাপার নিয়ে নাড়া চাড়া দেন আমাদের ভালর জন্যই বল্‌তে হবে। প্রথম প্রথমটা দেখে বড় ভয় হত বটে ভগবানকে ডেকে সকলেই দয়াল ঠাকুর আমাদের রক্ষা কর বলে চীৎকার করে কিন্তু পরে দেখে সবই ভালয় ভালয় কেটে গেল।

তুমি ত জানই মেয়ার আপিসের কেরাণী ফ্রিমার আমার হিংসা কর্‌তো। ফ্রিমারের চেহারার বর্ণনাটা তোমার কাছে করা হয় নি—বেঁটে হাড্‌ডি সার বুড়ো গায়ের রং হল্‌দেপানা মাথায় লাল পরচুলো কান ছুটো খোঁচা গাল তোবড়ানি। কিসে যে আমার ক্ষতি কর্‌বে সে তাই খুঁজে বেড়াত।

বল্‌তে কি, মন মত সুযোগ পেতেও তার বড় দেরী হল নি, এদিকে সহর ঘেরাও করবার দিন যত ঘুনিয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল, লোকেরাও বিক্রী সিক্রী করে ফেল্‌বে বলে তত ব্যস্ত হয়ে পড়্‌তে লাগ্‌লো। আমি যেদিন জার্কিন থেকে সুখবর পেলাম আমার মনে আছে তার পর দিন বৃহস্পতিবার—হাটবার। আল্‌সাস্‌ ফোরেস থেকে এত লোক সব ধামা ঝুড়ি আর বোঁচকা বুঁচকি করে চাটকা মাখন, পনির ডিম আর হাঁস মুরগী এনেছিল যে, তাতেই বাজার ভর্ত্তি হয়ে গিয়েছিল আর মোটেই ঠাঁই ছিল না; সকলেরই মৎলব টাকা গাঁথিয়ে হয় পাতাল ঘরের ভিতর না হয় কাছের কোনও বন জঙ্গলে ঢুকিয়ে রাখে। তুমি বোধ হয় শুনে থাক্‌তে পার যে সে সময় অনেক টাকা 'ন দেবায় ন ধর্ম্মায়' নষ্ট হয়েছিল অনেক টাকা শুধু শুধু খোয়া গিয়েছিল। এই যে সব লোকে কত ওক গাছের গোড়ায় বছর বছর টাকা কড়ি পায়, সে সব কেবল রুষ জার্ম্মানদের ভয়েই তখন গেরস্তরা পুঁতে রেখেছিল। ভেবেছিল আমরা তাদের দেশে গিয়ে যেমন করেছিলাম এরাও আমাদের দেশে এসে তেমনি লুট তরাজ আরম্ভ করবে। পুঁতে রেখেছিল যারা তারা হয়তো মরে গিয়েছে না হয় ঠিক জায়গাটা খুঁজে বার কর্ত্তে পারেনি। এই সব কারণে কত ধন দৌলত যে মাটির নীচে রয়ে গেছে তার ঠিক নাই।

তা যাক সেদিন—তারিখটা আমার মনে আছে ১১ই ডিসেম্বর—কি বিদঘুটে রকম ঠাণ্ডাই না পড়েছিল। মনে হচ্ছিল হাড় গুলোর মজ্জার ভিতরে ভিতরে শীত ঢুকছে। আমি কাঁপতে কাঁপতে খুব সকালেই উঠেছিলাম। গায়ে বেশ করে বোতাম দিয়ে আঁটা পশমের একটা খাট কুর্ত্তা মাথায় উদ্‌বিড়ালের চামড়ার একটা ঘাড় পর্য্যন্ত ঢাকা টুপি। ছোট বড় দুই চক্‌বাজারে লোক ধরবার আর জায়গা ছিল না সকলেই দরদাম নিয়ে হাঁকা হাকি করছিল দোকানটা কোনও রকমে খুলে বড় কাঁটাটা টাঙ্গাতে যা একটু সময় লেগেছিল তার পর খালি খদ্দেরের ভিড়। যত সব চাষার দল এসে দুয়ার ঘিরে দাঁড়াল, কেউবা চায় পেরেক কাঁটা কেউবা চায় কাঁচা লোহা। কেউ কেউ আবার দেখি সব পুরাণ লোহা সঙ্গে করে এনেছে—মৎলব যদি কোনওরকমে সে গুলো বিক্রী করে যেতে পারে। সকলেই টের পেয়েছিল যে, যদি শত্রুরা এসে পড়ে তা হলে এখন আর কেউ সহরে ঢুকতে পারবে না, সেই জন্য সকলেই কেনা বেচা করবার জন্য এত ভিড় করে এসেছিল।

আমি দোকান খুলে মাল ওজন কর্ত্তে লেগে গেলাম। বাহিরে সব রোঁদ দিতে বেরিয়েছে সেখান থেকেই তাদের হাঁক ডাক শোনা যাচ্ছিল। ঘাঁটি ঘাঁটিতে সব সৈন্য পাহারার ব্যবস্থা হয়েছে। গড়ের উপর তোলা সাঁকো রীতিমত মেরামত করা হয়েছে। বাহিরের চৌকে

দরওয়াজায় রীতিমত সব লোহা বসান হয়েছে। তখন পর্য্যন্ত সহর থেকে যাতায়াত বন্ধ হয় নাই বটে কিন্তু সকলেরই প্রায় সাসমির অবস্থা। মেরাস সার ব্রুক আর ত্রাসবুর্গ থেকে শেষাশেষি খবর পাওয়া গিয়েছে যে, শত্রু সেনারা র্‌্যাঁ (Rhin) নদীর আর পারে ও এসে পৌঁছেছে।

দেখ আমার অনেকবার মনে হয়েছে, যে ভগবান জগতের ছোটখাট ঘটনাগুলোর উপরও একটু আধটু নজর রাখেন, আর আমাদের মঙ্গলের জন্যই আমাদের জীবনের গতি ইচ্ছামত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেন। প্রথম প্রথম এতে বড়ই দাগা লাগে, মনে হয় কি ভয়ঙ্কর এ পরীক্ষা—প্রাণের আবেগে আপনিই বল্‌তে হয়—"হে দয়াময়, হে জগতের নাথ, একবার মুখ তুলে চাও!" কিন্তু বিপদ উৎরে গেলে দেখা যায় যা হয়েছিল তা ভাল'র জন্যেই; তুমি তো জান্‌তে মেয়ার আপিসের হেড কেরাণী ক্রিসারের আমার উপর অনেক দিন থেকেই রাগ ছিল। তোমার মনে আছে বোধ হয় তাকে—বেঁটে পড়া বুড়ো—"শুক্‌নো ষষ্ঠী"—চ্যাপ্ট্যা কান—তোব্‌ড়া গাল—শুকিয়ে রংটাও যেন হলুদে মেরে গিয়েছিল। এই ত চেহারা তার উপর মাথায় আবার লাল পর্‌চুলো পড়া হতো। পাজীটা কিসে আমার অনিষ্ট হবে কেবল তাই খুজে বেড়াত। তা ভাগ্যক্রমে তার বেশ সুবিধাও একটা জুটে গেল।

যতই সহর অবরোধের দিন ঘনিয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল ততই লোকে আপন আপন জিনিস বেচার জন্যে ব্যস্ত হয়ে বেড়াতে লাগ্‌লো। যে দিন আমি মার্কিণ থেকে ছেলে ছুটির সুখবর পেলাম তারই ঠিক পরের দিন সে দিন বৃহস্পতিবার—হাটবার—এত সব আলসেস্ লোরেনের লোক প্রকাণ্ড ২ ঝুড়ি চাঙ্গাড়ি বোঝাই করে আণ্ডা, মাখন, পনির, হাঁস, মুরগী সব এনে ফেল্‌লে যে হাটের ভিতর লোকে ঘুরে ফিরে বেড়াবে, এমন জায়গা টুকুও আর ছিল না।

সকলেরই মৎলব কিছু নগদ রেস্ত জোগাড় করে মাটির নীচে পাতাল ঘরে কি কাছের বনে বাদাড়ে—কোনও গাছের তলায় পুঁতে রাখে। সে সময় কত লোকের যে কত লুকোন টাকা কড়ি গিয়েছে তা আর বল্‌বার নয় এই সব টাকাই ভাগ্যবান লোকে এত দিন কেউ বা 'ওক' গাছটার তলায়, কেউ বা বীচ গাছের তলায় এম্‌নি করেই বছরের পর বছর পেয়ে আস্‌ছে। জর্ম্মাণ আর রুসিয়ানগুলোর ভয়েই যে লোকে এই সব গুপ্ত ধন রেখে দিয়েছিল তা অবিশ্যি আর তোমায় বুঝিয়ে বল্‌তে হবে না। সকলেই জান্‌তো আপদ গুলো এসেই লুট পাট আরম্ভ কর্‌বে। আমরা যেমন তাদের দেশে গিয়ে করেছিলাম তারাও তেমনি তার শোধ না তুলে ছাড়্‌বে না। কিন্তু লুকিয়ে রাখ্‌লে কি হয়, টাকা কড়ি পুঁতে ফেলে কতক লোক গেল মরে—কতক আবার কোথায় যে কি রেখেছিল তা নিজেরাই খুজেই বার কর্ত্তে পার্‌লে না। এম্‌নি করে লুকান ধন মাটির মধ্যেই থেকে গেল। যাক্ সে কথা।

তার পর সে দিন সেই ১১ই ডিসেম্বরের তারিখে এত ঠাণ্ডা পড়লো সে আর বল্‌বার নয় মনে হতে লাগ্‌লো যেন হাড়ের ভেতর মজ্জায় মজ্জায় হিম ঢুক্‌ছে আমি তো খুব সকাল সকাল উঠে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে একটা পশমী কামিজ গায়ে দিয়ে মাথায় একটা ঘাড় পর্য্যন্ত ঢাকা ভোঁদড়ের চামড়ার টুপি এঁটে বাইরে বেড়িয়ে এলাম।

দেখি বড় বাজার ছোট বাজার দুয়েতেই লোক জমেছে যেন পিপঁড়ের পাল—খদ্দের দোকান্‌দার সব গিস্ গিস্ কর্‌ছে—সকলেই জিনিস পত্রের দর—দস্তুর নিয়ে খুব কষাকষি হাঁক ডাক লাগিয়ে দিয়েছে। কোন রকমে আমার দোকানটা খুলে দাঁড়ি পাল্লা বার করে কাঁটা টাঙ্গাতে যা বিলম্ব, আর অম্‌নি দুয়োরের গোড়ায় ভিড় করে যে সব চাষা ভুষারা দাঁড়িয়েছিল তারা এসে মহা হাঙ্গাম বাধিয়ে দিলে; কেউ চায় পেরেক কাঁটা, কেউ চায় কাঁচা লোহা আর ইস্পাত আবার কেউ বা

বাড়ী থেকে যত পুরাণো লোহা লক্কড় এনেছে সেই গুলোই বেচ্বার আশায় আগে ভাগে সামনে ধরে দিচ্ছে।

সকলেই টের পেয়েছিল—যে শত্রুরা একবার এসে পড়লে আর সহরে ঢুক্তে পারবে না সেই জন্যেই আজ এত ভিড় কেউ বা এসেছে বেচ্তে কেউ বা এসেছে কিনতে।

আমি তো যা হোক্ দোকান খুলে মাল ওজন সুরু করে দিলাম। বাইরে সেপাইরা সব রোঁদ দিয়ে যাচ্ছে শোনা যাচ্ছিল। এর মধ্যেই আড্ডায় আড্ডায় সেপাইদের ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে সব ডবল ডবল লোক মোতায়েন করা হয়ে ছিল—সহরের ডোনা সাঁ কোটারও তখন অবস্থা তাল—আর বাইরের দিক্কার সহরে ঢোকার যে গেট গুলো ছিল সে গুলোও লোহা দিয়ে সবে নূতন করে মেরামত করা হয়েছে। এ পর্য্যন্ত সহর শুদ্ধ ঘেরাও হয় নি বটে কিন্তু ঠিক যেন ডালে বসা পাখীর উড়্ উড়্ অবস্থা কেবল পাখা মেলতে খেলতে যা দেরী। মেয়েন্স, আর ক্রুক্ সার ষ্ট্রাসবুর্গ থেকে যে শেষ খবর এসেছিল তাতেই জানা গিয়েছিল যে বিপক্ষ দলের ফৌজেরা রাইন নদীর ধারে এসে পৌঁছেছে।

আমার কিন্তু তখন মাথায় কেবল সেই ব্রাণ্ডীর কথাটাই ঘুরছে—বেচছি, ওজন কচ্ছি টাকা গুণে তুল্ছি বটে কিন্তু এ চিন্তেটা এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমায় ছেড়ে যায় নি কেউ যেন ঠিক—কপাল ফুঁড়ে—আমার দুই ভুরুর মাঝখানে—জোর করে ঢুকিয়ে রেখেছিল। ঘণ্টা খানেক তো এম্নি ভাবেই কেটে গেল হঠাৎ চেয়ে দেখি —বুর্গে আমার দরজার সুমুখে চাষাদের ভিড়ের পেছনে ঠিক ছোট খিলানটার নীচেই দাঁড়িয়ে আছে।

দেখেই বল্লে "যোয়াস একবার উঠে এস তো একটা কথা আছে।" আমি তখনই বা'র হয়ে এলাম, বুর্গে বল্লে "চল আমাদের এই গলিটার ভিতর যাই।" তার গম্ভীর মুখ দেখে আমি তো অবাক্, এদিকে পেছনে খদ্দেরেরা ব্যস্ত হয়ে চেঁচাতে লাগ্লো "যোয়াস তাড়াতাড়ি সেরে নাও বাবু আমাদের আর দেরী কর্বার যো নেই" তখন কিন্তু কিছুই যেন আর আমার কানে ঢুক্ছিল না।

গলির ভিতর যেতেই বুর্গে আমায় বল্লে "দেখ আমি এই মেয়ার আপিস থেকে আস্ছি সেখানে তারা সহরের লোকের কার কি ভাব তাই নিয়ে মেয়ার সাহেবের কাছে রিপোর্ট কচ্ছে হঠাৎ আমার কানে গেলো যে সেপাইদের জমাদার সার্জ্জেন টুব্যারের বাসা তোমার বাড়ীতেই ঠিক করে দিয়েছে।"

শুনে আমি তো একবারে বসে পড়লাম বল্লাম না, যা হয় হোক্ এতে আমি কখ্খন ও রাজী হবো না— পনর দিন ধরে ছ, ছ জন লোককে জায়গা দিয়ে এলাম এবার ও ফের আমারই পালা!"

বুর্গে বল্লে ঠাণ্ডা হ। অতো চেঁচা চেচি করো না এতে লাভ তো হবেই না মাঝথেকে আর ও হাঙ্গাম বেধে যাবে। আমি রাগের মাথায় কেবলই বল্তে লাগ্লাম 'সে হতচ্ছাড়া সার্জ্জেনটাকে আমি কোন মতেই বাড়ী ঢুক্তে দিচ্ছিনা—সেটাত আমার দুচক্ষের বিষ আমি ঠাণ্ডা মানুষ কারুর কোন ও ক্ষতি লোকসান করি না—বিনা ফেজদে ঠাণ্ডা ভাত বাতাস দিয়ে খাবো—তা কিনা আমার উপরই যতো উপদ্রব জুলুম।" আমি তো এম্নি করে আপন মনে চেঁচিয়ে যাচ্ছি—দেখি কিনা সর্লে টুক্রিটি হাতে করে সেই পথ দিয়েই বাজার কর্তে আসছে। আমাদের দুজনাকে সেখানে দেখে জিজ্ঞাসা কর্লে "হয়েছে কি? এখানে দাঁড়িয়ে কেন?" বুর্গে বল্লে "শোন সর্লে বিবি এক কথা বলি কিন্তু তোমার স্বামীর মত অবুঝ হ'লে চল্বেনা যোয়াস যে চটেছে কেন তা বুঝতে পারছি কিন্তু যা ঠেকাবার উপায় নাই তা মাথা পেতে নিতেই হবে। জানতো ক্রিসায়েরের তোমাদের উপর অনেক দিন থেকেই আক্রোশ সে ফৌজদারীর হেড কেরাণী ফৌজের লোকের কার

বাড়ীতে কার বাসা হবে সেই লিষ্টি বেঁধে ঠিক করে দেয়। সে তোমাদের ওখানে সার্জ্জেন ক্রব্যারকে জায়গা দিতে হবে এই বলে হুকুমনামা বার করে দিয়েছে। সার্জ্জেনটা ভারি বদরাগী আর গোঁয়ার তা আমি মেনে নিচ্ছি কিন্তু আর পাঁচ জনের মত তারও তো একটা থাকবার স্থান চাই। আমি তোমাদের হয়ে বল্‌তে কিছু কম্ করিনি কিন্তু আমার সব কথায় জবাবেই ফ্রিসার বল্‌তে লাগ্‌লো "মোয়াস পয়সাওয়ালা লোক, ফৌজ দিতে হ'বে বলে ছেলেদের সে ভাগিয়ে দিয়েছে এর জন্তে তার একটু ভোগা চাই তো।" মেয়ার সাহেব, গভর্ণর সাহেব দেশ শুদ্ধ লোক সকলেই বল্‌লে হাঁ এ ন্যায্য কথা বটে কাজেই বোঝ এর উপর কি আর কথা টেকে। আমি বন্ধু বলেই বল্‌ছি এতে তুমি যতই আপত্তি কর্‌বে সার্জ্জেনটাও ততই তোমার অপমান কর্ত্তে থাক্‌বে আর তোমার ফ্রিসার শত্রুও ততই হাঁসবে, এর আর তুমি কোনও প্রতিকার কর্ত্তে পার্‌বে না, তাই বল্‌ছি ঠাণ্ডা হয়ে বুদ্ধিমানের মত কাজ করো।

ফ্রিসারই এ যন্ত্রনার গোড়া শুনে আমার রাগ আরও বেড়ে উঠ্‌লো। আমি চেঁচামেচি কর্‌বো দেখে সর্লে আমার হাত চেপে ধরে বল্‌লে "থামো আমাকে বল্‌তে দাও—বুর্গে ম'শয় বড় ওয়াজীব কথাই বলেছেন—তিনি আগে থেকে জানিয়ে দিয়ে বড় উপকারই করেছেন। ফ্রেসারের আমাদের উপর রাগ আছে সেত জানা কথা। সে যা করেছে তা তার খাতে জমা রইলো এর হিসেব নকেশ পরে হবে। তা হ'লে সার্জ্জেনটি আসছেন কখন।

বুর্গে বললে—দুপুর বেলায়।

আমার স্ত্রী বল্‌লে বেশ তো তাই হবে—এখন বাসা আগুণ বাতি সবই আমাদের জোগাতে হবে এতে তো আর আমাদের ওজর আপত্তি চল্‌বেনা—কিন্তু এর শোধ, উঠ্‌বে ফ্রিসারের কাছ থেকে, পাই পয়সা বাদ যাবেনা। আমি সর্লের দিকে চেয়ে দেখলাম তার মুখ খানা যেন পাণ্ডাশপানা হ'য়ে গিয়েছে—বুঝে দেখলাম সে যা বলছে একবারে খাঁটি তাই আর কথা না ক'য়ে শুন্‌তে লাগ্‌লাম। সর্লে বল্‌লে "শোণ, আর মিছামিছি গোলমাল করোনা, একটু ঠাণ্ডা হয়ে ধৈর্য্য ধরে থাক যা কিছু করতে হয় আমিই কর্‌বো এখন।"

বুর্গে বল্‌লে "দেখ আমি এই কথা বল্‌বার জন্যেই এসেছিলাম, ফ্রিসারের এ কাজটা হয়েছে অতি ইতরের মত—দেখবো এর পর যদি সার্জ্জেনটাকে তোমাদের ঘাড় থেকে সরিয়ে নেবার সুবিধা পাই—যাই এখন আমাকে আবার নিজের ঘাঁটিতে গিয়ে জম্‌তে হ'বে। সর্লে বাজারের দিকে যেতেই বুর্গেও আমার হাত ধরে বিদায় নিল। এদিকে খদ্দেরের দলও এত জোরগলায় ডাক হাঁক আরম্ভ করেছিল যে আমাকেও অগত্যা ফিরে গিয়ে দাঁড়ি পাল্লা ধর্ত্তে হলো। আমার সে রাগ আর পড়লোনা। সে দিন কম করে প্রায় ২০০ ফাঁ'র লোহাই বিক্রী করেছিলাম, কিন্তু সার্জ্জেনটার ভয়ে আর ফ্রিসার বেটার উপর রাগ আর ঘেন্নার দরুণ আমার কিছুই ভাল লাগ্‌ছিল না। সে দিন যদি এর দশগুণ বিক্রী হ'তো তা হ'লেও মনে সুখ পেতাম না। আমি মনে মনেই বল্‌তে লাগ্‌লাম "বেটা দস্যি আমার সুখ শান্তি সব নষ্ট করলে—এ সহরে আমার আর নির্ঝঞ্ঝাটে বাস করা চলবে না।"

দুপুর বেলায় হাট শেষ হতেই—লোকেরা যখন "ফরাসী" দরওয়াজা দিয়ে পিল্‌পিল্ করে বেরিয়ে যাচ্ছিল—আমি তখন আমার দোকান পাট বন্ধ করে বাড়ীর দিকে রওনা হ'লাম—যেতে যেতে ভাবতে লাগ্‌লাম "নিজের বাড়ীতে আমার আর আপন ব'লে কোন অধিকারই রইল না—জর্ম্মাণ—,হিস্পানীদের মতো চোখ রাঙিয়ে গেও আমাদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে থাকবে। মনে হতে লাগ্‌লো যা-কিছু বল ভরসা ছিল সব যেন উজাড় হয়ে গিয়েছে। এই সব দুর্ভাবনার মধ্যে সিঁড়ি দিয়ে উঠ্‌তেই আমার নাকে নানা রকম

ভাল মন্দ রান্নার খোস্‌বাই আস্‌তে লাগ্‌লো—আমি ঘাড় সোজা করে জোরে নিঃশ্বাস নিতেই বুঝতে পার্‌লাম যে মাছের ব্যঞ্জন আর মাংসের কাবাব পাক হচ্ছে। ঠিক যেন আমাদের পরবের দিনের মত ব্যবস্থা। যেই দুয়ার খুলেছি—অম্‌নি সর্লে এসে দাঁড়াল বল্লে—যাও তোমার নিজের ঘরে গিয়ে—দাড়ি কামিয়ে একটা ফরসা কামিজ গায়ে দিয়ে এসগে। চেয়ে দেখি যে শনিবারে "স্যাবাথ" পরব পাল্‌তে হয় বলে আমরা যেমন একটু ছিম্‌ছাম্‌-চোস্ত রকম পোষাক করে থাকি সেদিন সে ঠিক তেম্‌নি ধারাই সাজগোজ করেছে। পরণে সবুজ ঘাগরা, কাণে কাণবালা (এয়ারিং), গলায় লাল রেশমী রুমাল বাঁধা। আমি একটু চেঁচিয়েই বল্লাম "কেন কি হয়েছে কি যে দাড়ি কামাতে হবে ?" আমার স্ত্রী আর তর্কাতর্কি না করে শুধু বল্লে যাও যাও আর সময় নাই, এই বেলা তাড়াতাড়ি সেরে নাও গে।" এই মেয়েলোকটির এত বুদ্ধি—এতবার সে আমাকে হাঙ্গাম, বিপদ থেকে বাঁচিয়েছে যে আমি আর কথাটি না করে শোবার ঘরে দাড়ি কামাতে আর জামাটা বদ্‌লাতে চলে গেলাম।

যখন কামিজটা গায়ে দিচ্ছি—তখন কাণে গেল—আমার ছোট ছেলে সাফেল বলচে "মা ঐ দেখ আস্‌ছে সেই-ই বটে" তার পর সিঁড়িতে ওঠার শব্দ শুন্‌তে পেলাম সঙ্গে সঙ্গে খুব কর্কশ স্বরে একটা হাঁক এল "এই কে কে বাড়ীতে আছ তোমরা ?" এম্‌নি অভদ্র কথা বলার ভঙ্গী যে শুন্‌লেই সর্ব্ব শরীর রাগে জ্বলে ওঠে। আমি শুনেই বুঝলাম ইনিই সেই সার্জ্জেন কর্ত্তা। তার পর শুন্‌তে পেলাম সাফেল খুব শাওখুরি করে বলছে "এই যে আমাদের সার্জ্জেন সাহেব এসে পড়েছেন" যেন তার আনন্দ আর ধরে না।

তার পর আমার স্ত্রী খুব মিষ্টি কথায় ভদ্রভাবে বলতে লাগলো "এর মধ্যেই এসে পড়েছেন—বেশতো—আসুন সার্জ্জেন মশায় আস্‌তে আজ্ঞা হোক। আপনার জন্যেই আমরা সব হাজির রয়েছি। আজ যে একজন সার্জ্জেন এ গরীবদের বাড়ী অতিথ হবেন এ খবর আমরা পেয়ে ছিলাম। এর আগে আমাদের এখানে সেপাই শান্ত্রীরাই ছিল; বড় দরের কেউ আসেননি তাই তখন সার্জ্জেন একজন আস্‌বেন শুনে বড়ই আনন্দ হ'ল। আসুন একবার কষ্ট করে বাড়ীর ভিতর আসুন।"

সে এম্‌নি খোস মেজাজে কথা গুলো বল্‌লে যে শুনে আমারই তাক্‌ লেগে গেল। আমি আপন মনেই বল্‌তে লাগলাম "সর্লে—কি, কৌশল কি বুদ্ধি তোমার এতক্ষণে তোমার চাল বুঝতে পেরেছি এই লক্ষীছাড়াটাকে মিষ্টি কথায় নরম কর্‌বে এই তোমার ভিতরকার মৎলব —ফোয়াস। তোর বড় ভাগ্যি যে তোর কপালে এমন বুদ্ধিমতী স্ত্রী পড়েছিল।

আমি আপন মনেই হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে—তাড়াতাড়ি পোষাক পড়তে লাগলাম—শুন্‌লাম সার্জ্জেন জানোয়ারটা বলছে "আচ্ছা আচ্ছা হয়েছে—আর মিষ্ট কথায় দরকার নাই শুধু মিষ্টি কথায় ভুলছিনে। বাপু! সার্জ্জেন ক্রব্যা-রকে কাঁচা ছেলে পাওনি এখন আমার শোবার ঘর। বিছানা টিছানা কোথায় কি রয়েছে দেখিয়ে দাও।

সর্লে বল্লে "তা আর বলতে—আসুন এক্ষুণি সব দেখিয়ে দিচ্ছি—এই যে আসুন এই দিকে—এই দেখুন আপনার ঘর আমাদের বাড়ীর এইটিই সব চেয়ে ভাল কুঠারী তারপর তারা অন্দরের পথ দিয়ে চললো—শুনলাম সর্লে আমাদের ভাল ঘরটার দরজা খুলছে—ফালস্‌ বুর্গ থেকে ঝি, জামাই এলে আমরা তাদের এই ঘরটাতেই থাকতে দিতাম। আমি আস্তে আস্তে ঘরের কাছে আস্‌তেই দেখলাম যে সার্জ্জেনচন্দ্র বিছানার উপর গোটা কয়েক ঘুঁসি মেরে পরখ করে নিচ্ছেন যে গদি টদিগুলা বেশ নরম কিনা—আর সর্লে আর সফেল পেছনে দাঁড়িয়ে মুখ টিপে হাঁস্‌ছে। বিছানা পরীক্ষা হয়ে গেলেই ক্রব্যার ভুরু কুঁচকে ঘরের সব কোণকানার গুলো দেখা আরম্ভ কর্‌লে। সে যে চেহারা জিজ

তেমন বোধ হয় তুমি কখনও দেখনি—আধ পাকা গোপ গুলো খোঁচ ২ হয়ে রয়েছে—খাড়া নাকটা বড়শীর মত বেঁকে মুখের উপর এসে ঝুঁকে পড়েছে—রংটা হলদে পানা—বলি পড়ে মুখের যে ক'ত জায়গা কুঁচকে গিয়েছে যে বলবার নয়।

সার্জ্জেন বাহাদুর বন্দুকের কুদোটা মেঝের উপর দিয়ে টান্‌তে টান্‌তে এধার ওধার ফিরছিলেন আর আপন মনে বিড় ২ করে বকতে ২ নেহাৎ বদমেজাজী ভাব দেখিয়ে এটা কি ওটা কি জিজ্ঞেস করছিলেন। কথাগুলোর নমুনা তোমাকে একটু শুনিয়ে দিই— "ওখানে ওটা কিগা?"

আজ্ঞে ও তে মুখ ধোবার জল থাকে আপনি মুখ হাত ধোবেন বলে রাখা হয়েছে।"

"এ চেয়ার গুলো—এ গুলো মজবুততো কেমন টিক্‌বে দেখি" বলেই এক একখান চেয়ার উঠিয়ে মেজের উপর ধম্ ধম্ করে পায়া শুদ্ধ ঠুকতে আরম্ভ কর্‌লে।

তার যে খুঁত বার করাই মৎলব তা আমাদের আর বুঝতে বাকী ছিল না।

দুয়ারের দিক ফিরতেই আমাকে দেখে একবার ত্যাড়চা ভাবে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা কল্লে "তুমিই কি বাড়ীর কর্ত্তা নাকি?"

"হাঁ, সার্জ্জেন,"

"আচ্ছা"

তার পর পিঠের ঝোলাটা টেবিলের উপর ফেলে বন্দুকটা ঘরের কোণে ঠেসিয়ে রেখে বল্‌লে "আচ্ছা, এই যথেষ্ট এখন তোমরা যেতে পার।"

এর মধ্যে সাফেল গিয়ে রান্না ঘর খুলতেই কাবাবের খুসবুতে ঘরটা ভরে গেল। সলে´ বেশ হাঁসি মুখে, মিষ্টি কথায় বল্‌লে "সার্জ্জেন মশায়, মাপ করবেন, কিন্তু আজ আমার একটা কথা আপনাকে রাখতেই হবে।"

সার্জ্জেন একবার ঘাড় উচু করে চেয়ে বললে "কেন তোমার আবার কিছু বলবার আছে নাকি?"

"হাঁ আছে বৈ-কী। আপনার যখন এই খানেই "ডেরা" ঠিক হয়েছে আপনি তখন বলতে গেলে এক রকম বাড়ীর লোকই হলেন তা মধ্যাহ্নের আহারটা অন্ততঃ আজকের মত একটি বার আমাদের সঙ্গেই কর্ত্তে হবে।

কর্ত্তা অম্‌নি রান্না ঘর পানে নাকটা ফিরিয়ে বললেন "ওঃ, এই বুঝি—এ যে হ'লো আলাদা কথা"। তার পর তাঁর ভাব দেখে বোধ হতে লাগলো যেন আমাদের উপর এ মেহেরবাণীটা করে হবে কিনা তাই একবার বুঝে সমঝে দেখছেন—আমরা তো চুপ করে—তিনি কি জবাব দেন তারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলাম। বাহাদুর একটুক্ষণ দম ধ'রে থেকে দুই একবার নাক ফুলিয়ে জোরে ২ নিশ্বেস টেনে কার্ত্তুসের পেটিটা বিছানার উপর ফেলে বললেন "আচ্ছা তাই সই—চলো দেখা যাক, গিয়ে"। আমার মনে হ'তে লাগলো "ব্যাটা ছোট লোক ওর জন্যে এবার এত যত্ন আত্তি! আজ যদি ব্যাটাকে শুধু কাঁচা মেটে আলু খাওয়াতে পার্ত্তাম তবে আমার গায়ের ঝাল মিট্‌তো।" সলে´ কিন্তু আগেকার মতই বেশ খুশী ভাবেই রয়েছে দেখলাম। সে সার্জ্জেনের কথা শুনে খুব খাতিরদারী করেই বলতে লাগলো "তাহলে একবার অনুগ্রহ করে গা তুলে এই দিক দিয়ে আসুন"।

খাবার ঘরের ভিতর ঢুকে দেখি—আয়োজন হয়েছে যেন স্বয়ং রাজপুত্তুরের জন্য—ঘরটি দিব্যি ঝাটঝোট দিয়ে খাসা করে সাজিয়ে গুজিয়ে টেবিল পাতা হয়েছে—ধবধবে চাদর পাতা—তার উপর চীনা মাটির প্লেট গুলোর পাশে ২ রূপার ছুরি কাঁটা। সলে´ সার্জ্জনকে টেবিলের আগার দিকে—আমি যে আরাম চেয়ার খানায় বসতাম সেই খানাতেই বসিয়ে দিলে। তাকে যে বাড়ীর কর্ত্তার মত সম্মান দেখান হচ্ছে—তার জন্যে কোনও রকম ইতস্ততঃ না করে এবার ভাব দেখালে যেন এম্‌নি ধারাই নিত্যি হ'য়ে থাকে। তারপর রাঁধুনী

দুয়ারের পার দিয়ে এসে ঢাকন খুলতেই টাট্‌কা মনীর সুগন্ধ চারিদিক ছড়িয়ে পড়ল। সে দিন যে কি রান্না বান্না হয়েছিল, ফ্রিজ, তাও তোমাকে শুনিয়ে দিচ্ছি। শুনলে পরে বলতে কি—তোমারও বিশ্বাস যাবে যে এর চেয়েও ভাল রকম খাওয়া দাওয়া তোমার আমার অদৃষ্টে সহজে জুট্‌বার নয়।

তার পর খাওয়া দাওয়া তো আরম্ভ হ'লো। আমাদের হয়েছিল সেদিন—১নং—রাজহাঁসের কাবাব, ২নং—বেশ বড় রকম একটা "পাইক" মাছের তরকারি, ৩নং—কপি দিয়ে মাংস দিয়ে একটা টক আর এ ছাড়া বড় বড় ভোজ নেমন্তন্নয় যা যা হয়ে থাকে সবই জোগাড় ছিল। এ সব সর্লের নিজে হাতে—দেখে শুনে পছন্দ করে রান্না। রাঁধুনী মাগী তো উপলক্ষ বল্লেই হয়। পাক যে কত উৎকৃষ্ট হয়েছিল তা আর বলবার নয়। এ ছাড়া পুরো চারটে বোতল ব্রাণ্ডি—শীতকাল বলে বোতল কয়টা ন্যাকড়া বেঁধে গরম করে এনেছিল—আর ফল ফাকড় মিষ্টান্ন ত ছিলই।

তা ফ্রিজ তুমি বল্‌লে বিশ্বাস যাবে না যে খাবার সময় সে হতচ্ছাড়া মুখের, ভাব দেখে কোনও জিনিষটা যে তার ভাল লাগ্‌ছে, তা বুঝবার জোটি ছিলনা। বল্‌বো কি বাবা, দুটি ঘণ্টা বসে বসে খেলে তা বেটার একবার ও যদি মনে এল যে বলি যে "মাছটা বেশ মিষ্টি" "কাবাবটা রান্না হয়েছে ভাল"—"কি এ ব্রাণ্ডিটা বেশ উঁচু দরের।"

যে বেচারা নেমন্তন্ন করেছে তার মনস্তুষ্টির জন্যে—কি-যে লোকটা কষ্ট করে অ্যতো রেঁধেছে তাকে খুসী করবার জন্যে—লোকে এম্‌নি ধারা দু একটা কথা বলে থাকে তো? তা সে হাভাতে'র মুখ দিয়ে যদি একটি কথাও বেরিয়ে থাকে। বেটা এম্‌নি ভাব দেখালে যে এমন খাওয়া যেন তার নিত্যিই জুটে থাকে। আমার স্ত্রী তাকে যতই খোসামোদ করে যতই তাকে মিষ্টি কথায় তুষ্ট করতে যায় ততই সে রুষ্ট হয়ে মুখ ভারি করে ভুরু কুঁচকে আমাদের হেনস্থা কর্ত্তে থাকে যেন আমরা তাকে কোন গতিকে বিষ টিষ খাইয়ে দেব বলেই নেমন্তন্ন করেছি।

আমার যেন এ আর সহ্য হচ্ছিল না আমি নিতান্ত বেরক্ত হয়ে—কয়েক বার সর্লের দিকে চাইলাম—, দেখলাম তার মুখে হাসি লেগেই আছে। সে তখনও এটুকু ওটুকু ভাল জিনিষ সার্জ্জনের থালায় তুলে দিচ্ছে—তখনও তার গেলাস খালি হলেই মদ ঢেলে দিচ্ছে। ধন্যি মেয়ে মানুষের বুদ্ধি! আমার দু তিন বার মনে হলো চেঁচিয়ে বলি—"সর্লে কি সুন্দর রান্নাই রেঁধেছ আজ কাবাবের ভেতরের পুরগুলোও কি খেতে এত সুস্বাদ হয়েছে।" কিন্তু সার্জ্জেনটা এর মধ্যে হঠাৎ বাঁকা দৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে দেখ্‌লে। বুঝলাম সেও আমার মনের কথা জান্‌তে পেরেছে। চখের ভাব দেখে মনে হ'লো যেন সে বলতে চায় "কি হে মৎলব—খানা কি? এত মাতব্বর হ'লে কোথা থেকে? আমাকে আদব কায়দা শিখোতে চাও! কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ তাকি আমি তোমার চেয়ে কম বুঝি।"

আমি আর এরপর কোন কথা কইলাম না। সেও আর কথা না কয়ে একধার থেকে যত খেয়ে যেতে লাগলো আমার ততই মনে হতে লাগলো এ বেটাকে একেবারে জাহান্নমে পাঠাতে পারতাম তবে এ গায়ের ঝাল মিটতো।' তা মনে যাই হোক সর্লের দেখা দেখি অন্ততঃ বাহিরে বাহিরে খুশী ভাবই দেখাতে লাগলাম।

খাওয়া দাওয়া শেষ হবার সময় আমার মনে হতে লাগলো যাক এ খানার হাঙ্গাম তো চুকে গেল—এখন সবই ভগবানের মর্জ্জি তাঁর একটু দয়া থাকলেই হয়। সর্লে আজ বড় ঠকানটাই ঠকেছে—কিন্তু তার আর অপরাধ কি? সে তো এসব ভাল ভেবেই করেছিল তা কোথা থেকে এমন একটা পশু এসে জুটবে তা কে জানে;?"

খাবার বাসন সরিয়ে নিতেই--আমি "কফি" আন্‌তে বলে ভাণ্ডার ঘর থেকে কয়েক বোতল পুরাণ "রম্" আর চেরী ফলের সরাব আন্‌তে গেলাম। আমি ফিরতেই সার্জ্জন জিজ্ঞাসা করলে বোতলে কি?" আমি বল্লাম "রম" আর কালা জঙ্গলের চেরীর সরাব—যার "কির্সেন ওয়াসার" বলে এত নাম ডাক। তারি সরেস জিনিস এ—বহু দিনের পুরাণো। সে চোখ মিট মিট করে বলে উঠলো "বল্লেই হলো অম্‌নি কালা জঙ্গলের চেরী সরাব,—মুখের কথা আর কি! বাপু সার্জ্জেন ক্রেবার বড় সহজে ঠকেনা, কই দেখি কেমন তোমার খাঁটি জিনিস?"

তার পর কফি খেতে খেতেই দুবারে দু গ্লাস সাবাড় করে বলতে লাগলো "মালটা আসল কিনা একবার ভাল করে পরখ করা চাই তো।"

সর্লে তাকে আর একগ্লাস ঢেলে দিতে যাচ্ছিল কিন্তু সে খাবার টেবিল থেকে উঠেপড়ে বললে "না খুব হয়েছে—আর কাজ নেই। আজ আবার ডবল ডবল লোক মোতায়েণ হয়েছে—আমাকে ফরাসী দরওয়াজায় পাহারা দিতে হবে। তা আজকে খাওয়াটা বড় মন্দ হয় নি। এমনি যদি মাঝে মিশেলে চলে তা'হলে আমাদের বন্‌্বে বড় মন্দ নয়।"

কথাগুলো বল্‌লে বটে—কিন্তু মুখে কোথাও হাঁসির চিহ্নও ছিল না—মনে হতে লাগলো বুঝি আমাদের ঠাট্টা বিদ্রুপ করেই বল্‌ছে। এর উত্তরে সর্লে বল্লে "আমাদের যতটুকু ক্ষমতা তার একটুও কসুর হবেনা।" তার কথা শেষ হতে না হতেই ক্রুবার তার ঘরে গিয়ে বাইরে বেরুবার ওভার কোটটা হাতে করে নিয়ে এল। তার পর সিঁড়ি দিয়ে নাম্‌তে নাম্‌তে বল্‌তে লাগ্‌লো— "আচ্ছা আচ্ছা দেখা যাবে এখন।"

আমি এতক্ষণ কোন কথাই বলিনি—সে মিচে নেমে যেতেই গলা ছেড়ে বলে উঠ্‌লাম "সর্লে এমন নচ্ছার তো আমি কখনও দেখিনি—এর সঙ্গে আমাদের কখনও বনাবনি হবেনা—দেখছি শেষ পর্য্যন্ত এ বেটার জন্যে সব শুদ্ধ বাড়ী ছেড়েই পালাতে হবে। সর্লে হেঁসে বললে "না গো না—দেখো, এখন এর পর বেশ বনে যাবে। তুমি যা বুঝেছ আমার দেখেতো তার উল্টোই মনে হয়।"

আমি বল্লাম "তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক, ভগবান যেন তাই করেন কিন্তু আমার তেমন ভরসা হচ্ছেনা"। সে হাঁসি মুখে টেবিলের চাদরখান উঠাতে লাগলো। আমি মুখে যাই বলি—তার কথা শুনে সত্যি সত্যিই যেন একটু আশা হ'তে লাগ্‌লো—ধরে যেন প্রাণ ফিরে এল। তার যে কত বুদ্ধি কত কৌশল সবই তো আমার জানা আর এই ব্যাপারে তার সদ্বিবেচনারও পরিচয় পাওয়া গেল।

(ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত)

শ্রীগুরুদাস সরকার।

——

হৃদ বল।

সবাই পড়ে সমর জ্বরে
হুস্ নাহিক হায়,
মুমূর্ষ মা মরণ কালে
জল চাহিছে কায়?
জ্বরের ঘোরে অসাড় পড়ে
পুত্র পালোয়ান,
মাতার স্বরে চমকে উঠে
ক্ষণিক লভি জ্ঞান।
শক্তি বিহীন উঠতে নারে
চক্ষে ঝরে জল,
হায়রে বিধি এমন করে
করলি হীন বল,
'সাত পেড়েতে জল সেচেছি
আক বাচাতে আমি

কলসী থেকে জল গড়াতে
শক্তি নাহি স্বামী।
চারটে ঘড়া মাথায় করে
জল বয়েছি হেসে,
আমার মাতা যায়রে আজি
কাঙালিনীর বেশে,
করেছিলাম বড়াই বৃথা
শক্তি কাহার নিয়ে
আজকে সে তাই জানিয়ে দিলে
চোখে আঙুল দিয়ে।
ধৃষ্ট আমি দুষ্ট আমি
কান্না শুধু পায়,
এমন কঠিন শিক্ষা যে দেয়
দয়াল বলি তায়?

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

যুগ সমস্যা

বর্ত্তমান যুগে মানব মাত্রেরই জীবনের পথ সমস্যা পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। কে কোন্ পথে চলিবে জাতীয় গতি কোন মুখী হইবে, দেশের অবস্থা তাই সর্ব্বতোমুখী চিন্তাকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান যুগ আমাদিগকে সনাতনপন্থিকের গণ্ডি ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া নব প্রবর্ত্তনের অসীম ঘূর্ণাবর্ত্তের নিরবচ্ছিন্ন স্রোত মুখে টানিয়া চলিয়াছে। এ গতি স্রোতকে মঙ্গল ও অমঙ্গলের সূক্ষ্ম নিক্তিতে বিচার করিয়া জাতীয় জীবনের গতি পথ নির্দেশ করিতে হইবে।

আমাদের দেশের পুরুষ তাদের গতি পথের দ্বারে দাড়াইয়া অসীম তর্ক ও অনন্ত গবেষণা জুড়িয়া দিয়াছে। ব্যক্তি মাত্রেই নিজ শ্রেয়ের সন্ধানে ছুটিয়াছে। উঠিতে বসিতে তাহারা নিজ নিজ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণায় ব্যতিব্যস্ত। কিন্তু বাকী রহিয়াছে নারী, তাঁ'রা তাদের চিরনির্দ্দিষ্ট বাঁধা পথেই ছুটিয়া চলিয়াছে। প্রবাহিতা তটিনীর অচঞ্চল বক্ষস্থিতা ক্ষুদ্র ভেলার ন্যায় সে গতি স্থির, ধীর ও মন্থর।

আজ সেই নারী জীবনের বর্ত্তমান যুগ সমস্যার পর্য্যালোচনাই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অভিপ্রায়।

নারী ও নর একই পৃথিবীতে একই উপাদানের ভিতর সৃষ্ট হইলেও, জীবনের গতি ও উদ্দেশ্য উভয়ের মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া দাড়াইয়াছে।

তাই আজ জাতীর গতি পথ নির্দ্দেশ করিলে নর ও নারী উভয়ের-গতি পথ নির্দ্দিষ্ট হয়না। কারণ মানব হিসাবে উভয়ে এক হইলেও বাস্তব জীবনের বৈষম্য উভয়কে ভিন্ন পথগামী করিয়াছে। যুগের ঐক্য তাদের কর্ম্ম প্রণালীর মাঝে বিভিন্ন ধর্ম্মে প্রকাশ পাইয়াছে।

আমাদের বঙ্গদেশের নারী সমাজ জাতীয় জীবনের ঘূর্ণাবর্ত্তের মাঝে বেশ এক সঙ্কটপূর্ণ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। তাদের জন্মগত অভ্যাস অনুভূতি বাহিরের সংঘর্ষে যুগপৎ ভীত ও শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছে। চির নির্ভরতায় অভ্যস্ত বঙ্গনারী আশ্রয় অভাবে পতনোন্মুখী হইয়া পরিতেছে।

আমাদের দেশে সংঙ্ঘবদ্ধ বস্ত্রবয়ণ, কৃষি, তাত প্রভৃতি কার্য্য ততটা ছিলনা সত্য কিন্তু একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা বহুদিবস হইতে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে তা লুপ্ত হইয়া আসিয়াছে। এবং অনতি ভবিষ্যৎ যুগে তাহা মোটেই থাকিবে কিনা সে বিষয়েও বিশেষ সন্দেহ আছে।

পূর্ব্বে একমাত্র উপার্জ্জনক্ষম পুত্র তার নিজ পত্নী, পুত্র, কন্যা নিয়া সংসার পাতাইয়া বসিতে পারিত না। নিজ পত্নী পুত্র কন্যার সহিত তাহাকে পিতা, মাতা, ভ্রাতা ভগ্নী, আশ্রিত আশ্রিতা প্রভৃতি বহুজন প্রতিপালক হইতে হইত। এবং সে বিদেশে থাকিয়া, কষ্টময় জীবন যাপন করিয়া তখনকার সমাজের বিস্ময় উৎপাদন

করিয়া দেবতা ঋষি প্রভৃতি কোনরূপ বিশেষণ প্রাপ্ত হইত না। তাহারা ইহাকে নিজেদের যথা নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য ও করনীয় বলিয়াই মনে করিত।

কিন্তু দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় সুযোগ্য পুত্র তার বিধবা ভগ্নী বা উপায়ান্তরহীনা ভ্রাতৃবধুর গ্রাসাচ্ছাদন করিতে পারিলেই নররূপে দেবতা আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এবং ইহা তাহারা নিজেদের কর্ত্তব্যের অতিরিক্ত কোন সুমহৎ কার্য্য করিতেছে বলিয়াই মনে করিয়া থাকে।

অবশ্য আধুনিক আর্থিক অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইতে শোচনীয়তর হইয়া দুর্ব্বল মানবের ভারাক্রান্ত স্কন্ধে—তার অসীম চিন্তার বোঝা চাপাইয়া দিয়াছে। এবং ইহাও অতি সত্য যে পূর্ব্বে যত পরিমাণ অর্থ দ্বারা বহুলোক প্রতিপালিত হইতে পারিত বর্ত্তমানে তাহাদ্বারা নিজ পত্নী পুত্র প্রতিপালনও কষ্ট সাধ্য হইয়া উঠিয়াছে।

তাই বলি পূর্ব্বে দেশীয় নারী সমাজ স্বামীর মৃত্যুর পর, দেবর, ভ্রাতা, শ্বশুর প্রভৃতির গৃহে আদরিনী গৃহ লক্ষ্মী রূপেই আশ্রয় প্রাপ্ত হইত। এবং বর্ত্তমানেও অনেকে এরূপ থাকিতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান সংগ্রাম—পূর্ণ জীবন যাত্রার মাপে সবাই যখন নিজের ভারেই ভারাক্রান্ত কে তখন উড়ো বোঝা ঘাড়ে করিয়া ক্ষুদ্র আয়ের মাঝে ভাগিদার সৃষ্টি করিয়া তুলিবে।

অবশ্য বহুজন প্রতিপালক, আত্মীয় রক্ষক, স্বজন পোষক লোক মোটেই যে নাই তাহা নহে। আছে; কিন্তু জনসংখ্যার আধিক্যের সহিত তুলনা করিলে একরূপ নাই বলিলেই চলে।

তাই আজ নারী সমাজের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পরিয়াছে। সমাজ তাহাকে নির্ভরশীলতায় অভ্যস্থ করিয়া তুলিয়াছে সত্য কিন্তু তার আশ্রয় স্থান ক্রমেই সংকীর্ণ হইয়া পরিতেছে। তাহাদের জীবনযাত্রার সহজ পথ সমস্যাপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। তাই আজ নারীর জীবন যাত্রার গণ্ডী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া পুরাতনের অনিষ্টকর নিয়মগুলি পরিবর্জ্জন এবং নূতনের মঙ্গলপূর্ণ নিয়মকে নিজ আত্মার সহিত সংযোগ সুত্রে গ্রথিত করিয়া লইতে হইবে। নারী তার গৃহের সৌকর্য্য বজায় রাখিয়া বাহির ও নিজ অভিব্যক্তিতে পূর্ণ করিয়া তুলিবে। তাদের স্নেহ প্রীতির লীলাক্ষেত্র হৃদয়গুলি ঘড় বাহির এক করিয়া তুলিয়া বাহিরকে ও সেই অরুণ স্বর্ণ জ্যোতিতে আলোকিত করিয়া তুলিবে। তাতেই তার কর্ম্ম ক্ষেত্রের প্রসারতা বর্দ্ধিত হইয়া জীবনকে পূর্ণতায় সার্থকতায় মণ্ডিত করিয়া তুলিবে।

যে কোন সংবাদ পত্রই দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থার শোচনীয়তা সম্বন্ধে প্রত্যহ প্রমাণ দিবে, এবং চাকরী জীবি বাঙ্গালী সমস্ত জীবন আফিষের চলন্ত চাকার নিষ্পেষণে অতিবাহিত করিয়া যখন সেই চির নির্দ্দিষ্ট পথে যাত্রা করে, তখন স্বজন মৃত্যুর তীব্র বেদনার চেয়েও তীব্রতর বেদনা তার পত্নীকে আকুল করিয়া তুলিবে। তা তার নিজ পরিণাম চিন্তা, আশ্রয় চিন্তা। কারণ চাকরী করিয়া স্বামী এমন কিছু সঞ্চিত পুঁজি রাখিয়া যান না যাহাতে পত্নীর সকল অভাব পূর্ণ হইতে পারে।

কিন্তু আমাদের দেশ ধারণা করিয়া বসিয়া আছে নারীর পরনির্ভরতা ও পরমুখাপেক্ষিতাই তাদের দাম্পত্য সুখ সৌভাগ্যের অটল ভিত্তি। অনেকাংশে এটা সত্য হইলেও সর্ব্বাংশে নহে। কারণ পুরুষের নিজ সমস্যা আজ বুঝাইয়া দিতেছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিকে উপেক্ষিত রাখিলে চলিবে না। ক্ষুদ্র বৃহৎ সব শক্তিকে প্রেমের কঠিন নিগরে গ্রথিত করিয়া এক বৃহৎ কর্ম্ম শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে, যাহা বিপুল বিশ্বকে তার ইঙ্গিতে চালাইয়া নিবার সামর্থ্য রাখে।

আমাদের দেশের কাব্য নাট্যের অর্দ্ধেক পুষ্টি নারীর এই নির্ভরতা ও অযোগ্যতা নিয়া। তাই তারা নারীকে গঞ্জারিনী পল্লবিনীনভেব প্রভৃতি অলঙ্কার সংযোগে এক সুমোহন কোমল ভাবের সৃষ্টি করিয়া মানব চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়া থাকে। নারীকে এখন আর হাওয়ায়

মতন, মেথার মতন, কুসুম গন্ধ রাশির মতন ভাসিয়া চলিবার সময় নাই। তাই বলি কাব্য জগতের সহিত বাস্তব রাজ্যের তুলনা করিলে এটা স্পষ্টই প্রতীত হয় যে কাব্যে যাহা স্ফুটতর হইয়া মানব চিত্তের ভাবপ্রবনতা জাগাইয়া তোলে বাস্তবে তাহাই নানা ঘাত প্রতিঘাতের অনন্ত সংঘর্ষের মাঝে চিত্তের মাধুর্য্য বিনষ্ট করিয়া হৃদয় বৃত্তিকে নিকৃষ্ট কাঠিন্যে পরিপূর্ণ করিয়া ফেলে।

পুরুষ কর্ম্ম ক্ষেত্রের প্রসারতার জন্য নিজকে নানা দেশ নানা জাতির সহিত তুলনা করিয়া ন্যায়ের নিক্তিতে কোথায় তাহার দৈন্য তাহা সারিতে চাহিতে লাগিয়া গিয়াছে। এবং বর্ত্তমানের সহিত নিজ জীবনাদর্শকে গড়িয়া পিটিয়া তুলিতেছে। কিন্তু নারী তার আবেষ্টনের মাঝে বেশী পরিবর্ত্তনের স্রোত বহায় নাই। কারণ তাহাতে শক্তির প্রয়োজন, এবং সে জানে যে তাহাদের অভ্যস্থ জড়তা ভাঙ্গিতে হইলে পুরুষের সবল হস্তের অক্লান্ত সাহায্যের দরকার। নিজকে অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে প্রকাশতার পক্ষে অসম্ভব বলিয়াই ভাবিয়া থাকে। কিন্তু সে সাহায্যের আশা এখনো বহুদূরে পরিয়া রহিয়াছে।

সুপ্রসিদ্ধ সহরের দু একটি স্কুল বোর্ডিং এ ৭।৮ শত মেয়ে শিক্ষা পাইলেই দেশের স্ত্রী শিক্ষা ও আত্মনির্ভতা সম্পন্ন হয় কি? তাছাড়া তারা ভদ্রভাবে সম্ভ্রম বজায় রাখিয়া নিজ পায়ে দাঁড়াইয়া চলিতে পারে এরূপ শিক্ষা এবং কর্ম্মক্ষেত্রের এদেশে একান্ত অভাব। তাই সচল জগেজ স্বরূপ নারী দুর্ভিক্ষ দগ্ধ আত্মীয় স্বজনের স্কন্ধের বোঝা রূপে পরিণত হইয়া পরিয়াছে। এবং তাই ঘড়ে ঘড়ে বিধবার এক বেলার আতপান্ন সংস্থান এবং কুমারীর পিতৃমাতৃহীন পরিজনগৃহ এক অনন্ত দুঃখের আকর স্বরূপ হইয়াছে।

ইহা সত্য যে দেশ তিন প্রকার অধিবাসীতে পূর্ণ থাকে। যথা—ধনী, মধ্যবিত্ত, দরিদ্র। তা কর্ম্মের অপ্রসারতা যখন যথেষ্টই রহিয়াছে তখন দরিদ্রের সংখ্যাই বেশী বুঝিতে হইবে। তৎপর মধ্যবিত্ত, যাহাকে রোজের অর্জ্জনে জীবিকা নির্ভর করিতে হয়। সর্ব্বশেষ ও কম সংখ্যা ধনী।

মানবের নিত্য ব্যবহার্য্য বস্ত্র, আহার্য্য, আশ্রয় সবই বাস্তব রাজ্যে সেই অনর্থের মূল অর্থের কৃপায়ই জুটিয়া থাকে। তাই কাব্য নাটকে তার আধিপত্য যতই কম থাক, কিন্তু বাস্তব জগত তাহাকে নিজ সহস্র বেষ্টনে সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। মানবকে জীবন যাপন করিতে হইলে যেরূপ শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়াকে নিয়মিত রাখিতে হয় তদ্রূপ অর্জ্জনের চেষ্টাকেও সচেষ্ট রাখিতে হয়।

কিন্তু মধ্যবিত্ত ভদ্র ঘড়ের স্ত্রী সম্বন্ধে যাহারা স্বামীর মৃত্যুর সহিতই অপোগণ্ড সন্তানাদি সহ দেবর, ভাসুর প্রভৃতি যে কোন সম্পর্কিত আত্মীয়ের আশ্রয়ে গলগ্রহ রূপে উপনীত হইয়া দুর্ব্বহ ও কষ্টকর জীবন ভারবহন করিতে থাকে তাদের ভবিষৎও একবার উদ্যমশীল পুরুষ জাতির চিন্তনীয় বিষয় নহে কি?

পুরুষ ও নারীর কর্ম্ম ক্ষেত্রের প্রসারতা বাড়াইতে হইবে। তাদের প্রকৃতির বিভিন্নতার সহিত কর্ম্ম শক্তিকেও বিধিমত প্রসারিত করিয়া তুলিতে হইবে। নারীকে বদ্ধ বারির দূষিত পঙ্কিলতা হইতে উদ্ধার করিয়া মহানদীর অনন্ত স্রোত মাঝে মিশাইয়া দিতে হইবে। স্রোত জলে মিশিয়া কুসংস্কারের গণ্ডি অতিক্রম করিয়াই সে অবিমিশ্র শুদ্ধতা প্রাপ্ত হইবে। অন্তরের দৈন্য, কার্য্যের অসামর্থ্যতা দূরিভূত করিয়া পুরুষের প্রত্যেক কার্য্যে প্রত্যেক বিপদে নিজকে সহকারিণী করিয়া তুলিবে, যে ক্ষুদ্র গৃহের রুদ্ধ গণ্ডির বাহিরে যাইবার অবকাশ পায় নাই, সেই ক্ষুদ্রই আজ পূর্ণ হইয়া তাহাকে বিরাট বিশ্বের কর্ম্ম প্রবাহের সহিত পরিচিত করিয়া তুলিবে। বিরাট বিশ্বই তখন তাহার নিকট বিরাট গৃহ ও কর্ম্মক্ষেত্ররূপে প্রতীয়মান হইবে।

বঙ্গদেশ রাজনৈতিক ক্ষেত্র, সমাজ সংস্কার, সাহিত্য পুষ্টি, শিল্প বাণিজ্যের প্রসার প্রভৃতি নানা পথে উন্নতি

চেষ্টার সহিত যদি দেশীয় স্ত্রী জাতির উন্নতি ও মঙ্গলের প্রতি উদাসীন থাকেন তবে তাদের প্রচেষ্টা গৌণ অনিশ্চিতের পশ্চাতে মোহময় স্বপ্নের অলীক বিহ্বলতায় পরিণত হইবে। কারণ তাহারা নিজ কর্ম্ম সহায়দের উপেক্ষিত রাখিয়া নিজেদের দুর্ব্বল করিয়া ফেলিবে।

বিশ্ব মানব স্পরস্পরের সাহচর্য্যের জোরেই নিজেদের শ্রেষ্ঠ আসন দাবী করিতে শিখিয়াছে। এমন কি প্রাণি জগত ও পার্থিব জগত, বিশ্বের প্রতি অণু পরমাণু নিজেদের কি এক নাড়ীর যোগের অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। তাই আজ জীবনের প্রতি কার্য্যে নারীকে নিজের সহিত জড়াইয়া লইতে হইবে। নারীকে সর্ব্ব বিষয়ের যোগ্যতায় পূর্ণ করিয়া তুলিয়া নিজেদের দুর্ব্বলতা ঢাকিয়া ফেলিতে হইবে। বিধাতার সৃষ্ট জীবকে উপেক্ষিত রাখিলে চলিবে না। তাদের জীবন যাত্রার গতি ও পথ নির্দ্দেশ করিয়া হাতে ধরিয়া হাটাইয়া নিতে হইবে। কারণ অনভ্যস্ততায় তারা নিজের পায়ে দাঁড়াইতে ভুলিয়া গিয়াছে।

শ্রীনীহারকুমারী দেবী।

উন্মনার প্রতি

(১)

ওগো সুন্দরী যুবতী !

প্রাসাদের 'পরে বসি' কার তরে
নিন্দিছ নিজ নিয়তি !
অলকে কুসুম গেল যে শুকায়ে,
অধরের হাসি গেল যে মিলায়ে,
পূবে চাঁদ ওঠে, নভে তারা ফোটে,
স্বজনী !
হৃদয়ের ব্যথা ডুবায়ে হৃদয়ে
পুলকিত কর রজনী !

(২)

ওগো চম্পক বরণা !

যৌবন-জ্বালা পুষিলে এমনি
অন্তরে জ্বলে কামনা !
চঞ্চল চোক্ চাহে চারিধার,
খোঁজে অজানারে সবার মাঝার,
দুরু দুরু হিয়া, পরাণ-পাপিয়া
কাঁদে গো।
সদা প্রাণ মন রহে উচ্চাটন,
আঁখি জলে দিঠি বাঁধে গো!

(৩)

ওরা কি বুঝিবে মানিনী !

শুকায়ে গিয়াছে হৃদয় ওদের,
পোহায়েছে সুখ-যামিনী !
আঁখি ঢুলু-ঢুলু, আলু থালু কেশ,
নিশা-জাগরণ-আলস-আবেশ,—
ওরা চলে যায়, ফিরে না তাকায়
নূতনে !
প্রণয়ের মধু ফুরায়ে গিয়াছে,
বরণ করিছে মরণে !

(৪)

ওগো চঞ্চলা চতুরা !

অঞ্চল তব উড়িছে হাওয়ায়,
পবন-পরশ-বিধুরা !
লুঠিয়া চিত্ত লুটিছে আঁচল,
প্রতি নিমেষেতে পরাণ পাগল,—
সত্বর' ত্বরা বেদনায় ভরা
হিয়ারে !
দুজনে দুখানে প্রাণে প্রাণ টানে,
কি জানি কে চায় কাহারে ;

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

গ্রন্থ সমালোচনা—

(১) (**A short History and Ethnology of the Cultivating Pods.**) শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ করণ প্রণীত। সম্ভবতঃ আদম-সুমারী কর্ত্তৃপক্ষগণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ইংরেজী ভাষায় লিখিত। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য এই যে আগামী আদমসুমারীতে পদ জাতিকে depressed class ভুক্ত না করিয়া ব্রাত্যক্ষত্রিয় লেখা হউক। গ্রন্থকার শাস্ত্রবচন এবং দেশীয় ও বিদেশীয় লেখকগণের মত উদ্ধৃত করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে 'পদ' অনার্য্য বা হীন জাতি নহে ইহারা কৃষিজীবী এবং ব্রাত্যক্ষত্রিয়। পদ জাতি সংখ্যায় নিতান্ত কম নহে। ইহাদিগকে পতিত শ্রেণীতে রাখা সমাজের পক্ষে হিতকর নয়। আভিজাত্যের গৌরব মানুষ মাত্রেরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম—কাজেই লেখকের উদ্দেশ্যের সহিত আমাদের সহানুভূতি আছে। কিন্তু যিনি অতীত লুপ্ত ইতিহাসের ক্ষীণসূত্র আবিষ্কার করিয়া নিজকে উন্নত জাতি বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন এবং ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ তাঁহাদিগকে অনুন্নত মনে করায় এত ক্ষোভ এবং ঘৃণা অনুভব করেন তাঁহার পক্ষে তাঁহার চেয়ে অপেক্ষাকৃত হীন জাতির প্রতি এরূপ ঘৃণার ভাব পোষণ করা অনুদারতার পরিচায়ক। লেখক এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা খানিতে জাতি বিদ্বেষের এবং ভিন্ন মতাবলম্বীগণের বিরুদ্ধে যেরূপ তীব্র বিষ উদ্গীরণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের সম্বন্ধে যেরূপ অসংযত ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার ক্ষুদ্র সংকীর্ণতাই প্রকাশ পাইয়াছে। বিশেষতঃ তিনি উপসংহারে যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে পদ জাতি ক্ষত্রিয় হইয়াও এতকাল যে পতিত ও অনাদৃত বলিয়া গণ্য হইয়া আসিয়াছে তাহার জন্য তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণই প্রধানতঃ দায়ী। লেখক যদি লেখনী সংযত করিয়া একটু ধীর স্থির ভাবে শাস্ত্র বচন এবং যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়া নিজ প্রতিপাদ্য বিষয় প্রমাণে মন দিতেন তাহা হইলে ইহার মূল্য আরো বেশী হইত।

(২) বিক্রমাদিত্য।

এক খানি ঐতিহাসিক উপন্যাস। শ্রীযুক্ত ভবেশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত। ৫২০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ছাপা বাঁধাই ভাল। লেখক এই জেলার অন্তর্গত আমুনিয়া গ্রাম নিবাসী এবং একজন উৎসাহী সাহিত্যানুরাগী যুবক। আমাদের পূর্ব্ব বঙ্গে প্রকৃত সাহিত্য চর্চ্চা দিন দিন যেরূপ কমিয়া যাইতেছে তাহাতে কোন নবীন লেখককে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে দেখিলে মনে আশার সঞ্চার হয়। ভবেশ বাবুর অন্নচিন্তা নাই, অবসরেরও অভাব নাই। তিনি যদি ধৈর্য্য সহকারে সংযত ভাবে সাহিত্যের সাধনা করেন এবং সাহিত্যের প্রকৃত সৌন্দর্য্য নিজে হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহা ভাষায় ফুটাইতে যত্ন করেন তাহা হইলে কালে তিনি ঔপন্যাসিকের পদ লাভ করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। বিক্রমাদিত্যে তিনি সুদূর অতীত কালের একখানি ঐতিহাসিক চিত্র আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু বোধ হয় তাঁহার প্রথম চেষ্টা বলিয়াই তিনি ইহাতে আধুনিক ও অতীতের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। নামে অতীত হইলেও এই উপন্যাসের চরিত্র গুলি আধুনিক, ঔপন্যাসিক পাপ এবং পুণ্য দুই রকম চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াই তাঁহার যাহা সৃষ্টি উদ্দেশ্য তাহা সাধন করিয়া থাকেন। পাপের চিত্রের নগ্ন বীভৎসতা না দেখাইয়াও এবং সুরুচির সীমা লঙ্ঘন না করিয়াও পাপের কদর্য্যতা উদ্ঘাটিত করিয়া পুণ্যের মহিমময় চিত্র লোক চক্ষে ফুটাইয়া তুলিতে পারেন। ভরসা করি লেখক এ বিষয়ে ভবিষ্যতে একটু যত্নবান হইবেন। এই উপন্যাসের চরিত্র অসংখ্য। এইরূপ বৃহদায়তন চরিত্র বহুল গ্রন্থে মূল সূত্র রক্ষা করিয়া চলা অতি কঠিন। নবীন লেখকের পক্ষে তাহা আরো কঠিন এবং তজ্জন্য উপন্যাস খানিতে কোন একটা চরিত্রই বিশেষ পরিস্ফুট হয় নাই। চরিত্র

গুলির ভিতর জয়মল এবং প্রভার চরিত্রই কিছু উল্লেখ যোগ্য। চুণিলালের চরিত্রও মন্দ হয় নাই।

ভাষা সম্বন্ধে লেখক ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে তিনি সাহিত্য সম্রাট' বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসরণ করিয়াছেন। স্থানে স্থানে তাঁহার কথা সত্য কিন্তু স্থানে ২ তাঁহার ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। যেমন—"সহসা বজ্রাঘাতে মস্তিষ্ক বিদীর্ণ হইলেও তিনি এতদূর স্তম্ভিত ও বিমর্ষিত হইতেন না। বালকের সুকুমার কান্তি স্বচ্ছনির্ম্মল মুখশ্রী তখনই যেন বিষাদকালিমায় আচ্ছন্ন হইল; ক্ষোভে দুঃখে তাঁহার তেজপূর্ণ অথচ সরলতাব্যঞ্জক নয়নদ্বয় বিদ্যুদ্গর্ভ জলদখণ্ডের ন্যায় শোভা ধারণ করিল; বিস্তৃত-বিকূর্ণিত পল্লবদ্বয় পলক বিরহিত হইয়া স্থির ভাবে রহিল; নৈরাশ্য-লেখ-প্রকটক অকুঞ্চিতশ্রী অর্দ্ধচন্দ্র প্রসন্নললাট স্বেদবিন্দু শোভিত হইয়া নিহারসিক্ত' প্রাভাতিক পদ্মমুকুল ছটা ধারণ করিল; রক্তিম ওষ্ঠাধর চিত্তোদ্বেগবশত পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল।"

লেখকের ভাষা একদিকে যেমন অপ্রচলিত দুরূহ শব্দালঙ্কারে নিপীড়িত ও দুর্ব্বোধ্য আবার স্থানে স্থানে তেমনি ইতর গ্রাম্য ভাষা প্রয়োগে শ্রুতিকঠোর হইয়াছে। লেখক নবীন এবং এই তাঁহার প্রথম উদ্যম। তজ্জন্য তিনি ভূমিকায় যেরূপ বিনীত ভাবে ত্রুটী স্বীকার করিয়াছেন তাহাতে তীব্র সমালোচনা করিয়া তাঁহার উদ্যম নষ্ট করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তবে তিনি আমাদিগকে আশা দিয়াছেন যে শীঘ্রই তাঁহার রচিত আরো ২।১ খানি গ্রন্থ প্রকাশিত করিবেন। ভাষার উপর তাঁহার অধিকার আছে॥ ভবিষ্যতে যদি তিনি চারিদিকে সামঞ্জস্য করিয়া "গতি" পরিত্যাগ করিয়া মাঝামাঝি ভাষা ব্যবহার করেন এবং ক্রিয়া পদ গুলিতে 'দিতেম' 'কর্ত্তেম' 'হচ্ছে', 'কর্চ্ছে', প্রভৃতি প্রাদেশিক শব্দ ব্যবহার না করেন তাহা হইলে তাঁহার গ্রন্থ সুমধুর হইবে এবং তিনি সাহিত্যিকের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই।

"ন্যায়চঞ্চু"

সাহিত্য-সংবাদ (১)

রাজগঞ্জ লাইব্রেরী।

রাজগঞ্জ লাইব্রেরীর দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য নিম্নোক্ত পদক প্রদত্ত হইবে।

১। গিরিশ চন্দ্র ঘোষ পদক।
বিষয়—হাস্যরসে দ্বিজেন্দ্রলাল ও অমৃতলাল।

২। রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী পদক।
বিষয়—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "বিরাজবৌ" এর চরিত্র সমালোচনা"।

৩। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পদক।
বিষয়—পল্লী গ্রামের অবনতির কারণ ও উন্নতির উপায়।

(কেবল ম্যাট্রিকিউলেসন্ ছাত্রদিগের জন্য)

আগামী ২৯শে ফাল্গুনের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে।

শ্রীবগলাপ্রসন্ন মল্লিক, শ্রীচারুচন্দ্র পাল।
সম্পাদক, রাজগঞ্জ লাইব্রেরী,
শাঁখরাইল, পোঃ, হাওড়া।

বীণাপাণি রৌপ্য পদক। (২)

আগামী ৩১শে চৈত্র পাবনা কিশোরীমোহন ষ্টুডেন্টস্ লাইব্রেরীর সপ্তম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে লাইব্রেরীর অন্যতম শুভানুধ্যায়ী শ্রীযুক্ত সঞ্জীবচন্দ্র লাহিড়ী বি-এ মহাশয় বঙ্গ ভাষায় শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ লেখককে দুইটী পদক পুরস্কার দিবেন। প্রবন্ধের বিষয়ঃ—(ক) লাইব্রেরী ও তাহার উপকারীতা, (খ) স্ত্রীশিক্ষা ও তাহার প্রয়োজনীয়তা। এই দুইটী প্রবন্ধ ১৫ই চৈত্রের মধ্যে লাইব্রেরীর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত জাহ্নবীচরণ ভৌমিক বি-এল মহাশয়ের নামে পাঠাইবেন ইতি।

দেবেন্দ্র প্রয়াণ

("বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে" পঠিত)।

১

পূজার মন্দিরে ভারতীর
প্রাণের প্রদীপ যাঁরা জেলেছিলা আনন্দে গভীর,
মধুর উদাও সুরে নিতি নিতি রচি' নব গান
চরণ সরোজে যার আত্মহারা করিলেন দান,
তাঁরা আজি একে একে হায়,
শূন্য করি সারা বসুধায়
কোন্ সে অজ্ঞাত লোকে লইছেন নীরবে বিদায়!

২

স্বপ্ন হেন আজি মনে হয়,
কোথায় নবীন মধু "কান্ত" হেম গোবিন্দ অক্ষয়!
ছিঁড়ে গেছে বীনা-তন্ত্রী, থেমে গেছে ললিত ঝঙ্কার,
আকুল তরঙ্গ-ভঙ্গে কল্লোলিনী নাহি বহে আর।
বসন্তের অবসান গাহি
আজি' বহ্নি দশ দিক্ দাহী,
শেষ পিক্ চলে গেল নন্দনের দীর্ঘ পথ বাহি!

৩

"মঙ্গলের" চির-উপাসক,
"অশোক গুচ্ছের" কবি, কল কণ্ঠ "অপূর্ব্ব" গায়ক,
শোকের কুজ্ঝটি জালে আবরিয়া মায়ের আনন,
চলে গেল! সত্য একি? অশ্রু যেগো মানে না বন্ধন!
এই মত সরল উদার,
এই মত জ্ঞানের ভাণ্ডার,
সৌন্দর্য্যের ভক্ত হেন, কত যুগে মিলিবেগো আর!

৪

জননীর বেণী যেগো নাই!
নিভিয়াছে জ্যোতিষপুঞ্জ অন্ধকার ঘেরে চারি ঠাঁই!
মৃত্যু! সে কি জগতের চিরন্তন রহস্য নিগূঢ়!
স্নেহের ব্যোমানলে ঝরে বুঝি তর্পণ অশ্রুর!
পূর্ণ করি আকাশ বাতাস
পড়ে থাকে মর্ত্ত্যে দীর্ঘশ্বাস,
অমৃত্য অমৃত যাবে নব জন্ম পায় কি বিকাশ?

৫

কে কহিবে—কে জানে সন্ধান—
কৃষ্ণ যবনিকাখানি বিশ্ব পটে নিত্য বিদ্যমান।
মানবের ক্ষুদ্র শক্তি ফিরে আসে মানি' পরাজয়,
শান্তিহারা কেঁদে মরে প্রিয়হারা ব্যথিত হৃদয়।
ক্রুর কাল হাসে অট্টহাসি,
সিন্ধু তীরে বাজে রুদ্র বাঁশী
সকল বন্ধন টুটি' ছুটে জীব ঘূর্ণাবর্ত্তে ভাসি'।

৬

হে কবি! হে সুহৃদসত্তম!
কোথা যাও? ফিরে চাও! তুমি কভু নহত নির্ম্মম!
তোমার অভাবে আজি কাব্যলক্ষ্মী বিধবার মত
শ্রীহীনা, নিরাভরণা, প্রাণোন্মাদী সরসতা গত।
বঙ্গমাতা বজ্রাহতা প্রায়
সংজ্ঞাহারা লুণ্ঠিতা ধূলায়—
কে সান্ত্বিবে? দীপ্ত চিতা মুহুর্মুহুঃ গ্রাসিবারে চায়!

৭

কে নিভাবে এ মহা অনল?—
কোথা শান্তি? অবিরাম ঝঞ্ঝা যদি মথে ভূমণ্ডল
কোথা হর্ষ? ক্ষণে ক্ষণে নামে যদি অশ্রুর প্লাবন।
অসহ এ জননীর নিদারুণ মরম-বেদন।
অমঙ্গলে বিরাজে মঙ্গল
মানিবারে বুকে নাহি বল—
কার অভিশাপে হায়, তাপ-দগ্ধ ফুল্ল শতদল।

৮

বানী-কুঞ্জে জ্বলে হুতাশন—
কোন্ মহারুদ্রদেব করে একি হোম উদযাপন।
শোকার্ত্ত সোদরবৃন্দ। এস আজি অগ্নিহোত্রী যোদ্ধা।
তা'রি সনে দিব যোগ শোকানল লয়ে প্রাণ জোড়া।
নিত্য নিত্য অশ্রু হবিঃ দিয়া
এ অনল রাখিব জ্বালিয়া
যদি কভু পুণ্য-চক্র মৃত-চিত্ত তুলে সঞ্জীবিয়া।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।
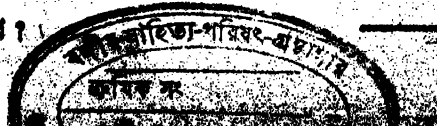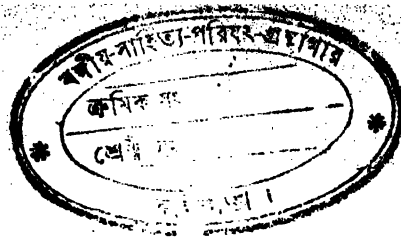
১০ম বর্ষ ফাল্গুন ১৩২৭ ১১শ সংখ্যা

গৃহ্যে গৃহ।

বৈদিক যুগে গৃহ কি প্রকারের ছিল তাহার সম্যক্ পরিচয় আমরা পাই গৃহ্য সূত্রে। বেদে গৃহ বিষয়ক কতকগুলি মন্ত্র আছে, তাহা হইতে আমরা গৃহ সম্বন্ধে কতকটা মোটামুটি ধারণা করিতে পারি; কিন্তু সেই মন্ত্রগুলির প্রকৃত তাৎপর্য্য গৃহ্য---সূত্রে তাহাদের প্রয়োগ দেখিয়া গ্রহণ করিতে হয়।

বেদের সঙ্কলন হইয়াছিল যজ্ঞাদিতে তাহাদিগের ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া। ঋগ্বেদ কি যজুর্ব্বেদ কি সামবেদ কি অথর্ব্ববেদ প্রথমে কি অবস্থায় রচিত হইয়াছিল তাহা আমরা বলিতে পারি না। যখন ইঁহাদের সঙ্কলন হয় তখন এগুলি সমস্তই যজ্ঞকালে প্রযুক্ত মন্ত্র স্বরূপে অপৌরুষেয় বলিয়া প্রচলিত ছিল। ইঁহাদের সঙ্কলন কর্ত্তা, যজ্ঞের প্রয়োজন অনুসারে প্রথমতঃ এই মন্ত্রগুলির চারিভাগ এবং প্রত্যেক ভাগের মধ্যে বিশিষ্ট খণ্ডে বিভক্ত করেন। কোনও একটি বিশেষ খণ্ডের বা সূক্তের ভিতর যে সকল মন্ত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে সেগুলি সকল স্থলেই পরস্পর সংবদ্ধ নহে এবং সেগুলি যে বাস্তবিক সেই ক্রম অনুসারেই রচিত হইয়াছিল তাহা জোর করিয়া বলা চলে না। পরবর্ত্তী কালে আবার এইরূপে মন্ত্রগুলির বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রয়োগের ক্রম অনুসারে পুনঃ সঙ্কলিত হইয়াছিল. যথা সামবেদীয় মন্ত্র ব্রাহ্মণ। ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব ঠিক এইরূপ প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যেই পূর্ব্বকালে সঙ্কলিত হইয়াছিল।

এই কারণে প্রায়ই দেখিতে পাই যে একই সূক্তের ভিতর যে কতকগুলি ঋক একত্র গ্রথিত হইয়াছে, অনেক অনেক সময় তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু ব্রাহ্মণে বা শ্রৌত বা গৃহ্য সূত্রে সেই সকলের যজ্ঞে প্রয়োগ দেখিলেই তাহাদের সম্বন্ধ আবিষ্কার করা যায়। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল যে এইরূপ উদ্দেশ্যে যজ্ঞের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সঙ্কলিত হইয়াছিল তাহা পণ্ডিতেরা লক্ষ্য করিয়াছেন কিন্তু

[illegible] এ কথা প্রযুজ্য। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলে ৫৫ সূক্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সূক্ত গৃহ্যে কিরূপ ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা দেখিয়া ইহার প্রয়োজন এবং সম্বন্ধসূত্র আবিষ্কার করিতে হয়। দশম মণ্ডলের ৮৫ সূক্ত এ কথার একটি [illegible] উদাহরণ। ইহাতে যে সকল মন্ত্র নিবদ্ধ আছে তাহা বিবাহে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। অথচ এই সূক্তে সেই সমুদয় মন্ত্রগুলি পর পর যথা ক্রমে এমন ভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে যে তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয় বা কোন্ মন্ত্র কি প্রয়োজনে কাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে তাহা [illegible] মন্ত্র অবলম্বন করিয়া বলা অসম্ভব। অথচ ঋগ্বেদীয় শাখা নিচয়ের গৃহ্যে সেই ঋক্‌গুলির প্রয়োগ দেখিলে তাহা স্পষ্ট বোধগম্য হয়।

এই জন্য বেদের বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইলে ব্রাহ্মণে তাহার ব্যাখ্যা ও শ্রৌত বা গৃহ্য সূত্রে তাহার প্রয়োগ দেখিতে হইবে। সকল সময় অবশ্য ব্রাহ্মণের ব্যাখ্যা বা কল্পসূত্রের প্রয়োগ অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। এমন অনেক স্থান আছে যেখানে কোনও বিশিষ্ট মন্ত্রের আদিম প্রকৃত অর্থ বিস্মৃত হইয়া ব্রাহ্মণ বা কল্পসূত্র তাহার একটা কাল্পনিক (হয়তো বা ক্রমাগত) ব্যাখ্যা বা প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা নিঃসংশয়ে ঋকের আদি তাৎপর্য্য বলিয়া ধরা যায় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৮৫ সূক্তে "নীল লোহিতা"দি ঋকের উল্লেখ করা যায়। এই ঋকের তাৎপর্য্য ও প্রয়োগ সম্বন্ধে বিভিন্ন গৃহ্যসূত্রে [illegible] ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ দেখা যায়। [illegible] তার একরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ সম্বন্ধে এই মতভেদ হইতেই বুঝা যায় যে [illegible] কালে এই ঋকের প্রকৃত তাৎপর্য্য লোকে বিস্মৃত [illegible] এমনি সকল কাল্পনিক ব্যাখ্যার আশ্রয় লইয়াছিল।

অথর্ব্ব বেদের দুইটি সূক্ত * গৃহ বিষয়ক, তাহারাও এই শ্রেণীর। এই দুইটি সূক্ত এবং ইহার তুল্য তৈত্তিরীয় সংহিতা ও বাজসনেয়ী সংহিতার সূক্ত এবং সামবেদীয় মন্ত্র ব্রাহ্মণের মন্ত্র, বিভিন্ন শাখার গৃহ্যসূত্রে গৃহ নির্ম্মাণ ও গৃহভঞ্জন ঘটিত ধর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যবহৃত হইয়াছে। সেই সমুদয় মন্ত্রের সমষ্টি এই দুইটী সূক্ত; ইহার প্রত্যেকটি মন্ত্র এক একটি বিশিষ্ট প্রক্রিয়ার সহিত উচ্চারণ করিতে হয়। সেই সমুদয় অনুষ্ঠান ও প্রক্রিয়া গৃহ্যসূত্রে নানা স্থানে বর্ণিত আছে। † তাহার দ্বারাই এই সূক্তের সম্যক ব্যাখ্যা সম্ভব। গৃহ সম্বন্ধে গৃহ্যে আরও বিস্তৃত পরিচয় আমরা পাই বলিহরণের বর্ণনায়। গৃহের নানা স্থান হইতে বলিহরণ করিতে হইত, তাহার বর্ণণায় আমরা গৃহের বিভিন্ন অংশের পরিচয় ও সে গুলির অবস্থান সম্বন্ধে কতকটা ধারণা করিতে পারি।

ঋগ্বেদে "হর্ম্ম্য" শব্দের উল্লেখ আছে। তাহা ছাড়া অসুরদিগের অয়সী পুরীর উল্লেখ আছে। ইহা হইতে এ কথা অনুমান করা যায় না যে সেকালে ধাতু বা ইট বা পাথরের নির্ম্মিত গৃহাদি ছিল। মেগাস্থিনীস তাঁহার ভারত বৃত্তান্তে এ প্রকার কোন ও গৃহের উল্লেখ করেন নাই তবে কাষ্ঠ নির্ম্মিত প্রাসাদের উল্লেখ করিয়াছেন। বেদের সময় যে তাহাও ছিল কিনা সন্দেহ। যজুর্ব্বেদ ও অথর্ব্ববেদ এবং সামবেদীয় মন্ত্র ব্রাহ্মণের মন্ত্রাদি দেখিয়া যে ধারনা হয় তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে বেদের কালে গৃহ প্রধানতঃ বাঁশের তৈয়ারী এবং খড় দিয়া ছাওয়া হইত।

অথর্ব্ববেদের ৩.১২ মন্ত্র গৃহ নির্ম্মাণ কালে ও ৯।৩ মন্ত্র, ঘর ভাঙ্গিবার সময় ব্যবহৃত হইত। গৃহ্যসূত্রে সেই প্রক্রিয়ার যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা হইতে দেখা যায়

---

* ৩, ১২ ও ৯, ৩।

† যথা সাংখ্যায়ন, ৩, ২। আশ্বলায়ন ২,৭ প্রভৃতি। পারস্কর ৩, ৪ প্রভৃতি। গোভিল ৪, ৭। খাদির [illegible] প্রভৃতি। হিরণ্যকেশী ১, ২৭-২৮। আপস্তম্ব ১৭।

যে প্রথমে গর্ত খুঁড়িয়া খুঁটি পোতা হইত। চারিটি কোণের খুঁটির নাম অথর্ব্ববেদে উপমিৎ। মধ্যের খুঁটিগুলির নাম প্রতিমিৎ। 'ধন্না'র নাম বংশ, সম্ভবতঃ ইহা বাঁশের হইত।

ঘরের একটি অংশের নাম 'পক্ষ'। ইহার অর্থ লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। Zimmer * পক্ষ অর্থ বুঝিয়াছেন মাঝের খুঁটীগুলি। Whitney ও Lauman তাঁহাদের অনুবাদে পক্ষ অর্থে লিখিয়াছেন sides অর্থাৎ বোধ হয় বেড়া। অথর্ব্ববেদের ৯।৩।২১ মন্ত্রে দ্বিপক্ষ, চতুষ্পক্ষ, ষট্‌পক্ষ, অষ্টপক্ষ ও দশপক্ষ "শালা" বা গৃহের উল্লেখ আছে। এখানে পক্ষ অর্থে চালা বুঝিলেই বোধ হয় ঠিক হইবে। আট খুঁটি বা দশ খুঁটি ঘরের মধ্যে প্রভেদের কোনও সার্থকতা নাই। পক্ষান্তরে এই ঘরগুলিকে ষট্‌কোণ অষ্টকোণ বা দশকোণ (Whitey র মতে তাহাই সদর্থ) বলিয়া অনুমান করা যায় না। কেন না তাহা হইলে চারিটি কোণের খুঁটির যে প্রাধান্য এই মন্ত্রে দেখিতে পাই তাহার কোনও তাৎপর্য্য থাকে না। অথচ চারিটি কোণের খুঁটিই যে প্রধান তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। এই চারিটি প্রধান খুঁটির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই গৃহকে চতুষ্পদ হস্তীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। (৯।৩।১৭) কিন্তু পক্ষ অর্থে চালা ধরিয়া লইলে আগা গোড়া সদর্থ হয় এবং পক্ষের সংখ্যা অনুসারে গৃহের শ্রেণী বিভাগের একটা সার্থকতা হয়। দোচালা, চৌচালা, ছয়চালা ও আটচালা ঘর এখনও সুপরিচিত। দশচালা ঘর হওয়াও এমন কিছু আশ্চর্য্য নহে।

এই গৃহ বা 'শালা' কেবল মাত্র একখানি খড়ের ঘর। অথচ এই ঘরকে লক্ষ্য করিয়াই গৃহকে, "হবির্ধান," "অগ্নিশালা" ও "পত্নীনাং সদনং" বলা হইয়াছে (৯।৩।৭) আবার পরে এই গৃহকে লক্ষ্য করিয়াই যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে বুঝা যায় যে গরু বাছুরও এই ঘরে থাকে (৯।৩।২১)। কেবলমাত্র এই সূক্ত আশ্রয় করিয়া সে কালের স্বরূপ নির্ণয় করিতে হইলে কাজেই বলিতে হয় যে এই এক ঘরেই মানুষ ও গরু এক সঙ্গে বাস করিত এবং এখানেই গৃহ্যাগ্নি প্রজ্বলিত হইত, রন্ধনাদিও হইত। অথর্ব্ব বেদের যুগে যে তাহা একেবারেই অসম্ভব তাহা আমি বলিতে চাই না। কিন্তু গৃহ্য সূত্রে যেরূপ গৃহের বর্ণনা পাই তাহাতে এ সিদ্ধান্ত খুব সমীচিন বলিয়া মনে হয় না। এ কথা মনে করা একেবারেই অসঙ্গত নয় যে যদিও পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রে কেবলমাত্র একটি ঘরের প্রতিষ্ঠা বা ভঞ্জনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, পরবর্ত্তী মন্ত্রগুলিতে গৃহ বা শালা অর্থে এইরূপ ভাবে প্রতিষ্ঠিত কতকগুলি ঘরের সমষ্টি বোধিত হইয়াছে। অন্ততঃবৌধায়ন গৃহ্যের বলিহরণ প্রকরণে গৃহের যে পরিচয় পাই তাহাতে এই সিদ্ধান্ত সমীচিন বলিয়া মনে হয়।

ঘরের চাল খড়ের দ্বারা ছাওয়া হইত। অথর্ব্ববেদের ৩।১২।৫-৬ মন্ত্রে গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে "তৃণং বসানা যুমনা অদি ত্বম্" বলা হইয়াছে। এইরূপ ৯।৩।১৭ মন্ত্রে গৃহকে তৃণাবৃত ও "পলদা" পরিহিত বলা হইয়াছে। পলদা অর্থে ঘাসের আঁটি বুঝায়। তৃণ ও পলদা এই মন্ত্রে স্বতন্ত্র ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে এবং পলদা গৃহের বসন বলিয়া উক্ত হইয়াছে; ইহা হইতে বুঝা যায় যে এখানে 'পলদা' আচ্ছাদন বিষয়ে প্রযুক্ত হয় নাই, আবেষ্টনের অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। এ অনুমান সঙ্গত হইলে বুঝিতে হইবে যে ঘরের বেড়াও খড়ের দ্বারা দেওয়া হইত। বন্ধনের জন্যও খড়ের দড়ি ব্যবহৃত হইত তাহা ৯।৩।৪ মন্ত্রে প্রাণাহ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

গৃহ সম্পর্কে এ স্থলে সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক না হইলেও ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সমস্ত গৃহবাসীকে ঘুম পাড়াইবার উদ্দেশে এই মন্ত্র (ঋগ্বেদ ৭।৫৫।৮) ইহাতে "প্রোষ্ঠেশয়া, বহ্যেশয়া নারীর্যা তল্পশীবরী" তাহাদিগের উল্লেখ আছে। ইহাতে দেখা

* Altindischen Leben h. 152

[illegible] যে কেবল ঘরে বিছানায় (তল্প) নয় "প্রোষ্টে" (দাওয়ায় ?) এবং বাহিরেও নারীরাও শয়ন করিতেন।

গৃহ্যসূত্রে গৃহের ভূমি নির্ব্বাচন হইতে আরম্ভ করিয়া গৃহপ্রবেশ ও অগ্নি প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত সমুদয় প্রক্রিয়াই বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা আছে। ভূমি নির্ব্বাচন সম্বন্ধে [illegible] প্রকার ব্যবস্থা আছে, তাহার মধ্যে কতকগুলি বড় কৌতুকাবহ। জাতিভেদ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ভূমি যোগ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ব্রাহ্মণের জন্য সাদা মাটি, ক্ষত্রিয়ের লাল মাটি ও বৈশ্যের কালো মাটি প্রশস্ত। (১) আশ্বলায়ন (২।৮) ভূমি নির্ব্বাচন বিষয়ে দুইটি ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহাও কৌতুবাহ। এক হাঁটু পরিমাণ গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহা সেই গর্ত্তের মাটি দিয়াই ভরিয়া দিতে হইবে। যদি মাটিতে গর্ত্ত ভরিয়া উচু হইয়া উঠে তবে ভূমি উৎকৃষ্ট; যদি গর্ত্ত ভরিয়া ভূমির সহিত সমতল হইয়া যায় তবে ভূমি মধ্যম। আর যদি গর্ত্তটি সম্পূর্ণ না ভরিয়া যায় তবে ভূমি বাসের অযোগ্য। দ্বিতীয় ব্যবস্থায়, ঐরূপ গর্ত্ত করিয়া, সূর্য্যাস্তের পর ঐ গর্ত্ত জলে পরিপূর্ণ করিয়া ভরিয়া দিতে হইবে। পরের দিন প্রভাতে যদি গর্ত্তে জল থাকে তবে ভূমি উৎকৃষ্ট বলিয়া জানিবে। যদি জল না থাকিলেও, মাটি ভিজিয়া থাকে তবে উহা মধ্যম। আর যদি ইহা একেবারে শুকাইয়া গিয়া থাকে তবে সে ভূমি বাসের অযোগ্য। এই দুইটি পরীক্ষার মধ্যে কোনও বৈজ্ঞানিক তথ্য নিহিত আছে কিনা বিজ্ঞান বিদ্‌গণ নির্ণয় করিবেন। আপাত দৃষ্টিতে এ দুইটি হইতে ইহাই মনে হয় যে ঋষিগণের মতে খটখটে শুকনো এবং porous জমি গৃহনির্ম্মাণের উপযুক্ত নয়, ভিজে আটাল মাটির জমিই প্রশস্ত। এ ব্যবস্থা পঞ্জাব বা উত্তর পশ্চিমে সুব্যবস্থা হইতে পারে কিন্তু জল বহুল সরস বঙ্গদেশে বোধ হয় ইহার উল্টা ব্যবস্থাই সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

যে খানে ঘর তুলিতে হইবে সে স্থান উত্তর পশ্চিম হইতে দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে ঢালু হওয়া দরকার। (১) পারস্কর ভিন্ন ভিন্ন ঘরের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহার মতে গৃহের জন্য নির্ব্বাচিত ভূমি এমন হওয়া দরকার যে চারিদিক হইতে জল আসিয়া মধ্য দেশে জমিয়া বাহির হইয়া যায়। যেখানে জমিয়া জল বাহির হইয়া যায় সেখানে ভাণ্ডার আর ভূমির মধ্যস্থলে বৈঠকখানা করা বিধি। (২)

ভূমির উপর কি উদ্ভিদ জন্মে তাহাও নিরীক্ষণ করা আবশ্যক। গোভিল ও খাদির গৃহ্যমতে ভূমি সমতল ও তৃণাবৃত হওয়া আবশ্যক। পারস্কর মতে কুশ ও বিরণতৃণ প্রশস্ত। গোভিল ও খাদির মতে ভিন্ন ভিন্ন তৃণে ভিন্ন ভিন্ন গুণ লক্ষিত হইয়াছে, যদি দর্ভতৃণ থাকে তবে ব্রহ্মবর্চস্য হয়, বৃহত্তৃণে বল হয় ও মৃদুতৃণে পশব্য অর্থাৎ ইহাতে পশু বাহুল্য হয়। (৩) এই প্রকারে কি কি ওষধি বা বৃক্ষ ভূমির উপর থাকা ভাল বা মন্দ সে বিষয়ে নানারূপ ব্যবস্থা আছে।

ঘরের দ্বার কোন্ দিকে থাকিবে সে বিষয়েও এইরূপ ব্যবস্থা পাই। উত্তর দ্বারী ঘর হইলে পুত্র ও পশু হয়, পূর্ব্ব দ্বার হইলে ধন ও যশ হয়, দক্ষিণ দ্বার হইলে সর্ব্ব কামনা সিদ্ধ হয়। (৪) পশ্চাতের দ্বার বা 'অনুদ্বার' 'গেহদ্বার' বা গৃহের সম্মুখ দ্বারের সোজাসুজি

---

(১) গৌরে ভূমিভাগে ব্রাহ্মণো, লোহিতে ক্ষত্রিয়; [illegible] বৈশ্যো [illegible] জোষয়েৎ। খাদির গৃহ্য ৪।২।৬। [illegible] গোভিল ৪।৭।৫—৭; আশ্বলায়ন ২।৮, ৬-৮ [illegible] ব্রাহ্মণের শ্বেত, ক্ষত্রিয়ের রক্ত, বৈশ্যের পীত মৃত্তিকা' [illegible]

(১) যতোদকম্ প্রত্যগুদীচিম্ প্রবর্ত্ততে। খাদির ৪।২।৭। গোভিল মতে পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব বা উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে। ৪।৭।৩।

(২) পারস্কর গৃহ্য, ২।৭।৭-১০

(৩) দর্ভসম্মিতম্ ব্রহ্মবর্চস্যম্, বৃহত্তৃণৈর্বলাম্ মৃদুতৃণৈঃ পাশব্যম্।' খাদির ৪।২।৯-১১; গোভিল ৪।৭।৯-১১

হওয়া উচিত নয়, এবং যার এক... হওয়া উচিত নয় যাহাতে বাহির হইতে ভিতরের সব দেখা যায়।

গৃহ প্রতিষ্ঠার যজ্ঞের ব্যবস্থা বিভিন্ন গৃহ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার আছে। প্রত্যেক খুঁটির গর্ত্তে ঘি ও অন্যান্য মন্ত্রপূত বস্তু ঢালিয়া শমী কাষ্ঠ তাহাতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। তাহার পর খুঁটিগুলির উপর বংশ যোজনায় মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। এই প্রকার প্রত্যেক প্রক্রিয়ার সঙ্গে কতকগুলি অনুষ্ঠান আছে। আমার বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়ে সেগুলির বিস্তারিত উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

পারস্কর গৃহ্যে একটী স্বতন্ত্র সভাগৃহ ও ভাণ্ডারের উল্লেখ আছে। সভাগৃহ বোধ হয় বৈঠকখানার অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহা প্রায়ই দ্যূত ক্রীড়ার জন্য ব্যবহৃত হইত বলিয়া পারস্কর ব্যবস্থা দিয়াছেন। কোন স্থানে এই গৃহ স্থাপিত করিলে ইহাতে দ্যূত ক্রীড়া হইবে না। ভাণ্ডারে ধন ধান্য থাকিত, ইহাই সম্ভবতঃ বৌধায়ন গৃহ্যে ধনধান্যাবকাশ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। উলূখল মুষলের এক স্বতন্ত্র গৃহের উল্লেখ বৌধায়নে আছে। গরুর ঘরও বোধায়ন স্বতন্ত্র ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

বোধায়ন বলিহরণ প্রকরণে একটি কথা বলিয়াছেন তাহা বিশেষ ভাবে প্রণিধান যোগ্য। বলিহরণে নিজ গৃহের সমস্ত অংশ পরিক্রমণ করিয়া "উপনিস্ক্রম্য জ্যেষ্ঠাবকাশে" বলিহরণের ব্যবস্থা আছে। ইহাতে বুঝা যায় যে গৃহস্থের পরিবারের মধ্যে সহোদরের স্থান ছিল না। বিবাহের পর গৃহস্থ স্বতন্ত্র গৃহ প্রতিষ্ঠা করিতেন, পিতা বা সহোদরের সহিত এক গৃহে থাকিতেন না। ইহা ব্রাহ্মণ ও গৃহ্যের নানা বিবরণ হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। বিবাহে স্বামী ও স্ত্রী যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিতেন তাহা লইয়া তাঁহারা গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিতেন। এই অগ্নি গৃহের স্বাতন্ত্র্যের পরিচায়ক। একই গৃহে দুই অগ্নি থাকিত না। সুতরাং অর্ব্বাচীন কালের যৌথ পরিবার গৃহ্যের যুগে ছিল না বলিয়া মনে হয়। জ্যেষ্ঠের গৃহে যাইতে যে আপনার বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইতে হয় তাহাও এই সত্যই প্রমাণিত করিতেছে। আবার, আপস্তম্ব গৃহ্যসূত্রে বিবাহ প্রকরণের মধ্যেই গৃহনির্ম্মাণের ব্যবস্থা লিখিত আছে; ইহা হইতেও মনে হয় যে গৃহস্থ বিবাহ করিয়াই গৃহ প্রতিষ্ঠা করিত।

শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত।

---

(৩) প্রাগ্দ্বারম্ ধন্যম যশস্যম্ বেদদ্বারম্ পুত্র্যম্ পশব্যম্, দক্ষিণ দ্বারে সর্ব্বে কামাঃ। খাদির ৪।২।৫। দ্রষ্টব্য গোভিল, ৪।৭।১৬-১৭

বস্তি বনাম পিচকারী।

অনেকের ধারণা পিচকারী ডুস প্রভৃতি যন্ত্র দ্বারা বাহ্য করান বা বলবর্দ্ধক ঔষধাদি প্রয়োগ কেবল পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের দ্বারাই আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই জন্য কবিরাজ মহাশয়দের বাড়ীতে পিচকারী বা ডুসের সত্তা দেখিতে পাইলে কোন কোন শিক্ষিত ব্যক্তিও বিস্ময় প্রকাশ করিয়া থাকেন। বাস্তবিক পক্ষে আজকাল যেরূপ অধিকাংশ কবিরাজবৃন্দের চিকিৎসা পনের সাহায্যে কেবল ঔষধ বিক্রয়ই প্রধান ব্যবসায় হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাদের গৃহে যন্ত্রসম্ভারাদি দেখিলে চমৎকৃত না হইবার কোন কারণ নাই। কিন্তু এক সময় ছিল যে সময়ে এই পিচকারী দ্বারাই চিকিৎসার অর্দ্ধেক কার্য্য সমাহিত হইত এবং প্রাচ্যগণ বহু প্রকার ব্যাধিতে ইহা ব্যবহার করিতেন এখন অত্যন্ত পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ তাহার ... ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন নাই। দুর্ভাগ্যের বিষয় অধিকাংশ কবিরাজ মহাশয়গণও এ বিষয় আলোচনা করা আবশ্যক বোধ করেন না। সেই জন্যই পূর্ব্বে একবার "প্রতিভা

পত্রে "বস্তি অর্থাৎ পিচকারী, ডুস্" লিখিয়া আমাকে তাহার কৈফিয়ৎ দিতে হইয়াছিল। যাক্, প্রাচ্যগণ বস্তি-দ্বারা চিকিৎসায় কতদূর উন্নত ছিলেন তাহার একটু আলোচনা করিব।

প্রাচ্যগণ অধোদ্বার দিয়া ঔষধ প্রয়োগকে বস্তি বলিতেন। বস্তি অর্থে মূত্রস্থলী (Bladder) বুঝায়। বৈদ্যবরঙ্গমালা অভিধানে "মূত্রাশয় পুটো বস্তিঃ" বলিয়াছেন। অধঃ প্রদেশ দিয়া শরীরে ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইলে বিনা যন্ত্রের সাহায্যে প্রয়োগ করা যায় না। যে যন্ত্র দ্বারা ঐরূপ ঔষধ প্রয়োগ করা হয় তাহা পশ্বাদি জন্তুর মূত্রাশয়ের কলা দ্বারা প্রস্তুত করা হইত এজন্য উক্ত যন্ত্রকেও বস্তি যন্ত্র বলা হয়। এবং ঐ প্রকার যন্ত্র দ্বারা যে ঔষধ প্রয়োগ করা হয় তাহাকেও বস্তি কহে। টীকাকার বলিয়াছেন:—"বস্তিভির্দীয়তে যথা তস্মাদ্ বস্তিরিতি স্মৃতঃ।" কায় চিকিৎসায় (Physic) এই বস্তি দ্বারাই চিকিৎসার অর্দ্ধেক কার্য্য সম্পন্ন হইত। সুশ্রুত বলিয়াছেন:—

"শিরাব্যধশ্চিকিৎসার্দ্ধং শল্য তন্ত্রে প্রকীর্ত্তিতঃ।
যথা প্রণিহিতো বস্তিঃ সম্যক্ কায় চিকিৎসিতে॥"

আজকাল কবিরাজ মহাশয়গণের কায় চিকিৎসাই প্রধান সম্বল কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে বস্তি দ্বারা কায় চিকিৎসার অর্দ্ধেক কার্য্য সম্পন্ন হয় তৎসম্বন্ধে জ্ঞান না থাকায় অনেকেরই চিকিৎসার চেষ্টা একপক্ষহীন পক্ষীর উড়িবার চেষ্টার ন্যায় নিষ্ফল হইয়া থাকে।

বস্তিক্রিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে ভগবান্ সুশ্রুত যাহা বলিয়াছেন তাহার ভাবানুবাদ এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব। বস্তি চিকিৎসায় অনেক কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।—"স্নেহাদি পঞ্চ কর্ম্মের মধ্যে বস্তিকর্ম্ম শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রাচীন আচার্য্যগণ বলিয়াছেন। যেহেতু বস্তি দ্বারা বহু কার্য্য সাধিত হয় এবং নানাবিধ দ্রব্যের সংযোগ জন্য তাহা দ্বারা দোষ সমূহের সংশোধন, সংশমন, ও সংগ্রহণ আদি সর্ব্বপ্রকার কার্য্য হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা শুক্র ধাতু বর্দ্ধিত হয়, কৃশ ব্যক্তির পুষ্টি ও স্থূল ব্যক্তির কৃশতা সম্পাদিত হইয়া থাকে। ইহা দৃষ্টি শক্তি বর্দ্ধক, বলি পলিত নাশক ও স্থির যৌবন সম্পাদক। উত্তমরূপে বস্তি প্রযুক্ত হইলে শরীর উপচিত হয়, বর্ণ পরিষ্কার হয়, বল বর্দ্ধিত হয়, সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি নষ্ট হয় ও আয়ুঃ বর্দ্ধিত হয়। আরও জ্বর, অতিসার, তিমির, প্রতিশ্যায়, শিরোরোগ, অধিমন্থ, অর্দ্দিত, আক্ষেপক, পক্ষাঘাত, একাঙ্গরোগ, সর্ব্বাঙ্গ রোগ, আধ্মান, উদর, শর্করা, শূল, বৃদ্ধি, উপদংশ, আনাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, গুল্ম, বাতরক্ত, বাতজ মূত্রজ ও পুরিষজ, উদাবর্ত্ত, শুক্রনাশ, আর্ত্তবনাশ, স্তন্যনাশ, হৃদমস্থ, হনুমস্থ, হৃদ্‌গ্রহ, হনুগ্রহ, অর্শঃ, অশ্মরী ও মূঢ়গর্ভ প্রভৃতি ব্যাধিতে প্রধান ভাবে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। প্রাচীন ঋষিগণ বলিয়াছেন যে:—

বস্তির্বাতে চ পিত্তে চ কফে রক্তে চ শস্যতে।
সংসর্গে সন্নিপাতে চ বস্তিরেব হিতঃ সদা।

অর্থাৎ বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, রক্তজ, দ্বন্দজ, সান্নিপাতিক এক কথায় সর্ব্বপ্রকার ব্যাধিতেই বস্তি হিত-কর হইয়া থাকে। সুতরাং প্রাচীনকালে বস্তিক্রিয়া চিকিৎসার প্রধান সহায় ছিল সে বিষয় সন্দেহ নাই।

প্রাচ্যগণ বস্তিক্রিয়াকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করেন। অনুবাসনবস্তি, নিরূহবস্তি ও উত্তরবস্তি। ঘৃত তৈলাদি স্নেহ দ্রব্য প্রধান দ্রব্য দ্বারা যে বস্তি দেওয়া হয় তাহাকে অনুবাসন বস্তি কহে। স্নেহশূন্য দ্রব্যের কাথাদিদ্বারা যে বস্তি দেওয়া হয় তাহাকে নিরূহ ও মূত্র পথ দিয়া যে বস্তি দেওয়া হয় তাহাকে উত্তর বস্তি বলা হয়। ইহার অনুবাসন ও নিরূহবস্তি বাতজ বা বাত প্রধান ব্যাধিতে শরীর সংশোধন জন্য ও বলাধানাদি জন্য প্রযুক্ত হয় এবং উত্তরবস্তি মূত্রাশয় ও গর্ভাশয়গত ব্যাধিতে ব্যবহৃত হয়। প্রাচীনকালে অবস্থাবান ব্যক্তি মাত্রেই জীবনীশক্তির বর্দ্ধন ও দীর্ঘকাল জীবিত থাকার আকাঙ্খায় 'রসায়ন' ঔষধ ব্যবহার করিতেন। এবং

তাহাদের কেহ কেহ আশাতীত কাল জীবিত থাকিতেন—এই প্রকার অনেক গ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও আজকালকার ক্ষীনজীবীর যুগে সেগুলি কবিকল্পনা বিজৃম্ভিত বলিয়া প্রক্ষিপ্ত হইতেছে তথাপি আয়ুর্ব্বেদের এ অংশ যে একবারে কল্পনা তাহা ধারণা করা যায় না। যাক্ এবিষয় বারান্তরে আলোচনা করা যাইবে। সেই রসায়ন ঔষধ ব্যবহার করিতে হইলে পঞ্চ কর্ম্ম দ্বারা শরীর সংশোধন করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। শাস্ত্রকার বলেন :—

নাবিশুদ্ধ শরীরস্য যুক্তো রাসায়নো বিধিঃ।
ন ভাতি বাসসি ক্লিষ্টে রঙ্গ যোগ ইবার্পিত॥

যেমন মলিন বস্ত্রে রং লাগাইলে তাহা কদাচ রঞ্জিত হয় না, সেইরূপ শরীর সংশুদ্ধ না হইলে রসায়ন ঔষধ প্রয়োগ যুক্তি যুক্ত নহে। সেই জন্য প্রাচীনকালের একটি প্রধান রসায়ন ঔষধ এখন হাটে বাজারে মুড়ি মুড়কীর ন্যায় বিক্রীত হইলেও তাহাদ্বারা তেমন ফল কেহই প্রাপ্ত হইতে পারেন না। পঞ্চকর্ম্ম করিতে হইলে নিরূহ ও অনুবাসন বস্তি বিশেষ আবশ্যক, সুতরাং ব্যাধি ব্যতীতও সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্যও বস্তি ক্রিয়ার প্রয়োজন আছে।

গুহ্যদ্বার দিয়া ঔষধ প্রয়োগের জন্য যেমন এখন পিচকারী ডুস্, এনিমা প্রভৃতি যন্ত্রের প্রচলন হইয়াছে সেইরূপ প্রাচীনকালেও ঐ কার্য্যের জন্য বস্তি নামক যন্ত্র প্রধান ভাবে ব্যবহৃত হইত। এই যন্ত্রের আকার কি প্রকার ও কি প্রকারে প্রস্তুত হইত তাহার উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। বস্তি যন্ত্রের দুইটি অংশ আছে এক অংশের নাম নেত্র (Tube) অপর অংশ বস্তি (Bladder)। রোগীর বয়স ভেদে এই নেত্র ও বস্তি ছোট বড় নানা প্রকারের হইয়া থাকে। ১ বৎসর হইতে ৮ বৎসর পর্য্যন্ত নেত্র দীর্ঘে ৬ অঙ্গুলি এবং মূলে কনিষ্ঠাঙ্গুলীর ন্যায় ও অগ্রভাগে কঙ্ক পক্ষীর পাখার অগ্রভাগের (Quill) (পাখার যে অংশ দিয়া সাধারণতঃ কলম হয়) ন্যায় স্থূল হইবে তাহার ছিদ্র এত বড় হইবে যে যাহার মধ্যদিয়া একটা মুগ কলাই যাইতে পারে। ৮বৎসর হইতে ১৬বৎসর পর্য্যন্ত রোগীর বয়স হইলে নলটি ৮আঙ্গুল দীর্ঘ হইবে ও মূলে অনামিকার ন্যায় ও প্রবেশ দ্বার বাজপক্ষীর পাখার অগ্রভাগের ন্যায় মোটা হইবে ও ছিদ্র মাষকলাই প্রমাণ হইবে। আর ষোড়শ বর্ষ হইতে পঁচিশ বর্ষপর্য্যন্ত ১০আঙ্গুল দীর্ঘ—মূলে মধ্যমাঙ্গুলির* ন্যায় ও অগ্রভাগ ময়ূরের পাখার অগ্রভাগের ন্যায় মোটা ও ছিদ্র মটর কলাই প্রমাণ হইবে। পচিশবর্ষের উর্দ্ধে বার আঙ্গুল দীর্ঘ নল মূলে বৃদ্ধাঙ্গুলির ন্যায় ও অগ্রভাগ শকুনের পাখার অগ্রভাগের ন্যায় ও ছিদ্র সিদ্ধ মটর কলাই প্রমাণ হইবে।

এই নেত্র বা নল সোনা রূপা তামা লৌহ পিত্তল হস্তি দন্ত মহিষাদির শৃঙ্গ কাচ বা কাষ্ঠসার দ্বারা তৈয়ার করিতে হয়। ফলকথা যাহা দ্বারা তৈয়ার করিলে খুব শক্ত ও পালিশ হয় এমন দ্রব্য দিয়া তৈয়ার করা কর্ত্তব্য। আকার গোপুচ্ছের ন্যায় মূলে মোটা হইয়া ক্রমশঃ সরু হইয়া যাইবে। মুখের নিকট গোল (Ball pointed) হওয়া কর্ত্তব্য নতুবা গুহ্য দ্বারাদিতে আঘাত লাগার সম্ভাবনা। ইহার মূলের দিকে দুটি কর্ণিকা (Notch) থাকিবে যাহাতে এই নলের সঙ্গে বস্তি বন্ধন করিলে খুলিয়া না যায়। অগ্রভাগে ও উক্ত ৪ প্রকার নেত্রের যথাক্রমে ১॥ অঙ্গুলি ২ আঙ্গুল ২॥ আঙ্গুল ও ৩ আঙ্গুলের পরও ঐরূপ একটি কর্ণিকা থাকিবে। এই কর্ণিকা পর্য্যন্তই গুহ্য দ্বারে প্রবেশ করাইতে হয়।

নিম্নের বস্তি অংশ সাধারণতঃ পূর্ণ বয়স্ক গরু মহিষ শূকর ছাগল ও ভেড়ার মূত্র স্থলী (Bladder) দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাহা দুষ্প্রাপ্য হইলে পক্ষচর্ম্ম বা অতি মোটা বস্ত্রদিয়া (যাহা দ্বারা জল পড়ে না) বস্তি নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। মূত্রাশয় বা চর্ম্ম দিয়া বস্তি করিলে সেই চর্ম্ম "নিরুপদিগ্ধ, তন্তু ও

পরিমার্জ্জিত" (Tan) করিয়া লইতে হয়। এই বস্তির আকার আজকালকার Insufflatons নামক যন্ত্রের অনেকটা অনুরূপ।

উক্ত বস্তির নল একটু বিশিষ্ট প্রকারের হইবে। সাধারণতঃ উহা ১৪ আঙ্গুল দীর্ঘ এবং মালতী ফুলের বোঁটার ন্যায়, অগ্রভাগের পরিধি ও ছিদ্র সর্ষপ পরিমাণ হইবে। স্ত্রীলোকের জন্য দশ আঙ্গুল দীর্ঘ ও ছিদ্র মুগ কলাই প্রমাণ হওয়া কর্ত্তব্য। তাহার বস্তির জন্য ছাগল বা ভেড়ার বস্তিই যথেষ্ট।

রোগীকে বস্তি প্রয়োগের পূর্ব্বে যে যে জিনিষের অর্থাৎ কাথ কল্ক, তৈলাদি যাহা আবশ্যক তাহা সংগ্রহ করিয়া সমস্ত একটি পৃথক পাত্রে উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া তাহা দ্বারা বস্তিপুট পূর্ণ করিবে পরে নেত্রটি পুটের মুখে লাগাইয়া বস্তির মুখ সঙ্কুচিত করিয়া নেত্রের নীচের কর্ণিকাদ্বয়ের সহ উত্তমরূপে সূত্র দ্বারা বন্ধন করিবে। যাহাতে বস্তির ক্বাথাদি নলের মুখ দিয়া ব্যতীত অন্য দ্বার দিয়া বাহির হইয়া না যাইতে পারে। বস্তি প্রয়োগের অব্যবহিত পূর্ব্বে রোগীকে স্নেহাভ্যক্ত করিয়া উত্তমরূপে স্বেদ দিয়া লইবে। তারপর রোগীর মল মূত্রের বেগ থাকিলে তাহা পরিত্যাগ করিয়া লইতে বলিবে। দ্বিপ্রহরেই বস্তি দেওয়ার উপযুক্ত সময় তবে আত্যয়িক ব্যাধির জন্য যে কোন সময়ে বস্তি দেওয়া যাইতে পারে। রোগীকে একটি ঘরের যে স্থানে খুব হাওয়া লাগেনা সেখানে দক্ষিণ পা সঙ্কুচিত করিয়া বাম পা প্রসারিত করিয়া বাম পাশে বিছানায় শয়ন করাইবে। মাথায় কোন বালিস দিবে না এবং শয্যাটা এমন ভাবে পাতিতে হইবে যাহাতে রোগীর পাছাটা শরীরের উপরের অংশ হইতে একটু উচ্চ থাকে। তারপর চিকিৎসক বস্তিটি বাম হাতে ধরিয়া যদি বস্তির মধ্যে ঔষধের সঙ্গে কিছু বায়ু থাকে তবে তাহা একটু চাপ দিয়া বাহির করিয়া দিবে। রোগীর গুহ্য দেশে ও বস্তির নলের অগ্রভাগে ঘৃত মাখাইয়া ধীরে ধীরে নলের সিকি পরিমাণ রোগীর গুহ্য দেশে প্রবেশ করাইয়া দিবে। তারপর দুই হাত দিয়া বস্তিটি চাপিয়া দিলেই ঔষধাদি রোগীর উদরে প্রবিষ্ট হইবে। তারপর নলটি বাহির করিয়া লইবে। রোগী কিছুক্ষণ স্থির ভাবে থাকিয়া উঠিয়া বাহ্যে গেলেই দোষের সহিত বস্তির ঔষধ বাহির হইয়া রোগীকে সুস্থ করিবে। ভিন্ন ভিন্ন জিনিষের সংযোগে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাধিতে আয়ুর্ব্বেদে সহস্র সহস্র প্রকার বস্তি প্রয়োগের ঔষধ নিশ্চিত হইয়াছে। পাশ্চাত্যগণ বলকারক ঔষধের জন্য লবণ জলের (Saline doache) ব্যবহার করিয়াই তাহা তাঁহাদের অপূর্ব্ব আবিষ্কার বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন। প্রাচ্যগণ এরূপ বলকারক বস্তি বহু ব্যবহার করিতেন এবং তাঁহাদের প্রায় বস্তির ঔষধেই বিশিষ্ট প্রকারে লবণের ব্যবহার আছে। তাঁহারা যত প্রকারে যত ব্যারামে বস্তির ব্যবহার করিতেন পাশ্চাত্যগণ তাহার অত্যল্প অংশ মাত্র তাহাদের বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করায় পিচকারীটা তাহাদের সম্পত্তি এরূপ সাধারণের ধারনা হইয়াছে। আর কবিরাজ মহাশয়গণ তাঁহাদের এই অপূর্ব্ব বিষয় হারাইয়া ফেলিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে?

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র সরস্বতী।

মধু-স্মৃতি।

১

"মধু-স্মৃতি" বড় মধুময়!
বাণী জননীর ঘরে নিশিদিন মধু ক্ষরে
জুড়াইয়ে তৃষিত হৃদয়!
"মধু-স্মৃতি" বড় মধুময়!

২

"মধু-স্মৃতি" বড় আলাময়!
কি কলঙ্ক বাঙ্গালীর গাঁথা তায় সুগভীর
শত যুগে ঘুচিবার নয়!
"মধু-স্মৃতি" বড় আলাময়!

৩

কোন্ সুরে গাব আমি গান ?
মাধবীর শোভা মাঝে বরষার ধারা রাজে
জ্যোছনায় অমা মূর্ত্তিমান !
কোন্ সুরে গাব আমি গান !

৪

বাজ্ বীণা মধুরে করুণ !
আলো-ছায়া অশ্রু-হাসি এক সাথে পাশাপাশি
মেঘে ঢাকা তরুণ অরুণ !
বাজ্ বীণা মধুরে করুণ !

৫

কোথা আজি তুমি কবিবর !
এক করে ধর বাঁশী ফুটে ব্রজ-ফুলরাশি
অন্যে কম্বু ধ্বনে ঘোরতর
"মেঘনাদে" মুগ্ধ চরাচর !

৬

হে "অমিত্র অক্ষর"-জনক !
বঙ্গকাব্য উপবনে সাজাইলে সযতনে
কি অপূর্ব্ব 'সনেট' স্তবক !
হে "অমিত্র-অক্ষর" জনক !

৭

ভারতীর বরপুত্র তুমি !
মধ্যাহ্ন-তপন সম দ্যুতি তব অনুপম
কীর্ত্তি তব ব্যাপ্ত আর্য্যভূমি !
ভারতীর বরপুত্র তুমি !

৮

তবু যে গো পারি না ভুলিতে
আত্মীয়-স্বজন-হারা তেয়াগিলে দেহ-কারা
তীব্র ব্যথা লয়ে স্মরা চিতে !
কেমনে তা' পারিব ভুলিতে ?

৯

সে কি হায়, কভু ভুলিবার ?
বিদেশী বিধর্ম্মী মাঝে তোমার সমাধি আজ
বৃথা পায়ে ডাকি বাঙ্গালার !
সে কি হায়, কভু ভুলিবার !—

১০

বন্দি তোমা শ্রীমধুসূদন !
আপনি গরল পিয়ে গেলে সুধা বিতরিয়ে
স্মৃতি তব চির-অতুলন !

শ্রীধীরেন্দ্রকুমার দত্ত।

দ্বিজ। *

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যেখানে ভোগলালসা পূর্ণ বিলাসের বিকৃত আদর্শ ধর্ম্মের সরল আদর্শটীকে বিচলিত করে না, যেখানে অতুল

---

* অগ্রহায়ন সংখ্যা প্রতিভায় এই প্রবন্ধের প্রথমাংশ প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক মহাশয় প্রবন্ধের প্রথম ৫।৬ ছত্রের মধ্যেই বৈজ্ঞানিক দিক হইতে দেখিতে গেলে, ৪।৫টি মারাত্মক ভুল করিয়াছেন। (১) পিপিলিকা পশু নহে ; (২) পিপিলিকা মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হয় না ; (৩) পিপিলিকা মাতৃস্তন্য পান করিয়া বর্দ্ধিত হয় না ; (৪) সকল পিপিলিকাই পুত্র উৎপাদন করে না। স্তন্যপায়ী পশু (Mamalia) হওয়া দূরে থাকুক পিপিলিকা মেরুদণ্ডি প্রাণী (Vertebrate) পর্য্যন্ত নহে। বোধ হয় লেখক মহাশয় সামান্য প্রাণী অর্থেই উদাহরণ স্বরূপ পিপিলিকা শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন।

প্রতিভা সম্পাদক।

প্রয়োজন সাধনের অপরিণামদর্শী ব্যাকুলতা স্বাভাবিক ধৈর্য্যকে চঞ্চলিত করে না, যেখানে মানব আকাঙ্ক্ষার উদগ্র ঔৎসুক্য চিত্তে বিকৃতির ছাপ মারিবার সুযোগ পায় না সেখানে সেই নিবিড় জনসংঘের আত্যন্তিক ঠেলাঠেলি হইতে বহুদূরে একটী বেড়া দেওয়া স্থানে এই ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম প্রতিষ্ঠিত।

চারা গাছটীকে ঘের দিয়া আচ্ছাদনের ভিতর না রাখিলে বাহিরের হিংস্র পশুর আক্রমনের আশঙ্কা সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে। সেই জন্যই তাহাকে একটী বেড়ার ভিতরে রাখা দরকার। অবশেষে একটী দৃঢ়মূল বৃক্ষে পরিণত হইলে যেন আর কিছুরই ভয় থাকে না। তেমনি বাল্য সৌকুমার্য্যকে অক্ষুন্ন রাখিবার জন্যই একটী বেড়ার আবশ্যক হয়।

এই ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের পাদদেশ প্রক্ষালিত করিয়া পর্ব্বত নির্ঝরিনীর অমল জলধারা প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে— তাহার চতুষ্পার্শ্বে শ্যামল অরণ্যানী পরিশোভিত।— সেখানে সেই বৃহৎ বৃক্ষচ্ছায়াতলে, মন্দ মন্দ সমীর হিল্লোলিত তপোবনে কয়েকটী কুটীরে সেই বালক-বালিকাদের ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম!

সেখানে তাদের জীবন বিশ্বপ্রকৃতির সহিত অবাধ আত্মীয়তায় গড়িয়া উঠিতে থাকে। সেই মিলন বিশুদ্ধ ও পরম পবিত্র—কেননা সে মিলনে—ইচ্ছাশক্তির একান্ত উন্মুখতা নাই— কাজেই বৃক্ষলতা পুষ্পপল্লবাদির সহিত আপন অন্তরতম প্রাণের নিগূঢ় মিলনে বিকৃতির আশঙ্কা অতি অল্প! প্রকৃতির ক্ষেত্রে সহজেই সেই সামঞ্জস্যটুকু পরিলক্ষিত হইতে পারে—যাহা বিশ্বমানবের ক্ষেত্রে সহজ সাধ্য নহে—এবং যাহার অভাবে প্রাণ এবং প্রেমের উপলব্ধি একেবারেই অসম্ভব।

সেই জনবিরল ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমে দ্বিগুণ প্রভাতের অমিয় আলোক সন্ধ্যার নিবিড় অন্ধকারকে একান্ত বিনম্র হৃদয়ে গ্রহণ করিতে থাকে। দিবস তাহাদিগের সরস নবীন শক্তিগুলিকে বাহিরের বিশ্বপ্রাণের দিকে আহরণ করে, রাত্রি তাহার বিরাম-পূর্ণ নীরব-নিবিড় ঘনায়মান শান্তি বিস্তার করিয়া অন্ধকার অঞ্চল দ্বারা তাহাদিগকে আবৃত করিয়া তাহাদের শক্তিগুলিকে সংহরণ করিয়া আনে! প্রভাতে তাহারা তাহাদের পিতৃপ্রতিম গুরুদেবের সমভিব্যাহারে বিশ্বপ্রকৃতির নানা বৈচিত্র্যের মর্ম্মনিহিত একের সহিত সম্মিলনে, কাননে, বট-তরুমূলে, তরঙ্গিনীতীরে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়;—নিশীথে কল্যানময়ী মাতৃদেবীর সস্নেহ আশ্রয়ে আসিয়া পৌরাণিকী কথা শ্রবণ করিতে করিতে শান্তিপূর্ণ নীরব-নিদ্রায় নিমগ্ন হয়। দিবাভাগে সূর্য্যকিরণের জ্যোতির্ম্ময় অঙ্গুলিনিচয় তাহাদিগকে বাহিরের দিকে সানন্দ আহ্বান প্রেরণ করে, তখন তাহারা আলোকখচিত আকাশের তলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম্মের বৈচিত্র্যে আত্মার প্রকাশে নিযুক্ত থাকে, সায়াহ্নে তারা আশ্রমধেনু চরাইয়া গোষ্ঠে প্রত্যাবর্ত্তন করে— তখন আবার সেই মৌন নীরব নিভৃত ব্যাপ্ত প্রশান্তি।

ষড়্ ঋতু তাদের কাছে, পুষ্পে পল্লবে, কুঞ্জে কুঞ্জে মধুকর গুঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে রঙ্ বেরঙের নিমন্ত্রণ-পত্রটী প্রেরণ করিতে থাকে, বসন্তের কোকিল সহোদরের মত আনন্দ কলকাকলী সঙ্গীতে তাদের হৃদয়ের তন্ত্রীগুলিতে সুললিত ঝঙ্কার নিনাদিত করিতে থাকে। চিত্রিত সুরভি কুসুমরাজি অপর্য্যাপ্ত প্রাচুর্য্যে তাহাদের চক্ষু দুটী উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়—ধরণীর শ্যামল পল্লবভার ও আকাশের স্নিগ্ধ নীলিমা তাহাদের হৃদয়কে অপরূপ আনন্দে বিলীন করিয়া দেয়।—

বর্ষার সজলমেঘমেদুর সৌম্যগম্ভীর মুহূর্ত্তে ঘোর ঘনঘটার স্নিগ্ধ কলনির্ঘোষে উন্মত্ত গহ্বরে বিরামহীন আকরে এমন একটী শান্ত মঙ্গলময় গভীরতা তাহাদের হৃদয়ে ঘনাইয়া ওঠে যে তাহারা তাহার কূল পায় না।— তাদের বিস্মিত বিমুগ্ধ হৃদয়ের উপর এমনি করিয়াই একটী পূর্ণনিবিড় কল্যাণঘন পরিবেষ্টন আসন্ন আনন্দে আচ্ছাদিত করিয়া দেয়। তাহারা দেখিতে পায়—ধরণীর সমস্ত তৃষ্ণাতাপ পরিপূর্ণ করিয়া সারা গ্রীষ্মের সমস্ত

হাহাকার বিদুরিত করিয়া, প্রসন্ন আশ্বাসে নববর্ষার অবিরামবর্ষী জলধারার ঝর্ ঝর্ প্রপাত!

এইরূপ বিশ্ব পৃথিবীর সহিত হৃদয়ের বাধহীন বিস্তারে তাহাদের চিত্তের ধারা প্রাণে, প্রেমে, স্বাস্থ্যে অমৃত ধারার উৎসারিত হইতে থাকে—তাহাদের হৃদয় সর্ব্ব মোহমুক্ত শান্ত-সংবৃত আনন্দে সকলকেই আপনার অন্তরতম প্রকোষ্ঠে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত আমন্ত্রণ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়!

এমনি ভাবে গুরুগৃহে যখন বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদ্‌বৃত্তির সম্যক্ বিকাশ সাধিত হইতে থাকে, সংযমের দ্বারা প্রবৃত্তি আত্মবশীকৃত হইতে থাকে, ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম সেই দ্বিজত্বের প্রাথমিক সাধনা। বিশ্ব প্রকৃতির সহিত আত্মার পূর্ণ মিলনই হচ্ছে এই ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের চরম সাধনা। এই সাধনায় যখন মানুষ সিদ্ধ হয়, তখন সে আর একটি বৃহৎ মিলন চায়—সেটী বিশ্ব প্রকৃতির ক্ষেত্রে সম্ভব নহে, বিশ্ব-মানবের ক্ষেত্রেই সম্ভব! এই মিলন লাভেরই উদ্যোগ পর্ব্ব ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে।

বিশ্বপ্রকৃতির সহিত মিলসাধনে কোনও বাধা বিঘ্ন নাই, কোন দুঃখমৃত্যু বিরোধের উপদ্রব নাই—তাহা অপেক্ষাকৃত সহজ সাধ্য—কিন্তু বিশ্বমানবের ক্ষেত্রে আত্মবিকাশের বাধা পদে পদে। অন্তরে নানাভিমুখী প্রবৃত্তি নিচয়ের বাধা, বাহিরের নানা দুঃখ ঝঞ্ঝার বাধা। কিন্তু মানুষ জ্ঞানের দ্বারা, ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা, ও সংযম-সাধনার দ্বারা এমনি একটি বল লাভ করে, যে সে অনায়াসে অক্লেশে এই সকল বাধার উপরে জয়ী হইয়া আপন মহত্বকে প্রকটিত করিতে পারে।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের সাধনা সমাপন পূর্ব্বক গার্হস্থ্যাশ্রমে যখন মানুষ প্রবেশ করে—তখনি সে বিবাহিত হইয়া—একটি বিশ্বমঙ্গলের ক্ষেত্রে আপনাদিগকে উৎসৃষ্ট করিয়া দেয়। এই সময় সে সর্ব্বমানবে তাঁহাকেই অনুভব করে—যিনি শিবং। তখন সে গৃহ, পরিবার, সমাজ, স্বদেশ ও বিশ্বের কল্যানে নানা বিচিত্র কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। এই সময় বিশ্ব নরনারীদিগের সহিত বিচিত্র সম্বন্ধে মানুষ বিজড়িত হইয়া এই সর্ব্ব বিচিত্রতার মধ্যে সেই একেরই উপাসনা করে—যিনি শিবম্। এই কর্ম্মের ক্ষেত্রেই মানুষের মুক্তির যথার্থ বিকাশ। মানুষের মনুষ্যত্ব ও দ্বিজত্ব এই ক্ষেত্রেই যথার্থ জন্ম লাভ করে, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে তাহার ভ্রূণ অবস্থা! নবীন পরিপূর্ণ যৌবন, নব বিকশিত শক্তি নিচয়, ও অপরিমিত বীর্য্য লইয়া সে তখন বিশ্বমানব সমাজের সেবায় আত্মত্যাগে ব্রতী হয়!

সংযমের সহিত স্বাতন্ত্র্য পরিচালিত করিলে বিশ্বের সকল কল্যানকর্ম্মাচরণ স্বাভাবিক হইয়া উঠে। প্রবৃত্তি যখন আত্মবশে আসিয়াছে, তখন তাহাকে সংযতভাবে যথাযথ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করাও দুরূহ নহে! অহঙ্কারকে একটী সত্যসীমার ভিতরে রাখিয়া প্রয়োগ করিলে, তাহাতে বিশ্বের সহিত মিলকে বাধা না দিয়া বরঞ্চ অধিকতর প্রকাশ করে—কাজেই তাহাতে প্রেমের বিকাশকে আরো অত্যুজ্জ্বল করিয়া তোলে।

এই ভাবেই যখন মানব সমাজে আকর্ষণ, বিকর্ষণ, স্বাধীনতা ও সংবরণ, কেন্দ্রানুগ ও কেন্দ্রাতিগ শক্তি সমূহ সমকালে সমভাবে পরিচালিত হয়, তখনি তাহা সত্যে কল্যানে, প্রেমে, পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। তখনি বিশেষত্ব বিশ্বকে অতিক্রম করিতে বৃথা প্রয়াস পায় না এবং প্রত্যেকেরই আপন আপন বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব পরস্পর বিরোধী হইয়া গভীর ধ্বংসের অভিমুখে যাত্রা করে না। ক্ষুদ্র অহঙ্কার অসংযত কোলাহলে দিগদিগন্ত মুখরিত করে না এবং প্রবৃত্তির লুব্ধ আস্ফালন প্রেমের চক্ষে শেল হানে না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও বিশ্বমঙ্গলের অপরূপ সামঞ্জস্য অপূর্ব্ব গরিমায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

এই বিশ্বমঙ্গলের ক্ষেত্রেই মানব সমাজের ক্ষেত্রেই, সংযমের যথার্থ পরিচয়। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে যাহা অভ্যাস মাত্র—গার্হস্থ্যাশ্রমে তাহাই সার্থকতা লাভ করে। স্বার্থত্যাগ করিতে যে না জানে, সুখকে ত্যাগ করিতে যে না জানে—তাহারি

শুধু দিন যাপনের শুধু প্রাণ-ধারণের গ্লানি
শরমের ডালি
নিশিদিন রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্রশিখা স্তিমিত দীপের
ধূমাঙ্কিত কালি

সে শুধুই আপন স্বাতন্ত্র্যকে নানা ভোগে অত্যুচ্চ করিয়া তুলিতে প্রয়াস পায়, এবং একদিন নিদারুণ মৃত্যুর হাহাকারে তাহার পর্য্যবসান।

এই বিশ্বকল্যানের ক্ষেত্রে যে যত বড় ত্যাগী তাহার গরিমা, তাহার মহিমা, তত উদার, তত গভীর, তত বিরাট। ন্যায়ের জন্য, সত্যের জন্য, লোককল্যাণের জন্য মানুষ তখন আনন্দে দুঃখকে, মৃত্যুকে, ক্ষতিকে বরণ করিয়া লয়—বিপদ্‌কে মাথার মুকুট করিয়া লয়, বিরোধকে কণ্ঠহার স্বরূপে গ্রহণ করে—। দুঃখই তাহার মনুষ্যত্বের গভীরতা পরিপূর্ণ করিয়া তোলে। সংসারে দুঃখধন্দার অন্ত নাই; অতএব ইহাকে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়, এরূপ এক দল আরামপ্রিয় বৈরাগী দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু দুঃখের দাবদাহের ভিতর দিয়া না গেলে পরম আরাম পরম আনন্দকে ত কিছুতেই পাওয়া যায় না। মানুষ তাহার অন্তরতম অমৃতকে পরিপূর্ণ বিকশিত করিবার নিমিত্তই দুঃখকে, মৃত্যুকে, বিপদ্‌কে, স্বেচ্ছায় আপন অন্তরের অন্তঃস্থলে বরণ করিয়া লইয়াছে। মানুষের মনুষ্যত্বের পরম বিকাশ সেই দুঃখদুর্গম ক্ষুরধারনিশিত পন্থায় আপন বিজয় যাত্রা প্রশস্ত করিয়া চলিয়াছে। মানুষের পরম প্রেমের পরিচয়ই সেই ঘোর ঝঞ্ঝার প্রলয়রোলে আসন্ন ঝটিকার ঘনঘোর নির্ঘোষে উদ্যত বজ্রের ভীমগর্জ্জিত বহ্নি-উদ্গারে।

ভুমার দিক হইতে যে আহ্বান মানুষের সমুদায় মর্ম্মগ্রন্থি বিদীর্ণ করিয়া দেয়, তাহা ত শুধু মঞ্জুল নিকুঞ্জের কলগুঞ্জন মধুর বংশীধ্বনি নহে; তাহা রুদ্রের প্রলয় পিনাকের ভুবন বিকম্পিত তূর্য্য বাজনা। মানুষ তাহাকে প্রত্যাখ্যান করে নাই, তাহাকে সাদরে আনন্দে বরণ করিয়া লইয়াছে, তাতেই তো তার বিজয়ের বিকাশ।

যেদিন সে সেই আহ্বান শুনিয়াছে—সেদিন সে তার সমস্ত সুখ সমস্ত আরাম বিসর্জ্জন দিয়া সমস্ত বৈভব সম্পদ পায়ে ঠেলিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে, ছিন্ন কন্থা পরিয়া যুগযুগান্তের সেই চির দুঃখের সেই চির মঙ্গলের সাধনার পরম পন্থায়। সে দিন তাহার প্রিয়তম স্বজন বন্ধুদের চক্ষু দর দর অশ্রুধারায় অভিষিক্ত হইয়াছে—তাহার প্রাণের পরম স্নেহের প্রেমের আদরের ধনেরা হাহা ধ্বনিতে দিক্ দিগন্ত ধ্বনিত করিয়াছে, সেদিন তাহা শুনিয়াও শোনে নাই—নিখিলের অশ্রুজলে তাহার হৃৎকমলটী ধৌত পরিপ্লুত করিয়া, তার পরম দুঃখের দেবতার চরণে তাহা অর্ঘ্য উপহাররূপে সমর্পণ করিয়াছে।

সে দিন দিগ্ হইতে দিগন্ত পর্য্যন্ত তাহার নিন্দাবাদ্ ধ্বনিত হইয়া গগণের প্রতি রন্ধ্র মুখরিত করিয়াছে—অবিশ্বাসীর অট্টহাস্য তাহার বক্ষে শেল হানিয়াছে, বাহিরের অগণ্য বাধা তাহার অঙ্গে বজ্রবাণ নিক্ষিপ্ত করিয়াছে—খর কণ্টক-গহণ পথে তার চরণ গাঢ় রক্তে অনুরঞ্জিত হইয়াছে। চৌদিকে শত মৃত্যুর দামামা গর্জ্জন স্বনিত হইয়া উঠিয়াছে, শত বিপদের বহ্নিজ্বালা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, সংহারের রক্ত নিষিক্ত গগণ তলে।

সে দিন সে সেই পরম দুঃখের ভিতরে পরম আনন্দে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে—সেই মৃত্যুর প্রলয়পয়োধির উন্মত্ত তরঙ্গদোলায় সে দুলিয়াছে—সে নাচিয়াছে—সে খেলিয়াছে—যখন হিংস্রদৃপ্ত কুটিল বীচিলহরী তাহাকে অতলে রসাতলে তলাইবার উদ্যোগ করিয়াছে তখন সে সহাস্য মুখে, অনন্ত আশান্বিত একান্ত নির্ভীক হৃদয়ে, সেই রুদ্রের অভয় চরণ জড়াইয়া ধরিয়াছে।—তবেই ত "সকল দ্বন্দ্ব-বিরোধ-মাঝে জাগ্রত যে ভালো" তাহাকে লাভ করিতে পারিয়াছে।

এই যে দুঃখ, এই যে বিপদপাত, এই যে মৃত্যুর আলোড়ন, এই ক্ষোভের ভিতরে যে বীর্য্যবান্ আনন্দে

প্রবেশ করে নাই, করিতে পারে নাই—সে কখনো সেই পরম প্রাণের অমৃত রস আস্বাদ্ করিতে পারে নাই—যে অমৃত মৃত্যুর পরপারে অবস্থিত—মৃত্যুকে অতিক্রম না করিলে যাহাকে পাওয়াই যায় না।

মানুষের জীবনে— সংসার ক্ষেত্রে তাই এই দুঃখের প্রয়োজন হয়—এই দ্বন্দ্বের প্রয়োজন হয়—এই জীবন ও মৃত্যুর দ্বন্দ্ব—সুখ ও দুঃখের দ্বন্দ্ব,—কল্যান ও পাপের দ্বন্দ্ব—এই দ্বন্দ্ব মন্থনের ভীমমুহূর্ত্তে মানুষ তাঁহাকেই পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করে, "যিনি শিবং।" তাঁহার ভৈরবরুদ্রচ্ছটা তাহার চক্ষে অপূর্ব্ব গৌরবের দীপ্তি বিস্তার করিয়া দেয়। অবশেষে যখন দ্বন্দ্বের সমাধান কাল উপস্থিত হয়—যখন মৃত্যুর তোরণদ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া অমৃতলোকে মানুষ উপনীত হয়—তখন সেই রুদ্রই দক্ষিণ বদনে তাহাকে রক্ষা করেন। তখন আবার সেই প্রেম, সেই আনন্দ, সেই প্রাণ। আদিতেও সেই প্রাণ অন্তেও সেই প্রাণ—মাঝখানেই যত দ্বন্দ্ব যত দ্বিধা সেই দ্বিধা পার হইয়া যখন পুনরায় অমৃতভবনে মানুষ উপনীত হয়, তাহা হইতে আর তার স্খলন নাই—তখনই তার মনুষ্যত্বের দ্বিজত্বের চরম বিকাশ, পরম সার্থকতা।

মানুষ তাহার গৃহস্থজীবনে যে মহৎ দুঃখের অধিকারী হইয়া থাকে তাহাই তাহার চরম নয়—চরমই হচ্চে ভূমার সুপ্রসন্ন আনন্দ মূর্ত্তি।—দুঃখের প্রখর মরুভূমি পার হইয়া মানুষ পরমানন্দ পারাবারে অবগাহন করিয়া শান্ত হইয়াছে, শীতল হইয়াছে। এই ভাবে গার্হস্থ্যজীবনে দ্বিজ বিচিত্র কর্ম্মে বিচিত্র সম্বন্ধের ভিতর দিয়া ভূমাকে অনুভব করে; এবং দুঃখের ভিতর দিয়া তাহার গভীরতা লাভ করে; অবশেষে দুঃখের যে দিন অবসান হয়; সে দিন সে একটি পরিপূর্ণ আনন্দে অভিষিক্ত হইয়া ধন্য হয়।—

তখন মানুষ তার জীবনের প্রান্তভাগে তৃতীয় আশ্রমে, একে একে সকল কর্ম্ম উন্মোচিত করিয়া দেয়—সংসারের সম্বন্ধ সকল একে একে ছিন্ন করিয়া মানব সমাজ হইতে একটু আলগা ভাবে জীবন যাপন করিতে থাকে। কর্ম্মজীবন শেষ হইয়াছে—এখন একটি শান্তিপ্লুত অন্ধকারপূর্ণ নীরব পরিসমাপ্তির জন্য প্রতীক্ষা।

কর্ম্ম সংসারের সমস্ত দুঃখসংক্ষোভ ক্ষয়ক্ষতির ভিতরে সে তাঁহারি পূজা করিয়াছে যিনি শিবং। এক্ষণে সমস্ত দ্বন্দ্বের অবসানে সে তাঁহারি দক্ষিণ বদন নিরীক্ষণ করিতেছে, যিনি অদ্বৈতম্। সে অদ্বৈতম্ একাকারত্ব নহে; সমস্ত বিরোধ ও বিচ্ছেদপরিপূর্ণ করা অদ্বৈতম্।—এক্ষণেই সে পরমানন্দকে লাভ করিল, পরিপূর্ণ আনন্দে নিমগ্ন হইল।

মানুষের এই শেষ জীবনে আবার সে লোকালয় ছাড়িয়া বিশ্বপ্রকৃতির উদার বিস্তারে বিশ্বজোড়া হাওয়া বুক ভরিয়া গ্রহণ করিতে থাকে, সমস্ত কাজকর্ম্মের ভার পুত্রের উপর দিয়া এখন একান্ত নিশ্চিন্ত চিত্তে বাহির হইয়া পড়িবার দিন আসিয়াছে।

সংসার হইতে এই স্বাভাবিক বিদায় গ্রহণেও অনেকে দৈন্য ও কুণ্ঠা বোধ করেন, কর্ম্মের একটা স্বাভাবিক অন্তিমতা আছে, এটা তাঁহারা স্বীকার করিতে চান না। তাই দেখা যায়, বৃদ্ধ হইয়া পলিত কেশে, স্খলিত দন্তে, নিস্তেজ ইন্দ্রিয়শক্তিতে যৌবনের শক্তি সঞ্চারের নিমিত্ত নানারূপ কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করেন। বস্তুতঃ কর্ম্মের বেগার খাটাই যাদের অভ্যাস ও যাদের চরম লক্ষ্য তারা ইহার কোনওখানে শেষ দেখিতে পাইলেই হাহাকারে দিক্ মুখরিত করে।

ফুলের পরিণতি ফলে। তেমনি জীবনেরও এক পর্ব্বের পরিণতি অপর পর্ব্বে। নৈলে পর্ব্বে পর্ব্বে দ্বিজত্বের ক্রমবিকাশ হইতেই পারে না। সাংসারিক জীবন যেমন ব্রহ্মচর্য্য জীবনেরি ক্রমিক পরিণতি তেমনি কর্ম্মচেষ্টা পারশূন্য অন্তিম জীবনও গার্হস্থ্য জীবনেরি পরিণাম। এই স্বাভাবিক বিকাশ যখন আমাদের দৃষ্টি বহির্ভূত থাকে, তখনি জীবনান্ত কাল আমাদের এত শোচনীয় বলিয়া বোধ হয়।

আর এক কথা. কর্ম্ম করিতে করিতে কর্ম্মসূত্রে যখন নানাপ্রকার জটিল গ্রন্থি পড়িতে থাকে,তখন জোড়াতাড়া দিয়া তাহাকে সারিয়া লইতেও বিশ্রামের অবকাশ প্রয়োজন! অন্তিম জীবন ও মৃত্যুই সেই কর্ম্মহীন উদার অবকাশ! ইহারো পরিণতি নব জীবনে। মানুষ তাহার জীবনান্তকালে ও তাহার মৃত্যুর অন্তে সেই নবজীবনেরি জন্ম প্রস্তুত হয়। সুতরাং ইহা যে জীবনের বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহ, এ কথা মনে আনাই মূঢ়তা।

মানুষের এই জীবন সন্ধ্যাসুপ্তশ্যাম মরণের গাঢ়নিশীথ রাত্রির অভিমুখে যখন রওনা হইতেছে, তখন মানুষ বড় আনন্দে সমস্ত মনের সম্বন্ধ হইতে দূরে ভূমার সঙ্গে একাকী মিলিত হয়। পতিব্রতা পত্নী যেমন সারাদিন পতিগৃহের সমস্ত কর্ম্ম একে একে সমাপন করিয়া গৃহ পরিজনের সেবাদি শেষ করিয়া অবশেষে দিনান্তে সন্ধ্যার ম্লানালোকে একান্তে স্বামীর সহিত কল্যানময় মিলনের জন্ত ধৌতপূত হইয়া তুরিরুচির হৃদয়ে পতিসমীপে আগমন করেন, তেমনি গৃহস্থও একে একে বিচিত্র সংসার সম্বন্ধের মধ্যে বিচিত্র কর্ম্মে তাঁহার প্রাণপ্রিয় ভগবানেরই পূজা পরিসমাপ্ত করিয়া জীবনের সন্ধ্যাবাসরে, সমস্ত অহঙ্কার বিসর্জ্জন দিয়া, স্নানস্নিগ্ধদেহে শুভ্র পবিত্র বসনে ভূষিত হইয়া একান্ত উন্মুখ হৃদয়টী ভগবানের চরণারবিন্দ প্রান্তে সমর্পণ করেন।

এই সময়েই ভূমার নিগূঢ় উপলব্ধি! বাধাহীন ব্যবধানহীন পরিপূর্ণ উপলব্ধি! দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ়ভাবে ঘনাইয়া আসে, আলোকের শেষ রশ্মিটুকুও নিঃশেষবিহীন নির্ম্মল বিস্তৃতার মধ্যে অন্ধকারের নিবিড়তর ঘনিমায় সমাচ্ছন্ন হয়—আলোকের তরতর ধারাটুকু অন্ধকারের দিগন্তব্যাপী বিপুলগভীর মৌন নীরবতা পারাবারে চির-বিরাম লাভ করে।

সেই দিন সেই সসীম অসীমের পূর্ণ মিলনের দিন—জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের দিন—সেই দিন তো জীবনের অবসান নয় জীবনের পূর্ণতম বিকাশ! সেই দিনই ত অসীম মৃত্যুর পবিত্র সঙ্গমতীর্থনীরে সেই প্রাণ পাত্রটী কল্যানে, প্রেমে, সুনিবিড় রসে ভরিয়া উঠে। সেই অন্তিম বিবাহ-বাসরে—জীব,ভগবানের স্নিগ্ধ করতলচ্ছায়ায় চিরনির্ব্বাণ লাভ করে—আনন্দে হৃদয় পরিপ্লাবী আনন্দে —বিশ্ব নিখিল পরিপূর্ণ করা গভীরতর আনন্দে। সেই দিনই তাহার জীবনের চরম শান্তি, চরম প্রেম, চরম আরাম! সেই দিনই তাহার প্রিয়তমের সহিত পূর্ণ মিলনে বিরহের একান্ত সমাপ্তি।

এই যে মানুষের দ্বিজত্ব পর্ব্বে পর্ব্বে প্রকাশিত হইতে চলিতেছে--এই পরিণতি প্রবাহ এক জীবনের কি? —ইহা যুগ যুগান্তের, জন্মজন্মান্তরের, ইহা অনাদি ও অনন্ত! ইহার আরম্ভ নাই শেষ নাই—নিত্যকাল হইবে, নিত্যকাল এই লীলা চলিবে এই অসীম অসীমের লীলা এই একের চিরবিচিত্র লীলা।

মায়ার খামখেয়ালি কল্পনে অবিদ্যাযোগে আত্মা স্বপ্ন দেখিতেছেন --এই বিচিত্র বিশ্বমানবের জন্মমৃত্যু উত্থান পতন—একথা সেই অবস্থায়ই মানুষ বলিতে পারে যখন তার অন্তরে দ্বিজত্বের অনুপ্রেরণা জাগে নাই—যখন সে জগৎকে মানুষকে রজস্তমের বিক্ষোভ বলিয়া মনকে ভুলাইয়া রাখে ও জগদীশ্বরকে চিদাভাস বলিয়া দূরে বর্জ্জন করে।

কিন্তু আমরা বলিতেছি, সে কথা আমরা মানিব না। বস্তুতঃ তর্কের দ্বারা যদি বিশ্বসত্যকে উদ্ধার করা যাইত তবে নাস্তিকের মত এত বড় সত্যদর্শী পৃথিবীতে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইত না। সরল বিশ্বাসী যে, সে তার হৃদয়ের গভীর কলভাষার অর্থ বুঝিয়াছে সে বুঝিয়াছে—সেই অনাদি অনন্ত ওঁকার সেই ব্রহ্মমন্ত্র নিনাদিত হইতেছে—চিরদিন বিশ্বের প্রতি অণুতে পরমাণুতে। দ্বিজের দ্বিজত্ব কোথাও আর গোপন নাই, এই মায়িক জগৎ যাহাকে বলিতেছে, এই মায়িক মানুষ যাকে বলিতেছে—সেই মায়ারই ভিতর হইতে সেই অনন্ত সুর উন্মুক্ত অম্বরতলে প্রতিধ্বনিত হইতেছে—সেই

সজলজলদগম্ভীর ওঁকার। সেই "সীমার মধ্যে অসীমের" বীণাধ্বনি।

সমস্ত সীমাকে অখণ্ডকে অখণ্ড অসীম আনন্দগুঞ্জনে সম্মিলিত করিয়া যিনি এই ভূর্ভুবঃস্বঃ জগতের ত্রিতন্ত্রী বাজাইতেছেন। হে তার্কিক! হে পরম বুদ্ধিমান জ্ঞানী? তুমি তাঁর সেই বিশ্বভুবনবিশ্রুত মহাসঙ্গীতের অনুসরণ কি বুঝিবে? বিশ্বপ্রকৃতির শত আবর্তনে ও বিশ্বমানবের বিচিত্র—জন্মমরনবন্ধুর সংসার ক্রীড়ায় যে অনাদি অনন্ত সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা ঝঙ্কারিত হইয়া উঠিতেছে তাহা সেই পরমা-নন্দেরই পূর্ণতার পরিমাপ। প্রতি জীবনে সেই আনন্দ-সঙ্গীতের একটি একটি করিয়া তান লীলায়িত হইয়া মৃত্যুর পূর্ণ সমে আসিয়া শেষ হইতেছে। অনন্ত জন্ম মরণের তালে তালে এই বিরাট্ প্রাণের জয়গান গীত হইতেছে—এ গানের মূল উৎস সেই অসীমে। সেই পরমাত্মা হইতেই সুর সঞ্চারিত হইতেছে—জীবে, পশুতে, পক্ষিতে, বৃক্ষে, বনস্পতিতে, জলে, স্থলে, নিখিল চরাচরে, আবার বিচিত্র ছন্দে, তালে, লয়ে সেই সুরই সমুৎসারিত হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে, সেই উৎসমুখে এমনি করিয়াই সেই পরমপ্রাণ বিশ্ববৈচিত্র্যের মধ্যে আপনারে ঢালিয়া দিয়া আপনাকেই বারম্বার ফিরিয়া ফিরিয়া পাইতেছেন—নিত্য নব নব আকারে—পরিপূর্ণ-তর রূপে।

সেই উৎসর্জ্জন ও গ্রহণের তালে তালে বিশ্বযাত্রা চলিতেছে—নিত্যকাল হইতে নিত্যকাল ব্যাপ্ত করিয়া। এই যাত্রা কোন কালেও শেষ হইবে না। কোন কালেই সেই অনন্ত ব্রহ্ম কোন সমাপ্তির সিংহ দ্বারে আসিয়া বলিতে পারিবেন না যে আর আমি প্রকাশিত হইব না—আমার যাত্রা সাঙ্গ হইল এবং শেষ পর্য্যন্ত অবিশ্বাসীর মুখ বন্ধ করিয়া, তার্কিকের তর্ক প্রতিহত করিয়া, মূঢ়ের অজ্ঞানজাত উদ্ধত আস্ফালন স্তব্ধ করিয়া মানব ও প্রকৃতির দেহ মনের মোহনবীনার তারে তারে সেই সুললিত সঙ্গীত ধ্বনিত হইবে। দ্বিজগণ প্রাণকে প্রসারিত করিয়া বিমুক্ত করিয়া শুনিবেন, সেই ধ্বনি পর্ব্বত কন্দরে, শিখরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শুনিবেন, মহাসমুদ্রের সুগম্ভীর রুদ্র মন্দ্রে সেই ধ্বনি শুনিবেন বিশ্বমানবের পতনাভ্যুদয়বন্ধুর অনন্ত যাত্রাপন্থায় নিয়ত ধ্বনিত সেই ধ্বনি! সেই দিগন্ত ব্যাপ্ত—

আনন্দ নিঃস্বন ওঁ তৎ সৎ ওঁ।

ভারতের আর্য্য ও অনার্য্য।
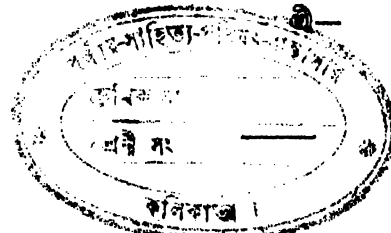
ষষ্ঠ প্রস্তাব—ক্ষত্রিয়বর্ণের কথা।

(অস্তিত্ব ও পরিচয়)

ক্ষত্রিয়-বর্ণ যে ভারতে চিরকাল "আর্য্য" বলিয়া পরিচিত এবং গৃহীত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই; কিন্তু বর্ত্তমান কালের বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতই বলিয়া থাকেন যে কলিযুগে কোথাও ক্ষত্রিয়বর্ণের অস্তিত্ব নাই। সেদিন একজন দেশ বিখ্যাত প্রবীণ ও ভূয়োদর্শী পণ্ডিত মহাশয়ও লেখককে ঐ কথাই বলিতেছিলেন। সময়াভাবে আমরা সেই পূজ্যপাদ পণ্ডিত মহাশয়কে আমাদের মন্তব্য জনাইতে পারি নাই; এক্ষণে যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে সেই কথাই বলিতেছি।

স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে স্মৃতির (যম সংহিতা) উল্লেখ করিয়া "যুগে জঘন্যে দ্বেজাতী ব্রাহ্মণঃ শূদ্র এব চ" শ্লোকার্দ্ধ উদ্ধার করিয়াছেন, মুদ্রিত স্মৃতি শাস্ত্রের পুস্তকে ঐ বাক্য পাওয়া যায় নাই। পাওয়া যাইলেও উহার উপর নির্ভর করা যাইতে পারিত কিনা সন্দেহ। মনুসংহিতা বেদের নিতান্ত অনুগত স্মৃতি বলিয়াই তাহার এত সম্মান। স্মৃতিশাস্ত্রে স্পষ্টই বলা হইয়াছে

যে মনুর মতের বিপরীত অর্থ-প্রকাশিকা স্মৃতির প্রশংসা নাই *। বেদের বিরুদ্ধ মত প্রচার যে স্মৃতির লক্ষ্য, মনু মহারাজ সেই স্মৃতিকে "নিষ্ফল এবং মৃত্যুর পর অন্ধকারে লইয়া যাইবার হেতু" বলিয়া পাঠককে সাবধান করিয়াছেন †। এরূপ অবস্থায় বর্ণাশ্রম ধর্মের বিরুদ্ধ কোন বিধানকে কোন এক স্মৃতির দোহাই দিয়া সমাজে উপস্থিত করিলেই চলিতে পারে না।

প্রথমতঃ, যদি কলিযুগে ব্রাহ্মণ এবং শূদ্র ভিন্ন অন্য কোন বর্ণ (জাতি নহে) আমাদের দেশে না থাকে, তাহা হইলে শ্রীশ্রীমনু মহারাজের মতে ইহাকে "আর্য্যাবর্ত্ত" না বলিয়া "ম্লেচ্ছ দেশ" বলিতে হয়। "চাতুর্বর্ণ্য" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটি বর্ণ কোন দেশে না থাকিলে সে দেশকে "ম্লেচ্ছ দেশ"ই বলিতে হয়। আর মনু মহারাজার মতে 'চাতুর্বর্ণ্য" এবং চতুরাশ্রমকে যথাবিধি রক্ষা করা ক্ষত্রিয়েরই কার্য্য, সুতরাং কোন দেশ হইতে ক্ষত্রিয় বর্ণের একান্ত অভাব হইলে, তথায় হিন্দুদিগের শ্রৌত অথবা স্মার্ত্ত ধর্ম্মই রক্ষা হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, যদি দেশে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য না থাকে এবং সকলেই শূদ্র হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণগণের ও নিত্য শূদ্র সংসর্গ, শূদ্রের যাজন, শূদ্রের নিকট প্রতিগ্রহ প্রভৃতি নিতান্ত নিন্দনীয় অথবা পাতিত্য জনক কার্য্য করিতে হয়। এরূপ অবস্থায় ব্রাহ্মণের "ব্রাহ্মণ্য" রক্ষিত হওয়াও আদৌ সম্ভব নহে।

* "বেদার্থোপনিবদ্ধত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোস্মৃতম্।
মন্বর্থ বিপরীতা যা সা স্মৃতি ন প্রশস্যতে॥"

† "বিরুদ্ধা চ বিগীতা চ দৃষ্টার্থা দৃষ্ট কারণে।
স্মৃতির্ন শ্রুতিমূলা স্যাদ্ যা চৈষ-সম্ভব শ্রুতিঃ॥
দ্বিতীয়াধ্যায়ে, মেধাতিথিধৃত।

যা বেদ বাহ্যাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ।
সর্ব্বাস্তা-নিষ্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠা হি তাঃ স্মৃতাঃ॥৯৫॥ দ্বাদশ অধ্যায়।

যাহা হউক, কলিযুগে, ক্ষত্রিয়বর্ণের ভারত ভূমি হইতে লুপ্ত হওয়ার দুইটি হেতুই প্রায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে প্রথম এবং প্রধান হেতু পরশুরাম কর্ত্তৃক এক বিংশতিবার পৃথিবীকে "নিঃক্ষত্রিয়া" করা এবং দ্বিতীয় হেতু মগধরাজ মহাপদ্মনন্দ কর্ত্তৃক নিখিল ক্ষত্রিয় জাতির ধ্বংস সাধন। আমরা ক্রমশঃ দুইটি আপত্তিরই উত্তর দিতেছি:—

পরশুরামের অবতার সম্বন্ধে পুরাণাদিগ্রন্থে নানা প্রকার উপাখ্যান প্রচলিত আছে। তিনি ভৃগু গোত্রীয় ঋচীক মুনির পৌত্র এবং জমদগ্নি ঋষির পুত্র কিন্তু তাঁহার পিতামহী এবং মাতা উভয়েই ক্ষত্রিয় রাজ কন্যা। তাহার পিতামহী সত্যবতী বিখ্যাত কন্যাকুব্জ পতি গাধিরাজের কন্যা এবং স্বনামধন্য বিশ্বামিত্রের ভগিনী আর তাঁহার জননী রেণুকা ইক্ষ্বাকুবংশীয় রেণু রাজার কন্যা। মহাভারত এবং কতকগুলি পুরাণে পরশুরামের দ্বারা পৃথিবী "নিঃক্ষত্রিয়া" করার উপাখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতের উপাখ্যান অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বলিয়া এখানে ঐটিই তুলিয়া দিলাম।

"একদা জমদগ্নির পুত্রগণ পূর্ব্ববৎ আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, এই অবসরে অনুপপতী মহাবীর কার্ত্তবীর্য্য তথায় উপস্থিত হইলেন। ঋষিপত্নী তাঁহাকে সমুচিত সৎকার করিলেও সেই যুদ্ধ মদমত্ত কার্ত্তবীর্য্য তৎকৃত সৎকারে অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক আশ্রম হইতে হোমধেনুর বৎসকে বলপূর্ব্বক আক্রমণ ও অপহরণ করিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করত আশ্রমের বৃহৎ বৃহৎ পাদপ সকল চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর রাম প্রত্যাগমন করিলে মহর্ষি এই বৃত্তান্ত তাঁহার কর্ণগোচর করিলেন। রাম পিতৃমুখে এই কথা শ্রবণ ও ধেনুকে দরদরিত ধারে অনবরত রোদন করিতে অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে অধীর হইয়া উঠিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ কয়োন্মুখ অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। পরে রুচির শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক রণস্থলে বিক্রম প্রকাশ করিয়া শানিত ভল্লাস্ত্র দ্বারা

কার্ত্তবীর্য্যের সহস্র সংখ্যক অর্গলতুল্য ভুজবল ছেদন করিলে সে তৎক্ষণাৎ অভিভূত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।" মহাভারত, বর্ণপর্ব্ব, তীর্থযাত্রাপর্ব্বাধ্যায় ৺ কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ।

"এই ব্যাপারের পর কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের পুত্রগণ একদিন আশ্রমে আসিয়া রামের অনুপস্থিতি কালে তাঁহার পিতা জমদগ্নিকে নিহত করিয়া গেলেন। রাম যথাসময়ে আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া পিতার মৃতদেহ নিরীক্ষণ এবং সকল বিষয় শ্রবণ করিয়া পরিশেষে পিতার প্রেতকার্য্য সম্পন্ন করিলেন। তিনি পিতৃবধের প্রতিশোধ লইবার জন্য ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করিবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা করিয়া অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক বাহির হইলেন এবং প্রথমেই কার্ত্তবীর্য্যের পুত্রদিগের প্রাণ সংহার করিলেন। তাহার পরে তিনি তাহাদের অনুগত ক্ষত্রিয়দিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। ভৃগুকুলতিলক রাম এইরূপে ক্রমশঃ পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া সমস্ত পঞ্চক তীর্থে রুধিরময় পঞ্চহ্রদ প্রস্তুত করতঃ তথায় পিতৃলোকের তর্পণ করিলেন।" *

এই ত পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয়া করার ব্যাপার! ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে পরশুরাম তাঁহার পিতৃহত্যাকারী কার্ত্তবীর্য্য-তনয়-গণকেই বধ করিয়াছিলেন এবং দক্ষিণাপথের অন্য দুই চারিজন ক্ষত্রিয় যাঁহারা হৈহয়দিগকে সাহায্য প্রদান করিতে আসিয়াছিলেন সম্ভবতঃ তাঁহাদিগকেও বিনাশ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন পরশুরাম যে মহাভারতের অন্যান্য মহাবল পরাক্রান্ত রাজচক্রবর্ত্তিগণের সহিত যুদ্ধার্থে গমন করিয়াছিলেন, তাহা দেখা যায় না।

মহারাজা কার্ত্তবীর্য্য যদুবংশের এক পরম প্রোজ্জ্বল রত্ন ছিলেন। যযাতির জ্যেষ্ঠপুত্র যদুর জ্যেষ্ঠপুত্র সহস্রজিৎ হইতে হৈহয় বংশের ধারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং যদুর অন্যতম পুত্র ক্রোষ্টী অথবা ক্রোষ্টু হইতে বৃষ্ণি, সত্বত, ভোজ, অন্ধক, কুকুর ইত্যাদি বহুতর শাখা প্রশাখা নির্গত হইয়াছিল। বায়ু, বিষ্ণু, ভাগবত এবং মৎস্য পুরাণ ও হরিবংশের বংশ তালিকা আমরা উত্তমরূপে মিলাইয়া পাঠ করিয়া দেখিয়াছি; তাহাতে দেখা গিয়াছে যে পরশুরামের হস্তে কার্ত্তবীর্য্যের সমস্ত পুত্রই বিনাশপ্রাপ্ত হন নাই; তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে জয়ধ্বজ, শূরসেন, বৃষভ, মধু ও উর্জ্জিত (মতান্তরে অন্য নামও পাওয়া যায়) এই পঞ্চবীরের বংশ রক্ষা পায় এবং জয়ধ্বজ হইতেই বিখ্যাত তালজঙ্ঘ এবং হৈহয় ক্ষত্রিয়দিগের অগণ্য শাখা প্রশাখা প্রসারিত হইয়া পড়ে। পরন্তু ক্রোষ্টুর বংশ হইতে যে অগণ্য শাখা প্রশাখা বাহির হইয়া প্রায় সমগ্র ভারতকে আচ্ছাদিত করিয়াছিল, তাহা, যদুবংশের বংশ বিবরণ একটু মিলাইয়া দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন। এখনও এই ভারতবর্ষে কার্ত্তবীর্য্য অথবা হৈহয় বংশীয় ক্ষত্রিয়েরা (কলচুরি চেদি এবং অন্যান্য নামে) আপন আপন প্রভাব রক্ষা করিতেছেন, যাদব ক্ষত্রিয়গণের ত কথাই নাই *।

ভার্গব পরশুরাম ক্ষত্রিয় বিনাশার্থ যে কোনও দিন আর্য্যাবর্ত্তের সূর্য্য অথবা চন্দ্রবংশীয় সম্রাট্গণের রাজধানীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে রামায়ণ ও মহাভারতে

---

* ৺ কালিপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের অনুবাদ খুব প্রসিদ্ধ সুতরাং মূল তুলিবার আবশ্যকতা নাই। কেবল পরশুরাম যে অর্জ্জুনতনয়গণকে এবং তাহাদের অনুগত ক্ষত্রিয়দিগকে বিনাশ করিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে শ্লোক দুইটী উদ্ধার করিতেছি—

"সংক্রুদ্ধোঽতিবলঃ সংখ্যে শস্ত্রমাদায় বীর্য্যবান্।
জঘ্নিবান্ কার্ত্তবীর্য্যস্য সুতানে কোঽন্তকোপমঃ ॥৭॥
তেষাং চানুগতা যে চ ক্ষত্রিয়াঃ ক্ষত্রিয়র্ষভ।
তাংশ্চ সর্ব্বান বামৃদত্রামঃ প্রহরতাং বরঃ ॥৮॥"

বনপর্ব্ব ১১৭ অধ্যায়।

* বায়ুপুরাণ ৯৪ অধ্যায়, বিষ্ণুপুর ৪র্থ অংশ, ভাগবত নবমস্কন্ধ; ২৩ অধ্যায়, মৎস্যপুরাণ ৪৩ অধ্যায় ও হরিবংশ, হরিবংশ পর্ব্ব। Tods Rajsthan Vol I.

কোন নিদর্শনই পাওয়া যায় না। অবশ্য বিষ্ণুপুরাণে (এবং অন্যান্য কোন কোন পুরাণে ও বটে) পরশুরামের অযোধ্যায় আগমনের এবং তাঁহার ভয়ে তৎকালীন সম্রাটের অন্তঃপুরে পলায়ন গল্প লিখিত আছে বটে, কিন্তু আমরা উহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নাহি। রামায়ণে এই বীর চরিত রাজার নামটি পর্য্যন্ত নাই। সূর্য্যবংশের ইতিহাসের কোন কথা বাল্মীকির রামায়ণে না থাকিলে, তাহা গ্রহণ করা উচিত নহে বলিয়াই আমরা মনে করি।

পরশুরামের দ্বারা একবিংশতিবার পৃথিবীকে "নিঃক্ষত্রিয়া" করার উপাখ্যান আদৌ আমরা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। প্রথমেই এই কথা লক্ষ্যকরা উচিত যে "নিঃক্ষত্রিয়া" শব্দের "নঙ্" অল্পার্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে, যে হেতু পৃথিবীকে একবার "নিঃক্ষত্রিয়া" করিলে দ্বিতীয় বার আর "নিঃক্ষত্রিয়া" করা অসম্ভব। তাই, আমরা অল্পার্থে "নঙ্" এর প্রয়োগ স্বীকার করিয়া লইতেছি। পৌরাণিক উপাখ্যানে লিখিত আছে যে ভগবানের অবতার অন্তঃসত্ত্বা ক্ষত্রিয়-নারীদিগকেও বধ করিয়াছিলেন, কাজেই একটিও ক্ষত্রিয় পুরুষ (শিশু পর্য্যন্ত) অবশিষ্ট ছিল না; পরে পতিপুত্র হীনা বিধবা ক্ষত্রিয়াগণ "নিয়োগ" ধর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণগণ হইতে পুত্রোৎপাদন করিতে থাকায় পৃথিবী পুনঃ পুনঃ ক্ষত্রিয়ে পূর্ণ হইয়া উঠে এবং তাই ভগবান পুনঃ পুনঃ তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া একবিংশতিবারের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছিলেন। একবিংশতিবারের পর যে সকল অবীরা ক্ষত্রিয়া ছিলেন, তাঁহাদিগের গর্ভে ব্রাহ্মণগণ নিয়োগ ধর্ম্মানুসারে যে সকল পুত্রের উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাহারাই ক্রমশঃ পৃথিবী পূর্ণকরিয়াছিল। *

পৌরাণিক এই উপাখ্যানের সত্যতা অনুসন্ধান করিতে হইলে কতকগুলি বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে; তন্মধ্যে—

(১) পরশুরামের বংশ বিবরণ এইরূপ :—

ব্রহ্মার পুত্র ভৃগু + পৌলোমী
|
চ্যবন + সুকন্যা
|
ঔর্ব
|
ঋচীক + সত্যবতী গাধিরাজার কন্যা ও বিশ্বামিত্রের ভগিনী
|
জমদগ্নি + রেণুকা (ইক্ষ্বাকুবংশীয় রেণুরাজার কন্যা)
|
রাম (পরশুরাম)

সুতরাং রাম (পরশুরাম) রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের ভাগিনেয়। এই বিশ্বামিত্র বুধের পুত্র পুরুরবার পঞ্চম পুত্র বিজয় (মতান্তরে অমাবসু) হইতে একদশ পুরুষ অধস্তন †

(২) কার্ত্তবীর্য্য (অর্জ্জুন) পরশুরামের শত্রু এবং ইনি পরশুরামের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। এই কার্ত্তবীর্য্য পুরুরবার জ্যেষ্ঠপুত্র আয়ু হইতে পঞ্চদশ পুরুষ অধস্তন। এই কার্ত্তবীর্য্য সত্যযুগের রাজা ‡।

(৩) ত্রেতা যুগের শেষ ভাগে হরধনুর্ভঙ্গ ব্যাপার লইয়া শ্রীরামচন্দ্রের সহিত পরশুরামের কলহ এবং রামচন্দ্রের দ্বারা পরশুরামের তেজোহরণ। ¶

---

† "অশ্মকস্য মূলকো নাম পুত্র হভবং ॥৭৩॥ যোহসৌ নিঃক্ষত্রে ক্ষাতলেহস্মিন ক্রিয়মানে স্ত্রীভিবিস্ত্রভিঃ পরিবার্য রক্ষিতঃ ততস্তং নারীকবচ মুদাহরন্তি ॥৭৪॥ "বিষ্ণুপু ৪র্থ অংশ ৪র্থ অধ্যায়। শ্রীমদ্ভাগবত। ৯ম স্কন্ধ, ৯ম অধ্যায়। রামায়ণে বংশ পরিচয়ে এই "অশ্মক" এবং "মূলক". রাজার নামও নাই, তাঁহাদের জন্মের উপকথাও নাই।

* মহাভারত, আদিপর্ব্ব, সম্ভবপর্ব্বাধ্যায়।

† মৎস্যপুরাণ, ১৯৪ অধ্যায়।

‡ বায়ুপুরাণ ৯১ অধ্যায়, মৎস্যপুরাণ ২৪ অধ্যায়, বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ অংশ, হরিবংশ, হরিবংশপর্ব্ব ¶

¶ রামায়ণ, আদিকাণ্ড।

(৪) (ক) দ্বাপরযুগের শেষ ভাগে কুরুবংশাবতংস ভীষ্ম দেবের সহিত পরশুরামের যুদ্ধ এবং তাহাতে কেহই জয়লাভে সমর্থ হন নাই; *

(খ) পরশুরাম অঙ্গরাজ কর্ণকে প্রথম যৌবনে অস্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন।†।

এই কয়টি পৌরাণিক বিষয় একত্র করিয়া তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে,

(১) যে পরশুরাম সত্যযুগে মহিষ্মতী পুরাধিপতি হৈহয় রাজ কৃতবীর্য্য নন্দনকে বধ করিয়াছিলেন, (২) তিনিই ত্রেতা যুগের অন্তিম সময়ে রঘুকুল চূড়ামণি শ্রীরামচন্দ্রের নিকট হত-দর্প হন এবং (৩) তিনিই দ্বাপরের শেষ কুরুকুল কমল ভীষ্ম-দেবের সহিত যুদ্ধ করেন। দ্বাপর যুগের বৎসর সংখ্যা লৌকিক্ হিসাবে ৮,৬৪,০০০ আটলক্ষ চৌষট্টি হাজার বৎসর এবং ত্রেতার পরিমাণ ১২,৯৬,০০০ বারলক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার বৎসর ‡। যদি কার্ত্তবীর্য্যের সহিত পরশুরামের যুদ্ধ সত্যযুগের শেষ দিবসেও হইয়া থাকে, তাহাহইলে মহাভারতের যুদ্ধের সময় তাঁহার বয়স অন্ততঃ ২১,৬০,০০০ একবিংশলক্ষ এবং ষষ্টি সহস্র বৎসরেরও উপর কুড়ি পঁচিশ বৎসর অধিক হইয়াছিল বলিতে হয়। কোনও পৌরাণিক পণ্ডিতই কোন মনুষ্যের পরমায়ু এরূপ দীর্ঘ হইতে পারে বলিতে পারিবেন না; এবং এই জন্যই কোন কোন পুরাণে পরশুরামকে অমর বা চিরজীবী বলা হইয়াছে।

এই ত গেল পরশুরামের পরমায়ুর হিসাব;—এরূপ লোকের সম্বন্ধে কোন কথাকে ঐতিহাসিক তথ্য বলিয়া বিশ্বাস করা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার দ্বারা পৃথিবী "নিঃক্ষত্রিয়" করার প্রবাদ যে মূলতঃ কাল্পনিক, তাহা নিম্ন-লিখিত বৃত্তান্ত হইতেও উপলব্ধি হইয়া থাকে;—

(২) রামায়ণ এবং মহাভারতের অথবা কোন পুরাণের বংশানুচরিত বর্ণনা কালে সূর্য্য এবং চন্দ্রবংশীয় রঘু, যদু, কুরু, পঞ্চাল, বিরাট, কুন্তি, ভোজ, মৎস্য, মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র ইত্যাদি কোনও শাখার কোন বিশেষ ক্ষত্রিয়রাজ পরশুরামের হস্তে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া লিখিত হয় নাই, অন্ততঃ আমাদের দৃষ্টিতে পড়ে নাই। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে, অবশ্য পরশুরামের ভয়ে পলায়িত এবং লুক্কায়িত কতকগুলি রাজার নাম দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু যে দেশে মহা-ভারত সংগ্রামে হতাহত এবং পলায়িত বীরপুরুষগণেরই সংখ্যা ১৬৬,০০,৪৪,১৬৫ (একশত ছয়ষট্টি কোটী, চুয়াল্লিশ হাজার এবং একশত পয়ষট্টি) ¶ বলিয়া কথিত হইয়াছে, সে দেশ যে কখনও কাহারও দ্বারা বীর শূন্য হইয়াছিল, তাহা আদৌ মনে হয় না। এই গণনার সহিত আদিপর্ব্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ের "অক্ষৌহিনীর" হিসাব মিলিবে না; সে জন্য কৌতূহলী পাঠক মহাশয়কে আমরা উদ্যোগপর্ব্বের ১৫৫ অধ্যায় এবং ভীষ্মপর্ব্বের ২১ অধ্যায় মিলাইয়া পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। এতৎ প্রসঙ্গ বিবেচনার সময় পাঠক মহাশয় কৃপা করিয়া মনে রাখিবেন যে মহাভারতীয় যুদ্ধের সময় "ভারতবর্ষ" দেশ অনেক বৃহৎ ছিল। আমাদের প্রথম প্রস্তাবে "ভারতবর্ষের" যে আয়তনের কথা বলিয়াছি, তাহা মনে রাখিলেই এরূপ সংখ্যাধিক্যে বিশেষ-রূপে বিস্মিত হওয়ার কথা থাকিবে না।

(৩) যাহা হউক, পরশুরামের নিখিল ক্ষত্রিয় হত্যার কথায় সে কালের ভীষ্মদেবেরও প্রত্যয় হয় নাই। অম্বোপাখ্যান

---

* মহাভারত, উদ্যোগ পর্ব্ব, অম্বোপাখ্যান পর্ব্বাধ্যায়।

† মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব।

‡ মনুসংহিতা। ১ম অধ্যায়, ৬৯—৭১ শ্লোক। বিষ্ণু, মৎস্য, বায়ু এবং ভাগবত পুরাণ।

¶ মহাভারতের যুদ্ধে উভয়পক্ষে কত বীর হত এবং পলায়িত হইয়াছিল, ধৃতরাষ্ট্রের এই প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন,—

"দশাযুতানামযুতং সহস্রানি চ বিংশতিঃ।
কোট্যঃ ষষ্টিশ্চ ষট্‌চৈব হ্যস্মিন রাজন্ মৃধে হতাঃ ॥৯॥
অলক্ষিতানাং বীরাণাং সহস্রাণি চতুর্দ্দশ।
দশচান্যানি রাজেন্দ্র শতং ষষ্টিশ্চ পঞ্চ চ ॥১০॥ মহাভারত,
স্ত্রী পর্ব্ব, ২৬ অধ্যায়।

পর্ব্বাধ্যায়ে ভীষ্মদেবের সহিত পরশুরামের যে যুদ্ধের বর্ণনা আছে, সেই যুদ্ধের প্রাক্কালে ভীষ্মদেব পরশুরামকে বেশ দুই চারিটী কটুকথা শুনাইয়াছিলেন বলিয়া লিখিত আছে। এই সময়ে ভীষ্ম স্পষ্টভাষায় বলিয়াছিলেন যে পূর্ব্বে পরশুরাম কোন প্রকৃত ক্ষত্রিয়বীরের সম্মুখীন হন নাই, তাই তাঁহার দর্প বাড়িয়াছে, এই বারে তাঁহার সেই দর্প চূর্ণ হইয়া যাইবে এবং তিনি যমন সদনে গমন করিবেন।

(৪) ভারতের শাক্ত সম্প্রদায়ের মতে অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত "ভাগবত পুরাণ" বলিতে "দেবী ভাগবত পুরাণ" নামক গ্রন্থকেই বুঝাইয়া থাকে এবং তাঁহারা "বিষ্ণু ভাগবত"কে কৃত্রিম পুরাণ (এবং দ্বাদশ শতাব্দীর দক্ষিণাপথের সচিবশ্রেষ্ঠ হেমাদ্রি পণ্ডিতের আশ্রিত বৈয়াকরণ বোপদেবের রচিত) বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন এবং বৈষ্ণবেরা আবার ঠিক ইহার বিপরীত উক্তি করিয়া থাকেন। এই দুইখানি "ভাগবত" লইয়া উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে খুব সাম্প্রদায়িক বিবাদ চলিয়াছে এবং সেই বিবাদ অবলম্বনে অনেকগুলি পুস্তিকাগুলির গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। এই "দেবী ভাগবতে" পরশুরাম কর্ত্তৃক কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনের বিনাশ কিংবা পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করার কোন প্রসঙ্গ নাই পরন্তু উহাতে হৈহয় রাজবংশের সহিত ভার্গব বিপ্রবর্গের বিবাদের এক সম্পূর্ণ পৃথক্ উপখ্যানের বর্ণনা আছে।

এই পুরাণ বলিতেছেন, "পুরাকালে হৈহয় বংশে সসাগরা পৃথিবীর একচ্ছত্র এক সম্রাট্ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ভগবান্ শ্রীহরির অবতার, দত্তাত্রেয়ের শিষ্য, সর্ব্বকার্য্যে সিদ্ধ, সর্ব্বার্থবিদ মহাবল পরাক্রমশালী ছিলেন। তাঁহার নাম কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন এবং তাঁহার সহস্র বাহু ছিল। ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণেরা তাঁহার পুরোহিত ছিলেন। সম্রাট্ কার্ত্তবীর্য্য অসংখ্য যজ্ঞ সম্পাদন করতঃ পুরোহিত ভার্গবদিগকে অকাতরে এবং অজস্র অর্থদান করিতেন এবং তন্নিমিত্ত পুরোহিতগণ অতুলনীয় ধনসম্পদের অধীশ্বর হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের হস্তী হিরণ্যের বর্ষা শতমুখে ঘোষিত হইতে লাগিল। পৃথিবীতে তৎকালে ভার্গবদিগের ন্যায় বিত্তশালী আর কেহই রহিলেন না।

"অবশেষে মহারাজ চক্রবর্ত্তী কার্ত্তবীর্য্য স্বর্গারোহণ করিলেপর তাঁহার বংশ সম্ভূত হৈহয়গণ ক্রমশঃ নির্ধন হইয়া পড়িলেন। নিতান্ত কষ্টে পড়িয়া তাঁহারা তাঁহাদের কুলপুরোহিত ভার্গবদিগের দ্বারস্থ হইলেন এবং পাদবৃদ্ধি (সিকি অর্থাৎ শতকরা ২৫ টাকা সুদ) স্বীকার করিয়া নিতান্ত বিনয় সহকারে কিঞ্চিৎ ধন প্রার্থনা করিলেন। ভার্গবগণ কিন্তু রাজপুত্রগণের বিপদে কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইলেন না, তাঁহারা পুনঃ পুনঃ "ধন নাই" "ধন নাই" বলিয়া রাজপুত্রদিগকে ফিরাইয়া দিলেন এবং কেহ নিজ ধন ভূমিগর্ভে প্রোথিত করিতে লাগিলেন, কেহ বা অন্যের নিকট রাখিয়া দিলেন, এবং কেহ বা স্থানান্তরে রাখিয়া আসিলেন। এইরূপে লোভী ব্রাহ্মণগণ ধনসম্পত্তি নিরাপদ স্থানে রাখিয়া দিয়া নিজের আবাসবাটী পরিত্যাগ করতঃ গিরি গুহাদি দুর্গম স্থানে আশ্রয় লইলেন তথাচ বিপন্ন যজমানগণকে একটি কপর্দ্দক দিয়াও সাহায্য করিলেন না।

"এই কার্য্যের ফলে হৈহয় রাজকুমারগণ অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া পুরহিতগণের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং শূন্যগৃহ সকল দেখিয়া গৃহের নানাস্থানে খনন করিতে লাগিলেন এবং কচিৎ কোনস্থানে ভূগর্ভে নিহিত বিত্তরাশি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা এইরূপে গৃহ হইতে গৃহান্তরে গমন পূর্ব্বক অর্থানুসন্ধান করিতে লাগিলেন এমন কি ভার্গবদিগের প্রতিবেশী ব্রাহ্মণগণের গৃহও বাদ পড়িল না,—ফলে ব্রাহ্মণদিগের উপর অকথ্য অত্যাচার হইতে লাগিল। ক্ষত্রিয়গণ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত, সুতরাং তাঁহারা নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে ব্রাহ্মণদিগকে নানা প্রকার বধ করিতে লাগিলেন; ব্রাহ্মণীদিগের গর্ভচ্ছেদ করিয়াও শিশু হত্যা করিতে

* এখানে পরশুরামের হস্তে কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনের বিনাশের কোন উল্লেখ নাই, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়, সন্দেহ নাই।

লাগিলেন ; এক কথায়, ব্রাহ্মণদিগের দুর্দ্দশার একশেষ হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণেরা প্রাণভয়ে নানাদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণীরা হাহাকার রবে গগন বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন।" দেবী ভাগবত, ষষ্ঠস্কন্ধ ; ষোড়শ অধ্যায় ;

এই দেবী ভাগবত পুরাণে ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণগণকে "চৌরসদৃশ, বকবৃত্তি, প্রতারক, দম্ভেনিপুণ" ইত্যাকার শব্দে বর্ণনা করা হইয়াছে। অবশেষে পুরাণকার বলিতেছেন, "ভৃগুবংশজ-ব্রাহ্মণগণ লোভ রূপ পাপেই উৎসন্ন গেল, হৈহয়গণ কেবল নিমিত্তের ভাগী হইয়াছিলেন মাত্র।" (এই উপাখ্যান অত্যন্ত বিস্তৃত বলিয়া মূল শ্লোকাবলী উদ্ধার করিলাম না)।

আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ প্রত্যেক পুরাণকে প্রকৃতই ব্যাসদেবের রচিত বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন ; তাঁহারা অতঃপর পরশুরাম কর্ত্তৃক হৈহয় বংশ ধ্বংস করার উপাখ্যান সম্বন্ধে কিরূপ বিবেচনা করেন, তাহা জানিবার নিমিত্ত কৌতূহল জন্মে। যাহা হউক, পরশুরাম যে একাকী কুঠার হস্তে সে কালের বিশাল ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে পদব্রজে পরিভ্রমণ করিয়া প্রত্যেক ক্ষত্রিয় বীরপুরুষের (শিশু সন্তান পর্য্যন্ত) শিরশ্ছেদন করিয়াছিলেন,—এবং তাঁহার কুঠারের নিম্নে যাবতীয় ক্ষত্রিয় রাজা তাঁহাদের পুত্র, অমাত্য, আত্মীয় স্বজন ও প্রজাবর্গের সহিত স্বেচ্ছায় মাথা কাটিবার জন্য পাতিয়া দিয়াছিলেন ইহা কোনমতেই বিশ্বাস যোগ্য নহে। তাহার পর, স্বেচ্ছায় শিরঃসমর্পণ করিলেও, একজন লোকে কুঠারের দ্বারা কোটী কোটী ব্যক্তির মাথা কাটিতে পারেন, তাহাও সম্ভব নহে। ইহার উপরে, ভগবানের অবতার বলিয়া পরিচিত কোনও ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ যে বিনা দোষে এরূপ অগণ্য মানবের প্রাণ দণ্ড করিবেন, তাহা মনেও আনিতে পারা যায় না।

আরও একটী বিশেষ কথা বিবেচনা করিতে হইবে। ত্রেতাযুগের পূর্ব্বেই যদি পরশুরাম পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়হীন, করিতেন, তাহা হইলে ত্রেতাযুগের ধর্ম্মশাস্ত্র গৌতম স্মৃতি, দ্বাপরযুগের ধর্ম্মশাস্ত্র শঙ্খ ও লিখিত মুনির স্মৃতি এবং কলি যুগের ধর্ম্মশাস্ত্র পরাশর * স্মৃতিতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারি বর্ণের ভেদ বর্ণনা, এবং তাহাদের প্রত্যেকের জন্য বিহিত ধর্ম্মের ও আচারের ব্যবস্থা কখনও লিপিবদ্ধ হইত না, পরন্তু স্পষ্ট ভাষায় লিখিত হইত যে পরশুরাম কর্ত্তৃক ভারতবর্ষের নিখিল ক্ষত্রিয় বর্ণের ধ্বংস হওয়ায় আর তাহাদের অস্তিত্ব মাত্র নাই। কলিযুগের ধর্ম্মশাস্ত্র পরাশর স্মৃতিতে ক্ষত্রিয় বর্ণের লোপাপত্তির সংবাদ যখন আদৌ দৃষ্ট হয় না,—বরং ক্ষত্রিয় বর্ণের কর্ত্তব্যাদির কথা জ্বলন্ত অগ্নির অক্ষরে বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায় † তখন আমরা স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ধৃত "যুগে জঘন্যে" ইত্যাদি শ্লোকাংশের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে পারি না।

আর, মজ্জমানজনের তৃণ খণ্ডকে আশ্রয় করার ন্যায় যাঁহারা মনু মহারাজের দশম অধ্যায়ের "শনকৈস্তু ক্রিয়া লোপাৎ" ইত্যাদি শ্লোকের উল্লেখ করিয়া সমগ্র ভারত হইতে ক্ষত্রিয় বর্ণের একান্ত অভাব ঘোষণা করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে আমরা ঐ শ্লোক দুইটী পুনশ্চ ভাল করিয়া পাঠ করিতে অনুরোধ করি। এই শ্লোকে "ইমা ক্ষত্রিয়-জাতয়ঃ" বলিয়া সেই জাতিগুলির তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে পরে আমাদের বক্তব্য বিস্তৃত ভাবে বলিতে হইবে।

এ পর্য্যন্ত যতদূর দেখা গেল, তাহাতে পরশুরামের পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করার উপাখ্যানটীর কোন ঐতিহাসিক মূল

* "কৃতেতু মানবো ধর্ম্মস্ত্রেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ।
দ্বাপরে শঙ্খ লিখিতো কলৌ পারাশর স্মৃতঃ॥
প্রথম অধ্যায়, পরাশর স্মৃতি।

† "দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডল ভেদকৌ।
পরিব্রাড় যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখে হতঃ॥৩৭॥
যত্র যত্র হতঃশূরঃ শত্রুভিঃ পরিবেষ্টিতঃ।
অক্ষয়ান লভতে লোকান্ যদি ক্লীবং ন ভাষতে॥৩৮॥
জিতেন লভতে লক্ষ্মীং মৃতেনাপি সুরাঙ্গনাঃ।
ক্ষণ বিধ্বংসিকেহস্মিন্ কা চিন্তা মরণে রণে?॥৩৯॥
ইত্যাদি পরাশর সংহিতা, তৃতীয় অধ্যায়।

খুঁজিয়া পাওয়া গেল না; এইবার মহাপদ্মনন্দের কথা। বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থ অংশের ২৪ অধ্যায়ে লিখিত আছে,—

"মহানন্দীর পর শূদ্রাগর্ভোদ্ভব অতিলুব্ধ, অতিবল, মহাপদ্ম নামা নন্দ অপর পরশুরামের মত অখিল ক্ষত্রিয়ান্তকার হইবেন। তাঁহার পরে শূদ্র নৃপতিগণ হইবেন।" †

শ্রীমদ্ভাগবতেও, দ্বাদশ স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে,

"মহানন্দি পুত্র শূদ্রীগর্ভোদ্ভব, বলবান্, মহাপদ্ম নামা নন্দ, ক্ষত্র বিনাশকারী হইবেন। তাঁহার পরে, নৃপতিগণ শূদ্র প্রায় এবং অধার্ম্মিক হইবেন।" †

বায়ু পুরাণ এবং মৎস্যপুরাণেও ঠিক এই ভাবেরই শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায় ‡

পুরাণগুলির ঐতিহাসিক ভাগে ভবিষ্য রাজবংশ বর্ণন প্রসঙ্গে এই বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণের এই অংশ ভারতের প্রাচীন ইতিহাস সঙ্কলন করিবার অতি আবশ্যক ও মূল্যবান উপাদান; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে আমাদের দেশের কোন পণ্ডিত মহাশয়ই এই অংশের সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে অনুসন্ধান অথবা আলোচনা করেন নাই। মহারাষ্ট্র দেশের মহামনস্বী পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় সার রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর মহাশয় তাঁহার "দক্ষিণাপথের ইতিহাস" (History of Dekkan) নামক সুলিখিত গ্রন্থে এই পৌরাণিক উপাদান কিছু কিছু ব্যবহার করিয়াছেন কিন্তু তাহার পর আর কাহাকেও ইহার মূল্যের অনুরূপ উপযোগ করিতে দেখি নাই। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় ভাণ্ডারকরের সুযোগ্য পুত্র ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর মহাশয় মৌর্য্য বংশের (অথবা মৌর্য্য সময়ের) এক ক্ষুদ্র ইতিহাস ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার এই পুস্তকে পৌরাণিক উপাদানের যথাযথ প্রয়োগ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

যাহা হউক, মহাপুরাণের মধ্যে গণনীয় সমুদায় গ্রন্থেই লিখিত রহিয়াছে যে শেষনাগবংশীয় শেষ ভূপতি মহানন্দীর পর শূদ্রাগর্ভোদ্ভব মহাবল-পরাক্রান্ত এই মহাপদ্মনন্দী একচ্ছত্র সম্রাট্ হইয়া দ্বিতীয় পরশুরামের মত অখিল ক্ষত্রিয় কুল বিনাশ করিবেন এবং তাঁহার পরের নৃপতিগণ শূদ্র (অথবা শূদ্র প্রায় এবং অধার্ম্মিক) হইবেন। এই বর্ণনার পরেই পুরাণে চাণক্যকর্ত্তৃক নন্দ-বংশধ্বংস ও মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেকের প্রস্তাব দেখিতে পাওয়া যায়। ইতিহাসের সময় লইয়া বিবেচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে মগধের শেষনাগবংশীয় (অথবা শিশুনাগ, শিশুনাভ, শিশুনাক,—পাঠান্তর) ষষ্ঠরাজা অজাতশত্রুর সময়ে কপিলবাস্তু নগরে শাক্যবংশে গৌতম-বুদ্ধের আবির্ভাব হয় এবং তাঁহার জীবদ্দশায়ই বৌদ্ধধর্ম্ম বিশেষ ভাবে আর্য্যাবর্ত্তের প্রাচ্যভূভাগে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। গৌতমবুদ্ধের অল্পকাল পূর্ব্বে জৈনধর্ম্মের জীবনদাতা শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীরস্বামীরও অভ্যুদয় এবং তাঁহার দ্বারা মগধ ও তাহার সন্নিহিত প্রদেশে জৈনধর্ম্মের প্রসার ও প্রতিপত্তি ঘটিয়াছিল। ঐ সময়ে প্রাচ্যভারতে মগধ, কোশল ও শ্রাবস্তী প্রভৃতি প্রদেশে যে সকল রাজবংশ শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিলেন, তাঁহারা কেহ বা জৈনধর্ম্মের এবং কেহ বা বৌদ্ধধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক হইতে ছিলেন। মহাপদ্মনন্দীও এইরূপ জৈন অথবা বৌদ্ধ (অর্থাৎ

---

† "মহানন্দিনস্ততঃ শূদ্রাগর্ভোদ্ভবোঽতি লুব্ধোঽতি বলো মহাপদ্ম নামা নন্দঃ পরশুরাম ইবাপরোঽখিল ক্ষত্রান্তকারী ভবিষ্যতি ॥২০॥ ততঃ প্রভৃতি শূদ্রা ভূপালা ভবিষ্যন্তি ॥২১॥" বিষ্ণুপুরাণ ৪র্থ অংশ ২৪ অধ্যায়।

† "মহানন্দিসুতো রাজন্ শূদ্রীগর্ভোদ্ভবো বলী ॥৮॥
মহাপদ্ম পতিঃ কশ্চিন্নন্দঃ ক্ষত্র বিনাশকৃৎ।
ততো নৃপা ভবিষ্যন্তি শূদ্রপ্রায়াস্ত্বধার্ম্মিকাঃ ॥৯॥
শাসিষ্যতি মহাপদ্মো দ্বিতীয়ইব ভার্গবঃ ॥১০॥" দ্বাদশ স্কন্ধ, প্রথম অধ্যায়।

‡ বায়ুপুরাণ, ৯৯তম অধ্যায়, মৎস্য পুরাণ, ২৭২ তম অধ্যায়।

অবৈদিক বা নাস্তিক) ধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক স্বরূপে পৌরাণিক ধর্ম্মের রক্ষক কোন কোন ক্ষত্রিয়রাজাকে পরাস্ত অথবা নিহত করিয়া থাকিবেন। বৌদ্ধ-ইতিহাসে মৌর্য্যবংশীয় অশোকবর্দ্ধন সম্রাটের এবং জৈন-ইতিহাসে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য ও তাঁহার বংশধর সম্রাট সম্প্রীতির আদান পরম্পরার কথা খুব উচ্চ প্রশংসার সহিত কীর্ত্তিত হইয়াছে। আমাদের মনে হয় যে, মগধ সাম্রাজ্যে বৌদ্ধ এবং জৈনধর্ম্ম রাজধর্ম্মরূপে গৃহীত হওয়ায় পুরাণ শাস্ত্রে এইরূপে ক্ষত্রিয়বংশ বিনাশের কথা কথিত হইয়াছে এবং এই জন্যই লিখিত হইয়াছে ব্রাহ্মণের নিকট অবৈদিক জৈন অথবা বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী রাজা শূদ্র অথবা শূদ্রপ্রায় অধার্ম্মিক রূপেই বর্ণিত হইয়াছেন। এই কারণেই মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তকে "মুদ্রারাক্ষস" নাটকে পুনঃ পুনঃ "বৃষল" বলা হইয়াছে।* "বৃষল" শব্দের অর্থ বৈদিক ধর্ম্মের অবহেলাকারক।

পৌরাণিক ইতিহাসে, প্রসিদ্ধ অন্ধ্রবংশের পর, অনেকগুলি রাজবংশের নাম ও বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল রাজবংশের বিবরণ অত্যন্ত কৌতূহল-জনক হইলেও বর্ত্তমান প্রবন্ধে উহাদের আলোচনার উপায় নাই। আমাদের ইচ্ছা আছে যে প্রবন্ধান্তরে ইঁহাদের প্রসঙ্গ প্রতিভার পাঠকমহাশয়দিগের নিকটে নিবেদন করিব। সম্প্রতি এই মাত্র বলিতে চাই যে মগধের মহাপদ্মনন্দী কর্ত্তৃক নিখিল ক্ষত্রিয় নাশের কথা দেশের কোন প্রসিদ্ধ রাজবংশের ইতিহাস অথবা বংশাবলীতে দেখিতে পাওয়া যায় না। পরন্তু সর্ব্বজন-প্রমাণ্য বায়ু এবং মৎস্যপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় যে মগধের শেষনাগ অথবা শিশুগণ বংশীয় রাজগণের রাজ্যকালে এই দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, একই সময়ে ইক্ষ্বাকু বংশীয় চতুর্বিংশ, পাঞ্চাল বংশীয় পঞ্চবিংশতি, কালক বংশীয় চতুর্বিংশ, হৈহয় বংশীয় চতুর্বিংশ, কলিঙ্গ বংশীয় দ্বাত্রিংশৎ, শকবংশীয় পঞ্চবিংশ, কুরুবংশীয়, ষট্‌ত্রিংশ, মৈথিলবংশীয় অষ্টাবিংশতি, শূরসেনবংশীয় ত্রয়োবিংশ, এবং বীতিহোত্রবংশীয় বিংশতি শাখার (অথবা জন) ক্ষত্রিয় রাজবংশ রাজত্ব করিতেছিলেন *। এতদ্ভিন্ন দক্ষিণাপথে যদুবংশীয় অগণ্য ক্ষত্রিয় বিদ্যমান ছিলেন। মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে নাগবংশের অবান্তর শাখা-প্রসূত এক মহাপদ্মনন্দ দ্বারা আর্য্যাবর্ত্তের এতগুলি ক্ষত্রিয় বংশের নিঃশেষে ধ্বংস হইয়া থাকিলে মৌর্য্যবংশের সময়ে সম্পূর্ণ ভারত বর্ষের ক্ষত্রিয় রাজবংশের নাম গন্ধও থাকিত না। অথচ, ঐ সকল পুরাণেই মৌর্য্যবংশের পরে বহুতর অধার্ম্মিক (ব্রাহ্মণদিগের মতে) ক্ষত্রিয়

* "বৃষো হি ভগবান্ ধর্ম্ম স্তস্য যঃ কুরুতে হ্যলম্।
বৃষলং তং বিদুর্দ্দেবা স্তস্মাদ্ ধর্ম্মং ন লোপয়েৎ ॥১৬॥"
মনুসংহিতা, অষ্টম অধ্যায়।
"প্রতিভা"র নবম বর্ষের ৬ষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত "মৌর্য্যবংশ" প্রস্তাব দ্রষ্টব্য।

* "শৈশুনাগা ভবিষ্যন্তি রাজানঃ ক্ষত্রবান্ধবাঃ।
এতৈঃ সার্দ্ধং ভবিষ্যন্তি তাবৎকালং নৃপাঃ পা॥ ॥৩২২॥
ঐক্ষ্বাককাশ্চতুর্বিংশৎ পাঞ্চালঃ পঞ্চবিংশতিঃ।
কালকাস্তু চতুর্বিংশ চ্চতুর্বিংশত্তু হৈহয়াঃ ॥৩২৩॥
দ্বাত্রিংশদ্বৈ কলিঙ্গাস্তু পঞ্চবিংশ স্তথা শকাঃ।
কুরবশ্চাপি ষট্‌ত্রিংশ দষ্টাবিংশতি মৈথিলাঃ ॥৩২৪॥
শূর সেনা স্ত্রয়োবিংশদ্বীতিহোত্রাশ্চ বিংশতিঃ।
তুল্যকালং ভবিষ্যন্তি সর্ব্ব এব মহীক্ষিতঃ ॥৩২৫॥"
বায়ু পুরাণ, ৯৯তম অধ্যায়। মৎস্যপুরাণ, ২৭২তম অধ্যায়, ১৩—১৬ শ শ্লোক

এই শ্লোকে স্পষ্টতঃ "হৈহয়" বংশের উল্লেখ পাঠক মহাশয়গণ কৃপা করিয়া লক্ষ্য করিবেন। "কালক" ও "শক" বংশীয় ক্ষত্রিয়গণের সম্বন্ধে পরে লিখিত হইবে "বীতিহোত্র" বংশ হৈহয় বংশেরই শাখা। অর্জ্জুনের প্রপৌত্রের নাম বীতিহোত্র। (বিষ্ণু পুরাণ, ভাগবত হরিবংশ, বায়ু পুরাণ ও মৎস্য পুরাণ।

বংশের রাজার নাম ও গোত্র সম্পূর্ণরূপে বর্ণিত হইতে দেখা যায়। এই সময়ের বহু পরে গুপ্তবংশীয় মহারাজাধিরাজ সমুদ্র গুপ্তের দিগ্‌বিজয় বর্ণনাত্মিকা প্রয়াগস্তম্ভলিপিতে বহু ক্ষত্রিয় রাজার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। কর্ণেল জেমস্ টড্ সাহেবের সঙ্কলিত রাজস্থানের ইতিহাসের প্রথম ভাগে ছত্রিশ রাজকুলের পরিচয় পাঠ করিলে, ভারতে কোন কালেই যে ক্ষত্রিয় রাজার একান্ত অভাব হইয়াছিল তাহা কেহই বিশ্বাস করিতে পারিবেন না। তবে পুনঃ পুনঃ ধর্ম্ম বিপ্লবের জন্য ক্ষত্রিয় রাজকুলের মধ্যে অনেকেই যে ক্রমশঃ বৈদিকধর্ম্ম ও আচার হইতে চ্যুত হইয়া পড়িতেছিলেন তৎসম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই।

ঐতিহাসিক যুগের গুপ্তবংশের রাজগণের পতনের পরে উত্তরাপথে "বৈশ" (বৈশ্য নহে) বংশীয় ক্ষত্রিয় শ্রীহর্ষবর্দ্ধন দক্ষিণাপথে চালুক্যবংশীয় দ্বিতীয় পুলকেশরীর অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। অজ্‌মেের নগরের যাদুঘরের রক্ষক পণ্ডিত রায় গৌরীচাঁদ হীরাচাঁদ ওঝা বাহাদুরের হিন্দি ভাষায় রচিত "চালুক্য বংশের ইতিহাস" পাঠ করিলে চালুক্য ক্ষত্রিয় এবং তাঁহাদের সমসাময়িক ক্ষত্রিয় রাজগণের সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা যায়। কাশ্মীর রাজ্যের ঐতিহাসিক কাব্য "রাজতরঙ্গিনী" পাঠ করিলেও হর্ষবর্দ্ধনের ও তাঁহার পরবর্ত্তী সময়ের অনেকগুলি ক্ষত্রিয় রাজবংশের পরিচয় জানিতে পারা যায়। তাহার পরেই রাজস্থানের মেওয়ার এবং মারবাড় প্রভৃতি রাজ্যসঙ্ঘের অভ্যুদয় ও তাঁহাদের সহিত নূতনাগত মুসলমান শক্তির সংঘর্ষ হইয়াছিল। দিল্লীর পালবংশ, আজমেরের চৌহানবংশ এবং কনৌজের রাঠোরবংশের ইতিহাসস্বরূপ চাঁদ বরদাইর "পৃথ্বীরাজ রসনা" নামক বীররসাত্মক মহাকাব্য এই সকল রাজ শক্তির কীর্ত্তিকথায় পরিপূরিত। কৌতূহলী পাঠকবর্গ অন্ততঃ এই একখানি কাব্য পাঠ করিলেও নূতনযুগের ক্ষত্রিয়দিগের সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত হইতে পারিবেন।

ফলতঃ সত্য অথবা ত্রেতাযুগের পরশুরামের দ্বারা পৃথিবী যেরূপ কখনই ক্ষত্রিয় শূন্য হন নাই, সেইরূপ কলিযুগের মহাপদ্মনন্দ কর্ত্তৃকও কোন দিন ভারতের নিখিল ক্ষত্রিয় বংশের ধ্বংস হয় নাই। সূর্য্য এবং চন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণের ধারা সৃষ্টির প্রথম হইতে অদ্যাপি বিদ্যমান্ আছে এবং যতদিন এই বৈবস্বত মন্বন্তর থাকিবে, ততদিনই ঐ পবিত্র বংশধারা বিদ্যমান্ থাকিবে। কলিযুগেও যে সকল রাজবংশ বিদ্যমান্ আছেন, তাঁহাদের এক তালিকা বায়ু পুরাণে এইরূপ পাওয়া যায়, যথা—

"ঐল এবং ঐক্ষ্বাকব বংশে (চন্দ্র এবং সূর্য্যবংশীয়) যে সকল বিখ্যাত রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অভিষিক্ত নৃপগণের একশত কুল, ভোজরাজগণের তদপেক্ষা দ্বিগুণ, এইরূপে তাঁহাদের তিনশত কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাঁহাদের সমান আরও প্রতিবিন্ধ্য বংশের একশত, নাগবংশের একশত, হয় (বা হৈহয়) বংশের একশত, ধৃতরাষ্ট্রদিগের একশত, জন্মেজয় বংশের অশীতি, ব্রহ্মদত্ত বংশের একশত, বীরি এবং শীরিগণের একশত, পৌলগণের একশত, শ্বেত, কাশ ও কুশাদির প্রত্যেকের এবং শশবিন্দুগণের একসহস্র কুল উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা সকলেই লক্ষ লক্ষ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছেন। এইরূপে, এই বৈবস্বত মন্বন্তরে শত সহস্র রাজর্ষি উৎপন্ন হইয়াছেন।"*

* "ঐলবংশস্য যে খ্যাতাস্তথৈ বৈক্ষ্বাকবা নৃপাঃ।
তেষা মেকশতং পূর্ণং কুলানা মভি যেকিশাম্ ॥৪৫১॥
তাবদেব তু ভোজানাং বিস্তারো দ্বিগুণঃ স্মৃতঃ।
ভজতে ত্রিশতং ক্ষত্রং চতুর্ধা তদ্ যথাদিশাম্ ॥৪৫২॥
তেধ্বতীতাঃ সমানা যে ক্রবত স্তান্নি বোধিত।
শতং বৈ প্রতিবিন্ধ্যানাং শতং নাগাঃ শতং হয়াঃ ॥৪৫৩
ধার্ত্তরাষ্ট্রাশ্চৈকশত মশীতি জনমেজয়াঃ।
শতঞ্চ ব্রহ্মদত্তানাং শীরিনাং বীরিণাং শতম্ ॥৪৫৪॥
ততঃ শতন্ত পৌলানাং শ্বেতকাশ কুশাদয়ঃ।
ততোঽবরে সহস্রং বৈ যে হতীতা শশবিন্দবঃ॥"
ইত্যাদি।

বায়ুপুরাণ ৯৯ তম অধ্যায়। (বঙ্গবাসী)
"যথাদৃষ্ট তথা উদ্ধৃত"।

এখনও, এই আধুনিক সংকুচিত-কায় ভারতবর্ষেও সূর্য্যবংশ, চন্দ্রবংশ, রুদ্রবংশ, অগ্নিকুল এবং নাগকুলের শত শত ক্ষত্রিয় রাজা রাজত্ব করিতেছেন। যাঁহার কৌতূহল জন্মে তিনিই ইহার পরিচয় লইতে পারেন। ব্রাহ্মণগণের বৃত্তিবৈকল্য জনিত যতদুর দুরবস্থা হইয়াছে, ক্ষত্রিয় বর্ণের কোন শাখারই ততদুর দুরবস্থা হয় নাই। ক্ষত্রিয় বর্ণের যে মৌলিক বৃত্তি প্রজাপালন এবং যুদ্ধ, তাহা তাঁহারা পরিত্যাগ করেন নাই। বেদবিহিত অগ্নিহোত্র এবং ষোড়শবিধ সংস্কার পরিত্যাগ করিয়াও, এবং যাজন, অধ্যাপন এবং প্রতিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের অবলম্বন-যোগ্য সমুদয় জীবিকা আশ্রয় করিয়াও যদি ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব অব্যাহত থাকে, তাহাহইলে ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রত্ব আজ বিন্দু-মাত্রও অপগত হয় নাই বলিতে হইবে। জৈন, বৌদ্ধ এবং অন্যান্য ধর্ম্মের প্রভাবে যদিও অনেক ক্ষত্রিয় বংশে বৈদিক আচারের ন্যূনতা প্রবেশ করিয়াছে; তথাপি, তাঁহাদিগকে "ক্ষত্রিয়" বলিয়া চিনিয়া লইতে কাহারও কোন অসুবিধা হয় না। এখনও ভারতের নানাস্থানে নানা নামে ও নানা পরিচয়ে অসংখ্য ক্ষত্রিয় বংশ বিদ্যমান থাকিয়া আমাদের বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অব্যাহত রাখিতেছেন। অতি প্রাচীনকালে, অবশ্যই কতকগুলি ক্ষত্রিয় বংশ নানা কারণে হীনত্বে অবনমিত হইয়াছিলেন, মনুসংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণ শাস্ত্রে তাঁহাদের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। আগামী বারে আমরা সেই সকল ক্ষত্রিয়বংশের সম্বন্ধে পরিচয় গ্রহণ করিব।

ক্রমশঃ

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

গান।

(স্বর্গীয় রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর, সি-আই-ই, মহোদয়ের রচনা। তদীয় পৌত্র শ্রীযুক্ত শ্রীপতি-প্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত)।

প্রাণ চায় যাঁরে প্রাণের মাঝারে
প্রাণের সে পুতুলে কোথা গেলে পাই?
প্রাণের পরিচয় হয় কি না হয়—
তবু তাঁরে হায় পলকে হারাই।

শত চন্দ্র হ'তে সে ধন সুন্দর,
শত সূর্য্য হ'তে তেজে খরতর,
মধুর শীতল কুসুম-কোমল,
সে বিনে তাঁহার তুলনা নাই।

সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্ম তাঁরে মনে লয়,
ফুলের ভরও যেন সয় কিনা সয়,—
ফিরে দেখি একি বিরাট বিশ্বময়
সে ধন বিশ্বে কই খুঁজিয়া বেড়াই।

কভু ভাবি বুঝি সে ধন আমার,
অমৃতের সিন্ধু অতল অপার,
আবার ভাবি হায় সে সিন্ধু কোথায়
বিন্দুর পিপাসু কেন মরে যাই!

জানি না তাঁহারে তবু সে আমার,
তাঁর বিনে এই জগত আঁধার,
নিরাশায় নিত্য আশার সঞ্চার—
প্রাণের একি ভাব ভাবি আমি তাই।

কেহ বলে "ভক্তি" তাঁরে পাবার পথ,
কেহ বলে পথ প্রেমের পুষ্পরথ;
পথহারা হয়ে আমি নানা পথে ভ্রমি—
পাই কিনা পাই প্রাণের তাঁরে চাই।

শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর।
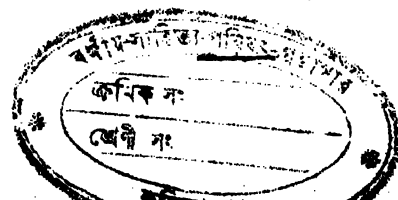
গ্রন্থ-সমালোচনা।

১। 'কৃষি-বিস্তার', ২। 'বস্ত্র-সমস্যা', ৩। 'বাঁচিবার পথ' ঃ—ব্রহ্মচর্য্যপ্রণেতা শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত তিনখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা। ইহাতে সাধারণের অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে—কিন্তু এত সংক্ষেপে যে পাতঞ্জলের সূত্রের মত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিষয়গুলি ভাল, সময়োপযোগী এবং তাহার ভিতর চিন্তা করিবার বিষয় আছে। 'বাঁচিবার পথে' তিনি শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে যে সকল মত প্রচার করিয়াছেন তাহার কতক কতক মত বিচার সাপেক্ষ—এবং তাহার সহিত আমরা একমত হইতে না পারিলেও লেখক যে দেশের জন্য দশের জন্য চিন্তা করেন তাহা বেশ বুঝা যায়, এবং তজ্জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ।

৪। শ্রাদ্ধতত্ত্ব—শ্রীযুক্ত রাজা শশীশেখরেশ্বর রায় প্রণীত। শ্রাদ্ধতত্ত্ব পড়িয়া আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি। তিনি প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য নানা দেশের প্রাচীন ইতিহাস হইতে দেখাইয়াছেন যে পিতৃপুরুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন—তাঁহাদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার সহিত কিছু দান করা এবং তাঁহাদের স্মৃতি শ্রদ্ধার সহিত সযত্নে রক্ষা করার রীতি অনেক সভ্য জাতীর মধ্যেই প্রচলিত ছিল ও আছে। আমাদের হিন্দুর শ্রাদ্ধের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি; কোন্ সময় ইহা সমাজে প্রচলন হইল, অতি প্রাচীন বৈদিক কাল হইতে তাহার আলোচনা করিয়াছেন। এই সব তত্ত্ব সম্বন্ধে যত আলোচনা হয় তাহাই ভাল এবং এ সম্বন্ধে আলোচনার যথেষ্ট বিষয়ও আছে। আমরা যদি কেবল অন্ধ বিশ্বাস ও পরম্পরাগত সংস্কারের দোহাই না দিয়া বিচার পূর্ব্বক শাস্ত্র মত গ্রহণ করিতে অভ্যাস করি তাহা হইলে দেশের ও সমাজের পক্ষে কল্যাণ বই অকল্যাণ হইবে না। রাজা শশীশেখরেশ্বর হিন্দু সমাজ এবং বাঙ্গলা সাহিত্যে সুপরিচিত। এই বার্দ্ধক্যের জড়াগ্রস্ত দেহে তাঁহার মন যে এখনও কেমন সজীব ও উৎসাহপূর্ণ তাহা এই পুস্তিকাখানি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

ঋষিসমাজে তত্ত্বচিন্তা।

আমি আজ ঋক্ সংহিতার যুগের ঋষি সমাজের তত্ত্ব চিন্তা সম্বন্ধে আপনাদিগকে কিছু শুনাইতে ইচ্ছা করি।

বেদ নিত্য এবং অপৌরুষেয়। ইহা ভগবানের উক্তি। ঋষি মন্ত্রের বেদমন্ত্রের রচয়িতা নহেন—মন্ত্রদ্রষ্টা আমরা হিন্দু ইহা মানিয়া থাকি।

ঋগ্বেদ পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্য দর্শন ও কবিত্বের উৎস, আর্য্যজাতির গৌরবের সামগ্রী। যদিও আমাদের দেশ হইতে বেদের আলোচনা একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে, [তথাপি ইহার মাহাত্ম্য আমাদের অস্থিমজ্জায় এমন ভাবে বিজড়িত যে বেদের নাম শুনিলেই আমাদের দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই মনে ভয় ভক্তি সম্বলিত কেমন এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়। জানিনা বিধাতার কোন্ অভিশাপে আমাদের এই প্রাচীন ধর্ম্ম দর্শন পুরাতত্ত্বের অক্ষয় খনি বেদের অধ্যয়ন ও চর্চ্চা অনেকদিন আমাদের দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্য সমাজে ইহার যথেষ্ট সমাদর ও আলোচনা হইয়াছে। ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ, ল্যাটীন, জর্ম্মান, রুশিয়ান প্রভৃতি বহু ইয়োরোপীয় ভাষাতে ঋগ্বেদের অনুশীলন হইয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সহিত এই সম্বন্ধে যে কত আলোচনা করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহা মনে করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। আজ যে আমরা বেদ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে অগ্রসর হইতেছি তাহার জন্যও আমরা তাঁহাদের নিকটই ঋণী. কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে ভিত্তি ভূমির উপর দাঁড়াইয়াছেন তাহা স্বতন্ত্র। তাঁহারা হিন্দু ভাবে অনুপ্রাণিত না হইয়া আমাদের পরম্পরাগত শ্রুতির মাহাত্ম্যে ও তাহার ভাবের ভিতর দিয়া দেখিতে ও বুঝিতে না পারিয়া নানারূপ ভ্রম প্রমাদে পতিত হইয়াছেন। তাঁহাদের প্রদত্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া আমরাও ছেলেবেলা হইতে শুনিয়া আসিতেছি যে বেদ কৃষকের গান—ঋক্ সংহিতা কৃষিজীবী আর্য্যগণের প্রকৃতির জড়শক্তির প্রতি ভীতিবিস্ময়প্রকাশক স্তব গান।

প্রাচীন ধর্ম্মমত তাচ্ছিল্য করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অন্ধ অনুসরণ ও অনুকরণ করাই আমাদের দেশের পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানীগণ এতদিন গৌরব অনুভব করিতেন। তাই রমেশচন্দ্র দত্তের মত ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিও ঐ ভ্রান্তির বশবর্ত্তী হইয়া ঋগ্বেদকে জড়ের পূজা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আজকাল আমাদের জাতীয় ভাবের বিকাশ ও জাতীয় উদ্দীপনার সঙ্গে ২ লোকের মন আবার দেশের দিকে ফিরিয়াছে, দেশে স্বাধীন চিন্তার যুগ আবার বহিতে আরম্ভ হইয়াছে। তাই বোধ হয় এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা আপনাদের নিকট অপ্রীতিকর কিম্বা অসময়োচিত বোধ হইবে না। সাধারণতঃ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এই সিদ্ধান্ত যে ঋগ্বেদের সংহিতা অর্থাৎ মন্ত্রভাগ যথা রচিত তখন ঋষি সমাজে দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভাব পরিস্ফুট হয় নাই। তখন আর্য্য জাতির শৈশবকাল। তাঁহারা জগতের যাবতীয় বস্তুকেই শিশুর মত সচেতন জ্ঞান করিতেন। প্রকৃতির যে সকল বিস্ময়কর কার্য্য দেখিতেন তাহাতেই এক একজন সচেতন ইচ্ছাবিশিষ্ট অধিষ্ঠাতা কল্পনা করিতেন। এক বিশ্বনিয়ন্তার ধারণা তাঁহাদের ছিল না। পরে তাঁহারা এক পরমেশ্বরের জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ evolution ক্রম বিবর্ত্তন বাদী—তাঁহারা evolution theory র সঙ্গে অসামঞ্জস্য। কোন মত গ্রহণ করিতে পারে না। বেদ যে নিত্য সনাতন সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই যে এই জ্ঞান সমষ্টি বিকশিত হইয়াছে, এ ধারণা তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। সুতরাং ক্রম পরিণতি ভিন্ন অতি প্রাচীনকালেই যে আর্য্য ঋষিগণ এই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের অধিকারী হইবে না এ ধারণা তাঁহাদের পক্ষে কঠিন, ইহাই তাঁহাদের ভ্রম প্রমাদের অনেকটা কারণ।

ঋক সংহিতার সকলগুলি সূক্তই এক সময়ের নয়। হয়ত বহুশতাব্দী ব্যাপিয়া ভিন্ন ভিন্ন ঋষি কর্ত্তৃক যে সকল আধ্যাত্মিক সত্য দৃষ্ট হইয়াছে তাহাই ঋগ্বেদ সংহিতায় সংগৃহীত হইয়াছে। সকল ঋষিই যে সমান উন্নত ছিলেন বা সকলের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিই যে সমান ছিল, তাহা নাও হইতে পারে। অথবা বেদ সকলের জন্যই নহে। তাই ইহাতে সকল স্তরের ধর্ম্ম চিন্তাই আছে—গৃহী বলুন, জ্ঞানী বলুন, যাঁহার মনোবৃত্তি যেরূপ তাহার অনুরূপ দার্শনিকতত্ত্বই ইহাতে রহিয়াছে। দুই শ্রেণীর জীব লইয়াই সংসার সকাম ও নিষ্কাম, একশ্রেণীর লোক কামনার দ্বারা পরিচালিত হইয়া কিসে সংসারে যশ ও প্রাধান্য লাভ করিবে, কিসে ভোগ্যবস্তু প্রাপ্ত হইবে ইহাই তাহাদের প্রধান লক্ষ্য। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক নিবৃত্তিমার্গের অবলম্বী। কিসে কামনামুক্ত হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিবে, সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে ইহাই তাহাদের লক্ষ্য। বেদে সকল শ্রেণীর লোকশিক্ষার উপদেশই রহিয়াছে। আমি বেদের পরবর্ত্তী যে অবস্থাকে জ্ঞান কাণ্ড বা বেদান্ত উপনিষদের যুগ বলে তাহার কথা বলিতেছি না। তখন আর্য্য ঋষিরা আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চতম শিখরে উপনীত হইয়াছেন। সে চিন্তা কল্পনা সে ধারণাও আমাদের পক্ষে সম্ভবে না। এ যুগের কথা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও একবাক্যে স্বীকার করেন। পণ্ডিত Max muller এই যুগের কথা বর্ণনা করিতে গিয়া একস্থানে বলিয়াছেন যে ঋষিরা তখন এত উচ্চে উঠিয়াছিলেন where their lungs alone could bear কিন্তু সাধারণতঃ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত এই যে ঋক সংহিতার যুগ অর্থাৎ আদিম বৈদিক যুগ বলিলে যাহা বুঝি সে সময় যাগযজ্ঞের বাহুল্য ছিল, তখন ঋষি সমাজে নিষ্কাম জ্ঞানের অঙ্কুর উদ্গত হয় নাই। কাজেই বলা বাহুল্য আমাদের দেশের আধুনিক শিক্ষিত মণ্ডলীও এই ভ্রান্ত মতই পোষণ করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু আপনারা দেখিতে পাইবেন যে বেদের সংহিতা বা মন্ত্র ভাগ যখন রচিত হয়—আমি এখানে লৌকিক অর্থে রচিতই বলিলাম—তখন হইতেই ঋষি সমাজে দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভাব কিরূপ পরিস্ফুট।

উপনিষদে ব্রহ্ম জ্ঞানের সবিস্তার আলোচনা হইয়াছে। তথাপি বেদান্ত উপনিষদে যে সকল ভাব পরিস্ফুট দেখিতে পাই তাহার মূল বীজ ঋক্ সংহিতায়ই নিহিত। উপনিষদে এমন কোন নূতন idea আছে বলিয়া

জানি না, যাহা বেদে নাই। দার্শনিক তত্ত্বের যাহা মূল তাহার সকলই ঋক্ সংহিতায় আছে বিক্ষিপ্ত ভাবে কিন্তু অতি সুন্দর কবিত্বপূর্ণ ভাব ও ভাষায় *।

ঋক সংহিতা কেবল প্রাচীনত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্বের হিসাবেই যে অমূল্য সামগ্রী তাহা নয়। যিনি কবি তিনি দেখিতে পাইবেন যে কবিত্বের হিসাবেও ইহা জগতের সাহিত্যে অতুলনীয়। ঋষিরা প্রকৃত কবি puls seers ছিলেন। তাঁহাদের দর্শনশক্তিই বা কি অদ্ভুত আশ্চর্য্য ছিল। রাত্রি দ্বিপ্রহরান্তে অখিল ভুবনের ক্ষীণ জ্যোতির উন্মেষ হইতে ক্রমে সূর্য্যের উদয়, ব্যাপ্তি এবং অস্ত—অস্তে পুনরায় নৈশ অন্ধকারের সমাগম পর্য্যন্ত এই সৌরনাটকের অভিনয়ের প্রত্যেক অঙ্ক বা পরিবর্ত্তন আর্য্য ঋষিগণ কিরূপ সরল শিশুটীর মত তাহার বহিঃ প্রকৃতি বিচিত্রবর্ণে চিত্রিত দেখিতেন এবং জ্ঞান-নেত্রে বহিঃপ্রকৃতির সহিত অন্তঃপ্রকৃতির সংযোগ সন্দর্শন করিয়া পুলকে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া হৃদয়ের ভাবগুলি কি সরল কবিত্বপূর্ণ ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন—যাহারা প্রকৃত জ্ঞানী ও কাব্যরসের রসিক তাহারাই সে ভাব ও বর্ণনা সম্যক উপলব্ধি করিতে সক্ষম। আমার মত অজ্ঞান নিরস লোকের পক্ষে সে ভাবের অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। যে বিস্ময় কবিহৃদয়ের অনুসন্ধিৎসা বা সূক্ষ্ম দৃষ্টির জনক তাঁহাদের হৃদয় সেই বিস্ময়ময় ছিল। কিন্তু এ বিস্ময় কি শিশু-হৃদয়ের অজ্ঞতাপ্রসূত বিস্ময়? ইহা কি শিশুর মত নির্জ্জীব পদার্থকে সচেতন বলিয়া ভ্রম? এই যে নিত্যপরিবর্ত্তনশীল বহিঃপ্রকৃতি প্রতি মুহূর্ত্তে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিয়া নব নব রূপে বিকাশ পাইতেছে, তাহা দেখিয়া ঋষিগণ বিস্ময় বিহ্বল চিত্তে যে সকল প্রশ্ন করিতেছেন, আবার নিজেরাই তাহার উত্তর দিতেছেন—একটু অনুধাবন করিলে তাহা হইতেই বুঝিতে পারিবেন যে ইহা কোন জড় শক্তির উপাসনা নয়। ইহা সেই একমাত্র চিৎশক্তি যাহা—"অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান"—যাহা ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিয়া বিশ্বমণ্ডলে কত অসংখ্য লীলা খেলা দেখাইতেছে তাহারই ঐক্যতা উপলব্ধিজাত বন্দনাগীতি।

আমি কে? এ বিশ্ব কি? কোথা হইতে আসিল-কোথায় লয় হইবে? এ বিশ্ব কি কেবলি অসম্বন্ধ ঘটনাবলী পূর্ণ? এই যে আমরা যাহাদিগকে পূজা করি স্তব করি তাহারা কোথা হইতে উৎপন্ন হইল তাহাদের পিতা কে? এই যে অগ্নি দাহ করিতেছে, ইহার দাহিকাশক্তি কোথা হইতে আসিল? এই যে চন্দ্র সূর্য্য ইহারা কাহার নিয়মে চলিতেছে? কাহার আদেশে আমাদিগকে কিরণ দিতেছে? তাহারা যে শক্তি বলে কাজ করিতেছে—সে শক্তি কোথা হইতে আসিল? এই সকল প্রশ্নের উত্তর আমরা ঋষিদের মুখেই শুনিতে পাই।

এই যে অন্ধকারপূর্ণ অন্তরীক্ষ পথে দেব ও মানুষকে সচেতন করিয়া দেব সাবিতা হিরণ্ময় রথে আরোহণ করিয়া বিশ্ব ভুবন দিনের পর দিন পরিভ্রমণ করিতেছেন—কে সেই বিশ্বব্যাপী পথের বিষয় বর্ণনা করিতে পারে, কেই বা সেই ঘোটককে দেখিয়াছে অথবা বুঝিয়াছে?

এই যে সূর্য্য ইনি কোন্ বলে ঊর্দ্ধ মুখে ভ্রমণ করেন? কে জানে যে স্বলোকের স্তম্ভ স্বরূপ সূর্য্য স্বর্গকে ধারণ করেন? এই সূর্য্য কে?—সূর্য্য দ্যুমণ্ডল ও পৃথিবী উৎপাদন করিয়াছেন—ইনি সর্ব্বজীবের হিতকারী অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাপক। আমরা ইহাকে স্তব করি। (১মঃ ১৬০)

এই যে বায়ু কখন ২ মৃদু প্রভাবে লতা পল্লব মন্দ ২ সঞ্চালিত করিতে করিতে তাঁহার সুখকর ও সুশীতল প্রবাহে আমাদিগকে বীজন করিতেছেন, কখনও বা প্রখর প্রবল বেগে বজ্রনিনাদে মহদাকার মহীরুহ ভগ্ন, কোথাও বা সমূলে উন্মূলিত করিতে করিতে সুস্থির পদার্থ পর্ব্বতাদি

* মুক্তিকোপনিষদে রামচন্দ্র বেদান্ত কোথায় প্রতিষ্ঠিত? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—"তিলেষু তৈলবৎ বেদে-বেদান্তঃ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ।"—তিলের অভ্যন্তরে যেমন তৈল বিদ্যমান থাকে তেমনি এই বেদের অভ্যন্তরেই বেদান্ত সুপ্রতিষ্ঠিত আছে।

পর্য্যন্ত নিজ বেগে কম্পবান করিতে করিতে আসিয়া পৃথিবীর ধূলি বিকীরণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক রক্তবর্ণ করিয়া আকাশ পথে বিশ্বভুবনের রাজার ন্যায় চলিয়া যাইতেছেন— ইনি কে? কোথায় জন্মিয়াছেন? কোথা হইতে আসিয়াছেন? ইনি জলের বন্ধু, জলের অগ্রে উৎপন্ন হয়েন। ইনি সত্যস্বভাব। এই বায়ুদেব দেবতাদিগের আত্মা স্বরূপ, ভুবনের সন্তান স্বরূপ, বিশ্বজগতের প্রাণ যথা ইচ্ছা বিহার করেন। ইঁহার শব্দই অনেক প্রকার শুনা যায়, ইহার রূপ প্রত্যক্ষ হয় না।

এই যে জগদ্ব্যাপার যাহা পলে ২ আমাদের দৃষ্টিপথে নিত্য অনুষ্ঠিত হইতেছে ইহা কোন অসম্বদ্ধ কার্য্য নয়—আমাদের পিতা সেই যে ঋষি যিনি বিশ্বভুবনে বসিয়া হোম করিতেছেন, এই বিশ্বজগত তাঁহারই যজ্ঞে রত, বরুণ ও সূর্য্য তাঁহারই নিয়মে চলিতেছে, নদী সমূহ তাঁহারই নিয়ম বহিয়া যাইতেছে।

দার্শনিক তত্ত্বের মূল যে প্রশ্ন তাহা ইহার ভিতরেই রহিয়াছে। এই সকল প্রশ্ন যে তাঁহাদের হৃদয়ের সন্দেহ-মূলক নয়, ঋষিগণ প্রশ্নোত্তরছলে দর্শনের এই মূলতত্ত্বগুলি উপাসনার অন্তঃর্গত করিয়া জ্ঞান সমাজে প্রচার করিয়াছেন তাহা ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, যে ঋষির মুখে এইরূপ কোন কোন সন্দেহাত্মক প্রশ্ন শুনিতে পাই তাঁহাদেরই মুখে ঐ প্রশ্নের পূর্ব্বেই এই তেজো পূর্ণ সগর্ব্ব উক্তি শুনিয়াছি—

"সুপর্ণম্ বিপ্রাঃ কবয়ো বাচোভি
রেকম্ সন্তম বহুধা কল্পয়ন্তি।"

পক্ষী (পরমাত্মা) একই। বুদ্ধিমান্ কবিগণ তাঁহাকে কল্পনা পূর্ব্বক নানা প্রকার বর্ণনা করেন।

ঋষিগণ অন্ধবিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁহারা বিচার না করিয়া কোন মতকেই অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতেন না। ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে উপনিষদে যে সূক্ষ্ম বিচার ও আলোচনা দেখা যায় তাহার আরম্ভ ঋক্ সংহিতায় ই। ঋষিরা যে সকল দেবতার উপাসনা করিতেছেন তাঁহারা কে, তাঁহাদের প্রকৃত স্বরূপ কি ইহা লইয়া ঋষি সমাজে বাদানুবাদ হইয়া অবশেষে সকল প্রশ্ন এবং সংশয়ের সমাধান করিয়াই তাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্বে উপনীত হইয়াছেন। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই মানব সমাজে ধর্ম্ম লইয়া নানারূপ আন্দোলন ও আলোচনা চলিয়া আসিতেছে। অতি প্রাচীন বৈদিক কালেও ইহা লইয়া ঋষি সমাজে কিরূপ আন্দোলন চলিয়াছে তাহার ২।১টী নমুনা আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

কো দদর্শ প্রথমং জায়মান মস্থন্বন্তং যদনস্থা বিভর্ত্তি।
ভূম্যা অসুর সৃগাত্মা ক স্বিৎকো বিদ্বাং সমুপগাৎ॥
প্রষ্টু মেতৎ॥ ১-১৬৪-৪।

প্রথম জায়মানকে কে দেখিয়াছে? অস্থিহীন কে কে অস্থিযুক্ত করিতে দেখিয়াছে? পৃথিবীর প্রাণ বায়ু ও রক্ত্মময় আত্মা কোথায় ছিল? পণ্ডিতগণের নিকট এই কথা কে প্রথম জিজ্ঞাসা করিয়াছিল?

অচি কিত্বাঞ্চি কিতুষশ্চিদত্র
কবীন্ পৃচ্ছামি বিদ্মানে ন বিদ্বান্।
বি যস্ত স্তস্ত ষড়িমা রজাংস্তজস্ত
রূপে কি মপি স্বি দেকং॥ ১-১৬৪-৬

আমি জ্ঞানহীন, আমি কিছু জানি না—জ্ঞানিগণের নিকট জানিবার ইচ্ছায় জিজ্ঞাসা করি যিনি এই ছয়লোক স্তম্ভন করিয়াছেন তিনি কি এক অজরূপে বাস করেন?

আর এক ঋষি বলিতেছেন—"অজস্যনাভাবধ্যেক-মর্পিতং যস্মিন বিশ্বানি ভুবনানি তস্থুঃ।"—এই অজ পুরুষের নাভি দেশেই এই সমস্ত বিশ্বভুবন অবস্থান করিয়াছিল।

ইন্দ্র কে? এক ঋষি সন্দেহ করিয়া বলিতেছেন—

প্রসুস্তোমং ভরত বাজয়ন্ত
ইন্দ্রায় সত্যং যদি সত্যমস্তি।
নেন্দ্রো অস্তীতি নেম উত্ব আহ
ক ঈং দদর্শ কমভিষ্ট বা ম॥

হে যুদ্ধাভিলাষি! ইন্দ্র আছেন ইহা যদি সত্য হয়, তবে তোমরা ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে সত্য উচ্চারণ কর। নেম ঋষি বলেন, "ইন্দ্র নামে কেহ নাই। কে উহাকে দেখিয়াছে? কাহাকে স্তব করিব? আর এক ঋষি উত্তর দিতেছেন এ ইন্দ্র কে,

ত্বম্ ইন্দ্র অভিভূরাণ ত্বম্ সূর্য্যাংম্ আরোচয়ঃ।
বিশ্বকর্ম্মা বিশ্ব দেবো মহান্ অ‍াস॥

তুমিই ইন্দ্ররূপে (অসুরগণকে) পরাভূত করিয়াছিলে, তুমিই সূর্য্যকে রশ্মিযুক্ত করিয়াছিলে, তুমিই বিশ্বকর্ম্মা, তুমি মহান্ বিশ্বদেব। যেমন ইন্দ্রের সম্বন্ধে তদ্রূপ সূর্য্য অগ্নি প্রভৃতি অনেক দেবতা সম্বন্ধেই এইরূপ প্রশ্ন ও উত্তর দেখিতে পাই।

এই সকল প্রশ্নের গূঢ়ভাব এবং সকল সংশয়ের সমাধান যে এই প্রশ্নের ভিতরেই রহিয়াছে তাহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দশম মণ্ডলের 'কঃ' সূক্ত। ইহাতে যে বিরাট হিরণ্যগর্ভের বর্ণনা করা হইয়াছে—তাহা একবার পড়িলেই দেখিতে পাইবেন যে বেদের ঋষির সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বনিয়ন্তা একেশ্বরের জ্ঞান কিরূপ পরিস্ফুট এবং তিনি পরোক্ষ হইয়াও তাঁহাদের চক্ষে কিরূপ প্রত্যক্ষের ন্যায় আভাত।

সায়নাচার্য্যের উপোদ্ঘাত প্রকরণে যে এই সকল সন্দেহ-সূচক মন্ত্র—

"ন সন্দেহ বোধনায় প্রবৃত্তঃ। কিন্তুর্হি জগৎকারণস্য
পরবস্তু নোৎতি গভীরত্বং নিশ্চেতুমেব প্রবৃত্তঃ।"—

এই সকল মন্ত্র সন্দেহ বোধের জন্য প্রবৃত্ত হয় নাই। সেই জগৎকারণ পরম বস্তুর অতিশয় গাম্ভীর্য্য নিশ্চয় করিবার জন্যই এইরূপ মন্ত্র প্রবৃত্ত হইয়াছে।

ঋগ্বেদে অসংখ্য দেবতার উল্লেখ আছে। ইঁহাদের সংখ্যা নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার। এক ঋষি বলিতেছেন যে, দেবতারা অসংখ্য হইলেও প্রজাপতি মনু যিনি আমাদের উপাসনার প্রণালীর ব্যবস্থা করিয়াছেন তিনি বলিয়াছেন যে দেবতাগণের মূলে "একাদশ"। এই একাদশ দেবতা আবার পৃথিবীতেও আছেন, অন্তরীক্ষেও আছেন, স্বর্গেও আছেন। এই হিসাবে দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ। ঋক সংহিতার প্রথম মণ্ডলের একটী মাত্র দীর্ঘতমা ঋষি এই তেত্রিশজন দেবতাকে আহ্বান করিতেছেন—

"যে দেবাসো দিবি একাদশস্থ পৃথিব্যাধি একাদশস্থ।
অপ্সু ক্ষিতো মহিনৈকাদেশস্থ তে দেবাসো যজ্ঞ মিমং জুষধ্বম্।

১-১৩৯-১১

আবার আর একস্থলে বিশ্বামিত্র ঋষি দেবতার সংখ্যার উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—

"ত্রীনি শতা ত্রী সহস্রাণি অগ্নিং ত্রিংশচ্চ দেবা
নব চা সপর্য্যান্"—(৩-৯-৯)

৩৩৩৯ জন দেবতা অগ্নির পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। ক্রমে পরবর্ত্তী কালে এই দেবতার সংখ্যা ৩৩ কোটীতে দাঁড়াইয়াছে। বিরাট পুরুষ হিরণ্যগর্ভ হইতে মৃত্তিকার ধূলিকণা আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত যাহা কিছু দ্যোতমশীল দীপ্তিশালী তাহাই যাঁহাদের নিকট দেবভাবে স্তুত হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা ৩৩ কোটী হইলেই বা আশ্চর্য্য হইবার কি আছে?

কিন্তু এই দেবতাগণের বিশেষত্ব এই যে কেহই বড় নহেন, কেহই ছোট নহেন, সকলেই সমান, সকলেই অতীব মহান্।

"ন হি বো অস্তি অর্ভকো দেবাসো ন কুমারকঃ।
বিশ্বে সতো মহান্ত ইৎ॥"

দেবতাদের মধ্যে বড় ছোট নাই—তাঁহারা সকলেই সমাত্মক, সকলেই "সতো মহান্ত" সকল প্রকার সৎ পদার্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

ঋগ্বেদে যে সকল দেবতার উল্লেখ আছে তাহাদের মধ্যে অগ্নি, ইন্দ্র বায়ু, সূর্য্য ইঁহাদের উদ্দেশ্যেই বোধ হয় অধিকাংশ স্তোত্র। ঋক্ সংহিতার প্রথমেই অগ্নির স্তব। অগ্নিই যজ্ঞ কার্য্যে আদি দেবতা—

অগ্নি মীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেব মৃত্বিজম্।
হোতারম্ রত্ন ধাতমম্।—

এইটীই ঋক সংহিতার প্রথম শ্লোক। নিরুক্তকার বলিয়াছেন, "অগ্নি পৃথিবী স্থানঃ"—অগ্নির প্রকাশ ভৌতিক পদার্থকে অবলম্বন করিয়া, যজ্ঞের সময় আমরা এই ভৌতিক অগ্নিকেই দেখিতে পাই। অগ্নির উদ্দেশ্যে যে সকল স্তব দেখিতে পাই-তাহাতে ইনি কবি, প্রকাশক, অমর, নদীগণের নেতা জলবর্ষী, অন্তরীক্ষ পৃথিবী

ও দ্যুলোক অজস্র প্রকাশ দ্বারা দীপ্তমান, উষা ও দিবসের মহান কেতু স্বরূপ দীপ্তিমান, ইনি উষার মধ্যে প্রবুদ্ধ, ইনি অপ্রকাশমান অন্ধকার নিমগ্ন প্রজাগণকে প্রজ্ঞাদ্বারা চেতনাবান করেন, ইনি বিশ্বায়ুঃ, (সর্ব্বব্যাপী) মহান্ অনিমানঃ বিশ্পতিঃ (সকল প্রাণীর পোষণকর্ত্তা) ইনি জাতবেদঃ—জাতবিষয় সকল অবগত আবার ইঁনিই 'জন্মম্ জন্মম্ নিহিতো জাতাবদঃ' জাত মাত্রই সর্ব্বভূতে জঠরানলরূপে অবস্থিত। এক ঋষি জিজ্ঞাসা করিতেছেন—এই অগ্নিকে যে তাঁহার পূজা করিব? আর এক ঋষি বলিতেছেন—অগ্নিকে জিজ্ঞাসা কর তিনিই জানেন, তাঁহার চৈতন্য আছে, শাসন ক্ষমতা তাঁহারই আছে, ইষ্টবস্তু তাঁহাতেই আছে, প্রথম মণ্ডলের একটী মন্ত্রে দেখিতে পাই অগ্নিকে পৃথিবীর নাভিঃ (রক্ষক) পৃথিবীর অধিপতি এবং জ্যোতিরূপ বলা হইয়াছে। অগ্নির উদ্দেশ্যের স্তবগুলি একটু প্রণিধান করিলেই দেখিতে পাইবেন—ঋষিরা এই অগ্নির ভিতরই সর্ব্ব দেবতার অধিষ্ঠান দর্শন করিয়াছেন এবং উপলব্ধি করিয়াছেন যে এক একটী শক্তিই কার্য্য ভেদে ভিন্ন ভিন্ন দেবতারূপে অভিহিত হইয়াছেন। আর্য্য ঋষিগণ যদিও ভিন্ন ভিন্ন দেবতার নাম উল্লেখ করিয়া উপাসনা করিয়াছেন কিন্তু তাহা যে প্রকৃত প্রস্তাবে এক ঈশ্বরেরই উপাসনা তাহা তাহাদের উচ্চারিত স্তব হইতেই স্পষ্ট প্রকাশ পায়। তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত আমাদের যুক্তি তর্কের অপেক্ষায় রাখেন নাই। এই অগ্নির সম্বন্ধেই দেখুন—অগ্নির নানারূপ শক্তি ও কার্য্য দেখিয়া প্রকৃতির সৃষ্টি পরম্পরার ভিতরে এক ঐশী শক্তিই যে নানা ভাবে কার্য্য করিতেছে তাহা ঋষি কেমন সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। এই সূক্তটী ঋক সংহিতার তৃতীয় মণ্ডলে— ইহাতে ২২টী ঋক—ইহার প্রত্যেক ঋকেরই শেষ ভাগে ঋষি পুনঃ পুনঃ ইহাই ঘোষণা করিতেছেন—"মহদ্দেবানা মসুরত্বমেকম্"—দেবগণের কার্য্য সমূহ ভিন্ন নহে—তাঁহাদের মহৎ বল বা ঈশ্বরত্ব এক।—

অগ্নি যজ্ঞের হোত ও সম্রাট। তিনি আকাশে সূর্য্যরূপে বিচরণ করেন, তিনি সকলের মূলভূত—হইয়া ভূমিতে বাস করেন। তিনি যজ্ঞ বেদীতে শয়ন করেন, বনমধ্যে অরণ্য সকলের মধ্যে বিভাসিত হন, তিনি ঔষধী সকলের মধ্যে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, তিনি মহান, তিনি সূর্য্যের সহিত দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে বিচরণ করেন, তিনি নানাবিধ রূপ ধারণ করিয়া—আমাদিগকে দর্শন করেন, ইনি বিষ্ণু, অক্ষয় তেজ ধারণ করিয়া পরম স্থান রক্ষা করেন, ইনি সমস্ত ভূতজাতকে জানেন, দিবা ও রাত্রি নানাবিধ রূপ ধারণ করেন। শুক্লবর্ণা ও কৃষ্ণবর্ণা যে ভগিনী দ্বয় যাঁহার একজন দীপ্তি-শালী ও অন্যজন কৃষ্ণবর্ণ তাহা ইনি উত্তাপরূপে ওষধি সকল উৎপন্ন করেন, সূর্য্যরূপে পশ্চিম দিকে শয়ন করেন এবং পূর্ব্ব দিকে উদিত হন, ইনিই অভিষ্টবর্ষী, ইন্দ্ররূপে কোন কোন দিকে মেঘের ঘর্ঘর শব্দ করেন আবার অন্য দিকে জল বর্ষণ করেন।

এই সকল দেখিয়া আর এ সন্দেহ থাকিতে পারেনা যে ঋষিদের মনে এই অনুভূতি উদয় হইয়াছে যে দেবতাগণের কার্য্যাবলী—প্রকৃতির নিয়ন্তা "একমেবাদ্বিতীয়ম্"। আর তিনি এক হইয়াও যে বহু দেবতার নাম ধারণ করেন তাহা অতি পরিষ্কার ভাবে ইহার পরের সূক্তেই উক্ত হইয়াছে—

> কেনঃ পিতা জানিতাযো বিধাতা
> ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা।
> যো দেবানাং নামধা এক এব
> তং সংপ্রশ্নং ভুবনা যন্ত্যান্যা॥

যিনি আমাদের জন্মদাতা পিতা, যিনি বিধাতা। যিনি বিশ্ব ভুবনের সমুদয় ধাম অবগত, যিনি এক হইয়াও সকল দেবতাদিগের নাম ধারণ করেন—অন্য তাবত্ত ভুবনের লোক তাঁহার বিষয় জিজ্ঞাসা করে।

এই অগ্নিই উপনিষদের ঋষিগণ কর্ত্তৃক অশেষ প্রকারে স্তুত হইয়াছেন। মূলতঃ উপনিষদের এই ভাব এবং বৈদিক ঋষির ভাবে কোন পার্থক্য নাই। উপনিষদের ঋষি যজ্ঞাদি কর্ম্মকে অবজ্ঞা করেন নাই। জ্ঞান-বিবর্জ্জিত যজ্ঞ

কর্ম্মানুষ্ঠানকেই নিন্দা করিয়াছেন যেমন—অগ্নিতে আহুতি দিতে হইলে অগ্নির প্রকৃত স্বরূপ অবগত হইয়া তাহাতে দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদান করিতে বলিয়াছেন। ইহাদ্বারা ভৌতিক জ্ঞানে অগ্নিতে আহুতি দেওয়াই জ্ঞান বিবর্জ্জিত কর্ম্ম বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন।

ঋষিরা যে অগ্নির উপাসনা করিতেন তাহার প্রকৃত তত্ত্ব কঠ উপনিষদে নাচিকেতার উপাখ্যানে বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। নচিকেতা যমকে বলিতেছেন যে আপনি স্বর্গ প্রাপ্তির কারণ এই অগ্নি বিষয়ক তত্ত্ব অবগত আছেন, আপনি আমার নিকট এই অগ্নির কথা বলুন যাহা সঞ্চয়ন করিয়া স্বর্গকামী যজমানগণ স্বর্গলোক প্রাপ্তিপূর্ব্বক দেবত্ব প্রাপ্ত হইতে পারেন। তখন যম নচিকেতার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে অগ্নির তত্ত্ব বিজ্ঞান বলিলেন—

প্রতে ব্রব মি তদুমে নিবোধ
স্বর্গ্যমগ্নিমচিকেতঃ প্রজানন্।
অনন্ত লোকাপ্তি মথো প্রতিষ্ঠাং
বিদ্ধি ত্বমেতন্নিহিতং গুহায়াম্॥

হে নচিকেতঃ, তুমি যে স্বর্গসাধন অগ্নির কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহা আমি অবগত আছি; তুমি একাগ্রমন হইয়া অবধান কর। এই অগ্নি স্বর্গ লোক ফল প্রাপ্তির কারণ, ইনিই বিরাট রূপে জগতের আশ্রয়স্বরূপ এই অগ্নির প্রকৃত স্বরূপ অবগত হও—ইনি বিদ্বান ব্যক্তির বুদ্ধিরূপ গুহাতে নিহিত আছেন। ঋগ্বেদে অগ্নির উদ্দেশ্যে যে সকল স্তোত্র আছে তাহার চুম্বক কঠোপনিষদের এই শ্লোকে দেখিতে পাই—

"অরণ্যোর্নি হিতো জাতবেদা
গর্ভ ইব সুভৃতো গর্ভি নীভিঃ।
দিবে দিব ঈড্যো জাগৃবদ্ভি—
র্হবিষ্মদ্ভি র্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ। এত দ্বৈতৎ॥

গর্ভিণী যেমন অন্নপানাদি দ্বারা গর্ভকে পোষণ করে সেইরূপ ঋত্বিগণ যে অগ্নিকে অরণিতে স্থাপিত করেন অর্থাৎ যজ্ঞে সর্ব্ব হবিদ্ভোজন যে অগ্নিকে অধ্যাত্মরূপে হৃদয়ে সুভৃত করেন এবং জাগরণশীল প্রত্যসক্ত মনুষ্যগণ প্রতিদিন যে অগ্নিকে স্তব করেন এত দ্বৈতৎ এই অগ্নিই প্রকৃত ব্রহ্মপদার্থ।

ঋষিরা যে কেবল এক সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহা নয়। তাঁহারা ঐ প্রাচীনতম যুগেই এই সত্যে উপনীত হইয়াছিলেন যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় ব্যাপারই এক অচল অটল নিয়মের দ্বারা পরিচালিত। বিজ্ঞানের এই মূলতত্ত্ব তাঁহারা অবগত ছিলেন। ঋক সংহিতার প্রথম মণ্ডলেই বিজ্ঞানের বিশ্বামিত্রের পুত্র দেবরাত ঋষি বরুণের স্তবে বলিতেছেন—

উরুং হিরাজা বরুণশ্চকার
সূর্য্যায় পন্থা মন্বে তবাউ।
অপদে পাদা প্রতিধাতবেক—
রুতাপবক্তা হৃদয়াবিধশ্চিৎ॥ ১-২৪-৮
অমীয ঋক্ষা নিহিতাস উচ্চা—
নক্তং দদৃশ্রে কুহচিদ্দিবেয়ুঃ।
অদব্ধানি বরুণস্য ব্রতানি
বিচাকশচ্চন্দ্র মা নক্তমেতি॥ ১-২৪,১০,

রাজা বরুণ সূর্য্যের নিয়মিত গতিবিধির জন্য পথ বিস্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার পদবিক্ষেপের জন্য পদরহিত অন্তরীক্ষে পথ করিয়া দিয়াছেন। ঐ যে নক্ষত্র যাহা উচ্চে স্থাপিত রহিয়াছে দিবাভাগে কোথায় চলিয়া যায় আবার রাত্রিকালে দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হয়? এই যে চন্দ্র দিবাভাগে অদৃশ্য থাকিয়া রাত্রিকালে দীপ্যমান হয় ইহাও তাঁহারই আজ্ঞায়। ইহারা যদৃচ্ছাক্রমে উদিত বা অদৃশ্য হয় না। রাজা বরুণের ব্রত বা নিয়ম অদব্ধ অচল অটল। তাই ঋষি বলিতেছেন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক অচল অটল নিয়মের অধীন—এবং সেই অদব্ধ ব্রতের একজন নিয়ামক আছেন। এই সূক্তে ঋষি তাঁহাকেই বরুণ ভাবে স্তব করিতেছেন। তার পর শুনিতে পাই বিশ্বামিত্র ঋষি বলিতেছেন—

ন তা মিনংন্তি মায়িনো-ন ধীরা
ব্রতা দেবানাং প্রথমা ধ্রুবানি।
ন রোদসীৎ অদ্রুহা বেদ্যাভির্ন পর্ব্বতা
নিনমে তস্থিবাং সঃ॥

এই যে ব্রত বা নিয়ম ইহা সৃষ্টির প্রথম হইতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ইহা অচল অটল, ইহার বিপরীতাচরণ অসম্ভব। সুচতুর মায়াবীই হউন, পণ্ডিতই হউন কেহই সে সকল ব্রতের হিংসা বা বিনাশ করিতে পারে না। দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে এমন কেহই নাই যে বিদ্যাদ্বারা তাহার অন্য আচরণ করিতে পারে। এই সকল অচল অটল নিয়ম "পর্ব্বতাইব" "ন নিনমে" পর্ব্বতের ন্যায় অবনত হইবার নয়।

সর্ব্বনিয়ন্তার এই অচল অটল নিয়মই কোথায়ও 'ব্রত' কোথায় বা 'ঋত' কোথায়ও বা সত্য বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। ইহাই আমাদের লৌকিক ভাষায় ধর্ম্ম—যাহাদ্বারা গ্রহ নক্ষত্রাদি ও লোক সমূহ ধৃত রহিয়াছে। প্রথম মণ্ডলের একটি সূক্তে বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে যে বলা হইয়াছে 'অতো ধর্ম্মানি ধারন, বিষ্ণু ত্রিপাদ এবং ধর্ম্ম সকলকে ধারণ করেন এখানে এই ধর্ম্ম ঐ ঋত বা ব্রত অর্থেই ব্যবহার হইয়াছে—সেই সকল নিয়ম বা laws যাহাদ্বারা বিশ্ব ব্যাপার নির্ণয় হইতেছে। এই সত্য কি? কোন ঋষি প্রশ্ন করিতেছেন—

"কে সত্য কে জানে? কে উহা বলে? কোন পথ দেবতাদিগের নিকট লইয়া যায়? দেবগণের অধঃস্থান অর্থাৎ দ্যুলোক স্থিত নক্ষত্রাদি যাহা দৃষ্টিগোচর হয় তাহা উৎকৃষ্ট দুর্জ্ঞেয় ব্রতে অবস্থিতি করে।

ঋষির মুখেই—ইহার উত্তর শুনিতে পাই।

"সত্যেনোত্ত ভিতা ভূমিঃ সূর্য্যে নোওভিতা দ্যৌঃ।
ঋতেনাদি ত্যাস্তিষ্ঠন্তি দিবি সোমো অধিশ্রিতঃ॥
১০, ৮৫, ১

পৃথিবী সত্যদ্বারাই আকাশের মধ্যে উত্তম্ভিত রহিয়াছে, সূর্য্য দ্যুলোককে উত্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছে, আদিত্যগণ ঋতকে আশ্রয় করিয়া উর্দ্ধদেশে স্থায়ী রহিয়াছে, সোমও ঋতের আশ্রয়েই ধৃত রহিয়াছে। পৃথিবী এবং সূর্য্য কাহার উপর ভর দিয়া রহিয়াছে? ঋষি বলিতেছেন পৃথিবী সত্যের উপর, সূর্য্য ঋতের উপর। উভয়েই সেই নিয়মের প্রভাবেই নিজ ২ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। এই সত্যের উদ্দেশ্যেই ঋষি বলিতেছেন—

"এই যে সত্য আকাশ এবং দিবা যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে, বিশ্বভুবন এবং প্রাণিবর্গ যাঁহার আশ্রিত, যাঁহার প্রভাবে প্রতিদিন জল প্রবাহিত হইতেছে এবং সূর্য্যদেব উদয় হইতেছেন, সেই সত্য যেন আমাদিগকে সকল বিষয়ে রক্ষা করেন। তাই ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন "ঋতস্যনঃ পথা নয় অতি বিশ্বানি দরিতা" আমাদিগকে পাপের পথ হইতে সত্যের পথে লইয়া যাও। এই ঋত এবং সত্য—এই অচল অটল নিয়ম ইহা কোথা হইতে উদ্ভব হইল? সিন্ধুদ্বীপ ঋষি বলিতেছেন—"ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভী দ্ধাও পসোধ্য জায়ত"—ইহা ঈশ্বরের তপঃ হইতেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। বেদে ঈশ্বরের জ্ঞানালোক তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতার জ্যোতিকে 'তপস্' বলা হইয়াছে। "যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ" এই শ্রুতিবাক্য অনুসরণ করিয়া শঙ্করাচার্য্য—'তপস্' শব্দের অর্থ জ্ঞান করিয়াছেন। যখন কোন সন্দেহাত্মা জিজ্ঞাসা করিতেছেন ঈশ্বর কোথায়? ঋষি বলিতেছেন—তিনি ঐ ঋতে। যে নিয়ম দ্বারা এই সৃষ্টি চলিতেছে তিনি এই নিয়মের ভিতরেই প্রকাশ রহিয়াছেন—এই জন্যই বেদে ঈশ্বরকে ঋত এবং 'ঋতসৎ' বলা হইয়াছে এবং ঈশ্বরের এক নাম ঋতবসেন্—তিনিই ঋত, তিনি ঋতসৎ এবং যাহা ঋত তাহাই তাঁহার বাস বা জ্যোতিঃ। ইহাই পরবর্ত্তী কালে উপনিষদে "ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম", "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি ভাবে উক্ত হইয়াছে। উপনিষদও এই সত্যই ঘোষণা করিতেছেন—

"সত্যেন বায়ু রাবাতি, সত্যেনাদিত্যো রোচতে দিবি,
সত্যং বাচঃ প্রতিষ্ঠা, সত্যে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং,
তস্মাৎ সত্যং পরমং বদন্তি।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী

"আশা পথে।"

কণ্টক বনে কেন লো সুন্দরি
এ কি দেখি তব বেশ।
কার তরে তব আঁখি ঝরিতেছে
আলু থালু কেন কেশ?

যমুনা শুনাবে কল্লোল গীতি
পুষ্প বিছান পথে;
ভ্রমিবে সদাই অই সুহাসিনী
রত্ন খচিত রথে।

সমীরণ যাবে কানে কানে বলি'
কত না গোপন কথা।
চাঁদিনী রজনী চরণে লুটাবে
রূপ দেখি' পেয়ে ব্যথা॥

তব সুধা হাসি যখনি ফুটীবে,
কোকিল উঠিবে গাহি,
সহসা সুরের সরস-আসারে
দশ দিশি অবগাহি।

রমণী তখন সরোষে কহিল
কবি, এ কি' কুবচন?
তুমি কি বুঝিবে হৃদয় বেদনা
রমণীর পোড়া মন?

যার তরে আমি কণ্টক বনে
নাহি যদি পাই তায়,
ত্যজিব জীবন সে বিনে বাঁচিয়া
কি ফল বলনা হায়?

শ্রীপ্রাণকিশোর সান্যাল।

মারকনী ও তারহীন টেলিগ্রাফি।

একদা শীতকালে নিউফাউণ্ডলেণ্ডের সমুদ্রতীরে তিনটি যুবককে এক বিশাল ঘুড়ী উড়াইতে দেখিয়া তথায় যে লোকটী সমুদ্রগামী জাহাজকে সঙ্কেত করিবার জন্য পাহারায় নিযুক্ত ছিল সে যুবকদিগকে বালকোচিত ক্রীড়ায় তন্ময় দেখিয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহাদের ঘুড়ীখানা বাঁশের শলা এবং রেশমী কাপড়ে প্রস্তুত ৯ ফুট লম্বা একটী বিশাল আয়তন এবং উহার সঙ্গে তার সংলগ্ন, ঘুড়ীটী উপরে উঠিয়া তার ছিড়িয়া সমুদ্রের দিকে চলিয়া গেল, তৎপর উহারা একটী বেলুন উঠাইয়া দিল, সেটীও ঘুড়ীর মত তার ছিড়িয়া সমুদ্রের কুয়াসার মধ্যে অন্তর্হিত হইল, যুবকগণ ইহাতে বিরত হইবার নহে, তৎপর দিবস তাহারা অন্য একটী বিশাল ঘুড়ী ৪০০ ফুট উর্দ্ধে উড়াইয়া দিয়া উহার সংলগ্ন তারটী ঐ পাহারাওয়ালার ঘরের একটী লোহার থামের সঙ্গে বাঁধিয়া ঐ তারের সঙ্গে গৃহাভ্যন্তরে স্থাপিত একটী অদ্ভুদ যন্ত্রের সহিত যোগ করিয়া দিল, ঐ যন্ত্রটীর সঙ্গে একটী টেলিফোঁ শুনিবার কল সংলগ্ন ছিল। ১৯০১ সনের ১২ই ডিসেম্বর এই ঘটনা হয়, যখন বেলা ১১২টা তখন উহাদের মধ্যে একটী সুদর্শন যুবক ঐ টেলিফোঁর কলটী কাণের কাছে ধরিল, বহু সময় যুবকত্রয় নির্ব্বাক হইয়া ঘুড়ীর দিকে তাকাইয়া রহিল, তৎপর মার্কনী (Marconi) বলিল কেম্প (Kemp) তুমি একবার চেষ্টা করিয়া দেখ, মার্কনীর আদেশ মত কেম্প যন্ত্রটী কাণে লইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল, যখন একটা বাজিয়া ১০ মিনিট, তখন সে তিনটী খট্ খট্ শব্দ শুনিতে পাইল। ২০০০ মাইল দূরে কর্ণওয়ালে (Cornwall) মার্কনীর একজন সহকারী ঐ শব্দ করিতেছিল, সেখানে সে একটী টেলিগ্রাফের কল টিপামাত্র প্রবল বৈদ্যুতিক প্রবাহ আকাশে ছড়াইয়া পড়িতেছিল, তাহার ফলে পুকুরে একটী ঢিল ছুড়িলে যেরূপ তরঙ্গ

চতুর্দ্দিকে ছড়াইতে থাকে সেরূপ বায়ুমণ্ডলে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ চতুর্দ্দিকে ছড়াইতে লাগিল, সে সময়েও মার্কনীর বিশ্বাস ছিল তাহার এই তারহীন সঙ্কেত প্রেরণায় কোন জড় বস্তুর প্রয়োজন নাই, ইহা কোন বস্তু বিশেষ দ্বারা বাঁধা প্রাপ্ত হইবার নহে, কারণ ইহা ইথারের (Ether) মধ্য দিয়া পরিচালিত হইয়া থাকে, বস্তুতঃ পক্ষে তাহা নহে, পৃথিবীর ৩৫ মাইল উর্দ্ধে এক ঘনীভূত বায়ুর স্তর বর্ত্তমান আছে, উহা দ্বারাই এই বৈদ্যুতিক প্রবাহ পরিচালিত হইয়া থাকে, এই প্রবাহ সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮০ হাজার মাইল বেগে চলিয়া থাকে। সাধারণ টেলিগ্রাফে বৈদ্যুতিক প্রবাহ ১/১০০ সেকেণ্ড স্থায়ী হয় এবং উহার দ্বারা অপর দিকের কলে সারা দিয়া থাকে কিন্তু তারহীন টেলিগ্রাফে প্রবাহ মাত্র ১/১০০০০০ সেকেণ্ড স্থায়ী হয়, কাজেই উহার অনুভূতির জন্য বিশেষ একটী কলের প্রয়োজন। মার্কনী ইহা বিদিত ছিলেন এবং সেই জন্যই তিনি ঐ সঙ্কেত গৃহে ঘুড়ী দ্বারা পরীক্ষা করিবার সময়ে মনুষ্যের অনুভূতির অতীত শব্দ ধরিবার জন্য ঐ অদ্ভুত কলটী স্থাপন করিয়াছিলেন। সে দিবস মার্কনী যেরূপ বহু সময় টেলিফোঁর শ্রবণ যন্ত্র কর্ণে ধারণ করিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন সেরূপ তাঁহার সহকর্ম্মীও দীর্ঘকাল কর্ণোয়াল হইতে বৈদ্যুতিক প্রবাহ চালনা করিতেছিলেন। সে সময়ে মার্কনী জানিতেন না যে তিনি প্রবল সূর্য্যকিরণের সহিত সংগ্রাম করিতেছিলেন।

তাঁহার সামান্য যন্ত্র যে বৈদ্যুতিক প্রবাহ বায়ু মণ্ডলে প্রেরণা করিতেছিল উহা সমুদ্র পার হইবে কি প্রবল সূর্য্য কিরণে বায়ু মণ্ডল এরূপ তড়িৎ ভাবাপন্ন হইয়াছিল যে উহা তাহাতেই বিলীন হইতেছিল। সে জন্যই নিউ ফাউণ্ডল্যেণ্ডে ঐ শব্দ পৌঁছিতে এত সময় লাগিয়াছিল।

এই তারহীন টেলিগ্রাফিতে মার্কনীরও প্রথমতঃ ভুল ধারণা ছিল। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে ইথার (Ether) দ্বারাই এই তড়িৎ প্রবাহ চালিত হইয়া থাকে। কিন্তু অতঃপর ১৯০২ সনে প্রথম বুঝিতে পারিলেন যে প্রকৃতপক্ষে তিনি পৃথিবী কিম্বা বায়ু মণ্ডলকেই তড়িৎ প্রবাহের তাররূপে ব্যবহার করিতেছেন। ছয় বৎসরের অদম্য চেষ্টার ফলে আটলাণ্টিক মহাসাগরের উপরস্থ বায়ু মণ্ডল দ্বারা তিনি সুচারুরূপে শব্দ প্রেরণায় সক্ষম হইয়া ছিলেন। যে স্থান হইতে সংবাদ পাঠান হয় এবং যে স্থানে উহা গ্রহণ করা হয় উভয় স্থানেরই যন্ত্রাদির বহু পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন করিয়া ১৯০৭ সনে তারহীন টেলীগ্রাফি সর্ব্বসাধারণের কার্য্য করিতে সক্ষম হয়।

মার্কনী যখন এই পরীক্ষায় ব্যাপৃত ছিলেন তখন তিনি অধ্যাপক রিগির (Righi) অধীনে বলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন, তখন তাঁহার বয়স মাত্র ২০ বৎসর। অধ্যাপক হেন্‌রিক্ হার্জ (Heinrich Hertz) ৩০ বৎসর বয়সে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের অস্তিত্ব বাহির করেন। অধ্যাপক রিগি এই তরঙ্গ সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছিলেন। ইতিপূর্ব্বেও লোকে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের অস্তিত্ব পরিজ্ঞাত ছিল। ফেরাডে (Faraday), মেক্সওয়েল (Clerk-Maxwell) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আলোক, উত্তাপ ও চৌম্বকিক বিদ্যুতের ইহাই যে মূল কারণ, তাহা অবধারণ করেন। এ যাবৎ এই তরঙ্গের অস্তিত্ব লোকে কেবল অনুমান করিত কিন্তু ১৮৭৯ সনে ইহা ধরিবার উপায় বাহির হয়। অধ্যাপক হাগস্ (D. E. Heighes) যিনি টেলিফোঁর কথা বলিবার অংশ বাহির করেন তিনিই বৈদ্যুতিক তরঙ্গ উপলব্ধি করিবার যন্ত্র বাহির করেন। তিনি একটী যন্ত্রে বিদ্যুত স্ফুরণ করিয়া উহা ইথারে (Ether) চালনা করিতেন। এই বৈদ্যুতিক তরঙ্গকে ইট, পাথর গৃহ কিছুতেই বাঁধা দিতে পারিত না, কারণ ইহা বায়ু কিম্বা মৃত্তিকার মধ্যদিয়া পরিচালিত হইত না।

ইথারের ভিতর দিয়া কোটী কোটী মাইল দূর হইতে নক্ষত্রলোক হইতে আলো আসিতেছে। আলোক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক তরঙ্গ মাত্র এবং আমাদের চক্ষু এই তরঙ্গের অংশ মাত্র গ্রহণ করিয়া আলো উপলব্ধি করে। আমাদের কর্ণ মাত্র বায়ুর জড় তরঙ্গ উপলব্ধি করিতে সক্ষম। বায়ু মণ্ডলের বহির্দ্দেশে কোনরূপ শব্দ উদ্ভূত হইলে তাহা আমরা শুনিতে সক্ষম হই না। চক্ষু আমাদের ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক তরঙ্গ

উপলব্ধি করিতে পারে। এই তরঙ্গ আরও ক্ষুদ্র হইলে উহা ধরিতে যন্ত্রের প্রয়োজন। অধ্যাপক হ্যাগস্ এই যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন এবং ইহার নাম মাইক্রোফোন (Microphone)। ইহা দ্বারা কয়েক ইঞ্চি মাত্র লম্বা তরঙ্গ উপলব্ধি করা যায়।

মার্কনী ১৮৯৪ সনে, হার্জ (Hertz) ব্রেন্‌লী (Branly) এবং রিগির (Righi) অভিজ্ঞতার উপরে নির্ভর করিয়া বিনা তারে সংবাদ পাঠাইতে চেষ্টা করেন, মার্কনীর পিতা ইটালিয়ান এবং মাতা আইরিশ। ইঁহাতে আইরিশ্ রক্ত থাকাতেই ইংরাজগণ মার্কনীকে নিয়া গৌরব করিয়া থাকেন, যখন মার্কনী বাড়ীতে ইহার পরীক্ষা করিতেছিলেন তখন অপর কেহ কেহও বৈদ্যুতিক তরঙ্গের পরীক্ষা করিতেছিলেন। যদিও ইংরাজগণ তাঁহার নাম প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত, আমাদের ভারত গৌরব ডাঃ জগদীশ চন্দ্রও উঁহাদের অন্যতম ছিলেন বলিয়া আমরা গৌরব করিতে পারি।

১৮৯৫ সনে এড্‌মিরেল জেকসন্ (Jackson) ও এক জাহাজ হইতে অন্য জাহাজে বিনা তারে সংবাদ পাঠাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইহা নৌ বিভাগ গোপন রাখাতেই মার্কনীর জয়মাল্য লাভ হয়।

সাধারণ টেলিগ্রাফিতে তড়িৎ প্রবাহ মৃত্তিকার ভিতর দিয়া এক ষ্টেশন হইতে অপর ষ্টেশনে চালিত হয় এবং তারের ভিতর দিয়া উহা পুনরায় প্রেরিত ষ্টেশনে ফিরিয়া আসে। পূর্ব্বে বিপরীত ধারণা ছিল। মার্কনী অজ্ঞাতসারে এই তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। তিনিও তাঁহার তারের এক মাথা মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া অপর মাথা এক উচ্চ স্তম্ভের উপরে শূন্যে স্থাপন করিতেন। ইহা দ্বারা, তিনি পূর্ব্বে বায়ু মণ্ডলে অথবা ইথারে তড়িৎ প্রবাহ নিক্ষেপ করিয়া যত দূরে সংবাদ প্রেরণা করিতে পারিতেন, তাহা হইতে ৮।১০ গুণ অধিক দূরে সংবাদ পাঠাইতে সক্ষম হইলেন।

আমাদের পৃথিবীর ৩৫ মাইল উর্দ্ধে যে ঘনীভূত বায়ুস্তরের কথা উল্লেখ করিয়াছি তাহার বাঁধা অতিক্রম করার জন্য মার্কনী প্রবল বৈদ্যুতিক তরঙ্গ উৎপন্ন করেন। উহা কখন কখন পাঁচ মাইল প্রশস্ত হইয়া থাকে কিন্তু আলোকের বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ১০৬১০০ ইঞ্চি হইলেই আমরা চক্ষে অনুভব করিয়া থাকি।

তারহীন টেলিগ্রাফির এই বিশাল তরঙ্গ দ্বারা বৈদ্যুতিক প্রবাহ একবার ৩৫ মাইল উর্দ্ধস্থ বায়ু স্তরের উর্দ্ধে উঠাইয়া দিতে পারিলে এই সুবিধা হয় যে ঐ ঘনীভূত বায়ুস্তর একরূপ ইন্‌সুলেটারের (Insulater) কার্য্য করে, তখন প্রবাহ অনায়াসে চলিতে পারে।

বর্ত্তমানে মার্কনীর টেলিফান্‌কেন্ (Telefunken), পোলসেন্ (Paulsen), ফেসেন্‌ডেন্ (Fessenden) প্রভৃতি কতিপয় প্রতিযোগী উপস্থিত হইয়াছেন। সকলেই তারহীন টেলিগ্রাফির অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন কিন্তু সকলের কার্য্যেই নিজেদের কিছু বিশেষত্ব আছে। এই টেলিগ্রাফির দ্বারা সমুদ্রগামী জাহাজের যে কত উপকার সাধন হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। বর্ত্তমানে আলোক গৃহে রাত্রিচর জাহাজে আলোক সঙ্কেত করিবার প্রয়োজন নাই, এই তারহীন টেলিগ্রাফির দ্বারাই ঐ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

মার্কনী কোম্পানী বৃটিশ রাজ্যে লণ্ডন, ইজিপ্ট, এডেন, ভারতবর্ষ (বাঙ্গেলোর), দক্ষিণ আফ্রিকা এবং সিঙ্গাপুরে তারহীন টেলিগ্রাফির ষ্টেশন স্থাপন করিয়াছে ইহা ক্রমেই বিস্তৃত হইবে। গবর্ণমেণ্ট হইতে ইহার প্রত্যেক ষ্টেশনের জন্য কোম্পানি ৯০০০০০ টাকা করিয়া পাইবে। বর্ত্তমানে ইহার যন্ত্রে মিনিটে ১০০ হইতে ২০০ শব্দ প্রেরণ করিতে পারে।

যুদ্ধ বিগ্রহের সময় শত্রু পক্ষ কখন ২ সমুদ্রের মধ্যস্থ "কেবল" (Cables) কাটিয়া সংবাদ চলাচল বন্ধ করিতে পারে কিন্তু বর্ত্তমানে তারহীন টেলিগ্রাফে আর সে ভয় থাকিবে না। এখন এরূপ উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে যে নিকটে ২টী ষ্টেশন থাকিলেও এক স্থানের কার্য্য দ্বারা অন্য স্থানের কার্য্যের কোনরূপ ব্যাঘাত হইবে না। যে দুইটী ষ্টেশনের সহিত যোগাযোগ রাখিতে হইবে সে দুইটী

যন্ত্রের কল এক লয়ে বাঁধা থাকে। উভয় যন্ত্রের তড়িৎ প্রবাহের ঢেউ বা কম্পন ঠিক একরূপ, কাজেই একে অন্যের সহিত কার্য্য করিতে পারে। এই তরঙ্গ বিশেষ-ভাবে সন্নিবিষ্ট থাকে, তাহা দ্বারাও অপর যন্ত্রের ব্যাঘাত হয় না, কেবল নির্দ্দিষ্ট যন্ত্রই কার্য্য করিতে পারে, পূর্ব্বে যে ব্যাপক ভাবের তরঙ্গ ব্যবহৃত হইত, তাহা সমুদ্রগামী জাহাজে বিপদের সময়ে কার্য্যকরী হয়, কারণ বিপদ জ্ঞাপন করিবা মাত্র যে কোন জাহাজ উহা ধরিতে পারে এবং সত্বর উপস্থিত হইয়া সাহায্য করিতে পারে। কোন ২ জাহাজে এই যন্ত্রের উপরে এরূপ একটী ঢাকনী থাকে যে উহার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া তড়িৎ তরঙ্গের পরিবর্ত্তন করা যায়।

শ্রীহরিচরণ গুপ্ত।

হরি শঙ্কর।

আজ আমি যে হরিশঙ্করের কাহিনী লইয়া পাঠকদের সমক্ষে উপস্থিত হইতেছি ইহা স্বর্গীয় হরিনাথ দে বা গৌরী শঙ্করদের ন্যায় কোনও ব্যক্তি বিশেষের কাহিনী নহে অথবা 'গৌরীশঙ্করের' ন্যায় কোনও পর্ব্বত শৃঙ্গের বৃত্তান্তও নহে। ইহা পূর্ব্ববঙ্গস্থিত ঢাকা জিলার কতিপয় অঞ্চলে প্রচলিত দেবতাবিশেষের পূজা ও তাহার ব্রতকথা। এই দেবতার অর্দ্ধভাগ হরি এবং অপরার্দ্ধ শঙ্কর। মূর্ত্তি গঠনকালেও এই দেবতাকে দক্ষিণভাগে হরির এবং বামভাগে হরের আকারে প্রস্তুত করা হয়। অর্দ্ধেক অঙ্গ শ্যামল ও অর্দ্ধেক শুভ্র! দেখিয়া মনে হয় যেন শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গে আন্তরিক আলিঙ্গনে সংবদ্ধ। এই মূর্ত্তি কোথাও "হরিহর" নামে পরিচিত কিনা তাহা আমরা বলিতে পারিব না। ভণিতাটীকে সুদীর্ঘ না করিয়া এই মুহূর্ত্তেই ব্রতকথা আরম্ভ করিতেছি। হরিশঙ্করের ভক্ত পাঠকগণ প্রত্যেকে এক একটী পুষ্প হাতে লইয়া অন্ততঃ এক একটী পুষ্পের পাপ্‌ড়ি লইয়া অবহিত চিত্তে ব্রতকথা শ্রবণ করুন। এই কথা শ্রবন করিলে

"নির্ধইনার ধন হয়, অপুত্রার পুত্র হয়, অ'বায়স্তের বিয়া হয়,হাতীশালে হাতী হয়, ঘোড়াশালে ঘোড়া হয়,সাত পুত্র ওর, ঐশ্বর্য্য অপার হয়, আগে দীঘি পাছে পুষ্কর্নী হয়,হারাণ ধন ঘর লয়, মরির মরা জিয়ে,যে যেই কামনা করে সেই কামনাই সিদ্ধি হয়।"

ব্রতের কথা শ্রবণ মাত্রেই যখন এত আশীর্ব্বাদ, ঐ কাহিনী ছাপার অক্ষরে পাঠ করিলে বোধ হয় তদপেক্ষা অধিকতর ফল লাভ হইবে। ব্রতের তিথি, বার, নক্ষত্র, ঋতু, মাস প্রভৃতি ব্রতকথার ভিতরেই উল্লেখিত হইবে, অতএব এই স্থানে আর স্বতন্ত্র বিবরণ প্রদত্ত হইল না। ভাষার পরিবর্ত্তন না করিয়া মহিলাদের মুখে ব্রতকথা যেমনটী শুনা যায় ঠিক তেমনটি উদ্ধৃত করা হইতেছে।

ব্রত-কথারম্ভ।

এক ব্রাহ্মণ। দিন আনে দিন খায়, মিত্তাভিক্ষা গুরু রক্ষা। একদিন ব্রাহ্মণ বল্লেন 'বাম'নি আজ অনেকদূর ভিক্ষা করতে যামু।' ব্রাহ্মণ মেলা করলেন। যাইতে যাইতে,যাইতে যাইতে এক অরাণ (১) জঙ্গলে গিয়া উপস্থিত। দেখেন, দেব-কন্যারা ধূপ, দীপে, গীতে, নাটে, জয় জোকারে বর্ত্ত (২) আরম্ভনা করছেন। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করেন "মাগো তোমরা কার বর্ত্ত করছ? এই বর্ত্ত কল্লে কি হয়?" দেব-কন্যারা বলল "আমরা হরিশঙ্করের বর্ত্ত করতাছি, এই বর্ত্ত কর্‌লে ধইনার ধন হয়, অপুত্রার পুত্র হয়, অ'বিয়স্তের বিয়া হয়, হাতীশালে হাতী হয়, ঘোড়াশালে ঘোড়া হয়, সাতপুত্র হয়, ঐশ্বর্য্য অপার হয়, হারাণ ধন ঘর লয়, মরির মরা জিয়ে, যে যেই-কামনা করে সেই কামনাই সিদ্ধি হয়।" ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করেন "আমরে নি এই বর্ত্ত শিখাইতে পার?"

"না, দেবকুলের বর্ত্ত মনুষ্য কুলে কর্ত্তে পারবি না, তিন ছিয়া বিয়া (৩) করবি, কাম নাই।"

"না ছিয়া বিয়া করতাম না, পারমু।"

"কার্ত্তিক মইস্যা অমাবস্যার প্রতিপদেরে প্রাতঃস্নান,

(১) অরাণ=নিবিড়। (২) বর্ত্ত—ব্রত।

(৩) ছিয়া বিয়া=বিতিকিচ্ছি।

কইরা মাটি ভিজাইয়া দুই ষোল বত্রিশটা গোটা পাকাইবি। একমাস ভইরা বর্ত্তের কথা কইবি। অগ্রাণ মাইসা অমাবস্যার প্রতিপদেরে দুইষোল বত্রিশ গাছ দূর্ব্বা তুলবি। দুইষোল বত্রিশ কাঠা ধান বানিয়া দুইসোল বত্রিশটা নৈবিদ্দি করবি, পিঠা করবি, পরমান্ন করবি। হাতে মোহন লড়ি, কাণে মদন কড়ি, অর্দ্ধেক খান হরি অর্দ্ধেক খান শঙ্কর মূর্ত্তি আইনা ধূপে দীপে, গীতে নাটে, জয়ে জোকারে পূজা করবি।"

আর আর দিন ব্রাহ্মণ পায় আধসের চাইল; আজ আধছালা চাইল লইয়া বাড়ী ফিরিলেন।

যায়, আছে, আনে, নেয়, খায়। তাঁরপর কার্ত্তিক মাইসা অমাবস্যার প্রতিপদের দিন ব্রাহ্মণ বলেন "বামুনি গো, ছান্ কইরা আয়; হরিশঙ্করের গোটা পাকাইয়া গো।"(১) বামুনী গিয়া ছান কইরা আইলেন, গোটা পাকাইয়া রাখ্‌লেন। একমাস ভইরা বর্ত্তের কথা কইলেন। অগ্রাণ মাইসা অমাবস্যার প্রতিপদেরে দুইষোল বত্রিশ গাছি দূর্ব্বা তুললেন, দুইষোল বত্রিশ কাঠা ধান ভান্‌লেন, পিঠা করলেন, পরমান্ন করলেন। ঘাটে ঘাটে কলার মূলায় জলকই ছেঁচইএ, হাতে মোহন লড়ি, কাণে মদন কড়ি অর্দ্ধেক খান হরি অর্দ্ধেক খান শঙ্কর—"হরিশঙ্কর ঠাকুর" আনলেন। ধূপে দীপে, গীতে নাটে, জয়ে জোকারে পূজা সমাপন করলেন। ঠাকুর তুষ্ট হইয়া বর দিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণের আগে দীঘি, পাছে পুষ্করণী হইল, হাতীশালে হাতী হইল, ঘোড়াশালে ঘোড়া হইল, সাতপুত্র হইল, ঐশ্বর্য্য অপার হইল।

বামুনীর এক গোয়ালনী সই ছিল। গোয়ালনী বলে "সই গো সই আমারে-নি এই বর্ত্ত শিখাইতে পার?"

"যতই দেখ্‌বি কলাবাগ ততই যাবি গোয়ালের মাঝ, দই বেচ্‌বি দুধ বেচ্‌বি, তুই-নিল এই বর্ত্তের কথা কইতে পারবি?"

"না পারমু, আমারে এই বর্ত্ত লওয়াতে হ'বে।"

"পারতি না, তিন ছিয়াবিয়া করবি। হলা হলা ঝরার ভাত চলা চলা পুঠি মাছ ঝিয়েরে দিবি পুতেরে দিবি আপনিও একটু মুখে দিবি বর্ত্তের কথা মনে পাহরবি * (১) তুই নিলো এই বর্ত্ত করতে পারবি?"

"না; পারমু, আমারে এই বর্ত্ত লওয়াইতে হবে।" বামনী গোয়ালনীরে বর্ত্ত লওয়াইলেন। দুই সইয়ে মিল্যা হরিশঙ্কর বর্ত্ত করলেন। যায় দিন। পরের বছর দুই সইতে মিলিয়া গোটা পাকাইলেন। দুই সইয়ে বর্ত্তের কথা কন। একদিন বামনী হলা হলা ঝরার ভাত, চলা চলা পুঠি মাছ, ঝিয়োর দিলেন, পুতেরে দিলেন, আপনিও একটু মুখে দিলেন, বর্ত্তের কথা মনে পাহরলেন। গোয়ালনী বলে সই গো সই, আইস আমরা বর্ত্তের কথা কই। বামনী বলেন 'হলা হলা ঝরার ভাত চলা চলা পুঠি মাছ, ঝিয়েরে দিছি পুতেরে দিছি আপনিও একটু মুখে দিছি বর্ত্তের কথা মনে পাহরছি। তোমার কথা তুমি কও আমার কথা আমি আর একদিন কমু।' গোয়ালনী আজ একলাই বর্ত্তের কথা কইল। আর একদিন আইসা জিজ্ঞেস্ করে "সই গো সই, আইস বর্ত্তের কথা কই।" বামনী বলেন "পিষ্টক রাঁধছি, পরমান্ন রাঁধছি, ঝিয়েরে দিছি পুতেরে দিছি, আপনিও একটু মুখে দিছি বর্ত্তের কথা মনে পাহরছি। তা তোমার কথা তুমি কও আমার কথা আমি আর একদিন কমু।" আর একদিন

(১) হরিশঙ্করের উদ্দেশে বত্রিশটী মাটির গোটা পাকাইয়া ধান দূর্ব্বা, পুষ্প ও সিন্দুর প্রভৃতি দিয়া পবিত্র স্থানে রক্ষা করা হয়। চান্দ্র মাসের গণনা অনুসারে বোধ হয় দুইষোলতে বত্রিশটী গোটা পাকাইবার নিয়ম।

(১) সম্পূর্ণ একমাস কাল; ব্রতের কথা বলিবার পূর্ব্বে জলগ্রহণ করিবার নিয়ম নাই। যদি কোন দিন ভুল বশতঃ ইহার ব্যতিক্রম হয় তবে পর দিবস দুইবার করিয়া ব্রত কথা বলা হইয়া থাকে; অথবা গ্রামে অপর কেহও ব্রতী থাকিলে তিনি দুইবারে ব্রত কথার আবৃত্তি করিবেন।

গোয়ালনী আইসা জিজ্ঞেস করে 'সই গো সই' আইস বর্তের কথা কই। বামনী বলে "ক্ষীরা ক্ষীরা দুধ করছি ঝিয়েরে দিছি পুতেরে দিছি, আপনিও একটু মুখে দিছি বর্তের কথা মনে পাহরছি (১) তা তোমার কথা তুমি কও আমার কথা আমি আর একদিন কইমু। গোয়ালনী বলে "তবে সই তোমার গোটা তুমি রাখ আমার গোটা আমারে দাও।" বামনীরে অলক্ষ্যাতে পাইল, বামনী পাছ দুয়ার দিয়া গোটা বাইর করা দিল। অগ্রাণ মাইস্যা অমাবইস্যার পাতিপদের দিন নিশাকালে (২) হরিশঙ্কর ঠাকুর আইলেন। আইস্যা দেখেন, বামনী ঘুমাইয়া আছেন।' গোয়ালনী ধূপে, দীপে, গীতে নাটে জয়ে জোকারে, পূজা আরম্ভ করছে। ঠাকুর গোয়ালনীর বাড়ীতে পূজা খাইয়া তুষ্ট হইয়া বর দিয়া গেলেন। গোয়ালনীর হাতী শালে হাতী হইল, ঘোড়া শালে ঘোড়া হইল ইত্যাদি।

বামনীর হাতীশালে হাতী চলে, ঘোড়াশালে ঘোড়া চলে, সাতপুত্র মরে, বমনী কাঁদে কাটে। গোয়ালনী আইসা জিজ্ঞেস করে 'সই তুমি দেখি কাঁদ কাট, আমারও কাঁদ্‌তাম কাট্‌তাম মনে লয়। (৩)

"আমি কাঁদি মনের দুঃখে, তুমি কাঁদবে কোন্ দুঃখে? রাজার হাতীটা মইরা রইছে তারে ধইরা কাঁদ।" গোয়ালনী গিয়া রাজার মরার হাতীটা ধরল। হরিশঙ্কর ঠাকুর ভাবেন 'কি আমার পূজার ফল বৃথা যাবে, গোয়ালনীর চক্ষের জল মক্ষে (১) পড়বে!' (তা কখনও হবেনা) এক কুঁই দুই কুঁই তিন কুঁই দিতেই রাজার হাতীটা জিয়া উঠল। (২)

আর এক দিন আইসা গোয়ালনী বলে "সই গো সই তুমি কাঁদ কাট, আমারও কাঁদতাম কাটতাম মনে লয়"।

"আমি কাঁদি মনের দুঃখে তুমি কাঁদবে কোন্ দুঃখে, রাজার ছেলেটা মরে আছে তারে ধইরা গা কাঁদ।"

এক কুঁই দুই কুঁই তিন কুঁই দিতেই রাজার ছেলে জিয়া উঠল। গোয়ালনীর চক্ষের জল আর মক্ষে পড়ে না। এ দিকে বামনীর যত সম্পদ ছিল সব গেল। বামন বলেন বামনী "আমার আগে বা সম্পদ দিল কে, পাছে বা সম্পদ নিল কে? যে আমারে আগে বাড়াইয়া পাছে কমাইছে তাঁর উদ্দেশ্যে যামু। গোয়ালনী আইসা বলে "সইয়া ঠাকুর কৈ যাও?"

(১) "আমার আগে বাড়াইয়া পাছে কমাইছে তার উদ্দেশে যাই।"

"তবে তাঁরে আমার (ও) সংবাদ কইয়।"

"তোমার সংবাদ কি কমু?"

"আমার যে কাঁদতাম্ কাট্‌তাম মনে লয় সেই সংবাদ কইয়।"

বুড়া বামন লড়িত ভর (৩) কইরা উঠলেন। কত দূর যান, গিয়া দেখেন একটা লোক মণ্ডল মাথায় কইরা খাড়ইয়া রহিছে (৪) জিজ্ঞেস্ করে "ঠাকুর তুমি কই যাও?"

(২) "আমার আগে বাড়াইয়া" ইত্যাদি।

"আমি (কেন) যে মণ্ডল মাথায় কইরা খাড়ইয়া রহিছি নড়তে পারি না চলতে পারি না এই সংবাদ কইয়।"

---

(১) পাহরছি = পাসরিছি = বিস্মৃত হইয়াছি।

(২) কোন কোন স্থানে দিবাভাগে, কোথাও বা রাত্রিতে পূজা হয়।

(৩) গোয়ালনীর সর্ব্বসম্পদ হওয়ার পর সুখের সীমা নাই। নিরবচ্ছিন্ন সুখের মধ্যে তার একদিন কাঁদিতে ইচ্ছা হইয়াছে; কিন্তু ক্রন্দনের কোনও উপলক্ষ নাই। অতএব ব্রাহ্মণী বলিতেছেন্ রাজার মরা হাতীটা ধরিয়া পরের দুঃখে দুঃখী হইয়া কাঁদিতে পার।

(১) মক্ষে = মর্ত্তে, অর্থাৎ ভূমিতে। হরিশঙ্করের আশীর্ব্বাদে ব্রত কারিনীদের শোকাশ্রু পাত হয় না। অতএব শোকের উপলক্ষে যে রাজার মরা হাতী তাহাও বাঁচিয়া উঠিল।

(২) কাঁদিবার নিমিত্ত হাগো, মাগো, আহা, উহু, করিবা মাত্রই হাতীটা বাঁচিয়া উঠিল।

(৩) লড়ি = লাঠি, যষ্টি। লড়িৎ = যষ্টিতে। ভর কইরা = আশ্রয় করিয়া।

(৪) মণ্ডল = গোলাকার বৃহৎ আসন বিশেষ। উহা মাথার উপড়ে নিয়া খাড়াইয়া রহিছে অর্থাৎ দাঁড়াইয়া আছে।

আর কত দূর যান্, একটা কবলী গাইয়ে (৩) জিজ্ঞেস করে "ঠাকুর তুমি কৈ যাও?"

(৩) "আগে বাড়াইয়া ইত্যাদি।"

"আমার দুধ যে দেবতায় খায়না, মনুষ্যে খায়না এই সংবাদ কইয়।"

আর কত দূর যান্, একটা অব্ধাপুষ্করণী (৪) জিজ্ঞাসা করে ;"

"আমার জল যে মানুষে খায় না গরুতে খায় না এই সংবাদ কইয়।" আর কত দূর যান্ একটা অমর্ত্ত ফলের গাছ (১) জিজ্ঞেস্ করে "ঠাকুর তুমি কৈ যাও?" "আগে বাড়াইয়া ইত্যাদি"

(৫) "আমার ফল যে কাউয়ায় খায়না কুলীতে খায়না এই সংবাদ কইয়।" আর কত দূর যান্ ইন্দ্রের সাত কন্যা জিজ্ঞেস্ করে "..................."

(৬) "আমরা এত বড় স্যোন হইয়াছি (২) আমাদের কেন বিয়া হয়না, এই সংবাদ কইয়।"

(৭) আর কত দূর যান্, শিয়ালটা উর্দ্ধমুখ হইয়া আছে, (সে) তাঁকে জিজ্ঞেস্ করে————

"আমি যে উর্দ্ধমুখী হইয়া আছি, ঘাস খাইতে পারিনা নীচের দিকে চাইতে পারিনা, এই সংবাদ কইয়" আর কত দূর যান্—

(৮) সের পুরা গলায় লইয়া (৩) খাড়াইয়া রইছে, জিজ্ঞেস্ করে————"আমরা যে সের পুরা গলায় লইয়া খাড়াইয়া রইছি, নামাতে পারিনা, তুলতে পারিনা, এই সংবাদ কইয়।

(৯) আর কতদূর যান্, পীড়ি মার্গে বাইজা রইছে (১) জিজ্ঞেস্ করে————"আমার যে পীড়ি মার্গে বাইজা রইছে ; খসেও না, ভাঙ্গেও না এই সংবাদ কইয়।"

(১০) আর কতদূর যান্, চালের কোণা ধইরা খাড়াইয়া রইয়াছে (সে) জিজ্ঞেস্ করে———"আমি যে চালের কোণা ধইরা খাড়াইয়া রইছি, নড়তে পারি না, হাট্‌তে পারি না এই সংবাদ কইয়।"

(১১) ছনের বোঝা মাথায় লইয়া রইছে "..................." "আমি যে ছনের বোঝা মাথায় লইয়া রইছি, নামাইতে পারিনা, সরাইতে পারিনা, এই সংবাদ কইয়।"

(১২) কলা, মূলা, জলফই, তেঁতই লইয়া বইসা রইছে———"আমরা যে কলা মূলা জলফই তেঁতই লইয়া বইসা রইছি, বিকী কিনি হয়না, এই সংবাদ কইয়।"

(১৩) চুণের টোপা ঠোঁটে লইয়া বইসা রইছে——— "আমি যে চুণের টোপা ঠোঁটে লইয়া বইসা আছি, খসেও না, পরেও না, এই সংবাদ কইয়।"

(১৪) কুমিরটা জলে-টানে পইড়া রইছে (২)——— "আমি যে আহার করতে পারিনা, আধার করতে পারিনা এই সংবাদ কইয়।"

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন কাব্য-পুরাণতীর্থ।

---

(৩) কবলী গাই—প্রচুর দুগ্ধবতী গাভী।

(৪) যে পুকুরের জল অব্যবহার্য্য।

(১) অমর্ত্ত ফল—অমৃত ফল অর্থাৎ আমগাছ।

(২) স্যোন হইছি—সেয়ানা হইয়াছি, যুবতী হইয়াছি।

(৩) সের পুরা—ওজন করিবার ভাণ্ড বিশেষ। বেতের বা বাঁশের নির্ম্মিত।

(১) পীড়ি—পৈঁঠা, বসিবার নিমিত্ত কাষ্ঠাসন ; গুহ্যদেশে সংবদ্ধ হইয়া আছে। মাংসের সঙ্গে জোড়া লাগিয়া আছে। "অশ্বত্থামার মণি রক্তের ন্যায় আজন্ম সংলগ্ন নহে।"

(২) অর্দ্ধেক জলে, অর্দ্ধেক ডাঙ্গায় পড়িয়া আছে।

পতিনির্ব্বাচনে নারীর রুচি।

সকল দেশেই যে স্ত্রীলোকগণ সকল পুরুষের সহিত স্বভাবতঃ প্রেমে মত্ত হয়, তাহা নহে। প্রতি দেশে কোন একটী বিশেষ গুণের পক্ষপাতী হইয়া পুরুষের প্রতি নারী-জাতি অনুরাগ প্রদর্শন করে। বিভিন্ন দেশের স্ত্রীলোকের পতিনির্ব্বাচন সম্বন্ধে কি অভিরুচি তাহার কিছু ধারনা নিম্নে দেওয়া গেল।

ফরাসী বিলাসিনীগণ বীর ও রসিক স্বামী কামনা করেন।

ওলন্দাজ কামিনীগণ, যে স্বামী নিরবচ্ছিন্ন সুখ ও স্বচ্ছন্দে রাখিতে পারেন, সেরূপ পতিতে রত।

জর্ম্মাণ রমণীগণ স্থির-প্রণয়ী ও চিরবিশ্বাসী পতিতে রত।

স্পেন নারীরা বৈর নির্য্যাতনকারী স্বামী বড় ভালবাসেন।

ইটালীয় রূপসীগণ কবিত্ব ও কল্পনা পূর্ণ ভর্ত্তা লাভে যত্নবতী।

রুষিয়ার সীমন্তিনীগণ, যে ব্যক্তি ইউরোপের পশ্চিম বিভাগের জাতিদিগকে অসভ্য ও দুর্ভাগা বলিয়া ঘৃণা করেন, তাহাকে তাহাদের প্রণয়াকাঙ্ক্ষার উপযোগী মনে করেন।

ডিনেমার ললনাগণ স্বামী যদি তাহার শ্বশুরের দেশকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বসুখাধার বলেন, তবে সেই স্বামীকে তাঁহারা খুব পছন্দ করেন।

ইংরাজি ললনাগণ ধনবান স্বামী চাহেন।

আমেরিকার রমণীগণ বিজ্ঞানবিদ্ ব্যক্তিকে স্বামী রূপে গ্রহণ করিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন।

নিগ্রো নারীগণ বনবাসী স্বামী চান।

আফ্রিকার রমণীগণ নৃত্যগীতে পারদর্শী স্বামীতে রত।

নিউবিয়ার রমণীগণ যে স্বামী নানারূপ রং দ্বারা বেশ সাজিতে পরেন, এমন লোককে পতি করিতে চান।

চীন নারীগণ চিত্র অঙ্কন করা বিদ্যায় অভিজ্ঞ ভর্ত্তায় ভক্ত।

জাপান রমণীগণ বীর ও বাণিজ্য-প্রিয়-পতি চান।

তিব্বত লক্ষ্মীরা সংস্কৃতভাষাবিদ ধার্ম্মিক স্বামী লাভে দৃঢ়চিত্ত।

ব্রহ্মদেশীয় ললনাগণ শিল্পবিদ্যায় বিশারদ ভর্ত্তা ভালবাসেন।

কাশ্মিরী যুবতীগণ সুসভ্য স্বামীর সেবা পরায়ণা।

মারবারী রূপসীরা ধর্ম্মরত ঈশ্বর ভক্ত পতি গ্রহণে ব্যস্ত।

পশ্চিমা রমণীগণ বলবান পতি চান।

বোম্বাইয়ের রমণীগণ ব্যবসায়ে দক্ষ পতি লাভে কৃতসঙ্কল্প।

মান্দ্রাজ সুন্দরীগণ ইংরাজি ভাষাবিজ্ঞ স্বামীর প্রিয়।

উৎকল কামিনীগণ মূর্খ অথচ কৃষিকার্য্যে পারদর্শী পতি চান।

বাঙ্গালী সতীগণ সর্ব্বাঙ্গে সোনার গহনা দিতে পারেন, এমন স্বামী পছন্দ করেন।

আসামী সীমন্তিনীগণ স্বদেশ-ভক্ত স্বামী প্রিয়।

আরব কামিনীগণ পর্ব্বতবাসী স্বামী লাভে যত্নবতী।

গারো রমণীগণ প্রতিহিংসা পরায়ণ পতিতে রত।

খাসিয়া ও জয়ন্তী নারীগণ যবন বিদ্বেষভাবাপন্ন পতি চান।

কোল ও ভীল ললনাগণ শত্রু দলনে সক্ষম স্বামী সঙ্গ চান।

রাজপুত বীরাঙ্গনা ধীর ও অটলপ্রতিজ্ঞ স্বামী ভক্ত।

জাট সুন্দরীগণ সমরদক্ষ পতি চান।

(মেদিনীপুর হিতৈষী)

শ্রীরঘুনন্দন দাস।

আমি ও তুমি।

বড় নগর বড় সহর
তোমার বসত বাস।
বড় রাস্তায় গাড়ী ঘোড়ায়
চলছ বার মাস।

কলের জলে স্নানটা চলে
আইস, লেমনেড্ পান।
বালাম চাল আর বুটের ডাল
উদরে দাও স্থান।

দুগ্ধ-দুগ্ধে, তুমি মুগ্ধ
জল খাইবার লুচি
রস গোল্লা, কাচা গোল্লা
বাদসা-ভোগ আর সুজি।

মাইনা তোমার সাত শ টাকা
কমনা তুমি লোক।
ভাব্‌ছি মনে দিনে দিনে
আরো বৃদ্ধি হোক।

আমি একটি অতি ক্ষুদ্র
দীন, দরিদ্র অতি।
বিশে কি তিরিশে মোর
এ জীবনের গতি।

আমি সহর ছাড়া; পল্লী-পাড়া—
আমার বাড়ী ঘড়;
গ্রাম্য পথে চলা ফিরা,
কর্‌ছি নিরন্তর।

পথের ধারে খোলা মাঠে
সবুজ ধানের হাসি!
বৈশাখ মাসে বকুল হাসে—
টগর রাশি রাশি,

খরের ঘড়ে বসত করি
উপড়ে লাউ লতা—
হলুদে ফুল তার ফুটে হাসে
জুড়ায় মনের ব্যাথা।

আউশ অন্ন আমার ভক্ষ্য
তাতেই উদর ভরে,
বিলের জলে অবগাহন
তৃষ্ণা বারণ করে।

জল খাইবার ইক্ষু গুড়
মুরি, মুড়কী, চিরা,
তাতেই তুষ্ট কান্তি পুষ্ট—
নাইক মনের পীড়া।

প্রকৃতির সে শ্যামল ক্রোড়ে
পল্লী মায়ের বুকে,
হাসি খেলি নাচি, গাই;
নিত্যি মনের সুখে।

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত।

আয়ুর্ব্বেদ সমস্যা।

(১)

এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা যে কোন স্থানে দু-একটা অনুস্বার বিসর্গ যুক্ত বাক্য দেখেন, তাহাই অভ্রান্ত বেদ বাক্যবৎ বিশ্বাস করেন, এবং যদি কেহ যুক্তিযুক্ত ভাবে ও তাহার আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হয়, তবে এই রক্ষণশীল সম্প্রদায় চীৎকার করিতে থাকেন যে :—কলিকাল মাহাত্ম্যেই আজ সকলেই এতাদৃশ অপৌরুষেয় শাস্ত্রের সমালোচনা করিতে সাহসী হইতেছে। আর এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ বাক্য মাত্রকেই রাবিশ (Rubbish) বলিয়া মনে করেন, কেহ কেহ বা অনুগ্রহ করিয়া প্রাচ্যবিদ্যা মাত্রেই প্রত্নতাত্ত্বিকের আলোচনার বিষয় মনে করেন এবং তাহাদ্বারা আর বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে কোন কার্য্যই হইতে পারে না বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন। আজকাল এই উভয় প্রকার চরমপন্থীর সংখ্যাই অধিক হইয়া পড়িয়াছে।

আজ আমরা যে বিষয় আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি তাহাতে উক্ত উভয় দলই বিরূপ হইবেন। একদল ইতিমধ্যেই সুর ধরিয়াছেন। অস্মদ্বিধ মর্ত্ত্য মানব দ্বারা অপৌরুষেয় আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির চেষ্টা হইতেছে শুনিয়া তাঁহারা তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়াছেন। ইঁহাদের আস্ফালন মৌখিক মাত্র সুতরাং তাঁহাদ্বারা কার্য্যের ক্ষতির সম্ভাবনা অতি অল্প। কিন্তু অপর সম্প্রদায় মুখে কিছু না বলিলেও কার্য্যেই প্রবল বাধা জন্মাইতেছেন। যদি কেহ আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি কল্পে শারীরিক, বাচিক বা আর্থিক সাহায্য করিতে অগ্রসর হন, তবে এই মহাত্মাগণ নানা চেষ্টায় ঐ সাহায্য যাহাতে সরকারী প্রতীচ্য বিদ্যালয়ে দেওয়া হয় তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া থাকেন। এ অবস্থায় আমাদের সাফল্য সুদূর পরাহত জানিয়াও "উৎপৎস্যতে হস্তি মম কোঽপি সমান ধর্ম্মা" এই মহাজন বাক্য অনুসরণ করিয়া কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের মত "আয়ুর্ব্বেদ অপৌরুষেয় সুতরাং অস্মদ্বিধ পুরুষের অনালোচ্য"। তাঁহাদের চিন্তাশীলতার অভাবই এই প্রকারে 'বেড়ালের পিঠা ভেজা' দেখিয়া বৃষ্টির অনুমান করিতে শিখাইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ অপৌরুষেয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই কিন্তু বর্ত্তমান প্রচলিত গ্রন্থ কয়খানি যাহা বহু বিপ্লবের মধ্য দিয়া যাওয়ায়, নানা উত্থাপোহে এখন এক রকম "খোল নলচে বদলান সাবেক হুকার" ন্যায় দশা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাকে ও কি অপৌরুষেয় বলিতে হইবে? যাহা আয়ুর্ব্বেদ, তাহা সত্য, তাহা শাশ্বত, তাহা অপৌরুষেয়। স্বীকার করি সত্যকে কেহ সৃষ্টি করিতে পারেনা তবে মানব তাহার আবিষ্কারক মাত্র। বিদ্যুতের অমানুষী শক্তি সত্য, অপৌরুষেয় ও শাশ্বত; কিন্তু সেই শক্তি মানবের কার্য্যে ব্যবহার করার প্রথা মানবের আবিষ্কার। বিড়ঙ্গের ক্রিমিঘাতিত্ব শক্তিই আয়ুর্ব্বেদ, তাহা অপৌরুষেয়, কিন্তু ব্যবহার দ্বারা ঐ শক্তির উদ্ভাবন মানবেরই কৃতিত্ব। এইরূপ আলোচনা যতদিন আমাদের দেশে ছিল ততদিন কিছু না কিছু নূতন যোগ আয়ুর্ব্বেদে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহা ব্যতীতও বহু বিষয় আলোচনার আছে তাহা আমরা ক্রমশঃ দেখাইতেছি।

প্রতীচ্য অর্থাৎ দ্বিতীয় মতাবলম্বীদের প্রতি আমাদের বক্তব্য বেশী কিছু নাই। যদি তাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ আলোচনা করিয়া তাহাকে 'রাবিশ' বলিতেন তবে দুঃখ ছিল না। কিন্তু তাঁহারা অধিকাংশেই আয়ুর্ব্বেদ দূরাস্তাং তাহার রচনার ভাষার সঙ্গেই পরিচিত নহেন। তবে এইটুকুও মাত্র বলিতে চাই যে, ভগবান এতখানি নির্ব্বোধ ছিলেন না যে, তিনি ভারতবর্ষে মনুষ্য সৃষ্টি করিয়া তাহাদের শরীর যাত্রার প্রধান উপকরণ ঔষধ সাত সমুদ্র পার উৎপন্ন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। যে দুর্দ্দৈববশে আমরা সভ্য হইয়াও দেশান্তর জাত বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ করি, সাংসারিক খুটি নাটি জিনিষটুকু, এমন কি আহারের প্রধান উপকরণ লবণ-টুকু পর্য্যন্ত যে দুর্ভাগ্যতায় আমাদের পরের মুখের দিকে চাহিয়া সংগ্রহ করিতে হয়, সেই প্রতিকূল দৈব, সেই হতভাগ্যতাই, চিকিৎসাতেও আমাদিগকে পরমুখাপেক্ষী করিয়াছে। আমার ঘরের কোনায় সর্ব্বদোষহর, উপদ্রব বিহীন, বিরেচক হরীতকী আদি থাকিতেও আমরা 'ক্যালোমেল' খাইয়া মুখ আসা প্রভৃতি অশোধিত পারদ ভক্ষণের অশেষ দোষে শরীর জর্জ্জরিত করিতে কুণ্ঠিত হই না।

আয়ুর্ব্বেদের আলোচনা করিতে হইলে বর্ত্তমান প্রচলিত আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ সমূহের সাহায্যে চিকিৎসায় আমাদের কি কি বিষয়ের অসুবিধা হইতেছে এবং কোন্ কোন্ বিষয় কি ভাবে আলোচনা করা আবশ্যক প্রথমে তাহাই দেখা যাউক। আজকাল "চরক সংহিতা," "সুশ্রুত সংহিতা" ও তাহাকে উপজীব্য করিয়া আর দুচারখানা সংহিতা গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। প্রাচীন মহর্ষিগণ আলোচনার সুবিধার জন্য আয়ুর্ব্বেদকে আট ভাগে বিভক্ত করেন। শল্যতন্ত্র (Surgery) শালাক্যতন্ত্র (Treatise on the disease of eye, nose, moath throat &c) কায় চিকিৎসা

(Physic) ভূতবিদ্যা (a treatment of Insanity, Hysteria &c) কৌমারভৃত্য (Midwifery) অগদতন্ত্র (Toxicology) রসায়ন তন্ত্র (Treatise to prolong longivity) বাজীকরণ তন্ত্র (Prolonging the power of generating human being) । অতি প্রাচীনকালে এক এক সম্প্রদায়ে এক এক বিষয় অধ্যাপিত হইত। এবং সেই সম্প্রদায়ের লোকে স্বীয় অধীত বিষয় লইয়াই জীবন অতিবাহিত করিতেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্যক্তির আলোচিত অসমাপ্ত বিষয়গুলি পর পর সম্প্রদায়ের অন্যান্য পণ্ডিতের দ্বারা আলোচিত হওয়ায়, ক্রমশঃ সেই সেই সম্প্রদায়ে তদ্বিষয়ক জ্ঞান ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইত এবং তাহারা জগতের হিতার্থ তাহাদের আবিষ্কার বিষয়গুলি প্রকাশ করিয়া যাইতেন। এই প্রকারে তৎকালে তত্তৎ সম্প্রদায়ের যে পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থ প্রচলিত ছিল, তাহার নিদর্শন এখনও আমরা পাইয়া থাকি। এখনও আমরা ধনন্তরি প্রভৃতির শল্যতন্ত্রে, নিমি, করাল ভট্ট, শৌনক প্রভৃতির শালাক্যতন্ত্রে, পার্ব্বতক, জীবক, বন্ধক প্রভৃতির কৌমার ভৃত্যে, অগ্নিবেশ জতুকর্ণ প্রভৃতির কায়চিকিৎসায়, কশ্যপ প্রভৃতির আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ থাকা শুনিতে পাই। ক্রমে রাষ্ট্রবিপ্লবে সেই সব গ্রন্থ যখন অনালোচিত হওয়ায় নষ্ট হইয়া যাইবার উপক্রম হয়, তখন কোন পণ্ডিত কায়চিকিৎসাপ্রধান চরকসংহিতা ও শল্যতন্ত্র প্রধান সুশ্রুত সংহিতা সংকলন করেন। তাহার মধ্যে চরক সংহিতায় কায় চিকিৎসা ব্যতীত রসায়ন ও বাজীকরণ তন্ত্র সম্বন্ধে অনেকটা বলা হইয়াছে। সুশ্রুতসংহিতায় অষ্টবিধ সকল বিভাগেরই উল্লেখ আছে। এখন এক সুশ্রুতসংহিতা দেখিলেই প্রাচীন চিকিৎসা প্রণালীর ঐতিহাসিক বিবরণ কিছু কিছু ছায়া হৃদয়ঙ্গম করা যায়। বর্ত্তমানে মুদ্রিত যে সব গ্রন্থ পাওয়া যাইতেছে তাহাও বহু বিপ্লব মধ্য দিয়া আসায়, তাহাদেরও কিছু কিছু ওতপ্রোত হইয়াছে। আবার দীর্ঘকাল ব্যবহার না থাকায়, প্রাচ্য লিপিকৌশলী পণ্ডিতবর্গের স্বল্পাক্ষরে উপনিবদ্ধ সূত্রগুলিও অনেক স্থানে দুর্ব্বোধ্য বা অবোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং এই সব গ্রন্থের সাহায্যে আমাদের আয়ুর্ব্বেদ আলোচনা করিতে হইলে কতগুলি অসুবিধা হইতেছে। (১) ব্যাধিনাম নির্দ্দেশে (২) শারীর যন্ত্র পরিচয়ে (৩) ভেষজ নিরূপণে (৪) ঔষধ প্রস্তুত প্রণালীতে (৫) বিশিষ্ট ঔষধ সমূহে (৬) যন্ত্র শস্ত্রাদি পরিচয়ে ও প্রয়োগে অসুবিধাই আমরা এক্ষণে আলোচনা করিব। ১। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে চিকিৎসা বিজ্ঞানে রোগ নির্ণয়েই অসুবিধা রহিয়াছে সে বিজ্ঞানের সাহায্যে কি প্রকারে চিকিৎসা হইতে পারে। এ সম্বন্ধে আমাদের উত্তর এই যে আয়ুর্ব্বেদের চিকিৎসা প্রণালী এলোপ্যাথদের চিকিৎসা প্রণালী হইতে বিভিন্ন প্রকারের। এলোপ্যাথগণ ব্যাধিনির্ণয়ে অসমর্থ হইলে কোন প্রকারে সুচিকিৎসা করিতে সমর্থ হননা কিন্তু আয়ুর্ব্বেদে ব্যাধির নাম নির্দেশ প্রধান প্রয়োজন নহে এবং ব্যাধির নাম করণ না হইলেও চিকিৎসার কোন বাধা হয় না। এই জন্যই পৃথিবীতে এ তক যত প্রকার ব্যাধির সত্তা আবিষ্কৃত হইয়াছে বা ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত হইবে সকলেরই চিকিৎসা করিতে আয়ুর্ব্বেদ সমর্থ। চরক বলেন :—

"বিকার নামা কুশলো ন জিহ্রীয়াৎ কথঞ্চন।
ন হি সর্ব্ব বিকারাণাং নামতো ইস্তি ধ্রুবা স্থিতিঃ।
স এব কুপিতো দোষঃ সমুত্থান বিশেষতঃ।
স্থানান্তর গতশ্চাপি বিকারান্ কুরুতে বহুন্।
তস্মাদ্বিকার প্রকৃতী রধিষ্ঠা না স্তরানিচ।
সমুত্থান বিশেষাংশ্চ বুদ্ধা কর্ম্ম সমাচরেৎ। চং সূং ১৮ অং"

অর্থাৎ ব্যাধির নাম নির্দ্দেশে অসমর্থ ব্যক্তির লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই যেহেতু সর্ব্ব প্রকার ব্যাধিরই যে একটা নাম থাকিতে হইবে তাহা ঠিক নহে। একই দোষ, প্রকোপের কারণভেদে, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নানা প্রকার ব্যাধির সৃষ্টি করিয়া থাকে। অতএব ব্যাধির প্রকৃতি, দোষের আক্রমণের স্থান ভেদ, ও দোষের প্রকোপের কারণাদিভেদ, বিবেচনা করিয়া-চিকিৎসা করিতে হইবে। এই হিসাব আয়ুর্ব্বেদ অনেকটা হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসার অনুরূপ। তাহারা একই ব্যাধিতে দোষভেদে শীত, উষ্ণ স্নিগ্ধ রুক্ষ প্রভৃতি বিপরীত ক্রিয়া করিয়া থাকেন। সুতরাং সামান্য চিকিৎসায় বিশেষ অসুবিধা না হইলেও চিকিৎসা বৈশিষ্ট্যে ব্যাধির প্রকৃতি জ্ঞান বিশেষ আবশ্যক। ব্যাধিটা আমাশয় গত কি উরোগত তাহা নির্ণয় করিতে না পারিলে অনেক সময় চিকিৎসা বিভ্রাট ঘটিতে পারে। কারণ আমাশয় গত ব্যাধির প্রথম লঙ্ঘনই ব্যবস্থা কিন্তু উরোগত ব্যাধির তাহাতে বিশেষ অনিষ্ট হইয়া থাকে। আমরা ব্যাধি নির্ণয়ে সংশয়ের বিষয়ীভূত কতগুলি বিষয়ের উল্লেখ করিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র সরস্বতী।
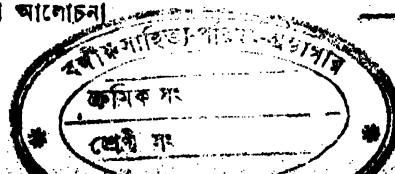
প্রতিভা

১০ বর্ষ } চৈত্র, ১৩২৭ { ১২শ সংখ্যা

মনসা-দেবীর ইতিবৃত্ত।

আস্তিকস্য মুনের্মাতা ভগিনী বাসুকেস্তথা।
জরৎকারুমুনেঃ পত্নী মনসা-দেবী নমোঽস্তুতে ॥

মনসা দেবীর পূর্ণ পরিচয় উপরে উদ্ধৃত দেবীর সর্ব্বজন—বিদিত প্রণামমন্ত্রেই আছে। তিনি আস্তিক মুনির মাতা, জরৎকারু মুনির পত্নী এবং বাসুকীর ভগিনী। ইহার অপেক্ষা বিশদ পরিচয় আর কি আশা করা যাইতে পারে? কিন্তু মহাভারত খুলিয়া যখন দেখা যায় যে, জরুৎকারু মুনির পত্নী, বাসুকীর ভগিনী এবং আস্তিকের মাতার নাম জরৎকারু, 'মনসা' নামের "নামগন্ধ" ও মহাভারতে নাই, তখনি অনুসন্ধিৎসুর মনে বিষম খটকা লাগিয়া যায়! মনসা ও জরৎকারু কি করিয়া এক হইয়া গেল তাহার অনুসন্ধান করিতে করিতে আমরা অনেক বিচিত্র তথ্যের সন্ধান পাইয়াছি; কিন্তু এই পথে পাঠকগণকে লইয়া রওনা হইবার পূর্ব্বে মহাভারতের আস্তিক মুনির কাহিনীটা একবার আওড়াইয়া লওয়া আবশ্যক।

মহাভারত খুলিয়াই দেখা যায়, এক এলোমেলো ব্যাপার। এক আস্তিকের কাহিনীই আদিপর্ব্বে তিনবার বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমে ১৩শ হইতে ১৬শ অধ্যায়ে। দ্বিতীয় দফা ৩৮শ হইতে ৪০শ অধ্যায়ে এবং শেষ ৪৫শ হইতে ৪৮শ অধ্যায়ে। এত কাছাকাছি একই পর্ব্বে একই কাহিনী তিনবার থাকাটা সকলের নিকটই একটু বিচিত্র বোধ হইবে। যাহা হউক, মহাভারতের পাঠনির্ণয় বা গঠনপর্য্যায় বর্ত্তমানে আমাদের আলোচ্য নহে। আস্তিক কহিনীর মূল সূত্রটি অনুসরণ করা যাক্।

প্রজাপতি কশ্যপের দুই স্ত্রী, কদ্রু ও বিনতা। কদ্রু হইতে সর্পগণ উৎপন্ন হয়। বিনতা অরুণ ও গরুড়ের জন্মদান করেন। পুত্রদের অবাধ্যতায় ক্রুদ্ধ হইয়া কদ্রু তাহাদিগকে এই বলিয়া অভিশপ্ত করেন যে, তাঁহারা মহারাজ জন্মেজয়ের সর্প-যজ্ঞে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। মাতার নিকট এই অভিশাপ লাভ করিয়া সর্পগণ মন্ত্রণা করিতে বসিল। ইলাপত্র নামক এক নাগপ্রধান বলিলেন যে, তিনি দৈবক্রমে অবগত হইয়াছেন যে, জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞে আস্তিক নামক এক মুনি আবির্ভূত হইয়া সর্পগণকে সর্ব্বনাশ হইতে রক্ষা করিবেন

তাহাদের যে জরৎকারু নাম্নী এক ভগিনী আছে, আস্তিক মুনি এই জরৎকারুর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন। এই জরৎ-কারুকে জরৎকারু নামক এক মুনিই বিবাহ করিবেন। নাগরাজ বাসুকীকে ইলাপত্র অনুরোধ করিলেন যে, জরৎকারু মুনির আগমন অপেক্ষা করিয়া যেন এই ভগিনীকে সযত্নে পরিরক্ষণ করা হয়।

জরৎকারু মুনি এক ভবঘুরে ব্রহ্মণ গোত্রের অন্তর্গত ছিলেন। ইহারা 'যেখানে সন্ধ্যা সেখানেই আবাস' এই রীতি অবলম্বন করিয়া তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইত। বিবাহ ও বংশরক্ষা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে প্রত্যেক গৃহস্থেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। জরৎকারু মুনি কিন্তু এদিকে কোন দিনই মনোযোগ দেন নাই। তাঁহার নিরপত্যতা হেতু পূর্ব্বপুরুষগণ স্বর্গভ্রষ্ট হইতেছেন। একদিন এবম্প্রকার এক দৃশ্য দেখিয়া তিনি বিবাহ ও বংশরক্ষার জন্য উৎসুক হইলেন। কিন্তু বেজায় কড়া মেজাজের ভবঘুরে মুনি কিনা, তিনি ঠিক করিলেন যে, সহধর্ম্মিণী সমনাম্নী না হইলে তিনি বিবাহ করিবেন না। শুধু সমনাম্নীই নহে, স্ত্রীটি আবার এমন হওয়া চাই যে, কথায় বা কার্য্যে কখনও যেন তাঁহার কিছুমাত্র অসন্তোষ উৎপাদন না করে। করিবা মাত্র তাহাকে তিনি পরিত্যাগ করিবেন। সহধর্ম্মিণীটির ভরণপোষণের জন্যও তিনি দায়ী থাকিবেন না, কন্যার পিতৃকুল সে ভার গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিবেন। একেবারে কুলিয়া মেলের নৈকুষ্য কুলীন সন্তান আর কি!

আজকালের দিন হইলে জরৎকারু ঠাকুরের পাত্রী মেলা ভার হইত। কিন্তু বাসুকীতো নাগকুল রক্ষার্থে তাঁহার ভগিনী জরৎকারুকে লইয়া তৈয়ার হইয়াই ছিলেন। বাসুকীর চরগণ গিয়া তাঁহাকে জরৎকারু মুনির আবির্ভাব এবং বিবাহাকাঙ্ক্ষা বিষয় অবগত করাইবামাত্র তিনি ভগিনী লইয়া হাজির হইলেন এবং মুনিকে সম্প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। জরৎকারু যখন জানিতে পারিলেন যে, কন্যা তাহার সনাম্নী এবং কন্যাপক্ষ তাঁহার সমস্ত সর্ত্তেই স্বীকৃত আছেন, তখন অবশ্য বিবাহ করিতে তাঁহার কোন আপত্তিই রহিল না।

কিছুদিন আনন্দে ও নিরুপদ্রবেই কাটিল। জরৎকারু প্রাণপণে পতির সেবা শুশ্রূষা করেন, মুনিও রাজভোগ খান দান ঘুমান। ক্রমে জরৎকারু গর্ভবতী হইলেন। এমন সময় একদিন এক বিপত্তি সংঘটিত হইল। সন্ধ্যা বহিয়া যায় এবং উপাসনা ও সন্ধ্যা বন্দনার সময় অতিক্রান্ত হইয়া যায় দেখিয়া নাগভগিনী স্বামীকে ঘুম হইতে ডাকিয়া উঠাইলেন। কি, এতবড় আস্পর্দ্ধা! সহধর্ম্মিণী হইয়া পতিদেবতার নিদ্রায় ব্যাঘাত! মুনিতো রাগিয়া আগুন। তখনই তিনি পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া বনে চলিলেন। নাগভগিনীর কাতর ক্রন্দনে তাঁহার পাষাণ হৃদয় গলিল না। গর্ভে সন্তান আছে কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি সংক্ষেপে মাত্র বলিলেন 'অস্তি'। তাই সন্তানের নাম হইল 'আস্তিক'। মুনি বনে চলিয়া গেলেন। জরৎকারুর সুখের হাট ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহার সন্তান আস্তিক মুনি জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞে নাগগণের প্রাণ ভিক্ষা করিয়া নাগগণকে আমূল ধ্বংস হইতে রক্ষা করিলেন।

এই তো গেল আস্তিক মুনির কাহিনী। নাগগণ যে সাপ নহে, মনুষ্য জাতিরই এক শাখা, ইহা বোধ হয় বিশেষ করিয়া না বলিলেও চলে। মহাভারতখানা পড়িলে বুঝা যায় যে, এই জাতি ক্ষমতা ও সম্পদে বড় নগণ্য ছিল না। ভারতে আর্য্য উপনিবেশ স্থাপনকালে পদে পদে আর্য্যগণের এই নাগজাতির সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। জন্মেজয়ের সর্প যজ্ঞের সরল ব্যাখ্যা এই যে, মহারাজ জন্মেজয়ের রাজত্বকালে এই নাগগণকে একেবারে নির্ম্মূল করিবার জন্য একটা বিশেষ রকম চেষ্টা হইয়াছিল। ফলে উত্তরাপথের অধিকার আর্য্যগণকে ছাড়িয়া দিয়া নাগগণ ভারতবর্ষের প্রত্যন্ত প্রদেশ সমূহে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। আসামের নাগপর্ব্বত, মণিপুর রাজ্য, গঙ্গার মুখের উপদ্বীপ সমূহ, কাশ্মীর, দাক্ষিণাত্য নাগগণের প্রধান আশ্রয় স্থান হইয়া উঠে।

নাগ জাতিকে যে আর্য্যগণ চক্ষে দেখিতে পারিতেন না, মহাভারতের বহুস্থানে তাহার পরিচয় আছে। নাগবংশের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ পর্য্যন্ত আর্য্যগণের নিকট যথোচিত সম্মান প্রাপ্ত হইতেন না। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ষষ্ঠ পঞ্চিকার ২৬শ

অধ্যায়ের প্রথম ভাগে ইহার একটি উদাহরণ আছে। কদ্রুর পুত্র অর্ব্বুদ নামে এক সর্পঋষি ছিলেন। তিনি বৈদিক যজ্ঞের একটি অসম্পূর্ণ অঙ্গের ত্রুটী সংশোধন করিয়াছিলেন। তিনি যে পথে যাতায়াত করিতেন, সে পথ 'অর্ব্বুদোপসর্পণী' নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। কিন্তু এত খ্যাতি সত্ত্বেও চোখ না বাঁধিয়া তাহাকে যজ্ঞ স্থানে নেওয়া হইত না। পাছে তাঁহার বিষদৃষ্টিতে আর্য্যদের পবিত্র সোম নষ্ট হইয়া যায়! এই স্থানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক নহে যে, মহাভারতেও অর্ব্বুদ নামে এক নাগের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি মগধের অধিবাসী ছিলেন। আরও একটি বিষয় এখানে লক্ষ্যের যোগ্য এই যে, অতিপ্রাচীন ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও অর্ব্বুদকে কদ্রুর পুত্র বলিয়া পরিচিত করান হইয়াছে। মহাভারতের কদ্রু হইতে নাগগণের জন্ম কাহিনীর মূল যে কত প্রাচীন, ইহা তাহারই সাক্ষ্য প্রদান করে।

এখন মূল বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক। মহাভারতের আস্তিক-কাহিনীতে জরৎকারুর দেবাদের কোন উল্লেখই নাই। তিনি যে নাগগণের দেবী, নাগমাতা, সর্পরাজ্ঞী, মহাজ্ঞানশালিনী বা বিষহরী, এমন কোন কথাই উহাতে নাই। তাঁহার মনসা নাম যে মহাভারতে নাই, পূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। নাগমাতা বলিতে মহাভারতে সর্ব্বদাই কদ্রুকে বুঝাইয়াছে *। ব্রাহ্মণ সমূহে সর্পরাজ্ঞী শব্দটি আছে (ঐতরেয় ৫।২।৪।৪, শতপথ ১।৪ ২৯) ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৮৯ সংখ্যক ঋকের মন্ত্রদ্রষ্ট্রীর নাম সর্পরাজ্ঞী। সায়ন বলেন এই সর্পরাজ্ঞী পৃথিবী। তিনিই সর্পণ বা গমনের রাজ্ঞী। তিনি এক দেবীরূপ ধারণ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন এবং উক্ত ঋক্ দর্শন করিয়াছিলেন। আর একটি টীকাকার মহীধর আরও একটু আগাইয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, সর্পরাজ্ঞী পৃথিব্যাভিমানী কদ্রু †।

এখন শব্দকল্পদ্রুম খুলিয়া দেখুন, অভিধানকার জটাধর মনসা শব্দের পর্য্যায়ে প্রথমেই দিয়াছেন কদ্রুর নাম!

এই সকল প্রমাণ হইতে সর্পের দেবী, সর্পমাতা বা সর্পরাজ্ঞী শব্দগুলি দ্বারা প্রথম যে কদ্রুকে বুঝাইত, জরৎকারুকে নহে, ইহা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে। সর্পদেবীর মনসা নাম এবং নাগভগিনী জরৎকারুর সহিত তাহার অভিন্নত্ব সংস্থাপন পরবর্ত্তী কালের ঘটনা।

মনসা দেবীকে লইয়া পুরাণকারগণ মহা বিপদে পড়িয়াছিলেন। প্রথম সমস্যা, নামটি কোথা হইতে আসিল, তাহার কিছুই ঠিক নাই। প্রাচীন সাহিত্যে এই নাম নাই, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পাণিনিতে এই নাম নাই। অমরকোষে পর্য্যায় নাই! মধ্য যুগের কোন ও পুরাণকারগণের সময়ে নামটি এবং সম্ভবতঃ পূজা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে; অর্থাৎ মনসা দেবী জোর করিয়া আর্য্য সমাজে ঢুকিয়া পড়িয়াছেন এবং নিত্যপরিচিত হইয়া পড়িয়াছেন। তখন 'ইষ্টং পিনষ্টি ইতি ইষ্টপিষ্টং', ইত্যাকার প্রণালীতে তাঁহাকে সব্যাখ্যা পুরাণ শাস্ত্রাদিতে সসম্মানে গ্রহণ করিয়া ফেলা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। তাই তাঁহারা ব্যাখ্যা করিলেন, মনসা নাম অলুক সমাসে সিদ্ধ "মনসা সৃষ্টা দেবী কশ্যপেন ইতি মনসা দেবীঃ"। অলুক সমাসে তৃতীয়ান্ত পদের লোপ হইল না, তাই শব্দটি হইল মনসাদেবী। এই অর্থের বিশদ ব্যাখ্যা পাই প্রথম ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে। পুরাণকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

> কন্যা সা চ ভগবতী কশ্যপস্য চ মানসী।
> তেনেয়ং মনসাদেবী মনসা যা চ দীব্যতি ॥
> মনসা ধ্যায়তে যা বা পরমাত্মানমীশ্বরী।
> তেন সা মনসা দেবী যোগেন তেন দীব্যতি ॥

লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, এই চারিছত্রে মনসা নামের তিন রকম ব্যাখ্যা রহিয়াছে। (১) কশ্যপের মন দ্বারা সৃষ্ট, তাই তিনি মনসা। (২) মন দ্বারা তিনি দীপ্তি পান, তাই তিনি মনসা। (৩) মনদ্বারা তিনি পরমাত্মার ধ্যান করেন, তাই তিনি মনসা।

* এক উপাখ্যানে নাগমাতার নাম সুরসা, কিন্তু তাহার এই আস্তিক কাহিনীর নাগমাতার সহিত কোন সম্পর্কই নাই ॥

† পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী অনূদিত এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত শতপথ ব্রাহ্মণ, দ্বিতীয় খণ্ড। পৃষ্ঠা ২৮-২৯।

—শেষ দুইটা অর্থে খুঁত ধরিবার কিছুই নাই, কারণ অর্থ দুইটা ইংরাজীতে যাকে বলে Colourless। কিন্তু মনসা কশ্যপের মানস সৃষ্টি এই অর্থে গোলমাল রহিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। মানসসৃষ্টিতে যতদূর জানি, মাতার আবশ্যকতা থাকে না। কিন্তু মহাভারতে দেখা যায় যে, সমস্ত নাগগণই কদ্রু হইতে প্রসূত হইয়াছিল। নাগ ভগিনী মনসাও কদ্রুগর্ভজাতা, অন্যবিধ কোন সুস্পষ্ট উক্তির অভাবে তাহাই ধরিয়া নিতে হইবে। কাজেই মনসা কশ্যপের মানসী, এই অর্থ খুব সুসঙ্গত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, প্রথম সমস্যার সমাধান নামনিরুক্তিনির্ণয়ে অনেক গলদ রহিয়া গিয়াছে।

তাহার পরে দেবীর ব্যক্তিত্ব নির্ণয়। ব্রাহ্মণ্য দেবসমাজ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর শাসিত। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রায় সকল দেব দেবীকেই এই তিন দেবতার একজন না এক জনের কোঠায় ফেলিয়া দেওয়া যায়। মনসা দেবী কোন কোঠায় পড়িবেন, তাহার সমাধান করিতে পুরাণকারগণ বেশ বিপদে পড়িয়াছিলেন তাহার প্রমাণ যথেষ্ট সংগ্রহ করা যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের উপাখ্যান, দেশ প্রচলিত মনসার ভাসান এবং মনসার ধ্যান গুলি আলোচনা করিলেই পুরাণকারগণের বিভিন্ন রকমের সমাধানের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

মনসা দেবীর প্রচলিত ধ্যানটি এই :—

ওঁ দেবীমম্বামহীনাং শশধরবদনাং চারুকান্তিং বদান্যাং
হংসারূঢ়ামুদারামরুণিতবসনাং সর্ব্বদাং সর্ব্বদৈব।
স্মেরাস্যাং মণ্ডিতাঙ্গীং কনকমণিগণৈর্নাগরত্নৈরনেকৈ
র্বন্দেহহং সাষ্টনাগামুরুকুচযুগলাং যোগিনীং কামরূপাম্॥

এই ধ্যানে প্রধান লক্ষ্যের যোগ্য বিষয় এই যে, দেবীকে হংসারূঢ়া বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। হিন্দুমাত্রেই জানেন যে,হংস ব্রহ্মা ও ব্রহ্মাণী বা সরস্বতীর বাহন। হংসারূঢ়া দেবী বলিলেই বুঝিতে হইবে যে,এই দেবী ব্রহ্মাণীর কোন না কোন প্রকারভেদ। কাজেই এই ধ্যানে দেবী ব্রহ্মাণী বা ব্রহ্মাণী-কল্পা বলিয়া পরিকল্পিতা। এই কল্পনা শুধু এই ধ্যানেই নহে, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ধন্বন্তরিকৃত মনসাস্তবে উল্লিখিত আছে ;—

সর্ব্বাভয়প্রদাং দেবীং ভক্তানুগ্রহকাতরাং।
সর্ব্ববিদ্যাপ্রদাং শান্তাং সর্ব্ববিদ্যাবিশারদাং॥

এই সর্ব্ববিদ্যাপ্রদা এবং সর্ব্ববিদ্যাবিশারদা বিশেষণ দুইটি বিশেষ করিয়া সরস্বতী দেবীকেই কি স্মরণ করাইয়া দেয় না? মনসার অবিকল সরস্বতী দেবীর মত মূর্ত্তিও আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা পরে বর্ণিত হইবে।

দেবীকে শিবের কোঠায় ফেলিবার উদ্যমই সকলের অপেক্ষা বেশী হইয়াছিল। মনসার ভাসানেও সর্ব্বত্রই দেবী শিব-দুহিতা বলিয়া পরিচিতা। ধন্বন্তরিকৃত উক্ত স্তবেই আছে।

নমঃ কশ্যপকন্যায়ৈ বরদায়ৈ নমো নমঃ।
নমঃ শঙ্করকন্যায়ৈ শঙ্করায়ৈ নমো নমঃ॥

কশ্যপকন্যা বলিয়া পর মুহূর্ত্তেই দেবীকে শঙ্করকন্যা বলা হইয়াছে। মনসার ভাসানে কশ্যপের নামগন্ধও নাই,তাহাতে দেবী শঙ্করকন্যা বলিয়াই পরিচিতা। ব্রহ্মবৈবর্ত্তের প্রকৃতি খণ্ডের ৪৬শ অধ্যায়ে আছে।

শিবশিষ্যা চ সা দেবী তেন শৈবীতি কীর্ত্তিতা।

এই স্থানেই মনসার দ্বাদশ নাম আছে। যথা—জরৎকারু জগদ্গৌরী, মনসা, সিদ্ধযোগিনী, বৈষ্ণবী, নাগভগিনী, শৈবী, নাগেশ্বরী, জরৎকারুপ্রিয়া, আস্তিকমাতা, বিষহরী, মহাজ্ঞানযুতা, বিশ্বপূজিতা।

লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, পুরাণকার কশ্যপ হইতে মনসার উৎপত্তির কাহিনীও ফেলিতে পারেন নাই, কিন্তু মনসাকে শৈবী বলিয়া পরিচিত করিবার ঝোঁকটাও তাঁহার কত বেশী। শঙ্কর কন্যা বলিয়াই আবার ব্যাখ্যা করিতেছেন, শঙ্করশিষ্যা, তাই শঙ্কর কন্যা বলায় কোন দোষ নাই।

মনসার ভাসান গুলি খাঁটি বাঙ্গালা দেশের সম্পত্তি মনসাপূজাও যেমন, ভাসান গুলিও তেমনি, বাঙ্গালা দেশেই গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। ভাসানকারগণ আর দোমন দোআঁশা রাখেন নাই। তাঁহারা কশ্যপের নামও লন নাই। তাঁহারা পরিষ্কার লিখিয়াছেন, শঙ্করবীর্য্য একদিন

পদ্মপত্রে ত্যক্ত হইয়াছিল। তাহা পদ্মানল ভেদ করিয়া নাগলোকে যাইয়া উপস্থিত হইল। নাগরাজ বাসুকী তাহা দেখিয়া কারিগর লাগাইয়া তাহা হইতে এক অপরূপ দেবীমূর্ত্তি গড়িয়া তুলিলেন এবং তাঁহাকে ভগ্নীসমান যত্নে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। ইহার পরে মহাভারতের কাহিনীর সহিত অনেকটা মিল আছে। পদ্মবনে জন্ম বলিয়া দেবীর নাম হইল পদ্মা এবং মনসার ভাসানের নাম তাই পদ্মা পুরাণ। লক্ষ্য করিবেন যে, এমন কি ব্রহ্মবৈবর্ত্তের দ্বাদশ নামের মধ্যেও দেবীর ভাসানপ্রচলিত পদ্মা নামটি নাই।

মনসাকে ব্রহ্মাণী ও শৈবী করিবার চেষ্টার পরিচয় আমরা দেখিলাম। তাঁহাকে বৈষ্ণবী বলিয়া পরিচিত করিবার চেষ্টাও হইয়াছিল। উপরে উদ্ধৃত মনসার দ্বাদশ নামের মধ্যে বৈষ্ণবী নামটিও আছে। তিনি বৈষ্ণবী হইলেন কেন? ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে তাহারও ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। তিনি কশ্যপের মানস কন্যা বটেন, কিন্তু শিবের শিষ্যা। শিবের নিকট হইতে মহাজ্ঞান (সর্পরাজ্ঞীর ব্রহ্মজ্ঞান লাভের কথা স্মরণ করুন) লাভ করিয়া কৃষ্ণের আরাধনা করিতে শিব কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি পুষ্করে গিয়া কৃষ্ণের আরাধনা করিয়া কৃষ্ণের অনুগ্রহ লাভ করেন এবং কৃষ্ণকর্ত্তৃক পূজিতা হন। তাই তিনি বৈষ্ণবী।

ভাসানের উপাখ্যানটী আপনারা সকলেই বোধ হয় অবগত আছেন। শৈব চন্দ্রসওদাগরের নিকট হইতে পূজা আদায় করিতে দেবীর দারুণ চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। এত চেষ্টা কেন? না, চন্দ্রসওদাগর দেবীকে পূজা না করিলে দেবীর পূজা পৃথিবীতে প্রচারিত হয় না তাই। চন্দ্রের স্ত্রী সনকা কিন্তু পাড়া প্রতিবেশীদিগের নিকট হইতে পূর্ব্বেই মনসা পূজা শিখিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু চন্দ্র মনসার ঘট ফেলিয়া দিতেন, সর্ব্বদা এমন ভীমদর্শন হিন্তালের লাঠি লইয়া ঘুরিতেন যে, তাহার ধার দিয়া যাইতেও মনসার ভরসা হইত না।

এখন পাঠকগণের নিকট কয়েকটি 'ইষু' ধার্য্য করা যাইতেছে।

১। মহাভারতে দেখা যায়, আর্য্যতাড়িত নাগগণ গঙ্গার মুখের জলাময় বদ্বীপ সমূহে এবং নাগপর্ব্বত, মণিপুর ইত্যাদি প্রত্যন্ত প্রদেশে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। ধ্রুব

২। সর্প নাগজাতির totem। মণিপুররাজ অভিষেকের পূর্ব্বে এখনও পাখঙব নামক পূর্ব্বপুরুষের প্রতিনিধিরূপে পূজিত নাগরাজের মন্দিরে যাইয়া তাহাকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন।*

৩। মনসা পূজা বাঙ্গালা দেশের নিজস্ব পূজা। মনসা-ভাসান সাহিত্যও বাঙ্গালা দেশের নিজস্ব।

৪। ভাসানের গল্পটি হইতে দেখা যায়, মনসা প্রথমে বাঙ্গালার আর্য্যসমাজে পূজা পাইতেন না। ইতর জনসমূহ এবং স্ত্রীলোকগণ প্রথমে তাহার পূজার পক্ষপাতী হন, এবং অনেক চেষ্টার পরে মনসা আর্য্য দেবসমাজে স্থান লাভ করেন।

৫। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে মনসার উল্লেখ নাই। মধ্যযুগের সাহিত্যে আছে, তাহাদের মধ্যে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণেই বিশদরূপে আছে। কিন্তু মনসার ব্যুৎপত্তি ও ব্যক্তিত্ব নির্ণয়ে নানা অসঙ্গতি বিদ্যমান।

এই সকল ইষু হইতে সুসঙ্গত সিদ্ধান্ত বোধ হয় এই যে, গঙ্গাপ্রবাহান্তরে উপনিবিষ্ট নাগ জাতির এক উপাস্যা দেবী ছিলেন, খুব সম্ভবতঃ তাঁহার নাম ছিল মনসা। বঙ্গদেশে যখন আর্য্যগণের বিস্তার ঘটিল, তখন এই নাগদেবী ক্রমশঃ আর্য্য সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি যখন এতটা প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেলেন যে, তাঁহাকে আর গ্রাহ্য না করিলে চলে না, তখন শাস্ত্রকারগণ তাঁহার নামের ব্যাকরণসম্মত এবং পুরাণসম্মত ব্যাখ্যা বাহির করিলেন। প্রথমে নাগমাতা কদ্রুর সহিত তাঁহার অভিন্নত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছিল। কিন্তু পরিশেষে তিনি নাগভগিনী জরৎকারুর সহিত অভিন্ন বলিয়া প্রতিপাদিত হন। কিন্তু জোড়াতাড়ার চিহ্নগুলি এখনও লুপ্ত হয় নাই। তিনি কখনও

---

* Vide—"The Naga Tribes of Manipur" and "The Meitheis" by Hodgson.

ব্রহ্মাণী, কখনও বৈষ্ণবী, কখনও বা শৈবী বলিয়া পরিচিত হইতেন। ক্রমশঃ শেষপরিচয়টাই প্রবল হইয়া উঠে। বেদ ব্রহ্মণোক্ত সর্পরাজ্ঞীর মত তিনি ব্রহ্মজ্ঞান বা মহাজ্ঞানশালিনী বলিয়া ঘোষিত হন। তিনি কেন যে ব্রহ্মাণী বা সরস্বতীর সহিত অভিন্ন প্রতিপাদিত হইয়াছিলেন অথর্ব্ব বেদে তাহারও একটি সূত্র খুঁজিয়া পাইয়াছি।

অথর্ব বেদে (১০—৪—১৪) একটি কিরাতবালার উল্লেখ দেখিতে পাই। এই কিরাতবালা বিষহরী। অর্থাৎ ইনি সর্প বিষের প্রতিষেধক ঔষধ জানেন। সুবর্ণ খুন্তী দ্বারা ইনি পর্ব্বতের সানুদেশ হইতে এই ঔষধ খুঁড়িয়া বাহির করেন। অথর্ব্ব বেদে ১০—৪—২৪ তে এই বালিকাকেই বোধ হইতেছে কাউড়ী বা ঘৃতাচী বলা হইয়াছে। ঘৃতাচী সরস্বতীর আর এক নাম। পুরাণকারগণ বোধ হয় মনসার শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা খুঁজিবার সময় এই বিষহরী কিরাত বালিকার সন্ধান পাইয়া ইহাকে বিষহরী মনসার সহিত অভিন্ন কল্পনা করিয়াছিলেন। কিরাত বালিকা ও ঘৃতাচী এক। ঘৃতাচী সরস্বতী। তাই মনসাও সরস্বতী।

মনসা পূজা এখনও প্রত্যেক হিন্দু পরিবারে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বহু কবি মনসার গান রচনা করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেব ৪৩০ বছর আগেকার লোক। তাঁহার সময়েও মনসা পূজার বিশেষ ধুমধাম ছিল। যথা, চৈতন্য ভাগবতকারের সেই পরিচিত উক্তি,—

> মঙ্গল চণ্ডীর গীতে করে জাগরণ।
> দম্ভ করি বিষহরী পূজে কোনজন॥

ভাসান গানের দুইজন কবিই এই অঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধ। ময়মনসিংহের নারায়ণ দেব * এবং বরিশাল ফুল্লশ্রী গৈলার বিজয় গুপ্ত। বিজয় গুপ্তের পুথির প্রারম্ভে তিনি কয়েকটি কথা লিপি বদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, মনসা পূজার ইতিহাসের পক্ষে কথা কয়টি অতি প্রয়োজনীয়। কথা কয়টি এই :—

> মুর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।
> প্রথমে রচিল গীত কাণা হরিদত্ত॥
> হরিদত্তের যত গীত লুপ্ত হইল কালে।
> যোড়া গাঁথা নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে॥
> কথার সঙ্গতি নাই নাহিক সুস্বর।
> এক গাইতে আর গায় নাহি মিত্রাক্ষর॥
> গীতে মতি না দেয় কেহ মিছা লাফফাল।
> দেখিয়া শুনিয়া মোর উপজে বেতাল॥

এই পদগুলি হইতে দেখা যায় যে মনসা গানের আদি রচয়িতা কাণা হরিদত্ত। তিনি মূর্খ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, বোধ হয় বিশেষ লেখা পড়া জানিতেন না। বিজয় গুপ্ত খৃষ্টাব্দের ১৫শ শতকের লোক। বিজয় গুপ্তের ভাসানের মুদ্রিত পুথিতে হরিদত্তের সঙ্গীতভাঙ্গা একটি সঙ্গীত স্থান পাইয়াছে। যদিও বিজয়গুপ্তের সময়ে হরিদত্তের গীত লুপ্ত প্রায় হইয়াছে, তবুও বিজয় গুপ্তের পুথিতে হরিদত্তের একটি পদ পাওয়াতে মনে হয় যে, লোকে তখনও হরিদত্তের দুই একটি পদ মনে করিয়া বলিতে পারিত। শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত রায় সাহেব দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় তাই অনুমান করেন যে হরিদত্ত বিজয় গুপ্তের ২৫০।৩০০ বৎসর পূর্ব্বেকার লোক হইবেন। ইহা সুসঙ্গত অনুমান। ভাসানের আদি কবি হরিদত্ত বোধ হয় খৃষ্টাব্দের একাদশ দ্বাদশ শতকেই প্রথম ভাসান গান রচনা করিয়াছিলেন। 'মূর্খ' হরিদত্তের গানের জনপ্রিয়তার পর পণ্ডিত ব্যক্তিগণ তাহার পদানুসরণ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই।

কোন নবোদিত পূজা পদ্ধতি, দেবীর মাহাত্ম্যসূচক গল্প ইত্যাদি দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেই পরে গীতরচয়িতাগণ

* ঢাকা সাহিত্য পরিষদের সভ্য শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র চন্দ্র গুহ বি এ, বি টি মহোদয় নারায়ণ দেবের পুথির চারি পাঁচখানি হস্তলিপি মিলাইয়া একটি আদর্শ পুথি তৈয়ার করিয়া ঢাকা পরিষদে উপহার দিয়া গিয়াছেন॥ নারায়ণ দেবের পুথি ময়মনসিংহ হইতেও ছাপা হইয়াছিল, তাহা আমার নিকট আছে। মুদ্রিত পুথি এবং উপেন্দ্র বাবু কর্ত্তৃক প্রস্তুত আদর্শ পুথি, এই দুই পুথি মিলাইয়া ঢাকা পরিষদ যদি নারায়ণ দেবের ভাসানের একখানা আদর্শ পুথি প্রকাশিত করেন, তবে শ্রেয় হয়।

অগ্রসর হইয়া দেবীর মাহাত্ম্যসূচক পালা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। কাজেই দেবীর পূজার প্রথম প্রচারে এবং তাঁহার মাহাত্ম্য বিস্তারের জন্য গীতের পালা রচয়িতাগণের আবির্ভাবের মধ্যে ১৫০।২০০ বৎসরের ব্যবধান থাকা সম্ভবপর। এই হিসাবে খৃষ্টের নবম দশম শতাব্দে মনসা দেবীর পূজা বাঙ্গলায় প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া ধরিতে হইবে। অবশ্য এগুলি সমস্তই অনুমানের হিসাব, কমও হইতে পারে, বেশীও হইতে পারে। তবে দুইটি প্রমাণে এই অনুমান সত্যের কাছাকাছি পৌঁছিয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে।

মনসামঙ্গলের গল্পটি সব কবির পালায়ই এক! শিবভক্ত সওদাগররাজ চন্দ্র 'চ্যাঙমুড়ী' কানী পদ্মাবতীর পূজা করিবেন না, মনসা দেবীও তাঁহাকে পূজা না করাইয়া ছাড়িবেন না, কারণ চন্দ্র পূজা না করিলে তাঁহার পূজা দেশময় প্রচারিত হয় না। প্রতিবেশীদের নিকট শিখিয়া চন্দ্রের স্ত্রী সনকা মনসা দেবীর ঘট স্থাপন করিয়া পূজা আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু চন্দ্রকে নোয়াইতে দেবীর অনেকখানি ষড়যন্ত্র করিতে হইয়াছিল। অবশেষে পুত্রবধূ বেহুলার অনুনয়ে চন্দ্র অনিচ্ছায় বাম হাতে মনসা দেবীর পূজা করিলেন।

এই চন্দ্র কে? ইনি সওদাগর এবং রাজা। বিক্রমপুর চন্দ্রবংশের কথা মনে পড়ে না কি? বাখরগঞ্জ অঞ্চলকে পূর্বে চন্দ্রদ্বীপ বলিত, এখনও বলে। বিক্রমপুর রাজ শ্রীচন্দ্র দেবের রামপাল তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারি, শ্রীচন্দ্রের পূর্বপুরুষগণ চন্দ্রদ্বীপেই প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। শ্রীচন্দ্রদেবের সময় মোটামুটি ৯৭৫—১০০০খৃষ্টাব্দ বলিয়া প্রায় সঠিকরূপে নির্দ্দেশ করা যায়। বিজয় গুপ্ত প্রাচীন চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত ভূভাগে বসিয়াই কবিতা লিখিয়াছেন, তাহার আশেপাশেই চান্দাইর বিল, উজানী ইত্যাদি বর্ত্তমান আছে। উজানীতে এখনও এক জমিদার বংশ আছে, তাহাদিগকে বহু প্রাচীন কাল হইতেই লোকে উজানীর রাজা বলে। উজানী হইতে কিছুদিন হইল এক অতি সুন্দর বুদ্ধমূর্ত্তি ও একখানা মারীচী মূর্ত্তি ঢাকা মিউজিয়মে সংগৃহীত হইয়াছে।

এই সকল দেখিয়া এই মনে হয় না কি যে, ভাসানের চন্দ্র সওদাগরের গল্পে যদি কিছু সত্য থাকে তবে খুব সম্ভবতঃ এই চন্দ্র পূর্ববঙ্গে যে চন্দ্র উপাধধারী বংশ রাজত্ব করিয়া গিয়াছে, সেই বংশেরই কেহ হইবেন। হইতে পারে, যে শ্রীচন্দ্রের তিনখানা তাম্র শাসন আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তিনিই ভাসানের চন্দ্র সওদাগর। তিনিই হয়ত মনসা পূজার প্রচারে প্রবল বাধা দিয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহার গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মনসা পূজা সারা দেশময় শাস্ত্র সঙ্গত ভাবে গৃহীত হইয়া যায়। ভাসানের চন্দ্র সওদাগর শিবভক্ত বলিয়া পরিচিত আর শ্রীচন্দ্রদেব বিখ্যাত বৌদ্ধ ছিলেন। কিন্তু দেওল বাড়ী হইতে পরম বৌদ্ধ মহারাজ দেবখড়গের মহিষী পরম বুদ্ধোপাসিকা মহারাণী প্রভাবতীপূজিত সর্ব্বাণী মূর্ত্তির আবিষ্কার হইতে সপ্রমাণ হইয়া গিয়াছে যে, এই যুগে বুদ্ধে আর শিবে বড় প্রভেদ ছিল না।

৯—১১ শ খৃষ্টাব্দেই যে মনসা পূজা বিশেষ করিয়া বঙ্গে প্রতিষ্ঠা লাভ করে তাহার আর একটি প্রমাণ আছে। দেশময় যত প্রাচীন মনসামূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের কোনটি পাথরে কোনটি বা অষ্টধাতুর। উহাদের কোনটিই ৯ শতাব্দী অপেক্ষা পুরাণা বলিয়া বোধ হয় না। রঘুরামপুরে শ্রীযুক্ত পরেশনাথ মহলানবিশ মহাশয়ের কোটীশ্বর খননের কথা হয়ত আপনাদের অনেকেরই মনে থাকিতে পারে। খনিত পুকুরটি রঘুরামপুরের বিখ্যাত হরিশ্চন্দ্রের দীঘি হইতে সামান্য দূরে দক্ষিণ পশ্চিম কোণে অবস্থিত। ঐ পুকুর হইতে মনসা পূজার ঘট, মাটির ঘণ্টা ইত্যাদি এবং ঐ সঙ্গেই কতক বৌদ্ধ কতক ব্রাহ্মণ্য মূর্ত্তি বাহির হয়। তাহাদের অনেকগুলিই এখন ঢাকা মিউজিয়মে আছে। ঐ সঙ্গে ডিম্বাকৃতি, চেপ্টা, পোড়া মাটির দুইখানা ফলক পাওয়া গিয়াছিল। তাহাদের উপরে ধ্যানাসনস্থ বুদ্ধমূর্ত্তি উৎকীর্ণ. মূর্ত্তির নীচে ১০—১১ শতাব্দীর অক্ষরে "যে ধর্ম্মা হেতুপ্রভবা" ইত্যাদি সুপরিচিত বৌদ্ধ মন্ত্রটি উৎকীর্ণ। ঠিক যেমন আজকাল ধামরাইএর মাধবের ছোট ছোট মূর্ত্তি কুমাররা ধামরাইএর রথের সময় বিক্রী করে. এগুলিও তেমনি। এই বুদ্ধ ফলকগুলির বয়সও যাহা, মনসা পূজার উপকরণ ঐ পুষ্করিণী হইতে যাহা বাহির হইয়াছিল, তাহাদেরও বয়স কম বেশী তাহাই হইবে।

কিছুদিন পূর্ব্বে বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি বিখ্যাত পদুম সহরের পুষ্করিণীটির একাংশ খুঁড়িয়াছিলেন। এই দীঘির তীরেই বিজয় সেন প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত প্রদ্যুম্নেশ্বর শিবের মন্দির ছিল এবং ইহার পারে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভগ্নাবশেষের মধ্যেই বিজয় সেনের সুপরিচিত দেওপাড়া প্রশস্তি পাওয়া গিয়াছিল। এই পুকুর খুঁড়িয়া অন্যান্য বহু দেবদেবীর মূর্ত্তির মধ্যে সমিতি কয়েকখানা মনসার মূর্ত্তি এবং মনসার ঘটও পাইয়াছেন। এই মন্দির ও দীঘি প্রতিষ্ঠার সন তারিখ ঠিক নাই কিন্তু নিশ্চয়ই ১১২৫ খৃষ্টাব্দের কিছু আগে পাছে হইবে।

রঘুরামপুর ও পদুম সহর হইতে প্রাপ্ত মনসাপূজার উপকরণগুলি যখন ১০-১১ শতাব্দীর, মূর্ত্তি যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাও যখন ঐ সময়েরই, মনসার ভাসানের নায়ক চন্দ্র যে ঐতিহাসিক শ্রীচন্দ্রের সহিত অভিন্ন বলিয়া অনুমান করি, তিনিও যখন ১০ম শতাব্দীরই লোক তখন ইহাই কি সিদ্ধান্ত হয় না যে মনসা পূজার প্রথম প্রচার খৃষ্টাব্দের ৯ম-১০ম শতকেই হইয়াছিল?

মনসা দেবীর যে সকল প্রাচীন প্রস্তরের মূর্ত্তি বরেন্দ্রে ও বঙ্গে পাওয়া গিয়াছে তাহা সাধারণতঃ এইরূপ। দেবী ডান পা ঝুলাইয়া এবং বাঁ পা গুটাইয়া পদ্মাসনে উপবিষ্টা। মাথার উপরে সপ্ত নাগছত্র। দক্ষিণ হাতে বর, কাম্যফল; বাম হাতে একটি সাপ। আটটি নাগ দেবীর সঙ্গে থাকা চাইই। দেবীর দক্ষিণে একটি অস্থিসার দাড়ীওয়ালা মূর্ত্তি, বামে একটি মুকুটান্বিত পুরুষ মূর্ত্তি। দক্ষিণেরটি বোধ হয় জরৎকারু। তপসা জরৎ-কৃতবান্ কারুশরীরং ইতি জরৎকারুঃ; তপস্যাদ্বারা যিনি সুন্দর শরীরকে জড়াগ্রস্ত করিয়াছিলেন, তিনিই জরৎকারু। মুকুটান্বিত মূর্ত্তিটি বোধ হয় বাসুকী। মনসার ধ্যানে এই সকল আবরণ মূর্ত্তির কোন উল্লেখ নাই। কোন কোন মূর্ত্তিতে একটি সুন্দর কারুকার্য্য মণ্ডিত কলসী মূর্ত্তির নীচে দেখা যায়। মনসা পূজায় ঘটের প্রাধান্য প্রাচীনকাল হইতেই আছে। কোন কোন মূর্ত্তিতে দেবীর পিছনে মনসা পূজার অপরিহার্য্য অঙ্গ সিজ গাছ দেখা যায়।

রাজসাহী মিউজিয়মে রক্ষিত কোন কোন মনসা মূর্ত্তিতে দেবীর মাথার উপরে মাত্র পাঁচটি নাগের ছত্র দেখা যায়। কিন্তু দেবীর বর্ণনায় অনেক যায়গায়ই দেখা যায় যে তিনি "সাষ্ট-নাগা"। পঞ্চনাগছত্র মূর্ত্তি গুলিতে দেখা যাইবে, একটি নাগ সোজা হইয়া ফণা তুলিয়া দেবীর দক্ষিণ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। আর একটি বাম বাহুতে জড়াইয়া আছে। আর একটিকে দেবী বাম হাতে ধরিয়া আছেন। নাগচ্ছত্রের পাঁচটি এবং এই তিনটিকে লইয়া বোধ হয় আট সংখ্যা পূরণ হইয়াছে।

এ পর্য্যন্ত মনসার চারিটি ধ্যান আমি বাহির করিতে পারিয়াছি। খুঁজিলে হয়ত আরও পাওয়া যাইবে। ওঁ দেবীমম্বামহীনাং ইত্যাদি যেই ধ্যানে আজকাল মনসার পূজা হয় তাহা পূর্ব্বেই তুলিয়া দিয়াছি। এই ধ্যানের প্রধান কথা দুইটি, দেবী সাষ্টনাগা হইবেন এবং হংসারূঢ়া হইবেন। হংসা-রূঢ়া মনসা মূর্ত্তি এ পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছে বলিয়া অবগত নহি। কিন্তু অবিকল সরস্বতী মূর্ত্তির মত একখানা মনসা মূর্ত্তি কলিকাতা যাদুঘরে আছে। ব্লক সাহেবের Catalogue এর ৯৫ পৃষ্ঠায় ৩৯৫০ নম্বর রূপে এই মূর্ত্তি বর্ণিত। দেবী ধ্যানাসনে বসা,—'যোগিণী' বিশেষণের সার্থকতা এইখানে। মাথার উপর সপ্ত নাগছত্র। বাম হাতে পুস্তক ও অমৃতঘট। দক্ষিণ হাতে অক্ষমালা ও বর। দক্ষিণে একটি লিঙ্গমূর্ত্তি, বামে একটি গণেশের মূর্ত্তি। নীচে মনসার ঘট, তাহা হইতে দুইটি সাপ বাহির হইয়া দুই দিকে যাইতেছে। বর, অক্ষমালা পুস্তক ও অমৃতঘট সরস্বতীর সর্ব্বজনবিদিত উপাধি-চিহ্ন। মাথার উপরের নাগচ্ছত্র এবং নীচে ঘটের মধ্যের নাগ দুইটি না থাকিলে এই মূর্ত্তিকে ধ্যানস্থা সরস্বতী বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইত। পূর্ব্বে মনসা ও সরস্বতীর একীকরণপ্রয়াস সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, এই মূর্ত্তিতে তাহা সুদৃঢ়রূপে সমর্থিত হইতেছে।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব মহাশয়, "দেবীম-ম্বামহীনাং" এই ধ্যানটি তাঁহার Archaeological Survey Report of Mayurbhanj নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন যে এই ধ্যানটি "Fouud in a Tantra"! কোন তন্ত্রে Found তাহার উল্লেখ করেন নাই। আমি কিন্তু এই ধ্যানটি পুরোহিতের মুখ হইতে শুনিয়া লিখিয়া লইয়াছি,

তিনিও বোধ হয় আসলে তাহাই করিয়াছেন, তাই কোন্ তন্ত্রে ধ্যানটি আছে তাহার উল্লেখ করা সম্ভবপর হয় নাই।

এই ধ্যানটির রচনা বিশেষ সুবিধার নহে। রঘুনন্দনের তিথিতত্ত্বের কাশীরাম বাচস্পতি কৃত টীকায় পঞ্চমী কৃত্যের মধ্যে মনসা পূজার বিস্তৃত বিধান আছে। এই টীকায় নিম্নরূপ ধ্যান ধৃত হইয়াছে কিন্তু কোথা হইতে ধ্যানটি সংগৃহীত তাহার কোন উল্লেখ নাই:—

হেমাম্ভোজনিভাং লসদ্বিষধরালঙ্কারসংশোভিতাং
স্মেরাস্যাং পরিতোমহোরগগণৈঃ সংসেব্যমানাং সদা।
দেবীমাস্তিকমাতরং শিশুসুতাং আপীনতুঙ্গস্তনীং
হস্তাম্ভোজযুগেন নাগযুগলং সংবিভ্রতীমাশ্রয়ে॥*

এই ধ্যানের রচনাটি দেবীমম্বামহীনাং ইত্যাদি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বলিয়া মনে হয়। এই ধ্যানে দেখা যায় দেবীর যেন চারিটি হাত। দুই হাতে শিশু ধরিয়া থাকিবেন এবং দুই হাতে দুইটি নাগ থাকিবে। তিনি নাগালঙ্কার ভূষিতা হইবেন এবং চতুর্দ্দিকে মহানাগগণ তাঁহার সেবা করিবে। কিন্তু এই ধ্যানের সঙ্গে মিল আছে এরূপ মূর্ত্তি যত পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের সবগুলিতেই দেবীর দুই হাত। কোনটায় দেবী দুই হাতে শিশুই ধরিয়া আছেন। যথা নগেন্দ্র বাবুর Archaeological Survey of Mayurbhanj এ X'lix পৃষ্ঠায় এবং তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে উদাহৃত মূর্ত্তি গুলি। পিছনে সিজ বৃক্ষের শাখা এবং নানা স্থানে সাপ দেখিয়াই চিনা যায় যে এ মূর্ত্তি গুলি মনসা দেবীর। নগেন্দ্র বাবু এই মূর্ত্তি গুলিকে গোতমী ও শাক্যসিংহ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

আর এক শ্রেণীর মূর্ত্তির হাতে শুধু সাপই আছে। যথা নগেন্দ্র বাবুর পুস্তকেরই xxxviii পৃষ্ঠার বিপরীত দিকের মূর্ত্তিদ্বয়ের ১৫ নম্বরেরটি। দেবীর বাম হাতের সর্পশিশুটির উপরের অর্দ্ধেক মানবাকৃতি। এইরূপ বাম হাতে মানবাকৃতি সর্পশিশুযুক্ত মনসা মূর্ত্তি রাজসাহী মিউজিয়মেও একটি আছে উহা মিউজিয়মের $\frac{H(c)14}{118}$ নম্বর, মূর্ত্তি। কলিকাতা যাদুঘরেও একটি আছে। নম্বর, ৩৯৫১, ব্লক সাহেবের ক্যাটালগ, ৯৫ পৃষ্ঠা।

এই মূর্ত্তিগুলির বিশেষত্ব এই যে এইগুলি দেখিবামাত্র বৌদ্ধদের শিশু-কোলে হারিতী, (যাহা আমরা সুবচনী করিয়া লইয়াছি) দেবীর কথা মনে পড়ে। হারিতীদেবীর সহিত মনসা দেবীর কিছু যেন সম্পর্ক আছে বলিয়া বোধ হইতেছে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তের প্রকৃতি খণ্ডের ৪২শ অধ্যায়ে এবং শ্রীকৃষ্ণ জন্ম খণ্ডের ৪৩শ অধ্যায়ে মনসা দেবীর আরও দুইটি ধ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতি খণ্ডের ধ্যানটিতে তথা বিশেষ কিছুই নাই। শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডের ধ্যানটিতে আছে যে দেবী মহোরগবাহনা এবং তিনি সর্ব্ববিদ্যাবিশারদা ও সর্ব্ববিদ্যাদাত্রী।*

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী।

* ঢাকা কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া এই ধ্যানটি খুঁজিয়া দিয়াছেন।

* ঢাকা মিউজিয়মের মূর্ত্তি সমূহের বর্ণনা মূলক সুবৃহৎ তালিকার (অবিলম্বে প্রকাশিতব্য) 'মনসা' অধ্যায়ের মুখবন্ধের মর্ম্মানুবাদ। ঢাকা সাহিত্য পরিষদের ১৩২৭ সনের ১০ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

ঋষি সমাজে তত্ত্ব চিন্তা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সৃষ্টিতত্ত্ব।—এই যে সৃষ্টি প্রহেলিকা যাহা সভ্যতার আদিম যুগ হইতে জ্ঞানের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনে কত বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে ইহা লইয়া প্রাচীন ঋষি সমাজেও কত আন্দোলন চলিয়াছে। এই সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে ঋক্-সংহিতায় যাহা পাই তার চেয়ে বেশী আজ পর্য্যন্ত কোন দেশের কোন দার্শনিকই বলিতে পারেন নাই। একালে সোপনহৌয়ার প্রভৃতি জগতকে যে একটা Will, একটা Idea বলিতেছেন তাহা আমাদের প্রাচীন ঋষিদের কথারই প্রতিধ্বনি মাত্র। বিশ্বকর্ম্মার উদ্দেশ্যে যে সকল স্তব আছে তাহাতে তাঁহাকে এই বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। এক ঈশ্বর—

এক সৃষ্টিকর্ত্তার কল্পনা অনেক স্থানেই দেখিতে পাই। কিন্তু এইখানেই তাঁহাদের তত্ত্বচিন্তা শেষ হয় নাই। তাঁহারা এক দিকে যেমন তাঁকে বৃহৎ হইতেও বৃহত্তর এবং মহতোমহীয়ান মহৎ হইতেও মহত্তর, অন্য দিকে তেমনি তাঁহাকে সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতররূপে উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে জিজ্ঞাসা হইল

"কিমস্বিৎ বনম্ ক উস বৃক্ষআস যতো
দ্যাবাপৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ।"

সেই বনই বা কি সে বৃক্ষই বা কি যাহা হইতে এই দ্যাবা-পৃথিবী গঠিত হইয়াছে?

"কিমস্বিদাসীদধিষ্ঠানং আরম্ভনং কতমৎস্বিৎ কথা-সীৎ।
যতো ভূমিং জনয়ন্ বিশ্বকর্ম্মাভির্দ্যাম্ ঔর্নোদমহিনা বিশ্বচক্ষ॥"

ইহার অধিষ্ঠান কোথায় ইহার আরম্ভই বা কিরূপে এবং কোথায় ছিল যাহা হইতে বিশ্বকর্ম্মা পৃথিবী এবং আকাশ নির্ম্মাণ করিলেন?

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতো মুখো বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
সমবাহুভ্যাং ধমতি সম্পতত্রৈর্দ্যাবা ভূমি জনয়ন্ দেবা একাঃ॥

বিশ্বতশ্চক্ষু বিশ্বতোমুখ বিশ্বতোবাহু বিশ্বতস্পাৎ (সর্ব্বব্যাপী মহাপুরুষ) নিজের বাহুদ্বারা এই দ্যাবাপৃথিবী সংগঠিত করিলেন।

কিন্তু কে জানে কোথা হইতে এই বিচিত্র সৃষ্টি, কেইবা বলিবে কোথা হইতে ইহার উৎপত্তি। দেবতারা হয়ত বলিতে পারিবেন, কিন্তু তাঁহারাই বা কি করিয়া বলিবেন 'দেবাঅস্ত বিসর্জ্জনেন'—তাঁহারাও তো সৃষ্টির পর উৎপন্ন হইয়াছেন। তখন ঋষি কঠোর তপঃ প্রভাবে দেহাত্মধ্যাসবর্জ্জিত এমন এক অবস্থায় উপনীত হইলেন যখন দেহের জ্ঞান একেবারে চলিয়া যায়—এমন কি মন পর্য্যন্ত সূক্ষ্মাৎসূক্ষ্মতর হইয়া ক্রমে লীন হইয়া যায়—তখন তাঁহারা নিজ সূক্ষ্ম নির্ম্মল হৃদয়ে মন ও বুদ্ধির অতীত এই সত্য দর্শন করিলেন—এবং তাঁহাদের অন্তঃকরণ হইতে যে মন্ত্রগুলি নিঃসৃত হইল তাহাই ঋক্‌সংহিতার দশম মণ্ডলে নাসদাসীয় সূক্ত বলিয়া পরিচিত। এমন সুন্দর গাম্ভীর্য্য পূর্ণ কবিতা জগতের অন্য কোন সাহিত্যে আছে কিনা জানি না। অব্যক্ত অবস্থায় সেই একমাত্র সৎ যিনি তিনি আত্মস্থ অবস্থায় বায়ুরও সাহায্য ব্যতীত কেবলমাত্র আত্মাবলম্বনেই নিরাকার নিরঞ্জনরূপে অবস্থান করেন, তাঁহাতে প্রথম কামের আবির্ভাব হইয়া তিনি বিকাশ প্রাপ্ত হইলেন। আপনারা হয়ত অনেকেই এই সূক্ত পড়িয়াছেন তথাপি এখানে উহার কয়েকটা শ্লোক উদ্ধৃত করিবার ইচ্ছা সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

না সদাসীৎ নো সদাসীৎ তদানীং নাসীৎ রজো ন ব্যোমাপরোযৎ।
কিম্ আবরীবঃ কুহকস্য শর্ম্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্ গহনং গভীরম্॥
ন মৃত্যুরাসীদ মৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যাঃ অহ্নঃ আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকম্ তস্মাধ্যন্ন পরাঃ কিঞ্চনাস॥
তমঃ আসীৎ তমসাগূঢ়মগ্রে প্রকেতম্ সলীলং সর্ব্বমা ইদম্।
তুচ্ছে নাভ্যপহিতং যদাসীৎ তাপসস্তদ্ মহিনা জায়তৈকম্॥
কামস্তদগ্রে সমবর্ত্তদাধি মনসোরেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।
সতো বন্ধম্ বসতি নিরবিন্দম্ হৃদি প্রতীষ্য কবয়োমনীষা॥

এই সূক্তে দেখিতেছেন যে ঋষিরা এই জ্ঞানে উপনীত হইয়াছিলেন যে অগ্রে কাম সৃষ্টিকর্ত্তার মন হইতে বীজরূপে উৎপন্ন হইল। বিশ্বজগৎ এই কামনা হইতে উৎপন্ন হইল। পরম পুরুষের কামেই সৃষ্টি বিকসিত হইল। এই কামনা বা কাম desire বা মায়াই সৃষ্টিকর্ত্তার মন। উপনিষদও এই সত্যই ঘোষণা করিতেছেন——'যদিদং কিঞ্চ জগৎসর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।' এই কামনা বা কাম কি উপনিষদ-কার তাহা বুঝাইয়াছেন—"তংঐক্ষত বহুস্যাম প্রজায়েয়"—(ছান্দোগ্য)। ইহারও পূর্ব্বে শতপথ ব্রাহ্মণে বেদের উপরোক্ত সূক্তের ব্যাখ্যায় দেখিতে পাই—"তদিদম্ মনঃ সৃষ্টম্ আবির-বুভূষদ্ নিরুক্ততরম্ মূর্ত্তরম্"—তখন ঐ মনন আপনাকে বহু ভাবে ও মূর্ত্তিতে দেখিতে ইচ্ছা করিলেন।

ঋগ্বেদের এই সৃষ্টিতত্ত্ব যতই আলোচনা করিবেন ততই বিমুগ্ধ হইবেন। যখন সমুদয় অব্যক্ত অবস্থায় ছিল তখন প্রাণের কোন রূপ বিকাশ ছিল না বটে কিন্তু তখনও প্রাণের অস্তিত্ব ছিল। তখন সমুদয় জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ড এই একমাত্র সৎ বা ব্রহ্মসত্তায় পর্য্যবসিত ছিল। তখন এই সৎ আপনি আপনায় মুগ্ধ, শুদ্ধ, নিস্পন্দ স্বস্বভাবে অবস্থিত—তখন তিনি নির্গুণ নিস্ক্রিয়, দেশ ও কালের অতীত—'সৎ'ও নয়—'অসৎ'ও নয়

আনীদ্‌অবাতম্‌—গতিহীন ভাবে স্পন্দিত হইলেন। ইহাই পরব্রহ্মের প্রথম নিঃশ্বাস বা স্পন্দন। এখন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানও এই পর্য্যন্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে সমুদয় জগৎ কেবল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কম্পনের সমষ্টি মাত্র। ইহাকে ইথারই বলুন বা subtle vibrationই বলুন। এই স্পন্দনই সেই সৎএর আপনায় আপনি কামযুক্ত অবস্থা যাহা ব্যক্ত অবস্থায় নানাবিধ শক্তির আকার ধারণ করিয়া এই পরিদৃশ্যমান জগতরূপে এই অদ্ভুত প্রপঞ্চরূপে বহির্গত হইয়া কল্পান্তে আবার অব্যক্ত অবস্থায় সেই একমাত্র প্রাণ সত্তায়ই লীন হয়। মুণ্ডকোপনিষৎ উর্ণনাভির উপমাদ্বারা এই ভাবটী অতি সুন্দরভাবে বুঝাইয়াছেন—"যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ"-যেমন উর্ণনাভি (মাকড়সা) কারণান্তর অপেক্ষা না করিয়া নিজের শরীর হইতে তন্তুসমূহ বহির্দ্দেশে প্রসারিত করে আবার তাহা নিজ শরীরে প্রতিসংহৃত করে তেমনি অনন্তকাল ধরিয়া ইনি কখন ব্যক্ত কখন অব্যক্ত ভাব ধারণ করিয়া লীলা করিতেছেন। ইহাই ঋষিদের সৃষ্টিতত্ত্ব—ইংরেজী creation বলিলে এভাব কিছুই প্রকাশ হয় না। আমাদের সৃষ্টি "বিসর্জ্জনেন"—এক ব্রহ্মসত্তাই কখন সূক্ষ্মাবস্থায় লীন থাকেন আবার কখন জগত প্রপঞ্চরূপে নির্গত হইয়া বিভাসিত হন। কিছুই শূন্য হইতে সৃষ্টি হয় নাই। বেদের ঋষি ইহাও জানিতেন যে কল্পে কল্পে এইরূপ হইয়া থাকে। এই যে সৃষ্টি ইহা পূর্ব্বকল্পে যেমন হইয়াছিল। "ও ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোহধ্য জায়ত……ততো রাত্রি জায়ত…… সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ম্‌"—এখনও সিন্ধুদ্বীপ ঋষির এই ঋকত্রয় ব্রাহ্মণকে ত্রিসন্ধ্যায় উচ্চারণ করিতে হয়।

আর বেদান্তের যে চরমতত্ত্ব "সোহহং"—আমিই সেই ব্রহ্ম বা আত্মা তাহারও মূল এই ঋকসংহিতায়ই পাইবেন। আমার যতদুর মনে হয় দুইটী সূক্তে এই ভাব অতি পরিস্ফুট হইয়াছে। একটী দশম মণ্ডলে, অম্ভৃন ঋষির কন্যা বাক্‌ দেবী এই মন্ত্রের দ্রষ্টা। এই সূক্তের ঋষিও বাক্‌ দেবী এবং দেবতাও বাক্‌। এই সূক্তটী দেবীসূক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ, শরতকালীন দুর্গাপূজায় আমাদের দেশে যে চণ্ডীপাঠ হয় তাহাতে এই দেবীসূক্ত গৃহে গৃহে পঠিত হইয়া থাকে। চণ্ডীপাঠের পূর্ব্বে এই দেবীসূক্ত না পাঠ করিলে চণ্ডীপাঠ নিস্ফল হয়। এই মন্ত্রগুলিতে আত্মজ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাইবেন। আপনারা এই ঋষিকন্যার সতেজ উক্তি একটু শুনুন—

অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নি অহমশ্বিণোভা॥

অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি
ব্রহ্মদ্বিষে শরবেহন্তবা উ।
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং
দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশহ॥
অহং সুবে পিতরমস্যমূর্দ্ধন্‌
মম যোনিরপ্‌স্ব অন্তঃ সমুদ্রে।
ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বা,
উতামূ দ্যাং বর্ষ্মনোপ স্পৃশামি॥
অহমেব বাত ইব প্রবাম্যা
রভমানা ভুবনানি বিশ্বা।
পরোদিবা পর এনা পৃথিব্যা
এতাবতী মহিমা সম্বভুব॥

আমি রুদ্রগণের ও বসুগণের সহিত বিচরণ করি, আমি আদিত্যগণের ও বিশ্বদেবগণের সহিত বিচরণ করি। মিত্র ও বরুণকে আমিই ধারণ করিয়া রহিয়াছি, আমিই ইন্দ্র আমি অগ্নি অশ্বিনীদ্বয়ও আমি। আমি ব্রহ্মদ্বেষীর বিনাশের জন্য রুদ্রের ধনু বিস্তার করি. আমি লোকহিতের জন্য সংগ্রাম করি, আমি দ্যাবাপৃথিবীতে অনুপ্রবিষ্ট আছি। আমি উর্দ্ধদেশে পিতা দ্যোকে প্রসব করিয়াছি, সমুদ্রের জলরাশীর মধ্যে আমার গর্ভ রহিয়াছে, আমি বিশ্বভুবনে অনুপ্রবিষ্ট, আমি নিজ দেহ দ্বারা দ্যুলোককেও স্পর্শ করিয়া রহিয়াছি। এই বিশ্বভুবন নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইয়া আমি বায়ুর মত সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইতেছি, দ্যুলোকের পরে পৃথিবীর পরে যাহা কিছু সর্ব্বত্রই আমি নিজ মহিমা দ্বারা সম্ভূত হই।

এমন তেজের ভাষা, এমন স্পষ্ট অদ্বৈতবাদ আর কোথায় শুনিয়াছেন? এই সূক্তের ভিতর আর একটী গূঢ় ভাব

রহিয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই মন্ত্রগুলির দেবতা বাক্। এই বাক্ই ব্রহ্মের প্রথম প্রকাশ তাই এই সূক্তে বাককে অম্ভৃণ ঋষির কন্যারূপে কল্পনা করা হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালে আমরা যে শব্দ ব্রহ্ম এই তত্ত্বের আলোচনা দেখিতে পাই যাহা তন্ত্রশাস্ত্রে আরো স্ফুটতর হইয়াছে "আসীৎ শব্দ স্তত: ব্রহ্ম" শব্দেই ব্রহ্মের প্রথম প্রকাশ এবং তন্ত্রে যে বাক দেবতার স্তত্ত্ব স্বরূপ মূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে তাহারও মূল এইখানে।

আর একই আত্মা যে সর্ব্বভূতে বিরাজমান এই আত্ম-তত্ত্ব জ্ঞান আমরা চতুর্থ মণ্ডলে বামদেব ঋষির একটী সূক্তে অতি স্পষ্ট ভাবে দেখিতে পাই। ইহা হংসবতী ঋক্ বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই মন্ত্রের দেবতা সূর্য্য। ঋগ্বেদী সন্ধ্যার মধ্যাহ্নের সূর্য্যার্ঘের জন্য এই মন্ত্র ধ্যান করিতে হয়—

"হংসঃ শুচিসৎ বসুরন্তরীক্ষসৎ হোতাবেদিসৎ
অতিথির্দুরোনসৎ নৃসৎ বরসৎ ঋতসৎ ব্যোমসৎ
অব্জা গোজা ঋতজা আদ্রিজা ঋতং বৃহৎ"

হংসঃ—পরমাত্মা বা ব্রহ্ম আদিত্য ইনি 'শুচিসৎ' নির্ম্মল-আকাশ মণ্ডলে অবস্থান করেন, ইনি 'বসু' অর্থাৎ সর্ব্বসঞ্চারী বায়ু স্বরূপ, ইনি 'অন্তরীক্ষসৎ' অন্তরীক্ষ সঞ্চারী ইনিই 'হোতা' আবার ইনিই বেদিসৎ হোমনিষ্পাদক অগ্নিস্বরূপ, ইনি অতিথিবৎ সর্ব্বদা পূজনীয়, ইনি 'দুরোণসৎ' গৃহাগ্নিরূপে পাকাদি সাধন করিতেছেন আবার 'নৃসৎ' চৈতন্যরূপে মানুষ মাত্রেই অবস্থিতি করিতেছেন ইনি 'বরসৎ' বরণীয় সূর্য্য মণ্ডলে বাস করিতেছেন 'ঋতসৎ' ঋতে, (সত্য, বা ব্রহ্ম বা যজ্ঞে) অবস্থিতি করিতেছেন, 'ব্যোমসৎ' আকাশে অবস্থিতি করিতেছেন, ইনি 'অব্জা' জলমধ্যে বিদ্যুদগ্নি বা বাড়বাগ্নিরূপে উৎপন্ন হইয়া অবস্থান করেন, ইনি 'ঋতজা' সর্ব্বত্র সত্যরূপে পরিদৃশ্যমান হয়েন, ইনি আদ্রিজা উদয়াচল হইতে আদিত্যরূপে সমুদিত হন, ইনি—'ঋত', সত্যসর্ব্বাধিষ্ঠান ব্রহ্মতত্ত্ব স্বরূপ। ইনি 'বৃহৎ' সর্ব্বব্যাপি যাঁহার সৎ আমরা সর্ব্বত্র উপলব্ধি করিতেছি।

একই আত্মা যে সর্ব্বভূতে নানা ভাবে বিরাজমান তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য কঠোপণিষদে এই মন্ত্রটীই উদ্ধৃত হইয়াছে। তন্ত্রও 'হংসঃ সোঽহং' আমিই সেই হংস বা ব্রহ্ম এই মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন। এবং সুরাশোধনের জন্য এই হংসবতী মন্ত্র প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ইহাদ্বারা মদ্য অমৃতে পরিণত হয়। ইহার তাৎপর্য্য আর কিছুই নয়, এই একাত্মতা লাভ জন্মিলে তান্ত্রিকও বেদের ঋষির মত উচ্চস্বরে বলিতে পারেন—

"অপাম সোম মমৃতাঅভুম"
"অগন্ম জ্যোতি রবিদাম দেবান্॥

আমি সোমপান করিয়া অমর হইয়াছি। আমি জ্যোতি লাভ করিয়াছি ও দেবগণকে জানিয়াছি। এই কয়েকটী সূক্ত একটু অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে মনে এ সন্দেহ থাকিতে পারে না যে ঋগ্বেদ সংহিতার ভিতরেই ঘোর অদ্বৈতবাদের অবতারণা রহিয়াছে; মনে হয় এই দেবতা বহুল ঋগ্বেদগ্রন্থ যেন একটা বিরাট অদ্বৈতবাদ। বেদান্তের যে সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম এই বেদান্তবাদ ঋক্ সংহিতায়ই পরিণত অবস্থায় দেখিতে পাই। কিন্তু বেদের ঋষিরা অদ্বৈতবাদী ছিলেন না—আমিই একমাত্র জীব আমিই ব্রহ্ম, সাধনা বলে ভেদজ্ঞান দূরকরত: আমিই ব্রহ্ম হইয়া যাইব—আমার মনে হয় তাঁহাদের মনের গতি সেরূপ ছিল না। ব্যবহারিক জীবনে তাঁহারা দ্বৈতভাবাবলম্বী ছিলেন। সাধক রামপ্রসাদের কথায় তাঁহারা—"চিনি হ'তে চান না, চিনি খাবেন, এই তাঁদের সাধ।" একটী মন্ত্রে ঋষির মনের এই ভাব অতি সুন্দর পরিস্ফুট দেখিতে পাই। ঋষি অগ্নির উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—"আমি তোমার উপাসক, আমি তোমার মূর্ত্তিকে পূজা করি; মহৎ প্রভুর গৃহে যেরূপ সেবক থাকে, আমি তোমার গৃহে সেইরূপ সেবক থাকিব।" ইহাই ঋষির কামনা। এই পূজ্য পূজক, সেব্য সেবক, বা উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধ বৈদিক ঋষি দূর করিতে চান না।

ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তের মন্ত্রগুলির সহিত হিন্দুমাত্রই পরিচিত। ইহার কতকগুলি মন্ত্র শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ায় পড়িতে হয়। ইহার প্রথম মন্ত্রটী 'সহস্রশীর্ষাপুরুষঃ' ইত্যাদি শালগ্রামশিলার স্নানের সময় নিত্য পঠিত হইয়া থাকে। এই বিরাট পুরুষের কল্পনা

মনে করিলেই ঋষিগণ যে তত্ত্ব চিন্তায় কত উচ্চ শিখরে উপনীত হইয়াছিলেন তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এই যে পুরুষ তাহার সহস্র শীর্ষ, সহস্র চক্ষু, সহস্র পদ, তিনি বিশ্বভূমে ব্যাপিয়া আছেন এবং তাহার উপরেও আরো দশ আঙ্গুল ব্যাপিয়া আছেন। যাহা কিছু আছে, ছিল বা হইবে তাহা সকলই এই পুরুষ। এই যে বিশ্বভুবন এ তাঁহারি মহিমা। অথচ এ সমস্ত মিলিয়া তাঁহার এক পদ মাত্র। তাঁহার আর তিন পদ এ সমস্তকে অতিক্রম করিয়া উর্দ্ধে অবস্থিত। আর এই পুরুষ-যজ্ঞের বিষয় একবার চিন্তা করুন্। তিনি বিরাটরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া আপনাকে আহুতি দিয়াই যজ্ঞ করিলেন, নিজকে যজ্ঞীয় পশুতে পরিণত করিয়া নিজের দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া এ বিশ্বজগত নির্ম্মাণ করিলেন। তাঁহার নাভি হইতে অন্তরীক্ষ, মস্তক হইতে দ্যুলোক, পদ হইতে ভূমি, কর্ণ হইতে দিক-সকল, মন হইতে চন্দ্র, চক্ষু হইতে সূর্য্য, মুখ হইতে ইন্দ্র অগ্নি, প্রাণ হইতে বায়ু, ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ এবং আরণ্য এবং গ্রাম্য পশুগণও উৎপন্ন হইল—এই বিশ্বসৃষ্টিই বিরাট পুরুষের মহাযজ্ঞ যাহা কল্পে কল্পে অনাদি অনন্তকাল হইতে নিত্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। এই পুরুষ হইতেই যে সমস্তের উৎপত্তি তাহা মণ্ডুক এবং কঠ উপনিষদেও বিবৃত দেখিতে পাই এবং এই দুই উপনিষদে পুরুষের যেরূপ বর্ণনা আছে তাহা পড়িলে মনে হয় যেন ঋগ্বেদের সেই বিরাট মহান পুরুষের বর্ণনাই পড়িতেছি। এই পুরুষের সম্বন্ধেই শ্বেত উপনিষদ বলিয়াছেন, "যস্মাৎ পরং নাপরং কিঞ্চনাস্তি"—যাহার পর আর কিছুই নাই। "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ তমেব বিদিত্বাহমৃতত্বমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"—আমি অবিদ্যার অতীত পরমজ্যোতির্ম্ময় সেই পুরুষকে জানিতে পারিয়াছি তাঁহাকে জানিলে অমৃতত্ব লাভ হয় আর দ্বিতীয় কোন পন্থা নাই।

ঋষির চোখে কিছুই ক্ষুদ্র নয়, তিনি জগতের যাবতীয় দ্রব্যই বৃহৎভাবে দেখিতেন কেননা সমস্তই একব্রহ্মসত্বার প্রকাশ, তাই বহির্জগতে যাহা কিছু সুন্দর বিস্ময় এবং বিহ্বল-চিত্তে তাহাই দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতেন। কিন্তু তাহা জড়ের পূজা নয়—ঋষিরা পূজা করিতেন কাহাকে? তাহার ভিতরের প্রাণশক্তিকে—

"যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশং ভুবনমাবিবেশ।
যো ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় তে নমঃ॥

নতুবা এই বিরাটপুরুষ যাঁহাদের কেবল কল্পনার অনুভূতিতে মন প্রাণের জাগ্রতভাব, এই বিশ্বজগত যাঁহাদের দৃষ্টিতে একটী বিশ্বব্যাপী প্রাণ ও চৈতন্যময় জ্যোতিরূপে প্রতিভাত তাহাদের নিকট আবার জড় কি?

যাঁহা হইতে এই বহু বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন যে 'একম্ সৎ' বহুরূপে প্রকাশিত; সেই একত্বের সন্ধান করিতে গিয়া—সেই আদি কারণের তত্ত্ব অন্বেষণ করিতে গিয়া ঋষিরা কি প্রকৃতি হইতে—বহির্জগত হইতে এই তত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছিলেন—যাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ভাষায়—From Nature to nature's God"? এই সূক্ষ্মতত্ত্ব কি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বহির্জগত হইতে লাভ করা যায়? সে যে অনন্তকাল সাপেক্ষ! সৃষ্টি তত্ত্বের আলোচনা করিবার সময় নাসদাসীয় সূক্তে দেখিতে পাই যে 'সৎ' এর উপর প্রথমে যে কামের আবির্ভাব হইয়া উৎপত্তির কারণ নির্গত হইল অসৎ হইতে সৎএর আবির্ভাব হইল ঋষিগণ তাহা বুদ্ধি দ্বারা আপন আপন হৃদয় পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক নিরূপণ করিলেন, আবার বিশ্বকর্ম্মার উদ্দেশ্যে এই সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে যে প্রশ্ন—সেই বনই বা কি, সেই বৃক্ষই বা কি যাহা হইতে এই দ্যাবা পৃথিবী নির্ম্মিত হইয়াছে? তাহার উত্তরেও ঋষি বলিতেছেন—"হে মনীষিগণ, তোমরা একবার আপন আপন মনে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ তিনি কিসের উপর দাঁড়াইয়া এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধারণ করেন। যখনই কোন গভীর তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন হয় ঋষি বলেন—'তোমরা আপন হৃদয় অন্বেষণ কর'। ইহার তাৎপর্য্য কি? ঋষিদের এ জ্ঞান জন্মিয়াছিল যে বহির্জগতে যাহা কিছু আছে তাহা তোমার অন্তঃর্জগতেই রহিয়াছে, নিজের হৃদয় অন্বেষণ কর সেইখানেই সকল বিজ্ঞানের বীজ নিহিত রহিয়াছে যাহা জানিলে সকলই তোমার বিজ্ঞাত হইবে। ইহাই উপনিষদের ভাষায় "আত্মানং

বিদ্ধি"। সকল কারণের যে মূলকারণ পুরুষ তাহা তোমার অন্তরেই অধিষ্ঠিত বুদ্ধি তাহা উপলব্ধি কর। বেদের এই তত্ত্বই আমার মনে হয় উপনিষদের "অঙ্গুষ্ঠমাত্রো পুরুষঃ" ইত্যাদি শ্লোকের তাৎপর্য্য। কঠোপনিষদ পুরুষের স্বরূপ বর্ণনায় বলিতেছেন—

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ মধ্যমাত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানোভূত ভব্যস্ত ন ততো বিজুগুপ্সতে।
এতদ্বৈতৎ॥

মুণ্ডকোনিষদ বলিতেছেন—"যিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ যাঁহার মহিমা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রকাশিত সেই পুরুষ হৃদয় পুণ্ডরীকে প্রতিষ্ঠিত। সেই পুরুষ মনোবৃত্তি দ্বারা বিভাবিত হন তাই তাঁকে মনোময় বলে। ব্রহ্মোপনিষদও ব্রহ্ম বা পুরুষ কোথায় প্রকাশিত হন তাহার উত্তরে বলিতেছেন—

"হৃদ্যাকাশে তদ্বিজ্ঞানং হৃদ্যাকাশং তস্মিন্নিদঞ্চ
বিচরতি যস্মিন্নিদং সর্ব্বমোতপ্রোতম্।"

ব্রহ্ম হৃদাকাশে প্রকাশিত হন। হৃদয়দেশে বিচরণ করেন ইহাতে সমস্ত দৃশ্যপদার্থ ওতপ্রোত ভাবে রহিয়াছে। হৃদয় পুণ্ডরীক অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ তাই সেখানে যখন পুরুষের অধিষ্ঠান তাহার পরিমাপও অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ। তন্ত্রও এই তত্ত্বই আরো স্পষ্ট ভাবে প্রচার করিতেছে। তোমার দেহের ভিতরেই সব রহিয়াছে—

"যোগিনাং হৃদয়াম্ভোজে নৃত্যন্তি নৃত্যমঞ্জসা।
আধারে সর্ব্বভূতানাং স্ফুরন্তী বিদ্যুদাকৃতি॥

সেই মহাশক্তি যোগীগণের হৃদয় সরোজে স্ব-স্বরূপ প্রকাশ করিয়া নিজের আনন্দে নিত্যকরিতেছেন। সর্ব্বভূতের আধারে বিদ্যুদাকারে স্ফুর্ত্তি পাইতেছেন।

পুরুষ সূক্ত ছাড়াও দশম মণ্ডলে ভূরি ভূরি শ্লোক আছে যাহাতে দেখা যায় যে অতি প্রাচীন বৈদিক যুগেই আধ্যাত্মিক জগতে ঋষিদের স্থান কত উচ্চে ছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এক একটা theory লইয়া আরম্ভ করেন এবং তাহার প্রতিকূল যাহা কিছু তাহাকে একটা না একটা ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া নিরস্ত করিয়া থাকেন। দশম মণ্ডল যদি ঋক্‌সংহিতার অন্তর্গত হয় তবে ঋষিকে জড়বাদী বলা কাহারো সাহসে কুলায় না তাই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই তর্ক নিরস্ত করিবার জন্য এক কথায় বলেন যে দশমমণ্ডলের মন্ত্রগুলি অনেক পরবর্ত্তী কালের; ইহাকে ঋক্ পরিশিষ্ট বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। এরূপ অনুমান করিবার কোন কারণ নাই; আমাদের দেশের পণ্ডিতগণ এই মত সমর্থন করেন না এবং তাহা করিবার কোন কারণ নাই। তর্কস্থলে দশমমণ্ডল ঋক্ পরিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও সকল তত্ত্বের যে মূল, সকল ধর্ম্মের মূলে যে সত্য "একম্ সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি' যাহা উপনিষদের ভাষায়—"একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইহা ঋক্ সংহিতার প্রথম মণ্ডলেরই একটী সূক্ত। অতি প্রাচীনতম কালেই আমরা ঋষির মুখে এই সতেজ সগর্ব্ব উক্তি শুনিতে পাই—সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের সাধারণ ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়াইয়া ঋষি জলদগম্ভীর ধ্বনিতে বলিতেছেন 'একম্ সৎ। অন্তর্দৃষ্টিবলে বলীয়ান ঋষি দর্শন করিতেছেন—

"একঃ সুবর্ণ স সমুদ্রমাবিবেশ
স ইদং বিশ্বং ভুবনং বিচষ্টে।"

এক পক্ষী সমুদ্রে প্রবেশ করিল। সে এই সমস্ত বিশ্ব-ভুবন অবলোকন করে।

সুপর্ণম্ বিপ্রা কবয়ো বাচোতি
রেকম্ সন্তম্ বহুধা কল্পয়ন্তি।

পক্ষী একই আছে। বুদ্ধিমান কবিগণ তাঁহাকে কল্পনা-পূর্ব্বক নানাপ্রকার বর্ণনা করেন।

দর্শনতত্ত্বের সার যে তত্ত্ব জীবাত্মা পরমাত্মার একত্ব উপলব্ধি যাহা মণ্ডুকোনিষদে অতি অপূর্ব্ব একটী রূপকে বর্ণিত' হইয়াছে যাহা লইয়া অদ্যাবধি দার্শনিক সমাজে কত আলোচনা আন্দোলন চলিতেছে তাহাও এই ঋক্ সংহিতার প্রথম মণ্ডল হইতেই গৃহীত—

দ্বা সুপর্ণা স যুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরণ্যঃ পিপ্পলং স্বাদত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽ ভিচাকসীতি॥

এই হেয়ালির মত শ্লোকটী উপনিষদকার গ্রহণ করিয়া

দেখাইয়াছেন যে জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক, ভিন্ন নহে। পরমেশ্বরের পক্ষীর রূপ ধারণ করা যে প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যেই দেখা যায় তাহা নহে বৃহদারণ্যকে ইন্দ্র পক্ষীরূপ ধারণ করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের অগ্নি বায়ুর নিকট সমর্পণ করিয়াছিলেন। "তানিন্দ্রো সুপর্ণোভূত্বা বায়বে প্রাযচ্ছৎ"— পাশ্চাত্য অনেক দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রেও এইরূপ উপাখ্যান পাওয়া যায়। দেবরাজ Zeus এর জন্য ঈগল পক্ষী মধু আনিয়াছিল। জার্ম্মাণদের মধ্যেও প্রবাদ আছে যে দেবরাজ Odhin ঈগলরূপ ধারণ করিয়া মধু আহরণ করিয়াছিলেন।

আপনারা বিষ্ণুর জগত পরিক্রমের কথা শুনিয়াছেন। ঋক্ সংহিতার ১ম মণ্ডলের ২২ সূক্তে বিষ্ণু ও তাঁহার বিচক্রমণ সম্বন্ধে যে স্তব আছে তাহা একটু প্রণিধান করিলেই জানিতে পাইবেন ঋষিদের তত্ত্বজ্ঞান কত গভীর এবং তাঁহারা দৈনন্দিন জীবনের ভিতরেই কিরূপে ধর্ম্মের মূল উপলব্ধি করিয়াছেন এবং চতুর্দ্দিকের অজস্র প্রকাশের ভিতর যেদিকে তাকাইয়াছেন সেই দিকেই চৈতন্যের বিকাশ দেখিয়া কিরূপ আনন্দ ও বিস্ময়ে আপ্লুত হইতেছেন—

উপনিষদও ইহার উপরে যান নাই বরং ইহাই অন্য ভাবে ও ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই ঋকের অনেকগুলি মন্ত্র আমাদের অনেক ক্রিয়া কর্ম্মে পঠিত হয় এবং আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়াকর্ম্মের প্রারম্ভে যে আচমন করিতে হয় এই আচমনের মন্ত্রও এই সূক্তেরই একটী ঋক্। ঋষি বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—

অতো দেবো অবন্তু তে 	যতো বিষ্ণু র্বিচক্রমে।
পৃথিবীঃ সপ্তধামভিঃ॥
ইদং বিষ্ণু র্বিচক্রমে 	ত্রেধা নিদধে পদং।
সমূঢ়মস্য পাংশুরে॥
ত্রীনিপদা বিচক্রমে 	বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ।
অতো ধর্ম্মানি ধারয়ন্॥

বিষ্ণু জগত রক্ষা করেন, তিন পদ বিক্ষেপে সমস্ত জগত ব্যাপিয়া থাকেন। এই বিষ্ণু কে এবং তাঁহার এই বিচক্রমন ব্যাপার কি তৎসম্বন্ধে ভাষ্যকারগণ নানারূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কাহারো কাহারো মতে বিষ্ণুর এই ত্রিপাদ বিক্ষেপের তাৎপর্য্য, সূর্য্যদেবের জগত পরিক্রমণ। এই বিশ্বে যাহা কিছু আছে সেই সমস্তেতেই বিষ্ণু বিচক্রমণ করেন। পৃথিবী অন্তরীক্ষ এবং স্বর্গ এই তিন স্থানে তিনি পদ ধারণ করেন পৃথিবীতে অগ্নিরূপে, আকাশে বিদ্যুৎরূপে এবং দ্যুলোকে সূর্য্যরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন, ঋক সংহিতার প্রথম মণ্ডলে একটী সূক্তে ঋষি বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—

বিষ্ণোর্নু কংবীর্য্যানি প্রবোচম্ যঃপার্থিবানি বিমমেরজাংসি।
যোঅস্কভায়দুত্তরং সধস্থং বিচক্রমান স্ত্রেধোরুগায়॥

আমি বিষ্ণুর বীর্য্যসকলের কথা বলিতেছি। এই বিষ্ণু পৃথিবী অন্তরীক্ষ ও [illegible]লোক নির্ম্মাণ করিয়াছেন—ইনি দ্যুলোককে পতন হইতে রক্ষা করিয়া স্তম্ভিত ভাবে রাখিয়াছেন। ইনি সব সৃষ্টিও করিয়াছেন রক্ষাও করিতেছেন। বিষ্ণু যে রক্ষণ কর্ত্তা ঋগ্বেদের অনেক স্থলেই তাহার উল্লেখ দেখা যায় তাই তাঁহার "গোপা" এই বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। পৌরাণিক যুগে বিষ্ণুর সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বের চেয়ে পালন কর্ত্তৃত্ব রূপই প্রকট। সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব ব্রহ্মাতে প্রকট হইয়াছে। নিরুক্তকারেরা কেহ কেহ বিষ্ণুকে সূর্য্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কোন কোন ঋকে দেখিতে পাই বিষ্ণুর রূপ কিরণ বিশিষ্ট—

"ত্রির্দ্দেবঃ পৃথিবীমেষ এতাং বিচক্রমে শতর্চ্চসংমহিত্বা"
এই দেবতা শত সংখ্যক কিরণবিশিষ্ট স্বীয় মহিমায় তিনবার পৃথিবীতে পদক্ষেপ করেন। সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে ঋষিরা বিষ্ণুর যে প্রকাশ দেখিয়াছিলেন এখনও নারায়ণের সেই রূপেই ধ্যান করিতে হয়।

বিষ্ণুর ত্রিপদে বিচক্রমণের কথা শুনিলেন। এতদ্ভিন্ন বিষ্ণুর আর একটী পদের উল্লেখ দেখিতে পাই যাহা পরমপদ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই যে আচমণের মন্ত্র আমরা প্রত্যহ উচ্চারণ করি—

তদ্বিষ্ণোঃপরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্॥
তদ্বিপ্রাসো বিপণ্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে।
বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদং॥

বিষ্ণুর এই পরমপদ কি যাহা সুরগণ অসীম বিস্তৃত আকাশপথে বাধাহীন দৃষ্টির স্থায় সর্ব্বদা সন্দর্শন করেন এবং সর্ব্বদা জাগরণশীল অপ্রমত্ত বিপ্রগণ যাহার অন্বেষণ করিয়া থাকেন? পরম পদের আধিভৌতিক অর্থ যাই কেন হউক না উহার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য আছে এবং বেদের ঋষিও সেই আধ্যাত্মিক অর্থেই প্রয়োগ করিয়াছেন। এ স্থলের অতীত একটা অবস্থা বা ভাব যাহা ইন্দ্রিয়ের অতীত এবং কেবল জ্ঞানিগণেরই জ্ঞান গম্য। আমার মনে হয় "একমেব পরং ব্রহ্ম বিভাতি" একমাত্র পরব্রহ্মই প্রকাশ পাইতেছেন সকল বস্তুর ভিতরই ব্রহ্মানন্দায় উপলব্ধি ইহাই পরমপদের গূঢ় তাৎপর্য্য। এ সেই অবস্থা যাহার সম্বন্ধে মুণ্ডকোপনিষদে দেখিতে পাই "জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধ সত্ত্ব স্ততস্তুতাং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ"— যাঁহাদিগের জ্ঞানপ্রসাদে অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইয়াছে তাঁহারা তাঁহাকে সকল বস্তুর অভেদে ধ্যান করতঃ দর্শন করিয়া থাকেন। মুক্তিকোপনিষদে ভগবান রামচন্দ্র তাঁহার সচ্চিদানন্দরূপ বর্ণনা করিতে গিয়া বলিতেছেন—তিনি একদিকে যেমন অশব্দমস্পর্শমরূপমধ্যয়ং আবার তেমনি স্বরূভিভাতং সর্ব্বদাই প্রকাশমান। "পুরস্তিরশ্চোর্দ্ধমধশ্চ সর্ব্বতঃ সুপূর্ণভূমাইদ্বিতীয় ভাবয়"—আমি অগ্র পশ্চাৎ ঊর্দ্ধ ও অধঃ সর্ব্বত্রই পরিপূর্ণ। আমি পরিব্যাপক বস্তু। তার পর ঋক সংহিতার এই সূক্ত দুইটী উদ্ধৃত করিয়াই বলছেন—

"তদেতওদূচা ভ্যুক্তং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং ইত্যাদি— বিষ্ণুর এই যে পরমপদ ইহা যে কেবল ঋক্ বেদের ঋষিগণেরই আকাঙ্ক্ষিত ছিল তাহা নহে উপনিষদের ঋষিগণেরও ইহা চির আকাঙ্ক্ষিত এবং ঈপ্সিত বস্তু। তাই দেখিতে পাই যে যে কঠোপনিষদে আত্মজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা সেখানেও বিষ্ণুর এই পরমপদ ঋষির কিরূপ অভিপ্সিত—

বিজ্ঞান সারথি যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্নরঃ।
সোহধ্বনঃ পরমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং॥

ঋষিরা বিষ্ণুর যে পরমপদ আকাশে বিস্তৃত সূর্য্যের স্থায় সর্ব্বদা সন্দর্শন করিতেন তাহা চর্ম্ম চক্ষের অগোচর। ঋষিগণ জ্ঞাননেত্রে তাহা প্রত্যক্ষ করিতেন যদ্দ্বারা তাঁহারা এই পরমপদ প্রকৃষ্টরূপে সন্দর্শন করিতে পারেন। তাই ঋক্ সংহিতায় এই চক্ষুর প্রার্থনাও দেখিতে পাইবেন। এই চক্ষুর অর্থ দিব্যদৃষ্টি লাভ বই আর কি হইতে পারে? ইহাই উপনিষদের ভাষায় উক্ত হইয়াছে—

তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ।
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি॥ (মুণ্ডক)

ধীরগণ বিজ্ঞাননেত্রে দেখিতে পান যে সেই আনন্দরূপ অমৃত বস্তুতেই অগ্র পশ্চাৎ ঊর্দ্ধ অধঃ সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ।"

ঋষিরা যে প্রাচীন বৈদিক যুগেই ধর্ম্মজগতে কত উচ্চে আরোহণ করিয়াছিলেন তাহার জন্য অন্য প্রমাণ খুজিবার আবশ্যক করে না। দ্বিজমাত্রেরই প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যায় উপাস্য এবং উচ্চার্য্য গায়ত্রী মন্ত্র হইতেই ইহা সহজে অনুমান করা যায়। ঋক্ সাম যজু এই তিন বেদেই গায়ত্রী ঋক্ দেখিতে পাওয়া যায়। উপনিষদেও এই গায়ত্রীমন্ত্র সাদরে গৃহীত হইয়াছে। এই গায়ত্রী দ্বারা ব্রহ্মের জ্যোতি বা প্রকাশে এরই উপাসনা হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আজ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে একই জ্যোতি বা তেজ জগতের যাবতীয় কার্য্য করিতেছে। ঋষিগণ তত্ত্বজ্ঞানী তাঁহারা এই জ্যোতিকেই জ্ঞানময় পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাঁহারা ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে যে তেজরূপে তিনি এই সূর্য্যে প্রকাশমান তাহার অসংখ্য স্থানে অসংখ্য আকারে প্রকাশ থাকিলেও তিনি বহু নহেন তিনি একই। তাঁহারা আরো জানিয়াছিলেন যে যিনি বাহিরে তেজোময় জ্যোতিঃরূপে প্রকাশমান তিনিই ভিতরে অন্তরে চেতনারূপে বিরাজমান— জ্যোতির প্রকাশ হইলেই জীবদেহে চেতনার প্রকাশ। তাই তাঁহারা এই তেজের আধার সবিতা দেবতার সেই বরণীয় তেজের ধ্যান করিতেছেন যিনি জীবে ধীশক্তি এবং চেতনা প্রেরণ করেন। এ সেই জ্যোতি যাহার সম্বন্ধে ছান্দোগ্য বলিতেছেন—"অথো যদ্ অতঃপরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে, বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু, সর্ব্বতঃ পৃষ্ঠেষু অনুত্তমেষু লোকেষু যদিদং বাবতদ্ যদিদং অন্তঃ পুরুষে জ্যোতিঃ"—যে জ্যোতি দ্যুলোকের উপরে, যাহা বিশ্বের পৃষ্ঠে, সর্ব্ব লোকের পৃষ্ঠে দীপ্তিমান, পুরুষের অন্তঃশরীরে যে জ্যোতি দীপ্তিমান্ সেই জ্যোতিই এই জ্যোতিঃ।

ব্রহ্মশক্তির বিকাশই সৃষ্টি, সমস্ত চরাচর জগত সেই ব্রহ্মশক্তি হইতেই প্রকাশ পাইতেছে সুতরাং সমস্তই ব্রহ্মভুক্ত। কিন্তু অসীম অনন্ত ব্রহ্মশক্তিতো এই সৃষ্টিতেই পর্য্যবসিত নয়—তাহার যে অসীম অংশ সৃষ্টিকার্য্যে নিয়োজিত হয় নাই, এই সীমাবদ্ধ জগতের অতীত যে এক অসীম বিশ্বজগৎ রহিয়াছে তাহার সন্ধানও বেদের ঋষি পাইয়াছিলেন। পুরুষ সূক্তে বিরাট পুরুষের বর্ণনায় যে দেখিতে পাই পুরুষের বিভূতি বর্ণনা করিতে গিয়া ঋষি বলছেন—

এতাবান অস্যমহিমা অতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোহস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥

এত তাঁর মহিমা, কিন্তু তাহা হইতেও পুরুষ শ্রেষ্ঠ। জগতের যাবতীয় প্রাণী তাঁহার এক পাদাংশমাত্র (¼) এবং দ্যুলোকের অমৃত তাঁহার ত্রিপাদাংশ। উপনিষদের ঋষিও এই পুরুষের বর্ণনা করিয়া শেষ করিয়া উঠিতে পারেন নাই এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও হার মানিয়া অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহামিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতোজগৎ॥

ইহার ভিতর আমরা ঋগ্বেদের ঐ বিশ্বাতীত অসীমেরই কতকটা আভাস পাই। ঋষি স্তব করিতেছেন—

'হে মিত্রাবরুণ তোমরা প্রত্যূষে সূর্য্যোদয় হইলে লৌহকীলক সমন্বিত সুবর্ণ পথে আরোহণ কর এবং সেই থান হইতে অসীম বিশ্বজগৎ এবং সীমাবদ্ধ জগৎও অবলোকন কর।'

এই যে সীমাবদ্ধ জগতের অতীত অসীম জগৎ, যাহার সহিত সৃষ্টির কোন সম্বন্ধ নাই, তাহা মানুষের জ্ঞানের অতীত। মানুষের কোনরূপ জ্ঞানদ্বারা তাহা নির্দ্দেশ করা যায় না। কিন্তু এই বিশ্বাতীত অসীমের conception কল্পনা যে ঋষিদের মনে উদ্ভাসিত হইয়াছিল তাহার পরিচয় এইখানে। পরবর্ত্তীকালে উপনিষদের ঋষিও এই অসীমকে নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া—

'যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ'

বলিয়া হতাশ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছেন। ঋক্ বেদের ঋষি তাই জীবকে উপদেশ দিতেছেন—

পরীত্য ভূতানি পরীত্য লোকান্
পরীত্য সর্ব্বাঃ প্রদিশো দিশশ্চ।
উপাস্থায় প্রথমজামৃতস্য
আত্মনাত্মানং অভিসংবিবেশ॥

সর্ব্বভূতকে (পরীত্য) ব্রহ্মস্বরূপ জানিয়া সর্ব্বলোককে সমুদয় দিগ্বিদিককে ব্রহ্মস্বরূপ জানিয়া প্রথমজা, অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ বেদের সেবা করিয়া নিজ কর্ম্মদ্বারা সত্যস্বরূপ আত্মায় প্রবেশ কর। ওঁ শান্তি।

শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী।

প্রার্থনা।

আমি যাহা চাই, পাই বা না পাই,
আশায় রাখিও প্রাণ।
মিলে বা না মিলে, মিলনের লাগি,
তৃষা দিও উপাদান॥
গভীর তিমিরে ডুবে যদি যাই
আলোকের আশে রেখো।
বড়ই যাতনা হইলে পরাণে
সুখ স্মৃতিটুকু রেখো॥
চির শয়নেতে যায় যদি দিন
আঁখি রেখো নিদ্রাহীন।
আশায় আশায় সুদীর্ঘ জীবন
রেখো সখা চিরদিন॥
চির আঁখিজল হলেও সম্বল
দুঃখ যেন রহে ঢাকা।
সহিতে বহিতে আপনা যাতনা
কর মোরে দৃঢ় সখা॥

শ্রীচারুবালা দত্তগুপ্তা।

সাগর তরঙ্গ।

সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের কথা আমরা পুস্তকে পড়িয়া থাকি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা যে কি সে সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ ধারণা নাই। সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া তরঙ্গমালার প্রতি দৃষ্টি করিলে মনে হয় যেন বহুদুর হইতে একটি সু-উচ্চ জলের প্রাচীর গড়াইতে ২ কুলের দিকে আসিতেছে। বস্তুতঃপক্ষে তরঙ্গের সহিত জলের কোন গতি হয় না, যেথাকার জল সেখানেই স্থির থাকে, কেবল চক্ষের ভ্রান্তির দরুণ ঐরূপ একটী গতি অনুভব হয়। ঐ ঢেউয়ের উপরে একটুকরা কর্ক ছাড়িয়া দিলে উহা একবার উর্দ্ধে উঠিবে এবং পুনরায় নিম্নে পড়িয়া যাইবে মাত্র কিন্তু উহা ঢেউয়ের সঙ্গে চলিয়া যাইবে না। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে তরঙ্গের কোনরূপ গতি নাই। নব-জাত শ্যামল ধান্যক্ষেত্রে বায়ু সঞ্চালনে যে একরূপ তরঙ্গের সঞ্চার হয়, ঐ সমুদ্র তরঙ্গও ঠিক এইরূপ।

জলরাশির বিস্তৃতির অনুপাতে যতই গভীরতর হইবে তরঙ্গও সেই অনুপাতে বৃহৎ হইবে। লবণাক্ত জলে এই তরঙ্গ অধিক হইয়া থাকে।

বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের নিকটে সমুদ্র অগভীর বিধায় তথায় তরঙ্গের উচ্চতা ১৫ হইতে ২০ ফুটের উর্দ্ধে উঠে না, ভূমধ্য-সাগরে তরঙ্গের পরিমাণ মাত্র ১৩ ফুট পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ১৮৪৭ সনে স্কর্জবি (Scoresby) লিবারপুল হইতে বোষ্টন যাইবার সময়ে তরঙ্গের যে পরিমাপ করিয়াছিলেন তাহা ২৬ হইতে ২৯½ ফিট পর্য্যন্ত হইয়াছিল। পর বৎসর ঐ পথে ফিরিবার সময়ে ঝড়ের মধ্যে আটলান্টিক মহাসাগরে ৩০ হইতে ৪৩ ফিট উচ্চ তরঙ্গ দেখিয়াছিলেন।

প্রশান্ত মহাসাগরে একটী তরঙ্গ ৩৩ ফিট মাপা হইয়াছিল। স্যার জেমস্ রস্ (Sir James Ross) উত্তমাশা অন্তরীপের নিকটে ৩৯ ফিট উচ্চ একটী তরঙ্গ দেখিয়াছিলেন। যে দিকে উপসাগর ঝড়ের জন্য বিখ্যাত তথায় ৩৬ ফিটের উর্দ্ধে তরঙ্গ দেখা যায় না। কেহ ২ বলেন তথায় ১০০ ফুট তরঙ্গও হইয়া থাকে।

উন্মুক্ত সমুদ্রে ৫০।৬০ ফুটের উর্দ্ধে তরঙ্গ না হওয়াই সম্ভব। বিশাল তরঙ্গ প্রবল ঝড়ের সময়ে উত্থিত হয় না, যখন একদিকে দীর্ঘকাল প্রবল বাতাস চলিতে থাকে উহাদের সমবেত ফলে বিশাল তরঙ্গের উদ্ভব হইয়া থাকে। কখন ২ যে স্থানে ঝড় হয় তাহা হইতে বহুদুরে তরঙ্গ বিস্তারিত হইয়া থাকে। সে জন্য পুরীতে অনেক সময়ে নির্ব্বাত অবস্থায়ও প্রবল তরঙ্গ দেখা যায়। ঐ সকল তরঙ্গ তটভূমীর সংঘর্ষে আসিয়া অনেক সময়ে ফাটিয়া যায়। তরঙ্গ যখন অগভীর জলে আসিয়া পড়ে এবং যখন বাঁধা প্রাপ্ত হয় তখনই উহার আয়তন বৃদ্ধি হইয়া থাকে। উন্মুক্ত বারিধি-বক্ষে তরঙ্গ সাধারণতঃ কখন ৫০।৬০ ফিটের উর্দ্ধে উঠে না। নস হেড্ (Noss head) লাইট হাউসে বাঁধা প্রাপ্ত হইয়া কখন ২ তরঙ্গ ১৭৫ ফিট উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া থাকে। ডানেট হেড্ (Dunnet head) লাইট্ হাউসের ৩০০ ফিট উর্দ্ধে যে কাচ নির্ম্মিত সারসী বর্ত্তমান আছে উহা কখন ২ উত্তাল তরঙ্গোৎক্ষিপ্ত উপলখণ্ডের আঘাতে ভাঙ্গিয়া যায়। এই উত্তাল তরঙ্গের দ্বারা বারিধির কতদুর গভীর পর্য্যন্ত আলোড়িত হয় এখন তাহাই দেখিব। হিসাব মতে দেখিতে গেলে তরঙ্গ যত ফিট্ উচ্চ হইবে সমুদ্রে গর্ভে তাহার ৩৫০ গুণ নিম্নে প্রতিঘাত যাওয়া উচিত। যদি একটী তরঙ্গে উচ্চতা ৩৩ ফিট হয় তাহা হইলে তাহার প্রতিঘাত সমুদ্রের ১¾ মাইল নিম্নে পৌঁছিবার কথা। ইহা হইল গণিত শাস্ত্রের হিসাব, কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে উহা গভীরতার সহিত Geometrical proportion এ কমিয়া থাকে। কখন কখন ৬০০ ফিট নিম্নেও প্রতিঘাত পৌঁছিয়া থাকে। কিন্তু উহা অত্যন্ত বিরল। সাধারণতঃ ৩০০ ফিটের নিম্নে প্রতিঘাত পৌঁছায় না, সে জন্যই প্রবল ঝড়ের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য ডুবুরী জাহাজ দ্বারা উত্তাল তরঙ্গাকুল সমুদ্র পার হইবার কথা চলিতেছে।

এই তরঙ্গ যত উচ্চ হয়, সাধারণতঃ উহা তাহার ১৫ গুণ দীর্ঘ হইয়া থাকে। যদি একটী তরঙ্গ ৫ ফুট উচ্চ হয় তাহা হইলে উহা ৭৫ ফুট দৈর্ঘ্যে হইবে ইহাই রীতি। সেরূপ ৫০ ফুট উচ্চ তরঙ্গের দৈর্ঘ্য প্রায় ৭৫০ ফুটের অধিক হয় না।

এই তরঙ্গের গতি উহার উচ্চতা এবং জলের গভীরতার উপরে নির্ভর করে। তরঙ্গ দীর্ঘ হইলে এবং সমুদ্র গভীর হইলে উহার বেগও অধিক হইবে। অগভীর সমুদ্রে ক্ষুদ্র তরঙ্গমালার গতি ঘণ্টায় ২০ মাইলের অধিক হয় না। আমরা তরঙ্গের দৈর্ঘ্য এবং গতির পরিমাণ জানিতে পারিলে সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয় করিতে পারি। অন্য দিকে আমরা তরঙ্গের উচ্চতা এবং জলের গভীরতা জানিলে তরঙ্গের বেগ নির্দ্ধারণ করিতে পারি। ভূমিকম্পের দ্বারা যে তরঙ্গ উদ্ভূত হয় তাহার দৈর্ঘ্য ও বেগ উভয়ই অধিক হইয়া থাকে। ১৮৫৪ সনের ২৩ শে ডিসেম্বর জাপানে যে ভূমিকম্প হইয়াছিল তাহার ফলে যে তরঙ্গের উদ্ভব হইয়াছিল উহা দৈর্ঘ্যে ২১০ মাইল এবং মিনিটে প্রায় ৮ মাইল বেগে চলিয়াছিল।

তৈলের দ্বারা বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের তরঙ্গমালা প্রশমিত করা যায়। ইহা লোকে পরিজ্ঞাত আছে। সে জন্য পারস্য উপসাগরে ধীবরগণ সমুদ্রে উত্তাল তরঙ্গ দেখিলে জলের উপরে তৈল ছড়াইয়া দেয়। লেপ্টেনেণ্ট বেচ্‌লার (Lieutenant Bechler) এ সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া বলিয়াছেন—তৈল তরঙ্গের আকৃতির পরিবর্ত্তন করিয়া উহার তীব্রতা কমাইয়া দেয়। উহা দ্বারা জলের উপরে পাতলা রবারের আবরণের মত একটী আবরণ পড়িয়া যায়। সে জন্য বায়ু উহা ভেদ করিয়া উচ্চ তরঙ্গের সৃষ্টি করিতে পারে না, কেবল বিস্তৃত জলরাশি একবার স্ফীত হইয়া উঠে এবং পুনরায় নিম্নগামী হয় মাত্র। এইরূপ উত্থান পতনে জলযানের বিশেষ ভয় থাকে না।

জল ভারী বস্তু বলিয়াই এই তরঙ্গের আঘাত অত্যন্ত গুরুতর হয়। যে ইঞ্জিনিয়ার এডেষ্টোন আলোক গৃহ (Eddystone light house) প্রস্তুত করিয়াছেন তিনি ঝঞ্ঝাবাতের সময়ে হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, প্রতি বর্গফুটে তরঙ্গের আঘাত ৩২ মণের কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে লাগিয়া থাকে, কিন্তু স্কেরিভোর আলোকগৃহে (Skerryvore light house) ঐ আঘাতের পরিমাণ প্রায় ৬৪ মণ হিসাব করা হইয়াছিল। শীতঋতুতে আটলাণ্টিক মহাসাগরের কোন ২ তরঙ্গ প্রতি বর্গ ফুটে ৮০ হইতে ১০০ মণ চাপও দিয়া থাকে। এই প্রবল তরঙ্গাঘাতে বিশাল প্রস্তরখণ্ড ক্ষুদ্র মার্বেলের মত ছুড়িয়া ফেলে। যখন হার্টকে (Heartoch) আলোকগৃহ প্রস্তুত হইতেছিল তখন এক প্রবল ঝড়ে ৫৪ মণ ওজনের ১৪ খানা প্রস্তর পত্রের মত দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়াছিল। তরঙ্গের ইহা অপেক্ষা অধিক শক্তির কথা লিপিবদ্ধ আছে। রিইউ-নিয়ন দ্বীপপুঞ্জে (Re-union) তরঙ্গে ৫১০ বর্গগজ একটী প্রস্তরখণ্ডকে সরাইয়া নিয়াছিল। যখন উইকবেতে (Wick Bay) সমুদ্রের মধ্যে জাহাজ রাখিবার এক নিরাপদ স্থান প্রস্তুত হইতেছিল তখন কঙ্ক্রিটের ২৭০০০ মণ এক বিশাল খণ্ডকে শীতঋতুর প্রথম ঝড়েই বহুদূরে ছুড়িয়া ফেলিয়াছিল। এই ভীষণ তরঙ্গঘাতে সমুদ্রের তীরদেশ কিছু কিছু ক্ষয় হইতেছে। ক্ষয়ের পরিমাণ সর্ব্বত্র সমান নহে। ক্ষুদ্র উপলখণ্ড বা নুড়ি দ্বারা তীরদেশ অনেকটা রক্ষা হইয়া থাকে।

শ্রীহরিচরণ গুপ্ত।